১৭২ক

Calc- HO5243-1-247472

67
64
21.3.63

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

756.3
C C 3/3

বঙ্গদর্শন

পাকিং-রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র

পুরনো ঘড়ি দেখা ও
ঘড়ি সারানো শিখুন

হিমানী

পশ্চিম বঙ্গের আধুনিকতম

ও

অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন

কলিকাতা—১২

ফোন ৩৪-৩৩৫৬

স্মরণীয় ৭ই ● অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থারম্ভ

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ :

প্রবাসী ও 'Modern Review'-এর সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫·৭৫

১৩৩২ সালের রবীন্দ্রনাথ যখন বেতার শান্তিনিকেতন ও [illegible] স্কুলের নিমন্ত্রণে ইরাণ ও ইরাক ভ্রমণে যান তখন লেখক রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন। এই দুটি দেশের সর্বত্র কবি যে সাদর অভ্যর্থনা ও বিপুল সম্মান লাভ করেছিলেন, তার পূর্ণ বিবরণ ও চিত্র-পরিচয় লেখক পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। ইরাণ ও ইরাকের প্রাচীন ও আধুনিককালের ইতিবৃত্ত, সভ্যতা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিচয় সহ প্রায় একশতখানি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে এই দুটি প্রাচীন দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, রাজনীতি সভ্যতা ও সমাজ মানসলোকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অব ড্রামা—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : চেয়ার, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অং বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০৲

সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ

নাট্যমঞ্চ ও নাট্যজীবন এক অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতিতে এসে পৌঁছেছিল নাট্যোৎকোবিদ নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সংসারপথ পরিক্রমায়। তিলে তিলে দিনে দিনে উনবিংশ শতকের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে কলকাতার আলিন্দ থেকে জেগে উঠছে নব চেতনায় বিংশ-শতক। এবং এই সন্ধিক্ষণই প্রবল সিন্ধু তরঙ্গের মতো তাঁকে এনে দিয়েছিল নাট্যলক্ষ্মীর সাধন-মন্দিরে। এই বিবর্তন যেমন তীব্র নাটকীয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আগ্রহ-উদ্দীপক। এক আন্তরিক ও অকপট আত্মকথনের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই সুবৃহৎ আত্মজীবনমূলক গ্রন্থটি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে এক অপরূপ রসলোকে নাট্যতীর্থ থেকে সাহিত্যতীর্থে উত্তরণের এ এক নাটকীয় স্বাক্ষর বলা যেতে পারে।

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত

বিবিধার্থ অভিধান

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন অভিধান

—এতে আছে—

১। বাংলা বিশেষার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ (Idioms & Phrases—অর্থসংকেত) ২। বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন (প্রত্যেক প্রবাদের অর্থসমেত) ৩। বাংলায় আগত বিদেশী শব্দ (ইংরেজী, ফরাসী পর্তুগীজ, জার্মান আরবী, ফার্সী) ৪। বাংলায় আগত অন্য ভারতীয় শব্দ (হিন্দী, মারাঠী তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটি ইত্যাদি) ৫। যুদ্ধোত্তর নূতন বাংলা কথা ৬। বাংলা ভাষার অবশিষ্ট ও অপশব্দ (Slang words) ৭। গ্রাম্য শব্দ ৮। তদ্ভবরূপ শব্দ ৯। সাংবাদিক নূতন বাংলা শব্দ ১০। বাংলা দ্বিত্ব শব্দ ১১। বিপরীতার্থক শব্দ ১২। সমষ্টিগত শব্দের তালিকা ১৩। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ ১৪। সহচর শব্দ ১৫। পরিভাষা (বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক, প্রশাসনিক রাজনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক পরিভাষা)—

এ ছাড়া আরও অনেক আবশ্যকীয় বিভাগ আছে—

৩৫০ পৃষ্ঠা : মূল্য ৬·৫০

সর্বকালের সর্বজনপ্রিয়

অমর কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

চিরনূতন গল্পগ্রন্থ

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুরুচিসম্পন্ন অভিজাত অভিনব প্রচ্ছদপটে সুসজ্জিত বেশে নবরূপে, নবকলেবরে প্রকাশিত হোল

দাম : ছয় টাকা

সুশীল রায়ের (উপন্যাস) পদ্মিনী ২·৫০

চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা ও সর্বোত্তমা রমণী পদ্মিনী। তেমনি এক স্ত্রী এই উপন্যাসের নায়িকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না ৩·২৫

স্নেহাস্পদ, প্রিয়জন বা শ্রদ্ধেয়জন সকলের হাতেই দেওয়া যায় সানন্দে

—এমন একখান চিরকালের বই—

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫
আজকের মানুষ		৬
রঙ্গদর্শন		৭
শুভকামনা	অন্নদাশঙ্কর রায়	৮
সীমান্তের মানুষ		৯

কবিতা

কয়েকটা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
এই বসন্তে	দক্ষিণারঞ্জন বসু	১০
ঐতিহাসিক	মনীশ ঘটক	২৫
যাওয়াটাই তাড়া	বাণী রায়	৪১

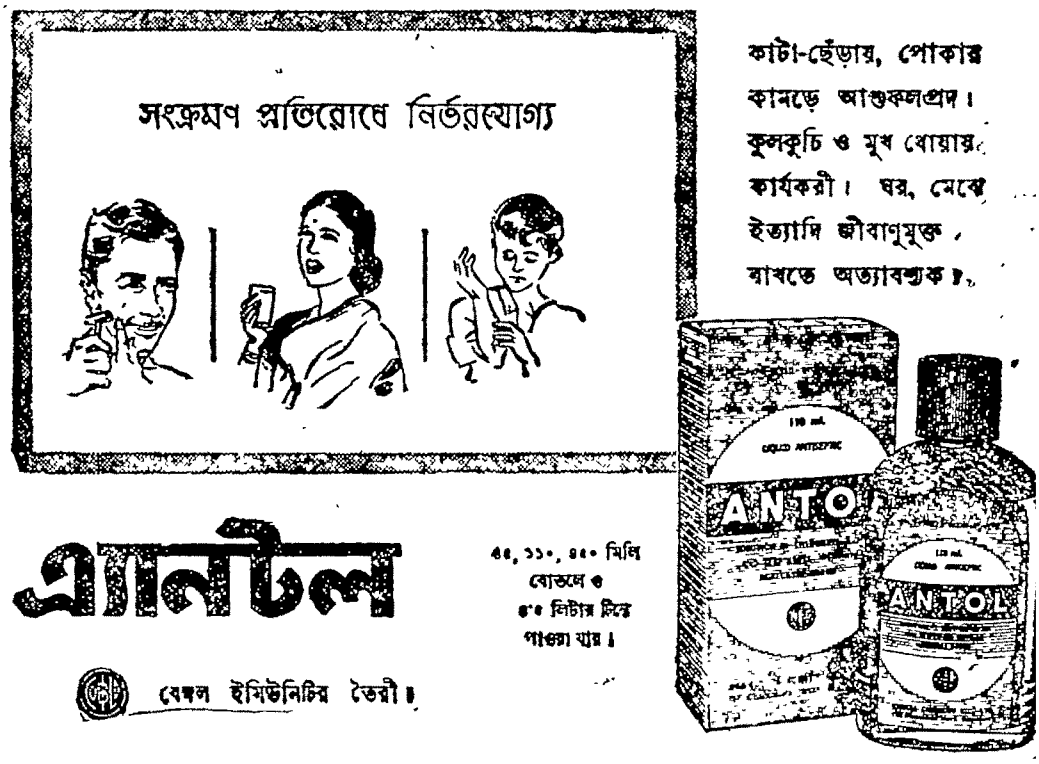

সূচীপত্র

আন্তর্জাতিক	...	...	১১
লণ্ডন থেকে	...	সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়	১৯
ভেড়ার শাসে (গল্প)	...	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১
নগর কলকাতা	...	...	২৬
দিল্লী থেকে	...	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৮
আমাদের প্রতিবেশী	...	নলিনীকুমার ভদ্র	৩১
কেন্দ্রীয় বাজেট	...	অধ্যাপক মিহির সেন	৩৩
কৃষ্ণার্জুন সংবাদ	...	পরিমল গোস্বামী	৩৬
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকলা	...	চিদানন্দ দাশগুপ্ত	৩৮
খেলাধুলা	...	...	৪২
রঙ্গজগৎ	..	...	৪৪

প্রচ্ছদপট : হৈমন্তী সেন

রবীন্দ্র পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচারকমণ্ডলী রম্যাণি বীক্ষ্যের লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালীর লেখক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে এবার (১৯৬২-৬৩ সালের জন্য) রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এই বইগুলির আমরাই প্রকাশক।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব	...	৭·৫০
মহারাষ্ট্র পর্ব	...	৭·৫০
দ্রাবিড় পর্ব	...	৭·০০
সৌরাষ্ট্র পর্ব	...	৭·০০
কুলিন্দা পর্ব	...	৫·০০
রাজস্থান পর্ব	...	৭·০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ৭·৫০

হিন্দু সমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, পূজা, উপনয়ন প্রভৃতি যে সকল সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি নিত্য প্রচলিত উহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই বইটি অপরিহার্য।

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ :: ফোন : ৩৪-১৬০৬

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার নামে পাঠাতে হবে।

প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে ডাকটিকিট সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে।

গ্রাহকদের প্রতি

১। ভি· পি· যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। মণিঅর্ডারযোগে গ্রাহক চাঁদা 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল (ডাকমাশুল)
বার্ষিক	১৩ টাকা	১৬ টাকা
ষান্মাষিক	৬·৫০ নঃ পঃ	৮·৫০ নঃ পঃ
ত্রৈমাসিক	৩·৫০ নঃ পঃ	৪·৫০ নঃ পঃ

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ নঃ পঃ

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং এ বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
সাপ্তাহিক বিভাগ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশিত হ'ল

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসসাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

কেউ তত লাজুক নয় দাম ৪·০০

আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

সাগরময় ঘোষ	●	দণ্ডকারণ্যের বাঘ	● ৩·০০
রূপদর্শী	●	ব্রজবুলি	● ৩·৫০
বিমল কর	●	এই দেহ তন্ত্র মুখ	● ৩·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	●	যখন যেখানে	● ২·৭৫
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	●	স্বপ্ন সঞ্চার	● ৩·৫০
প্রমথ চৌধুরী	●	রবীন্দ্রনাথ	● ২·০০
আনন্দীকশোর মুন্সী	●	পরম লগনে	● ৪·৫০
বিমলপ্রসাদ সম্পাদিত অলৌকিক গল্প-সংকলন		অন্য ভুবন	● ১০·০০

বীথিকা

: প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থভারত
৪১বি রাসবিহারী এভেন্যু,
কলি:-২৬ ; ফোন : ৪৬-৭৫২৯

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা — ১২

১।৩২এফ প্রেন্স গোলাম মহঃ রোড, কলি—২৬ ফোন : ৪৬-৮৪৭৫

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৬৭ বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ

বৃহস্পতিবার (৭ই চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)

Thursday, 21st March, 1963

25 Naya Paise

সাপ্তাহিক বসুমতীর নব পর্য্যায়

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে দৈনিক বসুমতীর নব পর্য্যায়ের যাত্রা সুরু হয়েছে। স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সংস্থার মধ্যে নতুন যুগের কর্ম্মোদ্যম ও নতুন পরিচালনার উদ্দীপনা এসেছে। সুতরাং দৈনিকের মত সাপ্তাহিকেরও রূপান্তর প্রায় অনিবার্য্য ছিল।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রের জগতে সাপ্তাহিক বসুমতী আজ প্রাচীনতম পত্রিকার গৌরব দাবী করতে পারে। সুদীর্ঘ ৬৬ বছর অতিক্রম করে সাপ্তাহিক বসুমতী ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করলো। কিন্তু ৬৭তম বর্ষের জরা বা বার্দ্ধক্য নিয়ে নয়, যেন যযাতির মত নব যৌবনের জোয়ার নিয়ে এই সাপ্তাহিক পত্র নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। এখন থেকে সপ্তাহিক বসুমতী কেবল ছকে বাঁধা সংবাদপত্র হিসেবে বেরুবে না, সাময়িক পত্র বা ম্যাগাজিনের আকারে সপ্তাহের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আত্মপ্রকাশ করবে। অর্থাৎ সংবাদ-সাপ্তাহিক বৈচিত্র্যময় সাময়িক পত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। শুষ্ক সংবাদকে পিছনে ফেলে সে রস ও সৌন্দর্য্যের জগতে প্রবেশ করছে। নানা বর্ণে, গন্ধে, রূপে ও ছন্দে আলোড়িত এই পৃথিবীর পরিচয় থাকবে সাপ্তাহিক বসুমতীতে। গল্প, কবিতা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে সুরু করে শিক্ষিত পাঠকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী যথাসম্ভব বিচিত্র রচনাসম্ভারে সাজানো হবে সাপ্তাহিক বসুমতীকে। দেশ-দেশান্তরের বাছাই করা সংবাদও যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে পৃথিবীব্যাপী নানা আন্দোলন ও সংঘাতের কাহিনী। কিন্তু কোন মতবাদের নিছক গোঁড়ামী নিয়ে আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর নীতি নির্দ্ধারণ করবো না। বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের জনসমাজের পক্ষে যে নীতি কল্যাণকর বলে বিবেচিত হবে, সেটাই আমরা অনুসরণের চেষ্টা করবো। রাজনৈতিক কোন্দল ও কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে আমরা যাবো না। আমরা কোনও বিশেষ দলভুক্ত নই—রাজনীতিক্ষেত্রেও না, সাহিত্যক্ষেত্রেও না। ঘোঁট পাকানো রাজনীতি ও দল পাকানো সাহিত্যকে আমরা বর্জ্জন করে চলবো।

সাপ্তাহিক বসুমতীর এই নব পর্য্যায়ের দ্বারা আমরা কারুর সঙ্গে কোন অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছি না এবং তার দরকারও নেই। কারণ বাঙ্গলার মানসক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত যে, মুক্ত আকাশের পাখীদের মত অনেক পত্র-পত্রিকার এখানে ঠাঁই আছে। বাঙ্গলার ভৌগোলিক দরজা যেমন কখনও বন্ধ ছিল না, তেমনি বাঙ্গলার মানসলোকও সর্ব্বদাই খোলা আছে। এই 'মুক্ত মনে'র সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে হবে সপ্তাহিক বসুমতীর নয়া কারবার। বাঙ্গলার সাহিত্য ও সংবাদপত্রের পিছনে রয়েছে বিপুল এক ঐতিহ্যের ইতিহাস। লাঞ্ছিত মানবতাকে এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে নির্ভয় চিত্তে ভাষা দিয়েছে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সংবাদপত্র। যে বেদনা সমাজের অভ্যন্তরে লুকানো তার সুর ধ্বনিত হয়েছে বাঙ্গলার মানসলোকে, তার সাহিত্যে ও সঙ্গীতে। মুক্তিকামী মানুষের বার্ত্তা লেখনীমুখে প্রচারিত হয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে। সেই বার্ত্তা সাপ্তাহিক বসুমতীর নতুন সংবাদ রূপে প্রতিফলিত হবে। আমরা মুক্তিকামী মানুষের মুখপত্রে পরিণত হতে চাই। এর চেয়ে বড় কামনা আমাদের নেই।

আশা করি, আমাদের এই নতুন ব্রতে ও সাধনায় আমরা পূর্ব্বগামীদের আশীর্ব্বাদ পাবো, আর দেশবাসীর কাছ থেকে পাবো প্রীতি ও সহযোগিতা।

সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের বিনীত নমস্কার।

আজকের মানুষ

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাক-ভারত আলোচনা বৈঠকের টেবিলে প্রথমেই চোখে পড়ে মাথায় সাদা পাগড়ী, চোখে চশমা, হাস্যোজ্জ্বল দীর্ঘদেহী মানুষটিকে। ইনি হলেন সর্দার শরণ সিং—পাক ভারত আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব যাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সীমানা নির্দ্ধারণের কাজেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। সীমানা সংক্রান্ত ভারত এবং চীনের মধ্যে বৈঠকগুলিতে ভারতের যুক্তিসঙ্গত দাবীর অকাট্যতা প্রমাণে সর্দারজী নৈপুন্য দেখিয়েছেন।

আরও অনেক আগে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান গঠনের সময় তিনি পার্টিশান কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

লাহোর সরকারী কলেজের এই শিখ ছেলেটি একদিন ছিল সব ভালো ছাত্রদের আতঙ্ক। তাঁর দাপটে কোন পরীক্ষায় প্রথম হবার উপায় ছিল না কারো। তখনকার লাহোর কলেজে বিতর্কে এবং বাগ্মিতায় তাঁর সমকক্ষ ছিল না কেউ।

জেনেভায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশনে সর্দার শরণ সিং ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন।

১৯৫৯ সালে ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় রাশিয়ানরা যে ১৫০০ মিলিয়ন রুবল ঋণদান করেন, সেই ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থার প্রাথমিক আলোচনার দায়িত্বও ছিল সর্দার শরণ সিং-এর উপর। মস্কোয় গিয়ে এই ঋণ আদায়ের আলোচনা এবং ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়।

১৯৫৭ সালে তিনি জলন্ধর থেকে লোকসভায় নির্ব্বাচিত হয়ে আসেন এবং কেন্দ্রীয় ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানী দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পুনর্গঠিত নেহরু-মন্ত্রি-সভায় তিনি রেল-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়ে এখনও এই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

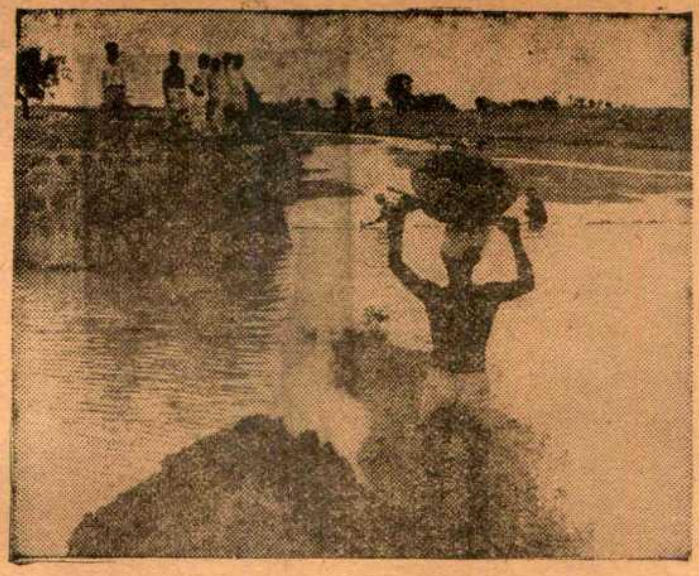

সরকারী প্রচেষ্টা

রূপায়ণ

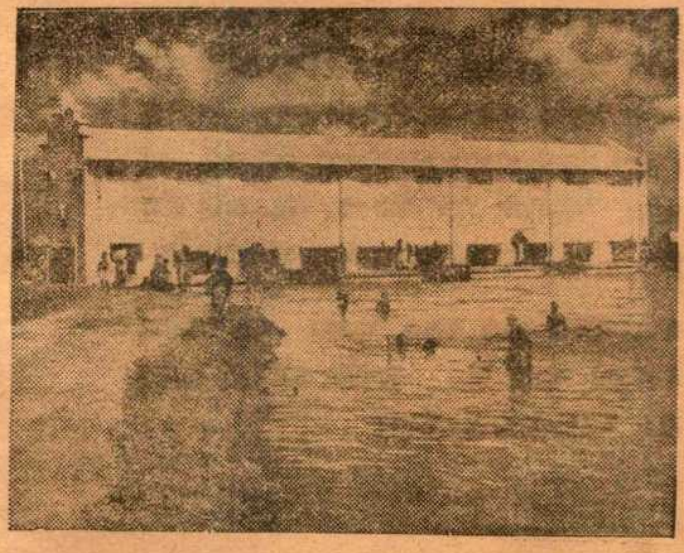

জলাভূমি পূরণ হচ্ছে

পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা সরকারী মুখপত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। মজুত গমের উপর নির্ভর করে সংকটকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে, এই নিশ্চয়তা অবশ্য দেওয়া হয়েছে। তবুও আত্মসন্তুষ্টির চিরাচরিত নিয়ম এ-ক্ষেত্রে প্রতিপালিত না-হওয়াই কাম্য। কারণ, পরিকল্পনা কমিশনের কাছে রাজ্যের কৃষি-ব্যবস্থার খাতয়ান দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছেন যে ১৯৫৭ সালের এপ্রিলের কোন পরিসংখ্যান তাঁরা সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যতটুকু তথ্য তাঁরা পরিবেশন করেছেন তা-থেকে একটি তথ্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে—কোটি কোটি টাকা কৃষিতে ব্যয়িত হওয়ার পরও কৃষিজাত উৎপাদন যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে গেছে।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে গত কয়েকবছরের ব্যয়কে অপব্যয়ের পর্যায়ে অভিহিত করাটাই সঙ্গত হবে।

পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে কৃষি সম্পর্কে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে।

আজও রাজ্যের ১৬ ভাগের বেশী জমিতে ভালো বীজ বিতরণ করা সম্ভব হয় নি। অজস্র অর্থব্যয়ে যে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, বিদ্যুতের অভাবে তার অধিকাংশই অকেজো। অথচ, এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার আগে কল্পনা করা কর্তব্য ছিলো যে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ঘাটতি হবে। সার বণ্টনের অবস্থাও একইরূপ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে এই সব ত্রুটী সংশোধিত হবে। শুধু প্রকৃতির কৃপা অথবা সরকারী প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সাধারণ মানুষের ভরপেট অন্ন জোটে না।

সীমান্তের মানুষ

নেফার নারী

মেয়েরা
ধান ভাঙ্গছেন

সামরিক শিক্ষা
গ্রহণ করছেন

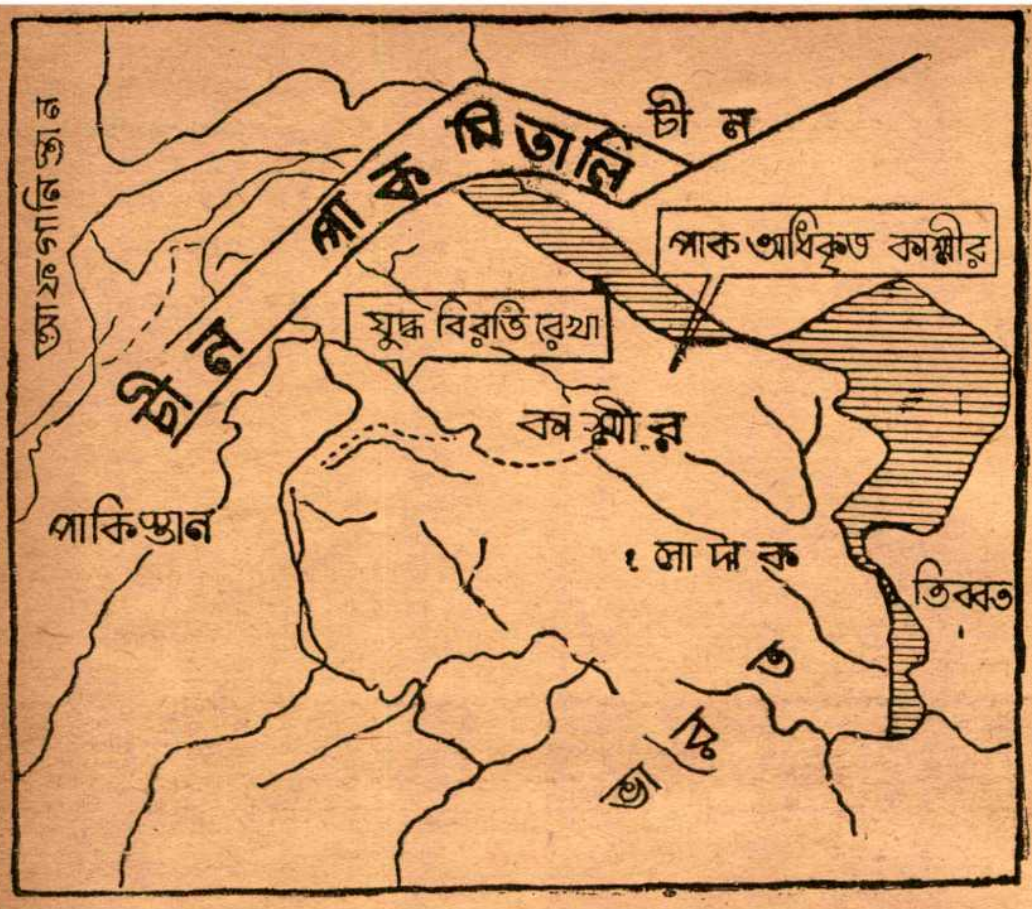

চীন-পাকিস্তান সীমান্তচুক্তি

এক বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে চীন এবং পাকিস্তানের সীমান্তচুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পিকিং থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, "সীমান্তের রেখা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে চীন

এবং পাকিস্তান নীতিগতভাবে ঐক্যমতে পৌছিয়েছে।"

রাওয়ালপিণ্ডির বৈঠকে বিদ্বেষ এবং সন্দেহ ছড়িয়ে দেওয়ার কুমতলবে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে, এমন ধারণা সঙ্গতভাবেই করা হয়েছিল। এখন, কলকাতা বৈঠকের প্রাক্কালে সীমান্তচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রইলো না যে, কেন এই 'বিস্ময়কর দ্রুততা'।

চীন কি চায় ?

এই চুক্তিবলে চীন যে এলাকা হস্তগত করলো তার সামরিক গুরুত্ব কম নয়। তা-ছাড়া, যে 'নীতির' ভিত্তিতে এই সীমানা নির্দ্ধারণ হ'লো তার স্বাভাবিক প্রয়োগ চল্‌লে চীন 'আক্‌সাই চীন' দাবী করতে পারে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনো আলোচনায় চীন দৃষ্টান্ত টানবে এই চীন-পাক সীমান্ত চুক্তির। দেখা যাচ্ছে যে আমিল গিরিবর্ত্মের জলাভূমি ধরে সীমারেখা টানা হয়েছে সামান্য পথমাত্র এবং তার পর সীমারেখা হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বে চলে কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম ধরে এগিয়েছে।

এই কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম ধরেই চীনের দাবী হলো 'আক্‌সাই চীন', যেটা তারই দখলে।

চীনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরও

সুদূর প্রসারী। সে চায় ভারতকে কোণঠাসা করতে। তাই সুকৌশলে চীন একের পর এক দেশের সঙ্গে সীমান্তচুক্তি করে নিল। প্রথমে বার্ম্মা, তারপর নেপাল। ইতিমধ্যে, ভারতের সঙ্গে আকস্মিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে চীন হঠাৎ তার কমিউনিষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্র মঙ্গোলীয়ার সঙ্গেও সীমান্তচুক্তি

করলো। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিলো—পরোক্ষে ক্রুশ্চেভ সমর্থক মঙ্গোলীয়াকে হুমকী দেয়া। দিকে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যেন সীমান্ত-নির্দ্ধারণ করার প্রক্রিয়া অতি-স্বাভাবিক এক পথ। চীন সেটাই চাইছে। কমিউনিষ্ট বা অ-কমিউনিষ্ট, এসব প্রশ্ন নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। মঙ্গোলীয়ার পর পাকিস্তান। সেখানেও "নির্বিঘ্নে" চুক্তি হলো। অতএব? চীনের প্রচারে বলা হবে: 'ভারতের অমনোয়, অবিবেচক কলহ প্রবৃত্তির জন্যই' চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন এমন 'উগ্ররূপ' ধারণ করেছে। তা-যদি না হবে, তবে অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমান্ত-চুক্তি কি ভাবে সম্ভবপর হ'লো।

অন্য আর একটি উদ্দেশ্য চীনের আছে। সকলেই জানেন যে, কাশ্মীর প্রশ্নে ক্রুশ্চেভ দ্ব্যর্থহীন ভাবে ভারতকে সমর্থন করেছেন। বর্ত্তমানে, চীনের ভারত-নীতিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অধিকাংশ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নিন্দা করেছেন। ক্রুশ্চেভ যদি ভারতের পক্ষে, চীন তবে ভারত-বিদ্বেষী পাকিস্তানের দিকে। শিশুসুলভ অভিমানের অভিব্যক্তি না অন্য কিছু?

পাকিস্তান কি চায়?

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে: পাকিস্তান কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলো? পাকিস্তান সীয়াটোর উৎসাহী-সভ্য। মার্কিন অস্ত্রবল-অর্থবলে প্রতিপালিত, সীয়াটো-সভ্য পাকিস্তান এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে চুক্তি করলো কেন?

কারণ, পাকিস্তান চিরকালই চেয়েছে ভারতকে কোণঠাসা করতে। সে দিক দিয়ে চীনের সঙ্গে তার সমস্বার্থ জড়িত। তাই, চীন-ভারত সংঘর্ষের সংকটময় কালে সে ভারতকে সমর্থন জানায়নি। পাকিস্তান ভাবছে, এই হলো সঠিক মুহূর্ত্ত যখন ভারতের ওপর চাপ দিয়ে সে কাশ্মীরের দখলীকৃত এলাকায় আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর পাকিস্তানের অভিমান পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ভারত যে-পরিমাণে মার্কিন অর্থলাভ করলো, এবং অস্ত্র পেলো সম্প্রতি তা পাকিস্তান খুসী মনে স্বীকার করতে পারছে না।

চীনের সঙ্গে চুক্তি করে পাকিস্তান এই কথাই মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের জানাতে চায় যে: 'অন্যত্রও আমার প্রিয়-জন রয়েছে। আমাকে অবহেলা করো না। 'একই সাথে ক্রুশ্চেভকেও ইঙ্গিত দেওয়া হ'লো: 'ভাখো, কমিউনিষ্ট চীন আমার সঙ্গে।' অর্থাৎ, আমরা অবহেলার বস্তু নই।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিধারাকে লক্ষ্য রেখেও যে এই চুক্তি করা হয়েছে, এমন অভিমত পোষণ করার সঙ্গত কারণ আছে। সাম্প্রতিক কালে, পাকিস্তানের জনমত-বিশেষ ভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষ দাবী করছেন স্বাধীন জাতীয় নীতি।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসত্ব তাঁদের দেশ প্রেমকে অহরহ লাঞ্ছিত করে।

তাঁরা চাইছেন: 'স্বাধীন, জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ নীতি।'

কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে চুক্তি করে পাকিস্তানের নেতারা এখন জন-সাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে, তাঁরা কারুর 'ভৃত্য' নন। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রেরও নয়।

জনসাধারণ আবার ভ্রান্তিকর এক মোহজালে বাঁধা পড়বেন হয়তো। তারই সুযোগে, পাকিস্তানের নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রসারিত এবং বলীয়ান করার চেষ্টায় মত্ত হবেন।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় একটা। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কী ভূমিকা?

শিকল বাঁধা পাখীকে একটু-আধটু পক্ষসঞ্চারণের অধিকার দিতে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ আপত্তি আছে বলে মনে হয় না।

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটা মীমাংসা হ'ক এটা তাঁরা চান। তার বেশী জড়িত হয়ে বিবদমান কোনো পক্ষকে তাঁরা বিব্রত কর্ত্তে রাজী নন।

সর্বকালের সর্বজনের বই:

যৌন বিজ্ঞান ১ম
আবুল হাসানাৎ ১০·০০

যৌন বিজ্ঞান ২য়
আবুল হাসানাৎ ১০·০০

জন্ম নিয়ন্ত্রণ (৭ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
আবুল হাসানাৎ ২·৫০

শিশু মনস্তত্ত্বমূলক বই

শিশু মঙ্গল
আবুল হাসানাৎ ৪·০০

কাজল লতা উপন্যাস
প্রবোধ সান্যাল ২·৫০

আমিরী উপন্যাস
প্রবোধ সান্যাল ২·০০

নতুন চাঁদ কবিতা
কবি নজরুল ইসলাম ২·০০

পূবের হাওয়া কবিতা
কবি নজরুল ইসলাম ১·৫০

যুগবাণী প্রবন্ধ
কবি নজরুল ইসলাম ২·০০

মৃগতৃষ্ণা রহস্যোপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৫·০০

মনবিহঙ্গ রহস্যোপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৫·৫০

রবীন্দ্র কাব্য নাটকের বিস্তৃত সমালোচনা গ্রন্থ

রবীন্দ্র নাট্যপ্রসঙ্গ
ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত ৪·০০

ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

সালাম

বলা সম্ভব নয়, তবে একথা সত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম না হ'লে সামরিক শাসনশক্তির পাট বদলের ইতিহাস গত কয়েক বৎসরেই কয়েকবার দেখা দিয়েছে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্যে। এই গণ-অভ্যুত্থান গণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতিতে সংহত না হলে কাশেম কিংবা আজমের পুনরাবৃত্তি যে ঘটবে

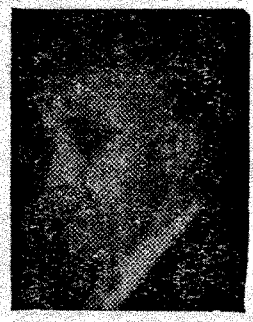

বিতাড়ন

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস থেকেই বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃত স্বার্থনিকার উত্তোলনে ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক দলের প্রগতিবাদিতা ও একতন্ত্রশাসিতার পরিবর্তে পার্টি সহনশীলতা আরব দুনিয়ার ইতিহাসে এক নতন সংযোজন ও নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ অধ্যায়।

ধূমকেতু

কাজী নজরুল ইসলাম

ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনমতের স্ফুলিঙ্গ বাংলা দেশকে যখন প্রখর করে তুলেছে, তার আগ্নেয় লেখনী নিয়ে নজরুল ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধূমকেতুর সম্পাদক রূপে। কুশাগ্র সেই রচনার তাড়নায় ইংরেজ সরকার তাঁর কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে তাঁকে কারারুদ্ধ পর্যন্ত করেছিলেন। ধূমকেতু নজরুল ইসলামের সেই বিস্ফোরণোন্মুখ রচনারই শোভন একটি সঙ্কলন। দাম—২·৫০

ঝড়

কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবির নতুন ও পুরাতন কয়েকটি কবিতার সঙ্কলন পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত। ৩·০০

সুরলিপি

কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলামের বিভিন্ন গান স্বরলিপি সহ একত্রে প্রকাশিত একটি শোভন সংস্করণ। দাম—৪·০০

বিষের বাঁশী

কাজী নজরুল ইসলাম

দাম—২·৫০

"সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে প্রকাশক নজরুলের 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করে পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা কবিতায় নজরুল একটি অবিস্মরণীয় নাম। ভেরার রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাঁশী জাগ্রত নব।' শাসিত ও জর্জরিত বাঙালার জীবনে মহাজীবনের বাণীই তিনি জাগিয়েছেন। তিনি শুনিয়েছেন 'দুর্জয় মহা আহ্বান।' মহৎ কবিতার সত্য কোন দিন বিবর্ণ হয় না। বিষের বাঁশীর আবেদন আজও ব্যর্থ হয় নি। এই আহ্বান ব্যর্থ হবার নয়। আজও বিষের বাঁশী পড়তে পড়তে পাঠকের এই সত্য উপলব্ধি করবেন যে দেশের মাটির প্রতি কবিতার টান কত গভীর, কত নিবিড়। এই কবিতার আবেদন দেশের মানুষের কাছে।—অমৃত

মরুভাস্কর

কাজী নজরুল ইসলাম

বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী নিয়ে লিখিত একটি অমূল্য কাব্যগ্রন্থ। দাম—২·৫০

উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

উপন্যাস—

পিয়া পথ চাহি	শ্রীবাসব	৩·০০
অন্ধকারের মন	শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ	২·০০
চেনা মন	শ্রীখগেন্দ্র দত্ত	২·৫০

কবিতা—

অন্যতর	শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ	১·৭৫

অন্যান্য বই—

যাতায়াতের পথের ধারে	শ্রীপদাতিক	১·০০
আগুনকন্যা	বোম্মানা বিশ্বনাথম	২·০০
বিশ্বনবী	গোলাম মোস্তাফা	১২·০০

বুকস্ এ্যাণ্ড বুকস্ (পুরবী সিনেমার নীচে) ১০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ভারত-পাক আলোচনার পঞ্চম অঙ্ক

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে জনাব জেড, এ, ভুট্টো ও সর্দার শরণ সিং

করাচী হইতে কলিকাতা। কলিকাতা হইতে আবার করাচী। চতুর্থ পর্য্যায়ে পাক-ভারত আলোচনা শেষে একমাত্র সুনিশ্চিত লাভ আলোচনা বানচাল হইয়া যায় নাই। করাচীতে আবার বৈঠক বসিবে।

কিন্তু তিন দিনব্যাপী পর্য্যালোচনা দুই দেশের মধ্যের ব্যবধান কমাইতে সক্ষম হয় নাই। বস্তুতঃ কাশ্মীর সমস্যা লইয়া আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইবার কোন অবকাশই কলিকাতায় ছিল না। চীন-পাকিস্তান চুক্তির কৃষ্ণচ্ছায়া সমগ্র আলোচনার পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

অশোভন ব্যস্ততায় পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি সম্পাদনের আশু উদ্দেশ্য যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা, তাহা খুবই স্পষ্ট। চীন যে কাশ্মীরের মালিকানার ব্যাপারে পাকিস্তানের সহিত বোঝাপড়া করিয়া ভারত-পাক সৌহার্দ্যের পথে কাঁটা দিতে চাহিয়াছিল, সে বিষয়ে মত স্তরের অবকাশ নাই। এই অবৈধ চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে করাচী যে অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ। বিশেষ করিয়া ভারত-পাক বিরোধ মীমাংসার জন্য যখন মন্ত্রিস্তরে আলোচনা চলিতেছে, সেই সময় কাশ্মীরের উত্তরাংশের দুই হাজার বর্গমাইল স্থান চীনকে উপঢৌকন দিয়া চুক্তি সম্পাদন করার মধ্যে আর যাই থাক, ভারতের প্রতি সম্প্রীতির মনোভাব নাই।

দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য কাশ্মীর বিরোধ যে প্রধান অন্তরায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যাকে এই দুই দেশের মধ্যে অন্যান্য সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা কঠিন। তবুও আলোচনা চালাইয়া যাইবার জন্য ভারত পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিল। কলিকাতার আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে সীমানা বিরোধ এবং আসাম ও ত্রিপুরায় পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশজনিত বিষয় লইয়া আলোচনা করা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহাতে ভারতের পূর্বের নীতিই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ রাওয়ালপিণ্ডিতে আলোচনার প্রথম পর্য্যায়ে ভারত এই বিষয়গুলি আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল।

পাকিস্তানের নীতি

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখনও দৃঢ় হয় নাই, তখন অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পাকিস্তান কাশ্মীরের উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধের সুযোগে গত পনের বৎসর বিনা উপদ্রবে সেখানে সে টিকিয়া আছে। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে পাক রাজনীতির প্রধান উপজীব্য ভারত-বিরোধিতা। স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অশান্তি ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ বন্ধ করিবার জন্য ভারত-বিদ্বেষ অকৃপণ হস্তে পরিবেশন করা হইয়া থাকে; পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় ভারত-বিরোধী কৎসা। কাশ্মীর সমস্যা অথবা যে কোন পাক-ভারত সমস্যার সমাধানের পথে পাকিস্তানের এই মনোভাবই বেশী অন্তরায়। কাশ্মীরে গণভোটের দাবী পাকিস্তান ভারতকে দিয়া স্বীকার করাইতে পারে নাই। কিন্তু গণভোটের দাবী পাকিস্তানের পক্ষে কোন সময়ই মৌলিক দাবী ছিল না। কারণ কাশ্মীর হস্তগত করার পন্থা হিসাবেই সে গণভোটের দাবী তুলিয়া ছিল। কারণ আইনগতভাবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু আইনগত অবস্থা যাহাই হউক না কেন, ভারতকে আজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবানুগ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কারণ এই দুই দেশের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বিরোধ অবসানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তবে দুই দেশের মধ্যে নিষ্পত্তির অর্থ এই নয় যে, পাকিস্তান ভালমন্দ যাহাই বলুক না কেন, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কাশ্মীর প্রশ্ন ভারতের কাছে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। পাকিস্তান যত সহজে গণভোটের প্রশ্ন উত্থাপন ও পরিত্যাগ করিতে পারে, ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি সেরূপ সহজে ত্যাগ করা সম্ভব নহে। গত পনের বছরে পাকিস্তানের গণভোটের দাবীর যৌক্তিকতা অনেক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক প্রথায় ভোট দিয়া নিজেদের সরকার নির্বাচিত করিয়াছে: আজ পর্য্যন্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে একবারও ভোট গ্রহণ হয় নাই। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সুযোগে পাকিস্তান বহুদিন তাদের দাবীর একগুঁয়ে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন।

বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত প্রস্তাব করিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা দ্বারা দুই দেশের মধ্যে কাশ্মীরকে বিভাগ করিতে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভারতের বক্তব্য হইতেছে যে, গত পনের বছরে কাশ্মীরের জনসাধারণ যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই প্রস্তাবে তাহা বিশেষ ব্যাহত হইবে না। বহু অর্থব্যয়ে ও কষ্টে যে অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া এবং কাশ্মীরের জনগণের জীবনে আবার দুর্য্যোগ ডাকিয়া আনিতে ভারত রাজী নয়।

পাকিস্তান গণভোটের দাবী না করিলে ভারত প্রস্তাবিত যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখ

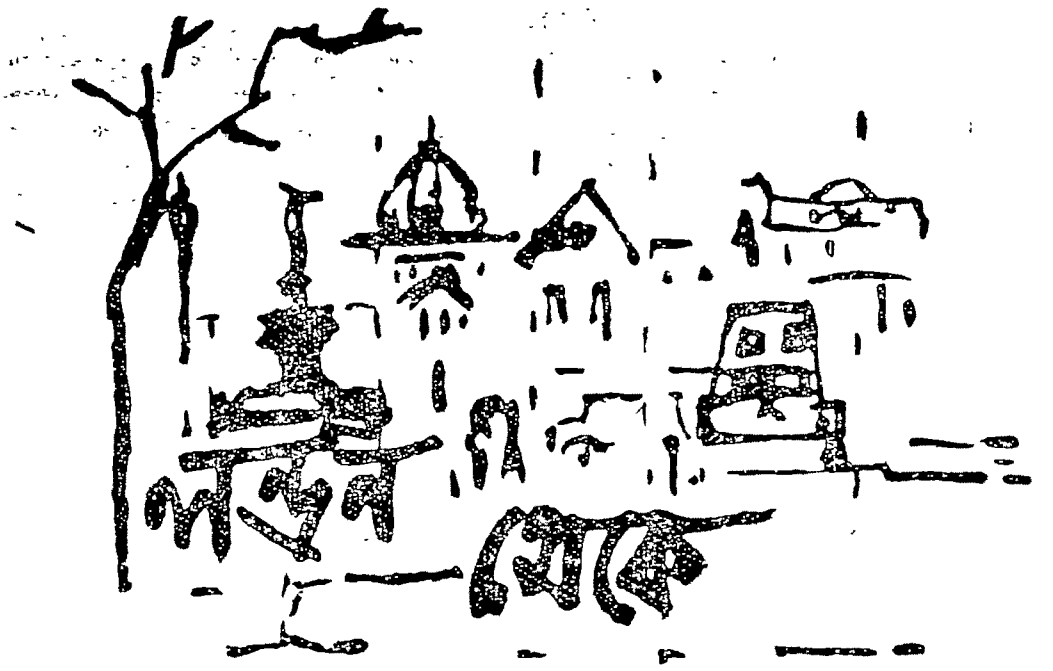

বক্সিং ডে। সকালবেলা থেকেই বরফ পড়েছে মুষল ধারায়। দুপুর নাগাদ সকলেই বাস্তায় ও পার্কে স্কেটিং করতে বেরিয়েছে। ছুটির দিন। স্বভাবতই প্রত্যেকে বেজায় খুশী। যাক তবু তো এবার White Christmas হলো! যদিও নবেম্বর থেকেই বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই পরিমাণে নয়। পরেরদিন সকালে অফিস যাওয়ার আগে কর্তা গ্যাবেজ খুঁজে পাননা; গিন্নীরও মেজাজ খারাপ; কারণ জলের পাইপ ফেটে গেছে; বাচ্চাদের স্কুলের বাস বরফ-চাপা পড়ায় পিকনিক বন্ধ। ব্যাপার কি? সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি নয় বরফই পড়েছে। দু-একদিনের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিলো গ্রেট-ব্রিটেনে। অধিকাংশ গ্রামই একঘরে হয়ে পড়েছে। এ. ন কি, লণ্ডনেও এক-হাঁটু বরফ। তার উপর গ্যাস সার্ভেন্স, পাওয়ার-কাট, জলসরবরাহ প্রায়-বন্ধ। রোজ সকালে জলের-গাড়ী এলে বালতি কিংবা প্রয়োজনে হাঁড়ি নিয়েও হাউস-ওয়াইফদের লাইন দিতে হয়। তাছাড়া শাক-সবজি দুর্লভ ও অগ্নি-মূল্য এবং দুধও ভালোমতো পাওয়া যাচ্ছেনা। "Drinka pinta milka day" বিজ্ঞাপনগুলো আগেই স্নগ এসে কালো করে দিয়েছিল! হেলিকপ্টারে সপ্তাহের বাজার পাঠিয়ে রিফিউজীদের (!) গ্রাসাচ্ছাদন আরম্ভ করতে হলো। তাপমাত্রা সবসময়ই বস্তাকার। নতুন নতুন শব্দ শোনা যেতে লাগল—ব্লিজার্ড, ব্লাক-আইস, ফ্রিজিনিং, ইত্যাদি। যানবাহন অনিয়মিত হওয়ায় দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রায় অচল। খেলাধূলা সম্পূর্ণ বন্ধ। সুতরাং যে বিরাট অংশ সপ্তাহ শেষে শনিবার ফুটবল-হুল কিংবা রেসের ফলাফলকেই জীবন-মরণ সমস্যা গণ্য করতো, তাদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী বাতাস আরো ভারী হয়ে উঠল। আঁক কষে পণ্ডিতরা বার করলেন ১৮১৪ ও ১৮৩৮ সালে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে একাসনে বসবার উপযুক্ত এ বছরের শীত। এমন কি ১৯৪৭ সালের দীর্ঘতাকেও অতিক্রম করে গেল এই বেয়াক্কেলে এবং সম্পূর্ণ গায়ে-পড়া অতিথি। এরিমধ্যে চৈচৈ। কি ব্যাপার? পোষ্টাপিস ও পুল কোম্পানী মিলে "তুতুড়ে ফলাফল" প্রচলন করেছে। অর্থাৎ যে ফুটবল খেলাগুলো খেলা হলোনা, সেগুলো যদি খেলা হতো, তাহলে তাদের যে ফলাফল হতে পারতো, তাই নির্ণয় করার জন্যে একটি কমিটি খাড়া করা হয়েছে। তার সভাপতি হিসেবে একজন লর্ড-এর নাম ঘোষণা করা হলো। পরের সপ্তাহে একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সাংবাদিক। তার পরের সপ্তাহে একজন এম, পি,। এখনও সেই ভুতুড়ে-খেলা পুরোদমে চলছে। এর উপর কমনওয়েলথের গোলমাল। ম্যাকমিলান সাহেব রাগ করে রাজকুমারী ও রাজমাতার প্যারিস ভ্রমণ বন্ধ করে দিলেন। সদ্য নির্বাচিত লেবার নেতা উইলসন সেই সুযোগে একচোট টিটকিরী করে নিলেন। বাজারে জোর গুজব উইলসন সামনের ইলেকসনে প্রধান মন্ত্রী হবেন। অর্থাৎ 'ছায়া' থেকে 'কায়া'য় রূপান্তর। অতএব ম্যাকমিলান যদি বহু যুগের ওপার হতে বসন্ত আনার নিমিত্ত শর্বরীর প্রতীক্ষা আরম্ভ করেন, তাহলে নিতান্ত অন্যায় হবে না।

যখন ইয়োরোপে আর্ট-ফিল্ম ও avon grade-এর ঝড় বইছে এ দেশে তখনও ভারতের মতোই সামাজিক সমস্যা বহুল (অথচ) সঙ্গীত মুখর টাইপের ছবিই বানার 'আলো' করে রয়েছে। এরই বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম ঘটেছে লিণ্ডসে এ্যাণ্ডারসনের "This sporting life" ছবিটিতে। স্যাটারডে নাইট সাণ্ড সণ্ডে মর্ণিং এবং "এ টেস্ট অফ হনি" তে যে বিপ্লবের সুরু তার স্থায়িত্ব

উৎসবে পুরস্কৃত। বহু আলোচিত ও প্রশংসিত। ট্রিলজির শেষ পর্ব "The eclipse" পাশ্চাত্যের অন্যতম মাস্টারপীস হিসেবে সম্মান লাভ করেছে। L, Avventura ও La Notte-এর পর যেখানে The eclipse দর্শক মহলে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত অর্থে ছবিটির কোনও প্লট নেই। মধ্যবিত্ত নিয়ে একজন উঁচুদরের চিত্রনাট্যকার, আন্তোনিয়ানি যুক্ত করতে পছন্দ করেন। ছবিটির আরম্ভ একটি বাংলোর বন্ধন থেকে নায়িকার মুক্তিলাভ ও শেষ অংক একটি প্রেমের অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিয়ে। এই বিরতিকে পরিচালক "sentimental interval" বলেছেন। আন্তোনিয়ানির বিশ্বাস বর্তমান জগতে সুস্থ প্রেমের বিকাশ হওয়ার কেন না আমরা Communicate করতে পারি না বা চাই না। তাই যৌন-সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে চেষ্টা করি তার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা আমাদের মানসিকে আরো যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে। পাশ্চাত্য সমালোচক চমকে দাঁড়িয়ে এ শুধু মনস্তাত্ত্বিক আক্ষেপ বা ভীত্র নসট্যালজিয়া নয়, শিল্প হিসেবে আন্তোনিয়ানির এ এক গভীর উপলব্ধি। তাই এই ছবিতে নায়িকার মুখে আমরা আন্তোনিয়নির সংলাপ শুনি: "There is no need to know each other to love, perhaps there is no need to love." প্রধান সূত্রে বাঁধা হয়েছে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বর্ণাঢ্যমে এ্যালেন ডেলন এবং মনিকা ভিত্তি অসাধারণ অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" লণ্ডনে কবে দেখানো হবে জানি না।

সুসংবাদ—

লণ্ডনের বহুপ্রশংসিত Lampoon "প্রাইভেট আই" এর প্রথম বছর পূর্ণ হলো গত মাসে। ফরাসী অস্তিত্ববাদের ওপর কয়েক ছাত্র মিলে উপস্থিত করে হাস্যরসের স্যাটায়ারের ঢেউ তুলছে। বাঁকা, উদ্ভট, উদ্ভত সমালোচনা। চোখা চোখা বিশ্লেষণ। এদের মধ্যে চারজন "Beyond the Fringe" এর শিল্পী। বলাবাহুল্য এই রিভিয়ুটি শুধু লাভ হোক এই নব্য সার্কাসী পারম্পরিকের প্রথম প্রয়াসে। ভালো ছবির কথায় মনে পড়ল মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়নির নতুন ছবি "The eclipse" লণ্ডনে রিলিজ করেছে। এই ছবিটি বান চলচ্চিত্র লণ্ডনেই নয় আমেরিকায়ও বক্স-অফিসের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও অসাধারণ মৌলিকতা বিভিয়ুটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এক শিল্পরুচির আখ্যা দিয়েছে। তাছাড়া মাস দুই ধরে টেলিভিশনে এই গোষ্ঠীরই "That was the week that was" নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠান এদেশে অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এদেরই কয়েকজন লণ্ডনের একমাত্র স্যু টারিকাল নাইট-ক্লাব "The Establishment" এর প্রধান অংশীদার ও মালিক। বেশীর ভাগ আক্রমণই রাজনৈতিক। এবং সম্পূর্ণ গোলাখুলি, তীক্ষ্ণ আক্রমণ। এদের সুতীব্র বিদ্রূপের কাছে সরকার বা প্রমুখের লেখা নিতান্তই মোলায়েম বলে ঠেকবে।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

যদিও ইংরেজরা চিরদিনই নিজেদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে অভ্যস্ত, তবুও এই দলটির মতো একই সঙ্গে প্রতিভা-সম্পন্ন তরুণ স্যাটায়ারিষ্টদের আবির্ভাব সম্ভবত আগে হয়নি। একটি দৃষ্টান্ত দেবার ইচ্ছে সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। "প্রাইভেট আই"-এর কোন এক সংখ্যায় চার্চিল সম্পর্কে একটি সচিত্র রসরচনা বেরোয়। তারই এক জায়গায় গান্ধীজী চার্চিলকে মদ পরিবেশন করতে এসে বলছেন "Your Gandhi and soda, Sir!" চার্চিলের উত্তর "I have not become the Tory's First Rebel to watch over the liquidation of the British Empire".

কবি রবার্ট ফ্রস্টের মৃত্যুতে কবি রবার্ট গ্রেভস অবিটুয়ারীতে লিখেছেন: "He (Frost) joked charasterically about his own death:" when I go to the next world, they'll ask me:'Did you live modern? I'll answer: 'A little and go on to say:' I flew a little, went on TV a little..'And then some will ask me: 'Did you smoke the right cigarette?' And I'll say: 'I don't know about that"

পুঃ—সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি Sylvia Plath হঠাৎ মারা গেছেন। মাত্র তিরিশ বছরেই উনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। পারিবারিক জীবনে উনি কবি Led Hughas-এর স্ত্রী। ১৯৬০ সালে প্রথম বই "The colossus" প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। সাহিত্য-জগতে এ ক্ষতি অপূরণীয়।

●

রাষ্ট্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

: ২য় বর্ষ ৩য় (কার্তিক-পৌষ) ও

৪র্থ (পৌষ-চৈত্র) একত্র

প্রকাশিত হইয়াছে

॥ এই সংখ্যার প্রবন্ধ ॥

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও নব মানবতাবাদ : বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রসঙ্গ : বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য প্ল্যানিং বোর্ড ও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা : মৃনাল মুখোপাধ্যায়। চীনের ভারত আক্রমণ ও আন্তর্জাতিক আইন : হরিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সংকটকাল ও জাতীয় সংহতি : অশোক মুখার্জি। পশ্চিম বাংলার পৌর সংস্থা : ব্রজকুমার মুখোপাধ্যায় : পুরাতনী, আলোচনা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, গ্রন্থ-পরিচয়, সহযোগী রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :

ডঃ নরেশচন্দ্র রায়

সম্পাদক : নির্মল বসু

॥ এই সংখ্যার দাম এক টাকা ॥

॥ বার্ষিক চার টাকা ॥

কার্যালয় : ১৫৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ব্লক—এন, ফ্লর নং ৮, কলিকাতা-৬

(ফোন : ৪৪-৫৩-১)

মানুষটার নাম ফুলচাঁদ বর্মণ। আর নাম শুনলেই যা মনে হয়—বোকাটে আর নিরীহ।

উত্তর বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। মেটে দেয়ালে খড়ের চালা, তিন বছরের মধ্যে সে চালা বদলানো হয়নি, বৃষ্টি শাদলায় করবার করে জল পড়ে। বাপ মজুর খাটে, মা মুড়ি ভাজে—ভরপেট খাওয়া জোগানো শক্ত হয়। আঠারো বছরের ফুলচাঁদ বাপের সঙ্গে খাটতে যায়, বাড়ী ফিরে বলাইকরা থালায় যা ভাত পায় তাতে পেট খুশি হয়না—তখন পুনর্ভবা নদীর ধারে ধারে নোনা-বইচি আর পানিফলের সন্ধান করে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়ী ছেড়ে পালালো ফুলচাঁদ। গ্রামের একটি মানুষ কলকাতায় যাচ্ছিল কি কাজে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কালিয়াগঞ্জ রেল ষ্টেশনে। বাপকে লুকিয়ে গোটা পনেরো টাকা জমিয়েছিল ছ'মাসে—একেবারে রাজধানীতে পৌছে গেল।

অকূল সমুদ্র। পথের দিশা নেই—লোকের শেষ নেই—ঘর বাড়ার ঠিক নেই। শেয়ালদা ষ্টেশনের বাইরে এসে আর তার পা চলে না। খুব ছেলেবেলায় একবার নেকমদনের মেলায় গিয়ে তার ঘূর্ণি লেগে গিয়েছিল—বাপের এর কাছে সে যে কিছুই নয়। আঠারো বছরের ফুলচাঁদ বর্মণের চোখে জল এসে গেল, মনে হল এক দৌড়ে ছোট্ট গাঁয়ে পুনর্ভবা নদীর ধারে বৈঁচি আর কুলবনের মধ্যে পালাতে পারলে সে বেঁচে যায়।

ভাগ্যিস গ্রামের মানুষটি সঙ্গে ছিল। সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল তাঁর উকিলবাবুর বাসায়। উকিলবাবুর এক বন্ধু তখন চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছিলেন আর মোটা একটা চুরুট টানছিলেন।

মামলার আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে উকিলবাবু ফুলচাঁদের কথাও শুনলেন। তারপর বন্ধুকে বললেন, তোমার চাকর দরকার আছে বলছিলে না? এই ছোকরাকে নিয়ে যাও না। তোমারও প্রব্লেম সল্‌ভড হবে—আর এও বেঘোরে মারা যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

উকিলবাবুর বন্ধুটি চোখ ছুটোকে গোল করে ফুলচাঁদকে দেখে নিলেন কিছুক্ষণ। তার বোকাটে ভীতু চেহারা তাঁর পছন্দ হল। তবু ভুরু কুঁচকে বললেন, একেবারে 'র' যে। মানুষ করতে সময় নেবে।

উকিলবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। বললেন, হোক 'র'। কিন্তু আমিও তো নখ বেরুলের—র‍্যাদার এদের ভেলারই লোক। এরা খুব নিরীহ আর ভনেষ্ট হয়। কাজ শিখিয়ে নাও—খাশাই হবে।

ফুলচাঁদ চাকরি পেল। কলকাতায় পা দিতে না দিতেই বরাত খুলল তার।

সে আজ মাস চারেক হল। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক তৈরী হয়ে গেছে ফুলচাঁদ। খুব বেশিরে অনেকবার, পেয়ালা প্লেট ভেঙেছে গোটা কয়েক, তার অনেকগুলো বোকামী এ বাড়ীর চাকরের টেবিলে হাসির খোরাক। কিন্তু এখন সে খাবার টেবিল সাজাতে জানে, ট্রামে উঠে বাজার করতে পারে, এক্সপ্লানেডে গিয়ে আর ঢাপা পড়ো পড়ো হয়না, এমন কি টেলিফোন ধরে 'হ্যালো হ'লো' করে বলতে পারে। ধরুন একটু—বাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

সংসারটা অদ্ভুত। গিন্নীরা আছেন—কিন্তু তেতলার ঘরে প্রায় সব সময়েই শুয়ে থাকেন। দুবার চায়ের সময় আর দুবার খাওয়ার সময় নেমে আসেন—তার পরেই ফিরে শুয়ে পড়েন আবার। কী যেন অসুখ আছে তাঁর, বেশি চলাফেরা করা বারণ। সন্ধ্যেবেলা জেগে থাকেন ছবি একটা বসে চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে নইলে নিজানায় পা এলিয়ে বই চাঁদকী সব পড়েন আর মধ্যে মধ্যে ডাক্তার এসে তাঁকে দেখে যান।

কর্তার তিন মেয়ে। একদম ছোট—স্কুলে পড়ে, বাস এসে নাদ, ব্রেক পরে বেণী দুলিয়ে স্কুলে চলে যায়। বাকী দুই দি দিদিরা ফুলচাঁদের চাইতে বয়েসে বড়ো হলেই মনে হয়। তারা যায় না—বাড়ীতে বসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শাড়ী বদলায়, আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁ ঘষে মুখে কী সব সুগন্ধ মাখে, গান-বাজনা করে, বেড়াতে

যায়, যার মাংস খায়, আর হাসিতে চিৎকারে চারিদিক একেবারে মাৎ করে রাখে। এরাই ফুলচাঁদের ওপর উপদ্রব করে সব চাইতে বেশি।

এটা আন-সেন্সর্ড আন—এদিকে যা সেদিকে যা। এ-টি পানের থেকে চুন খসলেই বকুনি: দুত্তোর ছাই-ছাড়া অবর্মার ঢেঁকি। একেবারে চিড়িয়াখানার জন্তু।

ফুলচাঁদ প্রথমে ভেবেছিল এরা বাবুর সঙ্গে মেয়ে তাই বাপের ঘরে পড়ে আছে। টনক নড়ল গাদা গাদা মাছ মাংস খেতে দেখে। তারপরে জানল এই হচ্ছে শ্বশুরের রেওয়াজ। এখানে বুড়ী না হলে বিয়ে হয়না মেয়েদের।

আর বিয়ে হয়না বলেই সাজগোজ পান-বাজনা ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। ফুলচাঁদের মধ্যে মধ্যে বিরক্তি ধরে যায়। ভাবে—যেত তাদের গ্রামে, সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যেত মহাটা। মণখানেক ধান সেদ্ধ করতে হলে বেরিয়ে যেত এই সমস্ত বাবুগিরি। এমন করে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে হত না।

তবু চাকরিতে ফুলচাঁদের একরকম মন্দ লাগছিল না। ভাবছিল, এমনি করেই দিন কেটে যাবে। কিন্তু তা হল না। আবার পালাতে হল তাকে। কলকাতা ছেড়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে। কুকুরের তাড়া খেয়ে যেমন করে খরগোস ছুটে পালায়।

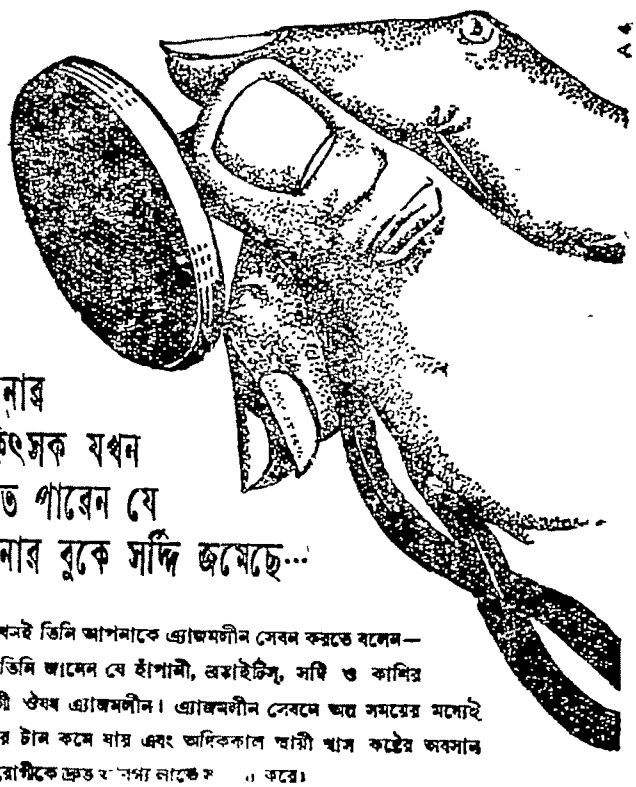

আপনার চিকিৎসক যখন বুঝতে পারেন যে আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলেন—কারণ তিনি জানেন যে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দ্দি ও কাশির উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিককাল স্থায়ী শ্বাস কষ্টের অবসান ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত স্বাস্থ্য লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন

শ্বাসযন্ত্রের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ

প্রস্তুতকারক—

জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

১১১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

ব্যাপারটা এই রকম:

সকালে উঠেই বাড়ীতে সাড়া পড়ল সেদিন।

চায়ের টেবিলে কর্তা বললেন, আজ সন্ধ্যায় জ্যোতির্ময় বাবুকে খেতে বলেছি। মানে মিষ্টার মজুমদারকে।

গিন্নীমা একটুকরো রুটির ওপরে মাখন মাখাচ্ছিলেন—শুনেই চমকে উঠলেন। কালো হয়ে গেল মুখের চেহারা।

—কেন আবার ওই লোকটাকে—

শক্ত গলায় কর্তা বললেন, থামো। ও না হলে পাঞ্জাবের কাজটা পাওয়া যাবে না।

গিন্নী আর কথা বললেন না, আধ পেয়ালা চা খেয়েছিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেলেন চেয়ার ছেড়ে। একেবারে তেতলায়, নিজের শোয়ার ঘরে।

কর্তা এবার মেয়েদের দিকে তাকালেন। বললেন, রুনু রণু, তোমরা—

মেয়েরা কিন্তু খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। রণু বললে, ঠিক আছে বাবা, জ্যোতির্ময় বাবু এলে তো আমাদের ভালোই লাগে। কী চমৎকার লোক আর কত মজার মজার গল্প করতে পারেন।

রুনু বললে, মা মিথ্যেই ওঁকে দেখতে পারে না। কোনো মানেই হয়না এ-সব পাগলামোর।

এ-সব ব্যাপারে ফুলচাঁদের কোনো কৌতূহল ছিল না, কোনো কিছু সে বোঝেও না। আবছা আবছা ভাবে কথাগুলো শুনছিল আর চায়ের টেবিলে জোগান দিচ্ছিল। কিন্তু চায়ের পরে কর্তা তাকে বললেন, এই ফুল, আমার সঙ্গে মার্কেটে চল। মাংস কিনে আনতে হবে।

বাড়ীতে সবাই ফুলচাঁদকে 'ফুল' বলে ডাকে। ফুলচাঁদ জেনেছে ওটা তার নাম ছোট করে ডাকা নয়, ইংরেজি গালাগাল। ওর মানে বোকা।

বোকা সে নিশ্চয়, গাঁয়ের লোকেও বলত। ওতে এখন আর তার খারাপ লাগে না। দিদিমণিরা তো তাকে গাধা উল্লুক শূয়োর যা খুশি বলে। বাড়ীর রাঁধুনি পর্যন্ত তার নাম দিয়েছে ক্যাবলারাম।

বাবুর সঙ্গে ফুলচাঁদ হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে চলল মার্কেটে। দিগ্বিজয়ীদের সঙ্গে আরো কয়েকবার গেছে সেখানে। তারা দোকানে ঢুকে নানারকম জিনিসপত্র কিনেছে আর সে বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে সাহেব-মেম দেখেছে। মার্কেট যেতে তার ভালো লাগে। যদি কখনো দেশে ফিরে যায়, তা হলে গাঁয়ের লোককে মার্কেটের গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে এমন একটা ইচ্ছেও রয়েছে মনে মনে।

কিন্তু আজ কর্তা তাকে কোথায় নিয়ে এলেন?

সেই ঝকঝকে দোকানপাটের নয়; দিনের বেলাতেও যেখানে আলো ঝলমল করে তার বড় বরাতের জিনিসপত্রের ঝলকানিতে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে চায়, সেখানেও নয়। এ এক আলাদা জগৎ। মাংসের বাজার। ছাল ছাড়ানো গোরু, শূয়োর, ভেড়া ঝুলছে দড়িতে। রয়েছে গোরুর কানো বড়ো বড়ো হলদে চর্বি আর তাল, জোড়ায় জোড়ায় ঝুলছে ঝকঝকে তকতকে কলিজা, ছাল ছাড়ানো ভেড়ার গায়ে আবার নানা রকম ফুল গাঁথা রয়েছে। ফুলচাঁদের পা থমকে দাঁড়ালো। তার মনে হল, পৃথিবীতে কোথাও এতটা জন্তু জানোয়ার বুঝি আর বাকী নেই—এই এতবড় কলকাতা শহরে একটা রাক্ষুসে পেটের মতো তাদের সবকে গিলবার জন্যে টেনে এনেছে কে কে, গেঁয়ো ফুলচাঁদের আর মনে হল, এর পরে জন্তু-জানোয়ার আর কুলোবে না, এখানকার একদল মানুষ আর এদের ধরে ছাল ছাড়িয়ে খেতে সুরু করে দেবে।

বাংলা দেশের একটা উচ্ছে পাড়াগাঁয়ে পুনর্ভবা নদীর ধারে ঘর বাড়ী, সেই ফুলচাঁদ বর্মণের গা দিয়ে ঘাম ছুটল। যেন চোখের সামনে দেখতে পেলো, তারও গায়ের ছাল ছাড়িয়ে—বেশ যত্ন করে ফুল পাতা এঁকে এই মাংসের বাজারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চমক ভাঙল কর্তার ডাকে।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বেকুব কোথাকার? আয় এদিকে।

ফুলচাঁদ এগিয়ে চলল বটে, কিন্তু তার বাধা ঘরছে তখন। বিশ্বাস করা যায় না—এখানে চাঁদতেও সম্ভব বলে বোধ হয়। এত জন্তু—এত মাংস—আর এত মাংস-খোর কলকাতার মানুষ! কিন্তু তার চাঁদতে অসহ্য লাগছে একটা। রক্ত-মাংস চর্বির উৎকট এক শব্দে গন্ধে ভরে আছে চারদিক—নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যেতে চায়, যেন পেটের নাড়ী উল্টে আসে। কী করে এরা ভেবে ভেবেনা করে মানুষ—এত মৃত্যু রক্ত কেমন করে সহ্য করে।

তবু ফুলচাঁদকে সইতে হল। কর্তা ঘুরে ঘুরে মাংস দেখতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ফুলচাঁদ কখনো চোখ বুজে রেখেও কিছু দেখতে চাইল না ফুলচাঁদ, তাকে তে লাগল: এখন পুনর্ভবা নদীর সোনালী রুপালি বালির ওপর রোদ পড়ে—উড় এসেছে ঝকের দল, ওপারে উঁচু ডাঙার ওপর পলাশ-বন লালে লাল, নীচে থোকায় থোকায় সাদা ভাঁট ফুল।

কর্তা বললেন, হল কি রে তোর? তখন থেকে হাঁ করে ওপর দিকে চেয়ে

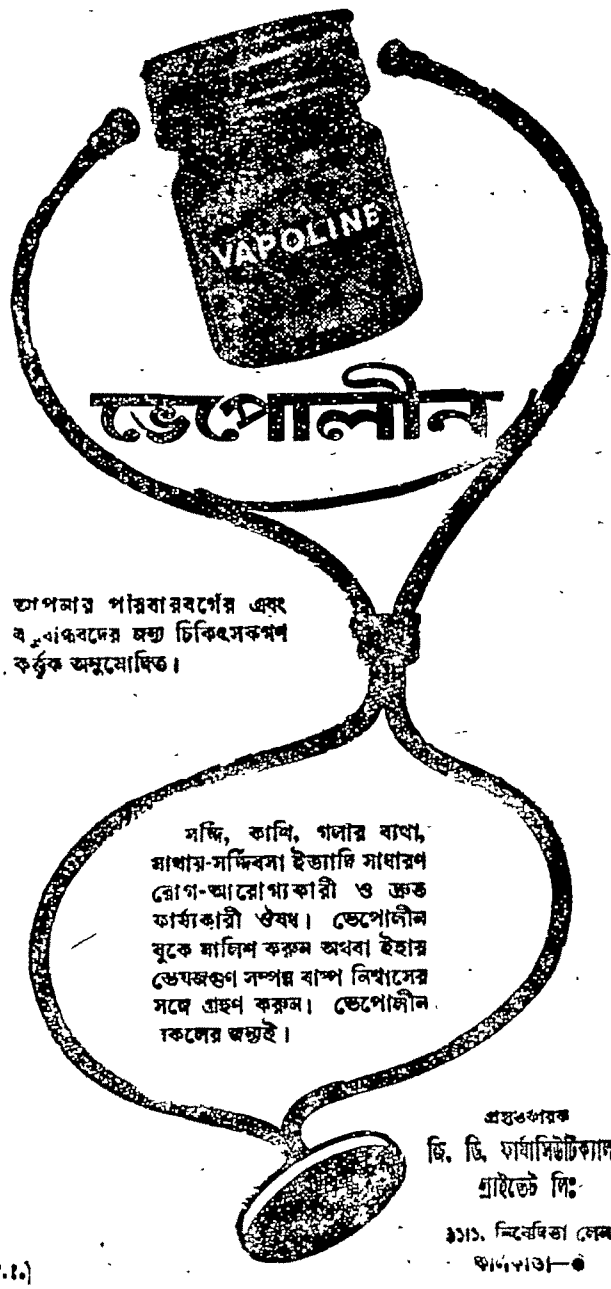

[V.I.]

আছিস? নে—মাংসটা ধর। এইবার একটু দই-মিষ্টি কিনে বাড়ী ফিরতে হবে।

ফুলচাঁদ মাংসের প্যাকেটটা হাতে নিলে। আশ্চর্য, কী সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়েছে। চকচকে পাতলা কাগজের ঠোঙার ভেতর দিয়ে দেখছে মাংস—মনে হয় একরাশ ফুল রয়েছে তার ভেতর। কলকাতার সব কাণ্ডই তাজ্জব!

মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে ওঠবার পরেও মাথার মধ্যে মাংসের গন্ধটা ঘুরে বেড়াল। যে বেচারা ভালোমানুষ ফুলচাঁদ কর্মজীবনে কোনদিন নিজেকে 'নার্ভাস' ভাবেনি, গোলমেলে কীর্তনের আসরেও একবার চোখে জল ছাড়া যার মন কখনো খারাপ হয়নি, আর 'হরে পাওয়া ছাড়া যার কোনোদিন বিশ্রী লাগেনি—আজকে সব কিছু তার কাছে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। এই বাড়ঘ চওড়া রাস্তা, মোটর গাড়ি, ট্রাম গাড়ি সব যেন একটা রাক্ষুসে পেটের মধ্যে মনে হতে লাগল। আর মানুষগুলোকে দেখাতে লাগল ঠিক ছাল ছাড়ানো একরাশ জন্তু—তারা যেন ফিরে না, অদৃশ্য দড়িতে বাঁধা হয়ে শূন্যে ঝুলছে।

ঘামতে ঘামতেই ফুলচাঁদ বাড়ী ফিরল।

তারপর সারাদিনের কাজ। দিদিমণিদের ফাই ফরমাস। আর যত্ন করে ঘর সাজানো।

—ভালো করে ঝাঁট দে। মেঝের কার্পেটটা বাইরে থেকে ঝেড়ে আন।

—সোফার হাতগুলো ভালো করে মুছতে পারিস নে? দেখছিস নে কি রকম ধুলো?

—কর্মন করে ফুল সাজায় বুঝি? সর সর—চড়চড়া বেকুব কোথাকার! ফুলদানিটা তোর হাত থেকে রক্ষে পেলে বাঁচি।

সব অফিস চলে গিয়েছিলেন, গিন্নীমা থেকে নিচের ঘরে জায়গা নিয়েছেন। ছুটি পেল না বাঁধুনি আর ফুল চাঁদ। সারা দুপুরটা ভরে রান্না মাংস রান্নার গন্ধ—ঘর সাজাতে বার বদলাতে ফুলচাঁদের হাড় কালিয়ে গেল। মনে হল, বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলায় মোজরা বসবে—তারই আয়োজনে দিদিমণিরা মশগুল।

বিকেলে কর্তা ফিরলেন দু' বগলে আরো দুটো কাগজের বাক্স নিয়ে। ওতেও কিছু খাবার দাবার আছে খুব সম্ভব। ফিরেই রান্নাঘরে ঢুকে তাড়া লাগালেন: ফ্রাইগুলো এখুনি ভাজতে বসেছ কেন? রেখে দাও—রেখে দাও। খাবার টেবিলে গরম গরম ভেজে দেবে।

আশ্চর্য, এত কাণ্ড হচ্ছে, গিন্নীমার তরফ থেকে কোনো সাড়া নেই। ঝাঁট দিতে যখন তেতলার ঘরে গিয়েছিল, তখন ফুলচাঁদ দেখেছে গিন্নীমা চুপ করে শুয়ে আছেন সেই বড়ো চেয়ারটায়। একটা বই রয়েছে বুকের ওপর, পড়ছেন না—জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। আর বিকেলের খানিকটা রোদ এমন করে তাঁর মুখে এসে পড়েছে যে আচমকা ফুলচাঁদের মনে হল গিন্নীমার সত্যিই খুব অসুখ করেছে—আর বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না।

তারপর সন্ধ্যে হল, বড় দু'বোন সেজে গুজে বাইরের ঘরে বসল, ছোট বোন খাতা নিয়ে তেতলায় মার ঘরে পড়তে চলে গেল, কর্তা ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মোটরের হর্ণ শোনা গেল বাইরে।

—এসেছেন—বলে কর্তা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাসিতে ভরে উঠলো দুই মেয়ের রাঙানো ঠোঁট দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন জ্যোতির্ময় মজুমদার।

মার জন্যে সারাদিন ধরে এত আয়োজন, তার দিকে ভীরু বোকাটে চোখে একবার চেয়ে দেখল কুলচাঁদ। জোয়ান-লম্বা চেহারা, মাথার চুলে পাক ধরেছে, পরনে ফিটফাট সাহেবী পোষাক। ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হয়ে সিগারেট জ্বলছে। কর্তা কী বলতে চাচ্ছিলেন, দুই মেয়ের গলার স্বরে চাপা পড়ে গেল।

—বারে, এমনি করে বুঝি ভুলে যেতে হয়?

—মোটরে করে আমাদের ডায়মণ্ড-হারবার নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আপনার আর দেখাই নেই। হঃ হঃ করে হাসলেন জ্যোতির্ময় মজুমদার।

—ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না একেবারে।—তারপরে ইংরেজীতে আরো কী সব যেন বললেন তিনি। মেয়েরা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুলচাঁদ দাঁড়িয়ে ছিল তখনো। জ্যোতির্ময় ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা গন্ধের ঝলক এসে তার নাকে লেগেছে। এ গন্ধটা তার অচেনা নয়—মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রে কর্তা টলতে টলতে বাড়ী ফিরলে তাঁর মুখ থেকে সে পায়। মদের গন্ধ।

কর্তা হঠাৎ তার দিকে তাকালেন। রুক্ষ গলায় বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে যে? এখান থেকে যা। দরকার হলে তোকে ডাকব।

কুলচাঁদ বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকেই যাচ্ছিল—আপাতত যাবার আর জায়গা কোথায়। ভাবছিল রাঁধুনির সঙ্গেই একটু গল্প গুজব করা যাক। এমন সময় কর্তার গলার স্বরে ঘুরে দাঁড়ালো।

কাকে ডাকছেন না। বলছেন মেয়েদের।

—ও ছলে ঝুনু-রুনু তোমরাই গল্প কর মিষ্টার মজুমদারের সঙ্গে। আমার পার্কসার্কাসের সেই আপো ট্যাক্সিটার কথা মনে পড়ছে—এখুনি ফোন আসছে। মিষ্টার মজুমদার নটার আগে ডিনার খাওনা—তার সঙ্গেই আমি ঘুরে আসব। বলেই আর দাঁড়ালেন না। ভারী ভারী পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

কী ভেবে কুলচাঁদ আবার ড্রইং রুমের দিকে দু' পা এগোয় গেল। সিল্কের মজুমদারের দু' পাশে দুই দিদিমণি বসেছে—আবছা ভাবেও দেখা গেল এখান থেকে। কানে এল হাসির শব্দ।

তখন কুলচাঁদের একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। মনে হল, শাদা নয়, কোট প্যাণ্ট নয়—চকচকে ঝকঝকে মার্ডার্ক। তার ভেতরে কে যেন পরিপাটি করে একরাশ ভেড়ার মাংস সাজিয়ে দিয়েছে।

আর তখনি, কী কাণ্ড, কোত্থেকে দমকা হাওয়ার ঝলক এল একটা। সেই হাওয়ায় রান্না ঘরের দিক থেকে উড়ে এল সেই মোড়াটা, যেটায় করে সকাল বেলা মার্কেট থেকে মাংস আনা হয়েছিল।

তারপর কুলচাঁদকে ঘিরে ঘিরে সেই গন্ধটা উঠল। অবিশ্বাস্য, কুৎসিত আঁশটে গন্ধ—অনেক মাংস, অনেক চর্বি, অনেক রক্ত, অনেক মাংসের গন্ধ। যে গন্ধে মাথা ঘুরে ওঠে—দম আটকে যেতে চায়। যে মৃত্যুর গন্ধে আতঙ্কে সারা গা দিয়ে কাল ঘাম ছুটতে চায়, এই কলকাতা শহরটা তখন—

আর দাঁড়াতে পারে কুলচাঁদ—পুনর্ভবা নদীর ধারে, ভাঁটফুলের গন্ধে ভরা বাতাসে, অন্ন পাড়া গাঁয়ে যার দিন কাটে? খিদে পেলে যে পেড়ে খায় পাকা নোনা, বৈঁচি আর পানিয়াল?

কুলচাঁদ বর্মণ পালালো। তৎক্ষণাৎ। সেই মুহূর্তেই।

কুকুরের তাড়া খেয়ে যেমন করে খরগোস ছুটে পালায়।

ঐতিহাসিক

মনীশ ঘটক

রুদ্ধদ্বারে কে তুমি সন্ধানী
আনিলে নিখিল পরিচয়ের বাণী খানি?
জানিলাম,
মমতাজের অন্তরের আর্ত্তি মানিলাম।
জাঁহাপনা দুর্জ্জয় সম্রাট
ততোধিক আরো যে বিরাট
তব পুত্র আলমগীর,
ধার্ম্মিক, স্বরাট।
পিতৃ হত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, বাহিয়া সোপান
মহিমার অন্বেষণে হয় ধাবমান।
সে কেন নিশ্চিহ্ন তোলো
কহো, কহো, কথা?
বুঝেছি জানাবে তুমি
চরম চৈনিক ইতরতা,
আজিকে কন্যরলালে যে করিতে
চাহে হতমান
তাহারা দেশের শত্রু
চিতাভস্মে তাদের বিরাম॥

একটি প্রতিশ্রুতি

'আজকে হোল না; পাইনি। কাল আসবি, ঠিক টাকা যোগাড় করে রাখব,' মাকে বলিস। কাল সকালে এসে নিয়ে যাবি।'

একটা চোদ্দ বছরের ছেলে শুকনো মুখে দাদার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে গেল, কাঁচড়াপাড়ার গয়েসপুর কলোনীতে। ওর মাকে জানাল দাদার প্রতিশ্রুতি। একটা দিন কোন রকমে চালিয়ে নাও।' কাল দাদা টাকা দেবে। চোদ্দ বছরের ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে অন্ধভুক্ত থেকে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মার চোখে ঘুম নেই। কখন সকাল হবে। কখন, কখন---

সেই সকাল হোল। আবার সেই চোদ্দ বছরের ছেলেটা ওঠনা হল। ঠিকানা ওর মুখস্ত। বহুবাজার, হুজুরীমল লেনের তিন নম্বর বাড়ী। ওর সাথী পথে একটিমাত্র ঘর, একটি মাত্র মানুষ, একটি প্রতিশ্রুতি মনে পড়ছে শুধু। তার চেয়েও বেশী করে মনে পড়ছে একটি প্রতিশ্রুতি। দাদা টাকা দেবে, দাদা শ্রীসুনীলকুমার কর্মকার।

কিন্তু ছেলেটি অবাক হোল, সে ঘরে দাদা নেই। কান্না পেল ওর, আজ টাকা না পেলে বাঁচবে না ও। ক'দিন ভালভাবে পেটে ভাত নেই। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নীলমতন গয়কার হাসপাতালে গিয়ে আছড়ে পড়ল। কাল দাদা ওকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুনীল কর্মকার, ওর দাদা পেট পরে এ্যাসিড খেয়েছে ওর দাদা পশ্চিমবাংলার স্বর্ণশিল্পী, ওর দাদা একটি উদ্বাস্তু পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল, ওর দাদা---আজ গর আত্মা জুড়িয়েছে।

গত রবিবার সকালে সেই কাঁচড়াপাড়ার গয়েসপুর কলোনীর একটি দরিদ্রের কুটিরে এক বৃদ্ধা মা'র বুক ফাটা কান্না আর ছোট সেই চোদ্দ বছরের ভাইটার পাগলের মত আছড়ে পড়া।

স্বর্ণশিল্পীরা মোরারজীর উদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়ে মরেছে। হয় না, ১৪ ক্যারেটে গহনা হয় না। বিপক্ষ ভাবল এ এক ছল ওদের। বার বার পশ্চিমবাংলার কারিগররা বোঝাতে চেষ্টা করেছে বাংলার ঐতিহ্য সন্ধ্যা কারিগরী কাজ অচল হয়ে পড়বে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার সম্ভাবনা আমাদের নেই।

মোরারজীর ইকনমিক্স যার জিয়োগ্রাফী ওরা বোঝে না; তাই হয়ত মোরারজীর দেশপ্রেমও বরদাস্ত করল না। সিকা হাঁর একমাত্র সম্বল এক ছটা দেড় ভরি সোনার গয়না হার, বিপদে আপদে ভরসা বেচবার। কিন্তু সেখানে তালা ঝুলছে আর সে তো খাঁটি সোনা, দেশের শত্রু।

সুতরাং আজ এদের পথ কোথায়? গালে হাত দিয়ে ভাবছে পশ্চিমবাংলার প্রায় লক্ষাধিক সুনীল কর্মকারের পরিবার মানুষ। 'সাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা' প্রবাদ কথা। এবার এক ঘা দিয়েই মোরারজী প্রমাণ করেদিলেন, ভাবক বসে বসে। কামার হাতুড়ি সে পথও নিয়েছিল। কিন্তু সেও ভাবনার বাইরে।

কিন্তু না ভেবেও তো স্বর্ণশিল্পীরা পারবে না। ভাবতে হবে। কি করে সংসার চালাবে। আর তো কাজ জানে না। লোকের কাছে হাত পাতাতেও ওদের বাধে। ওইটুকুই ওদের আভিজাত্য। বরাবর ওরা গরীবের সংসারে ঋণ জুগিয়েছে। যদি কিছু কাজ জানতো ওরা। এ পেশা যে ওদের বংশ পরম্পরায়, ঠাকুর্দা ঠুকঠুক করেছে, বাপ পুঁজি করেছিল মাকড়ির অর্ডার ধরবার মত ছেলে, ছেলেও---।

সুনীল কর্মকারও অনেক আশা নিয়ে বুক বেঁধেছিল। অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে ওদের জীবনে। এক দেশ বিভাগই ছন্নছাড়া করেছে একদিন। তবু ভরসা বাপ ছিল মাথার ওপর। বাবা শ্রীরসিকচন্দ্র কর্মকার তাঁর দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দিলেন পশ্চিমবাংলার দিকে। সাত পুরুষের মাটি বরিশাল পেছনে পড়ে রইল। তারপর আটটা বছর যেতে না যেতেই মাথার ওপর থেকে বাবাও চলে গেলেন। বিধবা মা যেন জলে পড়লেন। কিন্তু না, সুনীল কী দুর্বল; অক্ষম পুরুষ? কিছুতেই না, সমস্ত বাধা ঠেলে মাথা তুলেদাঁড়াল সুনীল। কাজ করত বোরাজারের একটি জুয়েলারীর দোকানে। মাইনে সামান্য কিন্তু একশো। বোরাজার তখন সারি সারি জুয়েলারী দোকানের আলোয় ঝলমল করত। গরীবের সংসারে একশো টাকাই দেব

আজ সেই ধরের দু'টি মানুষ গুমরে গুমরে কাঁদছে। কার অভিশাপে ওদের সুখের সংসার আজ---থাক নীরব কান্না ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে, প্রতিটি স্বর্ণশিল্পী পরিবারে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তাদের কান্না কি মোরারজীর কানে পৌঁছয়? তবু এ কান্না জীবন যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে।

কয়েক শ' বছর আগে ঘরের মায়া কাটিয়ে বঙ্গীয় কবি একদা ভাগ্যচক্রে উপস্থিত হয়েছিলেন কন্যাকুমারিকার উপকূলে। সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার বর্ণনা করতে গিয়ে মুগ্ধ কবি বলেছিলেন, 'দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।' এ হ'ল প্রাণের ভাষা, যুক্তির ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। আমার বিশ্বাস খাঁটি কলকাতাবাসীকে যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন শহর কলকাতা—তাহলে এই ভাষাতেই উত্তর পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডের কবি লণ্ডন শহরকে বলেছেন নরকের সমতুল্য। কিন্তু বঙ্গীয় কবিকুল আজও

দিশারী

প্রাণের ভাষাতেই কথা বলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন এমন কুৎসা রটনা করতে কলকাতা সম্বন্ধে।

বিদেশাগত অতিথি, আগন্তুক পর্যটকেরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা আজকাল কলকাতা দর্শনে খুসি হতে পারেন না। এ মহানগরীতে প্রথম পদক্ষেপেই বলে ওঠেন—ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল! বিরক্ত হয়ে আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে তাঁরা ত্রস্তপদে ফিরে যান। তারা দেখে যান ও বিশ্বাস করে যান কলকাতার আকাশ ছেয়ে আছে দূষিত হাওয়া, কলের জলে রোগের সংক্রমণ, পথে পথে আবর্জনার স্তূপ, মোড়ে মোড়ে বিশৃঙ্খল জনতার ভীড়, অধিবাসীদের মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, জীবনযাত্রায় সর্বব্যাপী রিক্ততা। এক তিক্ত আস্বাদ মুখে নিয়ে তাঁদের ফিরতে হয় কলকাতা থেকে। ফিরে গিয়ে স্বভাবতঃই তারা সার্টিফিকেট দাখিল করেন না কলকাতাবাসীর মন জুগিয়ে। তারা এমন ছবি আঁকেন, এমন প্রবন্ধ লেখেন যা' কলকাতাবাসীর মতে চরম হৃদয়হীনতা, অকৃতজ্ঞের অপলাপ।

এ মতের অংশীদার আমি নই। অপ্রিয়-ভাষীকে অসত্যভাষী বলতে আমি নারাজ, সেটা সদাচরণের বিধিবহির্ভূত। এই সব বিদেশী পর্যটক কলকাতাকে ওপর ওপর যেটুকু দেখেন, যেটুকু বোঝেন সেটুকুই বলেন। আমাদের তাতে ক্ষতি নেই। সত্যিই কি আগন্তুকের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে এ শহরের সহস্র ত্রুটি নেই? সত্যিই কি জনসংখ্যার চাপ এখানে শেষ সীমানা অতিক্রম করে যায়নি। এমন অস্বাস্থ্য, এমন দারিদ্র্য, এমন বিশৃঙ্খলা, এমন অবক্ষয় পৃথিবীর আর কোন্ মহানগরীর অঙ্গের ভূষণ? এ সব নিন্দার কথা মেনে নিলে আমাদের লজ্জা হতে পারে কিন্তু লোকসান নেই। বরং কিছু লাভ হতে পারে সংশোধনের দিক দিয়ে, সমাধানের অনুকূলে।

আসল কথা বিদেশীদের দেখাটা অনেক সময়েই পূর্ণদৃষ্টির দেখা নয়। তাঁদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে না কলকাতার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য —'লোক্যাল কালার'। কান পেতে তাঁরা শুনতে পান না এ শহরের প্রাণের ভাষা।

কলকাতা এসে প্রায়ই তারা উৎসুক নয়নে যাকে খোঁজেন, সে তাদের নিকট আত্মীয়ের মত—ইংরেজের পত্তন করা পাশ্চাত্যের সাধের ক্যালকাটা। সেই ক্যালকাটার ভাগ্যসূর্য আজ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। স্বাধীন খণ্ডিত ভারতবর্ষে তার চেহারা হয়েছে মলিন হতশ্রী। চার্ণকের মানসকন্যার মান বাঁচাতে 'ব্রাউন' সাহেবেরা সমর্থ হন নি। পারেননি তাঁরা ক্যালকাটাকে ঠিক গুছিয়ে রাখতে। তাঁদের দোষ নিশ্চিন্ন কারণ আসল আর নকল একরকম হতে পারে না। অনুকরণের নিপুণতা থাকলেই গ্রহণের যোগ্যতা আসে না। মনে হয় বিদেশী পথিক সবচেয়ে বেশী নিরাশ হন বিবহিনীর এমন মলিন চেহারা দেখে। তার কল্পনায় যা অপ্রত্যাশিত, রূঢ় বাস্তব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাই সত্য।

কিন্তু কলকাতা ত শুধু ক্যালকাটা, নয় গোবিন্দপুর, সুতানুটী, কালীঘাটও নয়। ইতিহাসের পাতায় তারা সবে গিয়েও নিশ্চিহ্ন হয়নি। মরে গিয়েও আজও বেঁচে আছে কলকাতার জীবনযাত্রায়, ধূলিধূসরিত নাগরিক জীবনে। একটু নজর করলেই দেখা যাবে এ মহানগরীতে পায়ে পায়ে, পাশাপাশি চলেছে দু'টি ধারা—এক ক্যালকাটা, আরেক কালিকাক্ষেত্র কলিকাতা। দুটি ধারাই চলমান সমান বেগে, বিপরীতমুখী সন্নিধানে।

একপাশে রয়েছে ধাপের বস্তি ঝাঁঝালো গন্ধ তীব্র স্বাদ, পারেক পাশে আছে আঙুরের রসের রঙীন আকর্ষণ, পারিস্রুত রিক্ততা। একপ্রান্তে যদি থাকে আধুনিকের সফেন গতি আরেক প্রান্তে অনিবার্য ভাবেই রয়েছে প্রাচীনের অলস মন্থরতা। প্রতিভার মনীষার বিত্তের সম্পদের সমাবেশ আছে আর রিক্তের নিঃস্বের ভ্রষ্টের হতাশাও আছে। একই রাস্তায় চলছে সর্বাধুনিক মডেল মার্সিডিজের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রায় উন্নাসিকের মত প্রাগৈতিহাসিক গরুর গাড়ী পথের এধারে অভিজাত্যের বড়মহল ওধারে জীর্ণ দেবালয়। একই শহরে একাসনে বসে রয়েছে পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা নিয়ে পৃথক দুটি জনসমষ্টি। বসে আছে শুধু রাস্তার এপার ওপার নয়, শতাব্দীর এ পার ওপার। এ মহানগরীতে পাশাপাশি চলেছে বিসমের, বিসদৃশের, বিপরীতের ধারা মিশে না গিয়ে পরস্পরকে জায়গা না ছেড়ে দিয়ে। কলকাতা জীবনের ব্যাসরুট এখানে। এখানেই রহস্য বা প্রহেলিকা, এখানেই সমস্যার সূত্র সমাধানের নির্দেশ। এখানেই কলকাতাওয়ালীর ভেলকি, যে ভেলকি দেখে বিদেশী পর্যটকের গা ছম্ ছম্ করে ওঠে, হিসেবে হয় গণ্ডগোল। কে বলতে পারে ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনের জন্য সেই কুহকিনী দুহাতে ধরে রেখেছেন দুটি বিপরীত

জ্ঞানের অলকনন্দা ও ভক্তিমন্দাকিনীর সম্মেলন

সর্ব্বশাস্ত্রের সার সঙ্কলন

গীতা-গ্রন্থাবলী

(পঞ্চবিংশতি গীতা-সমন্বয়)

মূল ও সরল বিস্তারিত বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার—এই গীতাগুলি তেমনি সর্ব্বশাস্ত্রের সারাৎসার। পঞ্চবিংশতি গীতায় এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ। ইহা ত্যাগীর মুক্তি, জ্ঞানীর সম্বল, যোগীর সিদ্ধি, ভক্তের জপমালা, সংসারীর পাথেয়।

হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, বড়ন্ত হংস, মন্ত্রি, গীতাসার, পিঙ্গ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকা, রাম, পরাশর, গীতাসার, শান্তি, শিব, ভগবতী, যোগ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর ও রাস।

মূল্য ৩৲ টাকা

স্বরাজ—স্বাধীনতার দীপ্ত বিষাণ—বাংলার জাতীয়-জীবন সংগঠনে নিবেদিত স্বদেশ-প্রেমিক মনীষী—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, বীরাঙ্গনা অ্যানিটা।

যে মহাপুরুষদ্বয়ের স্বলন্ত উদ্দীপনা, প্রাণপণ প্রয়াস—আত্মসুখ, ঐশ্বর্য্য-বিলাস উপেক্ষা—ত্যাগের সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে পদদলিত নিষ্পিষ্ট ইটালী রণোন্মাদনায় অধীর চঞ্চল স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিল—সেই স্বাধীনতার সূর্য্য—রাজনীতিক চিরজাগ্রত দেবতা—ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ—রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গময় তেজোদীপ্ত মহাজীবনী এই মহাগ্রন্থত্রয় মাত্র ১৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কীর্ত্তিমন্দির, হৃদয়োচ্ছ্বাস, বীরপূজা, প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, চিন্তাতরঙ্গিনী, জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

শক্তিমন্ত্র সমাহিত গ্রন্থরাজি ১৲ টাকা।

পুরাতনে চিরনূতন মণিমঞ্জুষা

সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত হুতোম প্যাঁচার নক্সা ; বাঙ্গালা উপন্যাসের প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—'ভ্রান্তিবিলাস।' একত্রে ২৲ টাকা মাত্র।

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্ত্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ী ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনীর সঞ্চয়ন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সাবধি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা চচি সয়তান, ভেলকির ভূমকী, ভূতের রাজা সয়তানী জায়া ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। চলিউডের টাকার পাতাড

মূল্য তিন টাকা।

—শিশু ও কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থ—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রণীত

অ-আ-ক-খ

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও যুক্তাক্ষরগুলি বানান শিক্ষা যেরূপ অতুলনীয় ছন্দের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারম্ভ সহজ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুঁথিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। চিত্রে চিত্রময়—রঙীন আর্ট পেপারে বড় হরফে ছাপা। মূল্য বার আনা।

৺সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

ছত্রপতি শিবাজী

যে বীরবর হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত প্রদান করিয়া জননী জন্মভূমির পূজা করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণবরেণ্য, অনুদিন স্মরণীয় ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উদার-চরিত্র জন্মভূমিভক্ত ও ভারতীয় বীর চরিত্র পাঠে অনুরক্ত মহাত্মাদিগের করকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করেন অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে বিপ্লবী সত্যচরণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

যারা কোনটিকেই করছেন না অর্জন, বা উপেক্ষা ?

অর্বাচীন কলকাতা

পৃথিবীর মহানগরগুলির তালিকায় বয়সের হিসেবে কলকাতা প্রায় অর্বাচীন। তথাপি এ শহরের প্রায় ষাটলক্ষ অধিবাসীর জীবনযাত্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে একটা উগ্র অশোভন প্রাচীন গ্রাম্যতা। কলকাতাবাসীর চরণে মার্জনা ভিক্ষা করে আমি বলতে চাই এ নগর হয়ে উঠতে পারেনি ঠিক শহুরে-আর্য্যান্। ধণিক বণিক শিল্পপতি অবশ্যিকের কুল কলকাতাকে দিয়েছেন অনেক কিছুই। কিন্তু দিতে পারেননি জীবন-যাপনে একটা মার্জিত রুচি সামগ্রিক শালীনতাবোধ নাগরিকতার যা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পটভূমি স্মরণে রেখেই আমরা বিচার করতে পারি কলকাতার নাগরিকদের আচরণ। এখানেই কারণ যার জন্য আমার প্রতিবেশী আমার বাড়ীর দরজায় আবর্জনা নিক্ষেপ করেন নিয়মিত অথচ অসঙ্কোচ কুশলবার্তার বিনিময় করেন প্রত্যহ। এ বাড়ীর বেডিওর উচ্চঘোষ ওবাড়ীর ছেলেটির বিদ্যাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটালে নাগরিকেরা মনে করেন না সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের তাতে কোন ক্ষতি আছে। দশজনের বহুল অসুবিধার কথা এ শহরে বিবেচ্য নয়, একজনের সামান্য সুবিধাটুকুই সর্বাগ্রগণ্য। প্রাইভেসির প্রাচীর ডিঙিয়ে চুরি করে আনা অপরের ব্যক্তি জীবনের খবর নিয়ে এখানে প্রকাশ্যে চাট জমে, প্রতিবাদের কণ্ঠ সেখানে অবশ্যই নীরব

কলহপ্রিয় কলকাতাবাসী

কলকাতাবাসী কলরবপ্রিয়, কলহপ্রিয়ও বটে। মত জানাতে গিয়ে কোলাহল না করা তাদের অসাধ্য। এখানে রসবোধের প্রাচুর্য রুচিবোধের ঘাটতি, সম্মানবোধ শাণিত সৌজন্যবোধ স্তিমিত। এ সব লক্ষণ কি নাগরিক, আর্য্যান ? নাকি এ মনস্তত্ত্ব প্রসারিত অতীতের প্রেতলোকে—সেই সুতানটী গোবিন্দপুর কালীঘাটের অধ্যায়ে ?

এসব হ'ল কলকাতার বাহিরের রূপ তার সার্বজনীন জীবন যাত্রার পরিচয়। কিন্তু তার অন্দরমহলের কোন ভিন্ন খবর আছে কি ? আছে, আছে একটা আকুল আগ্রহ, সমস্ত মালিন্য ক্লেদ আর কলুষকে অতিক্রম করে সেখানে জেগে আছে একটা আদর্শকে খুঁজে পাবার ঐকান্তিক অভীপ্সা। বৈপরীত্যের বিরোধিতার একান্নবর্তী সংসার এটা, আদর্শ এখানে অবসরের বিলাসের সামগ্রী নয়, জীবন মরণের প্রশ্ন। গ্রাম্যতার আর নাগরিকতার প্রাচ্যের আর প্রতীচ্যের প্রাচীনত্বের আর আধুনিকতার অসঙ্গতির টানাপড়েনে ক্লান্ত এই নগরী বেঁচে থাকার তাগিদেই খুঁজছে একটা সমন্বয়তা নয় সম্মিলন, আপোষ নয় সংহতি—যে সম্মিলন সংহতি আসতে পারে শুধুমাত্র একটা আদর্শের ভিতর দিয়ে।

একটা আদর্শের মহত্ত্বের প্রয়োজন অন্য কোন শহরের এত বেশী নেই কলকাতার যা আছে। তার চাই এমন একটা আদর্শ যার প্লাবনে ভেসে যাবে সমস্ত বিরোধ। জন্মসূত্রে কলকাতার ভাগ্যে জোটেনি যে কৌলীন্যের গৌরব তাকে সে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে ভিন্ন দিকে, একটা মহৎপ্রাপ্তির সিন্ধির ভিতরে। অতীতে কয়েকবার সে ইঙ্গিতের দর্শন পেয়েছিল। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার তার শ্রুতগত মানবিকতার আদর্শকে। কিন্তু মহাকালের স্রোতে ক্ষণিকার ছলনার মত সে সব হয়েছে হস্তচ্যুত। আর আজ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে খণ্ডিত বাংলাদেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে কোন যোগ্য আদর্শ উপস্থিত নেই বলেই বর্তমানের কলকাতা এত ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত দিশেহারা ম্রিয়মাণ।

দুই ধারা

ট্রিনিদাদের ভারতীয় ইংরেজী লেখক শ্রীভি. এস নাইপল তাঁর কলকাতা ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়েছেন বিলেতের নিউ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এক সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধে। সাধারণ বিদেশী পর্যটকদের থেকে শ্রীনাইপল একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সহানুভূতির চোখ দিয়ে একটু গভীরভাবেই তিনি দেখবার চেষ্টা করেছেন কলকাতাকে। তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে কলকাতা আসলে দুই নগরী, দুই ধারা। অবশ্য তিনি দেখেছেন একটা সামঞ্জস্য, তাঁর নিজের ভাষায় একটা 'একস্‌প্লাসিড মিকসচার।' কিন্তু মনে হয় শেষ পর্যন্ত শ্রীনাইপলও কল পাননি, তাঁরও গা ছম্ ছম্ করে উঠেছে। সেই খেদই মেটাইবার চেষ্টা করেছেন কলকাতার 'ব্রাউন' সাহেবদের সুখসন্ধানে।

অবশ্য আমরা শ্রীনাইপলকে বলব কলকাতার সেরা সম্পদ—যদি কিছু থাকে তা' অপেক্ষা করে আছে ভবিষ্যতের অনাগতের কোলে। 'ব্রাউন' সাহেবরা কলকাতার সেরা সম্পদ নয়। হয়তঁ কলকাতা দূর ভবিষ্যতে তার প্রয়োজনীয় আদর্শকে খুঁজে পাবে। যতদিন না পাবে ততদিন ব্রাউন সাহেবরা বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন বলে ভরসা হয় না। পাশ্চাত্যের, আধুনিকতার প্রভাব তাদের মানসিকতায় ততটা নেই যতটা রয়েছে চলনে বলনে। যদি থাকত তাহলে সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করতেন তাঁরা এই মহানগরীকে আর একটু সুন্দর আর একটু নমনীয় করে তুলতে।

আফশোসের কথা শ্রীনাইপলদের সুযোগ ঘটে না খাঁটি কলকাতাবাসীদের সাথে পরিচয়ের। তাদের সত্যিই এখনো আছে দিল্ আর দেমাক। বেপরোয়া ভালবাসায় তাঁরা কালপুরুষের তর্জনী সংকেত উপেক্ষা করছেন, প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। দুর্জয় দুঃসাহসে এই ধ্বংসোন্মুখ নগরীর সীমানাকে তাঁরাই টেনে নিয়ে চলেছেন যাদবপুরে গড়িয়ায় বরিশায় পুঁটিয়ারিতে। তাঁদের প্রত্যেকের প্রাণের কথা এ শহর ছেড়ে পালমকং ন গচ্ছামি। ডুবতে ডুবতে মরতে মরতেও গাঢ় গভীর অনুরাগে কলকাতাকে জড়িয়ে ধরে বলছেন 'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।

যাঁদের প্রাণে এই বিশালতা তাঁদেরই আচরণে আবার গ্রাম্যতার সংকোচ। তাঁদের সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা, আত্মশাসনে অনাগ্রহ কি সেই গ্রাম্যতাদোষেই দুষ্ট নয় ?

ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৬৩।

নতুন বই

রুশ গল্প সঞ্চয়ন

শ্রেষ্ঠ রুশ সাহিত্যিকদের সুনির্বাচিত ছোট গল্পের সংকলন।

এই সংকলনে আছে—পুশকিন, নিকোলাই গোগল, লেরমন্তভ, তুর্গেনিভ, দস্তয়ভস্কি, শেডিন, নিকোলাই লেসকভ, নিকোলাই উসপেনস্কি, সিবিরিয়াক, মিখাইল আর্টজিবাশেভ, ইগনাতি পোতাপেভ্‌কো, ফিয়েদর সোলোগুব আলেক্সি রেমিসভ চেখভ, ম্যাকসিম গর্কী, লিও তলস্তয়ের গল্প।

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দাম ৬.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট কলি-১২
১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীতে বসন্ত পঞ্চমীতে বসন্ত আসে না। সেখানে বসন্ত আসে রক্তবর্ণ আবীর নিয়ে হোলি উৎসব সমাগমে। ফাগুয়া নিয়ে ফাল্গুন এসে হোলি খেলে গেল। রাজধানীতে এখনও বসন্তের ছোঁয়া লাগেনি 'যাব', 'যাচ্ছি' করেও শীত যেন দিল্লী ছেড়ে যেতে চাইছে না।

রাজপথের দু'ধারে সারি নিমগাছের নবীন সবুজ পাতায়, রক্তরাঙা পলাশের নৃত্যে, নবযৌবনা মাধবী লতার মৃদু-মন্দ দোলায়, সমঞ্জরী আম্রকুঞ্জের বউলে বউলে ভ্রমরের মধুগুঞ্জনে, বেগন-বেলিয়া ক্যানার দল নিয়ে প্রকৃতি নবরূপে শীতাক্রান্ত দিল্লীর সঙ্গে হোলি খেলতে এসেছে। পাঁচশটি বছর ধরে বসন্তের আগমনে বৃক্ষচূড়ায় নব বসন্তের ছোঁয়ায় দিল্লীকে যেমনটি দেখে এসেছি, সবই যেন ঠিক তেমনটি চলেছে। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেন্স্, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুষ্পবাটিকার রঙ্-বেরঙের ফুলের মেলায় প্রতিটি বছর যে ফুলের দল দিল্লীর বসন্তকে অভ্যর্থনা জানায়, তারা সবাই এসে হাজির হয়েছে। বসন্ত আজও দিল্লীর দ্বারে জাগ্রত হয়নি!

আকাশে, বাতাসে মন মাতানো নব বসন্তের মধুগন্ধ উঁকিঝুঁকি মারছে। প্রকৃতির প্রতিদিনের এই লুকোচুরি খেলায় দস্যু আক্রান্ত মহান দেশের মহানগরী রাজধানী দিল্লী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বসন্তকে পূর্ণ অভ্যর্থনা জানাতে তৈরী হচ্ছে।

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে সতেরোই জানুয়ারী যে মহামানবের জন্ম-শতবার্ষিকীর উদ্বোধন হয়েছে, ত্যাগ প্রেম মহাবীর্য্যের প্রতীক সেই সন্ন্যাসীর উদ্দেশে আজও দিল্লীর প্রান্তে প্রান্তে সভা-সমিতি আয়োজিত হচ্ছে।

শত কাজের মাঝেও সময় করে প্রধান মন্ত্রী সেই চিরসন্ন্যাসী, অভয়মন্ত্রের সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতে ভোলেননি। রামলীলা ময়দানে, স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যে প্রধান দুটি সভার আয়োজন হয়, সে দুটিতে তিনি যোগদান করেছেন। জাতীয় সঙ্কটকালীন অবস্থায় বিবেকানন্দের অভয় বাণী ও আত্মোৎসর্গের মহান্ আদর্শ স্মরণ করিয়ে তিনি প্রতিটি

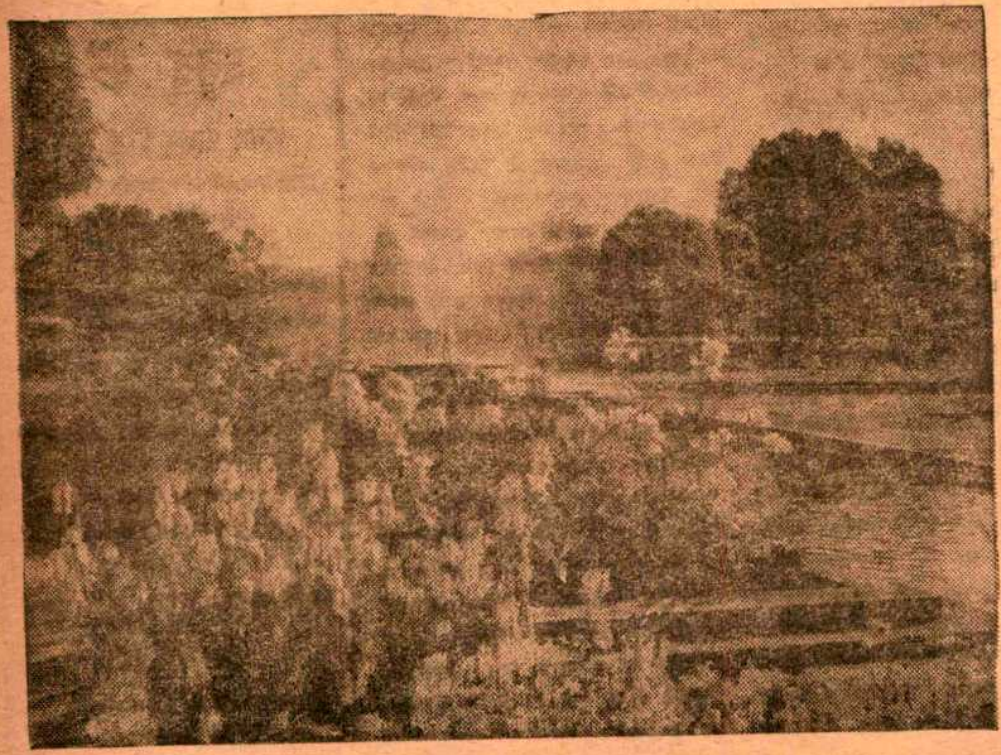

বসন্ত অবতরিত
—দিল্লী—

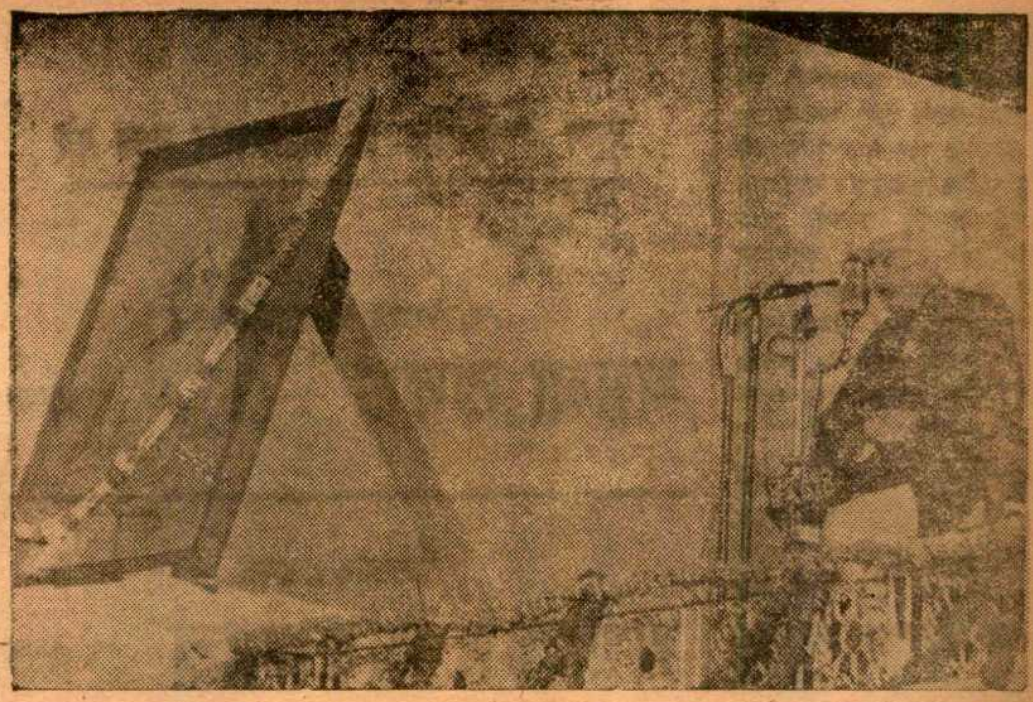

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীতে দিল্লীর অনুষ্ঠানে নেহরুজী

ভারতবাসীকে স্বামীজীর লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়বার অনুরোধ জানান।

এই সত্যদ্রষ্টা মহান্ ঋষি দস্যুর ভারত আক্রমণের পঁয়ষট্টি বছর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের চীন দ্বারা আক্রান্ত [illegible] ভয় আছে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন না তুলে, অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে আজ একটা অভিযোগ না করে পারলাম না। দিল্লীতে বহু জায়গায় স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। রামলীলা ময়দানে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি জোরবাগের এ্যালায়ান্স ফ্রাঁসেইর তরফ থেকে জন্ম জয়ন্তী সভার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যের কথা, কোনো বাঙালী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছুই আয়োজিত হয়নি। শুধু তাই নয়। তাঁরা তো সভা ডাকেনইনি, অন্যদের আহূত সভায়ও বঙ্গ-সন্তানদের উপস্থিতি নামমাত্রও হয়নি। তাঁরা কি রাতারাতি তথাকথিত 'মডার্ণ' হয়ে গেলেন? তাও নয় বোধ হয়, কেন না বিবেকানন্দর চেয়ে বেশী আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক বর্ত্তমান ভারতে কে হতে পারেন?

• • •

দিল্লীতে এখন মহাকবি আমীর খুসরোর উরস্ পালিত হচ্ছে স্থানীয় কবিদের কাওয়ালী ও নাজ্‌ম্-এর মৈফিলের মাধ্যমে উর মানে মৃত্যুদিন। এটা হল ৬৫৭তম মৃত্যু দিবস।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রধান শিষ্য মহাকবি আমীর খসরু গুরুর কবরের পাশেই শায়িত খসরু শুধু দার্শনিকই ছিলেন না। তিনি বর্ত্তমান হিন্দী সাহিত্যের জনক, উর্দু সাহিত্যের প্রবর্ত্তক, বীণা বাদ্যের স্রষ্টা ও হিন্দু-মুসলিম একতা বন্ধনের শ্রেষ্ঠ পূজারী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী আমীর খসরু উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি। তিনি হিন্দী সাহিত্যেরও আদি কবি। পার্সিয়ান ও আরাবিকেই তখন সকলে কবিতা লিখতেন। খসরু কবিতাকে আনলেন সাধারণ মানুষের দরবারে। রাজদরবারে এই সকল কবিতা পরিবেশিত হ[illegible] সহজ উর্দু ভাষায় লেখা বলে খস[illegible] কবিতা সাধারণ মানুষের বোধগ[illegible] হত

খসরু শৈশবে পিতৃহার[illegible] মৌলানা সাদুদ্দীন খসরুর প্রথম গু[illegible] দ্বিতীয় গুরু কিতলু খাঁ।

খসরু বহুদিন বাংলা দেশে [illegible] করেছেন

চিরবিদ্রোহী বাংলাকে শা[illegible] করতে দাস মোগল, পাঠান সব যু[illegible] সম্রাটই আপন আপন পুত্রদের বাং[illegible] রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতেন গি[illegible] সুদ্দিন বলবন আপন পুত্র বুগরা খাঁ[illegible] পাঠালেন বাংলা দেশে জাহাঙ্গী[illegible] বর্ণনার বহু পূর্ব্বে বুগরা [illegible] বাংলার নদী, জলভরা ম[illegible] শ্যামল দূর্ব্বাদল দেখে আনন্দে আ[illegible] হারা হয়ে বন্ধু আমীর খসরু[illegible] সেখানে এসে কবিতা রচনার আম[illegible] জানান। তিনি লিখলেন, 'কবি[illegible] লিখতে চাও তো এসো বাংলা দে[illegible] গাছপালা আকাশ-বাতাসের স[illegible] পাখীর গান নদীর নৃত্য যেখা[illegible] ত্রিযামাযামিনী কবিতা গাইছে।'

বিখ্যাত কবিদের দিল্লীর দরবারে এই বুগরা খাঁ একদিন আমীর খসরুকে একখানা মোহর দিয়েছিলেন। সে মোহর স্পর্শ করায় গুরু কিতলু খাঁ অপমানিত বোধ করে সভা পরিত্যাগ করেন। বহুদিন কিতলু খাঁ আমীরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ রাখেন। বুগরা খাঁ আমীরকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। তাই বাংলা দেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমীর খসরুকে সেখানে নিমন্ত্রণ জানান। খসরু বহুদিন বাংলা দেশে ছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি বাংলাদেশে আসেন তাঁর মাতৃবিয়োগের পর। তিনি বাংলা দেশে বসে কবিতা লিখতে লিখতেই একদিন তাঁর প্রিয় গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মৃত্যু-সংবাদ শুনলেন।

মৃত্যুর সময় তিনি আমীরকে স্মরণ করেছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, খোদা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, 'হাঁরে আউলিয়া, আমার জন্যে কি এনেছিস?' হজরৎ নিজামুদ্দিন বললেন, জানিস সবাই, আমি তখন হুজুরকে কি বলব? বলব তাঁকে, "তোমার জন্য নিয়ে এসেছি দুনিয়ার সেরা কবি, যার মনটা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। নাম তার আমীর খসরু"

নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাহেবের দেহাবসানের ঠিক ছ' মাসের ভিতর শুধুমাত্র গুরু-বিয়োগের শোকে এই মহান কবি দেহত্যাগ করেন।

দুটো শরীর পবিত্র মাটির কোলে এক হয়ে গেছে।

মায়ামঞ্চ

যাদুবিদ্যার সচিত্র মাসিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা ৩৫ + বার্ষিক ৪·০০
সম্পাদিকা—গীতা মুখোপাধ্যায়

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারের মূল্যবান প্রবন্ধ ও বহু ম্যাজিকের ছবি নিয়ে মার্চ-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

২১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কল-২৫
ফোন: ৪৭-৩১৭০

মুকুন্দ পাবলিশার্সের কয়েকখানি নতুন বই

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
ময়না তদন্ত ৩·০০

চিরঞ্জীব সেনের
রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের
দেওয়ালের দাগ ৭·০০

প্রফুল্ল রায় চোধুরীর
প্রাণতরঙ্গ ৬·৫০

গোলাম কুদ্দসের
সুরের আগুন ৪·৭৫

মুকুন্দ পাবলিসার্স
৮৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

আমাদের প্রতিবেশী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন পামথিঙ্। আদি মানবের নাম তি-গুং-থিক। তিনি ওঁর স্ত্রী নি-গুও ওাল সহ বাস করতেন "কিঙ ৎসুম-সং-বুঁ-ন ওপারে মায়াল-লিয়াঙ নামক স্থানে। সেখানে তখন না ছিল আধি-ব্যাধি, না ছিল দুঃখ দুর্গতি মৃত্যু শোক। এখন সকল মানুষই মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন করে সেই সুখ ও শান্তির নিকেতনে।

পুরাকালে সশরীরেই পৌঁছনো যেত সে দেশে। একবার মায়ালে এসে হাজির হল এক শিকারী। নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে সে একটা সুবিধামত জায়গার খোঁজ করতে লাগল। অকস্মাৎ অনতিদূরে আলোকমালা আকর্ষণ করল তার দৃষ্টিকে। ঐ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল শিকারী এবং ওখানকার লোকেদের কাছে রাত্রির মত আশ্রয় প্রার্থনা করল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে,—"এখানে রেম-দিয়ঙ এ (পূর্বপুরুষদের বাসস্থান) কি কর তুমি।" সে জবাব দিলে,—"পশু শিকার করি আমি এবং তাতেই জোটে আমার খাবার।" "তা হলে আর কিছু কি খেতে পাও না তুমি।"

"না, আর কিছুই নয়," জবাব দিলে শিকারী। তার পর তারা তাকে দিলে ধান আর জোয়ারের বীজ এবং শীতান্তে যাযাবর পাখীরা যখন আবার পাড়ি দেবে দেশান্তরের পানে তখন এগুলির চাষ করবার পরামর্শ দিলে। কিছুকাল পরে ঠিক ঐ স্থানেই এসে হাজির হল আর এক শিকারী। আগুন জ্বালিয়ে সে রান্নার তোড়জোড় করতে লাগল। একে একে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকে এসে সেখানে জড়ো হল এবং কি ভাবে রান্নাবান্না করে তা দেখতে চাইল। তাদের দেখে শিকারী তো রেগে আগুন এবং তাদের তাড়াবার মতলবে মারতে সুরু করে দিলে।"

এমনিভাবে আগন্তুকের দ্বারা অকারণে প্রহৃত হয়ে তারা বললে—"আমাদের দেশে একে অপরকে কখনো আঘাত করে না। সবাই আমরা শান্তিতে এবং মিলেমিশে বাস করি। গুটিয়ে নাও তোমার পাততাড়ি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে চলে যাও এদেশ ছেড়ে। নইলে আমাদের কুকুরগুলো এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে তোমার ওপর।" চোখ তুলে চারদিকে একবার তাকাল শিকারী—কুকুরগুলো হচ্ছে বাঘ ভল্লুকের মতো যেন। রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে শিকারী তো দে চম্পট। তার পলায়ন পথ অনুসরণ করে ছুটল প্রচণ্ড ঝড়, নামল পাহাড়ে ধস, সুরু হল প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে এল পাহাড়গুলি, আর রুদ্ধ হয়ে গেল এদেশের সবগুলি প্রবেশ পথ। এই ঘটনার পর থেকেই মায়াল দেশটি রয়ে গেছে দুরধিগম্য।

সাত ভাইয়ের বাসভূমি এই মায়াল দেশ। এই সপ্ত ভ্রাতাই হচ্ছেন সিকিমের পাহাড়ী মানুষ লেপচাদের পূর্ব পুরুষ এবং অভিভাবক। মায়ালে সাতটি বুটির বাস করেন এঁরা সাত ভাই। এঁরা অমর, প্রতি প্রভাতে এঁরা থাকেন শিশু, দুপুর বেলা হন পূর্ণবয়স্ক মানুষ আর বুড়িয়ে যান সন্ধ্যাবেলা। লেপচাদের মতই পরিধেয় এদের, মাথায় পরেন বেতের টুপী। দেবতা এবং মানুষের মাঝামাঝি স্তরের জীব হচ্ছেন এঁরা। পুরোপুরি দেবতা নন, কেন না এঁরা বাস করেন মর্ত্য লোকে, আবার মানুষও বলা চলে না এঁদের কেন না এঁরা অমর। [illegible] ভজ্যা পত্তন কেন্দ্রে এই [illegible] তলুঙ উপত্যকার উপরের [illegible] মায়াল এর অবস্থিতি।

এই মায়াল হচ্ছে 'সাত পেদু দেশ'। ওরেশের ফলগুলি এখান ফসলের চাইতে অ করে শ-গুণ সকল সময়েই পাকা থাকে সে সে ফসল। সেখানকার পাশ হয় মায়েল ফে। [illegible] সময় সম্পাদন করতে হবে কবিরাজ নির্দেশ দেবার জন্যে ঐ পা পাঠিয়ে দেন সাত ভাই লেপচ কাছে। যৌ নিয়ে ঘং করেন মায়াল বাসীরা। তবে সব চেয়ে আহু-ইয়ুক আর আলাউ ইয়ু কর কতকটা স্তূপের মতো থাকেন দুই তাল্যেষু নিমু আর সাঙো নি এঁরা হলেন ধরিত্রী দেবতা। মা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন তাঁরা, কর্ষণযোগ্য জমি তাদের উদ উপরে।

পুরাকালে মায়ালের পথ খোলা, এবং কখনো কখনো মা বাসীরা আসতেন দুনিয়ার অ মুলুকে এবং মাঝে মাঝে দুঃসা শিকারীরা এসে উপস্থিত হত মা দেশে।

উপরোক্ত মায়ালের কাহিনী নিজেদের আদিনিবাস সম্বন্ধে আ কতকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আ সিকিমের লেপচাদের মধ্যে। তদনুস কেবলমাত্র সাত ভাই নয়, লেপচা সকল পূর্ব পুরুষই বাস ক মায়াল এ।

নেপাল ও সিকিমের লেপ ভুটানের ভেদজ, প্রভৃতি বি মোঙ্গোলীয় মহাজাতির মানুষ সুদ ভোট ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) জা ভাষা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত বা নেফ আকা, আবর, মিরি, দফলা, মিশ এবং অন্যান্য বহু জাতির মানুষ ভাষায় কথা বলে তা এই ভাষা বং অন্তর্ভুক্ত। The Kacharis নাম জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ প্রণে রেভারেণ্ড এস এণ্ডল্-এর মা আসামের বড় (কাছারী, রাভা, মে কোচ, গারো, হাইজঙ এবং পার্ব ত্রিপুরার টিপ্রা প্রভৃতি বহুভা লোকেরা পরস্পরের স্বজাতি এবং স্ব

আসলে যে সকলেই তিব্বত ভোট ব্রহ্ম (Tibeto Burman) গোষ্ঠীর মানুষ।

নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং তিব্বতের ধর্ম এবং সংস্কৃতির উপর ভারতের প্রভাব যে কত গভীর সে বিষয়ে আমরা সচেতন নই। এ বিষয়ে মখ্যাত ভাষাতত্ত্বের ও ইতিহাসের দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal-এ। তার নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় নূতন আলোকপাত করেছেন বিদেশী বিদ্বান Mr. Matthias Hermanns ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *The Indo-Tibetans* নামক গ্রন্থে।

এই প্রবন্ধে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে সকল মানুষের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনীতিকুমার তাঁদের আখ্যাত করেছেন 'ইন্দো-মাঙ্গোলয়েড' বলে। এরা হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যে প্রোক্ত কিরাত জাতির মানুষ এই কিরাতদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শুক্ল যজুর্বেদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদে নরবলির প্রসঙ্গে। পরবর্তী যুগে রচিত মহাভারতেও পূর্ব হিমালয়ের মানুষ কিরাতদের কথা পাই :···হে কৌন্তেয়, অনন্তর পাণ্ডবরা ইন্দ্রপর্বতের সন্নিহিত বৈদেহ দেশে আগমন পূর্বক সাত জন কিরাত রাজাকে পরাজিত করলেন। ("সভাপর্ব, ২৬, ৩২)। মহাভারতের সভা পর্বেরই আর এক জায়গায় আছে 'লৌহিত্যের (আসামের লোহিত অথবা উজান ব্রহ্মপুত্র নদী) ওপারের কিরাতদের কথা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডেও পাই কিরাতদের বর্ণনা। এদের প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার বলেন—"খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব এবং খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে হিন্দুদের নিকট কিরাতদের পরিচিত ছিল এমন এক নরগোষ্ঠীরূপে যাদের আদি নিবাস ছিল হিমালয়ের ঢালুতে এবং পূর্বদিকের পর্বতমালা, বিশেষতঃ আসামে। (অতীতে) এরা ছাড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের সমগ্র সমতল অঞ্চলে, একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত এবং মনে হয় যে, এরা অনুপ্রবেশ করেছিল একেবারে পঞ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত।···

এই কিরাত জাতির মানুষদের ইন্দো-তিব্বতীয় বলে অভিহিত করেছেন বিদেশী নৃতাত্ত্বিক হের্মানস্। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, কিরাত জাতির মানুষরা ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে কাছাকাছি কোনো সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল সম্ভবতঃ আসামের ভেতর দিয়ে। ৪০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সারা ভারত, নেপাল সংলগ্ন বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ এবং গঙ্গার উত্তরে বাংলা এবং আসামের বৃহত্তর অংশ। পূর্ব নেপাল এবং লৌহিত্য অথবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে ছিল এদের বিশেষ যোগসূত্র।

একদা বাংলা দেশে আর্য্যরক্তের সঙ্গে অনার্য কিরাত রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছিল প্রভূত পরিমাণে। জাতিতত্ত্বের সূত্রে আবদ্ধ আমরা এদের সঙ্গে। দীর্ঘকাল আমরা আমাদের এই সকল জ্ঞাতির খোঁজ খবর নিই নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন সুনীতিকুমার ১৩৩২ সালে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'পাহাড়িয়া' কাহিনী'র ভূমিকায়। এতদিন পরে শিক্ষিত মহলে যে, সেই অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়েছে সেটাকে বলতে হবে শুভ লক্ষণ।

সিকিম ও ভুটানে কিরাত জাতি বা ইন্দো-তিব্বতীয় গোষ্ঠীর যে সকল মানুষ বাস করে তাদের মধ্যে লেপচারাই প্রধান। এরাই হচ্ছে সিকিমের মূল অধিবাসী। নেপালেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা রঙ্ নামে নিজেদের পরিচয় দেয়, তিব্বতীরা এদের বলে মন—ভুটানীরা মেরি।

(ক্রমশঃ)

মূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারকে ৫ বৎসরের জন্য ঋণ করা ৪ টাকা সুদ দান দিবেন। এইভাবে ৬৫।৭০ কোটি টাকা আয় হইবে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে কর্পোরেশন করের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হবে। ব্যক্তি বা হিন্দু যৌথ পরিবার বা ব্যবসায়ের উপর এই অতিরিক্ত করের হার ক্রমবর্দ্ধমান আয়ের শতকরা ৪ ভাগ হতে ১০ পর্য্যন্ত হবে। রেজেষ্ট্রীভুক্ত ফার্ম্মের অতিরিক্ত আয় করের হার হবে শতকরা ২০ টাকা।

কারণ হিসাবে তিনি বলেন, এখনি পোষ্টকার্ড বিলি করতে খরচ পড়ে ৮ নঃ পঃ কিন্তু স্থানীয় পোষ্ট কার্ডের মাশুল বর্ত্তমানে ৩ নঃ পঃ ও ভারতীয় পোষ্ট কার্ডের মাশুল ৫ নঃ পঃ—ফলে পোষ্টাফ ডিপার্টমেণ্টের বাৎসরিক ক্ষতি হয় তিন কোটি টাকা। পল্লীগ্রামে পোষ্ট অফিস খুলিতে হলে অনেক স্থলে পোষ্ট অফিস হবে যেখানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। সেজন্য ডাকের মাশুল সকল পোষ্ট কার্ডের ৬ নঃ পঃ হবে।

ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা এই বৎসর দিবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ট্যাকশালের মুনাফা বাবদ প্রায় ৭১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত। জাপানের অর্থনীতির ধাপে ধাপে উন্নতির মাপে দেখা যায় ১৯৫৬-৫৯ সনের মাত্র তিন বৎসরে কয়েকটি ভারী শিল্পে ও বস্ত্র শিল্পে জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্ম্মাণী ও বৃটেনকে অতিক্রম

শ্রীমোরারজী দেশাই বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন ঘাটতির পরিমাণ কমাতে হবে। ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অতিরিক্ত আয় ব্যবস্থার মধ্যে নূতন ও অতিরিক্ত কর ব্যতীত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে—সেই সঞ্চয়ের অর্থ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ হবে। অতিরিক্ত করের মধ্যে আরও কোন কোন বহির্বাণিজ্য শুল্ক। অতিরিক্ত মুনাফা কর। আয় করের উপরে অতিরিক্ত কর। দেশীয় উৎপাদন শুল্কও বৃদ্ধি করা হবে প্রয়োজন মত। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ডাকের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবও করেছেন।

লগ্ন কর বা আবগারী আয় যত হতে পারে ভারত সরকার এই খাজনার লোভে তাঁদের মূলনীতি হতে ভ্রষ্ট হলে তার চেয়ে বেশী নিন্দনীয় হবেন। সেজন্য ঐ আয়ের পথ আমাদের বন্ধ আছে। উৎপাদন শুল্ক আয়ের বড় পথ তেমনি আয়করও বড় পথ। কিন্তু ভারত সরকারের বাজেটে দেখা যায় এক অসঙ্গতি, আশা করি শীঘ্র তাহা পূরণ হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও শিল্পাধিকারের কেন্দ্র যত প্রসারিত হবে তাহার লাভ বা মুনাফা ভারত সরকারের রাজস্বকে সমৃদ্ধ করবে। ভারতীয় রেল করেছে। আমাদের যোজনা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় সে উৎসাহ কর্ম্মশক্তি ও নেতৃত্ব কোথায়? জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপরে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সবাই বলছেন। করের বোঝা বোঝা হয় না যদি আয় থাকে জীবন ধারণের পথ স্বচ্ছন্দ থাকে। সেদিকে শ্রীমোরারজী দেশাই দৃষ্টি দিয়াছেন বটে কিন্তু কর্ম্ম কোথায়। কার্য্যক্রম কোথায় সমগ্র ভারতে আজ যে উদ্দীপনা দেখা গিয়াছে জনগণের যে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যদি কোন দুর্ব্বলচিত্ত

ব্যক্তি প্রশ্ন করেন এত বোঝা কি আমাদের নেওয়া সম্ভব? তার উত্তরে দেশের আপামর জনসাধারণের ত্যাগের ও কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে দৃকপাত করলেই পাওয়া যায়। বৃটেনে ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-সমূহে সকলদেশে জনগণ দেশরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও আদর্শ পালনে বহু ত্যাগ স্বীকার করেন। আমরা যদি প্রয়োজনবোধে আয়কর বা অতিরিক্ত মুনাফাকর (super fortes tax) বর্দ্ধিত করে থাকি সে বোঝা দেশের ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ নিজ ও দেশের স্বার্থে গ্রহণ করবেন কিন্তু মূল প্রশ্ন থেকে যায় যে ব্যক্তির মালিকানায় (foriate leter) শিল্প, ব্যবসায় বা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় সম্প্রসারণের জন্য মূলধন প্রয়োজন সে মূলধন সঞ্চয় বা মুনাফা যতই সম্ভব সঞ্চয় ও মুনাফা যদি সরকার নিজায়ত্ত করেন তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষতি যাহাতে না হয় তাহা দেখা উচিত।

ব্যক্তিগত শিল্প ও ব্যবসায়ী মহলে আশঙ্কা বর্ত্তমান বাজেটে তাদের সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে সেইজন্য বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত ব্যক্তিগত মালিকানার আয় ও শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা বজায় রেখে শিল্পের উন্নতি প্রসারের জন্য মূলধন যাতে পর্য্যাপ্ত থাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কি না।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও জমার পরিমাণ আয়ের শতকরা ৩ হতে ১০ ভাগ। বাকী অংশের কিছু আয়কর বাবদ পাইবে বাকী সঞ্চয় বা মুনাফা শিল্প ব্যবসায় ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অব্যাহত থাকবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছে— ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাদের পক্ষ হতেও বাজেট প্রস্তাবসমূহের বিরোধিতা করা হয়েছে। নূতন কর বা কর বৃদ্ধির প্রস্তাবের চিরাচরিত প্রথামত বিরোধিতা করা হয়েছে

গান্ধীবাদের অহিংস নীতি যেমন আজ আমাদের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে উপেক্ষিত তেমনি গান্ধীবাদের অর্থনীতিও আজ বিচার সাপেক্ষে। ভারতের কোন রাজনীতিক দল নৈরাজ্যবাদী নন রাজারক্ষা বা দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সবাই সচেতন। গান্ধীর অর্থনীতির মূল কথা ছিল ভারতের অগণিত জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান, বিদেশী শোষণ হইতে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং শোষণ। সেই উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করতে চলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্বন্ধে নূতন নীতি গ্রহণ করতে হবে যার সাহায্য ইঙ্গিত কার্ব্যো কমিটির রিপোর্টে আছে শিল্পবিপ্লবের যুগে মান্ধাতার আমলের কৃষি ও শিল্পপদ্ধতি ভারতীয় জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে আমরা ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি করতে পারব না। জনগণের উৎপাদন বা আয় বর্দ্ধিত হবে না আয় করের পথ প্রসারিত হবে না। পরোক্ষ করের নানা বোঝায় জনগণের জীবন প্রপীড়িত হবে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না।

কাঠের চরখায় (অম্বর চরখার) সূতা কেটে। হস্ত চালিত তাঁতে কাপড় বুনে বা ২ বিঘা জমি চাষ করে যে আয় গ্রামে হয় তাতে আয়কর দেওয়া সম্ভব নয়—অনা করও বোঝা হয় এক দরিদ্রের সে করদানে রাজস্ব সমৃদ্ধ হয় না

শ্রীদেশাই যে সাহসের সঙ্গে বাজেটের প্রস্তাবগুলি করেছেন—১৫ বৎসর পূর্বেই স্বাধীনতার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই কঠোর সংযমের প্রয়োজন ছিল বৈদেশিক মুদ্রায় প্রয়োজন ছিল—সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল—শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় উন্নয়নের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল—দেশরক্ষার প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। ধীরে ধীরে ভুল ত্রুটীর মধ্য দিয়ে—সেই পথে আমরা অগ্রসর হয়েছি কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হলে ভারতের বাজেট অর্থ-নীতিকে নূতন ভাবে রচনা করতে হবে— কারণ আমাদের কাছে দেশের স্বাধীনতা ও জাতির স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা ব্যক্তিগত সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে অনেক বেশী বড়। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মুখের কথা নয় —তার জন্য চাই অর্থনীতি ও তার উপকরণ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারত সরকার রাষ্ট্রের ঋণপ্রস্তুতি ও দেশরক্ষা এবং কল্যাণ-রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে যে বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় সম্প্রতি দিতেছেন এবং যাহা দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট সংবাদিত হয়েছে সেই বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে বাজেট নীতি ও ভারতের অর্থনীতির আশু সমীক্ষা করবেন এবং আমাদের দেশের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির যে বিরাট সম্ভাবনা আছে তাকে রূপ দেবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বাজেট বা আয় ব্যয়ের তালিকা প্রধান প্রধান খাতে—

১৯৬৩-৬৪

আয়	কোটি টাকা	ব্যয়	কোটি টাকা
বহির্বাণিজ্য শুল্ক—	৩০৮·৫১	দেশরক্ষা—	৭০৮·৫১
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক—	৬১০·৫৭	ঋণ পরিশোধের খাতে—	২৮০·২৪
কর্পোরেশন ট্যাক্স—	২২৭·০০	কেন্দ্রীয় শাসন—	৮৮·২৮
আয় কর—	১২০·০৫	কর ও রাজস্ব আদায়—	২৩·৮৩
লাভ কর—	৩০·০০	শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক	
ধন কর—	১·৪০	কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা—	১৫৫·৪০
মৃত্যু কর—	১২·০০	পূর্ত্ত বিভাগ—	২০·১৪
সরকারী ঋণ—	২১৭·০৫	কেন্দ্রীয় করের রাজ্য সরকারের	
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ট্যাবশালের		প্রাপ্য অংশ—	১২৮·০৭
আয়—	৭৩·৫৮	রাজ্য সরকারকে সাহায্য দান—	২১৭·৫৫
অন্যান্য খাতে—	—	অন্য খাতে—	৮৬·১১
মোট আয়—	১৫৮৫·৭৩	মোট—	১৮৫১·৬৩
	+ ২৬৫·১০		
	১৮৫১·৬৩		

কৃষ্ণার্জুন সংবাদ

পরিমল গোস্বামী

ব্যাসদেব মহাভারত রচনার সময় ঠিক যে ভাবে যে অংশ লিখেছিলেন পরে সেই সব অংশ সবগুলি ঠিক সে রকম রাখেননি, অনেক বদল করেছিলেন। আমরা সেই পরবর্তী বদল করা মহাভারতের সঙ্গেই পরিচিত, প্রথম দিকের সেই বাতিল করা অংশগুলি আমরা চোখেও দেখিনি। দেখিনি কারণ সেগুলি সাধারণ পাঠকদের যাতে চোখে না পড়ে সে-জন্য তিনি তা একটি লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে পাহাড়ী মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। আমি সম্প্রতি সেটি আবিষ্কার করেছি।

সিন্দুকটি যদিও পাথরের নিচে চাপা ছিল, তবু তাতে মরচে ধ'রে শুধু সিন্দুকটিই নষ্ট হয় নি, মহাভারতের পাণ্ডুলিপিটিও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি সেই নষ্ট হওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে কোনো মতে ভীষ্মপর্বের সামান্য একটু অংশ উদ্ধার করেছি, এবং সেই সামান্য অংশটি মাত্র সম্বল করে আমি মোটামুটি একটি কাহিনী খাড়া করেছি। আমার নষ্ট লেখা পুনরুদ্ধারের রীতিটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। যথা একস্থানে পাণ্ডুলিপিতে পেলাম মাত্র তিনটি শব্দ। "তা দেখে ... অর্জুনকে ... জান?" মধ্যবর্তী অংশগুলি মরচে ধরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এ থেকে আমি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠের রীতির সঙ্গে আমার কল্পনা মিশিয়ে যা খাড়া করলাম তা হচ্ছে এই—"তা দেখে (এ দিকে যুধিষ্ঠির) অর্জুনকে (বললেন, বৃহস্পতি কি বলেছেন) জান?"

সব কাহিনীটাই এই ভাবে নতুন ক'রে গড়া। নিচে সেইটাই বিবৃতি হল:

ভীষ্মপর্ব-ভগবদ্‌গীতাপর্বাধ্যায়

কৌরব এবং পাণ্ডব সৈন্যগণ তৈরি হয়ে এসেছেন যুদ্ধের জন্য।

কৌরব বাহিনীর পরিচালকরূপে এসেছেন ভীষ্ম সম্পূর্ণ সাদা পোষাকে—তাঁর রথও সাদা, রথটানা ঘোড়াও শাদা।

ভীষ্ম কুরুপক্ষের রাজাদের ডেকে বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, তোমাদের স্বর্গযাত্রা অনিবার্য। ঘরে বসে নানা ব্যাধিতে না ম'রে অস্ত্রের আঘাতে মরা ঢের ভাল। আর এটা ধর্মেরও অনুমোদিত।

এ কথা শুনে বহু রাজা নিজ নিজ সৈন্যবল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রশ্ন স্বর্গে যাওয়া যাবে তো? কথার নড়চড় হবে না তো? —তাঁরা প্রতিশ্রুতি পেলেন, যে কথা সেই কাজ, স্বর্গে যাওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই শুনে তাঁরা হর্ষধ্বনি করলেন।

এ দিকে কুরুসৈন্যরা ব্যূহ রচনা শেষ ক'রে ফেলেছেন। তাঁরা যুদ্ধে যাবার জন্য এবং সেখানে নিহত হয়ে স্বর্গে যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছেন।

তা দেখে পাণ্ডব পক্ষের কিছু ভাবনা জাগল। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, বৃহস্পতি আমাদের কর্তব্য বিষয়ে কি বলেছেন জান? এমন অবস্থায় তাঁর উপদেশ কি জান?

না তো।

তিনি যুদ্ধ বিজ্ঞানে পণ্ডিত। যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর মতামত সে জন্য বড়ই মূল্যবান এবং তাঁর পরামর্শ শুনলে জয় অনিবার্য। তিনি বলেছেন, সৈন্য যদি অল্প হয় তা হলে খুব সাবধান। সৈন্য অল্প হলে তাদের বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে দেবে না, একসঙ্গে ঘনীভূত অবস্থায় রাখবে। আর এমন অবস্থায় সূচীমুখ ব্যূহ রচনা করবে।—এসবই পাকা উপদেশ, সমরশাস্ত্রসিদ্ধ।

দেখা গেল কুরুসৈন্যরা এগিয়ে আসছেন। পাণ্ডবসৈন্যরাও তা দেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ভীম গদা ঘোরাতে ঘোরাতে চললেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি এগিয়ে চললেন। এঁরা সবাই ভীমের পশ্চাদ্‌রক্ষীরূপে রইলেন।

সব প্রস্তুত, এখন শাঁখ বাজলেই হয়।

এমন সময় যুধিষ্ঠির বিপক্ষের প্রবলতর সৈন্যবাহিনী দেখে বড়ই দমে

গেলেন। তাঁর বুক কাঁপতে লাগল। বললেন, আমরা জিতব কি করে? জয়লাভ যে অসম্ভব বোধ হচ্ছে।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ সহায় থাকলে কেন জয় হবে না? নারদও তো তাই বলেছেন।

ওদিকে কুরুপক্ষও খুব নিশ্চিন্ত নয়, নিশ্চিন্তও নয়। তাদের মনে সন্দেহ, কি জানি কি হয়।

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, পাণ্ডবগণের সৈন্যবলকে খাটো করে দেখার কোনো হেতু নেই। মনে হচ্ছে যুদ্ধ অতি সাংঘাতিক ধরণের হবে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া বোধ হয় আর হবে না। আর ঐ দেখুন চেকিতান সবাইকে লড়াইয়ের জন্য ভীষণ চেতিয়ে তুলছে। কাশীরাজও আছেন, আরও বহু বীর আছেন। আপনি ভীষ্মকে রক্ষার ভার নিন।

দুর্যোধনের মনে দুর্বলতা এসেছে বুঝতে পেরে বৃকবৃদ্ধ ভীষ্ম খুব জোরে শাঁখ বাজালেন। যুদ্ধের প্রেরণা ছিল সেই ধ্বনিতে। সঙ্গে সঙ্গে বহুতর বাজনা বেজে উঠল।

তা শুনে এ পক্ষেও তার পাল্টা জবাব দেওয়া হ'ল। পাঞ্চজন্য বেজে উঠল। তার কি দুর্জয় আওয়াজ, দুর্যোধনের সকল অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তা শুনে।

অর্জুন বুঝতে পারলেন যুদ্ধ আসন্ন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, ভাই, আমার রথ দুইপক্ষের মাঝখানে রাখ, কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যুদ্ধটা কাদের সঙ্গে। মানে আমাদের বিপক্ষে কে কে আছেন তা আমার নিশ্চিত জানা দরকার হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণ রথ মাঝখানে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু অর্জুন বিপক্ষের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন। বললেন, এ যে দেখছি সবই জ্ঞাতি-কুটুম্ব গুরুজন। ভাই কৃষ্ণ, আমার দিকে রয়েছেন আমার আত্মীয়রা, আমার বিপক্ষে রয়েছেন আমার আত্মীয়রা এবং বিপক্ষের ওঁরা বেশি আত্মীয়। আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে ধরে ফেললেন, নইলে পড়ে যেতেন।

অর্জুন কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন, কৃষ্ণ, আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছি, আমার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে—এখন কর্তব্য কি?

সে কি কথা? তোমাকে তো যুদ্ধ করতেই হবে।—বললেন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ, আমি জয় চাই না। যাঁদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধে এসেছি, আমার বিপক্ষে তো দেখছি তাঁরাই এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বজন বধ ক'রে আমি কি লাভ করব? উঃ, কি মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি রাজ্যের লোভে!

বাজে কথা বলো না অর্জুন। এই রকম সঙ্কটকালে তোমার এমন মোহগ্রস্ত হ'লে চলবে কেন? এর আগে তোমার মনের জোর দেখে আমি যে পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম, এখন আমি সেই পরিমাণ হতাশ হচ্ছি।

আমি কি করব, বল। আমার হাতে আমার গুরুজনরা মরবে এ আমি চাই না।

কৃষ্ণ বললেন, মরবে কোন দুঃখে? মৃত্যু মানে কি? আত্মার মৃত্যু নেই। সমস্ত বিশ্বে প্রাণ ছড়িয়ে আছে, এর কেউ বিনাশ করতে পারে না। তা ভিন্ন কেউ একবার জন্মেছে অতএব তার সব শেষ, তাই বা ভাববে কেন? আত্মা বারবার এসে জন্মাবে। শরীর গেলেও আত্মা থাকে। আত্মার গায়ে তীর বেঁধানো যায় না, তীর দেহেই শুধু বেঁধে। অতএব তুমি যাদের নিহত করবে, তারা শুধু দেহে মরবে আত্মায় নয়।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, অত সূক্ষ্ম বিচার ক'রে তো আমরা সংসারে চলি না। আত্মীয় বিয়োগে কাঁদি। মারা যাবার আগে তাদের কাউকে বলি না এখন তা হ'লে এসো, এই তো ক'দিন পরে ফিরে এলেই আবার দেখা হবে। কিংবা এমন কথাও বলি না—আপাতত মারা যাচ্ছ বটে, কিন্তু ও কিছু না। কিংবা যে মারা যাচ্ছে সেও চোখ বোজার আগে বলে না যে আপাতত আমি এইখানেই শেষ হচ্ছি। মৃত্যুর পরেও কেউ বলে না যে মৃত অস্থায়ী ভাবে ছেড়ে গেছে, এই আবার এলো ব'লে।

কৃষ্ণ বললেন, বলে না লোকাচার হেতু। যারা বলে না তারা সাধারণ মানুষ। কিন্তু তোমাকে এ সবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তোমাকে অখণ্ড সত্যকে দেখতে হবে। তোমাকে কর্মযোগ শেখাবার ইচ্ছা, কিন্তু তবি এখন যেমন ভয় পেয়েছ, তাতে তোমার মাথায় এখন কিছু ঢুকবে ব'লে মনে হয় না। তবে এ টুকু মনে রাখতে পারি যে তোমার শুধু কর্মে অধিকার, ফলে নয়। এই কথা ব'লে কৃষ্ণ অর্জুনের পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁকে আদর করতে লাগলেন।

কিন্তু তবু অর্জুনের দ্বিধা দূর হ'ল না। তাঁর শুধু এক কথা—স্বজনদের নিধন করব না, তা তাঁরা দেহেই মরুন বা আত্মায়ই মরুন। আমি পার্থিব মানুষ, আমার কাছে দেহের মৃত্যুই আসল মৃত্যু। আত্মার কথা তুলে লাভ নেই কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ বললেন, কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ। আচ্ছা, তোমার কোন্ কোন্ গুরুজন বেশি অবধ্য মনে হচ্ছে?

কুরুদের পুরোভাগে যাঁরা আছেন সবাই আমার গুরু—মহাগুরু। মহাগুরুদের মধ্যে রয়েছেন মামা শল্য এবং চাউ এন-লাই। গুরুদের মধ্যে আছেন—

চুলোয় যাক তারা, তুমি ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না? এই তোমার শেষ কথা?

হাঁ, কৃষ্ণ, এই আমার শেষ কথা।

এ কথায় কৃষ্ণ যেমন হতাশ ভাবে ব'সে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমাকে পাণ্ডবেরা গ্রেপ্তার করবে, জান?

জানি কৃষ্ণ। আমি প্রস্তুত।

কৃষ্ণ যেমন বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমাকে ভজাতে না পারলে আমার পদত্যাগ অনিবার্য।

হয় তো তাই। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। আমি গ্রেপ্তার হ'তে চললাম।

কৃষ্ণ যেমন বললেন, আমিও পদত্যাগ পত্র লিখি তা হ'লে।

পরদিনই অর্জুনের গ্রেপ্তার ও কৃষ্ণের পদত্যাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হ'ল।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ তখনও চলতে লাগল।

বাংলা চলচিত্রে

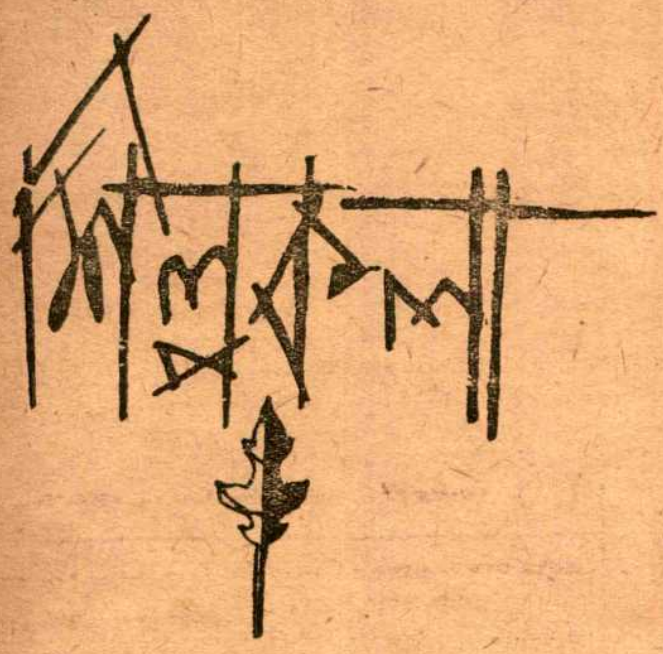

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

বাংলা চলচ্চিত্রের আসরে একটা 'গেল গেল' রব উঠেছে। সোর-গোলের নানা কথার মধ্যে একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে—'আর্ট' করতে গিয়েই নাকি বাংলা ছবির এই হাল। সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের পর থেকেই নাকি বাংলা ছবিতে আর্টের প্রাদুর্ভাব আর লাভের তিরোভাব। আর্টের বাহবা পেতে সবাই উদ্যস্ত, ফলে ব্যবসা বিপন্ন। জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার তাগিদ নেই। শূন্য বক্স অফিসে বসে বাহবা কুড়িয়ে লাভ কী? শুধু ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনেই আর্ট ক্ষান্ত হচ্ছে না, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ পরিচালকেরাও আর্টে শিকার হতে চলেছেন। যারা কেবল বিদেশী ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর স্বদেশের প্রতি বিমুখ, সেই বইপড়া, কফি খোর সমালোচকদের গোলকধাঁধায় পড়ে বাংলা ছবি ব্যবসার খেই হারিয়ে ফেলেছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা ছবির দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ছবির সংখ্যা শীর্ণ, লাভের ঘরে ঘাটতি। মূলধনের অভাব তীব্র, তার চেয়েও তীব্র প্রেক্ষাগৃহের অভাব। প্রবীণ চলচ্চিত্রসেবীরা এ সমস্ত বিষয়ে নানা জরুরী আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে কারণ ও নিরাকরণের প্রয়োজনীয় সন্ধান চলেছে। কী করে বাংলা ছবিকে সারাভারতে অন্ততঃ হিন্দি-ভাষী ভারতে চালু করা যেতে পারে, বাংলাদেশে হিন্দি ছবি তোলা যেতে পারে কি না, প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি ভেঙে প্রযোজকের ন্যায্য অধিকারকে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, মূলধন যোগানোর জন্য সরকারী ব্যবস্থা কী ভাবে হওয়া সম্ভব —এ সমস্ত বিষয় নানাদিক থেকে তলিয়ে দেখা হচ্ছে। অবশেষে যে বাংলা ছবির ব্যবসায়িক ভিত্তিকে সংগঠিত ভাবে যাচাই করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে তা বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্ত হিতাকাঙ্খীর পক্ষে আনন্দের বিষয় কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা চলচ্চিত্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের অনেকের এখনও ধারণা যে আর্টই বাংলা ছবির একমাত্র না হোক, পরম শত্রু। অনেকদিন ধরেই এই ধারণা বলবৎ হয়ে রয়েছে।

১৯৬২ সালে রেজমুক্ত বাংলা ছবির মধ্যে ৩৫টি এ যাবৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের একাধিক প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে এই ছবিগুলির ব্যবসায়িক সাফল্য-অসাফল্যের একটা মোটামুটি হিসেবের কিছুটা হদিস পাওয়া যায়। নির্ভুলতার দাবী অসম্ভব, কিন্তু এই হিসাব অনুযায়ী ৩২টি ছবির মধ্যে মাত্র চারিটি—বধূ, মায়ার সংসার, অভিযান ও দাদাঠাকুর। ব্যবসায়িক দিক থেকে সত্যিই লাভ-জনক প্রতিপন্ন হয়েছে। অন্যান্য ছবির মধ্যে ৭টির ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে লাভ বা লোকসান কোনোটাই ঘটেনি। ৪টির বেলায় খুবই সামান্য অঙ্কের লাভ হয়েছে বলে মনে হয়। বাদ বাকী ১৭টি ছবি—অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি ব্যবসায়িক দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

তথাকথিত আর্টের সংজ্ঞা যদি বিশেষ কারুর একলার কল্পনা ভাবেও ধরা যায়—অধিকাংশ বহির্দৃশ্যের ছবিকেও যদি বলা যায় আর্টপ্রবণ—তাহলেও এঁদের মতে আর্টপ্রবণ ছবির সংখ্যা এই ৩৫টি ছবির মধ্যে ৬টির বেশি নয়। বাকী ২৯টি ছবি 'আর্ট করা'র চেষ্টা না করেও প্রমোদ বিকরণের চেষ্টায়ই বিফল হয়েছে। আর 'আর্ট' শ্রেণীর ছবির মধ্যে একটি ছবি—অভিযান—লাভের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ওঠে যাঁরা আর্টকে প্রমোদের ও ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বোধ করেন, তাঁদের ছবিতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক অসাফল্য কেন? দর্শকের চাহিদা যদি তাঁদের জানাই থাকে তবে তার খোরাক জোগাতে তাঁরা কেন অপারগ?

আসলে ব্যবসায়িক বিচারে হয়ত বাংলা ছবির গোটা প্রযোজনা-ব্যবসাই নিরর্থক, কেননা ৩৫টি ছবির সম্পূর্ণ মূলধন দিয়ে যদি সেভিংস সার্টিফিকেট কেনা যেত তাতে হয়ত লাভ হত বেশি। এ ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি রেসের মাঠের বাজী ধরার সামিল। শ্রমশিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র প্রযোজনাকে গড়ে তোলার সংগঠিত চেষ্টা যদি যেত তাহলে নানা অগ্রসর দেশের মতো এদেশেও গল্প-সংগ্রহের জন্য ষ্টোরী ব্যুরো, শিল্পী

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার প্রথম সাহিত্য মিলন কেন্দ্র

চাণক্য সেন প্রণীত **রাজপথ জনপথ**

(তৃতীয় সংস্করণ)

দাম : ৬·৫০ নঃ পঃ

এক বৃদ্ধিপ্রধান সমস্যাকে ঔপন্যাসিক নিপুণতা ও সাহিত্যিক রসের সঙ্গে সার্থকভাবে উপস্থিত করেছেন।—আনন্দবাজার বলেন।

চাণক্য সেন-এর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও ঋজু, তাঁর বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাসের ঘোষণা আছে। রচনার জন্য লেখক অভিনন্দন যোগ্য।—বলেন দেশ।

পাত্র-পাত্রী অনেক···তাঁরা সবাই দেখেছেন এই ভারতকে, আর তাদের দেখাকে দেখেছেন লেখক। এ দেখার তারিফ করতে হয়।—বলেন আকাশবাণী।

ইদানীংকালের সার্থক উপন্যাস।—বলেছেন যুগান্তর।

ধীরে বহে নীল—(তৃতীয় সংস্করণ) চাণক্য সেন। ৮·০০
[মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস]

মধ্যপঞ্চাশ—(দ্বিতীয় সংস্করণ) উপন্যাস। চাণক্য সেন। ৪·৫০

নবীন শাখী—(উপন্যাস) ২·৫০
প্রবোধ ঘোষ

অবগুণ্ঠন - (উপন্যাস) ৩·০০
বিমল কর

প্রিয়ালতা—(উপন্যাস) ২·৫০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জলকন্যার মন—(উপন্যাস) ৩·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বধূ অমিতা—(উপন্যাস) ২·০০
শৈলেন দে

মালবিকা অগ্নিমিত্র—
(উপন্যাস) ৫·০০
[মহাকবি কালিদাস-এর নাটককে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন]
অশোক গুহ

দুই সমা—(গল্প গ্রন্থ) ২·০০
বিনয় চৌধুরী

অনূদিত উপন্যাস

করুণা কোরো না— ৩·০০
ষ্টিফান জাইগ

ডোরিয়ান গ্রের ছবি— ৪·৫০
অস্কার ওয়াইলড

ব্যাঙ্ক ইউ জীভস— ৪·০০
পি. জি. ওডহাউস

অভাগা— ৩·০০
গর্কি

পরকীয়া— ২·০০
চেখভ

সান্তা লুসিয়া (গল্প)— ৩·০০
জন গলসওয়ার্দি

ক্যারি অন জীভস— ৩·৫০
পি. জি. ওডহাউস

বিভূতি বসু
রঙ রঙ্গনা
গান শোনা শেখার বই।
বহু গুণীর বহু মূল্য এই বই-এ স্থান পেয়েছে। দাম—৪·০০

অজিতরঞ্জন গুপ্ত
বেচা কেনা সমস্যা
দাম—৪·০০
Salesmanship সম্পর্কে একমাত্র বই

নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সংগ্রহের জন্য কাটিং ব্যুরো, দন্ত-সংগ্রহের জন্য টকশট লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত, দর্শক কী চায় তা জানার জন্য যে গবেষণার প্রয়োজন তারও কিছু নজির মিলত। অর্থাৎ ব্যবসার দোহাই দিয়ে আর্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন যাঁরা তাঁদের দর্শক সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা, নেই স্বকীয় ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ চিন্তার কোনো সংগঠিত দায়িত্ববোধ নেই, সে দায়িত্ব সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে অনেক সাময়িক প্রযোজকই নিখোঁজ হয়েছেন। 'নিউ থিয়েটার্স'-এর আমলে কিছুটা শ্রমশিল্পোচিত কার্যক্রম ও মনোবৃত্ত গড়ে উঠেছিল, দর্শকের সঙ্গেও কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল, ফলে সে সময়ের দর্শকের উপযোগী চলচ্চিত্র পরপর অনেকগুলি দেখা যায়। সেই অনুপাতে যুদ্ধোত্তর, বঙ্গ বিভাগের পরবর্তী সমাজের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের যথেষ্ট পরিচয় নেই, তার মনের পরিবর্তনের খোঁজ ব্যবসায়ী রাখেন নি, তাঁর কল্পনায় দর্শকের এখনো উচিত বাঁধা ছকে সাড়া দেওয়া, পাঁচ মিশেলী স্বাদে উত্তেজিত হওয়া। তাই 'শেষ অঙ্ক'-এর মতো জমাট রোমাঞ্চের ছবিতেও দুটি মজার গান চাই, 'অবশেষে'-র মতো হাসির ফোয়ারাও হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়তে বাধ্য। নিউ থিয়েটার্স-এর সংগঠনশীলতা বাঙালী হাড়ে বেশিদিন সইল না। অব্যবসায়ী চিলেমি ও রেসের মাঠের রুচিহীন মনোবৃত্তিই শেষ পর্যন্ত সংগঠনীভাবকে কোণঠাসা করে দেয়। তখন 'আট' হঠাৎ সকলের বিরাগভাজন হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রক্ষেত্রে পৃথিবীর সেরা সংগঠন হলিউডে। টেলিভিশনের প্রকোপে অধুনা কিছু কাবু হলেও, হলিউডের শ্রমশিল্প বহুকাল যাবৎ ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা ও সংগঠনের আদর্শ-স্বরূপ। তৎসত্ত্বেও ৬০ বছর ধরে হলিউডে কিছু সংখ্যক শিল্পসম্মত ছবি যত নিয়মিতভাবে নির্মিত হয়ে এসেছে তুলনা মেলে না। হলিউডের আওতায়ই গ্রীফথ, চ্যাপলিন, ওয়েলস্, ফোর্ড প্রমুখ শিল্পীদের প্রকাশ ও বিকাশ। জাপানেও চলচ্চিত্রের শ্রমশিল্প ও শিল্প-কলার মধ্যে অনুরূপ সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির মধ্যেই কুরোসাওয়া, গোশো, মিজোগুচি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের অভ্যুদয়। তার ফলে হলিউডী বা জাপানী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে যায়নি, বরঞ্চ শিল্পগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। তার সাধারণ চলচ্চিত্রের নিম্নতম মান উন্নত হয়েছে এবং প্রায়ই শিল্পসম্মত সৃষ্টি ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির দ্বারা চালিত শ্রমশিল্প সৃষ্টিপ্রতিভাকে উপযুক্ত স্থান দিতে এবং তাকে নিজের উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন পরিমাপে ইংলণ্ড ফ্রান্স বা পোলার ছবিও এই দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। বাংলার শিল্পসম্মত ছবি ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে যে ভাবে বিদেশী মুদ্রা আনতে সক্ষম হয়েছে তেমন ভারতের আর কোনো ছবিই পারেনি। এটা শিল্পোত্তীর্ণ ছবির অব্যবসায়িকতার পরিচয় নয়। 'পথের পাঁচালি' কেবল বাহবা এবং ডলারই কুড়োয়নি, বাংলা দেশেও প্রায় গোড়া থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দুঃখের বিষয় মুষ্টিমেয় দু'একজন পরিচালক বাদে অন্যেরা কোনো স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি, অপরের শিল্পকর্মের বাহ্য লক্ষণগুলিকে নকল করেছেন মাত্র। চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী মহল আসল-নকল চেনার ক্ষমতা রাখেন না, তাই বহির্দৃশ্যবহুল ছবিমাত্রেই আর্ট বলে ধরে নেন। বিচার ক্ষমতার অভাবে অনেকের মূলধন অনেক ঢেউ-এর তলায় তলিয়ে গিয়েছে, অথচ কপালে সন্ধানও জোটেনি।

চলচ্চিত্রের মধ্যে শ্রমশিল্প ও শিল্পকলার একত্রিত বিকাশ অপরিহার্য। তাই বাংলা ছবির পরম শত্রু আর্ট নয়; একদিকে শিল্পবোধের মর্মান্তিক অভাব, আরেকদিকে অব্যবসায়ী, সংগঠন-বোধহীন মনোভাবই তার প্রধান অন্তরায়।

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত (সি. আই. টি.) রোড, কলিকাতা-১৪

* স্কুল-কলেজের যাবতীয় বই
* উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক
* ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থের সমাবেশ

কলেজ-স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই হয়

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্য-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সরলতামূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫.০০ | ভারত-আত্মার বাণী ৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১.০০ | কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ | বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ১.০০ | বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০ | বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০ | রাজর্ষি রামমোহন ১.০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০ | যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৩০
জীবন গড়া ৭০ | রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট-সংবলিত ১.৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রয়োগমূলক নূতনধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান। এই দুই যুগান্তকারী সংকলিত সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিধান প্রত্যেকের অপরিহার্য। ৭.৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

যাওয়াটাই তাড়া

শ্রীমতী বাণী রায়

উটের পায়ের দাগ মরুভূমি-বুকে,
ঝঙ্কিত পায়ের শব্দে স্পন্দন-বিষাদ,
অতলান্ত চারপাশে অতলান্ত রাত,
প্রহর-গুহায় তার ধ্বনিত বিষাদ।

শুকনো খেজুর ঝোপে যাযাবরা ভূমি,
রাধিকা আসেনা আর ব্যর্থ বেণু ছলে,
যমুনার নীর নাস্তি, শুধু ধূ-ধূ জ্বলে,
বালির পাথার আর মরিচীকা বলে।

তবু তো ভ্রমণ আছে আনন্দেশ চলা-
ভ্রমণের লক্ষ্য শুধু পথের ইসারা
যাত্রা শেষ না-ও হলে পশরার ভারা
টেনে চলে ক্লান্ত প্রাণ—যাওয়াটাই তাড়া

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি
আমাদের পাথেয় হউক

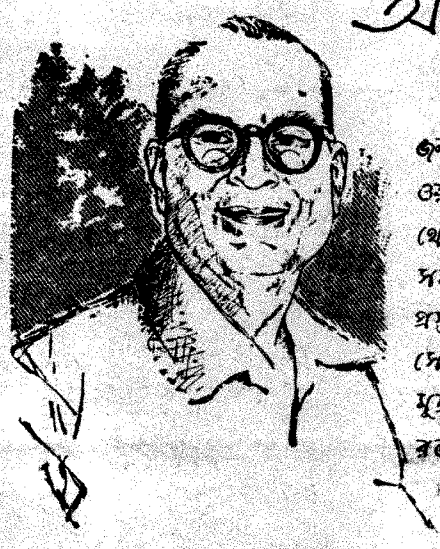

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি পাওয়া যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধান চন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু—এই টা দুনিয়াটায় ক্রিকেটের খেলার ্যা যতে, অন্য কোন খেলার ভাগ্যে বোধ হয় জোটেনি। ইংলণ্ডে বা অষ্ট্রেলিয়ায় টেষ্টখেলার চড়াই ন লাগে, তখন তার ফলাফলের জন্য গ্রীব হয়ে থাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস, ভারত, ল্যাণ্ড, পাকিস্তান এবং অন্যান্য কেট-মুরাগী দেশগুলো। ক্রিকেট

রণজিৎসিংজী

লাটা মূলতঃ ইংরেজের খেলা হলেও, ম্স-এর ঘাটে নোংর ফেলে এ-খেলা স নেই। দূর দূরান্তে পাড়ি জমিয়েছে । এ-খেলার দুরন্ত জনপ্রিয়তার বা ভারতে বসে স্বতঃই চিন্তাটা চলে য় অতীতে, মনে পড়ে নানা-দেশের ম-জাদা খেলোয়াড়দের, যাঁদের নাম র কীর্তি প্রায় রূপকথার গল্পর র্যায়ে পৌছে গেছে।

য-গুলি কীর্তিমান ক্রিকেট লোয় ড়দের নাম উজ্জ্বল হয়ে দেখা র, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় দু'জনই ইংরাজ। একজন হলেন ভারতের ন্স রঞ্জিৎ সিংজী, অপরজন ষ্ট্রেলিয়ার ভিকটর ট্রাম্পার। ক্রিকেট খলাটিকে নতুন জৌলুস দিয়েছিলেন রা দু'জন।

উন বংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রেস ন অবসর গ্রহণ করেন তখন ক্রিকেট খলাটি ছিল পুরোপুরি 'ইংরেজ'। শুধু ংরেজ' নয়, ইন্দ্র কৃষ্টির তৎকালীন ান্ট্য-সম্বলিত 'ভিক্টোরিয়ান'। তার-

পর উদিত হলেন এক নতুন তারকা। দর্শকেরা বিস্ময়ে চেয়ে রইলো এক বিখ্যাত লেখকের ভাষায়: এবজনকে দেখা গেল নতুন ঢংএ ক্রিকেট খেলতে। ইংলণ্ডে আগে কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড় এমন ক্রিকেট সম্ভবতঃ খেলতে পারতেন না।" সেই নতুন তারকা, সেই নতুন চালের ক্রিকেট খেলোয়াড় আর কেউ নন, তিনি হলেন ভারতের ঞ্জী জাম সাহেব রণজী নামে যিনি পরিচিত।

সব রকম 'শার্ট' মারার দক্ষতা তাঁর ছিল। তাঁর ব্যাটিং সব সময়ই ছন্দময় হতো; ব্যাট-চালনার মধ্যে রুক্ষ শক্ত বা বীভৎস উগ্রতার লক্ষণ থাকতো না। রণজীর খেলা দেখে এই ধারণাই হতো, তিনি যেন খেয়াল খুসী মতো বলটাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মাঠের নানাদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছিলেন তাঁরা বলতেন, রণজীর কাছে ক্রিকেট খেলাটা সহজাত গুণ ছিল। কথাটা কিন্তু ভুল। কেউ

রণজীর পরিচয় দিতে হলে নোভল ক্যাণ্ডাসের ভাষার সাহায্য নেওয়াই সমীচীন:

"রঞ্জিত সিংজীর মত খেলা আর হবে না। তাঁর প্রতিটি ছিল মৌলিক। ব্যাটসম্যানশিপের (ব্যাট চালার) ইতিহাসেও ক্রমবিকাশে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়। তাঁর ব্যাট-চালনা রীতি ও ধারাকে (ষ্টাইল) ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রয়োগে উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভা কেন, গোটা জাতির প্রতিভা! রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রিকেট ছিলো তাঁর দেশের ক্রিকেট। তিনি যখন ব্যাট ধরলেন, ইংলণ্ডের মাঠে প্রথম দেখা দিল এক নতুন আলোক। প্রাচ্যের আলোক। সে এক মনোরম যাদু। সে-যাদুর সব কিছুই নতুন, পুরাণো কোনো উপকরণ তাতে নেই।

'লেগ-গ্লান্স' খেলা রণজীরই আবিষ্কার। সোজা ও উদ্ধগতি বলকে সেকেণ্ডের শেষ ভগ্নাংশে কব্জির চকিত মোচড়ে বিদ্যুতের গতিতে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দিতেন তিনি। বোলার বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বল থামাবার অবকাশই পেতো না ফিল্ডার।

জন্মার ক্রিকেটার হয়ে, কেউ ক্রিকেটার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে। রণজী দ্বিতীয় দলে। ওস্তাদ হবার আগে তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি যখন ইংলণ্ডে যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তার আগে ভারতে ক্রিকেট খেলেছেন খুব কম!

ট্রাম্পার

ইংলণ্ডের [illegible] কয়েকজন পেশাদার বোলারকে তিনি নিযুক্ত করেন এবং প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের বলের সম্মুখীন হন। একঘণ্টা করে ফিল্ডিংও করেন প্রত্যহ। বস্তুতঃ, কঠিন পরিশ্রম, অনমনীয়তা, দৃঢ়-সংকল্পতাই তাঁর সাফল্যের কারণ। রণজীর জনপ্রিয়তার তুলনা ছিলনা এবং এই সূত্রে যে কাহিনীটি তাঁর সাফল্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে আছে সেটি উল্লেখযোগ্য। একটি সংবাদপত্র ঘোষণা করেছিল, আগামী খেলায় সর্বোচ্চ রাণকারীর নাম যে পাঠক করবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। রণজীর এক কনিষ্ঠ বন্ধু-ভক্ত রণজীর নামের পাশে ১৭৮ রাণ বসিয়েছিল। এ খবর শুনে রণজী হেসে বলেছিলেন: দেখব চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর কাউন্টি সাসেক্সের হয়ে খেলতে নামলেন রণজী এবং দেখা গেল তিনি ১৭৮ রাণই করেছেন। সবচেয়ে মজার খবর হলো এই যে, প্রায় দু' হাজার পাঠক ঐ একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো। তখনকার দিনে রণজীর অসামান্য জনপ্রিয়তার এইটিই নিদর্শন।

ঠিক সেই সময়, অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে এক তরুণের খেলা দেখে লোকে তাঁর সম্বন্ধে বলাবলি আরম্ভ করেছে। তরুণটি চেহারায় খাটো, রোগা, কাঁধ ছুটো সরু। তার গোড়ার দিকের খেলা দেখে গোড়ার দল বলেছিল: ভিক্টর ট্রাম্পারের ব্যাটিং আকস্মিক দীপ্তি আছে মাত্র, শীঘ্রই তা নিভে যাবে। ইংলণ্ড তার মাঠে ট্রাম্পারের খেলা দেখালো ১৮৯৯ সালে। অষ্ট্রেলিয়া দলে শেষ মুহূর্তে দলভুক্ত হয়ে এসেছেন তিনি। বিশিষ্ট কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া ট্রাম্পারকে চিনতো না কেউ। ভ্রাম্যমাণ টিমের লভ্যাংশের অর্ধেক পাবার সর্তে তিনি দলে যোগ দেন। ইংলণ্ডের খেলার মাঠে ট্রাম্পার যেন আগুন ছড়িয়ে দিলেন, দলে দলে লোক আসতে লাগলো তাঁর খেলার টানে এবং শেষ পর্যন্ত দলের কর্তারা তাঁকে অন্যান্য খেলোয়াড়দের মত সমান অংশীদারের মর্যাদা দিলেন লভ্যাংশে।

মূলতঃ তাঁর খেলা ছিল আক্রমণাত্মক। আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ ছিল তাঁর একান্ত শেষ কথা। পিচ-এ নেমেই একেবারে শিকারী প্যান্থারের মত আক্রমণ চালাতেন। তাঁর ভাঁড়ারে সব রকম মার ছিল এবং ইচ্ছামত তা প্রয়োগ করতেন। কখনও কখনও দেখা যেতো, একই ধরণের বলকে বিভিন্ন মারে খেলছেন। এইভাবে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে বোলিংকে শাসনে আনার শক্তি তাঁর আছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে ট্রাম্পার যখন অকালে মারা যান। ক্রিকেট দর্শকরা—তাঁর সেই অনন্য খেলা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোকে মুহ্যমান হয়েছিল।

রণজী এবং ট্রাম্পার,—দুজনেরই খেলার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু মাত্র রাণ তোলার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে বা পিছিয়ে খেলতেন দুজনই। ট্রাম্পারের ব্যাটে ধার ছিল, এবং তাঁর ব্যাট চালনা ছিল তলোয়ার চালনার মত তীক্ষ্ণ ও আক্রমণাত্মক। কিন্তু রণজী ছিলেন যেন নিপুণ যাদুকর; বোলারদের প্রলোভন দেখিয়ে পরে নির্মমভাবে তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত করতেন। বলা বাহুল্য তাঁরা উভয়েই একটা বিশেষ যুগে ক্রিকেট জগতে সম্রাটের আসন অধিকার করে নিয়েছেন। সে সম্মানিত আসন থেকে আজও তাঁরা বিচ্যুত হন নি, এবং টেষ্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁদের দান যুগে যুগে এবং দেশে দেশে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যে কোনও পরিমাণ
চাউল
বাড়ীতে
পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।
পশুপতি দাস
এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
৪৩।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪
ফোন: ২৪-৪৩৮১

চলচ্চিত্রের কাব্যরূপ

বর্তমানে আমরা একটা কুয়াশার মধ্যে বাস করছি, এবং সে অস্পষ্টতা থেকে নির্গত হওয়ার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছি। হয়ত এ কুয়াশার চেহারা পুরোপো নয়—যে কোনো জাতির জীবনেই এ কুয়াশা আসতে পারে। তারপর শীতের রিক্ততার পর বসন্তের নবকুরোদ্গমের মতই জাতির জীবনে নবজাগরণ আসে।

ও সে যাই হ'ক, এ কুয়াশার ছাপ শিল্প সাহিত্যেও পড়া উচিত। সাহিত্যে অবশ্য এর অস্পষ্টতার চেহারা খুবই প্রকট। সংগ্রামী মানুষ হতাশ মনোভাব নিয়ে শুধু ছুটে ছুট করছে, কিন্তু কোন আলোর সন্ধান পাচ্ছে না—এমন একটা আচ্ছন্নতায় জীর্ণ হয়ে আমাদের সামনে একটা স্থবির সমস্যা নিয়ে দাঁড়িয়েছে এযুগের সাহিত্য। আমরা তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের অন্তর্লোক থেকে একটু জিজ্ঞাসা খোঁজবার চেষ্টা করছি। আমরা বিফল হয়েছি, তাই স্পর্ধার কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।

কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের ওপর এই আচ্ছন্ন জীবনযাত্রার প্রভাব খুব স্পষ্ট নয়। আজও আমাদের চলচ্চিত্র নীতি-নির্ভর্তিক। সনাতনী ঢঙে শুভ-অশুভ দ্বন্দ্ব এবং অন্তে নিশ্চিতভাবে অশুভ ইচ্ছার পরাজয় ঘটিয়ে এ দেশের চলচ্চিত্র নৈতিক শুচিতা বজায় রাখে। আমরাও নিশ্চিন্ত হই একটা মর্য্যাল খুঁজে পেয়ে। এখানে জীবন-সংগ্রামের রূপটি হয় অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং কাহিনীর সবটাই হয় নিছক ঘটনা। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে আতনাটকীয় ভাবে কাহিনী শেষ করা হয়। চরিত্রগুলো আনুগত্য-বোধে নির্জীব হয়ে যেন ঘটনার নির্দেশ পালন করে কিন্তু শিল্পের রূপ নেয় না।

অথচ চলচ্চিত্রের ক্ষমতা কোথাও সীমাবদ্ধ নয়। অতি আধুনিক মানুষের যে অস্পষ্ট মানসিকতা, ইমেজ-এর সাহায্যে সেটুকুও নিপুণভাবে বলা যায়। সুদক্ষ পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান অত্যন্ত অনায়াসেই মানবমনের প্রতিটি ভাবনা অন্বেষণ করতে পারেন—মানব চরিত্রের সব রহস্যময়তা প্রকাশ করতে পারেন নিতান্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাষায়। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে অথবা ক্ষুদ্রতম রূপকের সাহায্যে সুদক্ষ রূপকার শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনা দিতে পারেন, যার প্রভাব হয় অত্যন্ত দুঃস্পর্শ। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বিপুল সম্ভাবনা আজ আর কারও অজ্ঞাত নয়, তাই দেশে দেশে নানাভাবে এই সম্ভাবনার ওপর পরীক্ষা চলছে।

সাম্প্রতিকালের অনেক সমালোচকের চোখেই চলচ্চিত্রের এই কাব্যরূপটি খুব স্পষ্ট। বিংশ শতাব্দীর যে অধ্যায়ে আমরা বর্তমানে বাস করছি, সে অধ্যায়টির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের তুলনা করা চলে। এই সংগ্রামক্ষেত্রে আমরা নিরন্তর সংগ্রামরত। এই সংগ্রাম কোথাও স্থূল জীবন যাপনের সংগ্রাম, আবার কোথাও মানসিকতার সংগ্রাম। একটা বিশেষ অবস্থা বা সভ্যতার সঙ্গে আপোষ না করতে পারার দরুণ, তীব্র যন্ত্রণাময় মানসিকতার উদ্ভব হয় এই সংগ্রাম থেকেই। অবশেষে আভ্যন্তরীণ এই সংঘর্ষের অন্তর্ভূত তীব্র হওয়ার জন্য অকস্মাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে একটা বৃহৎ রিয়ালাইজেশন যার নাম Intellectual Realization.

চলচ্চিত্রে এই রিয়ালাইজেশন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে তুচ্ছতম ক্রিয়া ও ইমেজএর সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় করার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা আছে বলেই আধুনিক কাব্যসমালোচকদের মতে '...Cinema is an admirable metaphor for us to choose when we come to discuss modern poetry.' [Key to Modern Poetry—Lawrence Durrell] বস্তুত, আধুনিক কাব্যের চিত্রধর্মিতা এবং অসংখ্য রূপকাবয়ন এবং পরিশেষে একটা রিয়ালাইজেশন এ উপস্থিত হওয়ার শিল্পরীতিটি একমাত্র চলচ্চিত্রেই দেখা যায়।

সুতরাং যে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে আমরা বর্তমানে নিবিষ্ট, তারই প্রোজ্জ্বল রূপরেখা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পেলে আমরা খুশি হই। হয়ত চলচ্চিত্রের এই নবতম রূপায়ণ অনেকাংশে দুর্বোধ্য। এমন কি এই নবতম রূপায়ণে আমাদের অনেকদিনের সযত্ন লালিত নীতিবোধটিও পদে পদে প্রহৃত হতে পারে। তবুও আমাদের ভাল লাগবে, কারণ আমরাও এই কুয়াশার আবরণে অস্পষ্ট, এবং কোন একটা রিয়ালাইজেশন-এ উপস্থিত হতে এখনো আমাদের অনেক পথ পরিক্রমণ বাকী।

—রবি গুপ্ত

BUILDING MATERIALS,
PAINTS: HOUSEHOLD & INDUSTRIAL
HARDWARE,
BRUSHES,
Chandi Charan Nayak Private Ltd.
124/1, BOWBAZAR ST. CALCUTTA-12
PHONE: 34-3574, 75
MINERALS,
CHEMICALS, OILS,
TEA GARDENS, MILLS,
AND COLLIERY REQUISITES ETC.

রেলওয়েই আপনার দোরগোড়ায় মাল দিয়ে যেতে পারে

বাড়ী বাড়ী গিয়ে মাল নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পূর্ব রেলওয়ে করেছে কলকাতায় তা অনুসৃত হচ্ছে। সাধারণ ভাড়ার উপর সামান্য কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে আপনিও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। রেলওয়ের অনুমোদিত কন্ট্রাক্টর মেসার্স রোড কেরিয়ারস্, ২০, মল্লিক ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭ (টেলিফোন নং ৩৩-৬৮৮৬ এবং ৩৩-৭০২৯) অথবা হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট চব্বিশঘণ্টা আগে খবর পাঠালে তাঁরা মাল পাঠাবোর বা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যদিনে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেবার এবং সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত মাল নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ রবিবার এ সুবিধা পাওয়া যায়না, তবে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে রবিবার শুধুমাত্র পচনশীল মাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। কোন মালের ক্ষেত্রে বুক করার সময় বাড়ীতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ যদি না থাকে এবং প্রেরক যদি পরে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চান, তবে অনুমোদিত কন্ট্রাক্টরের কাছে আবেদন করলে রেলওয়ের ডুপ্লিকেটে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

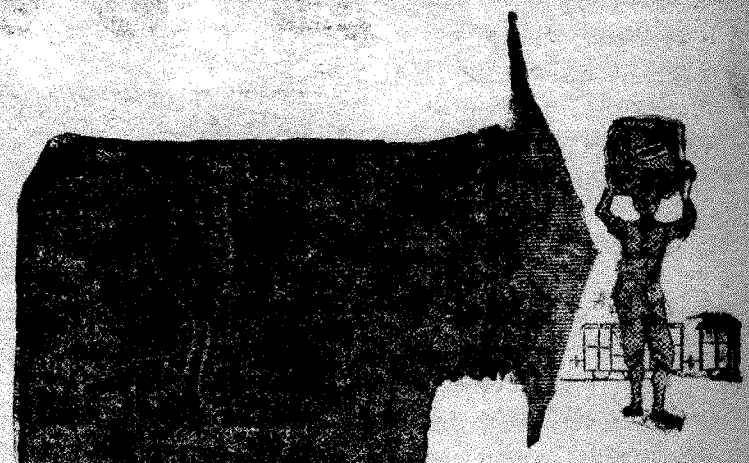

S স্ট্রীট
C কালেকসন য়্যাণ্ড
D ডেলিভারী
সার্ভিস

নীচের কার্ডটি আপনার বিশেষ সহরের সন্ধান এই ব্যবস্থা চালু

খিদিরপুর
বালিগঞ্জ
বেলিয়াঘাটা
শ্যামবাজার
টালিগঞ্জ
পার্ক ষ্ট্রীট
বৌবাজার
কাশীপুর

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নে সন্ধান করুন :

(১) চীফ পার্শেলস্ য়্যাণ্ড লাগেজ ইন্‌স্‌পেক্টর, হাওড়া (পার্শেল ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৬৬-৩৬১১

(২) ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ (পার্শেল ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৩) গুডস্ ইন্‌স্‌পেক্টর, হাওড়া (গুডস্ ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৬৬-৩৬৫৬

(৪) গুডস্ য়্যাণ্ড ইয়ার্ড সুপারভাইজার, শিয়ালদহ (গুডস্ ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৫) চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর অফিস ৭, কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১ টেলিফোন নং ২৫-৬২৪১

(৬) সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার

পূর্ব রেলওয়ে

"অগ্রগামী"র "নিশীথে"

প্রয়োগ-গত বিশিষ্টতার ও চিত্র-কল্পে, শিল্প বিন্যাসে ও দৃশ্যধর্মিতায় চলচ্চিত্র যে সাহিত্য নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র শিল্প, চিত্র পরিচালকের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি, এ বোধ অধিকাংশ চিত্র সমালোচকদের কাছে এখনও সুস্পষ্ট নয়। তাই অগ্রগামী প্রযোজিত ও

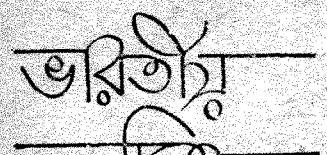

পরিচালিত "নিশীথে একটি সাহিত্য ধর্মী' ছবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছবিটির শৈল্পিক সার্থকতার অন্বেষণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে' গল্পটির নতুন করে আস্বাদ গ্রহণে।

অতি প্রাকৃত পরিমণ্ডলে (macabre atmosphere), সূক্ষ্ম ও জটিল মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, রসে ও রহস্যে সমুজ্জ্বল এই রবীন্দ্র কাহিনীর চলচ্চিত্রিক সম্ভাবনা অনস্বীকার্য ও অসীম। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সংগে অগ্রগামী গোষ্ঠী এই দুরূহ কর্ম ব্রতী হয়েছেন। দাক্ষিণাচরণ ও নিরুপমার মিষ্টি কোমল দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশ রচনা ও নিরুপমার মৃত্যুর পর এই স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অতি স্বাভাবিকতায় (super natural) কাহিনীর উপস্থাপন কয়েকটি সুন্দর ইমেজ ও ব্যঞ্জনাময় প্রতীকের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট করা হয়েছে।

পরিচালনা প্রক্ষেপনের পূর্বে শ্বাস কষ্টের আওয়াজ, স্পষ্ট শব্দ ও ধ্বনির ব্যবহারে যে সংযোজন সৃষ্টি করা হয়েছে। তা মূল ধারের পরিস্ফুটনে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। যেমন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্যে (এলাহাবাদের পথে দাক্ষিণাচরণ ও মনোরমার টাঙ্গার সান্ধ্য ভ্রমণ, যমুনার ধারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য) আলোকচিত্র শিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্তের ক্যামেরার নিপুণ প্রয়োগ প্রকাশ পেলেও তা ছবির সামগ্রিক বিচারে গভীর কোন তাৎপর্য বহন করে না। নিরুপমার মৃত্যু দৃশ্যে বিষের তীব্র জ্বালা, অব্যক্ত বেদনা ও জীবন-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সুপ্রিয়া চৌধুরীর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটে উঠলেও দৃশ্যটি অনাবশ্যক দীর্ঘ হওয়ায় দর্শক মনে আবেদন খুব সহজ হয় না। কাতিয়ে ব্রেঁসা যাকে বলেছেন "The decisive moment" সেই প্রকৃত মুহূর্তটি হারিয়ে গেছে অথথা প্রতীকের ব্যবহারে। নিরুপমার ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে অনাবশ্যক ভাবপ্রবণ। দ্রুত ও সূক্ষ্ম সম্পাদনায় এ ছবি আরও সার্থক, আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারতো। রীতি কৈবল্যের ব্যর্থ প্রয়াস অত্যন্ত প্রকট ও পীড়াদায়ক। আরতি মুখোপাধ্যায় গীত ছুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছবিকে আরও মন্থর করে তোলে ও নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়।

ভালোবাসায় উজ্জ্বল, যন্ত্রণায় ম্লান নিরুপমার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় দর্শক মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি সার্থক অভিনয় করেছেন। ভালোবাসার দ্বন্দ্বে ও বিবেকের দংশনে দীপ্ত দাক্ষিণাচরণের ভূমিকায় উত্তমকুমার প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে 'ডন' আবৃত্তি শ্রুতিকটু ও পীড়াদায়ক। নন্দিতা বসুর অভিনয় তাঁর বাচন ভঙ্গীর মতোই স্বাচ্ছন্দ্যহীন ও আড়ষ্ট। রাধামোহন ও গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

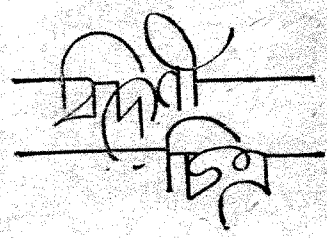

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালে ভারতী চিত্রগৃহে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিড' প্রদর্শিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যে ক্লাব অফ ক্যালকাটা ম্যাগেষ্টিক চিত্রগৃহে পর জার্মাণীর বিখ্যাত চিত্র "ষ্টার্স" প্রদর্শনের আয়োজন করেন।

'দি কিড' (১৯২১) চ্যাপলিনের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র। ছয় রীলের এই ছবিটির একটি প্রধান ভূমিকায় পাঁচ বছর বয়স্ক জ্যাকি কুগান অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সহজ মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ 'দি কিড' চ্যাপলিনের পরবর্তীকালের

শিশির সেনের
উপন্যাস পড়বেন যখন আধুনিক উপন্যাস
সম্বন্ধে ধারণা করবেন
আনন্দ নিকেতন ৪·৫০
আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক এন. এন. চৌধুরী: রাধাবাবুর শেষের কবিতার পর এমন বই পড়েছি বলে তো মনে হয় না।
একটি ফুল দুটি নায়ক ৩·০০
নৃপতির বলেন: সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিশির সেন সে দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নাই, একথা বলতে পারিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছি।
বংশ শতাব্দী ২·০০
অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন: সবচেয়ে বড় কথা জীবনের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় আছে।
কানে কানে কাহু তোরে ২·০০
নাট্যকার মন্মথ রায় বলেন: আজকের উপন্যাস রাজনীতিকে বাদ দিয়া শুধু 'মন দেওয়া নেওয়া'র রমাকাহিনী হইলে মনে কোন সাড়া জাগে না। গণতন্ত্রীয় শাসনযন্ত্রে যেসব গলদ দেখা দিতেছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আপনি কানে কানে কাহলেও সোচ্চার হইয়াছে এবং নায়কের জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে উহাই আজ আমাদের চিন্তার খোরাক।
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২
ফোন নং ৩৪-৩৮৯৬

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ায়
কাটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্মরোগে মলমা-চারমিন
এ, আর, সি, এল, লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

মিহির সরকার এণ্ড মনোহর সরকার

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ঃ কারখানা ঃ
৫২এফ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট,
ভবানীপুর, কলিঃ-২৫

ফোন ঃ
৪৭-৬২১১

ঃ শো রুম ঃ
২০০।২সি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

গ্রাম ঃ
সভারিণ

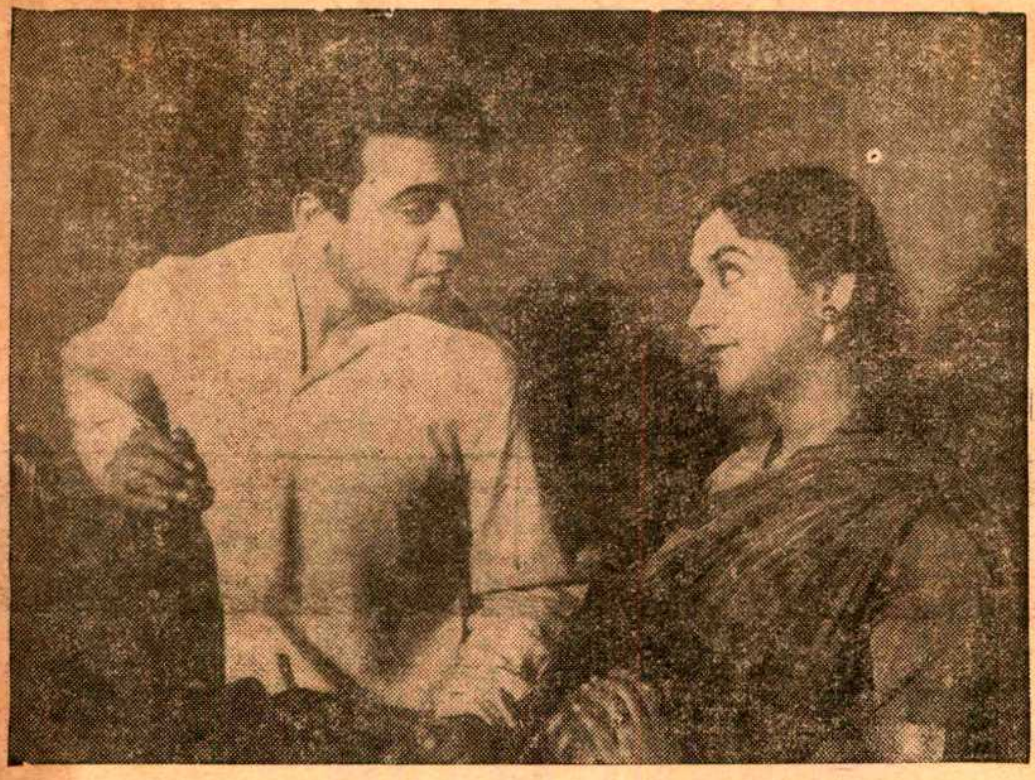

উত্তমকুমার প্রযোজিত "ভ্রান্তি বিলাস"-এর একটি বিশেষ দৃশ্যে—উত্তমকুমার ও সন্ধ্যা রায়

সৃষ্টির সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও শিল্প-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে প্রথম যুগের ছবি হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি পরিত্যক্ত শিশু ও সংগ্রহশীল পালক পিতার সম্পর্কের বিকাশকে উপলক্ষ্য করে বর্ণিত এই সাধারণ কাহিনীটি চ্যাপলিনের কল্পনার সাবলীল ও সুসংহত প্রকাশ। বাস্তবতা কাহিনী চিত্রায়ণের ভিত্তি হলেও প্রতীকের ব্যবহার অনস্বীকার্য। সুঅভিনয় ও গতি ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ। নির্বাক যুগের যে সব ছবি এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিবেশিত হচ্ছে তার অনেক ক্ষেত্রেই সংগীত সংযোজন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। 'দি কিড'-এর সংগীতও সুপ্রযুক্ত নয়।

* * *

কনরাড উলফ পরিচালিত "ষ্টাস" চিত্রটি ১৯৫৮ সালে পূর্ব জার্মাণী ও বুলগেরিয়ার মিলিত উদ্যোগে প্রযোজিত হয়েছিল। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রশক্তি যখন মনুষ্যত্বের অবমাননাকর এক সর্বনাশা নীতি অনুসরণরত, মানব ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ে অনির্বাণ দীপশিখার মত একটি আত্মা মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছে এবং মুক্তি খুঁজেছে প্রেমের মধ্যে। পরিচালক সেই প্রেমের এক প্রদীপ্ত রূপ এই ছবিতে এঁকেছেন। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে একক একজন ব্যক্তির সংগ্রামও যে মূল্যহীন নয় সেই অমোঘ বাণীর চিত্ররূপ "ষ্টাস"। পুডভাকিন ও দভজেঙ্কোর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালের সহযোগী উলফ জাতিতে জার্মাণ হলেও রুশ চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ মানবিক ঐতিহ্যের ধারক।

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

With best compliments of :

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly Kesoram Cotton Mills Ltd.)

Manufacturers and Exporters of

Cotton Textiles of all Varieties, such as

Greys	Long Cloths	Mulls
Poplins	Supetior Leons	Shirtings
Prints	Coatings	Dhoties
Sarees	Flannels	Towels
Tapestries	Hosiery	Web Cloth

and Stockinettes.

LARGEST TEXTILE MILL IN INDIA

Mills :

42, Garden Reach Road, Calcutta-24.

Phone : 45-3281 (4 lines)

Grams : "SPINWEAVE"

Regd. Office :

15, India Exchange Place, Calcutta-1.

Phone : 22-3411 (16 lines)

Grams : "COLORWEAVE"

Managing Agents :

BIRLA BROTHERS PRIVATE LTD.

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 21st March, 1963
Phone : { 34-3489 / 34-3488 Gram : "BASUMATI" Price : 25 nP.

লিলির
রিচ
নোনতা
বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সাপ্তাহিক বসুমতী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
28. 3. 63

কম্যুনিষ্ট চীনে চিন্তা-নিয়

৬৭ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা
বৃহস্পতিবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৯ ব

বোরোলীন
ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে
বোরোলীন হাউস • কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গের আধুনিকতম
ও
অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

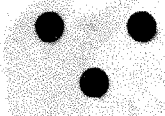

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন
কলিকাতা—১১
ফোন ৩৪-৩৩৫৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সম্পাদকীয়	...	৫
২। আজকের মানুষ	...	৬
৩। সহর কলকাতা	...	৭
৪। দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৯
৫। বঙ্গদর্শন	...	১২
৬। কবিতা	...	১৪
(ক) অন্বয়	হরপ্রসাদ মিত্র	
(খ) শোন তবে তুই	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
৭। মন-মরীচিকা (গল্প)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৫

—উপন্যাস—

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের
কুমারী ধরম ৫·৭৫

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালোচোখের তারা ৩·৫০

প্রমথনাথ বিশীর
যা হলেও হতে পারতো ৩·৫০
নীলবর্ণ শৃগাল ৪···
বাংলার কবি ৪···

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস
লাল পাথর ৩···
সমান্তরাল ৩·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
জানালার ধারে ৪···

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫·৫০

প্রবোধ সান্যালের
এক বাঙালি কথা ৪···
গল্প সঞ্চয়ন ৪···
বন্দীবিহঙ্গ ৩·৫০ জনতা ৩···

অভিযাত্রীর উপন্যাস
অনির্ব্বাণ শিখা ৫···
নষ্টচন্দ্রের আলো ৬···

জগদীশচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস
যাত্রিদল ৬·৫০

শ্রীবাসবের উপন্যাস
একাকার ৫···
শ্যাওলা ২·৫০

—নাটক—
স্বামী বিবেকানন্দ (অভিযাত্রী) ২·৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) ২···
লক্ষহীরা (মহেন্দ্র দত্ত) ২·৫০
পান্থশালা (রমেন লাহিড়ী) ২·৫০
চাঁদির কৌটা (উৎপল দত্ত) ২···
সন্তান (বাণীকুমার) ৩···
পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী) ২···
সূর্যমুখী (প্রশান্ত চৌধুরী) ২···
প্রত্যাবর্ত্তন ২··· লাল পাথর ২·৫০
অনাথ (সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২·৫০

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০···
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ৮···

অশোক গুহের অনূদিত
নগরীতে ঝড় ৫···
বনেদী ঘর ৩·৫০

যোগেশচন্দ্র বাগলের
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬···

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪···

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বাংলা সাহিত্যে একাদক ৪·৫০
সাহিত্যের স্বরূপ ২·৫০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
তরুণ বাংলা ২···

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাগার পরিচালনা ২·৫০
জটাশিবতলার ঘাটে ৩·৫০
শয়তানের জলা ২···

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৮।	আন্তর্জাতিক	...	২৫
৯।	কম্যুনিষ্ট চীনে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ	হিরণ্ময় কার্লেকর	৫৮
১০।	ভ্রান্তিবিলাস	শান্ত রক্ষিত	৩২
১১।	বিবেকানন্দ ও বেদনা	নীলকণ্ঠ	৩৫
১২।	আমাদের প্রতিবেশী	নলিনীকুমার ভদ্র	৩৭
১৩।	সংবাদ চিত্র	...	৪০
১৪।	কাগজে কলমে	হিমানীশ গোস্বামী	৪২
১৫।	রঙ্গজগৎ	...	৪৩
১৬।	খেলাধুলা	...	৪৫

প্রচ্ছদশিল্পী — প্রদীপ চৌধুরী

প্রকাশিত হইল !! প্রকাশিত হইল !!

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

মহাভারত

প্রথম খণ্ড — [আদি, সভা ও বনপর্ব্ব]

মূল্য ৮৲ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড — [বিরাট, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব্ব]

মূল্য ৮৲ টাকা

তৃতীয় খণ্ড — [দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্ব সহ]

মূল্য ৮৲ টাকা।

॥ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ॥

সেই বিখ্যাত ভাষাশিক্ষার একমাত্র বইখানি
বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাইতেছে

যাঁহারা পূর্ব্বে অর্ডার পাঠাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদের চাহিদা জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের আর এক অনন্য অবদান আত্মপ্রকাশ করিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা ইংরেজী শিখিবার—বলিবার—লিখিবার সর্ব্বজন পরিচিত ও সমাদৃত সহজ চূড়ান্ত গ্রন্থ

রাজভাষা

(স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত)

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিশু, কিশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজন ইংরেজী ভাষা শিখিতে, বলিতে ও লিখিতে পারিবেন।

বাঙলা দেশের মনীষী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

শিক্ষাপ্রণালীভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

নামমাত্র মূল্য তিন টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Thursday, 28th March, 1963
25 Naya Paise

756.3
.003/3
Ye.67 no.45

সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে

পশ্চিম বাঙ্গলার মত ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি নামধারী এত সভা, সমিতি ও সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় কিনা, সন্দেহ। এমন কোন সপ্তাহ নেই, যে সপ্তাহে অন্ততঃ কয়েকটি সাহিত্যসভার বিজ্ঞপ্তি চোখে না পড়বে। যদি কোন উৎসাহী সংখ্যাতত্ত্ব বিদ্ কোলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির একটা বিশদ সার্ভে করেন, তবে, আশা করি খুব চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজ মনের একটা কৌতুহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, শুধু 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'-মার্কা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও সারা দেশে অজস্র ক্লাব, সমিতি, ইউনিয়ন ইত্যাদি নামধারী অসংখ্য সংস্থা ছড়িয়ে আছে, যেগুলি বছরে একাধিকবার সাহিত্য বা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান করে থাকেন। এমন কি বিভিন্ন সরকারী আফিসের এবং কলকারখানার ক্লাবগুলি পর্য্যন্ত সাহিত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি থাকে—এই দৃশ্য বৃটিশ পরাধীন ভারতে দেখা যায় না। এই অজস্র অনুষ্ঠানকে তাকিয়ে মনে হয় যেন স্বাধীন ভারতবর্ষে বাঙ্গলা দেশের 'মনের দুয়ার' খুলে গেছে—যে বাঙ্গলা দেশ খণ্ডিত এবং রেফিউজি সমস্যায় জর্জ্জরিত। সম্ভবতঃ একমাত্র কেরলা ও দক্ষিণ ভারত ছাড়া এত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর কোথাও হয় না।

এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে, আমরা ধীশক্তিতে এবং শিক্ষায় ও মননশীলতায় খুব এগিয়ে যাচ্ছি? কিম্বা যে বাঙ্গলা একদা 'বাবু' বলে পরিচিত ছিল এবং আজও আছে, সেই বাবুয়ানারই এটা একটা মানসিক বিলাস মাত্র? শিক্ষায় ও ধীশক্তিতে বাঙ্গালী যে সারা ভারতে অগ্রসরমান নয়, তার প্রমাণ তার বিভিন্ন পরীক্ষার (সরকারী চাকুরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাগুলি সহ) ফলগুলিতে। বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীরা আজ সারা ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য নয়। এমন কি, রাজনৈতিক নেতৃত্বেও বাঙ্গালীর কোন পাত্তা নেই, সারা ভারতবর্ষে তার কণ্ঠস্বর নীরব। সাহিত্য যেমন সমাজ-মনের দর্পণ, তেমন রাজনীতিও সেই সমাজমনের প্রতিচ্ছায়া এবং এই প্রতিচ্ছায়ার দিকে তাকালে অনেক সময় প্রেতছায়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দক্ষিণ কিম্বা বাম, সর্ব্বত্র আজ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর নেতৃত্ব। অথচ বাঙ্গালীরা নিজদিগকে খুব ধীমান ও বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। কিন্তু যদি তাঁরা সত্যি ধীমান হয়ে থাকেন, তবে, এই নিকৃষ্ট নেতৃত্বের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন কি ভাবে?

আসলে বাঙলার সমাজ-মানসিকতা আজ কুয়াসাচ্ছন্ন। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির দিকে তাকালে বাহ্যতঃ মনে হবে যে, নতুন দিনের সূর্য্য বুঝি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে! কিন্তু নকল হীরের আলোর মত এগুলিও নকল সূর্য্যের ঝলকানি মাত্র। আপনি যদি এই সমস্ত সভা ও সম্মেলনের যে কোন তিনটিতে যোগ দেন, তবে দেখতে পাবেন যে, বাকী সবগুলিই এক সুরে বাঁধা এবং এক ছাঁচে ঢালাই করা। এমন কি সেই একই 'বিখ্যাত' ও 'প্রখ্যাত' ব্যক্তিগণ অত্যন্ত একঘেয়ে বাচন ও ভাষণের দ্বারা সংবাদপত্রের প্রোপাগাণ্ডার আসর দখল করে আছেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে এত সভা ও সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাহিত্য, কিম্বা সাহিত্যের নাম করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর খোসামোদ?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

লছম হোপ নামগয়াল

হোপ কুক

নিউইয়র্কের একটি মেয়ে। বয়স মাত্র ২২ বছর। রূপলাবণ্যে হাসিতে খুশীতে অপূর্ব্ব প্রাণোচ্ছল। ভারতীয় সৌন্দর্য্য-বিশেষজ্ঞরা ইউরোপীয় ললনাদের মধ্যে নমনীয়তার অভাব নিয়ে প্রায়ই যে অভিযোগ করে থাকেন তাতে যতটুকুই সত্যতা থাকুক, এই মেয়েটির ক্ষেত্রে সে অভিযোগ কিন্তু একেবারেই অসাড়। মিস হোপ কুককে যাঁরাই দেখেছেন তাঁরা সকলেই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করবেন। তিনবছর আগে দার্জ্জিলিংয়ে এসেছিল সে বেড়াতে। ছবি আঁকার দিকে তার খুব ঝোঁক। তুষারমৌলী কাঞ্চনজংঘার রূপ দেখে ২২ বছরের যুবতী পড়ল হিমালয়ের প্রেমে। ঘটনাচক্রে এই দার্জ্জিলিংয়েই একদিন এক ছুটির দিনে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল এক রাজকুমারের সঙ্গে। আমাদের দেশের মেয়েদের মতন মার্কিন রূপকথায় রাজকুমার-রাজকুমারীর গল্প দিদিমা-ঠাকুমার মুখ থেকে মিস কুক শুনে- ছিলেন কি না জানিনা। তথাপি নগাধিরাজ হিমালয়ের রূপলাবণ্যে মুগ্ধা বিদেশিনীর সঙ্গে প্রথমতঃ হিমালয়ের মত এক রোমান্টিক পরিবেশে—তারপর এক রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয়—সব মিলিয়ে এই দুইয়ের যা' স্বাভাবিক পরিণতি হবার তাই হোল। সিকিমের যুবরাজ গয়ালসে রিম্পোচে পালডেন থোণ্ডাপ নামগয়ালের (৩৯ বৎসর) সঙ্গে মিস কুকের শুভ পরিণয় গত ২০শে মার্চ্চ সুসম্পন্ন হয়েছে।

আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স কলেজ থেকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীমতী কুক এম, এ পরীক্ষা দিয়েছেন। এশিয়ান আর্টের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ।

প্রেম এমনই যা দেশ, কাল, জাতি ধর্ম্ম অথবা ভাষা সে কোন কিছুর বন্ধনকেই স্বীকার করে না, শুধু হৃদয়ের বন্ধন ছাড়া।

তাই সুদূর নিউইয়র্কের তরুণী মিস কু[illegible] হিমালয়ের দেশ সিকিমের ভবিষ্যৎ মহারাণী।

শহর কলকাতা

"কলকাতা সহরের মতই বিচিত্র, হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ ও ছন্দময় এখানকার কবিদের কাব্যরস"—সম্প্রতি কলকাতা পরিদর্শনে এসে বলেছেন আমেরিকার প্রখ্যাত কবি পল ইঙ্গল। আমেরিকা ছাড়ার পর আর কোন সহরে তিনি নাকি এত কবি ও সুধীজন সমাবেশ লক্ষ্য করেন নি। এ সহরে পৌঁছতে যদিও তাঁকে বিশ্ব-পরিক্রমা করতে হয়েছে, কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের ব্যবধান মন থেকে মুছে গেছে এখানকার জনসাধারণের সৌজন্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলেছেন যে, ধ্বনির ব্যঞ্জনা শুনে ও মূল কাব্য-রচয়িতাদের সঙ্গে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা আলোচনা করে আধুনিক বাংলা কবিতার রস গ্রহণে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন।

আমেরিকার কবির চোখে এ সহরের মাদকতা আকর্ষণীয় মনে হয়েছে বলে এশিয়ার অন্যান্য শহর ছেড়ে এখানেই তিনি সবচেয়ে বেশী দিন কাটাবেন বলে স্থির করেছেন।

"এখানে এসে আমি যে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছি, এই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ।"

দুই দেশের ভাব বিনিময়ে আগ্রহী হাসি খুশী, অমায়িক ও আন্তরিকতায় ভরা এই বিদেশী কবিকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই।

মধ্য কলকাতায় মার্কাস স্কোয়ারে ভীড় জমেছে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত এক প্রদর্শনীর আনন্দ মেলায়। প্রতি বছরের মত এখানে সম্মেলন সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন বসেছে। সুদৃশ্য তোরণের মধ্য দিয়ে ঢুকে বিচিত্র আলোক-সজ্জায় সজ্জিত স্টলের কাছে অনেক দর্শকের ভীড় চোখে পড়বে। কেউ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সন্ধানে, কেউ বা নিছক মনোরঞ্জনের প্রত্যাশায় এখানে এসেছেন। প্রদর্শনীর নানা আকর্ষণ ছাড়াও অন্যান্য বছরের মত একটি সুপরিকল্পিত মঞ্চক্ষেত্রে সংগীত, নাটক, যাত্রা নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। ভাবগাম্ভীর্য্যময় পরিবেশে সেদিন ধর্ম সম্মেলন হয়ে গেল। প্রতিদিন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন হাজার হাজার দর্শক নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুমহান অতীত ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে আসা বর্তমান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন।

দশ বছর ধরে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে অধিকতর আত্মসচেতন করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী। ভবিষ্যৎ বাংলার ভাবধারা যে বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠবে, তার পটভূমি রচনায় এই সংস্থার দান অনস্বীকার্য। আমরা এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

* * *

পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা সহরে কিছুদিন আগে ক্ষণস্থায়ী বসন্ত এসে রিক্ত ডালে ছিটে-ফোঁটা সবুজের আভাস ফুটিয়ে এখন বিদায় নেবার সুযোগ খুঁজছে। গলির মোড়ে পাঁচিলের গায়ে মাধবীলতা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে, ইট-কাঠের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো গাছের ডালে আমের বোল ধরেছে অজস্র। বসন্ত এসেছে, কিন্তু আমেজ লাগছে না মনে। পথে ঘাটে অহরহ জমে উঠছে আবর্জনার স্তূপ। হাইড্র্যান্টের জলের স্রোত অবাধে বয়ে যাচ্ছে কর্দমপিচ্ছিল ফুটপাতের ধারে। স্থানে অস্থানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা খাটালের নারকীয় পরিবেশ সহরের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলছে। প্রতিকার যার হাতে, সেই পৌর প্রতিষ্ঠান আজ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মত্ত হয়ে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত বলে "সিভিক সেন্স" অথবা নাগরিক চেতনাবোধকে মোটামুটি বিসর্জন দিয়ে আমরাও নির্বিকার চিত্তে 'মন্বন্তরে মরি নি আমরা, যারা

স্বর্গ কি হবে না কেনা ?

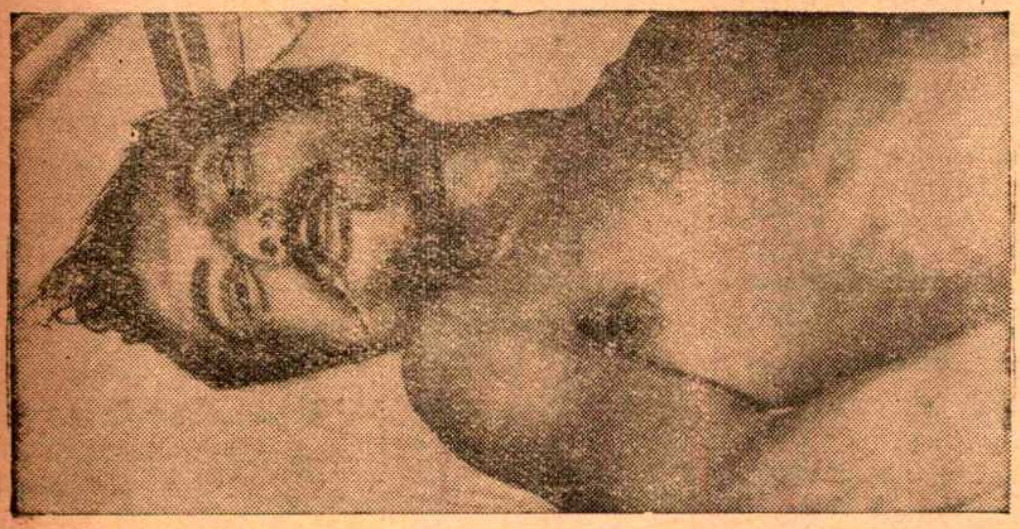

সোনার বাংলার স্বর্ণশিল্পী সুনীল কর্মকার।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির—'বলি'॥

য়ে ঘর করি'—এই পঙ্‌ক্তি স্মরণ
র গর্ব বোধ করি।

* * *

কলকাতার রাজপথে সেদিন এক
ন মিছিল চলেছিলো—শোকাহত
ক্ষ সজল অনেক মানুষের মিছিল।
মিছিলের একখানি মুখ জীবন
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চির-শান্তিময়
ঘুমে মগ্ন। বেঁচে থাকার মুহূর্তে
বেকার স্বর্ণশিল্পী সুনীল কর্মকার
হয়তো বুঝতে পারে নি বাংলা দেশে
তার এত আপনজন আছে। সোনার
সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন চুরমার
হওয়ার ব্যর্থ হতাশায় তাই সে তুলে
নিয়েছিলো বিষের পাত্র। একা
সুনীল কর্মকার নয়—হাজার হাজার
বেকার স্বর্ণ-শিল্পীদের কথা স্মরণ
করে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রথার সামাজিক
অথবা অর্থনৈতিক মূল্য বিচারের
অবকাশ সেদিন ঘটেনি। মিছিলের
দিকে চেয়ে কলকাতার প্রতিটি মানুষ
তিক্ত অভিজ্ঞতার পীড়নে রিক্ত হাতে
চলে যাওয়া একটি জীবনের প্রতি
সমবেদনায় অশ্রু বর্ষণ করেছে।
আমরা জানি—সেই চোখের জল
সোনার মতই নিখাদ।

ন্তের কোকিল

'তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ
ক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ
াস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে
হরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া
কতা আরম্ভ কর। আর যখন
ণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প
গে, তখন কোথায় থাক বাপু?
ন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে
ী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক,
ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার
-মাজা কালো-কালো দুলালি
ণের শরীরখানি কোথায় থাকে?
ন বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার
হ নও।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

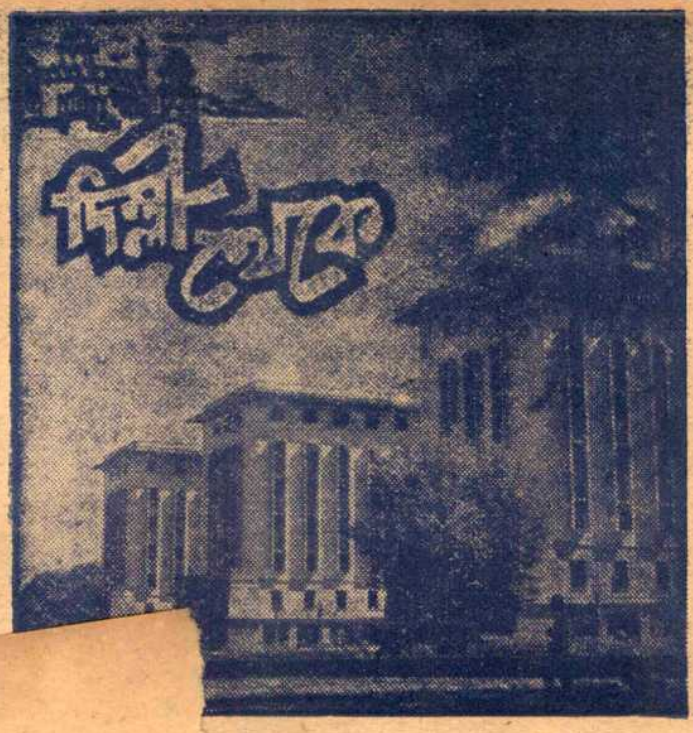

...রু, বুগরা খাঁ, সম্রাট
...র তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির
...ন বাংলাদেশের সাথে রাজধানী
...র যে মিলন গ্রন্থি বেঁধে গেছেন আজও সে বন্ধন অটুট রয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাংলার সাহিত্যকে দিল্লীর কস্‌মোপলিটন অধিবাসী শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখে। যাযাবর সাহেব তাঁর "দৃষ্টিপাতে" টেগোর রোডের উল্লেখ করে বলেছেন, কবির আপন প্রদেশেও এই সামান্য সম্মানটুকু দেখাবার পূর্বেই দিল্লীতে বিদেশী শাসক তাঁর নামে রাজপথের নামকরণ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও রাজধানী দিল্লী এ বিষয়ে গর্ব করতে পারে। ভারতবর্ষের ভিতর দিল্লীতেই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য নরসিংহ পুরস্কার ঘোষিত হয়। সমাবর্তন উৎসবে এই বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন ছাড়াও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাকে প্রতি বছর এক হাজার টাকার টোকেন পুরস্কার দেওয়া হয়। তা ছাড়া লীলা-স্মৃতি পুরস্কার ঘোষণা করেও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর বাংলাভাষায় গবেষণা করার সুযোগ সুবিধার ত্রুটি রাখেন নি। এবার লীলা স্মৃতি পুরস্কারের বিষয় হ'ল "১৮৭৫-১৯২৫এ বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার ইতিহাস।"

উল্লেখিত দু'টো প্রতিযোগিতাই ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। এ পর্যন্ত বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্টির জন্য যাঁরা নরসিংহ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ভিতর ছিলেন "যাযাবর", "সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব", মনোজ বসু ও শঙ্কর।

* * *

নিছক পুরস্কার ঘোষণাতেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যে গবেষণার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দেন নি। সাহিত্য সৃষ্টি তো আছেই কিন্তু যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়ে গেছে তার ওপরও গবেষণা করা প্রয়োজন। তাই বিশ্ব-কবির স্মৃতিতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন 'চেয়ার' খুলেছেন। রবীন্দ্র-স্মৃতি-অধ্যাপক হিসাবে যোগ-দান করেছেন ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। ডক্টর দাশগুপ্ত দিল্লীতে নবাগত নন। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসলেও পূর্বে দিল্লীর হিন্দু কলেজের সাথে ইংরিজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে জড়িত ছিলেন। এবার আমরা আশা করি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ওপর সুনির্ধারিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে গবেষণার আয়োজন হবে।

এ বিষয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট শতাধিক বাঙ্গালী শিক্ষক ও বিভিন্ন কলেজের পাঁচ শতাধিক বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী মিলে যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি খাড়া করেছেন তাঁদের দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়।

বছরে একটা করে বনভোজনের আয়োজন করে বা একবার করে সরস্বতী পূজোর আয়োজন করেই যেন তাঁদের সব উৎসাহ ও প্রেরণা শেষ না হয়ে যায়। বাংলা থেকে সহস্র মাইল দূরে বাংলা সাহিত্যের ওপর গবেষণা করার এ সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু একটা বিভাগ খুললেই তো সব কাজ শেষ হ'ল না। যে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে এ বিভাগটি খোলা হ'ল অগ্রগতির পথেও যেন সেই সে উৎসাহ অটুট থাকে।

* * *

রাজধানীতে বিবেকানন্দ-শত-বার্ষিকীর বর্ষব্যাপী আয়োজনের কথা গত সপ্তাহেই বলেছি। স্থানীয় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলির নীরবতার কথাও বলেছি। এ সপ্তাহে একটা বিশেষ ঘটনা আমার মনে বিশেষ দাগ কেটেছে। সেটা উল্লেখ না করে পারলাম না।

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দুঃখী যারা, দরিদ্র যারা, অবহেলিত, অশিক্ষিত যারা, আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা কোনোদিন জায়গা পেয়েছে কি? বোধ হয় না। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা" গলা ফাটিয়ে ফাইন আর্টস্ হলের নিয়ন লাইটের নীচে আবৃত্তি করে হাততালি কেনা খুবই সহজ কিন্তু একটা যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর শিয়রে বা কুষ্ঠব্যাধির রোগীর পাশে বসে তাদের সেবা করার শক্তি ক'জন সমাজসেবীর আছে? তাই বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দিল্লীর উদ্যোক্তাদের

যখন দেখলাম মিষ্টি খাবার হাতে দিল্লীর কুষ্ঠরোগী কলোনীতে গিয়ে দ্বিধাহীন ভাবে তাদের সেবায় রত হয়েছেন তখন তাঁদের সেবাপরায়ণতার উদ্দেশ্যে আমার মাথা স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে নত হয়ে এলো।

তাদের ভিতর বহু রোগীই সেদিন জীবনের সর্বপ্রথম সামাজিক নিমন্ত্রণ সভায় যোগদান করল। তাদের ভিতর যারা একটু আলোকিত তারা নিজেদের ভিতর উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করল। কেউ বা করল না। তারাও হাসতে জানে, তারাও উপভোগ করতে জানে। আনন্দের আতিশয্যে একটি কুষ্ঠরোগীর মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছিল না।

আমি বহুদূর থেকে দেখছিলাম তার কোটরাগত চোখ দু'টোতে টলমল করছে দু' ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। আমার যেন মনে হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতাব্দীতে এইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য!

* * *

নবযৌবনা কুমারীর মতন নিউ-দিল্লী দিন দিন বেড়েই চলেছে অবয়বে, প্রকৃতিতে।

নিউদিল্লীর নতুন কলোনীগুলোই যেন এক একটি ছোট ছোট শহর। বাজার, হাট, স্কুল, মন্দির, ডিসপেন্সারী সব যেন রাতারাতি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

বেশ মানায় কিন্তু। পুরোণো ভগ্ন প্রাসাদের পাশে নবীনা অট্টালিকা। তারাশঙ্করবাবু তাদের দেখলে 'জলসা ঘরের' আরও একটা এডিশন লিখতেন নিশ্চয়ই। প্রাসাদ-গুলোর সেই গৌরবময় দিনগুলো স্মৃতির অতলে মহাকালের সাথে মিলে গেছে। নতুন নতুন অট্টালিকা উঠেছে নতুন ডিজাইনে। নতুন কারিগর এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে নতুন প্ল্যান নিয়ে।

হাউসখাস, ওক্লার পথের দু'ধারে, কুতবমিনারের পথে জঙ্গলে গাছে গাছে যে সব পাখীর দল শত শত বছর ধরে বাস করে এসেছে তারা আজ কোথায় উড়ে গেছে। সে পাখীগুলোও নেই, সেই গাছগুলোও নেই। **সেখানে তৈরী হচ্ছে নতুন বাড়ী।**

দিল্লীতে পয়সা থাকলে বাঘের চোখ কেনা যায় কিন্তু বাসা পাওয়া অত সহজ নয়। সমস্যাটা আরও জটিল হবে যদি আপনি অবিবাহিত হন! তাই সরকারের তরফ থেকে তৈরী হচ্ছে 'নগর', 'পুরী', 'কলোনী'।

ধীরে ধীরে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির পথ তৈরী হচ্ছে। শত সহস্র নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ পুরম্-এ। হ্যাঁ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামেই ভারত সরকারের এই নতুন কলোনীর নামকরণ হ'ল।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে গঠিত এই কলোনীতে সব শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীই করবে একত্রে বসবাস। শ্রীরামকৃষ্ণ পুরমে তাই সব টাইপেরই বাড়ী তৈরী হচ্ছে।

গগনচুম্বী না হলেও নতুন সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলো বিল্ডিং এর আর্কিটেক্চার ও ডিজাইন বহু বিদেশীর ঈর্ষার উদ্রেক করবে। নব নির্মিত রবীন্দ্রভবন, রেলভবন, মানিক ভবন, অশোকা হোটেল, কৃষি-ভবন, উদ্যোগ ভবন, বিজ্ঞান ভবন, শুধু কারুকার্যেই নয়, ইকনমির দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছে। শুধু তাই নয়, অনেকগুলোতে আবার বিভিন্ন খ্যাতনামা চিত্রকারের তুলিরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

নয়া দিল্লীর এ নবরূপ যেন নতুন জাগ্রত ভারতের সিম্বল্—শুভ চিহ্ন!

মথুরা রোডের দু' পাশে শত শত কারখানার জায়গা নির্ধারিত রয়েছে। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ দীর্ঘ সাইন বোর্ডগুলো পড়তে পড়তে যখন যাই তখন নির্জন পথে যেন শুনতে পাই জাগ্রত নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির জয়গান। দু'পাশে ছোট বড় কারখানাগুলো খুললে অর্থনৈতিক জগতে দিল্লীর আসন আরও সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। সব দেখে মনে হয়, দিল্লী থেকে ফরিদাবাদ পর্যন্ত (আঠারো মাইল) একটা নতুন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ টাউন দাঁড়াবে।

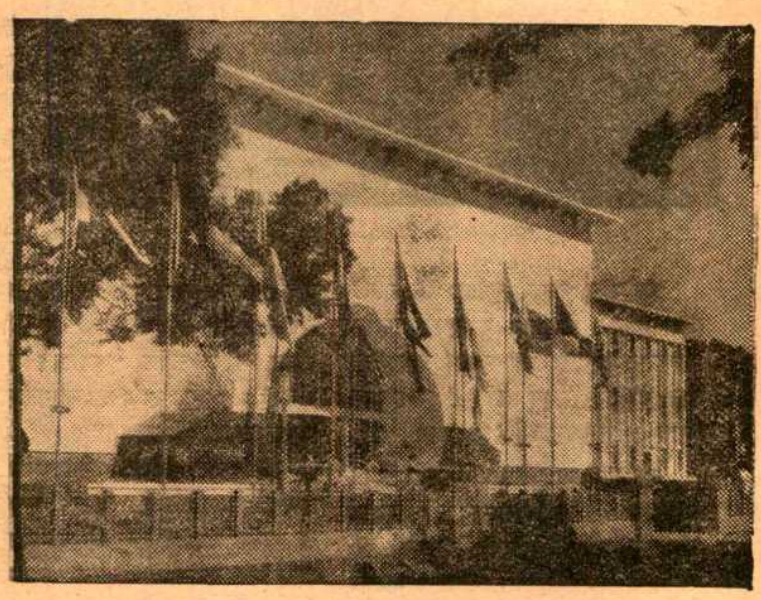

বিজ্ঞান ভবন, নিউ দিল্লী

অশোকা হোটেলের পাশে দাঁড়িয়েছে চাণক্যপুরী। সম্পূর্ণ নতুন পুরী। স্বাধীন ভারতে দেশ-বিদেশের ডিপ্লোম্যাটদের বাসস্থান। যেন একটা বিরাট শাল্মলীতরু, দূর দেশান্তরাগত পাখীদের নীড়। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ মৌর্যযুগের মনীষীশ্রেষ্ঠ চাণক্যের নামে অভিহিত এই নতুন কলোনীতে এসে আমি প্রায়ই আমার পঁচিশ বছরের দেখা নিউদিল্লীকে যেন ভুলে যাই। মনে হয় এ যেন নয়া দিল্লী নয়, একটা

নতুন দেশ। তখনই আবার নিজেকে নিজে ফিরে আসি। তাই তো! এই নিউদিল্লী তো সেই নিউদিল্লী নয়, এ তো বিদেশী শাসকের পদদলিত দেশের রাজধানী নয়, এ যে চল্লিশ কোটি জাগ্রত সন্তানের জন্মভূমির জীবন কেন্দ্র। এ যে স্বাধীন ভারতের রাজধানী নয়া নয়াদিল্লী। নতুন জীবন, নতুন প্রাণ, নতুন প্রতিশ্রুতির প্রতীক।

রাজধানীর রাজপথের যে জিনিষটা চট্ করে আপনার চোখে পড়বে সে হল রঙ্-বেরঙের ফুল। রাস্তার দু'ধারে, কখনও মাঝখান দিয়ে নানা রঙের ফুলের নৃত্য আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। অনেকগুলো ফুলই আপনার পরিচিত—জবা, করবী, টগর। বাংলা পল্লীর খালের পারের টগর, করবী, জবা, পদ্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারা সাজানো নয়, এরা সাজানো। মিউনিসিপ্যালিটির হর্টিকালচার বিভাগ থেকে লোক এসে নিয়মিতভাবে এদের তত্ত্বাবধান করে।

শুধু দিল্লীর পথে নয়, লাল কিল্লার ভিতরে দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ানই-আমের পুষ্প বাটিকাতেও আমি দেখেছি বাংলা দেশের নানা জাতীয় ফুল—টিপিক্যালি বাংলার ফুল। দেওয়ালের গা ঘেসে ঘেসে টগর, জবা, করবী যেন এ দূর দেশেও একটা রোমাঞ্চ জাগায় তাদের নৃত্যছন্দে। বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাসী সন্তানের মনে একটা উদাস ভাব জেগে ওঠে।

* * *

নির্দেশ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, সংস্কৃতি তো নয়ই। তবে কি সংস্কৃতির প্রগতিতে সরকারের কোনো হাত নেই? নিশ্চয়ই আছে—সেটা হল পৃষ্ঠপোষকতা। যেখানে ভাষাগত, আচারগত, কৃষ্টিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারায় একটা মূলগত ঐক্য রয়েছে সেখানে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজন যার হল কো-অর্ডিনেশন। এই বিভিন্ন ভাবস্রোত ও চিন্তাধারার মূল যে সাংস্কৃতিক উৎস তাকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে—নগরে প্রান্তে, গ্রামে গ্রামান্তে সর্বজনের সমক্ষে সমভাবে তুলে ধরতে

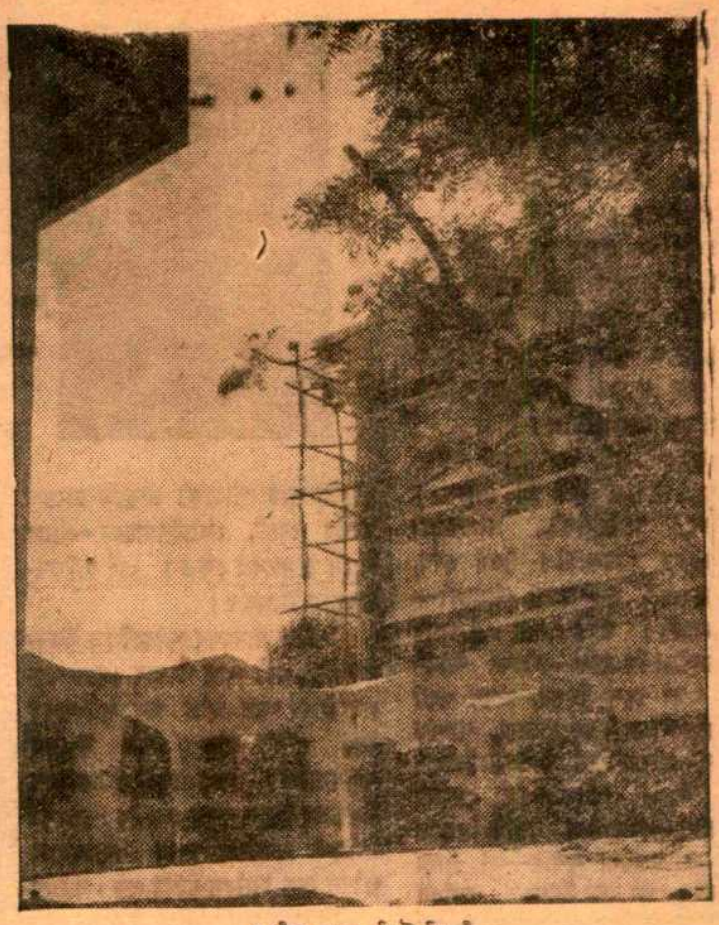

রবীন্দ্র ভবন, নিউ দিল্লী

হবে। রাজধানী দিল্লীতে তাই খোলা হয়েছে সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর প্রাণ-কেন্দ্র রবীন্দ্রভবন।

একদিন বিশ্বের দুয়ারে সত্য সুন্দরের যে মহান পূজারী ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিলেন, স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির সমবেত সমষ্টিকে একত্রিত করে যে পবিত্র মন্দিরে তাদের অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তার সাথে সেই মহাত্মার নাম জড়িত করে ভারতবর্ষ গর্ব অনুভব করছে।

সাহিত্য এ্যাকাডেমী, সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী ও ললিতকলা এ্যাকাডেমী বহুদিন পর্যন্ত নয়া দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রভবনে একযোগে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনটি এ্যাকা-ডেমীরই কাজের অনেক সুবিধা ঘটেছে।

পরিপার্শ্বটাও বেশ মনোরম। একদিকে খোলা মেলা ইণ্ডিয়া গেট, অন্যদিকে সঙ্গীত-ভারতী, সম্মুখে ভারত বিখ্যাত সপ্রু হাউস।

দিল্লীতে সব চেয়ে অসুবিধা হল যাতায়াতের। যাদের যানবাহন আছে তারা ভাগ্যবান। যাদের নেই—তাদের সংখ্যাই বেশী।

শুনেছি দিল্লীতে যত সাইকেল চলে পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে তার অর্ধেক সাইকেলও ব্যবহৃত হয় না।

তাই ট্র্যাফিক পুলিসদের বড় সমস্যা হল এই সাইকেল যাত্রীদের খোলা পথ দেওয়া। সাইকেল, কার, বাস, স্কুটার, টাঙ্গা সে এক মহান্ দৃশ্য। এই ট্র্যাফিক সমস্যা বেশ কিছুদিন থেকে ভারত সরকারের চিন্তার বিষয় ছিল। তাই আজকাল দপ্তরগুলোর কাজের সময় বদলে দেওয়া হয়েছে। মেইন্ মিনিষ্ট্রিগুলো বসবে সোয়া দশটা থেকে পৌনে ছ'টায়। অন্যগুলো সাড়ে ন'টা পাঁচটায়। গৃহ বধূদের আড্ডাতে একটু ব্যাঘাত ঘটলো।

বঙ্গদর্শন

হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলা—পশ্চিম বাংলার উত্তরখণ্ড। একদিকে নিষিদ্ধ রাজ্য ভুটানের পাহাড় হাতছানি দিচ্ছে, আর একদিকে একদিনের অতি আপন আজকের জ্ঞাতি শত্রু পাকিস্তান চরম বৈরিতা সাধনের সুযোগ খুঁজছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ আর সৌন্দর্যমণ্ডিত সীমান্তের এই জেলাগুলির গুরুত্ব আজ অপরিসীম। হিমালয়ের ওপার থেকে বন্ধুবেশী চীনের ছদ্মবেশ আজ খুলে গেছে। হিংস্র ড্রাগন তার থাবা উদ্যত করে রয়েছে।

বৈচিত্র্যমণ্ডিত উত্তরখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও কত না বৈচিত্র্য। নেপালী, আদিবাসী, রাজবংশী আরও কত অধিবাসী। ভিন্ন বেশ, ভিন্ন চেহারার তবু তারা বাঙালী—ভারতবাসী। তার প্রমাণ এখানকার অধিবাসীরা দিয়েছে—চীনের আক্রমণে যখন দেশ বিপন্ন, তখন গর্জে উঠেছিল পাহাড়ী জোয়ানেরা, পাহাড় আর সমতলে সেদিন কোন মতবিরোধ ছিল না। শান্তিপ্রিয় দেশের অধিবাসী—অস্ত্র নেই, প্রস্তুতি ছিল না শত্রুর মোকাবিলা করার—তা ছাড়া নিজেদের ছিল কত সমস্যা। সেদিন সব কিছু ভুলে গিয়ে বাংলার অধিবাসী গুর্খার সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে ধ্বনি তুলেছিল উপজাতি সম্প্রদায়ের জনসাধারণ "স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ"। পাহাড়ের চূড়া থেকে উত্থিত ধ্বনি দ্বিগুণ হয়ে উঠলো সমতলবাসী বাঙালীর কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে। সেদিন প্রমাণ হয়ে গেল কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় এক প্রাণ। একই সুর বেজে ওঠে সবার তন্ত্রীতে।

এই আমার দেশ আর দেশবাসী। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কোলকাতার সঙ্গে উত্তরখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পেয়েছি আমরা এক ফালি জমি। যোগাযোগের স্বল্পতা আজ নিশ্চয়ই মানুষকেও দূরে টেনে নিয়েছে।

গোটা ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও এই পশ্চিম বাংলার ক'জন চেনে এই উত্তরখণ্ডকে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ছায়া দিয়ে ঘেরা—শাল, শিশু, ঝাউয়ে ঘন বনানী—সেখানে বুনো হাতী আর গণ্ডারের মেলা। সংরক্ষিত বনে হরিণশিশুরা নির্ভয়ে বিচরণ করে। শীতের শীর্ণ তিস্তা বর্ষায় ভয়াল ভয়ঙ্কর, জলঢাকার সবুজ জলে বিদ্যুতের খেলা, খরস্রোতা ডায়না দু'কূলে আর পাহাড়ী ঢালুতে চায়ের থরথর বেণী, কোচবিহারের গ্রামে গ্রামে তামাকের ক্ষেত। এই পশ্চিমবাংলার উত্তরখণ্ড।

ব্রিটীশ আমলের অবহেলিত উত্তরবঙ্গ। চা, কাঠ আর তামাক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হ'ত শুধু সরকারের নয়, লাল হয়ে যেত ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কেউ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দিকে নজর দেয় নি। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যান্যদের জীবন ছিল আদিম যুগের মত। সাহেবদের আর তাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিদের করুণার উপর নির্ভর করতে হ'ত সাধারণ চাষীর। অন্যান্য রাজ্য থেকে আড়কাঠিরা ধরে নিয়ে আসতো আদিবাসীদের—চায়ের বাগানের এই কুলীদের জীবন যাপন করতে হ'ত মধ্যযুগের অবস্থায়।

দিনের পরিবর্তন হয়েছে। দেশ আজ স্বাধীন। সংবিধানে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আজ অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের নীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। কিছু কিছু কাজও হয়েছে কিন্তু সমস্যা এখনো বিরাট।

প্রথমেই ধরা যাক যোগাযোগের কথা। রেলপথ এমন কি বিমানপথেও আজ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। শিলিগুড়ি থেকে আসাম পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ করার কথা সরকারী ভাবে ঘোষিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে এই বিকল্প রেলপথ আর ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণের ওপর তার সমাধান অনেকটা নির্ভর করে। উত্তরবঙ্গের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ শীত-গ্রীষ্মে মোটের উপর মন্দ নয়। কিন্তু বর্ষায় যখন তিস্তা ভয়াল হয়ে ওঠে—ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুলি যখন উন্মাদিনীর মত দু'কূল ভাসিয়ে চলে তখন উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলই সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও নিয়মিত বন্যা উত্তরবঙ্গবাসীর জীবনে দুর্দৈব ঘটিয়ে থাকে।

বাগিচা-শ্রমিকদের অবস্থা ইংরেজ আমলের তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে বৈকি; কিন্তু সভ্য মানুষের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া আজো তা'দের কাছে স্বপ্নের বিষয়। আছে জমির সমস্যা। আধিয়াদের অত্যাচার। ভূমিহীনদের হাতে জমি দেওয়ার কাজ সুরু হয়েছে। কিন্তু ভূতপূর্ব জোতদারদের দুর্নিবার লোভ বেনামীর আড়ালে সরকারী পরিকল্পনাকে পদে পদে ব্যাহত করছে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি এখনো বাড়ছে না—সময় মত সেচের আর সারের অভাবে। একদিকে গভীর নলকূপ, কোথাও কোথাও পাহাড়ী ঝোরা থেকে জল নিয়ে এসে কোথাও বা খাল কেটে সেচের অভাব দূর করা যেতে পারে। সার সম্পর্কে চাষীরা আজো সচেতন নয়।

কোচবিহারের তামাক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক কোটি টাকা শুল্ক আদায় করে থাকেন, কিন্তু তামাক চাষের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কারও কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। প্রাণান্তকর "আষাঢ়ে অ ইনের" কবলে পড়ে তামাক চাষীরা ঘায়েল। যে তামাক কোচবিহার জেলার চাষীদের জীবনে নূতন জীবনস্পন্দন জাগাতে পারতো—

পরিকল্পনার অভাবে সেই তামাক-ই চাষীর জীবনে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়েছে।

উত্তরবঙ্গের অন্য একটি অর্থকরী সম্পদ তার বনাঞ্চল। দীর্ঘদিনের অবহেলায় বনাঞ্চলের ক্ষতিও হয়েছে অনেক, এতদিনে সরকারের দৃষ্টি পড়ায় নূতন বনীকরণ সুরু হয়েছে। কিন্তু বনবাসীদের জীবন নির্ভর করে ঠিকাদারদের দাক্ষিণ্যে। ভূমিদাসের জীবন আজো তাদের শেষ হয়নি।

দেশ বিভাগের ফলে ওপার থেকে চলে আসা মানুষের ভিড়ে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে চূড়ান্ত বেকারী। অথচ অজস্র উপাদান থাকা সত্ত্বেও শিল্পের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ আজ অবহেলিত। উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পই গড়ে ওঠেনি উত্তরবঙ্গে। কোচবিহারে যে ক'টি ছোট-খাট কারখানা মহারাজাদের আমলে সুরু হয়েছিল সেই সব কারখানার শূন্য ভবনগুলি আজ অতীতের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। একই অবস্থা জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ির। কোচবিহারে সিগারের কারখানা এবং কোচবিহার সহ অন্যান্য স্থানে কাগজের কল, চিনির কারখানা, চায়ের বাগানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কারখানা নির্মিত হতে পারে। বনসম্পদ ও নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এদিকে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা উপযুক্ত তথ্যাদি এখনো সংগৃহীত হয় নাই।

শিক্ষায় উত্তরবঙ্গের দৈন্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরও ঘুচলো না। দেশ বিভাগের ফলে উত্তরবঙ্গে এসেছেন কয়েক লক্ষ নিম্ন মধ্যবিত্ত। বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগানোই তাহাদের পেশা। কিন্তু উচ্চশিক্ষার দ্বার আজো উন্মুক্ত হয়নি। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে কলেজ আছে। কিন্তু অনার্স বা বাণিজ্য পড়াবার ব্যবস্থা নেই—অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। তাই সাধারণ লোক দূরের কথা, একটু স্বচ্ছল মানুষের পক্ষেও কোলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা প্রায় দুঃসাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সুরু হয়েছে বটে কিন্তু এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা কেটে ওঠেনি।

দার্জিলিং আর কার্শিয়াং-এর কথা বারান্তরে আলোচনা করার আশা রেখে কালিম্পং-এর দু'একটি কথা বলে আপাততঃ উত্তরখণ্ড পরিক্রমা শেষ করবো।

যে কোন নবাগতের পক্ষে কালিম্পং শহরকে মনে হবে বিষণ্ণ নগরী। তিব্বতের সঙ্গে পশমের ব্যবসায়ের উপরই প্রধানতঃ কালিম্পং-এর সমৃদ্ধি নির্ভর করতো। কিন্তু সেই পশমের ব্যবসা বন্ধ হওয়া শুধু নয়, কালিম্পং-এ বিদেশীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে এখানকার অন্যান্য ব্যবসাও অবলুপ্তির পথে। অথচ পাহাড়ীদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। অচল ব্যবসা, শিল্পে অনগ্রসরতা আর চাষের উন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় শুধু কালিম্পং শহর নয়, সমগ্র মহকুমাই আজ দুর্দশার পঙ্কে নিমগ্ন। দারিদ্র্য আর অনগ্রসরতা সমাজ জীবনকেও পঙ্গু করে ফেলেছে।

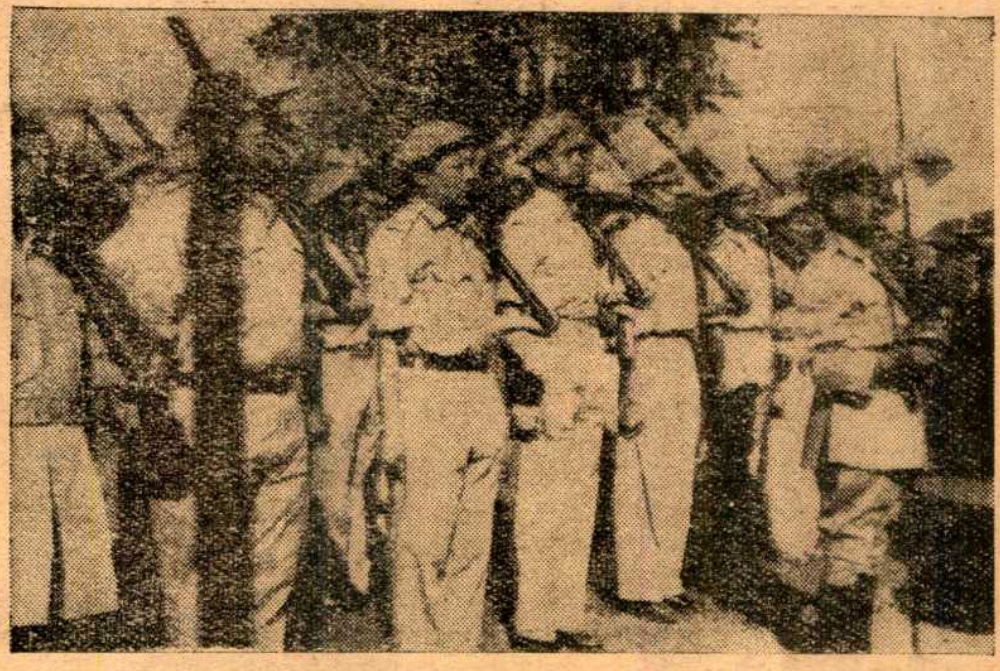

কালিম্পং-এর পাহাড়ী যোয়ানেরা চীনাদের মোকাবিলা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—রাইফেলসহ তাদের কুচকাওয়াজ।

শুধু পাহাড়ী শহর নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের আরও অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা আছে পৌর-উন্নয়নের, সমস্যা আছে সীমানা পুনর্বিন্যাসের। সমগ্র উত্তরবঙ্গেই মধ্যবিত্তের বৃত্তির পরিবর্তনের ফলে মানসিকতার পরিবর্তন দ্রুত সুরু হয়েছে। ফলে নানা সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতা

অন্বয়

এই ঝাপ্‌সা ধোঁওয়া ছবি, অবসন্ন বিকেল পেরিয়ে
প্রকাণ্ড নদীর স্মৃতি মনে এলো,
দুটি টি টি পাখি,
একটি তির্‌তিরে নৌকো,
পলি মাটি, শান্ত কিনারায়,—
কী অনুষঙ্গের খেলা
কেন এই দুর্বোধ্য সংযোগ ?

তেমনি এ-দিন থেকে চলে যাই
আরো নানা দিনে—
দেখি, শুনি, মগ্ন হই—
যদিও সে মগ্নতা অসার
হয়তো ভাবের ভরে
বৃথা সে মনেরই ভাব-চুরি।
কী অনুষঙ্গের খেলা
দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের দিকে—
রূপ থেকে রূপান্তরে
মর্ত থেকে মর্তের ও-পিঠে।

হরপ্রসাদ মিত্র

শোন তবে তুই

হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ ছুরি আমার বুক পিঠ
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে
হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।···তুই নাকি প্রেমিক!
ভালোবাসতে চাইবি আর ? শেয়াল শকুনেরে
যেমন ভালোবেসে দিলাম তোর রক্ত, হাড় ;
তেমন ভালোবাসবি ? প্রেম আবার দিবি। আর!

ব'লে উঠলাম রক্তে-ভাসা বুক দু'হাতে চেপে
'শোন তবে তুই, বিশ্বাসঘাতক!
ম'রে যেতে যেতেও আমি ভালোবাসছি ; তোর
সুমতি হোক, তোর সুমতি হোক!
এ প্রার্থনা তোর আর আমার দু'জনেরই মা
বসুমতি শুনছে, মূর্খ। তুই কী শুনিস না ?'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মন মরীচিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শাল আর মহুয়ার ফাঁকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যেতেই সুলেখা বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল।

ট্রেন আসছে। ন'টা সাতাশের ট্রেন এসে পৌঁছেছে দশটা কুড়িতে। এ লাইনে এটাই স্বাভাবিক। যাত্রীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাদের বেশীর ভাগই আসে বিহারের এই অখ্যাত নির্জন শহরে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায়। কাজেই ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক হ'লে তারা গ্রাহ্যই করে না। মাস-খানেক থেকে কোন রকমে শরীরটা চালু করে নেওয়া। যাতে আবার বছরখানেক শহরের ধাক্কা আর ধুলো সহ্য করতে পারে।

এর আগে বিশেষ এখানে কেউ আসত না; একমাত্র ব্যবসায়ীর ছুটকো ছাটকা দল ছাড়া। হরিতকির বন ইজারা নিতে, কিংবা শাল আর অর্জুন গাছের ঠিকেদারি। তারা জলবায়ুর ধার ধারত না। তাদের কাছে শরীর ঠিক রাখার একমাত্র ওষুধ নোটের গোছা। তাই আহরণ করে তারা ফিরে যেত।

কিন্তু বছরখানেক হ'ল ব্যাপারটা একেবারে ঘুরে গেছে। শহর থেকে মাইলখানেক দূর থেকেই শুরু হয়েছে তরঙ্গায়িত পাহাড়। রুক্ষ, ধূসর নয়, রীতিমত শ্যামল-শ্রী। অনেকটা সবুজ টোপরের মতন মনে হয়। তারই একটার খাঁজে একটা ঝর্ণা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ঝর্ণার জলে নাকি লোহা আর চুণের পরিমাণ এমন যে বদহজম আর পেটের অসুখের রোগীদের পক্ষে এক অঞ্জলি জল এক বোতল টনিকের কাজ করে।

খবরটা কাগজে বেরোতেই এদিক ওদিক থেকে দলে দলে যাত্রীর আমদানি শুরু হ'ল। নির্জন, নির্বান্ধব জায়গায় হোটেল হ'ল, অতিথিশালা হ'ল বেশ কয়েকটা মনিহারি দোকান, শহর নয়, তবে শহরের ছায়া পড়ল।

অবশ্য এ ভীড় বছরের সব সময়ে নয়। শুধু পুজোর কাছাকাছি মাস-দুয়েক। গ্রীষ্মে জলের চিহ্ন থাকে না, বর্ষায় মাটি মেখে গৈরিক হয়ে যায়, আর শীতকালে শহরের শীত-কাতুরে লোকগুলো এদিকে আসে না। শেষকালে কি নোটের অসুখ সারাতে এসে নিমোনিয়ায় ভুগবে।

সুলেখা আছে বছর আড়াই। আদিবাসীদের এক মিশনারী স্কুল। সুলেখা সেখানকার শিক্ষিকা। মাইনে

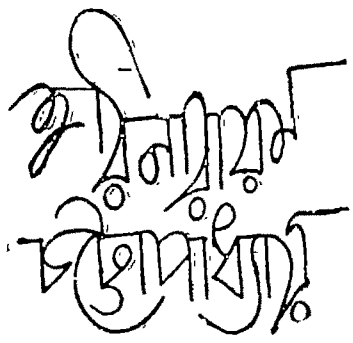

চলনসই, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, কিন্তু তবু সুলেখা নির্বিকার। হালচালে মনে হয়, এ জায়গা ছেড়ে সে বুঝি স্বর্গও কামনা করে না।

সত্যিই সুলেখা এমনই নিস্তরঙ্গ জীবনই চেয়েছিল। এমনই নিরুত্তেজ, এমনই গতানুগতিক। কাকডাকা ভোর থেকে শেয়ালডাকা রাত পর্যন্ত নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা প্রতিটি মুহূর্ত।

নিজের কথা ভাববার, নিজের দিকে লক্ষ্য করবার একটি অলস অনুপলও তার ছিল না। ভোর থেকে স্কুল যাবার জন্য প্রস্তুত, বিকেল পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পড়ানো, তারপর স্কুল থেকে ফিরে এসে সংগঠনের কাজ করতে হ'ত। পল্লীসংগঠনের কাজ। দরকার হ'লে মাঝে মাঝে ঘুরতেও হ'ত আদিবাসীদের পল্লীতে, পল্লীতে।

রাত সাড়ে দশটায় সুলেখা নিজের ক্লান্ত দেহটা যখন বিছানার ওপর ছেড়ে দিত, তখন তার আর কারো কথা ভাববার মতন মনের অবস্থা থাকত না। নিজের কথা তো নয়ই।

কিন্তু এতদিন পরে ঢেউ উঠল। ছোট্ট ঢেউ, কিন্তু সুলেখার বুকের তটে তটে শিহরণ জাগাল। মনের গভীরে আবর্তের সৃষ্টি করল।

পোষ্টকার্ডটা হাতে নিয়ে সুলেখা অনেকক্ষণ ভেবেছে। একটা পোষ্ট-কার্ডে শুধু লিখে দেওয়া, না। যে জীবন সুলেখা দু'হাতে সরিয়ে দিয়েছে, আর সে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার বাসনা তার নেই। বিশেষ করে এতদিন পরে, অতবড় ঝাপটার পর।

কিন্তু লিখতে গিয়ে সুলেখার খেয়াল হ'ল। উত্তর পৌঁছবার আগেই লোকটা রওনা হয়ে পড়বে। নিষেধের বার্তা তার কাছে পৌঁছবে না।

অবশ্য অসুবিধার কিছু নেই। সুলেখার বাড়তি একটা ঘর রয়েছে। একটা তক্তাপোষও পাতা আছে সেখানে। ফল, জল, চৌবাচ্চা সবই আছে। যা মাইনে পায়, তাতে সাধারণভাবে আর একটা মানুষের খোরাকও চলে যাবে। চলে যাবে, কারণ সুলেখার পিছন ফিরে চাইবার মতন তিন কুলে কেউ নেই। যেটুকু রোজগার করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনায়াসেই নিজের জন্য খরচ করতে পারে।

কিন্তু অসুবিধা কি কেবল ঘর-দোরেরই। শীতাংশু এসে থাকবে একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে। আবরণ নেই, আচ্ছাদন নয়, একেবারে নগ্ন সাক্ষাৎ মুখোমুখি। যে শীতাংশু দৃষ্টির সামনে এলে একদিন সুলেখার চোখের পাতা লজ্জায় ভারি হয়ে উঠত। দু' গালে রক্তের সঞ্চার হ'ত। অসম্ভব দ্রুততালে হৃদস্পন্দন শুরু হ'ত। যে সরে যেতে সমস্ত পৃথিবী সুলেখার কাছে বিবর্ণ, পিচ্ছিল হ'য়ে গিয়েছিল।

অতীতের যে স্মৃতিসৌরভ আবার যদি নতুন করে জাগে! ফেলে আসা জীবনের উন্মাদনা দেহের কোষে কোষে আবার শিহরণ তোলে।

সে সুলেখা আর নেই। শালের বাকলের মতন পুরোনো দিনের পরিচয় সে খসিয়ে দিয়েছে। পুরোনো দিনের পরিচয় শুধু নয়, পুরোনো দিনের মনও। তবু কি নিজেকে সুলেখা খুব বিশ্বাস করতে পারে! নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়াতে পারবে শীতাংশুর সামনে।

সুলেখা নিজেকে সংযত করেছিল। ভেবেছিল কোন ভয় নেই, ভয় কেটে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য, ট্রেনটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, অশ্রান্ত আবেগে সমস্ত শরীর দুলে দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে, আজকের সুলেখার মধ্য থেকে পুরোনো দিনের সুলেখা জন্ম নিচ্ছে। পুরোনো দিনের অনুভূতি আর সংবেদন নিয়ে।

সুখের চাকরি ছিল সুলেখার। দশটা পাঁচটা। মাঝখানে আধঘণ্টা লাঞ্চের অবসর। মাইনেও নিন্দার নয়। বেসরকারী অফিস। মালিকদের একটু মন জুগিয়ে চলতে পারলেই বরাত খুলে যেত। একই অফিসের তিনটি মেয়ে মিলে এক ডালে বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু সুলেখার বরাতে সুখ নেই। দিল্লী থেকে শীতাংশু বদলি হ'য়ে এল কলকাতার অফিসে। শুধু কলকাতায় বদলি হওয়াই নয়, বসল এসে একেবারে সুলেখার মুখোমুখি। দীর্ঘ গৌরাঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চলনে, বলনে মার্জিত রুচির ছাপ। সেকেণ্ডার শাহার মতন দুদিনেই এল, দেখল আর জয় করল। অফিসের যা কিছু উৎসব, আলোড়ন, সবই শীতাংশুকে ঘিরে।

সুলেখা প্রথম প্রথম একটু আলগা থাকতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। মাস খানেকের মধ্যেই তার স্রোতের মুখে কুটোর অবস্থা। অবশ্য কুটোর মতন ভেসেই বেড়াল না, চরের আশ্রয় পেল।

সুলেখা আরও একটু এগিয়ে গেল। ট্রেন এসে গেছে। স্বাস্থ্য-কামীদের ভীড় এখনও শুরু হয় নি। সব মিলিয়ে বড় জোর গোটা ছয়েক লোক নামল। তার মধ্যে কিছু আদিবাসী। হাট থেকে ফিরছে।

সুলেখা এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে শীতাংশু কুলির মাথায় বেডিংটা তুলে দেবার চেষ্টা করছে। সুটকেশটা পাশে নামানো।

শীতাংশু বুঝি ধরেই নিয়েছে সুলেখা স্টেশনে আসবে না; তাই কোনদিকে না চেয়েই, সুলেখার অপেক্ষা না করে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছে।

তাই যদি ভেবে থাকে শীতাংশু, যদি মনেই করে থাকে যে সুলেখা বদলেছে, তা হ'লে ওভাবে কি করে পোষ্টকার্ড লিখল শীতাংশু? পোষ্ট-কার্ডটা পড়লে মনে হয় যেন দু' জনের মাঝখানের কয়েকটা বছর একেবারে তিমিত, নির্বাত। কোন ঢেউ ওঠেনি কোথাও, উত্তাল আবর্তের সৃষ্টি হয় নি।

শীতাংশু মুখ ফিরিয়েই সুলেখাকে দেখতে পেল।

আরে, এই যে এসেছ? আমি ভাবলাম বুঝি পুরোনো কৌদলটা মনে রেখে, অভিমানে আর এলেই না।

পুরুষ জাতটা নির্লজ্জ হ'তে পারে শীতাংশু বোধ হয় তার প্রকৃষ্টতম

নিদর্শন। জীবনমৃত্যুর সেই মারাত্মক সংগ্রাম, শীতাংশুর কাছে শুধু কোঁদল? এর চেয়ে গভীর কোন সংজ্ঞা দিতে বুঝি সে রাজী নয়।

কিন্তু কথা কাটাকাটি করতে সুলেখার ভাল লাগল না।

একি চেহারা হয়েছে শীতাংশুর!

একদা গৌরবর্ণ তামাটে, কপালে অকালবার্ধক্যের হিজিবিজি আঁচড়, দু' চোখের কোণে পাখীর পায়ের দাগ। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। চুলের দু'পাশে সোনালী ঝিলিক।

কত বছর? বছর চারেকের বেশী নয়, তার মধ্যে একটা মানুষের শরীর এতটা ভেঙে যেতে পারে।

আপনার শরীর তো দেখছি বেশ খারাপ হয়েছে।

ইচ্ছা করেই সুলেখা তুমির অন্তরঙ্গতা এড়িয়ে গেল। আগের সম্পর্ক যখন নেই, তখন কি হবে আগের সম্বোধনে।

হ্যাঁ, পেটের গোলমাল শুরু হয়েছে। যা খাই, একেবারেই হজম হয় না, চোঁয়া ঢেকুর। একটুতেই হাঁপ লাগে।

সুলেখাকে নয়, ডাক্তারের সামনেই যেন শীতাংশু রোগের ফিরিস্তি দিচ্ছে। আধিব্যাধির হিসাব।

হঠাৎ থেমে শীতাংশু জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, জায়গাটা কি রকম? পেটের গোলমাল সারে তো? না কি পাঁটের পয়সা খরচই সার হবে।

কঠিন একটা উত্তর দিতে গিয়েও সুলেখা থেমে গেল। এমন ভাবে শীতাংশু কথা বলছে, যেন তাকে সুলেখাই আমন্ত্রণ করে এনেছে মাথার দিব্যি দিয়ে। শুধু মাথার দিব্যি নয়, অসুখ-বিসুখ সেরে যাবে এমন একটা গ্যারান্টিও দিয়েছে।

হাতের নির্দেশে সুলেখা সাইকেল রিক্সা থামাল। শীতাংশু ওর দিকে ফিরে বলল, মালপত্র নিয়ে উঠে বসুন আপনি।

উঠতে উঠতেই শীতাংশু জিজ্ঞাসা করল, তুমি, তুমি কিসে যাবে?

আমার কোয়ার্টার কাছেই, আমি হেঁটেই যাব। আপনি রোগীমানুষ, হাঁটতে আপনার কষ্ট হবে।

শীতাংশু কোন কথা বলল না। সুটকেশটা আঁকড়ে ধরে বেডিংয়ের ওপর দুটো পা-ই তুলে দিল।

একবার বলল, না, চল, আমিও নামি। তোমার সঙ্গেই যাই। কিংবা তুমিও একটা সাইকেল-রিক্সা নাও সুলেখা। হোক তোমার কোয়ার্টার খুব কাছে, তবুও এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়াটা ঠিক নয়। একথাও বলতে পারত, একটা সাইকেল-রিক্সাতেই ধরে যাবে দু'জনের।

শেষের কথাটা মনে হতেই সুলেখার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ভেবেছিল চোখের জলে, রক্তের তুলিতে সব কিছু বুঝি মুছে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। না মানুষ, না তার বাতাসে ছড়ানো সংলাপ।

কিন্তু না, কিছুই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয় না। মানুষ মরে গেলেও, তার কথা, তার সুর ফিরে ফিরে আসে বায়ুতরঙ্গে।

সেদিন শীতাংশুর আহ্বানেও যেমন জড়তা ছিল না, সাড়া দিতে সুলেখাও একটু সঙ্কোচ করেনি।

বাস থেকে নেমে মেঠোপথ ধরে দুজনে গ্রামের মধ্যে চলে গিয়েছিল। বসতি এড়িয়ে পা ছড়িয়ে পুকুর ধারে বসেছিল। কি কথা বলেছিল আজ আর সুলেখার মনে নেই, কিন্তু ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকির আলো জ্বলে উঠতেই সুলেখার বাড়ী ফেরার কথা মনে হয়েছিল।

দুজনে একঘণ্টারও ওপর পথে

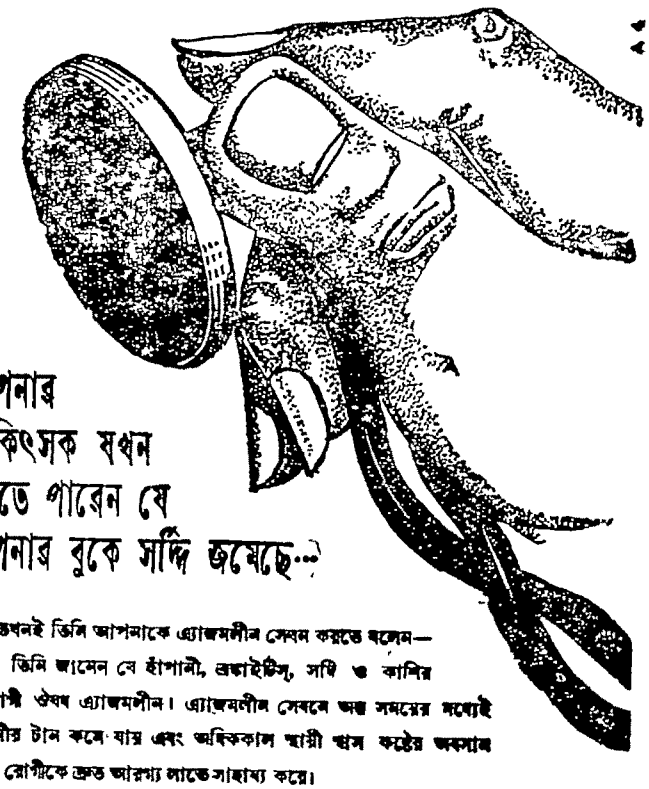

আপনার
চিকিৎসক যখন
বুঝতে পারেন যে
আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলেন— কারণ তিনি জানেন যে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দ্দি ও কাশির উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিকাল স্থায়ী শ্বাস কষ্টের অবসান ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন
শ্বাসযন্ত্রের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ

প্রস্তুতকারক—
ডি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ
২১১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

পথে ঘুরেছিল। ভুল পথে। বাসের নড়কের সন্ধান পায়নি।

সেই সময়ে সুলেখারই প্রথম চোখে পড়েছিল। একটা সাইকেল-রিক্সা। সাইকেল-রিক্সা নয়, সুলেখার মনে হয়েছিল, অথৈ জলে যেন তটরেখার আভাস।

অপরিসর আসনে বসে দু'জনে ফিরেছিল। সুলেখা আর শীতাংশু। উঁচু-নীচু পথ। ছোট ছোট পাথরের টুকরোর বাধা। সাইকেল রিক্সা বার বার ঠোক্কর খাচ্ছিল। এই ধাক্কা থেকে বাঁচাবার জন্যই বুঝি শীতাংশু একটা হাত দিয়ে সুলেখাকে আঁকড়ে ধরেছিল। পতন থেকে সুলেখাকে বাঁচাবার এমন প্রাণপণ প্রয়াস করেও কিন্তু শীতাংশু নিজেকে অধঃপতন থেকে বাঁচাতে পারেনি।

কথাটা মনে হতেই এতদিন পরেও সুলেখা ভ্রূ কুঞ্চিত করল। নিজেকে সহজলভ্য করেই সুলেখা ভুল করেছে ছিন্ন মুকুলের মতন পথের ওপর পড়েছিল বলেই বুঝি তার এই ধূলিধূসর অবস্থা।

গেটের কাছে সাইকেল রিক্সা থামল। সুলেখা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। জোর পায়ে হেঁটে যখন রিক্সার কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন শীতাংশু সুটকেশ হাতে নেমে দাঁড়িয়েছে।

সুলেখাকে দেখে বলল, কত দিতে হবে বল তো রিক্সাওলাকে? নতুন লোককে ঠকিয়ে নেওয়াই তো এদের রীতি।

আগে থেকেই সুলেখা ঠিক করে রেখেছিল যে, ভাড়াটা সেই দেবে। আর কোন কারণে নয়, নিছক ভদ্রতার খাতিরে। পুরোনো দিনের বাদ-বিসম্বাদ ভুলে মানুষটা যখন উজান বেয়ে তার কাছে আসতে পেরেছে, তখন সুলেখা আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখবে না।

কিন্তু শীতাংশুর কথাবার্তার ধরণ সুলেখার মোটেই ভাল লাগল না। গেটের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কেবল বলল, আনা আষ্টেক দিয়ে দিন। ওটাই রেট। চাকরকে দিয়ে সুলেখা সুটকেশ আর বেডিংটা ভিতরে আনিয়ে নিল। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল তখনও শীতাংশু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটু অপেক্ষা করে সুলেখা বলল, কি হ'ল? আসুন।

শীতাংশু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তারপর পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে বলল, জ্বারগাটা মন্দ নয়। শরীরটা ঠিক হলে বাঁচি।

শরীর, শরীর, শরীর। শরীর সর্বস্ব এই মানুষটার আর যেন কোন চিন্তা নেই। মনের বালাই নেই। মন বলে কোনদিন যে কোন পদার্থ ছিল, আজকের কথাবার্তা শুনে সেটা বোঝবার উপায় নেই।

অথচ এই মানুষই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আবোল তাবোল বকেছে। অর্থ-হীন কথার স্রোত। কথার ফুল দিয়ে দিয়ে ভবিষ্যত জীবনের মালা গাঁথা। গঙ্গার ধারে, রেস্তোরাঁয় নির্জন কোটরে, শহরতলীর মাঠ-ঘাটে। দিনান্তে একদিন দেখা না হ'লে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এসেছে লোকলজ্জা, সমাজভয় সব বিসর্জন দিয়ে।

হিন্দুস্থান জেনারেল

ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

সেবা ও নিরাপত্তার জন্য

চেয়ারম্যান
ডাঃ এম, এন, লাহা
এম-এ, পি-এইচ-ডি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী পি, এন, ভালুকদার
এম-এ (ক্যান্টাব)

শাখাসমূহ ঃ

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, নয়াদিল্লী, হায়দরাবাদ (ডেকান), কোচিন, বাঙ্গালোর, কটক, ইন্দোর, আসানসোল, নাগপুর, গৌহাটী, পাটনা, জলপাইগুড়ি, কাটিহার, চাকা, বরোদা, ডিব্রুগড়, ধানবাদ, জামসেদপুর, কোডারমা, নওগাঁ

হেড অফিস ঃ হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩

অগ্নি-নৌ-মোটর এবং অন্যান্য বহুবিধ দুর্ঘটনার বীমা লওয়া হয়

আর আজ ষ্টেশন থেকে মামার পর একবারও সুলেখার কুশল প্রশ্ন করেনি। অন্তরঙ্গ বাক্য একটিও বলে নি।

অবশ্য সেদিনের সে সুরের রেশ আর নেই। নিজের হাতেই সুলেখা সে সুরের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

এ ছাড়া তার আর কিছু করারও ছিল না।

সব ঠিক। বিয়ের দিন ক্ষণ পর্যন্ত। শুধু শীতাংশুর একটা ইনক্রিমেন্টের অপেক্ষা। মাস দুয়েক বড় জোর। আর কোন বাধা ছিল না। ইনক্রিমেন্টের প্রয়োজন ছিল, কারণ শীতাংশুর ইচ্ছা নয়, সীমন্তে সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরে সুলেখা অফিসে যায়। শীতাংশুর কাছাকাছি বসে। সহকর্মীদের ধিক্কারের জন্য নয়, শীতাংশুর ধারণা দিন রাত দেখা হলে বিয়ের আমেজটুকু নষ্ট হয়ে যায়। যার হাতে জীবনটা তুলে দেবার কথা, তার হাতে ফাইল তুলে দিতে দিতে সরসতা শুকিয়ে আসে। জীবন গতানুগতিক হয়ে দাঁড়ায়।

সুলেখা তাতেই রাজী। শীতাংশুর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। দুজনের আলাদা কোন বাসনা থাকতে পারে না।

একটু গরম জল চাই। জামা খুলতে খুলতে শীতাংশু বলল। চাকরের দিকে নয়, সুলেখার দিকে চেয়ে।

উত্তরও সুলেখাই দিল। চাকরের দিকে চেয়ে, একটু গরম জল বসিয়ে দাও তো।

আড়চোখে সুলেখা শীতাংশুর দিকে চেয়ে দেখল। নির্বিকার শীতাংশু সেজ পরে দু'টো পা-ই তক্তাপোষের ওপর তুলে বিড়ি ধরাচ্ছে। সুলেখার কাছে নয়, সে যেন মেস বাড়ীতে আস্তানা পেতেছে। তাই শালীনতা বোধটুকুও রাখা প্রয়োজন মনে করে না।

হাসি পেল সুলেখার। শীতাংশু আসবে বলে নিজের হাতে যে ঘরটা সাজিয়েছিল। জানলায়, দরজায় রঙীন ছিটের পর্দা। টেবিলের ওপর কাঁচের ফুলদানিতে মরশুমী ফুলের গোছা রেখেছিল। টেবিলের ওপর আজকালকার নক্সাকাটা প্লাষ্টিকের ঢাকনা।

মুকুন্দ পাবলিশার্সের কয়েকখানি নতুন বই

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
ময়না তদন্ত ৩·০০

চিরঞ্জীব সেনের
রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের
দেওয়ালের দাগ ৭·০০

প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর
প্রাণতরঙ্গ ৬·৫০

গোলাম কুদ্দুসের
সুরের আগুন ৪·৭৫

মুকুন্দ পাবলিশার্স
৮৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

শীতাংশু জানলার পর্দাগুলো খুলে রেখেছে। দরজার পর্দাটা চালগোল পাকিয়ে গুটিয়ে দিয়েছে। এত খরচ করে শরীর সারাতে আসা। স্বাস্থ্যকর বাতাসটুকু যেন অবারিত হয়। পর্দায় বাধা পেয়ে ফিরে না যায়।

সুলেখা ভেবেছিল, আগে শীতাংশুকে খাইয়ে তবে সে খেতে বসবে। হাজার হোক শীতাংশু যখন অতিথি। কিন্তু বেলা অনেক হয়েছে দেখে নিজেও বসে গেল শীতাংশুর সঙ্গে। একেবারে মুখোমুখি। অনেক আগে অফিসে যেমন বসত।

ঝোলের বাটিতে চুমুক দিয়েই শীতাংশু আঁতকে উঠল।

সর্বনাশ, এ যে ঝালে বিষ। এ রকম রান্না খেলে আর শরীর সারাতে হবে না।

সুলেখাও ঝোল মেখেছিল ভাতে। দু'এক গ্রাস মুখে দিয়ে বলল, কই তেমন ঝাল তো মনে হচ্ছে না?

তোমার মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমার পক্ষে এটুকু ঝাল খাওয়াই মারাত্মক। আমি রোগী সে কথা ভুলে যাও কেন?

সুলেখা আর একটি কথাও বলল না। মাথা নীচু করে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। চাকরের হাতেই পান পাঠিয়ে দিল। সে ঘরে শুয়ে শুয়েই শুনল, শীতাংশু চাকরটাকে বলছে, শোন, আমার তরকারিতে লঙ্কা, হলুদ একদম বেশী দেবে না। কোন রকম মশলা তো নয়ই। আর এক গ্লাস জল নিয়ে এস তো, ওষুধ খেতে হবে। পরিষ্কার জল এনো, নোংরা টোংরা না থাকে।

বালিশে মাথা দিয়ে সুলেখা পাতলা একটা চাদর টেনে দিল গায়ে, শীতের জন্য নয়, শীত এমন কিছু নেই, শুধু বাতাসে একটা শির-শিরাণি ভাব। চাদরটা দিয়ে কান ঢেকে দিল।

পাশের ঘরের কথাগুলো কানে না আসে। শীতাংশুর লম্বা লম্বা কথা।

ছুটির দিন দুপুরে শুলেই ঘুমে সুলেখার দু'চোখ জড়িয়ে আসে, কিন্তু, আশ্চর্য, কিছুতেই আজ ঘুম এল না। এলো-মেলো কথার রাশ ভিড় করে এল মনের সামনে, পুরোনো দিনের অজস্র ঘটনার টুকরো।

বিয়ের তারিখের বোধ হয় মাস-খানেক আগের ব্যাপার। অফিস থেকে বেরিয়ে সুলেখা একটা সিনেমা হলে ঢুকেছিল। সঙ্গে শীতাংশু নয়, আর এক বান্ধবী ছিল। কলেজের সহপাঠিনী। সেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুলেখাকে। বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যাবার আয়োজন করছে, এমন সময় দরজায় টোকা। একবার, দুবার।

সুলেখা উঠে দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। দেখবার চেষ্টা করল আগন্তুককে। দেখল, কিন্তু চিনতে পারল না।

একটু দ্বিধা আর সঙ্কোচ, তারপর সাহস করে সুলেখা দরজাটা খুলেই ফেলল। নাতিদীর্ঘ প্রৌঢ়। বর্ণ ঘনশ্যাম, বিরল কেশ মস্তক, বড় গোঁফ, নিষ্প্রভ দু'টি চোখ।

হাত যোড় করে বলল, সুলেখা দেবী থাকেন এখানে?

আমিই সুলেখা দেবী, বলুন।

প্রৌঢ় এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, তারপর বলল, আপনার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা ছিল।

সুলেখা এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রৌঢ়ের কাছে এসে দাঁড়াল, কি বলুন?

ইতি মধ্যে প্রৌঢ় একটা চেয়ার টেনে তার ওপর বসেছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, আমি শীতাংশুর দাদা। শীতাংশু আপনাকে ঠকিয়েছে। মিথ্যা কথা বলেছে।

খাটের বাজু ধরে সুলেখা টাল সামলাল। কোন রকমে জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টো ভিজিয়ে নিয়ে বলল, কে শীতাংশু? কোন্ শীতাংশু?

আপনাদের অফিসের শীতাংশু সেন। যার সঙ্গে আপনার—

সুলেখা বাধা দিয়ে বলল, বুঝেছি, বলুন।

দেশের বাড়ীতে শীতাংশুর বউ আছে। অথচ হতভাগা আবার বিয়ের চেষ্টা করছে। আপনি তাকে বিয়ে করলেও এ বিয়ে অসিদ্ধ হবে।

খুব আস্তে, প্রথমে খাট, তারপর

গ্রন্থালয়ের কয়েকখানি অসামান্য বই

গোরাকালার হাট

অশোক গুহ : ৮৷৷০

প্রকাশিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বইখানা সম্বন্ধে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সুধিবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতিকালে আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে।

কর্ণাটরাগ

শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷ ৪৲

দরদী লেখকের হাতে প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য—এমনকি জুবেদা-হাতীও চির-দিনের জন্য মনে থাকবে। পত্র-পত্রিকার দরদী লেখনী প্রশংসিত।

অন্যনয়ন

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷ ৪৲

লেখকের এই নূতন উপন্যাসখানিতে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব তাই নয়, সাহিত্যের মুন্সিয়ানায় প্রোজ্জ্বল ও অনবদ্য।

আরও অনবদ্য উপন্যাস

অ্যাক্সিডেন্ট	৷৷	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৷৷	২·৫০
সীমান্ত	৷৷	শিশির দাশ	৷৷	৩·০০
লক্ষ্মীমিত্রা	৷৷	সঙ্কর্ষণ রায়	৷৷	২·৫০
চৌধুরী বাড়ি	৷৷	বিশ্বনাথ রায়	৷৷	৪·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ (যন্ত্র)

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অমনি বাতটা জ্বলে উঠল। ঘড়ি পাওয়ারের বাতিটা ষোল পাওয়ারের জ্বলে হ'ল। সুলেখা খাটের ওপর বসে পড়ল। নিজের শরীরের ওপর আর আস্থা নেই। যে কোন মুহূর্তেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তা হলেই একেবারে চরম কেলেঙ্কারী।

তবু ওরই মধ্যে মনে জোর এনে সুলেখা জিজ্ঞাসা করল, আপনার কথাগুলো যে সত্যি তার প্রমাণ ?

প্রৌঢ় নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসল। বলল, আমার নাম বিশ্বেশ্বর সেন। শীতাংশু আর আমি এক মায়ের পেটের ভাই। শীতাংশুর সঙ্গে আপনার দেখা হবে। তাকে আমার কথা বলবেন। বলবেন, পারিবারিক ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।

সারাটা রাত সুলেখা বিছানায় ছটফট করল। বুকে তীর বেঁধা

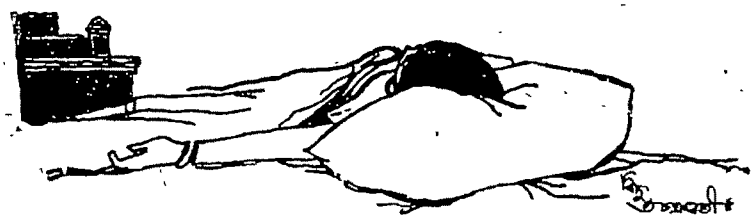

সারাটা রাত সুলেখা বিছানায় ছটফট করল

পাখীর মতন মর্মান্তিক যন্ত্রণা। ঈশ্বরের কাছে সকরুণ মিনতি জানাল, রাত্রের এ ঘটনা যেন মিথ্যা হয়। এ কলঙ্ক যেন শীতাংশুকে স্পর্শ না করে। শীতাংশুর সম্বন্ধে ধারণা যেন সুলেখাকে কোনদিন বদলাতে না হয়।

পরের দিন অফিসে গিয়েই শীতাংশুর সঙ্গে দেখা হ'ল। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানোভাবে দু' একজন কেরাণী বসেছিল। সুলেখাকে দেখে আর সকলের কান বাঁচিয়ে শীতাংশু বলল, ওঁ, আষাঢ়ে বরদে দেবি।

সুলেখা কোন উত্তর দিল না। গম্ভীর মুখে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। এ ধরণের লঘু পরিহাস তার ভাল লাগছে না। শিরায় সংক্রান্তি। একটা চরম বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

কাশির শব্দে সুলেখা চমকে উঠল। দরজায় গোড়ায় শীতাংশু এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি একটু বেরোচ্ছি। সকাল বিকাল বেড়াবার কথা ডাক্তার বিশেষ করে বলে দিয়েছে। রাত্রে আমি কিন্তু সাবু ছাড়া কিছু খাই না। সাবু আর পেঁপে সেদ্ধ। তোমার চাকরটাকে বলে রেখো। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, নয় তো আমিই বলে যেতাম।

শীতাংশুর কাশির সঙ্গে সঙ্গেই অসমৃত বেশ ঠিক করে সুলেখা বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। দু'-হাতে খুলে পড়া খোঁপাটা ঠিক করতে করতে সব শুনল। একটি কথাও বলল না।

বিছানায় বসেই দেখল শীতাংশু ধীর পায়ে সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্টেশনের দিকে। এটাই বোধ হয় তার একমাত্র জানা পথ, তাই আর বিপথে যেতে সাহস করে নি।

রাগে হাত কামড়াতে ইচ্ছা হ'ল সুলেখার। কি ভুলই সে করেছে! দরদ দেখিয়ে স্টেশনে আনতে যাবার কি প্রয়োজন ছিল। তাকে দেখতে না পেলেই শীতাংশু অন্য কোথাও ওঠার ব্যবস্থা করত। কোন হোটেলে বা সরাইখানায়।

নিজের মনের মধ্যে সুলেখা ডুবুরি নামাল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোথাও যদি অতীত-স্মৃতির শুক্তির সন্ধান মেলে। ঠিক বুঝতে পারল না। সব বোঝাপড়ার পরে, সব যুক্তিতর্কের শেষে, কিছু বুঝি অবশিষ্ট থাকে। দিনের আলো মিলিয়ে যাবার পরেও গাছের আগায় রংয়ের ঝিলিমিলি।

সেদিন অফিস ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা শীতাংশুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা কথা আছে। আমি মোড়ে অপেক্ষা করছি, তুমি এস।

মোড় থেকে দু'জনে চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকেছিল। পর্দাঢাকা বন্ধ কামরায়।

কোনরকম ভণিতা না করে সুলেখা বলল, কাল রাত্রে তোমার দাদা আমার কাছে এসেছিলেন ?

তাই বুঝি ? শীতাংশু নির্লিপ্ত-ভাবে চায়ে চুমুক দিল।

আড়চোখে শীতাংশুর দিকে সুলেখা চেয়ে দেখল। আর একটি প্রশ্ন। তার দ্বিতীয় প্রশ্নেই এত যত্নে গড়ে তোলা শীতাংশুর নিস্পৃহতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যদি বিশ্বেশ্বর সেনের কথাগুলো সত্যি, হয়, তাহ'লে শীতাংশুর নির্মোক খসে যাবে। বিস্ফারিত দুটি চোখে ত্রাসের ছায়া কাঁপবে।

তিনি বলে গেছেন, তুমি বিবাহিত। দেশে তোমার স্ত্রী আছে।

শীতাংশুর মুখে একটি আঁচড়ও পড়ল না। চোখ দু'টো শুধু একটু কুঁচকে বলল, দাদা ঠিকই বলেছেন।

ঠিকই বলেছেন ? তার মানে কি বলতে চাও তুমি ? নিজেকে সুলেখা আর সংযত রাখতে পারল না।

এর আর মানে কি ? এ তো পরিষ্কার বাংলা ভাষা। শীতাংশু অবিচল।

আর পারে নি সুলেখা। পরিবেশ ভুলে চায়ের কাপ ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

স্কাউণ্ড্রেল। কি মনে করেছ তুমি আমায় ? আমি রঙচঙে মাটির পুতুল। যখন খেলবার ইচ্ছা হবে খেলবে আর খেলা শেষ হয়ে গেলেই ছুড়ে ফেলে দেবে ধূলোর ওপর। তুমি বিবাহিত, তবু অসভ্যের মতন অভিনয় করে গেছ আমার সঙ্গে।

সুলেখার চীৎকারে পর্দা সরিয়ে দুএকটা বেয়ারা উঁকি দিল। আশ-পাশের দু একজনও উঠে দাঁড়াল।

খুব শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শীতাংশু বলল, না, আমি অভিনয় করি নি। প্রথম স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করব। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। কোন সম্পর্ক রাখি নি। তুমিই আমার সব।

শীতাংশু হাত বাড়াতেই সুলেখা

হাতটা সরিয়ে নিল। সামনে রাখা চায়ের কাপ ডিস্ সশব্দে মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

সুলেখা রাস্তা পার হয়ে যখন একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল তখন প্রবল উত্তেজনায় তার বুকের স্পন্দন দ্রুততর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের মুক্তা। অবসাদে, শ্রান্তিতে দু'টি চোখ নিমীলিত।

পরের দিনই সুলেখা অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে। এক বান্ধবীকে অনুনয় বিনয় করে এক স্কুলে কাজ যোগাড় করে নিয়েছে। শহরে নয়, শহরের বাইরে। জলপাইগুড়িতে। স্কুলের চাকরি পাকা হ'তে, অফিসে ইস্তফা দিয়েছে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি এসেছিল। চিঠিটা না খুলেই সুলেখা খণ্ডবিখণ্ড করে টুকরোগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তারপর জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে এখানে। আরো নির্জন, আরো শান্ত পরিবেশে।

সেই শীতাংশু যে কোনদিন পোষ্টকার্ড লিখে তার কাছে চলে আসতে পারে, এটা সুলেখা ধারণাও করতে পারে নি।

সন্ধ্যার আগেই শীতাংশু ফিরল। হাতে একগাদা ওষুধের শিশি। নিজের ঘরের টেবিলে সাজাতে সাজাতে নিজের মনেই বলল, বিদেশ বিভূঁই, সঙ্গে ওষুধ থাকা ভালো। কখন কিসের দরকার হয়, বলা যায়।

সুলেখা এ ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল। উঁকি দিয়ে দেখল, শীতাংশু একদৃষ্টে লাল, নীল রংয়ের ওষুধের শিশিগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে অসীম মমতা।

রাত্রেও দু'জনে খেতে বসল এক টেবিলে।

জায়গাটা তো খুব সুবিধের নয়। তরকারীর প্লেটটা সামনের দিকে টানতে টানতে শীতাংশু বলল।

সুলেখা কিছু বলল না, শুধু শীতাংশুর দিকে চোখ তুলে দেখল।

ষ্টেশনের কাছে এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। মডার্ণ ফার্মেসীর ডাক্তার মজুমদার। তিনি বললেন, পেটের গোলমালের জন্য ভুবনেশ্বর অনেক ভাল। নতুন রাজধানী হওয়াতে নাক্সভমিকা গাছ অনেক নিশ্চিহ্ন হয়েছে বটে, তবু এখনও জায়গাটার জলবায়ু বেশ ভাল। একটা জুতসই উত্তর দেবার মুখেই সুলেখা বাধা পেল।

এ কি, এ তো পেঁপে সেদ্ধ নয়। তরকারীর প্লেটটা শীতাংশু সজোরে ঠেলে দিল।

না, পেঁপে সেদ্ধ নয়, কাঁপ সেদ্ধ। এ সময়ে এখানে পেঁপে পাওয়া যায় না। সুলেখার কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন।

সর্বনাশ, কাঁপ সেদ্ধ? পেটের অসুখের পক্ষে একেবারে বিষ! আমি তোমার কি করেছি সুলেখা যে তুমি আমার এত বড় অপকার করতে চাইছ?

কি অপকার? আমার সারাটা জীবন তুমি নষ্ট করেছ। ছলনা করে, প্রতারণা করে, আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ ধুলোয় মিশিয়েছ। সত্যি সত্যি তোমার মুখে বিষের পাত্র তুলে দিলেও আমার পক্ষে অন্যায় কিছু হ'ত না।

মুখে এ'লেও, এ সব কথা সুলেখা উচ্চারণ করতে পারল না। মিছা-মিছি কাদা ঘেঁটে লাভ নেই।- এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি খেলায় নিজেকেও সুলেখা নিষ্কলঙ্ক রাখতে পারবে না। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। জায়গাটা যখন তার শরীরের পক্ষে উপকারী বলে মনে হয় নি, তখন বেশীদিন শীতাংশু নিশ্চয় এখানে থাকবে না।

সাবু নিয়েও শীতাংশু কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল। এত ঘন দুধসাবু খাওয়া ক্ষতিকর।

এবারিও সুলেখা একটি কথাও বলল না। দুধটা ঘন করার জন্য অবশ্য সুলেখাই দায়ী। চাকরকে সেই নির্দেশ দিয়েছিল।

খাবার টেবিল ছেড়ে সুলেখা উঠে পড়ল। এমন একটা মানুষের মুখো-মুখি বসে থাকার কোন মানে হয় না। রোগের মধ্যে সুলেখা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই সুলেখা বেরিয়ে পড়ল। সকালে ক্লাশ। দুপুর বেলা একবার খেতে আসবে। তখন দেখা হবে শীতাংশুর সঙ্গে। অত ভোরে শীতাংশু ওঠে নি।

স্কুলে যাবার পথেই সুলেখা ভাবতে লাগল, যে শীতাংশুর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, যাকে কেন্দ্র করে তার সব কিছু আবর্তিত হ'ত, আজকের শীতাংশুর মধ্যে সে মানুষটার খোঁজ করতে যাওয়া বৃথা।

শুধু দেহই রোগগ্রস্ত তা নয়, এ শীতাংশুর মনও কীটদষ্ট। তা না হলে অমন একটা ব্যাপারের পরে শীতাংশু কিছুতেই এভাবে সুলেখার কাছে আসতে পারত না।

দুপুরে সুলেখা ফিরে দেখল শীতাংশু খাবার টেবিলে অপেক্ষা করছে। সুলেখাকে দেখে বলল, আজ আমি চলে যাব সুলেখা, সবাই বলছে এখানে আমার শরীর সারবে না। এরপর আরো শীত পড়ে গেলে, রোগা শরীরে ঠাণ্ডা লেগে একটা বড় রকম অসুখ হ'য়ে যেতে পারে।

সুলেখা কোন কথা বলল না। চাকরকে ভাত দেবার নির্দেশ দিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। একবার চোখ তুলে চেয়েই সুলেখা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। শীতাংশুও এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। দৃষ্টিতে যেন তার পুরোনো দিনের মোহ।

তুমি এখানে ভালই আছ সুলেখা, তাই না? শীতাংশুর গলা আবেগতরল। সুলেখার আশ্চর্য লাগল। এতক্ষণ পরে লোকটা, বুঝি শরীরের মায়া

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত (সি. আই. টি.) রোড,

কলিকাতা-১৪

* স্কুল-কলেজের যাবতীয় বই * উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক

* ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থের সমাবেশ

কলেজ-স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই হয়

কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। নিজের শরীর ছাড়িয়ে, রোগের প্রকোপ ভুলে আর একটা দেহ, আর একটা মনের কথা ভাবতে শুরু করেছে।

হ্যাঁ, ভাল আছি বৈ কি। খুব ভাল আছি। প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চেঁচাল সুলেখা। যদি লোকটা ভেবে থাকে তার জন্য চিন্তা করে করে সুলেখা অর্ধাশনে, শুধু দীর্ঘশ্বাসের পাল তুলে জীবনতরী বেয়ে চলেছে, তবে তার সে ভ্রান্ত ধারণার অবসান হোক।

কথাগুলো শীতাংশু শুধু কান দিয়ে শুনল, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করল মুখ চোখের ভাবে এমন মনে হল না।

আড়চোখে সুলেখা চেয়ে দেখল, হঠাৎ যেন শীতাংশু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ফেলে আসা জীবনের ছায়া বুঝি দীর্ঘ হয়ে পড়েছে মনের সামনে। তাকে একটু বিচলিত করেছে।

মনোজ্ঞ কোন কথা শোনবার জন্য সুলেখা কান পেতে রইল।

ভারি মুস্কিলে পড়লাম। শীতাংশুর কণ্ঠে চিন্তার ছোঁয়াচ।

কি হ'ল?

একটু যেন অম্বল হয়েছে মনে হচ্ছে। চোঁয়া ঢেকুরও উঠছে। না, আজ রাতেই সরে পড়ব। কন্টায় গাড়ী আছে, বলো তো।

ভাতের থালা ঠেলে সুলেখা উঠে পড়ল। পরনে নীলাম্বরী শাড়ী। অঙ্গে সেই রঙেরই ব্লাউজ। স্কুল থেকে ফেরার সময়ে একটি মেয়ে তাজা লাল গোলাপ তুলে দিয়েছিল হাতে। সুলেখা সেটা খোঁপায় গুঁজেছে।

শীতাংশুর চোখে ঘোর দেখে সুলেখা ভেবেছিল বুঝি তাকেই নিরীক্ষণ করে সে দেখছে। অন্যমনস্ক হয়ে যেতেও সুলেখা আশা করেছিল, বোধ হয় অতীতের কোন স্মৃতিই শীতাংশু রোমন্থন করছে।

কিন্তু শীতাংশু যে অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের চিন্তায় উদ্বিগ্ন, সে খেয়াল তার একেবারেই হয়নি।

গাড়ী সাতটা তেইশে।

সুলেখা প্রথমে ভেবেছিল সে স্টেশনে যাবে না। চাকরকে সঙ্গে দেবে। কিন্তু তারপর বসে বসেই ভাবল, আর হয় তো মানুষটার সঙ্গে জীবনেও দেখা হবে না। তবু তো একদিন দু'টি ভিন্নমুখী জীবনধারার এক সঙ্গে মেশার অঙ্গীকারটুকু ছিল। এক গৃহ, এক সংসার।

আজ সে স্রোতের চিহ্নটুকু নেই। উত্তপ্ত বালির মধ্যে সে ধারা লুপ্ত প্রায়। তবু শালীনতাবোধটুকু কেন সুলেখা বিসর্জন দেবে। অন্তত শীতাংশু একটুও না খুঁজে পায়। কখনও বলতে না পারে, সুলেখার দিক থেকে আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হয়েছে।

এবার দু'টো সাইকেল রিক্সা এল। একটায় মালপত্র সমেত শীতাংশু, অন্যটায় সুলেখা। পথে কোন কথা হ'লনা। সুলেখা ইচ্ছা করেই তার রিক্সা-ওলাকে বলল আস্তে চালাতে। যাতে পাশাপাশি না গিয়ে পড়ে। শীতাংশুও কোন কথা বলার সুযোগ না পায়।

ঠিক সময়ে ট্রেন এল। টিকিট কেটে শীতাংশু কামরায় গিয়ে উঠল। ভীড় নেই। শীতাংশু জানালার ধারে বসেছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর সুলেখা। কোন কথা নয়। বলবার মতন কোন কথাই নেই।

কথা বলতে সুলেখার সাহস হচ্ছে না। এখনই হয়তো শীতাংশু রোগের ফিরিস্তি দেবে। এক রাতেই তার স্বাস্থ্যের কতটা অবনতি হয়েছে তার হিসাব।

শীতাংশু চুপচাপ চেয়ে রয়েছে। সুলেখার দিকে নয়, প্ল্যাটফর্মের ওপর ছড়ানো নুড়িগুলোর ওপরে।

অস্বস্তিকর নীরবতা। মিনিট চারেকের বেশী ট্রেন এখানে থামে না, অথচ মনে হ'চ্ছে, অনন্তকাল ধরে লৌহ-দানবটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

গার্ড সবুজ বাতিটা দোলাবার সঙ্গে সঙ্গেই শীতাংশু কথা বলল। আরে ভাল কথা, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে।

খুব মৃদু মন্থর গতিতে সবে ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করেছে। সুলেখা কামরার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। কি ভুল হয়েছে শীতাংশুর! আবার কি ভুল সে করল।

একটু ঝুঁকে পকেটে হাত দিয়ে শীতাংশু বলল, এই টাকাটা তোমার চাকরকে দিয়ে দিও। আমি আসার সময় তাড়াহুড়োতে দিতে একেবারে ভুলে গিয়েছি।

অন্ধকারে সুলেখা ঠিক বুঝতে পারল না। কি একটা যেন উড়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ল।

নীচু হ'য়ে তুলতে গিয়েই সুলেখা থেমে গেল। এক টাকার একটা নোট। বিবর্ণ একটা কাগজের টুকরো। কিন্তু তার পাশেই, একটু ইতস্তত করে সুলেখা তুলে নিল।

রক্তরাঙা গোলার্ক। চলতে ফিরতে কখন বুঝি সুলেখার খোঁপা থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিয়ে শীতাংশু নিজের বুক পকেটে রেখে দিয়েছে। হৃদয়ের সান্নিধ্যে।

এ কি বেহিসেবি কাজ করল শরীর-সর্বস্ব মানুষটা। দু'চোখ জলে ঝাপসা। মুখটা তুলেই সুলেখা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শীতাংশুকে নিয়ে ট্রেন অনেক দূরে সরে গিয়েছে। শুধু দুটো লাল পুচ্ছ দীপ্তি দেখা যাচ্ছে, নিষেধের রক্তচক্ষুর প্রতীক।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার নামে পাঠাতে হবে।

প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে ডাকটীকিট সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে।

গ্রাহকদের প্রতি

১। ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হয় না। মণি অর্ডারযোগে গ্রাহক চাঁদা 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

চাঁদার হার

	কলিকাতা মফঃস্বল (সডাক)
বার্ষিক	১৩ টাকা ১৬ টাকা
ষাণ্মাসিক	৬·৫০ নঃপঃ ৮·৫০ নঃপঃ
ত্রৈমাসিক	৩·৫০ নঃপঃ ৪·৫০ নঃপঃ

প্রতি সংখ্যার দাম ১৫ নঃ পঃ

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং এ বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
সাপ্তাহিক বিভাগ
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রেলওয়েকে আপনার দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে

বাড়ী-বাড়ী গিয়ে মাল নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পূর্ব রেলওয়ে করেছে কলকাতার তা অনুসৃত হচ্ছে। সাধারণ ভাড়ার উপর সামান্য কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে আপনিও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। রেলওয়ের অনুমোদিত কন্ট্রাক্টর মেসার্স রোজ কেরিয়ারস্, ২০, মল্লিক ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭ (টেলিফোন নং ৩৩-৬৮৮৬ এবং ৩৩-৭৮৯৪) অথবা হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট চব্বিশঘণ্টা আগে খবর পাঠালে, তাঁরা মাল পাঠানোর বা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যদিনে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেবার এবং সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত মাল নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ রবিবার এ সুবিধা পাওয়া যায় না, তবে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে রবিবার শুধুমাত্র পচনশীল মাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। কোন মালের ক্ষেত্রে বুক করার সময় বাড়ীতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ যদি না থাকে এবং প্রেরক যদি পরে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চান, তবে অনুমোদিত কন্ট্রাক্টরের কাছে আবেদন করলে রেলওয়ের স্থবিধাসাপেক্ষে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

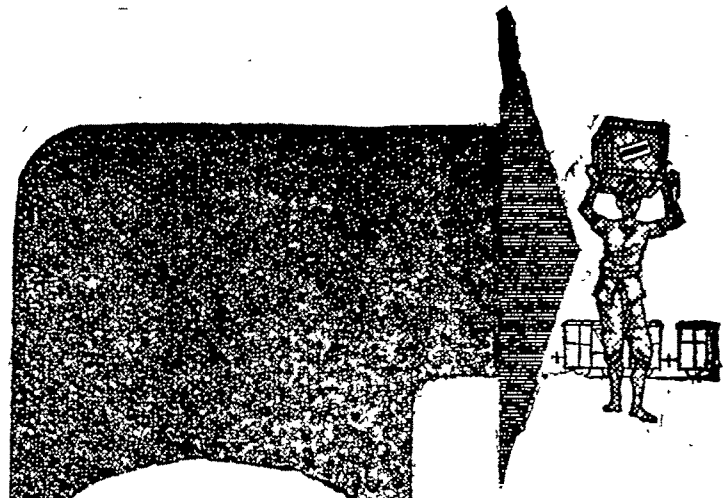

স্ট্রীট কালেকসন অ্যাণ্ড ডেলিভারী সার্ভিস

নীচের আটটি অঞ্চলে বিক্রয় মহলের সর্বত্র এই ব্যবস্থা চালু :

খিদিরপুর
বালিগঞ্জ
বেলিয়াঘাটা
শ্যামবাজার
টালিগঞ্জ
পার্ক ষ্ট্রীট
বৌবাজার
কাশীপুর

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন :—

(১) চীফ পার্সেলস্ অ্যাণ্ড লাগেজ ইন্‌স্‌পেক্টর, হাওড়া (পার্সেল ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৬৬-৩৪১১

(২) ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ (পার্সেল ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৩) গুডস ইন্‌স্‌পেক্টর, হাওড়া (গুডস্ ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৬৬-৩৩৫৬

(৪) গুডস্ অ্যাণ্ড ইয়ার্ড সুপারভাইজার, শিয়ালদহ (গুডস্ ট্রাফিক) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৫) চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর অফিস ৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-১, টেলিফোন নং ২৩-৬২৫১

(৬) সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার

পূর্ব রেলওয়ে

আন্তর্জাতিক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র চৌদ্দ বৎসর পরেই নব্য-ভারতকে যে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে এভাবে লড়াই করতে হবে ভারতের রাষ্ট্রনায়করা তা' স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বাদ থেকে। জনাব জিন্নার দ্বি-জাতি নীতি অবিভক্ত ভারতের জাতীয়তা-বোধে যে ফাটল ধরিয়েছিল কূটবুদ্ধি ইংরাজ সুকৌশলে সেই ফাটলকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ভারতবর্ষকে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিবেশী চীনের কাছ থেকে আক্রমণাত্মক কোন কাজ আমরা আশঙ্কা করি নি। চীনের সঙ্গে ভারতের সখ্যতা অনেক দিনের। দুই দেশ, দুই জাতির উপর দিয়ে বহু

দেশের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার নগ্ন আক্রোশে :

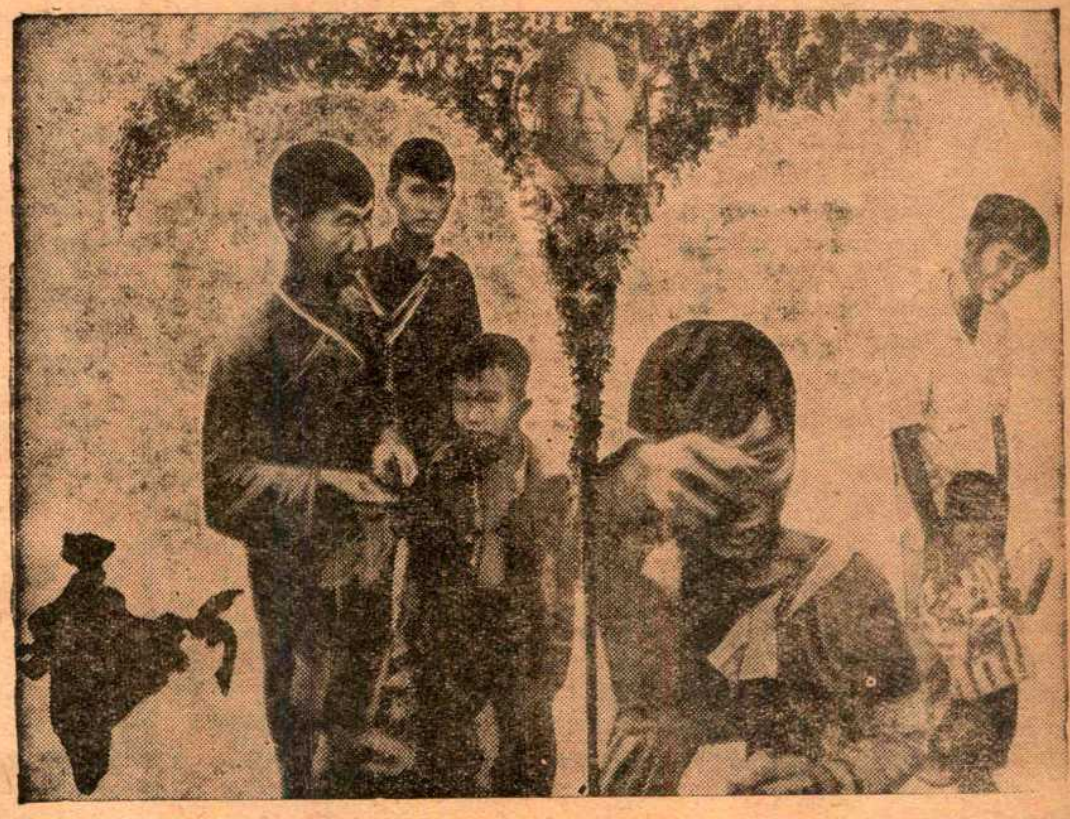

**চীনের প্রতি প্রান্তে অর্থনৈতিক সংকটের নগ্ন প্রকাশ * দারিদ্রের নির্মম ঘাতাকলে জীবন নিষ্পেষিত ** কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মানুষ সেখানে কান্নায় বোবা হইয়া যায় ॥ আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ নেতা হিংস্র দৃষ্টি তুলিয়া তাকায়, পথ কোথায়? তাই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য হানা দেয় শান্তিপ্রিয় ভারতের বুকে। যুদ্ধের মেঘ ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশে ছড়াইয়া পড়ে ॥

পাকিস্তানের সঙ্গে অবশ্য বিরোধ লেগেই ছিল; অবাঞ্ছিত হলেও সে বিরোধ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। দ্বিধাবিভক্ত করেছে। কাজেই জনাব জিন্নার সৃষ্টিধরেরা যদি সেই বিরোধের জের ক্রমাগত টেনেই চলেন তবে খুব ঝড় ব'য়ে গেছে, পরবশতার গ্লানি জমে উঠেছে উভয় জাতিরই জীবনে, নানা দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে চীন ও

পেয়েছে, স্বাধীন হয়েছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন উপেক্ষা করে দুই জাতিই বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টা করেছে—শুধু অতীতে নয় অতি সাম্প্রতিক কালেও। পণ্ডিত নেহরু পঞ্চশীল নীতি রচনা করেছেন। মাও সে তুন, চৌ-এন-লাই সে নীতিকে সমর্থন করেছেন, সে নীতি মেনে চলবার অঙ্গীকার করেছেন।

বেশী দিনের কথা নয় চীনের তিব্বত অধিকারের পরও ভারত ও চীনের দুই প্রধানমন্ত্রী পঞ্চশীলে আস্থাজ্ঞাপন করে এক যুগ্ম বিবৃতি প্রচার করেছিলেন ১৯৫৪-র জুন মাসে।

কিন্তু তবু সেই চীনের সঙ্গেই বিরোধ বাঁধলো। চীন প্রজাতন্ত্র আকস্মিকভাবে আক্রমণ করল ভারতবর্ষকে। পাকিস্তানের শত্রুতা ভারতবর্ষকে বিব্রত করেছে কিন্তু আহত করেনি। কিন্তু চীনের আচরণ ভারতবর্ষের বিশ্বাসকে প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত করেছে। প্রকাশ্যে যে শত্রুতা-সাধন করে সে শুধু দেহই পীড়ন করতে পারে, কিন্তু বন্ধুর মুখোস পরে যদি কেউ ছুরি মারে তবে দৈহিক পীড়ার চাইতেও মানসিক যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে পড়ে। চীন ভারতভূমিকে আক্রমণ করে ভারতীয় জনগণের মন কৃতঘ্নতার বিষে বিষিয়ে দিয়েছে। যে ভারতবর্ষ চিরদিন সবাইকে ভালবেসে এসেছে, অন্যকে ভালবাসতে শিখিয়েছে সেই ভারতবর্ষের মনে আজ নব্য-চীনের রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

গত ২১শে নভেম্বরের মধ্যরাত্রিতে আক্রমণকারী চীনাসৈন্য একতরফা ভাবে যুদ্ধ বন্ধ করেছে এবং ক্রমে তারা ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের সীমারেখায় সৈন্য অপসারণ করেও নিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বাধা দেয়নি, অপসৃয়মান চীনা সৈন্যকে পর্যুদস্ত করেনি। বরঞ্চ আশ্বাস দিয়েছে যে, চীন যদি সম্মানজনক সর্তে আপোস মীমাংসা করতে চায় তবে ভারতবর্ষ তা' বিবেচনা করতে রাজী আছে।

কিন্তু সবার মনেই আজ প্রশ্ন উঠেছে যে চীন কি আপোস-মীমাংসা সত্যিই করতে চায়? না বর্তমান সংস্করণ? প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে 'জরুরী অবস্থা' কবে শেষ হবে তা বলা শক্ত। চীনের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির অবসান যে হয়েছে এ কথা বলা চলে না।

সাম্প্রতিক ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর এই আশঙ্কাকে সমর্থন করেছে। চীন বলেছে যে কলম্বো প্রস্তাবের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট নয়; আর চীনের কাছে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভারতের কাছে দেওয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কলম্বো প্রস্তাবের রচয়িতারা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন শ্রীমতী বন্দরনায়ক স্বয়ং পিকিঙে ও দিল্লীতে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কাজেই দু'-দেশে দু'টো ব্যাখ্যা দেবার কোন অবকাশই এ ক্ষেত্রে থাকতে পারে না। আসলে চীন কোন মীমাংসায় আসতে চায় না, তাই যে-কোন ছল ছুতোয় সে কলম্বো প্রস্তাব বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর।

চীন যে ভারতের সঙ্গে পূর্ব সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে চায় না তার আর এক মস্ত প্রমাণ পাকিস্তানের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক সীমান্ত-চুক্তি। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরোধ যাতে মিটে যায় তারই জন্য দু'-দেশে যখন আলাপ আলোচনা চলছে ঠিক তখন ভারত-ভূমির এক অংশ পাকিস্তান চীনকে দান করে বসলো, চীনেরও তা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা গেল না। বরঞ্চ চীন আর পাকিস্তানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করবার চেষ্টা প্রবলতর হয়েছে।

আজ তাই সকলের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, চীন তার ভারত বিরোধী মনোভাব বদলাবে না, বদলাবার কোন আগ্রহই তার নেই। অদূরভবিষ্যতেই সে আবার তার আক্রমণ চালাবে কি না তা নির্ভর করছে চীনের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। কিন্তু একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, বিরোধ মীমাংসার চাইতে তাকে জীইয়ে রাখাটাই চীনের অভিপ্রেত। চীনের মনোভাবের [illegible] করা সহজ হবে যদি চীন কেন ভারত আক্রমণ করল তা নির্ণয় করবার চেষ্টা আমরা করি।

ভারত সীমান্তের যে ৫০ হাজার বর্গমাইল চীন নিজ এলাকা বলে দাবী করেছে তার সত্যিকারের রূপ কি? তার অধিকাংশ তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। দুর্গম, নির্জন ও নিষ্ফলা। শুধু এইটুকু অধিকারের সে ভারতবর্ষের মত একটা মিত্ররাজ্যের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হবে এ কথা অবিশ্বাস্য। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এতবড় আহাম্মক কেউ নেই যে, এ ধরণের হঠকারিতা করবে। তাই একথা ভাবা অন্যায় হবে না যে চীনা-রাষ্ট্রনায়কদের এই আক্রমণের পিছনে নিছক জমি দখলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও অনেক বড় দুরভিসন্ধি আছে।

আমেরিকার ধারণা চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবতারণা করেছে। আর ভারত-বর্ষকে তার আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে সে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত বলে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নাও হতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জাতীয় জীবনেও নেতৃত্বের মোহ এক সাংঘাতিক মোহ। প্রাচ্য দেশ-গুলোতে আজ নব জাগরণ সুরু হ'য়েছে—এশিয়া-আফ্রিকার রাজ-নীতিক রঙ্গভূমিতে নায়কত্ব করবার জন্য পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে চলাও খুব বিচিত্র নয়। আর স্বভাবতই চীন ও ভারতবর্ষ সমস্তরের বলে রেষারেষিটা তাদের মধ্যেই আগে বাধবে। পণ্ডিত নেহরুর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শুধু যে বিশ্ব রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তা নয়, এশীয় রাষ্ট্রগুলি অবিসম্বাদিত অন্যতম নেতা বলেও স্বীকৃতি লাভ সে করেছে। চীন যখন নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন সে বন্ধু বলেই ভারতকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রাচ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব সে বরদাস্ত করতে পারল না—সে সহজেই ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠলো। নিজেদের অর্থনীতির

ব্যর্থতায় বিব্রত চৈনিক রাষ্ট্রপ্রধানরা ভারতের অগ্রগতিকে সুনজরে নাও দেখতে পারেন।

কিন্তু চৈনিক আক্রমণ কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাপ্রসূত একথা ভাবা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রথমত শুধু ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হয়ে কোন জাতি অন্য জাতিকে আক্রমণ অন্তত এ যুগে করে না। কারণ এখনকার যুদ্ধে, ঝুঁকি খুব বেশী; সামান্য সংঘাত থেকেই যে-কোন সময়েই বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে; আর সে বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি আণবিক প্রলয় এ কথাও অবধারিত। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যেই যদি চীন ভারত-অভিযান করতো তবে দু'মাসের মধ্যেই সে সরে যেত না; আর বাধ্য হয়েই যদি সৈন্য অপসারণ তাকে করতে হোত তবে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই লোপ পেত। কিন্তু চীনের কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সীমানাচুক্তি গভীরতর কোন অভিসন্ধিই সূচিত করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্মরণীয় যুদ্ধের প্রধানতম কারণ ধর্মান্ধতা ও মতান্ধতা। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার স্থান বিগত দুই শতাব্দীতে মতান্ধতা অধিকার করেছে। ফ্যাসিবাদ-নাজীবাদ গত মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ। 'ইজম্'-এর দোহাই পেড়ে একটা সমগ্র জাতিকে যত সহজে তাতিয়ে-মাতিয়ে তোলা যায় আর কিছুতেই তা' যায় না। চীনা সম্প্রসারণ-বাদের পিছনে যে চীনা রাষ্ট্রনায়কদের রাজনীতির মতবাদ কাজ করছে আজ আর তা' গোপন নেই। রুশ-চীন মতবিরোধের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির ফলে সে সত্য আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় আসবার ফলে রুশ রাজনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েচে। রাশিয়া আজ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। সে আজ চায় নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি। চৌ-এন-লাই প্রভৃতি চীনা রাজনীতিকের মতে ক্রুশ্চভের মতবাদ মার্ক্স-লেনিন নীতির পরিপন্থী, তাই ক্রুশ্চভকে "revisionist", প্রকৃত কম্যুনিজমের শত্রু। শ্রেণী সংঘাত যদি মার্ক্সবাদের ভিত্তিভূমি হয় তবে পুঁজিবাদের সঙ্গে সহাবস্থানের অবকাশ থাকে কি করে? পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষের হাতে কোন ক্ষমতাই স্বেচ্ছায় কোনদিন তুলে দেবে না, সাধারণ মানুষকে তা পুঁজিবাদীদের হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। আর অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর কর্তব্য হচ্ছে অনুন্নত দেশের গণবিপ্লবের সব প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা। ক্রুশ্চভকে পুঁজিবাদী আমেরিকা যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে black mail করছে, তাই রাশিয়া আজ পুঁজিবাদীদের সঙ্গে মিতালী করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে আন্তর্জাতিক ধনসাম্যবাদের সমাধি রচনায় সহায়তা করছেন ক্রুশ্চভ ও তাঁর অনুগামীর দল। রাশিয়ার কিউবাকে সাহায্যদান ও পরে আমেরিকার হুমকীতে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে আসা দু'টোই নাকি ক্রুশ্চভের "adventurism"-র ফল। চীন নাকি তার সমর্থন করে না।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে সাধারণ মার্ক্সবাদীদের কাছে চীনের এই বিশ্লেষণ অভ্রান্ত বলেই মনে হবে; বিশেষ করে সেই সব দেশের মানুষ সহজেই এই ভাষ্যের অনুরাগী হবে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ এখনও শাসন চালাচ্ছে, পুঁজিবাদ শোষণ করছে মানুষকে। চীন ও চীনপন্থী মার্ক্সবাদীরা এই তথ্য আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে। এ কথা বললে অন্যায় হবে না।

ক্রুশ্চভ ও তাঁর অনুগামীরা কিন্তু চীনের মতবাদকে মার্ক্স-লেনিনবাদের ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁরা পাল্টা অভিযোগ করছেন যে চৌ-এন-লাই-এর দল ট্রটস্কির অনুগমন করছেন, সাম্যবাদের মূলনীতিকে বিকৃত করছেন। মার্ক্সীয় নীতির প্রকৃত ব্যাখ্যা কে করছেন তার বিচার-বিবেচনা আলোচ্য নিবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে; কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয়। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি চীনের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীই তার সম্প্রসারণবাদের মূল ভিত্তিভূমি।

চীন ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সদ্ভাবকে প্রীতির চোখে দেখতে পারে নি। তার ধারণা রাশিয়ার অহেতুক উদারতার ফলেই ভারত কম্যুনিষ্ট ব্লকে যোগ দেয়নি, পরন্তু ক্রমশ পুঁজিবাদীদের শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের সঙ্গে এদেশের সরকার ও তার সমর্থক দলের কোন যোগ নেই। সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য ভারতের জনগণ সম্পূর্ণ প্রস্তুত বাইরের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এখানকার জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারকে গদীচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে। ভারতের মত এত বড় ও এত সমৃদ্ধ এক রাষ্ট্রকে দলে পেলে এশিয়া ও আফ্রিকায় চৈনিকমার্কা কম্যুনিষ্ট স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

কিন্তু চীনের পক্ষে এই জঙ্গীবাদ কল্পনা করে নেওয়া যত সহজ রাশিয়ার পক্ষে তত সহজ নয়। চীন আণবিক শক্তির অধিকারী নয়, আর তা' নয় বলেই এই শক্তির ভয়াবহতা সে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। ক্রুশ্চভ আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন তাই আণবিক অস্ত্রের অধিকারী বিপক্ষ শিবিরকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। চীনা অভিযোগের জবাবে তাঁকে তাই বলতে হ'ল যে "The paper tiger (of Imperialism) had nuclear claws"। আর সেই নখদন্তের আঘাতে মানব সভ্যতা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে—আণবিক যুদ্ধের শেষে সমাজতন্ত্রের ফলভোগ করবার জন্য বড় বেশী কেউ আর বেঁচে থাকবে না। ক্রুশ্চভ আর তাঁর অনুগামীদের আজ তাই মার্ক্স-লেনিনবাদকে আণবিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে পর্যালোচনা করতে হচ্ছে, সহ অবস্থানকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

চীন দ্বিতীয় ভুল করেছে ভারতবর্ষ ও তার নেতা নেহরু সম্পর্কে। চীন ভেবেছিল যে নেহরুর জোট-নিরপেক্ষ নীতি একটা কথার কথা একটা ছলনার মুখোস মাত্র। আঘাত করলেই সে মুখোস খুলে পড়বে তিনি সোজা চলে যাবেন সামরিক গোষ্ঠী চক্রের খাঁড়ার ভিতরে। তখন রাশিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান যাবে যে সে ভুল করেছে। ভারত

যদি চীনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গ-আমেরিকার কাছে আত্মবিক্রয় করতো তবে সাম্যবাদী ভাইকে রক্ষা করবার জন্য রাশিয়ারও রণাঙ্গনে না নেমে উপায় ছিল না। কিন্তু খুব সহজেই বোঝা গেল যে নেহরুর পঞ্চশীল নীতি, তাঁর জোট-নিরপেক্ষতা মুখোস নয়, সেগুলো নব-ভারতের ধর্ম ও আদর্শ। দেশে ও বিদেশে বহুজন বহু চেষ্টা করেও গান্ধী-শিষ্য ভারত নায়ককে তার বিশ্বাস থেকে টলাতে পারে নাই। তাই আজ বিশ্বমত ভারতবর্ষের অনুকূলে। রাশিয়ার দ্বন্দ্বও পক্ষকালের বেশী স্থায়ী হল না। সে ভারতবর্ষকেই সমর্থন জানাল।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে চৌ-এর ধারণা যে সঠিক নয় তাও বোঝা গেল। তার জাতীয়তা বোধ যে তার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার অনেক ঊর্ধ্বে ভারতবাসী মুহূর্তের মধ্যে তা' প্রমাণ করল। গান্ধীপন্থী ভারত একদিন সমাজতন্ত্রকে হয়ত প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু সেজন্য বাইরের কারও সহায়তা তার প্রয়োজন হবে না। নতুন পদ্ধতিতে সে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এ প্রত্যয় তার আছে।

দৃঢ় প্রতিরোধ ও বিভিন্ন দেশের নৈতিক চাপের জন্য চীনা হানাদাররা ফিরে গেছে। কিন্তু ক্ষতি যে তারা করতে পারে নি তা' নয়। প্রথমত নেহরু-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় জনগণের কষ্টের মাত্রা বেড়েছে। তবু ভারতবর্ষ অবনমিত হয়নি। সে নেহরুর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়েছে।

প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে আজ চীনের সমর্থক দেশের সংখ্যা নগণ্য। পাকিস্তানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে নয় তা' বোঝা সহজ। এই মিত্রতার ফলে এক দিকে যেমন ভারত বিব্রত হবে অন্য দিকে তেমন ইঙ্গ-আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের ঘটবে অবনতি। পাকিস্তানে। এই উপমহাদেশে তার ঈপ্সিত ঘাঁটি পাকিস্তানের মাটিতে গ'ড়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে, অন্যান্য সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া চীন করতে বদ্ধপরিকর। সেই বোঝাপড়ার গতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে চীনের আগামী দিনের কর্মসূচী। সেই কর্মসূচীর স্বরূপ না জেনে ভারতবর্ষ কোনক্রমেই বর্তমান আপৎকালীন ব্যবস্থাকে শিথিল করতে পারে না।

কম্যুনিষ্ট চীনে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ

হিরণ্ময় কার্লেকর

কম্যুনিজ্‌মের সংগে চিন্তার স্বাধীনতার বিরোধ চিরকালের। তবে এ বিষয় অন্যান্য কম্যুনিষ্ট সরকারের চাইতে চীন সরকার অনেক বেশী উগ্র। তাঁরা তাঁদের শতপুষ্পের অলকাপুরীতে যে শুধু চিন্তার স্বাধীনতাকে কারারুদ্ধ করেছেন তা নয়, দেশের লোকে কি ভাবে কি ধারায় কখন কি চিন্তা করবেন তাও তাঁরা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করছেন।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁদের এই প্রচেষ্টা তিনটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়েছে (ক) জনসাধারণের চিন্তাধারাকে সরকারী চিন্তাধারার অনুগামী করা, (খ) তাদের মনে অবাঞ্ছিত চিন্তার অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা ও (গ) তাদের দৈনন্দিন আচারে ব্যবহারে সরকারী চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা। চীন দেশে চিন্তা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পরিধি উপলব্ধি করতে হলে এই ত্রিমুখী প্রয়াস কার্য্যকরী করার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তার আলোচনা প্রয়োজন।

এই আলোচনায় (ক) ও (খ) কে এক সংগে করে এবং (গ)র থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। প্রথম দুটি মানসিক জগতে এবং তৃতীয়টি মানুষের নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

প্রথম দুটি উদ্দেশ্য একই পন্থায় সাধিত হয়েছে—দেশের সমস্ত প্রচার মাধ্যমকে, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিমূলক কার্য্যকলাপকে এবং দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের সম্পূর্ণ অধীনে আনা ও সরকারী প্রচারে

প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে খবরের কাগজের প্রাধান্য অবিবেংসিত। সংবাদপত্র সম্বন্ধে চীনা কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী চীন সংবাদপত্র কুলতিলক জেন্‌-মিন্‌-জিহ্‌-পাও'র (পেকিং পিপ্‌লস্‌ ডেইলী) ১৯৫৬ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যার থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিলেই বোঝা যাবে। এতে বলা হয়েছে,...“জনসাধারণকে সাম্যবাদ শেখাবার জন্য, কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলি প্রচার করার জন্য, জনগণ ও পার্টির মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলার জন্য সংবাদপত্র হচ্ছে সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র।”

চীনের সংবাদপত্রজগৎ আজ সম্পূর্ণভাবে সরকারের অধীন হয়ে সরকারী প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। মসনদে আসীন হওয়ার পরই চৈনিক কম্যুনিষ্টরা সমস্ত অকম্যুনিষ্ট কাগজের (যেমন কুয়োমিনটাং পরিচালিত চুাং-য়্যাং-জিহ্‌-পাও এবং ক্যাথলিকদের দৈনিক য়ি-সিহ-পাও) প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত কাগজ চালু রয়েছে তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রচার দপ্তরের হাতে। এখানে প্রচারের সমস্ত বিষয় ঠিক করা হয়। এখান থেকে নির্গত হয় সংবাদপত্র মাধ্যমে প্রচারের জন্য এর নিজস্ব ঘোষণা এবং পরিচালনা ও সংবাদপরিবেশন বিষয় সংবাদপত্রগুলির উপর এর বিভিন্ন আদেশ নির্দ্দেশ।

পার্টির নাগপাশ আরও কঠিন

এজেন্সি ও জেন, মিন, জিহ পাও। প্রথমটির মারফৎ বিভিন্ন সংবাদ-সত্রগুলির কাছে সংবাদ পরিবেশনে পার্টির একাধিপত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ১৯৫০ এর পর থেকে এই এজেন্সির খবর প্রকাশ করা প্রত্যেক খবরের কাগজের পক্ষে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সরকার প্রচারিত খবর ছাড়া সমগ্র চীনদেশে কোন কাগজ আর কোন খবর প্রকাশ করতে পারে না। আর জেন্-মিন্-জিহ্-পাও? এটি হচ্ছে পার্টির নীতি ও চিন্তাধারার একমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-কারী। এ যে কেবল অন্য কাগজ-গুলিকে পথের আলো দেখায় তাই নয়, তাদের সবার উপর জবর খবর-দারী করে আর সময় সময় "সার্ভে এণ্ড কমেণ্টস অফ দি প্রেস" (সংবাদ পত্র জগতের নিরীক্ষা এর মন্তব্য) শিরোনামায় পদস্খলিত পত্রিকাগুলির সমালোচনা করে।

প্রচারকার্য্যের জন্য চৈনিক কম্যুনিষ্টরা সংবাদপত্রের মত বেতার ও শব্দবৃদ্ধিকারক (লাউডস্পীকার) যন্ত্রেরও প্রয়োগ করেছেন। ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, সহরে, গ্রামে—চীন দেশে লোকে যেখানেই যান না কেন তারস্বরে প্রচারিত সরকারী বেতার-ভাষণ থেকে অব্যাহতি নেই। এমন কি সবচাইতে পশ্চাৎপদ এবং প্রাচীনপন্থী গ্রামেও গাছের মাথায় লুকোনো শব্দ বৃদ্ধিকারক যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়।

এই বেতার ভাষণগুলি দিনরাত বিরাম বিহীনভাবে সরকারী প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এবং যাবতীয় সরকারী খবর, জাতীয় প্রগতি এবং শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি খবর পরিবেশন করে। এ ছাড়াও এগুলির মারফৎ নানা নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে—কি করে ধাতু গলাবার দেশী আধার তৈরী করতে হয়, কি করে চিয়াং গোষ্ঠী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে হারিয়ে দিতে হয়, কি করে ভাল কম্যুনিষ্ট হওয়া যায়, কি করে পরিষ্কার থাকতে হয়, কি করে শাঁখালু রান্না করতে হয়, কোথায় থুতু ফেলিতে হয় না—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সর্বঘটে এবং সর্বস্থানে বেতার ও শব্দবৃদ্ধিকারক যন্ত্রের এই উপস্থিতির একটা বিশেষ কারণ আছে। বিশাল চীনদেশের সত্তর কোটি অধিবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরতার পরিমাণ এখনও বহুল। সুতরাং এদের মধ্যে প্রচারের জন্য লিখিত বার্ত্তার চাইতে বেতারে প্রচারিত বাণীই বেশী কার্য্যকরী, বিশেষ করে যখন পরিবেশক এবং গ্রাহক যন্ত্রগুলিকে বন্ধ করা দূরে থাক, নিয়ন্ত্রণ করাও সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ ছাড়াও রয়েছে মৌখিক প্রচার। প্রায় প্রত্যেকদিনই পার্টির কর্ম্মীরা কোন না কোন বিষয়ে সভার আয়োজন করে এবং সেখানে উপস্থিতি সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক। বলা বাহুল্য যে এই সভাগুলি সরকারী প্রচার-কার্য্যের বাহকমাত্র। এগুলিতে বিভিন্ন সরকারী নীতি, সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়া-শীল ইত্যাদিদের চক্রান্তসমূহ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করা হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রচার পদ্ধতির চেয়ে মৌখিক প্রচারের একটি অতিরিক্ত গুণ আছে। এর দ্বারা জনসাধারণকে প্রচারকার্য্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলা যায় এবং জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

এরপর চলচ্চিত্র। চীনা কম্যুনিষ্ট-দের মতে এটি মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের একটি অতি উত্তম উপায় এবং চীন সরকার তাঁদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্রকলা দপ্তরের (ব্যুরো অফ দি সিনেমাটোগ্রাফিক্ আর্ট অফ্ দি মিনিষ্ট্রি অফ কাল্চার) মারফৎ সমস্ত চিত্র উৎপাদনকারী ষ্টুডিওগুলি করায়ত্ত করেছেন। প্রচারকার্য্যে চলচ্চিত্রের উপযোগিতা কতকগুলি পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। চীন দেশে প্রতিবছর চলচ্চিত্র দর্শকদের সংখ্যা হচ্ছে ২৫০,০০০,০০০, এবং এর কার্য্য-ক্ষেত্র কেবলমাত্র সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রায় আড়াই হাজার ভ্রাম্যমাণ দলের সাহায্যে এর প্রচার দেশের সুদূর কোণে কোণে বিস্তারিত হয়ে পড়ে। প্রচারধর্ম্মী চলচ্চিত্রের উদাহরণস্বরূপ ১৯৫২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারীর কুখ্যাত পিপল্স ট্রায়ালের উপর তোলা ছবির কথা বলা যেতে পারে। মঞ্চে আসীন অর্থমন্ত্রী পো-ই-পো ও পার্টির অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ সদস্যদের সামনে হাতকড়ি পরা বন্দীদের উপস্থিত করা, পো-ই-পো কর্তৃক তাদের ধিক্কার দেওয়া ও জন-সাধারণ কর্তৃক বন্দীদের রক্তের জন্য চীৎকার করা—সবই দেখানো হয়েছে।

প্রচার মাধ্যমগুলির মত চীনদেশে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিমূলক জীবনও নানা পাকে আবদ্ধ হয়ে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছে। এর গোড়ায়ও রয়েছে সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কতগুলি মৌলিক বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। চৈনিক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তরের উপ-পরিচালক শ্রীচৌ-য়্যাং। ১৯৫৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখের কোয়াংমিং কাগজে লেখেন, "আমাদের সাহিত্য, শিল্পসৃষ্টি ও সমালোচনার উচিত জনসাধারণকে তাদের কম্যুনিষ্ট সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করা এবং একটি কম্যুনিষ্ট লেখনশৈলী তুলে ধরা.....।"

চীন দেশের শিল্প ও সাহিত্য-জগৎকে সরকারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়েছে সমগ্র চীন দেশীয় শিল্প ও সাহিত্যচক্রগুলির যুক্তসংস্থা (অল্ চায়না ফেডারেশন অফ আর্ট এণ্ড লিটারারি সার্কল্স) ও তার বিভিন্ন শাখা উপশাখার মাধ্যমে। ছাপার আগে অনুমোদনের জন্য সমস্ত লেখককে এখানে পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হয়। যুক্তসংস্থা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে ও আলোচনার জন্য লেখককে ডেকে পাঠায়। আলোচনায় লেখার উৎকর্ষের চেয়ে অনেক বেশী জোর দেওয়া হয় লেখককে চিন্তাধারা সঠিক মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী কি না তা দেখায়। কোন কোন লেখককে আবার লিখতে হয়। শুধু তাই নয়, যুক্তসংস্থা লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর নানা ভাবে কর্তৃত্ব করে। এ শুধু কোথায় গিয়ে, কি বিষয় কি লিখতে হবে তাই ঠিক করে দেয় না, লেখায় যুক্ত করার জন্য লেখককে নানা সরকারী তথ্যও যোগান দেয়।

এবারে আসা যাক শিক্ষার

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার প্রথম সাহিত্যিক মিলন কেন্দ্র

চাণক্য সেন প্রণীত **রাজপথ জনপথ**

(তৃতীয় সংস্করণ)

দাম : ৬·৫০ নঃ পঃ

এক বৃদ্ধিপ্রধান সমস্যাকে ঔপন্যাসিক নিপুণতা ও সাহিত্যিক রসের সঙ্গে সার্থকভাবে উপস্থিত করেছেন।—আনন্দবাজার বলেন।

চাণক্য সেন-এর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও ঋজু, তাঁর বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাসের ঘোষণা আছে। রচনার জন্য লেখক অভিনন্দন-যোগ্য।—বলেন দেশ।

পাত্র-পাত্রী অনেক···তাঁরা সবাই দেখেছেন এই ভারতকে, আর তাদের দেখাকে দেখেছেন লেখক। এ দেখার তারিফ করতে হয়।—বলেন আকাশবাণী।

ইদানীংকালের সার্থক উপন্যাস।—বলেছেন যুগান্তর।

ধীরে বহে নীল—(তৃতীয় সংস্করণ) চাণক্য সেন। ৮·০০
[মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস]

মধ্যপঞ্চাশ—(দ্বিতীয় সংস্করণ) উপন্যাস। চাণক্য সেন। ৫·৫০

নবীন শাখী—(উপন্যাস) ২·৫০
সুবোধ ঘোষ

অবগুণ্ঠন—(উপন্যাস) ৩·০০
বিমল কর

প্রিয়ালতা—(উপন্যাস) ২·৫০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জলকন্যার মন—(উপন্যাস) ৩·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বধূ অমিতা—(উপন্যাস) ২·০০
হীরেন্দ্র দত্ত

মালবিকা অগ্নিমিত্র—
(উপন্যাস) ৫·০০
[মহাকবি কালিদাস-এর নাটককে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন অশোক গুহ]

দুই সখী—(গল্প গ্রন্থ) ২·০০
বিনয় চৌধুরী

অনূদিত উপন্যাস

করুণা কোরো মা— ৬·০০
ক্রিটফান জাইগ

তোরিয়ান গ্রের ছবি— ৪·৫০
অসকার ওয়াইলড

থ্যাঙ্ক ইউ জীভস— ৪·০০
পি. জি. ওডহাউস

অভাগা— ৬·০০
গর্কি

পরকীয়া— ২·০০
চেখভ

সান্তা লুসিয়া (গল্প)— ৬·০০
জন গলসওয়ার্দি

ক্যারি অন জীভস— ৩·৫০
পি. জি. ওডহাউস

বিভূতি বসু
রাগ রঞ্জনী
গান শোনা শেখার বই।
বহু গুণীর বহু মত এই বই-এ স্থান পেয়েছে। দাম—৪·০০

অজিতরঞ্জন গুপ্ত
বেচা কেনা সমস্যা
দাম—৪·০০
Salesmanship সম্পর্কে একমাত্র বই

নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ব্যাপারে। চীনে সব চাইতে নীচু ধাপ থেকে সব চাইতে উঁচু ধাপ পর্য্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কম্যুনিজম্ প্রচারে লিপ্ত। এমন কি শিশু-বিদ্যালয়ের শিশুদেরও সমবেত কণ্ঠে গাইতে শেখানো হয়—"কম্যুনিজম্ ভাল," "কম্যুনগুলো ভাল," "চেয়ারম্যান মাও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা"।

চীনে উদার সংস্কৃতিমূলক (লিবারেল আর্টস) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি বলতে যা বুঝি তার শিক্ষা একরকম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চীন সরকারের মতে যতদিন না কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে ততদিন এ সব অবান্তর জিনিষ স্থগিত রাখা যেতে পারে।

উদার সংস্কৃতিমূলক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থান এমন অধিকার করেছে রেড এণ্ড এক্সপার্ট ইস্কুলগুলি। এগুলিকে সময় সময় পিপল্‌স্ ইউনিভার্সিটিও বলা হয়ে থাকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদের একই সংগে সুযোগ্য কম্যুনিষ্ট ও কোন এক বিশেষ কারিগরী বিষয় দক্ষ করে তুলতে চায়। শিক্ষা দেওয়া হয় দু'টি অসংলগ্ন স্তরে। প্রথমটি কম্যুনিজমের মূল সূত্রগুলি ও সেগুলির বিবর্ত্তন, মার্ক্সীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও কম্যুনিজমের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে ছাত্রদের তাদের বিশেষ কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও চীনে কেবলমাত্র কারিগরী বিদ্যালয়ও আছে। এগুলির মধ্যে পলিটেক্‌নিক্ থেকে শুরু করে পূরোদস্তর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত সবই আছে। এগুলোতে যে কেবল নিয়মিতভাবে কম্যুনিজম প্রচার করা হয় তা নয়, ছাত্র ভর্ত্তিও করা হয় কম্যুনিজমের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। এর জন্য আবার ইস্কুল থেকেই ছাত্রদের উপর কড়া নজর রেখে দেখা হয় কে কম্যুনিজম সম্বন্ধে কতখানি আগ্রহী।

চীন সরকার শিক্ষার ব্যাপারে শুধু এখানেই থামেন নি। তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অপরাঙ্গ হিসাবে

পণ্ডিত ব্যক্তিদের বা বুদ্ধিজীবীদের বদলে পার্টির ঝানু সদস্যদের নিযুক্ত করে ষোলকলা পূর্ণ করেছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালের শীতকালে চীন ভ্রমণরত এক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীকে উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছিলেন, "আমার কোন বিদ্যালয়প্রসূত শিক্ষা নেই। আমি সারাজীবন একজন বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট সৈন্য ছিলাম।" চীনের সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আজ এ বিষয়ে একই অবস্থা।)

কিন্তু এত কাণ্ড করার পরও যে লোকে সরকার নির্দ্দিষ্ট পথে চলছে তার প্রমাণ কি? কড়া নজর রাখতে হবে যে তারা তাদের প্রতি ব্যবহারে ইঙ্গিতে সরকারী চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য ও সরকারী মতে অবাঞ্ছনীয় চিন্তাধারার প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করছে কি না। এর জন্য তৈরী হয়েছে এক বিরাট তত্ত্বাবধানকারী যন্ত্র, যার ভিত্তি হচ্ছে ষ্ট্রীট কমিটী নামক সংস্থাগুলি। চীনদেশের প্রতি সহরের, প্রতি গ্রামের, প্রতি রাস্তায় এই সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এগুলির প্রতিটির মাথা হিসাবে বসানো হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্রীড়নকদের। এদের কাজ হচ্ছে এদের এলাকাধীন পরিবারগুলির জীবনের উপর ঘনিষ্ঠ খবর্দ্দারী করা, [illegible]দের জীবনের নিভৃততম কোণগুলি [illegible]অনাবৃত করে সন্ধানী দৃষ্টিতে [illegible] করা। পুলিশের সঙ্গে এদের [illegible] যোগাযোগ। প্রকৃতপক্ষে [illegible]লিশের কাজ লাঘব করার জন্যই এই ষ্ট্রীট কমিটীগুলি এবং এদের [illegible]তন ষ্ট্রীট কাউন্সিলগুলি প্রতিষ্ঠিত [illegible]ছে। কোন কোন ষ্ট্রীট কমিটীর [illegible] সভায় স্থানীয় পুলিশের কর্ত্তা [illegible]ত থাকেন এবং এই সভাগুলিতে [illegible]তোক পরিবারকে উপস্থিত থাকতে হয়। শুধু তাই নয়, সপ্তাহে দুদিন পুলিশ থানায় এলাকার সমস্ত মহিলা-দের জড় করে তাঁদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়। যদি কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহার সন্দেহজনক বলে মনে হয়, তাহ'লে তাকে প্রতিদিন কমিটীর সামনে হাজিরা দিতে হয়, তাকে অন্য কারুর সংগে কথা বলতে দেওয়া হয় না এবং দৈনিক কাজের পর সোজা বাড়ীর পথ ধরতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কেবল মানুষের গৃহজীবন নয় কর্ম্মজীবনেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং অফিস, কারখানা ইত্যাদি অনুরূপ সংস্থা গড়ে উঠেছে।

চীনের এই সামগ্রিক এবং সর্ব্বাত্মক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস জর্জ্জ অরওয়েলের "১৯৮৪"এর দুঃস্বপ্নকে প্রায় বাস্তব করে তুলতে চলেছে। কিন্তু এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে বারে বারে স্বৈরাচারী একনায়কেরা স্বাধীন চিন্তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছেন। আধুনিককালে এই চেষ্টা করেছেন হিটলার, মুসোলিনি, তোজো ...করেছেন বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট এক-নায়কেরা। তবে কম্যুনিষ্টদের বেলায় বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তাদের প্রয়াস আদর্শগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিষ্ট শাস্ত্রমতে স্বাধীন চিন্তা একটি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জ্জোয়া মূল্যবোধ। আসলে যে কোন বিশেষ চিন্তাধারা যে কোন বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন মাত্র। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্র এবং সর্ব্বহারাদের স্বার্থে পরিচালিত। সেখানে সর্ব্বহারাদের আদর্শ বা সাম্য-বাদ ছাড়া আর কোন চিন্তা প্রকাশ করতে দেওয়া হতে পারে না, এবং এর প্রকাশকর্ত্তা হতে পারে সরকার, যা নাকি জনগণের প্রতিভূ কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত।

কিন্তু এইরকম সরলীকরণ দেখতে চকচকে হ'লেও ধোপে টেকে না। মানুষের চিন্তাধারা বিভিন্ন মুক, অদৃশ্য শক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শ্রেণীস্বার্থ তার মধ্যে একটি হলেও প্রধান নয়। বস্তুতঃ লেনিন যখনই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রসংগে শ্রেণীচ্যুত (de-classed) বুদ্ধি-জীবীদের কথা বলেছিলেন তখনই তিনি এই বিষয়ে মার্ক্সবাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। যদি নিজের চেষ্টায় শ্রেণীচ্যুতই হওয়া যায়, তা'হলে কি বলা যায় যে মানুষের চিন্তাধারা নির্দ্ধারণে শ্রেণীস্বার্থই সব?

মার্ক্সবাদের বহু গলদের মধ্যে এটি অন্যতম।

প্রকাশিত হ'ল

: বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থ :

● কেউ তত লাজুক নয় ● ৪·০০

সাগরময় ঘোষ	●	দণ্ডকারণ্যের বাঘ	● ৩·০০
রূপদর্শী	●	ব্রজবুলি	● ৩·৫০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	●	যখন যেখানে	● ২·৭৫
বিমল কর	●	এই দেহ অন্ধ মুখ	● ৩·০০
প্রমথ চৌধুরী	●	রবীন্দ্রনাথ	● ২·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	●	স্বর্ণ সঞ্চার	● ৩·৫০
আনন্দকিশোর মুন্সী	●	পরম লগনে	● ৪·৫০
বিমলাপ্রসাদ সম্পাদিত অলৌকিক গল্প সংকলন	●	অন্তর্ভুবন	● ১০·০০

: যন্ত্রস্থ : রূপদর্শীর ● চেনা মুখ ৩·৫০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুমারসম্ভবের কবি ৩·৫০

: প্রাপ্তিস্থান :

বীথিক

গ্রন্থভারত
৪১বি রাসবিহারী এভেন্যু,
কলি-২৬, ফোন ৪৬-৭৫২৯

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলি-১২

১৩২এফ, প্রিন্স গোলাম মহঃ রোড, কলি-২৬, ফোন ৪৬-৮৪৭৫

বিজ্ঞান বিচিত্রা

কিছুদিন আগে সংবাদ-পত্রের মারফৎ জানা গেল, ফলিত-গণিতে গবেষণা করার জন্য নালেকার নামে একজন তরুণ ভারতীয় গণিত-শাস্ত্রবিদ্‌কে সম্প্রতি প্রচুর সম্মান দেখানো হয়েছে। নালেকার কেম্ব্রিজ-এর কিংস কলেজের "ফেলো" নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিদ্বজ্জন-সমাজে তাঁর কাজ নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ জানা গেল, নালেকার নাকি নিউট্রিণো নামক মৌল-পদার্থের কাল নিরপেক্ষ ইকোয়েশন্ (equation) উদ্ভাবন করেছেন। সেটা যে কী বস্তু তা' আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। আমরা শুধুমাত্র কল্পনা কত্তে পারি এ কথা সত্য হলে নিউট্রিণোর গতি নিশ্চয় অতীতের দিকেও চালিত হতে পারে! বিখ্যাত "পাঞ্চ" (Punch) কাগজে এই নিয়ে একটা অভিনব রসিকতা করা হয়েছে! (সুধীজন বুঝতে পারবেন, কত বড়ো দুর্লভ সম্মান—এই "পাঞ্চে"র রসিকতা!) সেখানে যা' বলা হয়েছে তার সার মর্ম্ম এই,—এর পর আর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসী অস্ত্র (anti-missile missile) তৈরী করার প্রয়োজন নেই; গুটিকয়েক নিউট্রিণো-বোমা বানালেই চল্‌বে—যা'র সঞ্চরণ বর্ত্তমান থেকে কালাতীতে। কারণ, আজ যদি রাশ্যা থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে কোনো আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (I.C.B.M.) পাঠানো হয়, তা'হলেও বিচলিত হওয়ার কারণ নেই—শুধু অতীতে সঞ্চরণশীল একটি নিউট্রিণো বোমা রাশ্যার অভিমুখে পাঠালেই চল্‌বে, যার কাজ হবে রাশ্যার অন্তর্গত ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিটিকে অস্ত্র-নিক্ষেপের আগেই ধূলিস্যাৎ করে দেওয়া। চমৎকার সহজ এবং সরল সমাধান নয়? একেবারে হিং টিং ছট!

* * *

কথাটা কিন্তু সবই পরিহাসের ব্যাপার নয়। আমাদের নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময়েই মৌলিক পদার্থ-বিদ্যার গূঢ়ার্থ নির্ণয় করার জন্য উদ্ভট-কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে আমাদের উপায় নেই! আইন্‌স্টাইনের আপেক্ষিকতা-তত্ত্বই কি আমরা বুঝতে পারি?

তবু, এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি আমি একটা বিশেষ কারণে। নালেকারের গবেষণার আসল তত্ত্ব

শান্ত রক্ষিত

আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে হ'তে পারে। কিন্তু এই তরুণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন একটা তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন—যা অভিনব এবং মৌলিক, বহুজন ভুক্তের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নয়। এই ইঙ্গিতকে অনুসরণ করলেই যে বিরাট কোনো সত্যের আবিষ্কার হবে অথবা বিজ্ঞানে একটা যুগান্তর হবে—এ কথা কেউ হলফ করে বল্‌তে পারে না। স্বর্ণের সন্ধানে বেরিয়ে নানা স্থানে নানা সূত্রের অন্বেষণ ক'রে সবাই কী আর স্বর্ণের সন্ধান পায়? শুধু দু'একজন ভাগ্যবান পুরুষের কপালেই সোনার খনি জুটে যায়। গণিত শাস্ত্রের বেলায় অন্ততঃ এই কথাটাই সম্পূর্ণ খাঁটি। সুতরাং, নালেকারের গবেষণার অন্তিম পরিণতি কী হবে বলা শক্ত। বলার প্রয়োজনও নেই। তথাপি মনটা আনন্দে ও গর্ব্বে ভরে যায় এই কথা ভেবে, যে আমাদের দেশের অন্ততঃ একজন বিজ্ঞান সেবী মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ' নয় যে, নালেকারই একমাত্র ভারতীয় যিনি মৌলিক গবেষণা করছেন। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আরো ভারতীয় কেউ কেউ আছেন যাঁদের অভিনিবেশ এই ধরণের জ্ঞানান্বেষণে। কিন্তু এটাও ঠিক যে এদের সংখ্যা যৎ-সামান্য, এবং এদের দান যৎকিঞ্চিৎ মাত্র।

শুধু প্রয়োগ-বিজ্ঞানেই নয়, সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রেই, আমরা ভারতীয়েরা অনেককাল দেউলিয়া হয়ে গেছি। এ কথা প্রকাশ্যে বল্‌লে, আজকের দিনে শুধু ঘোর প্রতিবাদ হবে তাই নয়; যিনি বল্‌বেন, তাঁর প্রায় জীবন-সংশয় হবে। বিনা দ্বিধায়, তক্ষুণি তাঁকে স্বজাতি-দ্রোহী, দেশপ্রেমহীন প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করা হবে। তবু, ঐ বিপদ মাথায় নিয়েও মাঝে মাঝে আমাদের এ কথাটা প্রকাশ্যে বলা প্রয়োজন। যে দৈন্য, যে নিঃস্বতা আমাদের জাতির সামগ্রিক বিকাশের আজ পরিপন্থী হয়ে উঠেছে—তার সম্বন্ধে জাগ্রত এবং সচেতন না হ'লে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার মহতী বিনষ্টি হওয়ার আশু সম্ভাবনা। তাই কোনো মতেই আজ আর আত্ম-প্রত্যয়ের নামে মিথ্যা অহঙ্কারকে আশ্রয় দেওয়ার সমর্থন করা [redacted] না।

বহুকাল আগে—প্রায় দু[redacted] বছর হোল—সুশ্রুত মুনি [redacted] পাঠকদের উদ্দেশ করে সাবধান ক[redacted] দিয়েছিলেন—যেন তাঁরা 'চন্দনবাহী খরে'র মতো বিদ্যাকে শুধুমাত্র বোঝা না করে ফেলেন। গাধা শুধু চন্দনের ভারটাকেই টের পায়, চন্দনগন্ধের আস্বাদ পায় না—'ভারস্য বেত্তা ন

ডাঃ জি, সি, দের

এণ্টিকফিল,

স্কিন্ টানিক্

ইহাতে ফোড়া, কার্বঙ্কল, ব্রণ, খোস, চুলকণা, সকল রকম ক্ষত আরোগ্য করে।

বাস! বাস!! বাস!!!

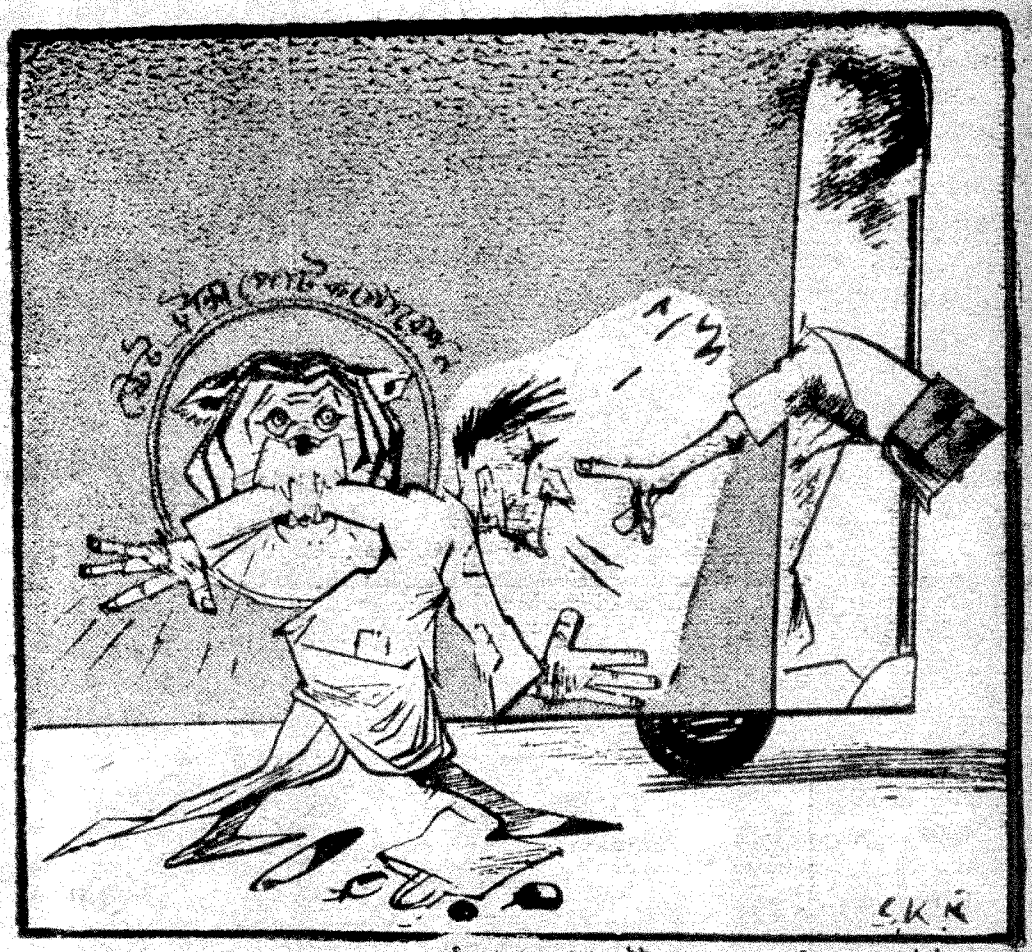

কলিকাতায় আবার বেঁচ বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠিয়াছে

ছু চন্দনম্ভ।' সুশ্রুতমুনির সে বাণী আজ আমাদের সবারই বিশেষ ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন। বেদ, উপনিষদের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ, শঙ্কর, বুদ্ধ, শ্রীহর্ষ, নাগার্জুন প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারায় পুষ্ট আমাদের জাতির মন—এই অভিমানে মত্ত হয়ে আমরা ভুলতে বসেছি যে শুধু ঐতিহ্যের সম্বল নিয়ে কোনো জাতিরই মানসজীবনের অন্তিত্বরক্ষা সম্ভব নয়। আমরা আজ এমনই আত্ম-বিস্মৃত, আমাদের খেয়াল নেই, —যে, সনাতন চিন্তা ও ভাবধারা সহস্রাধিক বৎসর ধরে এ যাবৎ আমাদের মানসজগৎকে প্লাবিত ও সরস করে রেখেছিল, সে ধারা এখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শুষ্ক রেখা-মাত্রে পরিণত। অথচ, বৃহত্তর মানব-সমাজে—বিশেষ করে, তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে, যে চিন্তাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে এবং নিত্য নব নব ধারার সংযোগে পুষ্ট ও স্ফীত হচ্ছে—তার বহুধারার সাথে আমাদের জাতিমানসের কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই।

কী বিজ্ঞানে, কী দর্শনে, কী সমাজতত্ত্বে—বিদ্যা ও প্রজ্ঞার কোনো ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কোনো মৌলিক চিন্তার দান বহুকাল ধরে আমরা ভারতবাসীরা কি নি একজন রমণ, কী একজন সত্যেন বসু, কী একজন চন্দ্রশেখরণের কাজ নিয়ে যে হাস্যকর গর্ব আমরা করে থাকি সে আমাদের চরম দীনতা ও রিক্ততারই পরিচায়ক।

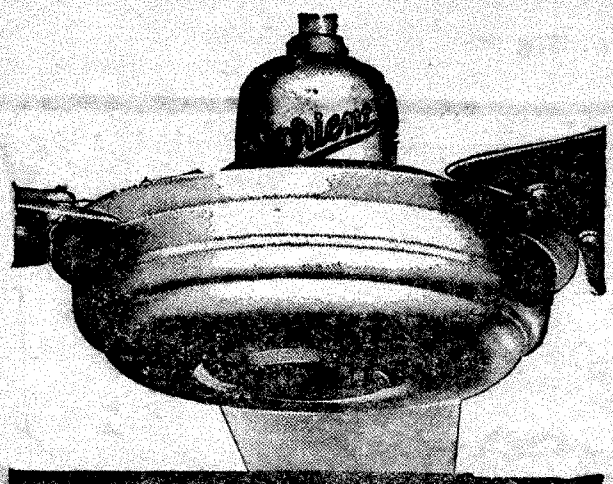

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH
BETTER ENGINEERING

Orient
FANS

Years ahead in looks and performance

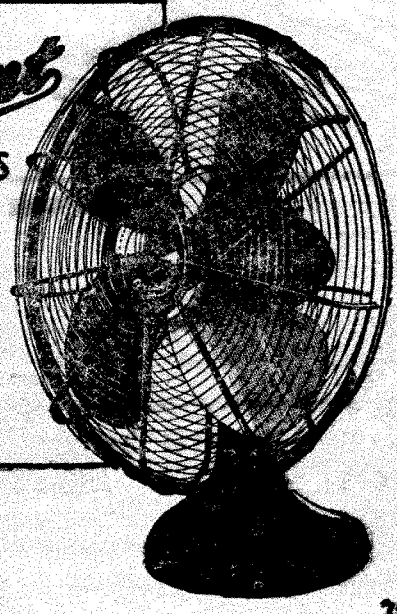

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-13

বিবেকানন্দ ও বেদনা

রাম ও কৃষ্ণের, বিবেক ও আনন্দের, বীর্য ও বেদনার অংশীদার বিবেকানন্দের চিত্তে কোনদিন সুখ ছিল না। তখন ভারত-পথিক সন্ন্যাসী এই দেশের মানুষদের চেহারা বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় প্রত্যক্ষ পাঠ করতে পাগলের মতো কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেণে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বীর বিক্রমে, দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে। কঠোর তপশ্চর্যার, কঠোরতর প্রতিজ্ঞার কঠিন প্রতীক সেই মুখের দিকে তাকানো যায় না বেশিক্ষণ। দ্বিপ্রহরের সূর্য যেন হন হন করে হেঁটে গেছে বৈরাগী বৈশাখের ভীষণ শুকনো প্রান্তর দিয়ে। কে থামাবে তাঁকে? কে তাকাবে তাঁর দিকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে ঝলসে যাবে সুনিশ্চিত! স্বামী বিবেকানন্দের আগুনজ্বালা পথ পরিক্রমার নিঃসঙ্গ ভারত যাত্রার দিনে খবর গেল মঠ থেকে, প্রিয় সন্ন্যাসী গুরুভায়ের মৃত্যু হয়েছে হঠাৎ।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর শুষ্ক বৈশাখী চোখে নেমেছে আষাঢ়ের উদ্গত অশ্রু। কে জানতো রৌদ্রুক্ষ মাটির বুক ভেদ করে উঠতে পারে উচ্ছ্বসিত করুণার নির্ঝরিণী।

কে প্রশ্ন করেছে নির্বোধের মতো, স্বামীজী, আপনার চোখেও জল?

খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিদ্যুতের মতো সেই বাঁকা তলোয়ার। ঝলসে উঠেছে বীর্যের আলোয়, বিবেকের বাণী: সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি অমানুষ হয়ে গেছি?

মানুষের কুসংস্কারে যে চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়েছে, মানুষের দুঃখে সেই চোখ দিয়ে বেরিয়েছে জল। জীবনের প্রথম প্রভাতের অরুণ মুহূর্ত থেকে, যৌবনের তরুণ মুহূর্তে, জীবনের দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার করুণ মুহূর্তেও স্বদেশের জন্য সীমাহীন দুঃসহ, দুর্বহ দুঃখ তাঁকে সুখ দেয়নি। ঈশ্বর যাঁকে রূপোর চামচে মুখে করে পাঠিয়েও কপালে লেখেন নি সুখ, দক্ষিণেশ্বর তাঁকেই দিয়েছিলেন মহৎ 'অসুখ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছেন, নরেনকে: কি চাস তুই আমার কাছে?

মুহূর্তকাল দ্বিধা না করে, বলেছে বীরেশ্বর: নির্বিকল্প সমাধি! ইচ্ছে করে একেকবার পাঁচ ছদিন ডুবে যাই

নালকণ্ঠ

সমাধিতে। মাঝে মাঝে এক-আধবার উঠি, দেহরক্ষার জন্যে—

তীব্র তিরস্কারের, ক্ষমাহীন ভৎর্সনার বিপুল তরঙ্গ উঠেছে করুণার সিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণে: ছি, ছি, ছি, আমি কোথায় ভেবেছি তুই বিরাট বটবৃক্ষের মতো হবি; তোর ছায়ায় প্রাণ পাবে আর পাঁচজন। আর তুই কি না তুচ্ছ সুখের জন্যে—।'

কণ্ঠ রুদ্ধ হয় কৃষ্ণের; বাঁশী সঙ্গীতহারা!

বিবেকানন্দ যেদিন নরেন ছিলেন সেদিন দর্শন তাঁর চিত্তে সুখ দেয়নি। ঈশ্বরতত্ত্বের দর্শন নয়, ঈশ্বরদর্শন করেছে

কি না কেউ, সেই প্রশ্ন তাঁর চিত্তকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন বললেন যে, না, তিনিও ঈশ্বরদর্শন করেননি, তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো তরুণ নরেন। কে তাকে বললো, এখনই অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা! দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শী আছেন এক তার কাছে যাও। তোমার প্রশ্নের উত্তর দে জন্যে সেখানে জেগে আ শ্রীরামকৃষ্ণ। নদীর কানে ডাক এ পৌঁছল সিন্ধুর। নরেনের জী কৃপাসিন্ধুর। বীরেশ্বর এলেন দক্ষি শ্বরের কাছে।

আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

হ্যাঁ; এই যেমন তোমা দেখছি—

চরম প্রশ্নের পরম উত্তর! পৃথিবীতে সেই একবার তার উত্তর উড্ডীন। সেই এক মুহূর্ত পেয়েছিলেন চির অসুখী বিবেকানন

সুখের অজস্র ধারা বর্ষণের দি জীবনের দরজায় এসে দাঁড়ায় দুঃখ রথ!

দুহাতে রোজগার চার হাতে খ

করে কপর্দকশূন্য অবস্থায় দেশ মারা গেলেন বিশ্বনাথ দত্ত। মাথা হাত দিয়ে বসলেন সংসারিক দুঃখে ভীষণ মূর্তির সংগে অপরিচিত নরেন দিন যায়; তবু যেন দিন যায় না ঈশ্বর, দয়া, মায়া, সংগীত সব যায় বিশ্বাস চলে যায় উপবাসী নরেন ঘরে ফেরে চেঁকুর তুলতে তুলতে

যেন বন্ধুর বাড়ীতে ভূরিভোজন করে ফিরল সে। যদি তার অংশও মা-ভাইয়ের মুখে ওঠে দুটো।

সকালে শয্যা ত্যাগ করে তবু ঈশ্বর নাম নেয় নরেন। সে নামে অভিমানে ক্রুদ্ধ হন ভুবনেশ্বরী; চুপ কর ছোঁড়া! ঈশ্বর তো সব করলেন তোর—

ঈশ্বর যদি না করেন কিছু তবু আছেন দক্ষিণেশ্বর—

—আপনার মা-কে বলে আমার মা-ভায়ের অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করে দিতে পারেন না?

নরেনের প্রশ্নে বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া পড়ে ধ্যাননিমীলিত দুই চোখে দক্ষিণেশ্বরের: তুই সে মা-কে বিশ্বাস করিস না! আমি বললে কি হবে? তুই নিজে গিয়ে বল মা-কে। আমি বলছি, তুই যা চাইবি মায়ের কাছে, মা তোকে তাই দেবে—

মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করে ছেলে, গর্ভধারিণী মায়ের অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করবার সংকল্প নিয়ে। প্রবেশ করে দেখে সৃষ্টির গর্ভধারিণী এ কে? সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী, বীর্য, বৈরাগ্য, মোক্ষ এর পায়ের তলায় দলিত সর্পের মতো শূন্যদন্ত শায়িত, লোকমান, অর্থ, সামর্থ্য দূরে কম্পিত দণ্ডায়মান, সূর্য-শশী-তারা অংগাভরণ যাঁর তাঁর কাছে কে চাইবে সামান্য বস্তু। তুচ্ছ ভাত ডালের কথা তুলবে কে তার কানে? নরেন্দ্র বললে: আমাকে জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও, দাও শুদ্ধা ভক্তি—

কি রে চেয়েছিলি মা'র কাছে মনের তেষ্টা মিটিয়ে সব—

না—

না কি রে?

পারলাম না, টাকাকড়ি, অন্নবস্ত্র চাইতে—

যা, যা, আবার যা! এবার খুব সাবধান—

সাবধানের মার নেই; আবার মারেরও সাবধান নেই। বারবার তিনবার উচ্চারিত হ'লো সেই এক প্রার্থনা: বৈরাগ্য দাও, দাও শুদ্ধা ভক্তি! আমি আর কিছু চাই না মা—

নিজের অন্নকষ্ট তাকে অন্য কষ্টের চেয়ে চল্লিশ কোটি মানুষের অন্নকষ্ট দূর করার দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্দীপিত করেছিলো। যার রুজি রোজগারের ক্ষমতা নেই ভগবানকে ডাকার অক্ষমতা তার নয়, আমাদের লজ্জার কারণ, এছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারেননি যিনি, তিনিই অসুখী বিবেকানন্দ। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে নিজের চোখে দেখবার পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই মাটির দুঃখ, এই মাটির দুঃখ দূর না করা পর্যন্ত মুক্তি মূল্যহীন।

সেই দুঃখ দূর করবার জন্যে বহু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়ে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রথম দিনে কে বলেছিলো, শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন এ ছিলো না—

বীরেশ্বরের কণ্ঠে উদ্গীত হয়ে ছিলো তাঁর জীবন ও বাণী: আমি তোর রামকৃষ্ণের কি আর কারুর চেলা নই। আমি চেলা ওই চল্লিশ কোটি মানুষের, যাদের পেটে ভাত, পরণে কাপড় নেই; যারা অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আমাদের অপরাধে যারা প্রায়শ্চিত্ত করছে যুগ যুগ ধরে, তাদের দুঃখ দূর করাই আমার ধর্ম, আমার কর্ম, আমার জীবনের ও কর্মের মর্ম—।

তারপর অস্ফুট বলেছিলেন: অনধিকারী কে শ্রীরামকৃষ্ণকে তোরা বুঝেছিস? আমি বুঝিনি?

এই বিবেকানন্দকে আমরা বুঝিনি। এই বিবেকানন্দের ঈশ্বর কেবল দক্ষিণেশ্বরে নয়, উত্তরে-দক্ষিণে ঊর্দ্ধে-অধে সমস্ত নরের মধ্যে যিনি বহুরূপে সম্মুখে তোমার! কাম-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্যের সর বিদ্ধ কোটি মানুষের মধ্যে ওই একটি ঈশ্বর-বিদ্ধ মানুষ,—চির অসুখী বিবেকানন্দ!

যাবার আগে, কর্মব্যস্ত দিনের মধ্যপথে, মধ্যাহ্ন সূর্যের হঠাৎ বিদায় নেবার বিস্ময়-প্রত্যাবর্তনের প্রাক্-মুহূর্তে বলেছেন অসুখী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: আরেক বিবেকানন্দ থাকলে সে বুঝতো এ বিবেকানন্দ কি করে গেছে!

বিবেকানন্দের অসুখ আমাদের অসুখ নয়। তাঁর অসুখ মহৎ অসুখ। বুদ্ধের অসুখ, যীশুখ্রীষ্টের অসুখ, স্বামীজীর অসুখ মহৎ অসুখ। মানুষের দুঃখের মূল খুঁজতে গিয়েছিলেন বুদ্ধ। মানুষের দুঃখের মূল বোঝাতে অমূল্য জীবন দিয়েছেন যীশু। মানুষের দুঃখ দূর করবার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে এসেছিলেন বিবেকানন্দ। বৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি, মুক্তি তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে স্বামীজীর চোখে। তখন ভারতবর্ষ তাঁর ঈশ্বর, ভারতের মানুষের দুঃখ তাঁর দুঃখ।

ব্যক্তিগত মুক্তির সুখ নয়; কোটি কোটি ব্যক্তির সুখের চিন্তাই এই একটি ব্যক্তির অসুখ।

বিবেকানন্দের আগেও যেমন, বিবেকানন্দের পরেও তেমনই আরও কেউ কেউ ঈশ্বরদর্শন করবে। মুক্ত হবে তারা। যিনি কখনও মুক্ত হবেন না, তিনিই বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন, কালে আরও কত বিবেকানন্দ আসবে। আসবে তারা। মানুষের মধ্যে তারা ঈশ্বর দর্শন করবে। মানুষের আধি-ব্যাধি থেকে নিরাপদ দূরে নিশ্চিন্ত বসে ধ্যান করবে না মুক্তির। তারা শুধু ভারত বর্ষের নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নিজেরা হবেন না মুক্তিকামী।

মার্কাস স্কোয়ারে
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের
প্রদর্শনীতে
—বসুমতীর ষ্টলে—
বসুমতীর অমূল্য
গ্রন্থরাজি
১৫% কমিশনে বিক্রয়
করা হইতেছে।

আমাদের প্রতিবেশী

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীনলিনাকুমার ভদ্র

কোন স্থান থেকে এসে এরা সিকিমে বাস পত্তন করেছিল এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। জে, সি, হোয়াইট তাঁর Sikkim and Bhutan নামক বইয়ে বলেন: লেপচারা এসেছিল তিব্বত থেকে নয়, কিন্তু আসাম এবং উত্তর ব্রহ্মের পর্বতমালার পূর্বদিক থেকে। এদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি সমূহ অনুসারে কিন্তু হিমালয়ই হচ্ছে এদের আদি নিবাস। একটি লোক-শ্রুতিতে এই তথ্য বিধৃত আছে যে, তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বত হচ্ছে এদের উৎপত্তি স্থান। শিকারীদের রক্ষাকর্তা পুমরুম বাস করেন সেখানে, লেপচাদের পরম দেবতারও নাম পুম-রুম।

লেপচা বা রঙরা বলে যে, মূলতঃ তারা হচ্ছে শিকারী জাত। তিব্বতী নেপালী এবং ভুটানীদের বহু আগে তারা না কি তাদের দেশে এসে বসতি-স্থাপন করেছিল। সেই অতীতকালে সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সমূহের উপর ছিল তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। বনের পশু-পাখী, গাছপালা এবং ফলমূলের কথা জানা আছে এদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। ফলমূলের মধ্যে কোনগুলি ভক্ষ্য এবং কোনগুলি বিষাক্ত তা তারা না চেখে শুধু চোখে দেখেই বলে দিতে পারে। অনাবৃষ্টির দরুণ অজন্মা হলে লেপচাদের অনশনে থাকবার আশঙ্কা কম, কেননা তখন জঙ্গল থেকে খাদ্য হিসাবে জোগাড় করে নেবে তারা আহার্য বৃক্ষপত্র ফলমূল ইত্যাদি। এই ধরণের একটি বৃক্ষমূল হচ্ছে দায়ুত বাক। মাটি খুঁড়ে এটিকে নিয়ে এসে ছোট ছোট টুকরো করে তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এতে বিষটা কেটে যায় এবং গাঁজলা মিশিয়ে তৈরি করা হয় একপ্রকার মদ। আর একপ্রকার গাছের শিকড়ের নাম দগ-কে অথবা বোক-য়িক। এটি কেটে সিদ্ধ করে গুঁড়ো করা হয়। এ দিয়ে যে রুরুয়া তৈরি হয় তা খাওয়া হয় ভাতের বদলে।

কোনো কোনো রঙ শিকারে অত্যন্ত অনুরক্ত। মাঝে মাঝে শিকা সন্ধানে তারা চলে যায় দূর বনা এবং মাসের পর মাস কাটিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। নি প্রাণীগুলিকে নিজেদের বাড়ীতে পা দেন তারা অপরের মারফ গোমাশিরুম, গোম-ইয়ু রুম প্র কতিপয় দেবতার উপর এই স শিকারীর গভীর শ্রদ্ধা। কোনো কো ওস্তাদ শিকারীর কাহিনী রোমাঞ্চকর যে তাকে রূপকথার না বলে মনে হয়। এমনি এক অব্যর্থ শিকারী ছিল আ-চি, বোঙ্-থিঙ-বাবা। অকুতোভয়ে সে বাঘ এব হাতীর অনুসরণ করত। চোখে তার আগুন। হিংস্র প্রাণীরা সে জ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারত আতঙ্কে ছুটে পালাত।

'রঙ'রা অন্তত তাদের একা যে মূলত ছিল নির্ভেজাল শিকা তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই এ প্রসঙ্গে Gorer বলেন, "কাহল্যো

অরণ্যে আনন্দ

নিতে জানা গেল যে, সপ্তদশ শতক হওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত তারা ছিল পুরোপুরি যাযাবর। তখন শুধুমাত্র সাময়িকভাবে কুঁড়েঘর তৈরি করত এবং ইতস্তত বেড়াত বন থেকে বনান্তরে। বৃত্তি করত তারা শিকারে নিহত পশু মাংস এবং বুনো ফলমূল খেয়ে। তৈরির জন্যে লোহার ব্যবহারের রেওয়াজ হয় এদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। স্থায়ীভাবে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস শুরু করে প্রায় আন্দাজ এক-পুরুষ পরে।

রঙদের বাসগৃহগুলি নেপালী, ভুটানী এবং তিব্বতীদের চাইতে আলাদা ধরণের। তা পাহাড়ের ঢালুতে এমনভাবে নির্মিত যে পিছন দিককার বেড়া খাড়া থাকে একটি পাথরের ভিতের উপর। ঘরের ভিতরটা কয়েকটি কামরায় বিভক্ত। চুল্লী থাকে সবচেয়ে বড় কামরাটিতে। কোনো কোনো বাড়ীতে আলাদা একটি কক্ষে বেদীর উপরে থাকে দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য দানের ব্যবস্থা। এই প্রথাটি সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা।

রঙ মেয়ে পুরুষ সবাই হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ঢিলা পায়জামা পরে। মেয়েরা তার উপর একটি কাপড়ের নীবিবন্ধের সাহায্যে কোমরে জড়িয়ে রাখে একটি বস্ত্র খণ্ড। গায়ে দেয় একটি আঙিয়া। আগেকার দিনে নিজেদের পরিধেয় লেপচারা নিজেরাই বুনত। ইদানীং নেফর কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত, লেপচাদের সমাজেও তাঁত বোনার রেওয়াজ এক রকম উঠে গেছে বললেই চলে। এরা এখন তৈরী জামা কাপড় কিনে ব্যবহার করে। লেপচা মেয়েদের মধ্যে তিব্বতী ধরণে পোশাক পরার রেওয়াজ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বহু লেপচা মেয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধে নেপালী মেয়েদের পদ্ধতিতে। লেপচা মেয়েদের নিত্য ব্যবহার্য হাতিয়ার হচ্ছে বাঁকা কাস্তে। একে বলা হয় বাহুর, নেপালীরা বলে কুরপা। তাই দিয়ে তারা কাঠ কাটে, গাছের ডালপালা ছেদন করে। সাত কিংবা আট বছর বয়সের সময় মেয়েকে দেওয়া হয় কাস্তে আর ছেলেকে ছোরা। উদ্দেশ্য : অল্প বয়স থেকেই যেন তারা এই সর্বজনীন হাতিয়ারের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

Gorer এবং C. J. Morres তাঁদের বইয়ে লেপচাদের মাত্রাতিরিক্ত যৌন প্রবণতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মতে, লেপচারা যৌন ব্যাপার নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। এইটেই হচ্ছে তাদের বেশীর ভাগ কথাবার্তা এবং প্রায় যাবতীয় রসিকতার বিষয় বস্তু। Fr Matthias Hermanns কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, সিকিমের মহারাজা এবং অন্যান্য যে সকল শিক্ষিত সিকিমী Gorer-এর বই পড়েছেন তাঁরা তাঁর বর্ণনাকে লেপচা চরিত্রের পক্ষে অবমাননাকর বলে মনে করেন।

লেপচাদের বিশ্বাস যে রুম লিয়াঙ্ বা দেবভূমির অবস্থিতি হচ্ছে স্বর্গলোকে। পরম দেবতা রুম নাক সেখান থেকে নজর রাখেন পৃথিবীর উপরে। সেখান থেকে দেবতা এবং

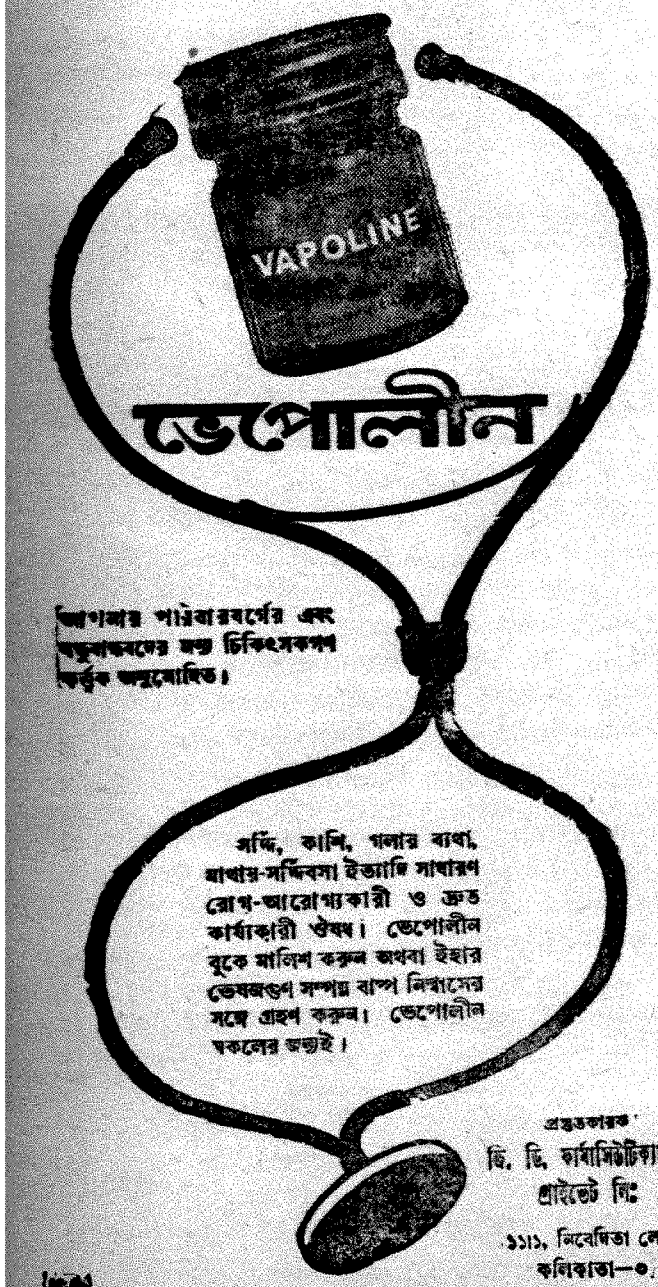

উপদেবতারা হয় নিজেরা নেমে আসেন মর্ত লোকে, নতুবা বজ্ররূপী দূত অথবা অজানা শক্তিনিচয়কে পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে।

অন্যান্য লেপচাদের মতে আবার দেবভূমির অবস্থান উপরে নয়—নীচে। এই পুণ্যস্থানকে তারা বলে মিং-সো'ঙ্ রুম। রুম বলতে শুধু পরম দেবতাকেই নয়, সেই সকল দেবতা এবং উপ-দেবতাদেরও বোঝায় যাঁরা মানুষের প্রতি-অনুকূল, এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে মুঙ্, যার মানে মানুষের অহিতকারী দৈত্য।

রংদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা দৈবশক্তি সম্পন্ন। এদের বলা হয় মুন বা বঙ্-থিঙ্। এদের কাজ হল দেবতা এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

বঙ-থিঙ হওয়ার আগে কেউ শুনতে পায় দেবতার প্রত্যাদেশ, কেউ বা নিজের ভিতরে অনুভব করে দৈব-শক্তির অবতরণ। এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কা-কার থিঙ্গির দাদা-সি-বঙ থিঙ বলেছে :—"বঙ্-থিঙ্-হবার আগে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার ওপর এসে ভর করেছে দৈবশক্তি। সেই শক্তিদ্বারা চালিত হয়ে আমাকে চলে যেতে হল গহন বনের ভেতরে। এতে অত্যন্ত মনমরা এবং হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। এমনিভাবে কাটল বেশ কিছুক্ষণ, অবশেষে এই নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলাম। দেবতা তার পর আমাকে এমন একটা খাড়া পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলেন যেখান থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়, সেখানেই রাত কাটাতে হল আমাকে। মাঝরাতে হঠাৎ অনুভব করলাম যেন অমিত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে গেছি! সেই শক্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে উপড়ে ফেললাম একটা বিরাট বনস্পতি। পরের দিন সকালে দেবতা আবার আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কথাটা যখন বাবার কানে গেল তখন তিনি স্থির করলেন যে, আমাকে হতে হবে বঙ্-থিঙ্।"

দৈবানুগৃহীত যে ব্যক্তি বঙ্-থিঙ হতে চায় তাকে গুরুর নিকটি গিয়ে দীক্ষা নিতে হয়। এর পর বেশ কিছুকাল চলে শিক্ষানবীশির পালা। তাকে শিখতে হয় প্রার্থনা মন্ত্র, বলিদান ইত্যাদি উৎসবের বিভিন্ন কৃত্য।

॥ লেখক মহল ॥
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-১৪
সকলপ্রকার রচনা প্রকাশের জন্য
যোগাযোগ করুন

'রূপা'র বই

ভারতীয় ভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ

যাদু-কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু

[অ. কৃ. ব.]

উনিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ

দাম আট টাকা

মঞ্চে, মহলে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর, ভেলকিওয়ালা, মাদারি। এদের তাকলাগানো খেলাগুলোরও নানা রকম নাম—ম্যাজিক, যাদু, ভেল্‌কি, ভানুমতির খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘদিন অন্তরঙ্গ বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই বহু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

এ বইতে যাঁদের কথা আছে

এ দেশের : ৺গণপতি ● ৺রাজা বোস ● ৺বিমল গুপ্ত ● ৺ডাঃ কালীকিংকর পি. সি. সরকার ● রয় দি মিস্টিক ● আশু দে ● দেবকুমার মৃণাল রায় ● ডি. সি. দত্ত ● বিমলাকান্ত ● এ. সি. সরকার তকমাওয়ালা সাঁই…প্রভৃতি

বিদেশের : লুডিনি ● চুং লিং সু ● লাফায়েৎ ● থাস্টন ● ডেভান্ট ম্যাসকেলিন ● ক্যালিওস্ট্রো ● ফরাসী যাদুসম্রাট উর্দ্যা হোরেস গোল্‌ডিন ● নিকোলা ● কেলার ● হার্ম্যান…প্রভৃতি

[অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.]-র অন্যান্য বই : বাতাসী বিবি [উপন্যাস] ৪·০০ ; শহরতলির শয়তান [অনুবাদ] ৪·৫০ ; শেষ বসন্ত [উপন্যাস]—যন্ত্রস্থ

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সংবাদ-চিত্র

ভারত-মার্কিণ কভার ষ্ট্যাম্প বিনিময় অনুষ্ঠান ঃ
প্রধান বিচারপতি মার্ল ওয়ারেন কলিকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত কভার ষ্ট্যাম্প ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি, কে, নেহরুর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি কভারে হাইকোর্টের তেইশজন বিচারকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। প্রধান বিচারপতি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার 'কভার' উপহার দেন। তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের নয়জন বিচারপতির নাম খোদিত আছে।

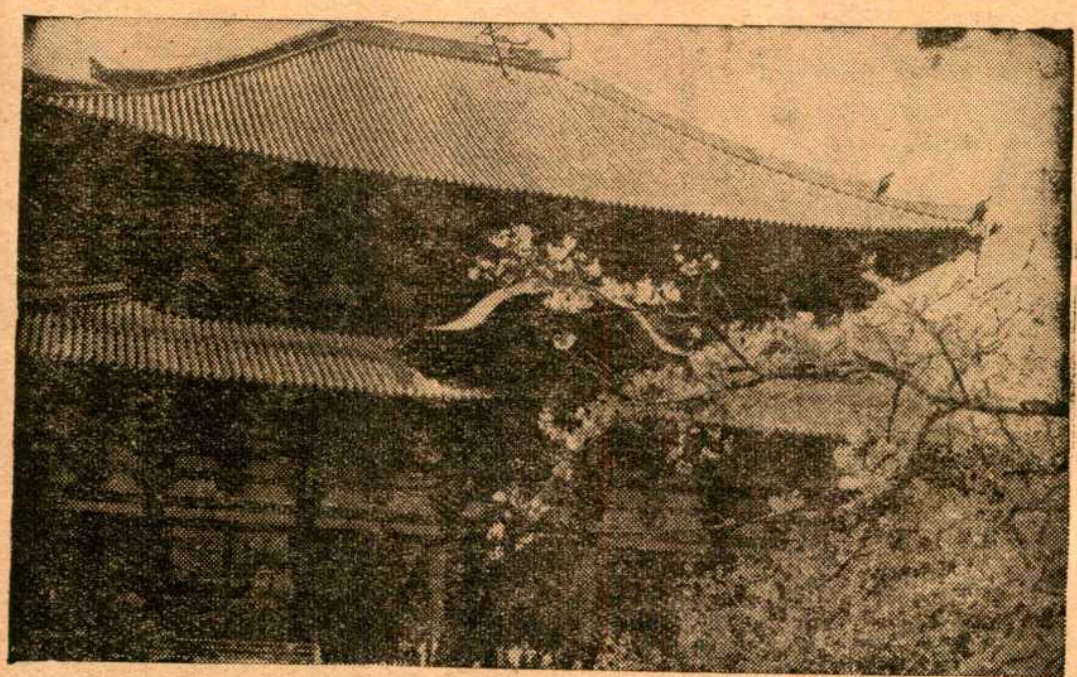

টোডাইজি মন্দির ঃ—মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয় ৭৪৫ সালে। তদবধি এখানে বিরাট বুদ্ধমূর্তি ডাইবুটসুর পূজা হইয়া থাকে। ডাইবুটসু বিশ্বের বৃহত্তম ব্রোঞ্জমূর্তি। ৮ম শতাব্দীতে এই মূর্তিটি নির্মিত হয়। এই মূর্তিতে বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ বাণী উচ্চারণ করিতেছেন।

সংবাদ-চিত্র

পশ্চিম জার্মাণীর মায়েরা তাঁহাদের সংসার জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়াসে ছেলে-মেয়েদের নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেনস অথবা বন্ধুবান্ধবদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অফিস বা কারখানায় যান। ছেলে-মেয়েরা কিন্তু তাহাতে দুঃখিত নয়। খেলাধুলায় ও নাচগানে তাহারা সুন্দরভাবে সময় কাটাইয়া দেয়। নৃত্যরত ছেলেমেয়েরা খুসীতে ভরপুর।

মস্কোয় সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীতেনজিং ঃ

'চোমোলুঙ্গমা' বিজয়ী তেনজিং সম্প্রতি মস্কোর 'সোভেতস্কি স্পোর্টস-এর কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন

বাগজী কলমে

হিমানীশ গোস্বামী

জিনিসের দাম বাড়ছে।

ভাগলপুরে কথাবার্তা হচ্ছিল। সেখানে বহু বাঙালী বহু বছর যাবৎ বসবাস করছেন। এখনো আছেন—এবং থাকবেনও আরো বহুকাল। অনেক কিছু তাঁরা দেখেছেন এই শহরটিতে। অনেক কিছু দেখবেনও। অনেক অভিযোগ আছে—অনেক অভিযোগের প্রতিকারও হবে, কিন্তু প্রতিকার হবে না একটি জিনিসের—তা হ'ল জিনিসের দাম।

বাড়ছে তো বাড়ছেই।

"মনে পড়ে", একজন বললেন, "পঁচিশ বছর আগে টাকায় চোদ্দ ছটাক খাঁটি গাওয়া ঘি পেতাম এখানে?"

অন্য এক ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "চোদ্দ ছটাক কোথায় মশাই, সতের ছটাক! স-তে-র-ছটাক। এখন টাকায় এক ছটাক কিনলেও খাঁটি জিনিস পাবেন না।

* * *

খাঁটি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। একটি কথা বলতে বলতেই তার ধাক্কাটা আর ধাক্কা বলে মনে হয় না। মানুষের মনের মধ্যে একটা স্বভাবজ রক্ষা কবচ আছে। এর যান্ত্রিক নাম হচ্ছে সেফটিভালব। এর ফলে দাম বাড়া এবং ভেজাল বাড়া এ দু'টি অস্বাভাবিক জিনিস আমরা মনের রক্ষাকবচের সাহায্যে সহ্য করতে পারছি, সহ্য করে নিতে হচ্ছে। এর-ফলে রোজই আমরা যা খাচ্ছি তা স্বাস্থ্যবিধি সঙ্গত খাদ্য নয়। যা খাচ্ছি তাতে মন তেতে উঠছে। কিন্তু কোনোক্রমে মনকে সামলে নিচ্ছি।

কিন্তু মনকে সামলালেও শরীরকে পারছি না।

ওটাতে আমাদের হাত নেই।

* * *

প্রতি পনের দিন পর পর—একজন ভীতি অমায়িক প্রকৃতির একটি যুবক আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে জ্বর টর হচ্ছে কি? যুবকটি আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য সাহায্য করছেন। এঁকে বলি, আপাতত জ্বর

নেই বটে, কিন্তু রোজই হাজার হাজার মশা আমাদের রক্ত খাচ্ছে। যুবকটি ম্লান হাসি হেসে বলেন, ওর বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারব না। ও সব মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় না। দেখে মনে হয় যুবকটিও মশার হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। সত্যিই তো—কিছুই করবার নেই। বাজারে ঘি-এ ভেজাল, চালে পাথর, কিন্তু এই যুবক কিছু করতে পারেন না, কারণ ভেজাল ঘি এবং পাথর খেলে ম্যালেরিয়া হয় না।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এই সরকারী অভিযানের সবচেয়ে গোড়ার কথা হচ্ছে ওটি কারো ক্ষতি করে না। এই অভিযানের ফলে রাস্তা মেরামত করতে হয় না কাউকে, রাস্তায় জল জমলে তা দূর করার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করতে হয় না, রাস্তায় মরা বেড়াল, ইঁদুর পচলেও কিছু করতে হয় না। এই অভিযানের ফলে চোরাকারবারী, মজুতদার, খুনে, সমাজবিরোধী কারুর গায়েই আঘাত লাগে না। অতএব এটি একটি নিরাপদ অভিযান।

আর একটি কথা—এই অভিযানে মশারাও রেহাই পায়। এমন অহিংস আন্দোলন আর হয় না।

পাটনা স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোঁরায় যখন খেতে গেলাম তখন বেলা বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। ট্রেণ ছাড়বে বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে। খেতে গিয়ে শুনলাম ডিমের ঝোল পেতে দেরি হবে আধ ঘণ্টা। অবশ্য মাংস পাওয়া যাবে, মাংস ঝোল এবং ভাত। দাম দেড় টাকারও বেশি।

আপনারা কখনো দশ দিনের পুরণো মাংস খেয়েছেন কি না জানি না। মাংসের রঙ কুচ কুচে কালো হয় তা দেখেছেন কি না জানি না। মাংসের ঝোলে কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছেন কি না জানি না। আমি এ সমস্তই পেয়েছিলাম। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে তখনি বমি হয়ে যায় নি। এই অপরূপ খাদ্য খাবার আধ ঘণ্টা পর সমস্তই অবশ্য বমি হয়ে গিয়েছিল।

আমার অভিযোগ কিছুই নেই। রেলওয়েতে খেতে গেলে বাড়ির মতো করে রান্না করে কেউ দেয় না জানি। ট্রেণে যাতে অত্যধিক কেউ ভ্রমণ না করে সেজন্য এই ব্যবস্থা তাও বুঝি, কিন্তু এটি ঠিক বুঝলাম না এই দুর্মূল্যের বাজারে ঝোলের মধ্যে কেরোসিন মিশিয়েও কেমন করে অত সস্তায় খেতে দিল:

রঙ্গজগৎ

পাসোলিনি পরিচালিত ইটালীয় ছবি "মামা রোমা"র একটি দৃশ্য

"বহুরূপী"র ইবসেন অভিনয়

ভাল নাটকের সন্ধানে বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে প্রায়ই বিদেশী নাট্যকারদের শরণ নিতে হয়। এ ব্যাপারে ইবসেন সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কেননা তাঁর নাটকে উপস্থাপিত আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যার গভীর মিল আছে। অবশ্য বিদেশ থেকে "নাটক আমদানী" করবার ব্যাপারে অনেকে আপত্তি করেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব নেই, বরঞ্চ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সেতু আমাদের এই বিভেদ-

রাখতে পারে। অতএব ইবসেনের নাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের দর্শকের নিজস্ব পরিবেশে চক্ষুষ পরিচয় করিয়ে বহুরূপী আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। "ডল্‌স্ হাউস" এবং "এন এনিমি অফ দি পিপ্‌ল্" এই দুটি বিখ্যাত নাটকে আমাদের সমাজের পটভূমিকা

এবং "দশচক্র" নামে এঁরা অভিনয় করেন। রূপান্তর করবার কাজে শ্রীশম্ভু মিত্র (পুতুলখেলা) এবং শ্রীশান্ত বসু (দশচক্র) অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং ঐ দুটি নাটক অনায়াসে মৌলিক রচনার স্বাচ্ছন্দ্য অর্জ্জন করেছে। 'পুতুলখেলা' নাটকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে চরিত্রগুলিতে বাঙ্গালীত্ব আরোপিত হয়েছে, এমন কি নাটকীয় রূপকল্পগুলিকেও এদেশী ছাঁচে ঢেলে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। নোরার টারাণ্টুলা নৃত্য অনায়াসে বুলুর রবীন্দ্র কাব্য আবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। নৃত্যসভা পরিণত হয়েছে বিজয়া দশমীর উৎসবে।...

পুরুষ-প্রভাবিত সমাজে নারীর আপন অধিকার অর্জ্জনের সমস্যা এই নাটকের নাট্যবস্তু, এই কথা সকলে প্রশ্নও ওঠে, তবুও আমাদের সমাজে নারীর স্থানের প্রশ্নটি এখনি এতটা মীমাংসিত হয়নি যে এ নাটককে সেদিক থেকে বাসি বলে মনে হবে। হাবার্ট মার্শ্যাল 'পুতুলখেলা' দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয় পটভূমিকায় এ নাটককে বেশী জীবন্ত মনে হয়, কেননা নারী-মুক্তির প্রশ্ন ভারতে এখনও একটি প্রধান সমস্যা। এই নাটকের মঞ্চসজ্জায় শ্রীখালেদ চৌধুরী উচ্চাঙ্গের ন্যাচারালিজমের সঙ্গে পর্দ্দা বা চাদরের রংএর ব্যবহারে চমৎকার প্রতীকী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। আলোক সম্পাতে শ্রীতাপস সেন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ে সর্বশ্রী শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, আরতি মৈত্র ও কুমার রায় স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বুলুর চরিত্রে শ্রীতৃপ্তি মিত্র বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের মাঝখানে পড়ে একজন পরহিতব্রতীর যে যন্ত্রণা তাকেই এ নাটকে মূর্ত্ত করা হয়েছে। ঐ আত্মদাহের রূপায়ণে বিবেকবান চিকিৎসকের চরিত্রে পরিচালক শম্ভু মিত্র স্বয়ং অসামান্য অভিনয়কীর্ত্তির পরিচয় দিয়েছেন। কুচক্রী বড়ভাই-এর চরিত্রে শ্রীঅমর গাঙ্গুলী এবং স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্ত নেতার চরিত্রে শ্রীগঙ্গাপদ বসু তাদের সুপরিচিত শক্তিমত্তার নতুন পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী কুমার রায়, লতিকা বসু, হিমাংশু চ্যাটার্জ্জী, অরুণ মুখার্জ্জী বহুরূপীগোষ্ঠির অভিনয়ের উচ্চমানের প্রমাণ দিয়েছেন। মঞ্চসজ্জায় শ্রীঅনিল ব্যানার্জ্জীর ইম্প্রেশনিজমের সুপরিকল্পিত প্রয়োগ প্রশংসনীয় হয়েছে, শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষের আলোক

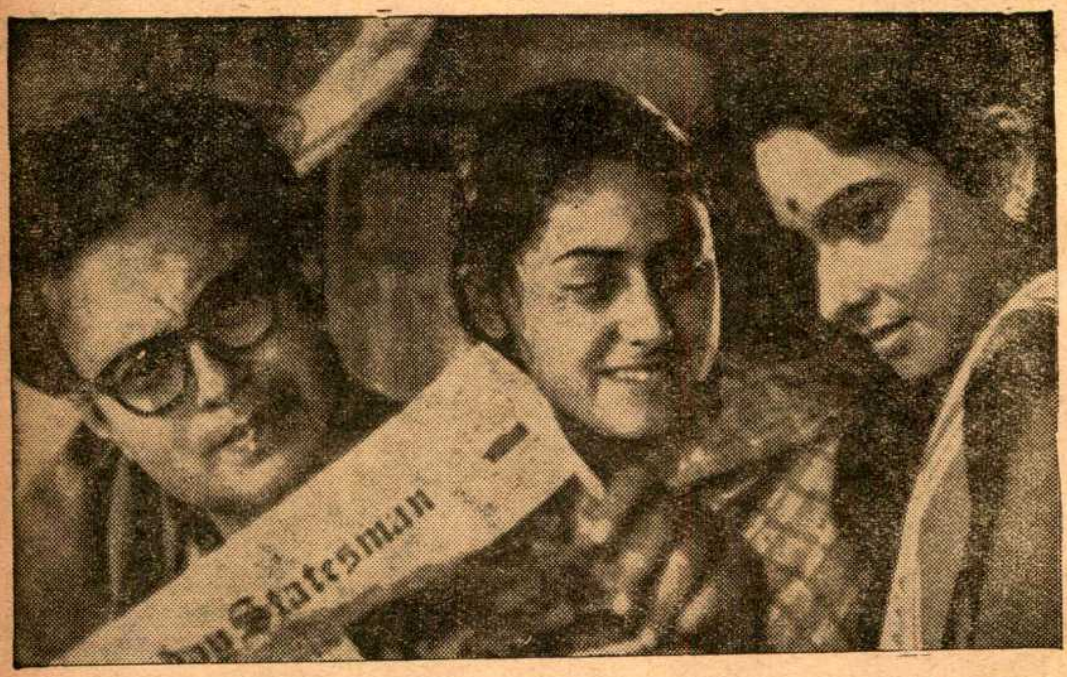

সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর"-এর একটি দৃশ্যে—অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও জয়া ভাদুড়ী

ধরেন। নারীর বিদ্রোহ এই নাটকের উপজীব্য বটে, কিন্তু সেটাই এ নাটকের শেষকথা নয়। সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে, জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্মমর্য্যাদা অর্জ্জনের বেদনা এই নাটককে তথাকথিত "ফেমিনিজমে"র গণ্ডীর বাইরে গভীরতর মূল্য দিয়েছে।

"দশচক্রে"ও সামাজিক অনুশাসনের চাপে বিবেকবান ব্যক্তির যন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে, কোন রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন এ নাটকের অভিষ্ট নয়। অগণিত জনসাধারণ যাদের হাতে

সম্পাতেও চিত্রকলার মেজাজ আনা হয়েছে—বিশেষ করে জনসভার দৃশ্যে।

শিল্পকলার রাজ্যে যেখানে প্রায়ই তুচ্ছতা বিরাজ করে সেক্ষেত্রে। 'বহুরূপী'র এই মহৎ নাট্য অভিনয়ের সফল প্রচেষ্টা আমাদের মনকে বাংলা নাট্য

খেলাধুলা

পরলোকে ফাষ্ট বোলার নিসার

নিসার, অর্থ উৎসর্গ! ভারতীয় ক্রিকেটে উৎসর্গীকৃত একটি উজ্জ্বল তারকা আজ কক্ষচ্যুত। অবিভক্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তো বটেই, তদানীন্তন বিশ্বের সেরা ফাষ্ট বোলারদের অন্যতম নিসার মাত্র ৫২ বছর বয়সে গত ১১ই মার্চ্চ, লাহোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে নিসার ছিলেন

নিসার

পাকিস্তানের অধিবাসী, তবুও তাঁর অকালমৃত্যু ভারতের অগণিত ক্রীড়া-মোদীকে উদ্বেলিত করেছে।

নিসারের ক্রিকেট জীবন স্বল্পস্থায়ী কিন্তু এই স্বল্পকালেই তিনি নিজেকে বিশ্ব ক্রিকেটে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব আর ১৯৩৭-৩৮ সালে পরিসমাপ্তি। এর ভেতরে তিনি ছয়টি সরকারী টেষ্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেয়ে মোট ২৫টি উইকেট দখল করেছিলেন, যার গড় ২৪·২৮; লর্ডস মাঠে, তাঁর অনবদ্য ভূমিকা ইংরেজ সমালোচকদেরও চমকিত কোরে তোলে। তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে নিসারকে তদানীন্তন ইংলণ্ডের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ফাষ্ট বোলার হ্যারল্ড লারউডের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। লর্ডস মাঠে নিসারই মাত্র ১১ রাণে প্যাভিলিয়নে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাটক্লিফ এবং হোমেনকে, যাঁরা মাত্র কয়েকদিন আগে প্রথম উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

এ গেল খেলোয়াড় নিসারের কথা, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন বোধ হয় আরও বড়, আরও মহৎ। বাইরে থেকে তাঁকে মনে হয়েছে বজ্র-কঠোর, কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে থাকতো শিশুর অন্তরাত্মা। ভারতীয় রাজনীতিতে যখন সাম্প্রদায়িক বিষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঠিক সেই সময়ে, জার্ডিনের দলের ভারত সফর কালে, নিসারের একাধিক সুহৃদ, হিন্দু সি কে নাইডুর অধিনায়কত্বে খেলায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু মহৎ প্রাণ নিসার খেলাকেই ভালোবাসতেন,—সাম্প্রদায়িকতার সে প্রভাব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি।

নিসার আজ নেই, মৃত্যুর হাতছানিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তান উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদী যুগ যুগ ধরে তাঁকে স্মরণ করবে আর বলবে,—

'Others may abide our question
But thou art free!'

ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের প্রাধান্য

'দম্ভভরে কিছু বোল না,—তোমার কাজই তোমার হয়ে বলুক কথা'—এই বাণীটি সদ্য সমাপ্ত রণজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের পক্ষে অবশ্য প্রযোজ্য। রণজি ট্রফি প্রতি-যোগিতার ২৯ বৎসরের ইতিহাসে বোম্বাই মোট পনেরো বার ফাইন্যালে উন্নীত হোয়ে ১৪ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এ এক অপরিসীম কৃতিত্ব! ফাইন্যালে উঠে একবারই মাত্র তারা হোলকারের কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। বোম্বাইয়ের এই সাফল্য, দলীয় সংহতির অপূর্ব্ব নিদর্শন।

ফাইন্যালে এবারও বোম্বাই রাজস্থানের সম্মুখীন হয়। উপর্য্যুপরি তৃতীয় সাক্ষাৎকারেও ফল ফল বোম্বাইয়ের অনুকূলেই গেছে। এবারকার ফাইন্যালে বোম্বাই এক ইনিংসে জয়ী হয়েছে। রাজস্থানকে উপর্য্যুপরি তৃতীয়বার 'রাণার্স-

রণজি ট্রফি

আপের' সম্মান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পক্ষান্তরে বোম্বাই উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার বিজয়ীর আখ্যা লাভ করে, রণজি প্রতিযোগিতায় এমন এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে রাখল, সাধারণভাবে যেটাকে দুরতিক্রম্য বলেই মনে হয়।

রামচাঁদের অবসর গ্রহণ

বোম্বাইয়ের অধিনায়ক জি এস রামচাঁদের সফল নেতৃত্বে বোম্বাই রণজি ট্রফির ফাইন্যালে জয়লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, রামচাঁদ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতই খেলোয়াড়সুলভ। রামচাঁদ প্রথম রণজি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালে। ১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত, এই উনিশ বছরে

তিনি রণজি ট্রফিতে দশটি সেঞ্চুরী করেছেন। টেষ্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তেতাল্লিশবার। মোট রাণ সংখ্যা ১১৮০; টেষ্ট ক্রিকেটে বোলার হিসেবে ও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন,—১৯৯০ রাণের বিনিময়ে তাঁর দখলীকৃত উইকেট সংখ্যা ৪১; রামচাঁদ ১৯৫৯-৬০ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বেই ভারত কানপুরে দ্বিতীয় টেষ্টে

রামচাঁদ

অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবার অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। ক্রিকেট থেকে রামচাঁদ বিদায় নেবার ফলে, ভারতীয় ক্রিকেট তো ক্ষতিগ্রস্ত হোলই, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট রস-পিপাসুরাও একজন সুঠাম সুন্দর দেহী, অমায়িক ক্রিকেট খেলেয়াড়কে হারালেন।

বলরামের অর্জ্জুন পুরস্কার লাভ

ভারত সরকার খেলা-ধূলোর বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া-প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এবার ৯ জন ক্রীড়াবিদকে 'অর্জ্জুন' পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। নির্ব্বাচিত ক্রীড়া-বিদ্‌দের ভেতর রয়েছেন তারলোক সিং (এ্যাথলেটিক), বলরাম (ফুটবল), উইলসন জোন্স (বিলিয়ার্ডস), মীনা খান (ব্যাডমিন্টন), পদম বাহাদুর খন্দ (মুষ্টিযুদ্ধ), নরেশকুমার (লন টেনিস), লক্ষ্মীকান্ত দাস (ভারোত্তোলন) মালওয়া (কুস্তি) এবং নৃপজিৎ সিং (ভলিবল)।

এর ভেতরে বলরাম এবং লক্ষ্মীকান্ত দাস উভয়েই বাংলার।

বলরাম

গত বৎসরও ফুটবলে বাংলা থেকে পি, কে, ব্যানার্জ্জী অর্জ্জুন পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

আগামী ২৮শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নির্ব্বাচিত ক্রীড়াবিদদের 'অর্জ্জুন' পুরস্কার প্রদান করবেন।

ট্রুম্যানের বিশ্ব রেকর্ড

ইংলণ্ডের প্রখ্যাতনামা ফাষ্ট বোলার ট্রুম্যান টেষ্ট ক্রিকেটে ২৫০টি উইকেট দখল করে, তাঁর সতীর্থ ব্রায়ান ষ্ট্যাথামের বিশ্ব রেকর্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। ব্রায়ান ষ্ট্যাথাম এ্যালেক বেডসারের রেকর্ড ভেঙ্গে-ছিলেন এ বছরই ২৬শে জানুয়ারী। অত্যল্পদিনের ব্যবধানে ট্রুম্যান যে অপরিসীম কৃতিত্ব দেখালেন, বিশ্ব ক্রিকেটে এ ঘটনা বহুদিনই স্মরণ থাকবে। আরও উল্লেখযোগ্য হোল,—এ্যালেক বেডসার অষ্ট্রেলিয়ার ক্ল্যারি গ্রিমেটের বিশ্ব-রেকর্ড আতক্রম করবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের তিনজন বোলারই টেষ্ট উইকেট দখলের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হ'য়ে আসছেন।

ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরে প্রথম টেষ্ট খেলায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে লিডসে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৮ রাণে ১১টি উইকেট দখল করে অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৬২ সালে ৪৭তম টেষ্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ট্রুম্যান তাঁর ২০০তম উইকেট দখল করেন।

শিশির সেনের

উপন্যাস পড়বেন যখন আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হবেন

আনন্দনিকেতন ৪·৫০

আশুতোষ কলেজের ডক্টর এন, এন, চৌধুরী: রবিবাবুর শেষের কবিতার পর এমন বই পড়েছি বলে তো মনে হয় না।

একটি ফুল দুটি নায়ক ৩·০০

যুগান্তর বলেন: সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিশির সেন সে দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নাই, একথা বলিতে পারিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছি।

বিংশ শতাব্দী ২·০০

অন্নদাশঙ্কর রায় বললেন: সবচেয়ে বড় কথা জীবনের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় আছে।

কানে কানে কহি তোরে ২·০০

নাট্যকার মন্মথ রায় বলেন: আজকের উপন্যাস রাজনীতিকে বাদ দিয়া শুধু 'মন দেওয়া নেওয়া'র রম্যকাহিনী হইলে মনে কোন সাড়া জাগে না। গণতন্ত্রীয় শাসনযন্ত্রে যে সব গলদ দেখা দিতেছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আপনি কানে কানে কহিলেও সোচ্চার হইয়াছে এবং নায়কের জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে উহাই আজ আমাদের চিন্তার খোরাক।

আনন্দ পাবলিশার্স

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

ফোন নং ৩৪-৬৮৭৬

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্য্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পাঁচ
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসৎকড়ির রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ধ্বংস করিয়াছে মুনাফা সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—সেই সর্ব্বজনপ্রমোদন—অমরকীর্ত্তি উপন্যাসিক—জগৎপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—দরদী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কল্পনা, সুপর্ণা, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গবেষণা, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদরা, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, নেপথ্যে, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের জন্য, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নয়াযুগের নাট্য ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিষ্মান নাট্যরাজি, কালিদাস, কাঞ্চনাচার্য শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, শূদ্রক, রাজশেখর প্রভৃতির সাহিত্য-মন্থিত অমৃতধারা—বালজাকের বিভীষিকা, মোপাসাঁর গল্পসুধা, জোলার রসরঙ্গ, পিয়ের লোতীর সম্মোহন, মোলিয়েরের কৌতুক-যৌতুক, স্বাধীন ভারতের গৌরবদীপ্তি, রাজপুত শৌর্য্যের অলৌকিক প্রভা তরবারি আস্ফালনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত।

মূল্য ১৲ টাকা

২য় খণ্ড—মিলিতোনা, শোণিত-সোপান, হত্যাকাণ্ডের পর, সবুজ শয়তান, অলীক বাবু, বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পাঠ, বালিনের অবরোধ, দর্পণ, ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ, মুখোসপরা নাচের মজলিস, মা, জল্লাদ, জ্যোৎস্না রাতে, খুকুমণি, শেষ পরী, ঘণ্টা, অভিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ।

মূল্য ১৲ টাকা

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত।

মূল্য ১৲ টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 28th March, 1963
PHONE : { 34-3487 / 34-3488 GRAM : "BASUMATI" Price : 25 nP.

Viewing the world through glass

With GLASS it's more view and more room too ! Wherever it goes Glass opens up exciting new possibilities. Gone is that cramped, confined, closed-in feeling. The bright, cheerful, open look is in.

And glass goes everywhere. To homes, hotels, hospitals—to offices, schools and stores. In windows and doors, in buses and cars.

Manufactured in India by Hindusthan-Pilkington Glass Works Limited, quality tested sheet glass is available in a wide variety of sizes and thicknesses to suit every purpose.

For the finest, most durable glass you can depend on

HINDUSTHAN-PILKINGTON GLASS WORKS LIMITED
Managing Agents : Talukdar Law & Company Private Limited
Hindusthan Buildings, 4 Chittaranjan Avenue, Calcutta 13

সাপ্তাহিক

বসুমতী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

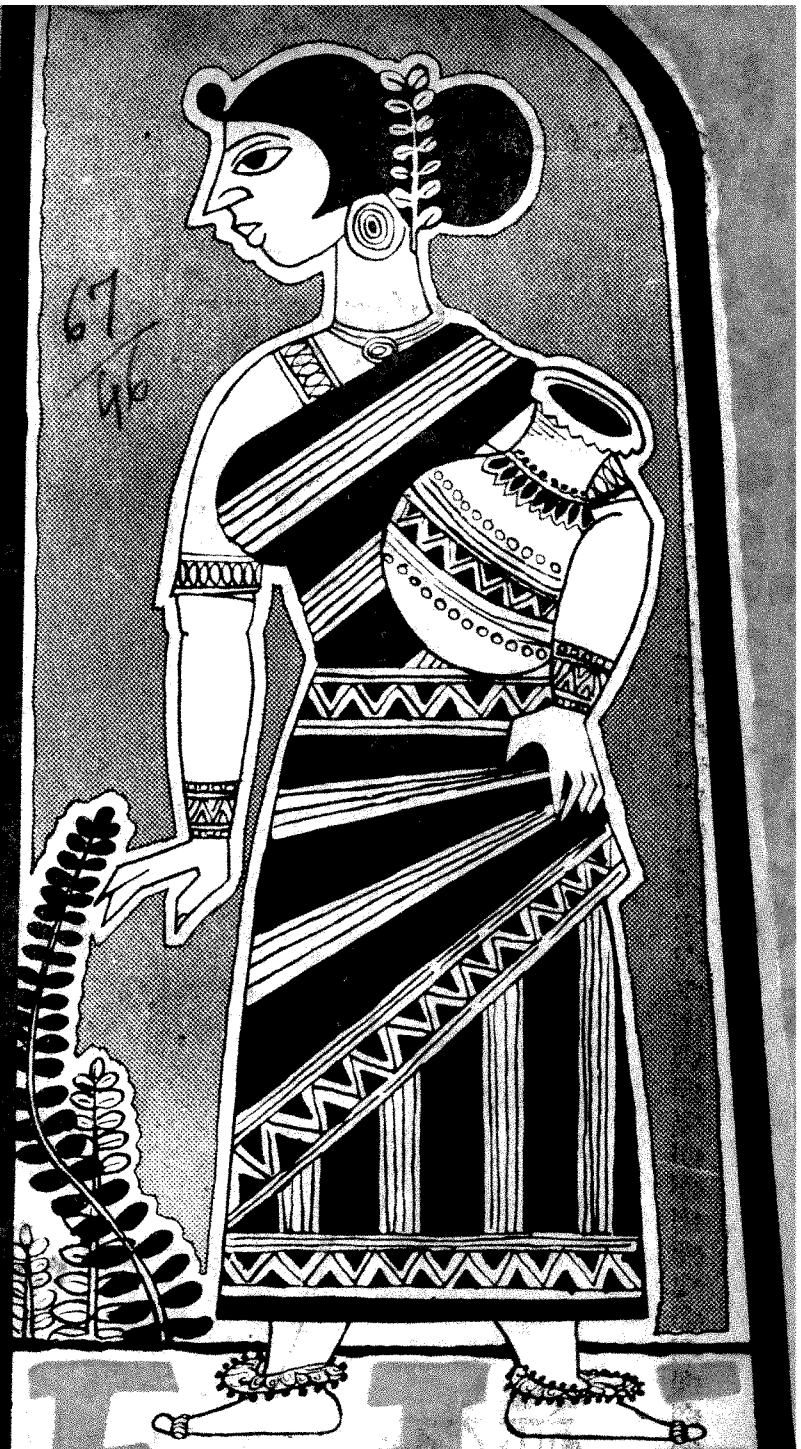

4.4.63

মস্কো-পিকিং বিরোধের
সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য

আরব সংহতি

৬৭ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা
বৃহস্পতিবার ২১শে চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়
হিমানী

পশ্চিম বঙ্গের আধুনিকতম

ও

অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

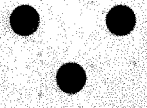

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন

কলিকাতা—১২

ফোন ৩৪-৩৩৫৬

সূচীপত্র

CALCU... CENT... LIBRA... UNIVE...

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সম্পাদকীয়	---	৩
২। আজকের মানুষ	---	৪
৩। শহর কলকাতা	---	৫
৪। দিল্লী থেকে	শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৮
৫। বঙ্গদর্শন	---	১১
৬। কবিতা		
বিপ্রলব্ধ	শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৩
মানমন্দির	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	১৩
৭। জাপানী সন্দেশ	শ্রীসন্দীপ ঠাকুর	১৪
৮। আন্তর্জাতিক	---	১৭

মুকুন্দ পাবলিশার্সের কয়েকখানি নতুন বই

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

ময়না তদন্ত ৩·০০

চিরঞ্জীব সেনের

রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের

দেওয়ালের দাগ ৭·০

প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর

প্রাণতরঙ্গ ৬·৫

গোলাম কুদ্দুসের

সুরের আগুন ৪·৭

মুকুন্দ পাবলিশার্স

৮৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শোক সংবাদ	...	২৬
১০।	নীলিমা (গল্প)	শ্রীসুশীল রায়	২৭
১১।	আমাদের প্রতিবেশী	শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	৩৩
১২।	ভারতদর্শন	...	৩৫
১৩।	পশ্চিমবঙ্গ ও কৃষি উৎপাদন	...	৩৭
১৪।	রঙ্গজগৎ	...	৩৯
১৫।	সঙ্গীতের বিকাশ ও তার আদিরূপ	শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়	৪২
১৬।	বিজ্ঞান	শ্রীসত্যেন লোধ	৪৫
১৭।	খেলাধুলা	.	৪৭

প্রচ্ছদশিল্পী — বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
গ্রন্থাবলী
মূল্য সাড়ে তিন টাকা
লো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর
হিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-
হিত্যের শার্লক হোমসের মত
দীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।
বাংলার মিষ্টী সাহিত্যে
নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব
—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—
লো ভ্রমর, করোজে ম্যা মরেজে,
কহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের
পাশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া,
ন, কালচক্র, কবর, পাথরের
াখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।
বিখ্যাত কথাশিল্পী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শলজানন্দের গ্রন্থাবলী
ম ভাগ— মূল্য ৩।০ টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মণিলাল গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৫খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲
রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ
উপন্যাস। মূল্য ৩।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস।
মূল্য ৩।০।
প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি
নির্ব্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

পুরাতনে চিরনূতন মণিমঞ্জুষা
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী
প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন
সিংহ বিরচিত—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।
বাংলা উপন্যাসের প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ
মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল,
পুণ্যকীর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—
ভ্রান্তিবিলাস। একত্রে ২৲ টাকা মাত্র।
প্রখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা
প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
গ্রন্থাবলী
৫খানি সেরা বই—২।০

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ২১শে চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Thursday, 4th April, 1963
25 Naya Paise

ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা

এ কথা সত্য যে, কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ষ্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েট রাশিয়াতে এই স্বাধীনতা কার্য্যতঃ ছিল না। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর বর্ত্তমানে ক্রুশ্চেভের আমলে লেখা ও বক্তৃতার স্বাধীনতা আগের তুলনায় অনেকখানি স্বীকার করা হইলেও কমিউনিষ্ট পার্টির গৃহীত নীতি ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার নাই। বিরোধী পক্ষীয় নেতাদের (যেমন মলোটভ, ম্যালেনকোভ প্রভৃতি) প্রকাশ্যে স্ব স্ব মতামত প্রকাশের কোন অবাধ অধিকার নাই। এমন কি গল্প, উপন্যাস, কবিতার মত বিশুদ্ধ সাহিত্য-বিষয়ক রচনা লইয়াও পার্টির পক্ষ হইতে বিতর্ক উঠিয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্ত কিছুকেই কমিউনিষ্ট পার্টির 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' আলোকে বিচার করার চেষ্টা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইলিয়া এরিনবুর্গের মত প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ লেখকের রচনা লইয়াও নাকি বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে। তবে, ষ্ট্যালিনের আমলের মত এখন লেখকদের আর গর্দ্দান যায় না, এই যা ভরসা। বর্ত্তমান চীনের অবস্থা ষ্ট্যালিনের আমলের গুলিসী রাষ্ট্রের মত। সেখানে শাসক পার্টির মতামত ছাড়া আর কোন মতের বালাই নাই। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে বিরোধী পার্টি বলিয়া কোন স্বীকৃত দল নাই। সুতরাং তাদের পক্ষ হইতে মত প্রকাশের কোন প্রশ্নও নাই।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ঢের বেশী উন্নত, ভদ্র এবং উদার—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। গণতন্ত্র শাসিত দেশের আইন-কানুনে ও সংবিধানে বক্তৃতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের এবং সঙ্ঘ গঠনের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ও যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতা রহিয়াছে। মৌলিক অধিকারের এই গ্যারেণ্টি গণতন্ত্রের অমূল্য সম্পদ। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট কোন পার্টি বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে সাহিত্য, শিল্পকলা কিম্বা ভাব প্রকাশের অধিকার দমন বা হরণের কথা উঠে না। তথাপি পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রেও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কতকগুলি গণ্ডীবদ্ধতা আছে। যেমন সংবিধানে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই স্বাধীনতা রহিয়াছে মালিকপক্ষের

এ কথা সত্য যে, সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিন্তাধারার (উহা আর্টেরই হউক কিম্বা সায়েন্সেরই হউক) উপর কোন পার্টির বা গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু ইদানীং এই প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও একটা অসুস্থ ঝোঁক দেখা যাইতেছে। যাঁরা নিজেরা সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিন্তার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাঁরা কিন্তু বিরোধী মত প্রকাশের সম্ভাবনায় একেবারে ক্ষিপ্ত! এমন কি, তাঁরা দল বাঁধিয়া নিজেদের মত অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। এই ঝোঁক নিশ্চয়ই সুস্থ ও স্বাধীন মনের পরিচায়ক নহে। অবাধ মত প্রকাশের এবং অকুণ্ঠ সমালোচনার অধিকার আছে বলিয়াই কমিউনিষ্ট ও ডিক্টেটর-শাসিত রাষ্ট্রের তুলনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা অনেক বেশী, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের মতামতকেই একমাত্র খাঁটি ও চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁরা কিন্তু আসলে গণতন্ত্রের মূল-নীতি ও আদর্শের বিরোধিতা করিতেছেন। সুতরাং এই ঝোঁকটা উদ্বেগজনক।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিজু পট্টনায়ক

বিজু পট্টনায়ক এমন একজন মানুষ—কর্মময় জীবনের সুরু থেকেই তিনি যখন যা' করেছেন, তাতেই প্রচলিত রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়েছে কিম্বা প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে তাঁর কাজের বিরুদ্ধে। এমন বিতর্কমূলক চরিত্র সত্যিই বিরল। এই প্রতিবাদের ঝড় ঠেলেই কিন্তু তিনি পাড়ি জমিয়েছেন সব ক্ষেত্রে।

১৯১৬ সালে তাঁর জন্ম। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে অরুণা আসফ আলী ও জয়প্রকাশের সঙ্গে তিনি যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন বৃটিশ শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে

সেদিন অবধি উড়িষ্যায় ছিল কোয়ালিশন সরকার। পট্টনায়কের নেতৃত্ব তখনও দানা বাঁধতে পারে নি। প্রতিপক্ষ তাঁর কম শক্তিশালী ছিল না। বিতর্কের ঝড়ের মধ্যে সব বাধা ঠেলে তিনি বেরিয়ে এলেন একচ্ছত্র নেতৃত্ব নিয়ে। রাতারাতি সব গেল পালটে—অবসান ঘটলো কোয়ালিশন সরকারের। তিনি হলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী।

চীনের আক্রমণে ভারত যখন বিপন্ন, তখন আবার এই মানুষটির দিল্লীর দরবারে আনাগোনা নিয়ে সমালোচনার কানাঘুষা হ'ল সুরু। দেশের প্রতিরক্ষার গোপন আলোচনার ভার নিয়ে গেলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেও এমন কাণ্ড করে বসলেন—যা' নিয়ে দেশময়, এমন কি পার্লামেন্টে উঠলো বিতর্কের ঝড়। এগিয়ে আসতে হ'লো প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি জানালেন, তাঁর সম্মতি পেয়েই গিয়েছিলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক বিদেশে। তাঁর বক্তব্য সাধারণের কাছে এসে পৌঁচেছে বিকৃত হয়ে। ফলে, গণ্য হলেন তিনি প্রতিরক্ষার সম্পদ হিসেবে।

তাঁর চরিত্রের এই মূল সূত্রটি একই তালে চলেছে। বৈমানিক পট্টনায়কের ইন্দোনেশিয়ার গতিবিধিও তুলেছিল এক সময় সমালোচনার ঝড়। কিন্তু খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি ডাচ এয়ার ব্লকেড ভেদ করে শারিয়ারকে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে।

উড়িষ্যার শিল্প প্রসারেও তাঁকে কম হেনস্ত হতে হয় নি। আজ দারিদ্র উড়িষ্যার শিলায়নে তাঁর অবদান কিন্তু অনস্বীকার্য

এক প্রবাসী বন্ধু অনেককাল বাদে দেশে ফিরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন —"এ যুগে দান্তে বেঁচে থাকলে তোমাদের কলকাতার রাস্তাঘাটে ভীড়ের নমুনা দেখে তাঁর 'ডিভাইন কমেডী'র প্রথম খণ্ডটি আবার নতুন করে লেখার অনুপ্রেরণা পেতেন।'

কথা হচ্ছিল পথ চলতে চলতে। বিকেল পাঁচটা। রাস্তায় অগণিত মানুষ ও যানবাহনের মিছিল চলেছে। এখানে ওখানে অকারণে 'ট্রাফিক জ্যাম' হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির এলোমেলো লাইন। ক্রমাগত বিরক্তিকর হর্ণ বাজিয়ে কোনো কোনো অত্যুৎসাহী চালক এগোবার বৃথা চেষ্টা করছেন পথচারীদের অসুবিধা ঘটিয়ে।

এই রাজপথে ত্রিবর্ণরঞ্জিত সিগন্যাল রয়েছে, প্রতি জনবহুল মোড়ের মাথায় ট্রাফিক পুলিসের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়। পদাতিক মানুষদের জন্য রাস্তার দু'ধারে ফুটপাত রয়েছে— যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুটপাতকে আমরা দোকানবিহীন ব্যবসায়ীদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে বসার উপযুক্ত আস্তানা বলে স্বীকার করে নিয়েছি। নিয়ম কানুন থাকা সত্ত্বেও কলকাতা-বাসীরা বেআইনী ও বেহিসাবী ব্যবস্থার পক্ষপাতী বলে বিখ্যাত। তাই দুর্ঘটনার খতিয়ান করলে দেখা যায় প্রায় রোজই বেশ কয়েকটি নিরীহ প্রাণ অকারণে আত্মবলি দিচ্ছে।

"লণ্ডন রোডফেয়ারার ক্লাবে"র সদস্য মিঃ সি, ক্লার্ক রামজে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন এখানকার পথ-ঘাটের সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে। কুখ্যাত "আফিস টাইমে" তাঁকে প্রধান ও ভীড়সহুল রাজপথে ঘোরানো হয়েছে। এশিয়া ও পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি শহর দেখার অভিজ্ঞতা ভদ্রলোকের আছে, কিন্তু কলকাতার মানুষদের পথচলার সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতা ও চরম বিশৃঙ্খলতা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। জন-সাধারণের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক এবং বাড়ীতে ও স্কুলে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে পথচলার নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়া উচিত— এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে 'সেফ্‌টি ফার্ষ্ট এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কিছুকাল ধরে এ জাতীয় শিক্ষামূলক প্রচার কার্য সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। আমাদের উদাসীন জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং নিয়মভঙ্গ-কারীদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।

* * *

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে মার্কাস স্কোয়ারে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। গত ২৮শে মার্চ সর্ব-ভারতীয় লেখক-সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী একটি বৈঠক শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিকবর্গ ছাড়াও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের দেশের ভাষাগত ও চরিত্রগত বৈচিত্র্যের মাঝ-খানে একটি সুমহান ঐক্য স্থাপনা করাই এই সভার মূল আদর্শ। আমরা এই আদর্শকে প্রত্যেকেই সর্বান্তঃ-

শ্রীকা-না-সুব্রমনিয়ম, শ্রীবালকৃষ্ণ রাও, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, শ্রীউমাশংকর যোশী

করণে সমর্থন [illegible]রি এবং উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বাঙালী জাতি আত্মাভিমান ও অহংকারের দুর্ভেদ্য খোলসের মধ্যে নিজেকে চিরকালই কিছুটা স্বতন্ত্র করে রাখার পক্ষপাতী, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবহেলা আমাদের মর্যাদার আসন থেকে বেশ কিছুটা নীচে নামিয়ে এনেছে। কয়েক বছর আগেও ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনা করলে দেখা গেছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্র ছাড়া তাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কোন কৌতূহল বা আগ্রহ দেখাননি। কেউ কেউ স্পষ্টই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেও ছাড়েন নি বাঙালীদের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ্য নিন্দা করে। কিন্তু ইদানীং প্রতিবেশী-দের জানবার সদিচ্ছা আমাদের হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার প্রধান সুবিধা, তাতে আমাদের মনের অনেক ভুল ধারণা সহজেই দূরীভূত হয় এবং তুলনামূলক আলাপ, আলোচনার ফলে সঙ্কীর্ণতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। আশা করা যেতে পারে, এ জাতীয় সভা সম্মেলনের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার মহান্ আদর্শ আমাদের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলবে।

* * *

জনপথের কোলাহল ছাপিয়ে যখন-তখন শোনা যায় দমকলের গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনির অশুভ সংকেত। কোথায় আবার আগুন লাগলো! কলকাতা-শহরে আগুন লাগা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কিন্তু আগুন নির্বাপিত করার ব্যবস্থায় অনেক গলদ ও ত্রুটির সন্ধান হঠাৎ সেদিন একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে শহরবাসীর গোচরে এসেছে। কলকাতায় লোকসংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে চলেছে, বেড়েছে শহরের পরিধিও, কিন্তু দমকল বাহিনী কোন উন্নতির চেষ্টা হয়নি।

লালবাজারের উল্টোদিকে বিকানীর ভবনে চারতলার একটি গুদামে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন সুদক্ষ, তরুণ ও জনপ্রিয় অফিসার অ্যান্টনী জেমস্। এই অকালমৃত্যু-জনিত ক্ষতি অপূরণীয়। এই গুদামেই নাকি কয়েক বছর আগে বিস্ফোরক জাতীয় বস্তু রাখার ফলে আর একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। শোনা যায় কলকাতা শহরে আরও নানা এলাকায় দাহ্যবস্তু সংরক্ষিত আছে এবং এ ধরণের মারাত্মক দুর্ঘটনা যে কোন সময়ে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী দাহ্য পদার্থ রাখতে হলে ফায়ার ব্রিগেডের অনুমতি নেওয়ার

অ্যান্টনী [illegible]

প্রয়োজন নাই, কেব[illegible]রেশনের ট্রেডমার্কই যথেষ্ট। দুর্ঘটনা ঘটলে বিচারালয়ে সামান্য জরিমানা দিয়ে অপরাধী ছাড়া পায়। অনেকদিন ধরেই ফায়ার সার্ভিস আইনের সংশোধনের কথা চলেছে। এভাবে সারা শহরের নিরাপত্তা যারা বিঘ্নিত করে—তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বিকানীর ভবনে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য।

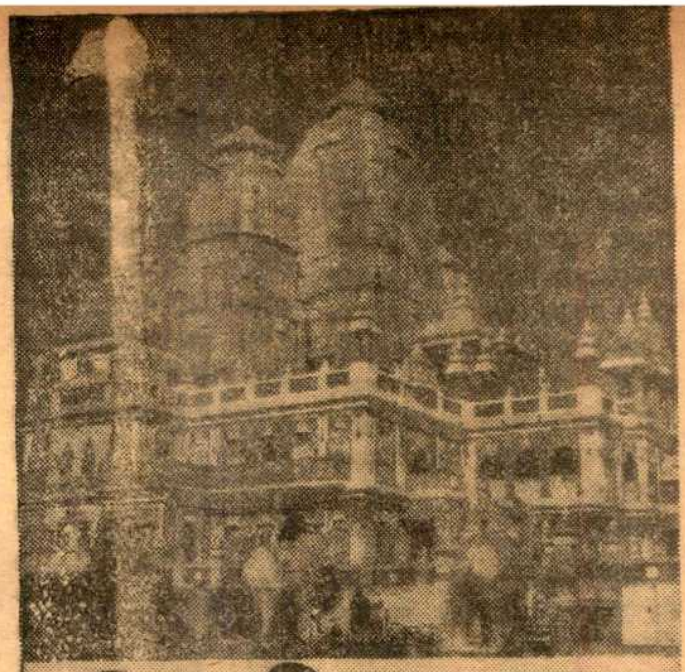

দিল্লী থেকে

নয়াদিল্লীর চল্লিশ হাজার বঙ্গ সন্তানের সংস্কৃতিক, সামাজিক, ধার্মিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হ'ল নয়াদিল্লী কালীবাড়ী। বিপদে আপদে শোকে আনন্দে বরাভয় শক্তি-রূপিণী মহামায়ার শরণ নিয়ে এসেছে বাঙ্গালী জাতি। শক্তির উপাসক মহাকালের পুত্রবতী বঙ্গ সন্তান যুগ যুগ ব্যাপী আরাধনার ফলে মৃন্ময়ী মূর্তিকে করে তুলেছে চিন্ময়ী। দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালীর সেই আরাধনার, সেই সাধনার কেন্দ্রস্থল হ'ল নয়াদিল্লী কালীবাড়ী।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে মুষ্টিমেয় বঙ্গ সন্তান হরিপদ গুপ্তর নেতৃত্বে গোলমার্কেটের অদূরে বেয়র্ড রোডে জগন্মাতা বিশ্বরূপা বঙ্গ জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তারপরে স্যার বি, এন, মিত্র এলেন ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের মেম্বার হিসাবে। তিন শত বঙ্গ সন্তানের মিলিত চেষ্টায় আরাবল্লী পাহাড়ের পাদদেশে বিখ্যাত তালকটোরা উদ্যানের সমীপে ভারত সরকারের বদান্যতায় একখণ্ড জমি পাওয়া গেল।

ধীরে ধীরে সমবেত প্রচেষ্টায় মন্দির খাড়া করা হ'লো। ধনী এলো ধন নিয়ে, নির্ধন এলো প্রাণ-মন-শ্রম নিয়ে।

বাংলার বাইরে এত বড় কালী-বাড়ী আর কোথাও নেই। অতিথিশালা সর্বদাই খোলা রয়েছে।

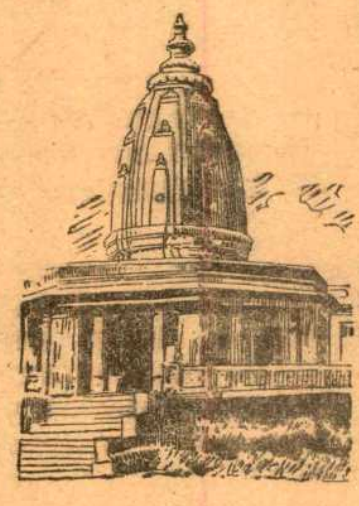

নয়া দিল্লীর কালীবাড়ী

দেশ বিদেশ থেকে অতিথি আসছেন। ব্যস্ততায় মন্দির প্রাঙ্গণ সর্বদাই সরগরম।

রয়েছে। দিল্লীতে [illegible] তিরিশটি বিভিন্ন জায়গাতে [illegible] অন্তত একটি দিনের জন্য [illegible] একবারটি কালীবাড়ীতে [illegible] যান।

নয়াদিল্লী কালীবাড়ীতে [illegible] অট্টালিকায় ছোটবড় অনেক ক্লাব ও সভা-সমিতির আশ্রয়স্থল।

বেয়র্ড রোডে নিউদিল্লী [illegible] ক্লাব ভাড়াটে বাড়ীতে বহুদিন কা[illegible] পর সম্প্রতি তারও বেশ কিছুদিন [illegible] অতিথিশালার সংলগ্ন কয়েকখান[illegible] নিয়ে আপন অধিকার [illegible] করেছেন।

আজ বেঙ্গলী ক্লাব কালী[illegible] অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয়র সংখ্যা থেকে উত্তরোত্তর এদের [illegible] সমস্ত দিল্লীকে আলিঙ্গনপাশে চলেছে। সাংবাদিক, অভি[illegible] অভিনেত্রী, সাহিত্যিক, খেলোয়া[illegible] যখনই দিল্লীতে আসেন, বেঙ্গলী [illegible] সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জ[illegible] কুণ্ঠিত হয় না। দূর থেকে এ[illegible] বলেই তাদের সাথে প্রীতিবন্ধনটা হয় দৃঢ়তর।

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচা[illegible]

দু'দিনের জন্য আগত [illegible] অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নেন। পরমাত্মীয়ের নিকট থেকে নিয়ে চলেছেন তাঁরা। বাংল[illegible] ছবিটুকু তাঁরা দিয়ে যান আপন[illegible] লুণ্ঠনায় প্রবাসী বাঙ্গালীর মনে উঠে বিরহ বেদনা—মাতৃ[illegible] বিরহ বেদনা। মুহূর্তের জন্য মন ছুটে যায় সহস্র মাইল আকাশ যেখানে ধরিত্রীকে চুম্বন ধানের ক্ষেতে, দুরন্ত শিশুর দ[illegible] হর্ষগমে যেখানে স্বাগত সম্ভাষণ খালবিলের পিঙ্গল জলস্রো[illegible] শুধু মুহূর্তের জন্য দিল্লী প্রবা[illegible] অসুস্থ হয়ে পড়ে—ইংরিজীতে বলে হোম সিক'।

বাংলা সাহিত্যকে এঁ[illegible] বসেন সাহিত্য সভা বসান [illegible] অধ্যবসায় শ্রমে, তাই খাড়া [illegible] দু'খানি পত্র-পত্রিকা। [illegible] পত্রিকার নাম দিয়েছেন [illegible]

(ছায়াচিত্র দ্রষ্টব্য) "সম্পাদকমণ্ডলী" দেন ভাষা।

রাত জেগে অনারারী শিল্পী দেন তাকে রূপ। শুধু তাই নয়, আপন সাধ্য অনুসারে তাঁরা প্রকাশিত করে আসছেন "লেখনী"। স্থানীয় সাহিত্যিকবৃন্দ নিয়ে আসেন রচনা সম্ভার। "পাত্রকাটি" কোয়ার্টারলি।

মন্দির অঙ্গনে এই ক্লাবটি যে সব অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে তার ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর। সেখানে মাঝে মাঝে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বসে।

নয়া দিল্লীর বৌদ্ধ মন্দির

"হরি সভা" বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুগ যুগ ধরে যে সঙ্কীর্তনের অধিকারী হয়ে এসেছে সুদূর দিল্লী সহরেও তার পুনরুদ্ধারে স্থানীয় বাঙ্গালী কৃপণতা করেন নি। মরমিয়া কীর্তনের প্রাণমাতানো সুরে ভক্তবৃন্দ প্রেমে মাতোয়ারা অশ্রুপ্লুত নয়নে সেই মহান্ পবিত্র নাম সঙ্কীর্তন করেন, জীবনের কান্না হাসি সাঙ্গ হলে যে নাম ধ্বনিত করে মাটির ধূলোতে করা হবে এ শরীরের অবসান। এঁদের প্রচেষ্টায় দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দের রাধারাণীর কীর্তন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ, দিলীপ রায়ের সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে।

খেলাধূলোর জন্য এঁরা যে প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন তার সাথে বাংলার অনেকেই পরিচিত। রাইসিনা স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লীর ফুটবল জগতের সম্রাট বললে অত্যুক্তি হবে না। তিরিশ বছর পূর্বে দিল্লীতে বাঙ্গালীর জাতীয় ক্রীড়া ফুটবলের প্রচলন করে এঁরা দিল্লীর ক্রীড়ামোদীর বিশেষ প্রিয়ভাজন হয়েছেন। এঁদের অনেক খেলোয়াড় বিদেশেও আমন্ত্রিত হয়েছেন।

বাংলা থেকে সহস্র মাইল দূরে বাংলার কৃষ্টি ঐতিহ্যকে অব্যাহত গতিতে সর্বজনসমক্ষে পরিবেশনের যে গুরুদায়িত্ব এঁদের উপর অর্পিত হয়েছে, সে গুরুভার তাঁরা যেন সম্মানের সাথে বহন করেন এই প্রার্থনা জানাই।

নয়াদিল্লী কালী মন্দিরের পরিপার্শ্বটি বড়ই মনোরম। এর সংলগ্ন মন্দিরটি বহু দেশ বিদেশাগত তীর্থ যাত্রীদের পদধূলিপূত বৃদ্ধ মন্দির। তার পাশেই ভারতবিখ্যাত মন্দির—লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির হলেও স্থানীয় লোকেরা এর সাথে জড়িত করেছেন বিড়লার নাম। গৌরবের কথা, দু'টি মন্দিরেরই প্ল্যান্ যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গ সন্তান।

বিড়লা মন্দিরে স্বাস্থ্য চর্চার জন্য একটা সমিতি রয়েছে। তার কর্ণধার রঞ্জিত মজুমদার কোনো কালে সমগ্র উত্তর ভারতে মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

আরাবল্লী পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দিরগুলো দেখে একদিন "যাযাবর" সাহেব এই রাস্তাটির নামকরণ পরিবর্তিত করার বাসনা প্রকাশিত করেছিলেন। এই মন্দিরগুলোর পাশে আরও একটি নতুন অর্ঘমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "যাযাবরে"র ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আজ এই রাস্তার নতুন নামকরণ হয়েছে। রীডিং রোড থেকে এর নাম হয়েছে মন্দির মার্গ। পার্শ্ববর্তী নিরিবিলি বীথিকার নাম পরিবর্তন করে সহরের কর্তারা বেরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। "লভাবস্ লেন" নামটার সাথেও বেশ রোমাঞ্চ জড়ানো ছিল না কি?

* * *

সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হ'লেই আমি একটি লাল পেন্সিল নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসি। গত দশ বছরের ফলাফল লক্ষ্য করে আসছি। গত দু'বছর থেকে বাঙ্গালী ছাত্ররা মোটামুটি ভালো করে আসছেন যদিও অতীত গৌরবময় দিনগুলোর তুলনায় এ কৃতিত্ব নিষ্প্রভ, ম্লান। এই অবনতির কারণ কি?

এটা স্বীকার্য যে সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলোতে দিল্লীর বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ মোটের উপর ভালোই করছে। এবারকার ইণ্ডিয়ান্ এডমিনিষ্ট্রেটিভ্ সার্ভিস বা ফরেন সার্ভিসে দিল্লীর বাঙ্গালী ছাত্রদের 'কোটা' মন্দ নয়। মিলিটারী এ্যাকাডেমিতেও তাঁরা নেহাৎ মন্দ করছেন না। দু' তিনজন ছাত্র প্রতিবারই আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্সে প্রবেশ করছেন। তাতে আমাদের আনন্দিত হবার কারণ থাকলেও সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখানে আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই সর্বভারতীয় পরীক্ষার এই ফলাফল নিয়ে আমি শুধু বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতিত্ব অকৃতিত্ব আলোচনা করছি নিছক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির বিশ্লেষণের দিক থেকে, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতার চোখে নয়। সম্প্রতি "কাশ্মীরের ইতিহাসের" এক দীর্ঘ ভূমিকায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুও কাশ্মীরী ছাত্রবৃন্দের বিভিন্ন পরীক্ষার কৃতিত্বে গৌরব অনুভব করেছেন।

দিল্লীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী এ শতাব্দীর শুরু থেকেই রয়ে এসেছেন (রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথেই যাঁরা দিল্লীতে এসেছিলেন, যাঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে) তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে, সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলোতে বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ কি রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তালিকায়

আজও সেই পুরোণো দামগুলো সে অতীত গরিমার সাক্ষী হিসেবে রাখা রয়েছে। কিন্তু আজকাল সেই প্রতিভা কোথায় উঠে গেল?

খেলাধূলোতে (আনন্দের কথা বহুদিন পরে স্থানীয় রাইসিনা স্পোর্টিং আবার নিজ শীর্ষ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), সামাজিক বৈঠকীয় আয়োজনে, লেখাপড়ায়, সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাদের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শীর্ষস্থান থেকে নেমে আসছে কেন?

তার জবাব খুঁজতে গিয়ে কি দেখি?

স্কোয়ারে স্কোয়ারে (দিল্লীতে মোয়াকের রেওয়াজ নেই, তার পরিবর্তে আছে স্কোয়ারের আড্ডা) গাছের তলায় বসে দীর্ঘকাল ব্যাপী অর্থহীন আড্ডার মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদন। এই আড্ডাগুলোতেও তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করে না। এই সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন জীবন অতিবাহনের পর যখন হঠাৎ একদিন তাদের শিরে সংসারের ভার এসে পড়ে তখন তারা চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। হাতের কাছে যে চাকুরীটি জুটে যায় সেটিই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে তার মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী ছাত্রবন্ধু তখন দিবাযামিনী অধ্যয়নের ভিতর ডুবে পরিকল্পিতভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মেধা থাকা সত্ত্বেও তাই আমাদের প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ প্রতিযোগিতায় আর যেন পেরে উঠছে না। সংগ্রামের শক্তি তাদের দিন দিন কমে আসছে।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯৪৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ, পাশ করে একটি শিখ ছাত্র (তার নাম সুরেন্দ্র সিং) দুয়ারে দুয়ারে কেরাণীর চাকরী খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। ব্যর্থ মনোরথ হয় নি। ছাত্র পড়িয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। শুক্রবারের বারান্দায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। সমস্ত দিনটি কাটিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ,এস,আই,এস, ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরীতে, ১৯৫১ সালে অতি কষ্টে দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে সে শুধু এম্, এ্ পরীক্ষাই পাশ করে নি, সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সম্মানের সাথে পাশ করেছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দিল্লীর অদূরের এক গ্রাম থেকে একটি ছাত্র পড়তে আসতো।

নয়া দিল্লী কালীবাড়ী ক্লাবের দেওয়ালে চিত্রিত 'অরাম'

পরীক্ষার অল্পদিন পূর্বে শুনলাম সে পরীক্ষা দেবে না। চিন্তিত চিত্তে তার বাড়ীতে গেলাম। দেখলাম গিয়ে ছেলেটি অত্যন্ত অসুস্থ। খবর নিয়ে জানলাম অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। ছেলেটি দিনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ-নীতিতে এম, এ পড়তো। রাতে রিক্সা চালিয়ে অর্থোপার্জন করত।

আজ সে কোনো কেন্দ্রীয় সরকারী গবেষণা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

এ দৃষ্টান্তগুলো উদ্ধৃত করলাম শুধু বাংলা দেশের সংগ্রামশীল ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে, পরিশ্রম অধ্য-বসায় কখনও ব্যর্থ যায় না।

দিল্লীর ছাত্রবৃন্দকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই লাইব্রেরীর সুবিধা নেই, যানবাহনের সুবিধা না থাকায় সময়ের অপচয় হচ্ছে, তাদের এ সব অজুহাত সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাদের অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই যে তাঁদের পূর্ববর্তী সতীর্থদের তুলনায় তারা কম পরিশ্রমী, কম অধ্যবসায়ী।

দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন সাড়া দেখা দেয় বসন্তের সমাগমে। প্রতিটি বছর দিল্লী নাট্যসঙ্ঘ প্রতিযোগিতামূলক নাটকের আয়োজন করে আসছেন। এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন ভাষাভাষীর নাটক-সঙ্ঘের সমাবেশে। প্রতিযোগিতাটা গৌণ, মুখ্য হল বিভিন্ন ভাষাভাষীর নাট্য সাহিত্যের ভাবের আদান প্রদান।

এটা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা যে নাট্য সাহিত্যে বা নাটকের আর্টে বাংলা দেশই সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে রয়েছে। কোন কালে হয় তো সেটা ছিল। আজ নয়। সর্ব-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটা ভাষার সাথে অন্যটার তুলনা করতে বসলে দেখতে পাই অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার নাট্য সাহিত্য বা নাটকের টেক্‌নিক আজ আর বিশেষ পিছিয়ে নেই। এ বিষয়ে মারাঠী সাহিত্য সম্প্রতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে যা থেকে আমাদের বাংলা মঞ্চের অনেক কিছু গ্রহণীয়।

দিল্লী নাট্যসঙ্ঘের এই উৎসবে বাংলা ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করে আসছেন "নবনাট্যম"। অন্যান্য সঙ্ঘও দু'একটা বাংলা বই নিবেদন করেছেন (যেমন "চতুরঙ্গ") তবে নবনাট্যমের অভিনয়ের জন্য দিল্লীর সমজদার মহল সর্বদাই বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়ে এসেছেন। এবারকার

উৎসবে নবনাট্যম্ যে অভিনয় পরিবেশন করেন (গঙ্গাপদ গুহর "অংশীদার") তার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মাননীয় আইন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন মহাশয়।

দিল্লীতে সখের অভিনয়ের রেওয়াজ বহুদিন থেকেই চলে আসছে। সেই সব অভিনয় সঙ্ঘের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ আজ সর্ব-ভারতীয় নাট্য জগতেও স্বনামধন্য হয়েছেন।

সেকালে দলগত কোন নাটকের সংগঠন ছিল না। এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরী চালায়, ব্রীজের কম্পিটিশন বসায়, পূজোর সময়ে কমিটী মেম্বারদের ধরে করে একটা-আধটা থিয়েটারও খাড়া করে। নিছক নাটকের জন্য দিল্লীতে সর্বপ্রথম যে দলটি গঠিত হত তার নাম নবনাট্যম্।

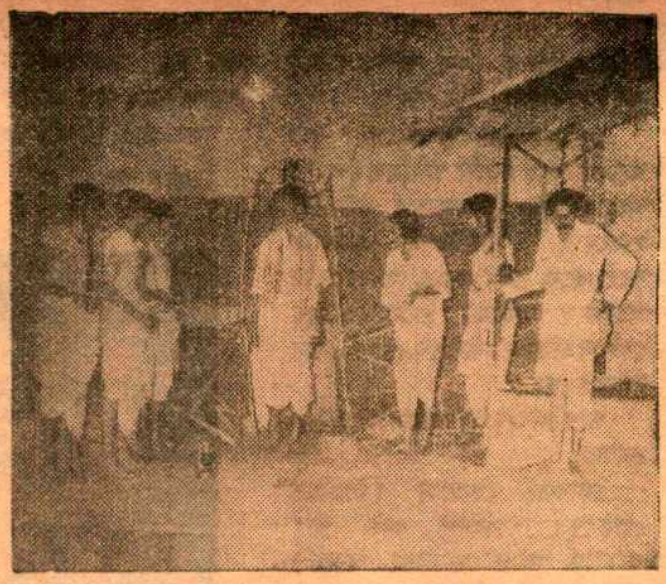

"নবনাট্যম্" মঞ্চস্থ "আমার মাটি"র একটি দৃশ্য

১৯৫৮ সালে প্রশান্ত চৌধুরীর "প্রত্যাবর্তন" নিয়ে এদের প্রথম আবির্ভাব। দৃশ্য সজ্জার আঙ্গিকে এরা একটা নতুন ধারা চালু করে। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ঝোঁক ছেড়ে সমষ্টিগতভাবে অভিনয়ের দিকেই এদের বৈশিষ্ট্য দেখা গেল।

১৯৬০ সালে দিল্লী নাট্য সঙ্ঘের নাটক প্রতিযোগিতায় পাঁচটি পুরস্কার লাভ করে সমস্ত ভারতীয় দলের মধ্যে নবনাট্যম্ একটি রেকর্ড সৃষ্টি করে।

নবনাট্যম্-এর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব যোগেশ চৌধুরীর সীতার মতন একটি চিরায়ত নাটকের উপস্থাপনে। এ যুগ ক্লাসিক্স্-এর প্রতি কৃপা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ঐতিহ্যে যারা বিশ্বাস করে না ভবিষ্যতেও তাদের পক্ষে কুয়াশাময় অবাস্তব। নবনাট্যম্ সীতা মঞ্চস্থ করে সর্বপ্রথম দিল্লীর মতন সংস্কৃতিবিহীন জায়গাতেও একটা নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এঁরা শীঘ্রই 'সাজাহান' মঞ্চস্থ করবেন। আগামী বছর শেক্স্পীয়র চতুর্থ শত বার্ষিকীতে বাংলায় 'ম্যাক্বেথ্' মঞ্চস্থ করার আয়োজন চলছে।

পুরস্কার লাভের কৃতিত্বেই নব নাট্যমের বৈশিষ্ট্য নয়। সাহিত্য সভার মাধ্যমে নাট্য সমস্যা নিয়ে এঁরা ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেন। এঁদের আসরে এসেছেন ৺শচীন সেনগুপ্ত, ৺ছবি বিশ্বাস ও ৺তুলসী লাহিড়ী। এসেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শম্ভু মিত্র ও কালী ব্যানার্জী।

চলচ্চিত্রের অত্যাচারে দূর প্রবাসে দিল্লীতে বাংলার নাট্য সাহিত্য যখন প্রায় নির্বাসনে যেতে চলেছিল তখন সমাজজীবনে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালী সমাজ নবনাট্যমকে অভিনন্দন জানাবে নিশ্চয়ই। শুধু বাঙ্গালী সমাজ কেন সাথে সাথে সর্বভারতীয় বিভিন্ন যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সংস্কৃতির প্রগতির সাথে জড়িত তাঁরা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করবেন।

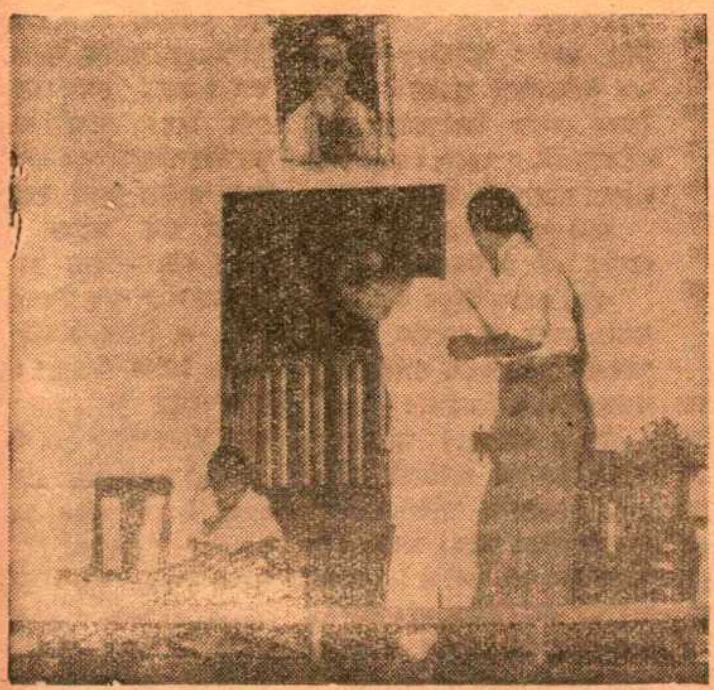

"নবনাট্যম্" মঞ্চস্থ সংক্রান্তির একটি দৃশ্য

বঙ্গদর্শন

চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্ত শহর বনগাঁ। বনগাঁ পৌর এলাকা অতিক্রম করে মাত্র দু'তিন মাইল পথ গেলেই যশোর রোডে পুলিস আর কাষ্টমসের চেক পোষ্ট। ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা এখানে ভারত সীমান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মাঝে বেড়া। বেড়ার ওপার থেকে সুরু হয়েছে পাকিস্তানের এলাকা।

যশোর রোডের এই চিহ্নিত আর সুরক্ষিত সীমান্ত ছাড়া আরও দীর্ঘ স্থান জুড়ে দুই রাষ্ট্রের সীমারেখা।

পৃথিবীর সব দেশেই আছে সীমান্ত সমস্যা। সব দেশেই সীমান্ত এলাকায় দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলায় পাকিস্তানের সঙ্গে সুবিস্তৃত সীমান্ত এলাকা ছড়িয়ে আছে। সব জেলার সীমান্ত শহরের যে সমস্যা বনগাঁয়ের সমস্যা তা থেকে স্বতন্ত্র নয়। সমস্যার মিলের সঙ্গে সঙ্গে একই ধরণের দুর্নীতি।

পাশপোর্ট-ভিসা, চেক-পোষ্ট, শুল্ক ঘাঁটির দৃষ্টিকে আড়াল করে দিনরাত অবাধে চলছে বে-আইনী, লোক পাচার আর মাল পাচার। যশোর রোডের দু'ধারের গেঁয়ো পথ ধরে, দুই রাষ্ট্রের প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে ভারতে আসছে নানা ধরণের মার্কিণী যন্ত্রপাতি, গুঁড়া দুধ আর লবঙ্গ-এলাচ প্রভৃতি মশলা।

ভারত থেকে যায় বিড়ির পাতা আরও অন্যান্য জিনিস। বনগাঁ থেকে চোরাই পথে চালান হয়ে আসা মাল পত্র আবার চলে আসে কলিকাতার খোলা বাজারে, সেখান থেকে ভারতের সর্বত্র।

একই পথ ধরে পাকিস্তানের নাগরিকরা বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করে ভারত থেকেও পাকিস্তানে চলে যাতায়াত। মাল আর মানুষের এই চোরাই পাচারের জন্য এপার আর ওপারের দালালদের আছে সুসংহত প্রতিষ্ঠান। নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা অবাধে তাদের পাপ-ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

বনগাঁয়ের জনসাধারণের অভিযোগ দু'পারের সীমান্ত প্রহরীরা এই বে-আইনী কারবারের শুধু নীরব সাক্ষী নয়। তাদেরও অনেকের নিয়মিত 'হপ্তা' ব্যবস্থা আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে সরকারের উপরওয়ালাদের টনক নড়ে। যশোর রোড কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রহরীরা সতর্ক হয়। বেশী সতর্ক হয় চোরাই পাচার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন। যশোর রোডের ওপর নজর পড়ে। কিন্তু খোলা মাঠ আর গেঁয়ো পথে মাল চলাচল আর লোক যাতায়াত বন্ধ হয় না। দু'চার জন চুনোপুটি ধরা পড়ে। কাগজে কাগজে হৈ-চৈ হয়—আইন সভায় প্রশ্ন ওঠে। আবার দেখা যায় একই দৃশ্য চলে একই নাটকের অভিনয়।

* * *

সীমান্তবর্তী বনগাঁ মহকুমা আজো বিপুল জনসংখ্যার চাপে সমস্যাসঙ্কুল। দেশবিভাগের সময় যে এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার—আজ সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার। ওপার থেকে চলে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আজ ঘর বেঁধেছে বনগাঁ শহরে আর মহকুমার গ্রামে গ্রামে। অনেকের ঘর হয় তো আজো বাঁধা হয়নি। আজো ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে।

বনগাঁ শহরের নিউমার্কেটে অবস্থিত দেড়শর্ত পরিবার তাদের অন্তর্ভুক্ত। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতের সাহায্যেই এঁরা চলে আসেন বনগাঁ সহরে। ভিটে-মাটি হারা হয়ে সেদিন থেকে এঁরা ভিখিরীর জীবন যাপন করছেন। আজো তাঁদের দুর্দিন শেষ হয় নি। হবে কি না কে জানে?

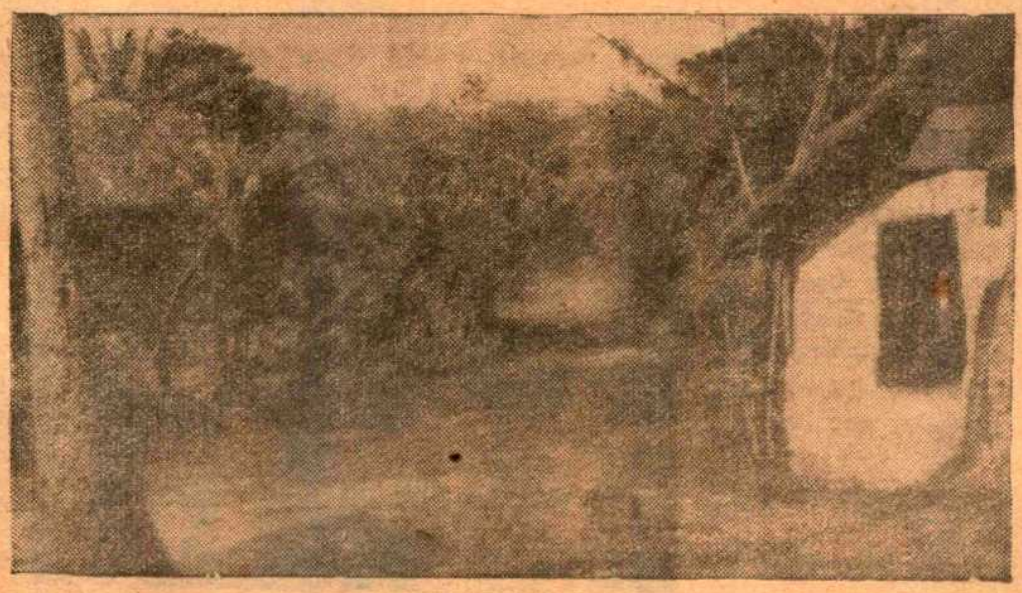

যশোর রোডের দু'ধারে মাল পাচারের পায়ে-চলা পথ

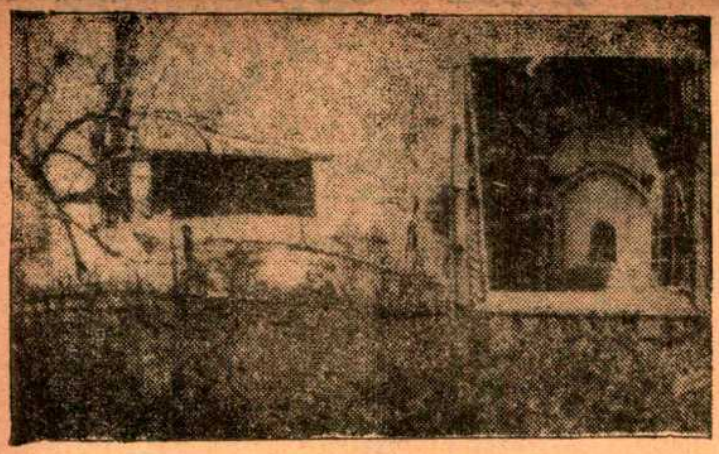

যবন হরিদাসের সাধনক্ষেত্রে তুলসী মঞ্চ

এছাড়া কোথাও বা সরকারী প্রচেষ্টায় আর কোথাও বা স্ব-প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু কলোনী। তাঁদের অভাব আছে, আছে অভিযোগ কিন্তু মাথা গোঁজবার ঠাঁই তাঁরা পেয়েছেন আর পেয়েছেন জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা।

কৃষি নির্ভর বনগাঁ মহকুমার কৃষকের জীবন ঋণভারে জর্জরিত। প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার তার ওপর মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে নিজের চাষের জমিটুকু হারিয়ে অনেক কৃষক আজ সর্বস্বান্ত।

সেচের জলের জন্য আজো বনগাঁয়ের চাষীদের নির্ভর করতে হয় বরুণ দেবতার কৃপার উপর।

অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টায় ৫টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা নগণ্য। আরও নাকি ২৮টি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বনগাঁয়ের বড় বড় বাঙ্গর থেকে জালা কেটে অথবা পাম্প বসিয়ে সেচের ব্যবস্থার কথাও নাকি সরকার চিন্তা করছেন।

উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পের অভাবে বনগাঁয়ের ভূমিহীন কৃষক আর নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে বেকারীর অভিশাপ। অথচ পাট প্রধান এই মহকুমায় আর কিছু না হোক দু'একটা জুট মিল চলতে পারে স্বচ্ছন্দে।

বনগাঁ সহরের চিরুণী শিল্প আজ প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অভাবে মুমূর্ষু। সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক শত শ্রমিক আর ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে পড়েছে আসন্ন অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ছাপ।

এই মহকুমায় প্রায় দশ হাজার আদিবাসী বাস করেন। এদের মধ্যে আবার বহু সংখ্যক পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা পরিবার। অধিকাংশ ভূমিহীন আদিবাসীদের জীবনও স্বভাবতই সমস্যাসঙ্কুল। সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কিছুটা সীমিত ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন কিন্তু বনগাঁয়ে এই বিভাগের কোন দপ্তর না থাকায় অধিবাসীদের অযথা হয়রানি হতে হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বনগাঁয়ের উন্নতির জন্য সরকার থেকে কিছু করা হয় নি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। দেশবিভাগের পূর্বে এই মহকুমায় কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল না—এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে নয়টি। পনের বৎসর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৯৬টি, এখন হয়েছে ৩৫০টি। পাকা রাস্তা ছিল ৩০ মাইল এখন ৯০ মাইল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি কতটুকু।

দীনবন্ধু, রাখালদাস, বিভূতি-ভূষণের জন্মস্থান বনগাঁ। যবন হরিদাসের সাধনক্ষেত্র বনগাঁ। এই বনগাঁ একদিন বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কালের প্রভাবে আজ বনগাঁয়ের সে সমৃদ্ধি নেই—সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তার অবলুপ্তির পথে। যশোর রোডের ধারে পরম বৈষ্ণব হরিদাসের সাধনক্ষেত্র আজ জঙ্গলে সমাকীর্ণ। স্থানীয় কৃষি অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় নির্মিত তুলসীমঞ্চটি আজ শুধু অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

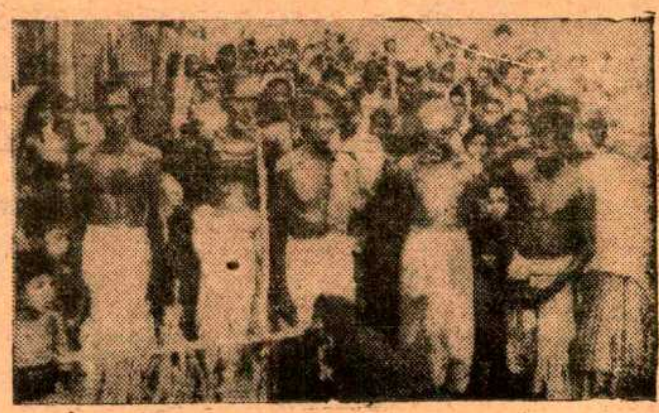

বনগাঁ-নিউ মার্কেটে আশ্রয়হত উদ্বাস্তু দল

কবিতা

বিপ্রলব্ধ

দঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

অনেক প্রার্থনা শুধু খেঁাওয়ার মতন গেল আকাশে মিলিয়ে
হৃদয় বিলিয়ে
কী আমি পেলাম ?
নাম শুধু জ্বালাময় নাম !
তা-ই দিয়ে যাই আমি সময়ের হাতে—
যদি কোনো বিস্মিত প্রভাতে
প্রার্থনার সাড়া
আলোকের হয় ঝর্ণা-ধারা !
বিপ্রলব্ধ মন
জানে না কোথায় আর আছে সান্ত্বনার আয়োজন
কোন্ কাজে, কোন্ প্রেমে, কোন্ অভিলাষে,
কোন্ প্রার্থনার মৃত্যু-পাশে ঃ

মানমন্দির

দুর্গাদাস সরকার

মানমন্দিরে কার্ণিশে কোলে পাখিটার ভাঙা বাসা।
ছাদেতে তা-দেওয়া রক, পাখিটির ডিম ;
সেখানে ছিঁড়বে হঠাৎ হয় তো সৌররশ্মিশিখা।
ঝিঝভোর জ্বলে অনেক উঁচুতে লালবাতি টিমটিম।

মানুষের মুখ আঁকা একরোখা ফানুস হয়েছে ছাপ
মাঠের উপর ধবধবে মেঘে
উঠোনে কে গোণে তারা সারারাত, চোখের ডিমেতে ঘুম
কাড়ে তারকার আত্মহত্যা ঃ পাশে তারি লাশ শুন !

জাপানী সন্ধ্যা

শ্রীসন্ধ্যা ঠাকুর

ট্রেন চলেছে সবেগে। এত গতির তেজ, আশ্চর্য্য, তবু কামরার ভিতর থেকে বিশেষ শব্দ আসে না কানে। ঐ ঝিক্‌ঝিক্ আওয়াজ কানে না এলে রেলগাড়ীতে চলেছি বলে মনেই হয় না। শুধু একটা শাঁ শাঁ শব্দ। দু'পাশের দৃশ্য শুধু তীব্র বেগে উল্টোদিকে ছুটে চলেছে। বিজলী ট্রেন। নাম কোদামা। কোদামার মানে হ'ল প্রতিধ্বনি। পৃথিবী-বিখ্যাত এই জাপানী টোকিও থেকে কোবে পর্য্যন্ত মিটার গেজ লাইনের নাম তোকাইদো। টোকিও থেকে কোবে সহর চার শ' মাইল দূরে। কোদামা ঐ চার শ' মাইল পার হয় পাক্কা সাড়ে ছয় ঘণ্টায়। de luxe ট্রেন। আরও আছে কয়েকটি। নাম হ'ল 'হাতো', 'ৎসুবামে' ইত্যাদি। হাতো মানে পায়রা, 'ৎসুবামে' হল চাতক্। কী সুন্দর সব নাম। এর মধ্যে কোদামাই সবচেয়ে আধুনিক ও de luxe। এর গতিবেগ প্রতিধ্বনির মত জল্‌দি। দেখতেও সুন্দর। ঝক্ ঝকে, ষ্ট্রীম্-লাইন্‌ড্, স্মার্ট্।

পয়লা আর দোসরা দরজা। সব রিজার্ভ্‌ড্ সীট্। তফাৎ বিশেষ নেই পয়লা আর দোসরা শ্রেণীতে। ফার্ষ্ট ক্লাসের reclining chairএর উপর ধবধবে সাদা ওয়াড় দেওয়া, সেকেণ্ড ক্লাসের নীল মখমলের গদী ওয়াড়-বিহীন। জানালা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। বন্ধ একেবারে। জানালা তুলে বিদায় কালে হাত বা রুমাল নাড়ার উপায় নেই। জাপানীদের ঐটুকুতেই সামান্য আপত্তি। আর সবই o. k.।

ষ্টীল্ টিউবের ঝকমকে ঠেলা-গাড়ীতে নানান্ রকমের refreshments নিয়ে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করছে সাগর-সবুজ রংয়ের uniform পরা ফুটফুটে জাপানী মেড্। মিষ্টি গলায় মাঝে মাঝে হাঁকছে "ওবী—রুনী জিউ—সু"। হঠাৎ মনে হয় যেন গান গাইছে। বী-রু হ'ল beer আর জিউ-সু মানে juice। ও দু'টিই বিদেশী কথা হলেও এখন জাপানী ভাষায় ঢুকে পড়েছে। অবশ্য উচ্চারণের দৌলতে শোনায় অন্যরকম। আধুনিক জাপানী।

কণ্ডাক্টর এসে মাঝে মাঝে যাত্রীদের কাউকে বিলিয়ে যাচ্ছে এক টুকরো হল্‌দে কাগজ। কি বল তো? টেলিগ্রাম। এই de luxe রেলগাড়ীতে বসে টেলিগ্রাম পাওয়া যায়, পাঠনো তো যায়ই। শুধু কি তাই? সীট ছেড়ে একটু গাড়ীর পিছনের দিকে গেলেই দেখতে পাবে লাউঞ্জ, বার, স্মোকিং রুম, ডাইনিং রুম ইত্যাদি। হঠাৎ যদি ইচ্ছা যায় বাড়ীতে কারুর সঙ্গে কথা বলবার—যাও সোজা টেলিফোন বুথে। আরামসে কথা কও। এদিকে কোদামা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে কোবের দিকে। কামরার ভিতর থেকে বিশেষ আওয়াজ পাওয়া যায় না বটে। বাইরের থেকে কোদামার আওয়াজ আর হাওয়াই-জাহাজের আওয়াজ প্রায় একই রকম।

এই তোকাইদো লাইনের ট্রেন-গুলির নাম ডাকের পিছনে আছে একটি জরুর ব্যাপার। ট্রেন লেট হয় না কখনও। না, এক সেকেণ্ডও নয়। অবশ্য অঘটন কিছু ঘটলে আলাদা কথা। এই ধরণের পাংচুয়ালিটি সচরাচর দেখা যায় না অন্য দেশে। এমন কি আমেরিকা বা য়ুরোপেও। তাই এর এত নাম-ডাক। প্রতি জাপানীর গৌরব এ।

অন্যান্য লাইনে যে সব ট্রেন চলে—তাদের নিয়ে গৌরব করার বিশেষ কিছুই নেই। সাধারণতঃ নোংরা। পয়লা দরজার কামরাও বেশ নোংরা। যাত্রীদেরই দোষ। এগুলি হ'ল গ্রাম্য ট্রেন। অতএব নোংরা ও আন্‌পাংচুয়াল্।

এরা সময় নষ্ট করতে চায় না একেবারেই। সবসময়েই একটা কিছু করতে হবে। তা' না হলে waste। টাইম্ ইজ মানি। ট্রেনের যাত্রীরা একটা না একটা কিছু করছেই। কেউ পড়ছে বই, খবর কাগজ বা সাপ্তাহিক,

কেউ পিটছে তাস পয়সা ফেলে, কেউ বা আবার সশব্দে চুমুক্ দিচ্ছে ইয়া লম্বা বীয়ারের গ্লাসে। কেউ বা জোর গলায় লাগিয়েছে খোস গল্প, আবার ঠিক তারই পাশে বসে কেউ

কানে ইয়ারফোন্ এঁটে ট্রানজিস্টার রেডিও শুনছে চোখ বুঁজে। কি যে শুনছে, সে নিজেই জানে! পাশের খোসগল্প না রেডিওর গান। সময় নষ্ট হচ্ছে না—সময় কাটছে! আর এক ঘন্টা পরে মাতুন তোকাইদো লাইন্ খোলা হবে। স্রড্ গেজ্। তখন কোবে থেকে টোকিও যাওয়া যাবে সাড়ে তিন ঘন্টায়। বোঝ ব্যাপার!

রাজধানী টোকিও ছাড়ার খানিকটা পরেই ডান দিকে পড়ে ফুজিয়ামা পাহাড়। এই মাউন্ট ফুজি হ'ল জাপান দেশটার একটি বিরাট পরিচয়। অনেকের এই পাহাড়ের নামের মাধ্যমেই মোলাকাৎ হয় জাপানের সঙ্গে। জাপানে গিয়ে যদি ফুজিয়ামাই না দেখলুম তবে আর দেখা হ'ল কি জাপানের? এ যেন ভারতে গিয়ে তাজমহল না দেখার মত। অবশ্য ফুজি পর্ব্বতের সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করা উচিত নয়। আলাদা ব্যাপার। প্রায় চার হাজার মিটার উঁচু এই ফুজিয়ামা। য়ামা মানে পাহাড়। চূড়ো ঢাকা রয়েছে চিরশুভ্র তুষারে। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসেন বলে মনে হয়। মেঘমুক্ত আকাশে দূর বহুদূর থেকে দেখা যায় ফুজিসান্কে। সান্ মানে শ্রী। শ্রীফুজি। রাজকীয় ভঙ্গিতে মেঘের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক দৈত্যের হাত থেকে জাপানকে রক্ষার জন্য প্রহরা দিচ্ছেন পর্ব্বতরাজ ফুজিয়ামা। এঁর পাদদেশে রয়েছে ছোট বড় কয়েকটি নীলজলের লেক আর তাদের আশে-পাশে কয়েকটি ছোট-খাট সুন্দর সহর। এদের মধ্যে নামজাদা হ'ল ছাকোনে আর আতামি। আতামির একদিকে ফুজিয়ামা, আরেকদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। শীত গ্রীষ্মে ছুটির সময়ে কী ভিড়, কি ভিড়।

পাহাড় আর সাগরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে এই তোকাইদো লাইন। চমৎকার দৃশ্য। মাঝে মাঝে বিরাট লম্বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। পাহাড় কেটে চলে গেছে তোকাইদো। পাহাড়ের পর পাহাড়। ফুজিসানের কাছাকাছি এলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সব যাত্রীরা। কেউ বা নমস্কার জানাবে দেবতা শ্রীফুজিকে, কেউ বা ক্যামেরায় ছবি তুলে নিয়ে যাবে। যারা দেখা পেল না তারা ফেলবে দীর্ঘশ্বাস আর যারা দেখা পেল—প্রায় সকলেই—জানালার কাছে হুমড়ি খেয়ে ঝপাঝপ ছবি তুলে ফেললে নিজেদের গলায় ঝোলানো ক্যামেরা দিয়ে। বাড়ী ফিরে ছবি ডেভেলপ্ করে দেখা যাবে সত্যিই কি দেখলুম! ক্যামেরার জাপান।

প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট ইয়োকোয়ামা টাইকানের আঁকা ফুজিয়ামার ছবির কথা মনে পড়ে। সারাজীবন ধরে কত ছবিই উনি এঁকেছেন ঐ কুহকী পাহাড়ের। দেখলে জুড়িয়ে যায় চোখ। ভোরের ফুজিসান, দিনের ফুজিসান, অস্তাচলের ফুজিসান্। এক একটি জলন্ত কবিতা। বছর চারেক আগে স্বর্গলাভ করেছেন টাইকান্।

বিদেশীরা জাপানে এলে প্রথমেই ছোটেন ফুজিয়ামাকে চাক্ষুষ দেখতে এটা না দেখলেই নয়। আর দেখতে ছোটেন কিমোনো পরা পাখা হাতে সুন্দরী জাপানী মেয়েদের। তাঁদের কাছে এরা হ'ল জাপানের বিশেষত্ব। এদিকে এই শুনে এ দেশের মডার্ণরা চটে যান। বলেন ভুল ধারণা। আমাদের জাপানকে ঐ পাহাড় আর কিমোনো পরা মেয়ে দিয়ে বোঝার চেষ্টা ভুল। আমরা আধুনিক। আমরা নূতন। আমাদের যন্ত্রশক্তিই আমাদের পরিচয়। ভুলে যাও ফুজিয়ামা; কিমোনো ঢাকা সুন্দরী, নদীর ঢেউয়ের মত জাপানী নাচ; ভুলে যাও ঐ পুরাণো কামিসেন সঙ্গীত; ভুলে যাও আমরা পুরণো মাল। চির নূতন আমরা!

অতএব সহরের যেখানে সেখানে আলগলিতে রয়েছে যে সব অগুনতি হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, কাফে, বার বা টি-রুম্—চলে যাও সোজা, যদি দেখতে চাও আজকের আধুনিক জাপানকে। এক টাকা দাম দিয়ে কেনা আমেরিকান্ কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কান খাড়া করে শোনো প্যাটবুন, একজিম্ প্রিসলি, ল্যাটিন্ আমেরিকান বা চা-চা-চা সঙ্গীত। ছাঁড়র মত মাইক্রো-ফোন হাতে ফ্যাশনেবল্ মার্কিণকাটের স্যুট বা গাউন্ পরা গায়ক-গায়িকা হেলে দুলে, হাঁটু মুড়ে গেয়ে চলেছে বিদেশী গান। জাপানীর 'জ'ও নেই সুরে বা সঙ্গীতে। একই গানে দু' তিন রকম ভাষা মেশানো। আরিজিনাল্ ইংরাজী, ফরাসী বা হিস্পানী কথা এক লাইনও তার সবটাই বিদেশী উচ্চারণে ভরা জাপানী কথা। কি ভাষা তা জাপানীরা নিজেরাই বুঝতে অক্ষম বেশীর ভাগই। ইন্টারন্যাশন্যাল্ ব্যাপার। সে জা কথা! অদ্ভুত উচ্চারণ ও কিম্ভূত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক দিয়ে গড়া এই আধুনিক জাপানী সঙ্গীত। যে বলে ভাল লাগে না—সে আধুনিক নয়। Teenagersরা এই শুনেই মুগ্ধ, এতেই নির্ব্বাণ লাভের চেষ্টায় রত।

যদি শুনতে চাও জাপানের সনাতনী সঙ্গীত, তবে যেতে হবে পুরাণো রাজধানী কিওতো। টোকিও থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরে। শত শত মন্দির আছে এই সহরে। অনেকটা আমাদের বারাণসীর মত। প্রাচীন ও সুন্দর। তবে কিওতোর সৌন্দর্য্যের তুলনা পাওয়া ভার। নিশিয়ামা আর হিগাশীয়ামা (নিশি=পশ্চিম। হিগশী=পূর্ব্ব। য়ামা=পাহাড়) দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর উপত্যকা জুড়ে কিওতো বহুদিন থেকে বিরাজ করছে। টোকিও রাজধানী হয়েছে প্রায় একশ' বছর হ'ল। তার আগে কিওতোই ছিল পুরাণো রাজধানী। আজও জাপানী আর্ট ও কালচারের রাজধানী কিওতোই। অনেকে একে বলেন এটা জাপানের কালচারাল্ ক্যাপিটাল।

হাজার দেড়েক মন্দির ছড়ানো রয়েছে এই কিওতো সহরে। হয় লুকিয়ে আছে নিশি বা হিগাশীয়ামার পাইন্ বনের মধ্যে, নয় রয়েছে সহরের মাঝখানে হোটেল বারের গা ঘেঁসিয়ে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে। হোটেল রেষ্টুরেন্টের নিওন্ আলোর সঙ্গে মন্দিরের মলিন বাতি তো আর লড়ে ইয়ে উঠতে পারে না। একদিন তাকে নিঃশব্দে সরে যেতেই হবে অন্য কোথাও।

হিগাশীয়ামার পাদদেশে শতশত

অঞ্চলে ঢুকে পড়ো যেকোন একটা গলিতে। ভিড় নেই একেবারে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছে ধূপের গন্ধ। পাশেই বয়ে যাচ্ছে শিরাকাওয়া (সাদানদী)। ছোট্ট পার্বত্য নদী। নীলজল। দু'ধারে রয়েছে হাল্কা সবুজ রংয়ের ইয়ানাগী (উইলো) গাছের সার। একটু জোরে বাতাস বইলেই মাথা দুলিয়ে নমস্কার জানাচ্ছে নদীর জল আর আকাশকে। শিরাকাওয়ার ওপার থেকে ভেসে আসছে জাপানী সঙ্গীতের ধ্বনি। কোতো বা শামিসেনের ধ্বনি। কোতো হল প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাঠের পাটার উপর তার লাগানো যন্ত্র। মেঝেতে রেখে বাজাতে হয়। শামিসেন্ অনেকটা সরোদের মত। আর একটু বড়। হাতির দাঁতের ষ্ট্রাইকার দিয়ে বাজাতে হয় কোলে রেখে। অতি সুন্দর এই যান্ত্রিক সঙ্গীত। মাঝে মাঝে বিরাট ফুল-গোঁজা খোঁপা দুলিয়ে উঁচু খড়ম পায়ে এঁটে সুন্দরী গেইকা তার বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে নদীর পাড় ধরে। উইলোর পাতা হঠাৎ বাতাসে নীচু হয়ে তার খোঁপা ছুঁয়ে আবার আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। একেবারে ছবির মত। মনে হবে হ্যাঁ সত্যই জাপানে এসেছি। এইতো আসল জাপান।

ঘড়ির দিকে চাইলে—ওঃ দেরী হয়ে গেল। "পন্থচো" থিয়েটারের টিকিট রয়েছে পকেটে। মিস্ করা যায়না। জাপানী তদোরীর (নৃত্য) শো। ছুট ছুট! একবার কিওতোয় এসে অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাই হয়না। কিওতোকে ভালভাবে দেখতে হলে সময় লাগে অনেক। এইখানেই জাপানকে, পুরাণো জাপানকে জানতে পারা যায়। অন্য কোথাও নয়। জাপানী বাগান, তার ফুল সাজানোর আর্ট, তার মন্দির, তার বৌদ্ধ মন্দিরের নিরামিষ খাবার খেয়ে দেখতে হবে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে যারা এখনও ভালবাসে তাদের পুরাণো জাপানকে। নিঞ্জন্ ভালবাসে কিমোনো পরতে। ভালবাসে মাথা নামিয়ে নমস্কার জানাতে। ভালবাসে ভগবান বুদ্ধকে আর তাঁর দেশকে।

জাপানীদের মধ্যে এই প্রাচীন আর নবীনকে নিয়ে মহা আলোচনা, আলোড়ন চলেছে গত এক শ' বছর ধরে। প্রাচীনরা মাথা খাটাচ্ছেন কী করে তাঁদের জাপানকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। নবীনরা ভাবছেন কী করে মডার্নিজম্ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে কিস্তিমাৎ করে দেওয়া যায়, আর কী করে ঐ প্রাচীনকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে রেখে আদায় করা যায় ফরেন্ এক্সচেঞ্জ। অদ্ভুত দেশ এই জাপান। আলট্রা মডার্ন লিজম্ ফিরে আসছে দ্রুতবেগে। নতুন নতুন ব্যাপার নিয়ে অকোরত্র রিসার্চ করে চলেছে এরা। সেই সব খবর ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে এই "জাপানী সন্দেশ" বসুমতীর পাঠক পাঠিকার কাছে।

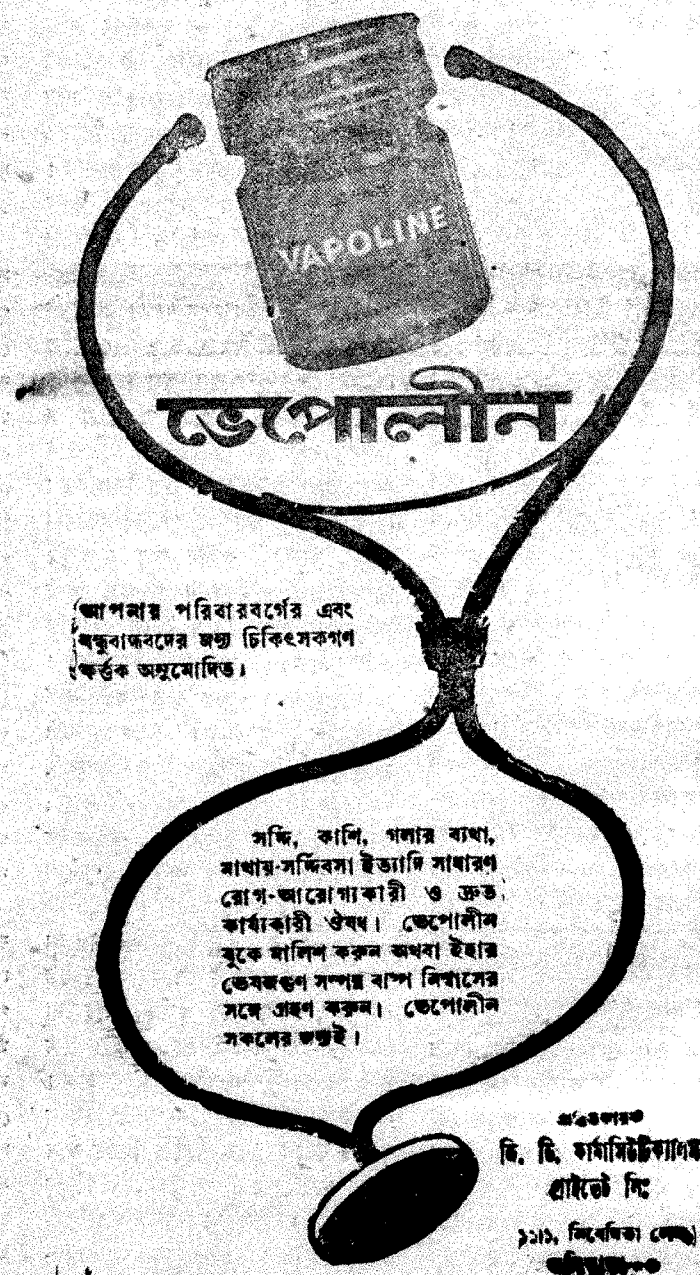

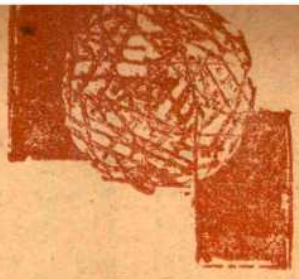

আন্তর্জাতিক

মস্কো-পিকিং বিরোধের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য

কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ব্যাপার সম্পর্কে যাঁরা অ্যাকাডেমিক গবেষণা করে থাকেন, তাঁদের অনেকেরই মতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে বর্তমান বিরোধ পন্থাগত মতভেদ ছাড়া বেশী কিছু নয়।

কিন্তু লক্ষ্য যেখানে দুয়েরই এক, সেখানে পন্থাগত বিরোধ মারাত্মক হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। অন্তত লক্ষ্য সাধনের জন্যে যদি এক পক্ষ অপরের পন্থার সঙ্গে সাময়িক-ভাবে সহাবস্থান করে, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু মস্কো ও পিকিংয়ের মধ্যে যে বিরোধ আজ বেশ কয়েক বছর ধরে ধিকি ধিকি করে জ্বলে আসছে, তার গভীরতা, তার তিক্ততা, তার অনমনীয়তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বিরোধ নিছক পন্থাগত নয়, এ বিরোধ আদর্শগত।

কম্যুনিষ্ট শিবিরে আজ পরিবর্তনের ঝড় এসেছে। তাতে অনেক কিছুই ওলট-পালট হতে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুকেই পরিবর্তিত হতে হয়। প্রকৃতি রূপ বদলায়। মানুষের জীবনে যৌবন-জরা-মৃত্যু আবর্তিত হয়ে যায়। সমাজ-জীবনে পুরণো ব্যবস্থাকে চৈত্রের পাতার মত ঝরে গিয়ে নতুন মূল্যবোধের কিশলয়কে পথ করে দিতে হয়।

তা যদি না দিতো, তবে প্রকৃতির রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অন্ত থাকতো না। মানুষের সমাজে তা সহজে দেয় না বলেই যত অশান্তি, যত সংঘাতের সৃষ্টি। 'বাপ-ঠাকুর্দার আমলেও শুনি নি' এমন কথা মেনে নিতে এখনো যে আমাদের সমাজের প্রাচীন অংশ পরাঙ্মুখ, তাতো আমরা চোখের সামনেই দেখছি।

কম্যুনিষ্ট মতাদর্শের মধ্যেও এই পরিবর্তনের সংঘাতই দেখা দিয়েছে। যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা অর্জনের জন্যে যে পরিস্থিতির প্রয়োজন, দেখা গেল কালের স্রোতে তার পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার ফলে সমস্ত চিন্তাধারাকে নতুন করে ঢেলে সাজবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। লক্ষ্যকেও নতুন জায়গায় স্থাপন করার প্রশ্নটিও তাই বড় হয়ে উঠেছে। কারণ, বাঁচতে হলে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। নইলে আদর্শ বৃহৎ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীটুকুর মধ্যে গুমরে মরে শেষে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে মস্কোয় কমিনটার্নের দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেস উপলক্ষে সমবেত কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছেও একবার এই খাপ খাওয়ানোর প্রশ্নটি দেখা দিয়েছিল। তাঁরা যেমনটি আশা করেছিলেন, তখনকার পরিস্থিতি ঠিক তেমনটি ছিল না। লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লব হবে, কিন্তু তা হয়নি। কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে, এবং তার ফলে সর্বহারার বিপ্লবের

রা শিয়ার দুইজন খ্যাত শ্রমিকের মুখে সাফল্যের হাসি

উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। এমন কি মধ্য-ইয়োরোপের দেশগুলিতে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও, কম্যুনিষ্ট মতবাদ সেখানে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। হাঙ্গেরী ও জার্মানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সমস্যার মুখে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে একটি সমাধান খুঁজে নিতে হয়েছিল। তাঁরা স্থির করেছিলেন, ইয়োরোপীয় সর্বহারার কথা স্থগিত রেখে আপাতত ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হোক এইভাবে তাঁদের আদর্শকে খাপ খইয়ে নিয়ে তাঁরা কম্যুনিজমকে যে দীর্ঘতর জীবন দান করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

তেতাল্লিশ বছর পরে আজ আবার খাপ খাওয়াবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্ন এখন আরও মৌলিক, কারণ এই অন্তর্বর্তীকালে জগতের, সমাজ-ব্যবস্থার, অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে আরও ব্যাপক।

এখন এশিয়ায় ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটতে চলেছে। তা কোন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ফলে নয়। ভারত তার কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্যে স্বাধীনতা পায়নি। আফ্রিকায় অনেক ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে নিছকই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আলজিরিয়ার রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মস্কোর নির্দেশে পরিচালিত কোন কম্যুনিষ্ট নন। ইরাকে অত্যাচারের মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট-পন্থী শাসন কায়েম করার চেষ্টা চলেছিল, নিয়তির চরম দণ্ডের ভেতর দিয়ে তার অবসান ঘটেছে।

এখন উন্নতিশীল দেশগুলিতে গরীব আরও গরীব হচ্ছে না। দেশের শিল্পসমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার মত টাকা অপর্যাপ্ত হলেও এসে যাচ্ছে। জীবনধারণের মান আর এক জায়গায় থেমে নেই।

এখন ধনতন্ত্র আর গোঁড়া শোষক নয়। আজকের শিল্পপতি কেবল মুনাফা লোটেন না, শ্রমিকদের থাকার জন্যে তাঁরা উপনিবেশ তৈরী করে দেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে স্কুল করে দেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল তৈরী করে দেন, তাঁদের মানসিক সুস্থতার জন্যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁদের ভবিষ্যতের জন্যে দেন ভাতা, দেন নিরাপত্তা।

এখন কম্যুনিজমের পয়লা নম্বর শত্রু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একজন শ্রমিক যে বেতন, যে সুযোগ-সুবিধা পায় এবং যে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, কম্যুনিজমের জন্মভূমি রাশিয়াতেও আজও তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আর

মিঃ ক্রুশ্চেভ

রাশিয়ার কথা বাদই দিলাম। এই ভারতেরই অনেক মোটা মাইনের কর্মচারীও একজন মার্কিণ শ্রমিকের সমান বেতন পান না।

এখন আমেরিকায় কম্যুনিজমের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কম্যুনিজম একজন শ্রমিককে যা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তা আমেরিকা ইতিমধ্যেই দিচ্ছে। আর এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে তা দেওয়া হচ্ছে আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই।

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এখনকার স্বল্পোন্নত দেশগুলির আরও সমৃদ্ধি ঘটবে। তখন সেই সব দেশেও শ্রমিকদের বেতন যাবে বেড়ে। তাদেরও জীবনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। একটা মোটামুটি উন্নত জীবনধারার মান আসবে সকলের জন্যে। তারপর ব্যক্তিগত চেষ্টায় যদি কেউ নিজেকে উন্নততর করতে চায়, তাতে কেউ বাধা দেবে না।

তখনো কি সেই সব দেশে কম্যুনিজমের চাহিদা থাকবে?

বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে এই প্রশ্নটিই অত্যন্ত বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের কাছে বিষয়টি এক অপ্রিয় পছন্দের মত। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকের এই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় যদি গোঁড়ামী করে সর্বহারার বিপ্লবের পুরণো আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তবে তাঁদের বহুনিন্দিত ধনতন্ত্র সে আদর্শকে অনেক পেছনে ফেলে চলে যাবে।

তাঁর কাছে সমস্যা আজ শুধু কম্যুনিজমের প্রসারের নয়, কম্যুনিষ্ট দুনিয়াতেই কম্যুনিজমকে টিকিয়ে রাখারও। এ কথা পরিহাসের মত শোনালেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্রুশ্চেভের কম্যুনিজমকে আজ পশ্চিমের ধনতন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভকে তাই সহাবস্থানের নীতি বেছে নিতে হয়েছে। আমেরিকাকে গ্রাস করার নয়, আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার। ক্রুশ্চেভ নিজে বলেছেন যে, "জটিল পরিস্থিতির মধ্যে" তাঁকে এই নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এই নীতি তিনি চালিয়ে যাবেন।

নানা তিক্ততার মধ্যেও নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা থেকে ক্রুশ্চেভ যে সরে আসেন নি, তা তাঁর এই নীতিরই ফল। কারণ তিনি জানেন নিরস্ত্রীকরণ আজকের দুনিয়ার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

স্বজাতীয়দের নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বার্লিন নিয়ে তিনি যে হট করে কিছু করে বসেন নি, তা-ও এই জন্যেই; বরং ১৯৬১ সালের

অক্টোবর মাসে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে তিনি আর্মাণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার নির্দিষ্ট তারিখ প্রত্যাহার করে নেন।

তাই—কেবল বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার জন্যেই—আমেরিকার হুমকিতে তিনি কিউবা থেকে অপরাধীর মত সমস্ত সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন।

এই কারণেই ১৯৫৯ সাল থেকেই তিনি কম্যুনিষ্ট চীনের মাও সে-তুংকে বলে আসছেন লাওস, ভারত এবং সিকিম ও ভূটানের সীমান্ত থেকে চীনা সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও মিঃ ক্রুশ্চেভ পরিবর্তনকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন। স্তালিনের যখনকার লৌহ তিনি আর অনুসারে বেতনের তারতম্য তাঁকে করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে। বিলাসদ্রব্যের চাহিদাকে তিনি সমালোচনা করেছেন, কিন্তু দমন করেন নি।

দেশকে তিনি যৌথ খামার দিয়েছেন, কিন্তু 'কমিউন' দেননি। 'কমিউন' প্রথার সবচেয়ে প্রধান বিরোধী হলেন ক্রুশ্চেভ। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, মানুষের মুক্তিপ্রিয় জীবনকে একটা কঠোর বাধাধরা ব্যবস্থায় বন্দী করলে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। একবার সে বিদ্রোহ দেখা দিলে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। মানুষের মন বন্ধন চায় না। সে চায় নিজের পুত্র-

চীনের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত প্রধানত এখানেই।

পিকিং জোর গলায় বলে থাকে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তার ধারণা যুদ্ধের আশ্রয় না নিলে কম্যুনিজমের প্রসার ঘটানো যাবে না। কিউবা থেকে বিনাযুদ্ধে সরে আসায় চীনা নেতৃবৃন্দ ক্রুশ্চেভের ওপর যারপর নাই রুষ্ট হয়েছেন।

এ কথা তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক করলেই বিশ্ব শান্তি স্থাপন করা যায় না। আকারে ইঙ্গিতে তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, "সাম্রাজ্যবাদী" শক্তিবর্গের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনার প্রতি ক্রুশ্চেভের যে বিশ্বাস

লেনিন যৌথ খামারের (ক্রাস্নোদর জেলা) ৪ জন গোয়ালিনী কাজের শেষে ঘরে ফিরছেন

তত্তটা রাখেন নি। পত্র-পত্রিকা আর পর্যটক আদান-প্রদানের মাধ্যমে অকম্যুনিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল শ্রেণীর জনগণকে এক নিয়মের ষ্টীমরোলার চালিয়ে সমান করে দিতে পারেননি। পূর্ববর্তী আমলে সাধারণের বুকের ওপর শাসনের যে বরফ জমে উঠেছিল, তা তিনি অনেকটা গলিয়ে হাল্কা করে দিয়েছেন। জনসাধারণের যোগ্যতা কন্যাকে ঘিরে একটি সুখী সংসার গড়ে তুলতে একেবারে নিজের মত করে। সে চায় নিজের আয়ের একাংশ জমিয়ে একটু স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক পরের কথা।

ক্রুশ্চেভ চান, কম্যুনিজমকে পরিবর্তন করে, মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাছে নতি স্বীকার করে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা।

আছে তা "নীতিভ্রষ্ট" ও "অলীক"।

তাছাড়া তাঁদের এখনও ধারণা যুদ্ধ না করলে ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীন হ'বার সম্ভাবনা নেই। তাঁরা ক্রুশ্চেভের নিরস্ত্রীকরণ নীতিরও বিরোধী; কারণ তাঁদের মতে নিরস্ত্রীকরণ হলে পরাধীন জনগণের হাতে অস্ত্র থাকবে না, আর অস্ত্র না থাকলে তাদের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধও করা যাবে না।

কিন্তু এ প্রশ্নও নয়। বস্তুত পিকিং বিরোধের এর চেয়েও প্রত্যক্ষ কারণ হলো কমিউন ব্যবস্থার প্রতি ক্রুশ্চেভের তীব্র বিরোধিতা। পিকিংয়ের মুখের ওপরেই ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, কমিউন ব্যবস্থা এ যুগে অচল। রাশিয়াতেও তিনি সে ব্যবস্থা হতে দেননি। কারণ তিনি জানেন তা ব্যর্থ হবে। মানুষ কখনো ব্যক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এক পাল মেষের মত যূথবদ্ধভাবে বাস করতে পারে না।

ক্রুশ্চেভের আপত্তি উপেক্ষা করে চীন কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তা যথারীতি ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতা যে বিরূপতা ও ক্রোধের আকার নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভারত আক্রমণ করল। এর সাফাই হিসাবে পিকিংয়ের 'পিপলস্ ডেইলি'র এক সম্পাদকীয়তে লেখা হলো : "ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের তিন বছরে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, চীন সরকার ভারতের নেহরু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ আরম্ভ করে সম্পূর্ণ ঠিকই করেছেন।"

পিকিংয়ের এই কাজ মস্কোকে আরও বিরক্ত করে তুলল। গত জানুয়ারী মাসে পূর্ব জার্মাণ পার্টি কংগ্রেসে চীনা প্রতিনিধিদল ধিক্কৃত ও অপমানিত হলেন। চীন-ভারত বিরোধে ক্রুশ্চেভ "ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজবাদী রাষ্ট্র" চীনকে সাহায্য করলেন না, বরং ভারতকে প্রতিশ্রুত 'মিগ' জেট জঙ্গী বিমান পাঠিয়ে দিলেন। ক্রুশ্চেভ এইভাবে "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি" পরিত্যাগ করায় চীন এইবার আরও তীব্রভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো।

চীনের তত্ত্ব আলোচনার পত্রিকা 'রেড ফ্ল্যাগ' ক্রুশ্চেভের নিন্দা করে বলল, "তাঁর মুখটি ভয়ঙ্কর, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি দুর্বল---তিনি ইঁদুরের মত ভীতু, ভয়ের চোটে তিনি মরে আছেন।"

'পিপলস ডেইলি' গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী লিখল, ক্রুশ্চেভ ও তাঁর কমরেডরা শ্রেণী সংগ্রামের বদলে শ্রেণী সহযোগিতা এবং সর্বহারার বিপ্লবের বদলে সাংগঠনিক সংস্কার সাধন করতে চান।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে গালাগালির এক প্রবল স্রোতে মাও সে-তুং মস্কোকে সম্ভাব্য সকল অভিযোগেই অভিযুক্ত করলেন। বিশেষ করে বললেন যে মস্কোর নেতৃবৃন্দ বিশ্ব কম্যুনিজম দমনে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সাহায্য করছেন।

ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে চীনের এই প্রবল ক্রোধের কারণ প্রধানত তত্ত্বগত সন্দেহ নেই। অন্তত ক্রুশ্চেভের কাছে প্রশ্নটি মূলত তত্ত্বগতই। পিকিংও অবশ্য সে ধারণারই সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু মনে হয়, এই আদর্শগত কোঁদলের পেছনে চীনের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতেও পারে।

এ কথা আমরা জানি, চীনে কমিউন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। ঐ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত 'বিরাট সম্মুখ পদক্ষেপ' আনতে পারেনি। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আর্থিক অবস্থা আজ তাদের আরও খারাপ। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ আশার চেয়ে অনেক কম। শিল্প উৎপাদন লক্ষ্যের অনেক পেছনে।

কম্যুনিষ্ট স্বর্গ তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেনি।

আর দেশের বাইরে, চীনের আদর্শগত গোঁড়ামি আফ্রিকায় এশিয়ায় চীনকে আজ কোণঠাসা করেছে। শক্তির গর্ব দেখিয়ে চীন পৃথিবীর এই অংশে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা কেবল ভীতিরই সঞ্চার করেছে, ভালোবাসায় কাউকে কাছে টানেনি।

এ কথাই মনে রেখে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, চীন ভারত আক্রমণ করে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বুকে চরম আঘাত হেনেছেন। কারণ ধনতন্ত্র যেখানে শ্রমিকদের 'স্বর্গসুখ' দিতে ইচ্ছুক, সেখানে জোর করে কম্যুনিজম চাপাতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই।

চীনের জনগণের মনেও কি এই ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না? যে অবাস্তব সমাজব্যবস্থায় তারা ক্রমশ নিঃস্ব হতে চলেছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হওয়া কি অসম্ভব? বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই হয়েছে। দক্ষিণ চীনে খাদ্য দাঙ্গার কথা আমরা শুনেছি।

অপর পক্ষে চীনের জনগণ চোখের সামনেই দেখছে রাশিয়ায় কম্যুনিজমের পরীক্ষা সফল হয়েছে। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রুশ্চেভ তাঁর দেশকে স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছেন।

নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে তাঁরা সামরিক সম্প্রসারণেরও এক নীতি গ্রহণ করেছেন। দেশের কাছে জবাবদিহিস্বরূপ তাঁরা যেন বলতে চান, 'দেখ, চীনের শক্তি আজ কম নয়। চীনের নীতিই আজ তাকে এশিয়ার মুকুটমণি করে তুলেছে। ভারতকে আমরা কি শিক্ষাই দিয়েছি। আর রাশিয়া? রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালী করতে চায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে গ্রাহ্য করে না। দেখনি, আমেরিকার হুমকিতে কিউবা থেকে কেমন পালিয়ে এসেছে?'

সেই সঙ্গে চীন আরও বলেছে, রাশিয়া মানব হয়ে চীনকে তাঁবে রাখতে চায়। এই জন্যেই তো চীনের যত দুর্দশা। এমন কি চীনকে আর্থিক সাহায্যও সে আর দেয় না।

এ কথা স্পষ্ট যে, মস্কোর সঙ্গে বিরোধ জীইয়ে রাখা চীনের বর্তমান শাসকদের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক। রাশিয়ার পক্ষেও প্রশ্নটি জীবন-মরণের কিন্তু অন্য দিক থেকে রাশিয়া বাঁচতে চায় কম্যুনিজমকে, চীন নিজেকে

অন্তত অদূর ভবিষ্যতে এই বিরোধ হ্রাস পাবার বিশেষ আশা নেই। কারণ এ বিরোধের মীমাংসা সম্ভব কেবল কোন এক পক্ষের আত্মসমর্পণের দ্বারা।

ক্রুশ্চেভের আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কম্যুনিজম জঙ্গীবাদে রূপান্তরিত আজকের পৃথিবীতে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর মাও সে-তুং যদি মীমাংসা চান, তবে তাঁকে আদর্শের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে কম্যুনিজমকে রাশিয়ার মত উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে।

অবশ্য সেটা তখন কম্যুনিজম থাকবে কি না তা অন্য প্রশ্ন।

কুড়ি

আরব জগতে এক আশ্চর্য ঐক্যবোধ আছে। ইহা আটলান্টিক উপকূলের মরক্কো থেকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি ছাড়িয়ে ভূমধ্য ও এশিয়া মাইনরের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত। পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের শুধু ভৌগোলিক পরিচিতি ছিল। আরব উপদ্বীপে নানা উপজাতির বাস ছিল, একটি সাধারণ ভাষা তাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। ইসলাম সমস্ত উপজাতিও গোষ্ঠীকে জয় করে সমগ্র আরবকে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করলো। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর আরবগণ এক হাতে তরবারি ও অপর হাতে কোরাণ নিয়ে আরব দেশ থেকে বেরিয়ে পড়লো অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত পতাকা উচ্চে তুলে ও আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি করে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আরব সৈন্যবাহিনী মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করলো এবং ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে স্পেনে ঢুকলো ও সেখান থেকে ফ্রান্সে প্রবেশ করলো। তুর্সের যুদ্ধে চার্লস দি মার্টেল আরব সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস না করলে সমগ্র ইউরোপ আরব জগতের অংশ হয়ে পড়তো। আরব সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এলো ধর্মান্তরকরণ ও আরব ভাষা। একশো বছরের কম সময়ের মধ্যে মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক থেকে আরব হয়ে উঠলো, যদিও তারা আজও জাতিগত ভাবে পার্থক্য বজায় রেখেছে। এই বিরাট অঞ্চলের প্রাচীন মিসরীয়গণ, বারবেরগণ, মেষরের উপজাতিগণ ও অন্যান্য নানা উপজাতির ইতিহাস পুরাতত্ত্বে নিহিত রয়েছে। তারা সকলেই আরব জগতের বিরাট সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে ও তারা আজ নিজেদের আরব বলে মনে করে, যেমন তারা গত বারশত বছর ধরে করে আসছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আরব জগৎ ওত্তমান সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে। তারপর থেকে আরব জগতে অনৈক্য দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওত্তমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় আরব জগৎ বিভিন্ন ধরণের

শাসন ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ইরাক ও সৌদী-আরব রাজ্য ও ইয়েমেনের মত ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্য ছাড়া আরব জগতের বাকী সব রাজ্য ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ডের ম্যাণ্ডেট শাসিত অথবা আশ্রিত (প্রটেক্টরেট) রাজ্য হয়ে পড়ে। সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের ম্যাণ্ডেট শাসিত রাজ্য হয়। প্যালেষ্টাইন ইংলণ্ডের আজ্ঞাধীন (ম্যাণ্ডেটরী) হয়। মিশর অল্পবিস্তর বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য হয় সুদান বৃটেনের অধীন হয়। লিবিয়া ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত হয়। তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে পড়ে। মরক্কো স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব জগৎ ও অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে বিরাট আন্দোলন সুরু হয়। অধীন ও ম্যাণ্ডেট শাসিত দেশগুলিতে ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নেয়। ফ্রান্সের প্রাথমিক বাধার পর সিরিয়া ও লেবানন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। ইতালীয়দের পরাজয়ের পর লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। বৃটিশ সরকার সুদানকে স্বাধীনতা দান করেন ও সুদান মিশর থেকে পৃথক হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত করে। তিউনিসিয়া স্বাধীন হয়। মরক্কো স্বাধীন হয়। প্রায় দশ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আলজিরিয়া সবে মাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আলজিরিয়ার দশ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে ও আরও অনেকে নিঃস্ব হয়ে গেছে। মিশরে মুক্তি আন্দোলন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের রূপ ধারণ

আরব নেতৃবৃন্দের সহিত কায়রোস্থ গৃহীত চিত্র

(ডান দিক থেকে) শ্রী আর, কে, নেহরু, নাসের, শ্রী এ, কে, সেন, আলী সাব্রী ও আজম হোসেন

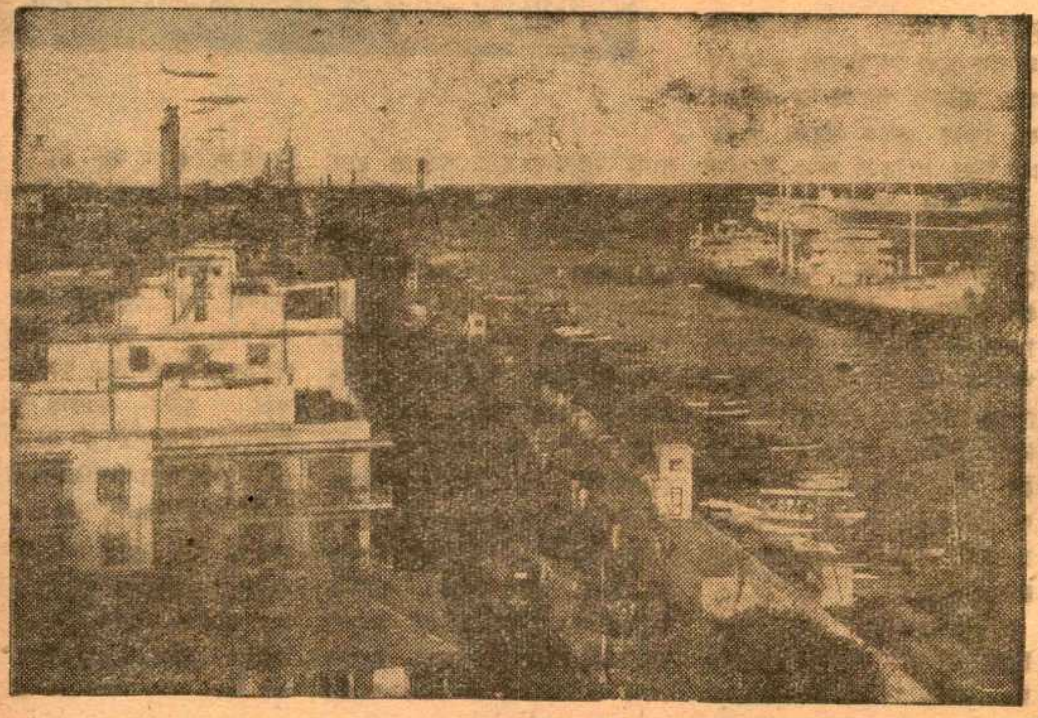

সাম্রাজ্যবাদীর কবলমুক্ত সুয়েজ খাল

করে। সুয়েজ খালের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য উচ্ছেদ করে তাকে স্বাধীন ও মিশরীয়দের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে রাজা পারেননি। সামরিক অভ্যুত্থান রাজা ফারুককে মিশর থেকে বিতাড়িত করলো ও রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হল। সেই সময় আরব ঐক্যের আন্দোলন আরও জোরদার হল। মিচেল আফলাক নামে একজন সিরীয় খৃষ্টান সিরিয়াতে বাআথিষ্ট আন্দোলন সুরু করলেন ও তা' সমগ্র আরব জগতে আলোড়ন তুললো। এর শ্লোগান হল "ঐক্য, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রবাদ।' প্রেসিডেন্ট নাসের মিশর বিপ্লবের নেতা। তিনি "আরব ঐক্য ও সমাজতন্ত্রবাদের" ধ্বনি গ্রহণ করেন। শুধু রাজনৈতিক-ভাবে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবেও তিনি মিশরের বিপ্লব সফল করেছেন। ফেলাহেনরা (মিশরীয় কৃষক) দীর্ঘকাল ধরে এক জমিদারী

মিশরের ফেলাহেন (কৃষক) রমণী

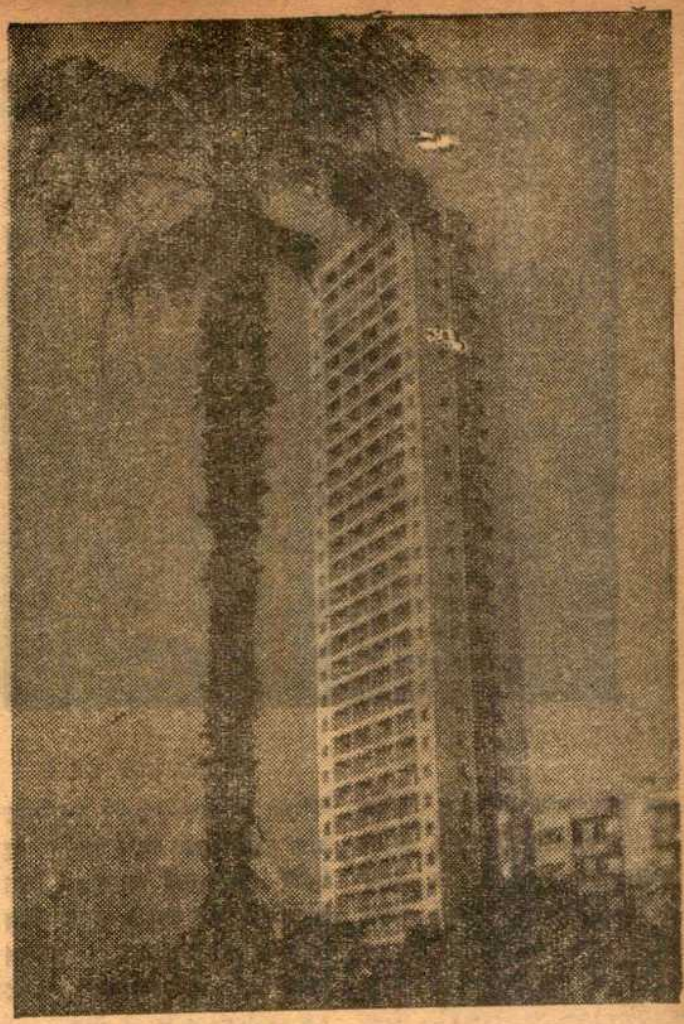

কায়রোর আধুনিক গৃহ

প্রথায় উৎপীড়িত হচ্ছিল। নীল উপত্যকার সমৃদ্ধ জমিগুলি মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের হাতে ছিল যারা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল ও ফেলাহেনদের মায়ের ওপর নির্ভর করতো। ফেলাহেনরা কঠোর পরিশ্রম করতে ও তাদের খাবার কিছু ছিল না বছরে তাদের দু'বার মাংস জুটতো কিনা সন্দেহ। একটি আলখা, জীর্ণ ও ময়লা পোষাক সে পরতো ও তার স্ত্রীকেও ঐরকম পোষাক দিত। আজ ফেলাহেনরা ইতিহাসে সর্বপ্রথম জমির মালিক হয়েছে। তাদের খণ্ড উদ্বৃত্ত আছে। জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। মিশরের জাতীয় সম্পদের প্রতীক সুয়েজ খাল আজ মিশরীয়দের। মিশরীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ খালটি রক্ষাণা-বেক্ষণ করে ও খাল অতিক্রমের সময় জাহজগুলি পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক দিক থেকে প্রেসিডেন্ট নাসেরর নীতি হল ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব, আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সঙ্গে সংহতি ও সামরিক ব্লকে যোগ না দেওয়া। দেশে ও বিদেশে বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী অপসারনের পর প্রেসিডেন্ট নাসের যে অসীম সাফল্য-লাভ করেছেন আরব জগতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আরব ঐক্য, সমাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে মিশর ও সিরিয়া যুক্ত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকের বিপ্লবে প্রেসিডেন্ট

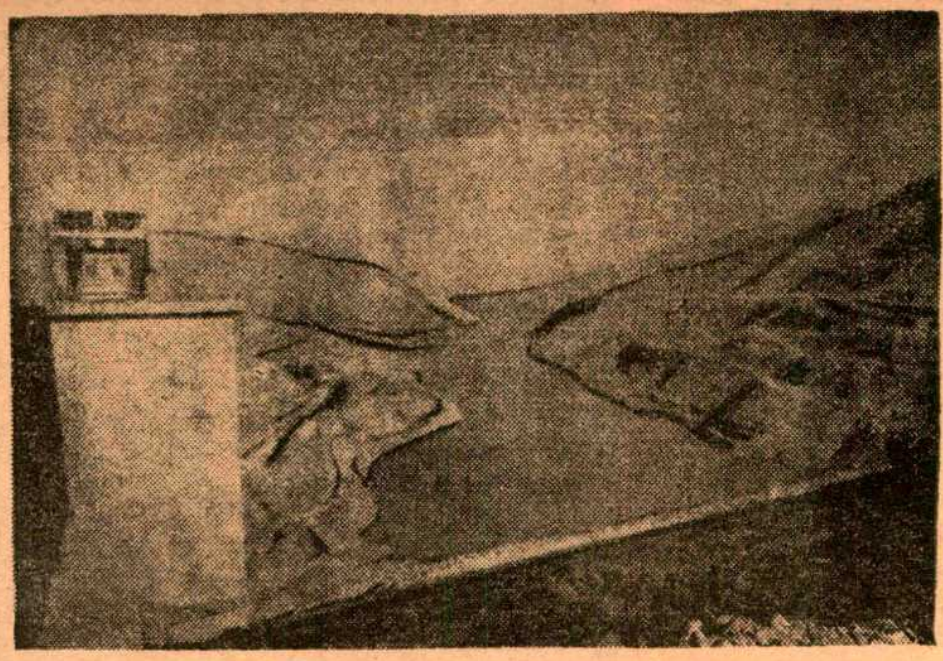

টাইগ্রীসের বাঁধ

কাসেম ক্ষমতা লাভ করেন। রাজা ফৈজল ও মুরী এল সৈয়দের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ধ্বংস ও চিরকালের জন্য রাজতন্ত্র বিলোপ হয়েছে। আশা করা যায় ইরাক শীঘ্র সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে যোগ দিবে। কিন্তু কম্যুনিষ্টগণ একীকরণের বিরোধী, তারা প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতি বিরূপ। কাসেম নিজেকে ইরাকের কম্যুনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত হতে দেন। এতে তিনি প্রেসিডেণ্ট নাসেরও সিরিয়া থেকে দূরে সরে যান ও আরব ঐক্যের আশা তিরোহিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বংশানুক্রমিক শাসনের মত কম্যুনিষ্টরাও আরব ঐক্যের প্রধান বাধা। ইরাক ও সিরিয়ায় সাম্প্রতিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে ইরাক ও সিরিয়ায় বাআথিষ্টরা ক্ষমতাসীন হয়েছে। মিচেল আফলাক এখন সিরিয়া সরকারের নেতৃত্ব করছেন ও সালা বিতার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট আরেক ইরাকে বাআথিষ্ট বিপ্লবের নেতৃত্ব করছেন। সিরিয়া ও ইরাকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রেসিডেণ্ট

ইরাকী সৈন্যদলের কুচ-কাওয়াজের দৃশ্য

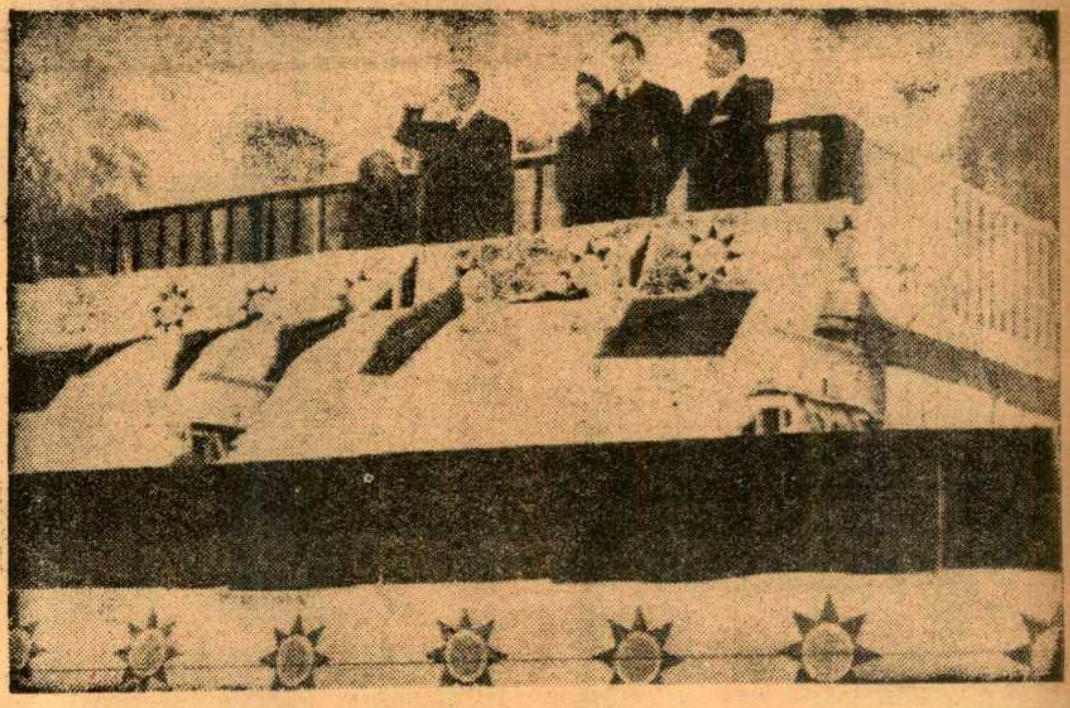

ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরেফের অভিনন্দন গ্রহণ

নাসের, শালা বিতার ও আরেফ মিলিত হন এবং মিশর, সিরিয়া ও ইরাককে নিয়ে এক নতুন ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা করেন। এতে আরব জগতে নতুন রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে ও অন্যান্য আরব রাজ্যে, বিশেষতঃ আলজিরিয়া ও ইয়েমেন যোগদান করবে আশা করা যায়। আরব জগতে এখন দু'টি শিবির একদিকে সৌদী আরব ও জর্ডানের রাজারা, অন্যদিকে মিশর ও সিরিয়ার মত নবজাগ্রত ও প্রগতিশীল আরব দেশ। সৌদী আরব ও জর্ডানের রাজাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা হয় ও তাঁরা আরবঐক্য ও অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছেন। সেইজন্য প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে সৌদী-আরব ও জর্ডানের রাজাদের অবিরত বিরোধ লেগে আছে। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের আহ্বান সৌদী-আরব ও জর্ডানের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। আরবঐক্য ও সমাজতন্ত্রবাদের বাআথিষ্ট মতবাদ সৌদী-আরব ও জর্ডানে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্মম সরকারী ব্যবস্থা বিপ্লব ঠেকিয়ে রেখেছে।

ইতিমধ্যে আরব জগত—মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে অগ্রগতি ও গতিশীলতা দেখা দিয়েছে। ইয়েমেনের মত আরব দেশ অল্পবিস্তর আদিম ও অনুন্নত হলেও কায়রো, বাগদাদ ও দামাস্কাস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করছে। কায়রো ও বাগদাদ বিশ্বের আধুনিকতম সহরের অন্যতম। মিশরের আসোয়ান বাঁধ নীল নদের উপত্যকায় চতুর্দিকের মরুভূমিকে জয় করবে। তাইগ্রিসের ওপর নতুন বাঁধ—ইরাকে হাজার হাজার একর উষর জমিতে শস্য ফলাবে। এই দেশগুলিতে দ্রুত শিল্পসমূহ গড়ে উঠছে। এশিয়ার মধ্যে বেরুট ও লেবাননে জীবনযাত্রার মান খুব উন্নত। এক নবজীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমগ্র আরব জগতকে চঞ্চল করে তুলেছে।

বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মহান বন্ধন আরব জগতকে ভারতের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট নাসের ভারতের একজন শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, তেমনি ভারতও আরব জগতের বন্ধু। ভারত সমগ্র আরব জগতের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিপদের দিনে প্রেসিডেন্ট নাসেরের বাণী ভারতকে অনেক শান্তি ও স্বস্তি দিয়েছে। কলম্বো সম্মেলনে ও পরে প্রেসিডেন্ট নাসের ও তার সরকার ভারতের দাবী ও শান্তির পক্ষ সমর্থন করেন এবং নতুন চীনা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

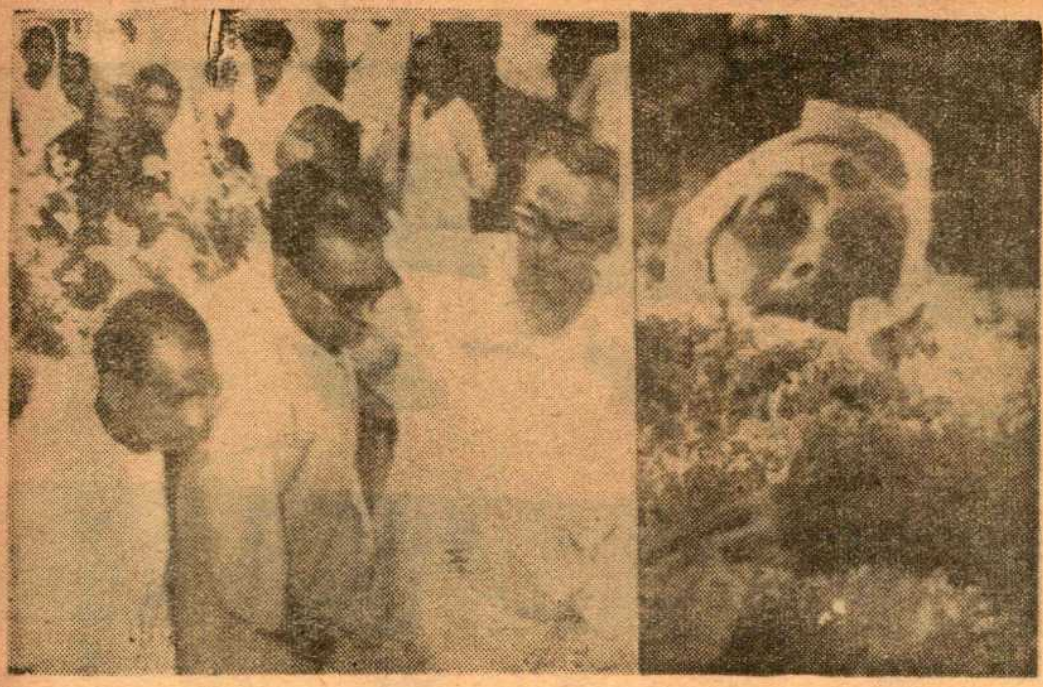

মহীয়সী মাতার মহাপ্রয়াণে

কৃতবিদ্য সন্তানের জননী, সোনারঙের (বিক্রমপুরের) প্রখ্যাত জমিদার স্বর্গত শ্রীনাথ সেনের কন্যা মহীয়সা রমণী সুষমা সেন রবিবার রাত্রিতে তাঁর পুত্র ডাঃ অমিয়কুমার সেনের গৃহে পরলোকগমন করেছেন। এই সার্থক জননীর স্নেহক্রোড়ে মানুষ হয়েছেন শ্রীসুরকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী, দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি শ্রীসুকুমার সেন, ডাঃ অমিয়কুমার সেন, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীঅরুণকুমার সেন, শ্রীবিজনকুমার সেন, কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ। প্রত্যেকটি সন্তানই তাঁর রত্ন। জীবনে তাঁরা সকলেই আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

সুষমা সেনের হৃদয় ছিল স্নেহ-কোমল। সহজেই পরদুঃখে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তাঁর গোপন দান, তাঁর হাতের সেবা-যত্ন পেয়ে বহুলোকেই নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। তাঁর বিয়োগ ব্যথা তাই অনেককেই অত্যন্ত কাতর করে দিয়েছে।

১১ বছর পূর্ব্বে তাঁর স্বামী অক্ষয়কুমার সেন পরলোক গমন করেছেন। সুষমা সেনের মহাপ্রয়াণে একজন স্নেহময় জননী, সদালাপী, দানশীলা ও ধর্ম্মপ্রবণা রমণীর অভাব ঘটল।

ওর নাম নীলিমা রাখাটা ভুল হয়েছে, আসলে ও নীলকণ্ঠ।

ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন ওর মুখে মধু দেওয়া হয়েছিল, তখন ও নাকি চুক চুক শব্দ ক'রে মধু চুষে চুষে খেয়েছিল। আধঘণ্টা বয়সের শিশু শব্দ করে মধু চুষে খায়—আশ্চর্য হবার মত ঘটনা বটে। শব্দ করে মধু চুষে খাওয়াটাই শেষ কথা নয়, সাত দিনের মেয়ে কাৎ হ'য়ে শুয়ে ছিলো, দেড় মাসের মেয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ছিলো, সাত মাসের মেয়ে একশিশি টিংচার আয়োডিন গলাধঃকরণও নাকি করেছিল। এইভাবে ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠবার পর যখন তার অল্পবিস্তর বুদ্ধির উদ্রেক হ'লো, তখন থেকে সে ঘৃণা করতে শুরু করলো পুরুষদের।

নীলিমার বাবার নাম মনোতোষ। এ নামটাও বেখাপ্পা, জীবনে মনস্তুষ্টি তিনি কারো করতে পারেন নি, অন্যের মনস্তুষ্টি দূরের কথা, নিজের মনকেই তিনি অসন্তুষ্ট রেখে মারা গেছেন। তিনি ছিলেন মেজাজী ও আদর্শবাদী, তাঁর মেজাজ ও তাঁর আদর্শই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। জীবনে তাঁর প্ল্যান ছিলো অনেক। পরিকল্পনা আর কল্পনা দিয়ে জীবন নষ্ট ক'রে গেছেন তিনি।

নীলিমার বাবা, মা ও ছোট একটি ভাই ছিল। এখন অবশ্য কেউ নেই। নীলিমা তার বাপের সর্বাধিনায়কত্বে ছোট থেকে বড় হয়েছে। তার বাপের গুণ ও দোষ দিয়েই তাই সে পুষ্ট। তারও মেজাজ খুব চড়া; তারও আদর্শ খুব উঁচু। অতএব জীবনে ব্যর্থ হবার দাবী তারও আছে।

বাপের উপদেশ ও শিক্ষাই তার জীবনের মূল সূত্র। তাই সে পরোয়া করতে জানে না কাউকে। যেটা সে নিজে ভাল বোঝে, সেইটেই আসল ভাল; যেটাকে অন্যে ভাল বলে সেটা তার পছন্দ নয়। এইভাবে বেড়ে ওঠার পর তের বছর বয়সে তাকে চলে আসতে হ'লো তার মামার হেফাজতে। একে একে বাপ মা ও ভাইটি যখন মারা গেলো, তখন একটা আশ্রয় না হ'লে তো চলে না।

সে ছেলে না মেয়ে—এ চেতনাই তার যেন নেই। মামাবাড়ির গাছে গাছে সে লাফিয়ে বেড়ায়, মামার দেশের মাঠে মাঠে সে টহল দেয়। কে কি বলবে এই ভয়ে নিজের ইচ্ছার বিপরীত কাজ করার মত শিক্ষা সে তো পায়নি। মামার গ্রামের লোক যখন তার নামে দুর্নাম রটাচ্ছে, সে তখন পেয়ারা চিবিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ছিবড়ে ছড়াচ্ছে; আর দাঁত বার ক'রে হি হি ক'রে হাসছে। কোনটা দুর্নাম আর কোনটা বদনাম কিছুই যেন বোঝে না সে, তার কোনো একটা কাজের তারিফ করে তাকে বাহবা দাও—সে—সে কথায় কর্ণপাতও করবে না। আশ্চর্য, এত শিক্ষা দিয়ে গেলেন তার বাবা, লোককে কেয়ার করতে একটু শিখিয়ে গেলেন না। তার মামারবাড়ির এ একটা অভিযোগ আছে বটে। পৃথিবীর সহস্র দুর্নাম গলাধঃকরণ করে পৃথিবীকে নির্বিষ করার মতলব নিয়েই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি না—এ একটা ভাবার কথা। যতই বড় হ'য়ে উঠছে নীলিমা তার মামার বাড়ির বুকের কাঁপুনি ততই দ্রুত হ'চ্ছে। ছেলে হ'লেও বা একটা কথা ছিলো, মেয়ের দুর্নাম তো উপেক্ষা করার নয়; তার ওপর লজ্জা সঙ্কোচ ও নেই একটুও। কিন্তু গোঁ আছে অসাধারণ। যা বলবে তা সে করবেই।

মনোতোষবাবু তাকে শিখিয়েছেন, যাকে ঘৃণা করবে তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করবে, আর যাকে ভালবাসবে তার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও পিছু

পা হবে না। ঘৃণা আর ভালবাসা এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেই ব্যক্তির নষ্ট হয়, চরিত্রবল ঢিলে হয়ে যায়। যারা ঘৃণা আর ভালবাসার মধ্যে দোল খায় তারা অস্থির চিত্ত—তাদের চরিত্র দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

মনোতোষবাবু আরও শিখিয়েছেন, আদর্শ ভ্রষ্ট হবে না কখনো। জীবনে যদি কখনো কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, আগে পরখ ক'রে দেখে নেবে তার মনুষ্যত্ব আছে কি না, আগেই যাচাই করে নেবে তার হৃদয়। মেজাজ উগ্র করবে না, কিন্তু তেজী রাখা চাই। এর জন্য ত্যাগ স্বীকার অবশ্যই ক'রতে হবে।

কাঁচ মেয়ের কানে এমনি ভারি কথা ঢেলে গেছেন মনোতোষবাবু। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও তার পাকছে। বাপের উপদেশের কথাগুলো স্মৃতির ঝাঁকার হয়ে কানের মধ্যে অনবরতই বাজছে তার। আজকাল সে একটু আধটু বুঝতে পারছে তার বাবার উপদেশের মানে। তার জীবনে যৌবনের জাগরণ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তে পিতৃদত্ত উপদেশের অনুরণন নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে। সে হয়ে উঠেছে তেজী, সে চাইছে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। তার মনে সুকুমার অনুভূতির আবির্ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে কুৎসিত কদর্য কিছু সহ্য করতে পারছে না; সে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি রাখার চেষ্টা করছে। তার এ সৌন্দর্য-সাধনা কারো মনোরঞ্জনের জন্য হয়ত' নয়, হয়ত' নিজেকে খুসি রাখার জন্যেই।

তার মামার গ্রামের লোকেদের চোখে এটা দৃষ্টিকটু লাগে। মেয়েরা সাজে কেন? মেয়েদের সাজগোজের পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে—সেটা কারো অজানা নয়। কাকে খুসি করতে চায় নীলিমা? কার মনকে চায় সে আকর্ষণ করতে।

নিশ্চয় বিনয় বটব্যালই তার শিকার। নীলিমা হেসেছে তার কথা শুনে। গ্রামের কারো কি রুচিবোধ নেই। একটা অশিক্ষিত আনাড়ি ওই বিনয় বটব্যাল; তার মন কাড়বার জন্যে সাজতে হবে নীলিমাকে।

অপরাধের মধ্যে বিনয় নির্মাল্য মাছ ধরে কেদার ডাক্তারের পুকুরে, আর ওপারের ঘাটে বসে নীলিমা মাছ ধরা দেখে। মাঝে মাঝে বাক্য বিনিময়ও হয় অবশ্য তাদের। নীলিমা বলে, অতবড় ছিপ দিয়ে ওইটুকু মাছ ধরলেন, ছি। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—

বিনয় কথাটা বঁড়শির মত বাঁকিয়ে নিয়ে বলে, হোক না ছোট, ক্ষতি কি? বড় মাছও একদিন ধরা পড়বে।

—আর পড়েছে। নীলিমা এ-পার থেকে চেঁচিয়ে বলে।

চমকে ওঠে বটব্যাল, ফণিনার মত বুক তার কাঁপতে থাকে ক্রমাগত। ধরা দিই-দিই করেও বুঝি ফসকে গেল মাছটা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বিনয় একরাশ ছাওলা টেনে তুললো।

নীলিমা প্রাণ খুলে হাসলো এপারে বসে, ওপারে বিনয় বটব্যাল হতাশ হয়ে ছিপের সুতো গুটিয়ে হন হন ক'রে চলে গেলো।

মামা বললেন, নীলিমা এসব ভাল নয়।

—কি সব?

মামা বললেন, মাছ ধরা।

—মাছ আবার ধরলাম কবে?

—ধরা নয় দেখা, মাছধরা দেখা, লোকে যা তা বলে।

—কি বলে আর কারা বলে আমি জানতে চাই। নীলিমা রুখে দাঁড়ালো।

আপনার চিকিৎসক যখন বুঝতে পারেন যে আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলবেন— কারণ তিনি জানেন যে কাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দি ও কাশির উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিককাল স্থায়ী খাস কষ্টের অবসান ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত আরাম লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন

শ্বাসযন্ত্রের একমাত্র নির্ভরযোগ্য টনিক

প্রস্তুতকারক—

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

৩৯।১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

মামা বললেন, তেজ রাখো নীলিমা। লোকনিন্দার মত মারাত্মক আর কিছু নেই। তুমি মেয়ে; এ কথা ভুলে যেয়ো না। গায়ে গায়ে লাফিয়ে বেড়াবে, যার-তার সঙ্গে হেসে কথা বলবে—

নীলিমা বলল, থাক। আর শুনতে চাইনে।

মামার কথা নীলিমার কাছে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য বোধ হলো। তার রক্তের মধ্যে মনোতোষবাবু অন্য মন্ত্র দিয়ে গেছেন—লোক-নিন্দাকে ভয় করলে জীবনের সার্থকতা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি মেয়ে,—কারো থেকে তুমি ছোট নও। জীবনে বা মনে জড়তা রেখ না, যা খুশি হবে তা-ই করবে, ভয় পাবে না। মেয়েদের ও ছেলেদের রাস্তায় তফাৎ নেই কিছু, উভয়ের জীবনের বাঁধা সড়ক একটাই। চলতে গিয়ে গায়ে গায়ে দৈবাৎ ধাক্কা লাগলে চমকে উঠো না। মনে গ্লানি না থাকলে অমন চমকে কেউ ওঠে না। মন হওয়া চাই শরৎকালের আকাশের মত। লজ্জা ও সঙ্কোচ হবে স্বাভাবিক ধর্ম। তাদের ধর্ম হিসেবে ব্যবহার করবে, অস্ত্র হিসেবে নয়। সঙ্কোচে বিহ্বল হবে না, সেটা আত্মাবমাননা।

পারত পক্ষে তার বাবার উপদেশ মতই চলার চেষ্টা করে নীলিমা; তার মামার আদেশমত চলতে তার মর্যাদায় বাধে। এতে মামার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। অভিমানের চারা ধীরে ধীরে গজিয়ে ওঠে অতিহিংসার মহীরুহ হয়ে। মামা গুম হ'য়ে বসে উপায় ভাবতে থাকেন।

নীলিমার বয়স যত বাড়ছে; দেখতে সুশ্রী হচ্ছে তত। যত বেশী কুৎসা রটছে তার নামে, ততই সে হয়ে উঠছে জৌলুসে ভরপুর। এর মানে কি? মেয়েটার মন বলে কি কোনো পদার্থ নেই? মনের ওপর এতটুকু দাগ পড়লে কারো চেহারা অমন জলজল করতে পারে না। তার গায়ের চামড়া এমন পালিশ করা যে মনে হয় রোদ যেন গা থেকে পিছলে পড়ে যায়। নীলিমার এই সৌন্দর্য সাধনা যতই বাড়ছে, বিনয় বটব্যালের জীবনধারণ করা ততই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। নীলিমার লাবণ্য সহ্য করতে পারছে না বিনয়। হতাশ প্রেমিক সাজলো বিনয়, গাল মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ গজিয়ে তুলে সে সন্ন্যাস নেবার মহড়া দিয়ে চললো।

নীলিমার হাসি ধরে না। বলে, এইবার ঠিক মানিয়েছে। বেশ বুনো, —বুনো দেখাচ্ছে।

—তার মানে? বিনয় থমকে দাঁড়ালো।

—তার মানে বনমানুষ। নীলিমা হাসলো।

বিনয় রেগে বললো, বেশ। মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয়, বনমানুষও তবে মানুষ।

বুদ্ধিমানের মত একটা মস্ত কথা বলে দিয়েছে—এই রকম একটা আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে জবাব দিলো বিনয়।

নীলিমা বললো, মস্ত নতুন কথা বললেন কিন্তু। এত বুদ্ধি আপনার তবু কেদার ডাক্তারের মেয়েরা বলে, আপনি একটা মূর্খ। কেন বলুন তো?

জবাব দেয় না বিনয়, হন্ হন্ করে হাঁটা দেয়।

বিনয়ের বৈরাগ্য নীলিমার কলঙ্কের প্রথম কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বৈরাগী হ'লো বিনয়, আর তার ফলভোগ করতে হলো নীলিমাকে। লোকে সব জেনে শুনে মত প্রকাশ করে না কেন? ভেবে পায় না নীলিমা। যাগ্‌গে, যে যা বলার বলুক, পরোয়া করে না নীলিমা।

বিনয়কে সন্ন্যাসী করেই নাকি ক্ষান্ত হয়নি, হরিপদর মাথায়ও নাকি ছিট ঢুকিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা দিব্যি পড়াশুনা করছিলো, পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাল নম্বর পাচ্ছিলো। তার উপর তার বাপ মায়ের আশা ভরসা ছিল কত। তাদের পাঠচক্রে নীলিমা সপ্তাহখানেক যোগ দেবার পর থেকেই ছেলেটা কী রকম ভাবুক হয়ে উঠলো। এই পাঠাগারটিতে মেয়ে সভ্য একজনও নেই, হঠাৎ নীলিমা গায়ে পড়ে সেখানে সদস্যা হয়ে এই সর্বনাশটা করলো।

মনোরমা বললো, নীলিদি, হরিপদ পাগল হয়ে গেছে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—জানি। নীলিমা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো: হবে না মাথা খারাপ! মাথার দোষ কি? অত রাত জাগা অত মুখস্থ করার মানে হয় কিছু?

—না তো। মনোরমা আবার বললো, রাত জেগে নয়। ওরা তোমার দোষ দিচ্ছে।

নীলিমা হেসে বললো, দোষী জানিল না কিবা দোষ তার বিচার হইয়া গেলো?

অনেক বিষ গলাধঃকরণ করেছে নীলিমা। তার নাম নীলকণ্ঠ হওয়াই উচিত ছিল। নীলিমা বন্ধ করলো এবার তার বহির্বিচরণ, এবার সে মন দেবার চেষ্টা করলো আরাধনায়, সে শিবারাধনা আরম্ভ করলো।

মনোতোষবাবু বলেছেন, বাহিরের যা যখন মনকে স্পর্শ করবে; তখন মনকে মেরামত করার প্রধান যন্ত্র পূজা ও অর্চনা। বিক্ষিপ্ত মনকে সংহত ও সংযত করার উপায় এর চেয়ে কার্যকরী আর কিছু নেই। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—মনে রেখো তিনটি কথা। জীবন সমুদ্রে এই তিনটি পথপ্রদর্শক; এই তিনটিই ধ্রুবতারা।

সত্যের পূজা সে করে না, সত্য পালন করে; সুন্দরের উপাসনা সে করে না, সুন্দরকে নিজের অঙ্গে প্রলেপ হিসেবে পেতে চায়; শিবস্তুতি করে না সে; সে করে শিবারাধনা।

PHONE : 22-8820
"নবীন অপটিক্ হাউসে"র
'চশমা' ও 'গগলস'
সকলকে মুগ্ধ করে ● পরীক্ষা প্রার্থনীয়
২৪৫।বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অটলপ্রতিজ্ঞ নীলিমা সংকল্প করে বসলো—সে থাকবে চিরকুমারী, সে থাকবে শুদ্ধ শান্ত ও পবিত্র। এ প্রতিজ্ঞা টলবে না তার কখনো—নীলিমা ঠিক করে রাখলো। আসলে সে চটেছে পুরুষ জাতটারই ওপর। পুরুষের নাম শুনলে সে নাক সিঁটকায় আজকাল।

তবু, তবু মৃত্যুঞ্জয় পাকড়াশীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী হতে হলো নীলিমাকে। মৃত্যুঞ্জয় মামার ছেলে-দের সকাল সন্ধ্যায় এসে পড়াতো। নীলিমার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে নিশ্চয়ই; সে দেখা সাক্ষাতের মধ্যে এত গভীরতা যে ছিলো, আগে তো বোঝেনি মামার দেশের কেউ। মৃত্যুঞ্জয় ছেলেটা গরীব, তার চেহারায় দারিদ্র্যের কলঙ্ক-কালিমা ছিল মাখা। নীলিমার তো মনে হয়, ছেলেটা তার দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোনো পথ না পেয়েই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তার মনে করার দাম কী। যে যা-ই মনে করুক আসলে যা মনে করার, তা ক'রেছে গ্রামের প্রবীণেরা।

চঞ্চল চটুল মেয়ে নীলিমা গাম্ভীর্যের হিমালয়ের মত অটল হ'য়ে দাঁড়ালো। সহস্র কলঙ্কের বাতাস তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঊর্ধ্বমুখে উঠে যায়। তাকে বিচলিত করতে পারে না। নীলিমার ঘৃণা গাঢ় হয়ে উঠলো পুরুষদের ওপর। তার মনের প্রতিটি খোপে বীতরাগ ও বিদ্বেষ গজিয়ে উঠলো।

এখান থেকে মহেশপুরের গঞ্জ মাইল সাতের পথ। সেখানে নদীর কিনারে প্রকাণ্ড একটা পাটের কল আছে। এই পাটকলের ম্যানেজার যজ্ঞেশ্বর এদিকে একজন নামজাদা লোক। প্রায় সাত ফুট লম্বা তার চেহারা, সুগঠিত তার শরীর। পঞ্চাশ বছর বয়স হবে যজ্ঞেশ্বরের। কিন্তু তবুও স্বাস্থ্যটা অটুট রেখেছে। বন্দুক দিয়ে যজ্ঞেশ্বর পাখী শিকার করে; ঘণ্টাখানেক হাঁটলে মেরে আনে, আস্ত মোরগের মাংস খায়। লোকটাকে দেখলে ভয় পাবার কথা, অনেকটা দানবীয় তার চেহারা। তার চাল-চলনই একটু পাশবিক টাইপের, রুচি-বোধ নেই বিন্দুমাত্র, কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি অসাধারণ।

পাটকলের মালিককে ফাঁকি দিয়ে কি ভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করা যায়, এই প্ল্যান ছিলো যজ্ঞেশ্বরের অনেকদিন থেকে। গত বছর সে সাফল্য লাভ ক'রেছে। ক্যাশের টাকা সরিয়ে ফেলে গাঁট গাঁট পাট বেচে দিয়ে যজ্ঞেশ্বর পাটকলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কি ভাবে আগুন লাগলো, তদন্তে তা প্রকাশ হলো না, কিন্তু এটা তদন্তে পাওয়া গেলো যে যাবতীয় গাঁট পুড়ে গেছে আগুন লেগে সিন্দুক গলে দুমড়ে গেছে, তার মধ্যে কাগজের টাকার চিহ্ন নেই, কাঁচা টাকা গলা দু' এক চাপ রূপোর সন্ধান মিলেছে। এইভাবে যজ্ঞেশ্বর কিছু টাকাও গুছিয়ে

হিন্দুস্থান জেনারেল

ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

সেবা ও নিরাপত্তার জন্য

চেয়ারম্যান
ডাঃ এন, এন, লাহা
এম-এ, পি-এইচ-ডি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী পি, এন, তালুকদার
এম-এ (ক্যান্টাব)

শাখাসমূহ :

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, নয়াদিল্লী, হায়দরাবাদ (ডেকান), কোচিন, বাঙ্গালোর, কটক, ইন্দোর, আসানসোল, নাগপুর, গৌহাটী, পাটনা, জলপাইগুড়ি, কাটিহার, ঢাকা, বরোদা, ডিব্রুগড়, ধানবাদ, জামসেদপুর, কোডারমা, নওগাঁ

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩

অগ্নি-নৌ-মোটর এবং অন্যান্য বহুবিধ দুর্ঘটনার বীমা লওয়া হয়

নিয়েছে। এত বয়স হলো যজ্ঞেশ্বরের, শুধু কি পরিশ্রমী—সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে টাকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়—পায়ও। মাংস যখন খায় যজ্ঞেশ্বর মদও একটু আধটু অবশ্যই টানে। মাংসের প্রতি তার এমন টান যে, নিজে হাতে না রেঁধে সে মাংস খাবে না। নিজে কাটবে নিজে রাঁধবে। তার ওপর মাংস মেখে কাঁচা মাংস চেখে দেখে স্বাদ ঠিক হয়েছে কি না।

যজ্ঞেশ্বরের তৃতীয় স্ত্রী মারা গেছে সম্প্রতি। ভাগ্যবানের নাকি বউ মরে, সেদিক থেকে যজ্ঞেশ্বর ভাগ্যবান বটে। তিনটি স্ত্রীই দু-চারটে ক'রে ছেলেপিলে রেখে গেছে,—তাদের জন্যেই নাকি যজ্ঞেশ্বরের অর্থ লালসা এত। তিনটি বউই বেদম মার খেয়েছে যজ্ঞেশ্বরের হাতে। শুধু হাত দিয়ে কেন, দরকার মত পা দিয়েও মেরেছে যজ্ঞেশ্বর। বউদের চীৎকার আর আর্তনাদ শোনেনি, মহেশপুরে এমন লোক নেই। আসলে, যজ্ঞেশ্বর লোকটা গ্রামের একটা দুঃস্বপ্ন।

যজ্ঞেশ্বর নাকি আবার বিয়ে করবে, স্বাস্থ্যটা যখন আছে—বিয়ে করতে বাধা কি। তার উপর অর্থও আছে যখন।

তলে তলে অনেক এগিয়ে গেছেন মামা। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে নীলিমার বিয়ের ব্যবস্থা তিনি প্রায় পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন। যজ্ঞেশ্বরেরও নাকি আপত্তি নেই। তার সংসার চালানো নিয়ে কথা। নীলিমাই হোক আর যে-ই হোক, একটা মেয়েমানুষ হ'লেই তার চলে যাবে। বিয়ের খরচ যা লাগবে, যজ্ঞেশ্বর তা দিতে রাজি আছে। মামাও ভেবে দেখলেন, এত সহজে ও এত সস্তায় বিয়ে যদি দিয়ে দিতে পারেন; তাহলে নীলিমারই মঙ্গল। পাকাপাকি একটা আশ্রয় তাহ'লে তার হয়।

বদনামই হোক আর সুনামই হোক, যজ্ঞেশ্বর নামকরা লোক। নীলিমাও তার নাম জানে। শুধু নামই জানে না, যজ্ঞেশ্বর সম্বন্ধে সবই সে শুনেছে। অতএব নীলিমার কানে যখন কথাটা গেলো, তখন সে আশ্চর্য হলো শুধু মামার রুচিবোধ দেখে।

মনোরমা বলেছিল, নীলিদি, তবে চললে?—বেশ ভাল বর পেয়ে গেলে কিন্তু—অনেক টাকা।

নীলিমা বললো, সত্যি। বড়লোক হ'য়ে যাব এবার।

—চিনতে পারবে তো আমাদের; ভ্রূ চেনে বললো মনোরমা।

—উঁহু। নীলিমা মাথা নাড়লো।

শুদ্ধ শান্ত ও পবিত্র জীবনযাপন করবে নীলিমা। এই তার প্রতিজ্ঞা। তার প্রতিজ্ঞার সিংহদরজায় এসে হানা দিয়ে দাঁড়ালো এরা কেন? ভেবে

নীলিমা বললো, সত্যি, বড়লোক হ'য়ে যাব এবার।

পেলো না নীলিমা, সে থাকবে চির-কুমারী। কেন তবে মামার এ আয়োজন? মামার বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার যে বিশাল মহীরুহ গজিয়ে উঠেছে, তার ছায়া দিয়ে ঢেকে নীলিমার ভবিষ্যৎ তিনি অন্ধকার করতে উদ্যত হয়েছেন। বেশ নীলিমা গ্রহণ করলো মামার চ্যালেঞ্জ। হোক বিয়ে, তবু সে থাকবে চিরকুমারী। দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালো নীলিমা।

বিয়ে হ'লো। শুভদৃষ্টির সময় নীলিমা যজ্ঞেশ্বরের আপাদমস্তক ভালো ক'রে দেখে নিল। তার বুক কেঁপে উঠলো। ভীষণ-দৃষ্টি এই মানুষটা তার স্বামী? মাথায় কালো কালো একরাশ চুল, বড় বড় কালো গোঁফ, চোখের দৃষ্টি রুক্ষ, উগ্র চেহারা। নীলিমার সম্মুখে বর যেন একটি বিভীষিকা দাঁড়িয়ে।

চোখ বন্ধ করলো নীলিমা। যজ্ঞেশ্বর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নড়ে দাঁড়াল।

বিনয় বটব্যালকে বনমানুষ বলে ছিল না নীলিমা। সে যদি বনমানুষ, যজ্ঞেশ্বর তবে কী? বিনয়ের কথা মনে পড়লো নীলিমার। অযথাই সে গাল পেড়েছিল তাকে। তারি অভিশাপে কি নীলিমাকে বউ হয়ে যেতে হচ্ছে মহেশপুরে?

মহেশপুরের মস্ত কোঠাবাড়ির ফটক পার হ'য়ে অন্দরে ঢুকলো নীলিমা। যেটা নীলিমাদের থাকবার ঘর, সে ঘরে সে ব'সে রইলো অনেকক্ষণ একা। নীলিমা বসে বসে

কাঁড়কাঠ গুণছিলো, যজ্ঞেশ্বরের এক-পাল উলঙ্গ ছেলে দরজার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিলো তাদের নতুন মাকে।

প্রতি রাত্রে আর্তনাদের একটা রেওয়াজ আছে এ-বাড়িতে। যজ্ঞেশ্বরের মেজাজ বিগড়ে গেলেই বউকে না মারলে তার মেজাজ ঠিক হয় না। মার বলে মার। ভীষণ মারতে পারে যজ্ঞেশ্বর।

নীলিমা আসার পর থেকে প্রতি রাত্রে তাদের ঘর থেকে ক্রমাগত 'না না-না-না' ধ্বনি শোনা যায়, তার সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে যজ্ঞেশ্বরের আদেশ ও কাসি শোনা যায়। ঘরের এক কোণে কাঠের বেঞ্চের ওপর একরাশ বাক্স সাজানো। একটা বেড়াল বাক্সের ওপর বসে এদের রকম দেখে। নীলিমা কেবলই বলে, না, না। বেড়ালটা চোখ পিট পিট করে আর দেখে, কখনও আবার চমকে ওঠে।

না, কিছুতেই না, মরে গেলেও না—নীলিমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যজ্ঞেশ্বর গায়ের ফতুয়া খুলে ফেলে দেয়—গরমে ঘেমে উঠছে যজ্ঞেশ্বর। আশ্চর্য, এ কী কড়া ধাতের মেয়ের পাল্লায় পড়লো যজ্ঞেশ্বর।

সর্বাঙ্গে ঘন লোম যজ্ঞেশ্বরের, ঘামে লোম ভিজে উঠেছে। নীলিমার সামনে বিকট দানবের মত দাঁড়ালো সাত ফুট লম্বা যজ্ঞেশ্বর। রুখে উঠে গলকণ্ঠে বললো, এর কারণ কি?

যজ্ঞেশ্বরের গলার স্বর শুনে চমকে উঠলো বেড়াল। নীলিমা নিশ্চল হয়ে বসে রইলো। যজ্ঞেশ্বর তার হাত ধরতে গেলে হাত টেনে নিয়ে নীলিমা বললো, না, কিছুতেই না।

—কেন?

জবাবে নীলিমা বললো, না।

যজ্ঞেশ্বর নিজের ঠোঁট চুষতে লাগলো। এই 'না' কথাটির মানে বুঝতে পারে না যজ্ঞেশ্বর। কেন না, কিসের জন্যে না! বড় বড় গোঁফ মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে, গোঁফের ঘাম শুষে নিলো যজ্ঞেশ্বর।

রাতের পর রাত এই পালা চলছে। বেড়ালটা বাদে এর সাক্ষী আর কেউ নেই। নীলিমা যে তার প্রতিজ্ঞা পালন করে চলেছে—পৃথিবীতে এ-কথা জানে না আর কেউ। এদের মধ্যে মন কষাকষি একটু যে চলেছে; তা অবশ্য আন্দাজ করে অনেকেই। ওদের মুখের ভাব দেখলেই পরিষ্কার তা বোঝা যায়। এ মন কষাকষি কিসের জন্যে? গয়না? আরও গয়না দেবে যজ্ঞেশ্বর।

নীলিমা মৃত্যুপণ করেছে। ঘৃণায় তার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। গোঁফ চুষে চুষে যখন যজ্ঞেশ্বর ঘাম খায় নীলিমার তখন মনে হয় বমি ক'রে সে বুঝি পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। গায়ে অদ্ভুত গন্ধ যজ্ঞেশ্বরের, তফাতে থেকেও নীলিমার নাকে সে-গন্ধ পৌঁছায়। লোকটা কি একটা মানুষ? কিছুই বুঝতে পারে না নীলিমা।

দিনের বেলা এক রকম কেটে যায় নীলিমার। রাত্রি এলেই সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ ভাবে সে কাটাবে কি করে এখানে? মামা তার ওপর এমন প্রতিহিংসা নিলেন কেন? বুঝতে পারে না নীলিমা। এই মৃত্যুকারাগার থেকে উদ্ধারের কি কোনও উপায়ই তার নেই? না, উপায় একটা বা'র করতেই হবে তাকে।

মনোতোষবাবুর উপদেশের কথা ভাবে নীলিমা—আদর্শভ্রষ্ট হবে না কখনও; মেজাজ উগ্র রাখবে না, তেজী রাখবে। যাকে ঘৃণা করবে, তাকে মন প্রাণ দিয়েই ঘৃণা করবে।

নিজের মেজাজ সে তেজী রেখেছে। মনকে একটুও নরম হতে সে দিচ্ছে না। মনের কোমল বৃত্তি-গুলো সে কঠোরতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। দুর্ভেদ্য সে আবরণ। জীবনকে ব্যর্থ হতে সে দেবে না, প্রতিজ্ঞা তার টলবে না।

যজ্ঞেশ্বরের আক্রমণের বিরাম নেই। রাতটির জন্যে সে যেন ওৎ পেতে থাকে। ঘরে এসেই সে নীলিমার গা ঘেঁসে বসার চেষ্টা করে প্রথমে। কিন্তু নীলিমা আঁৎকে সরে যায়। বেড়ালটাও সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে।

সব জানলা খুলে দিল যজ্ঞেশ্বর। ঘরটা বেজায় গরম। হ্যারিকেনটা কমিয়ে নিলো। আলো-আঁধারী ঘরের দূরের কোণে বসে ঝিমোতে লাগলো বেড়াল, আর এদিকে খাটের ওপর বসে যজ্ঞেশ্বর ফিস্‌ফিস্ করে কি সব যেন বলতে লাগলো।

নীলিমা মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো—না, না!

যজ্ঞেশ্বরের ধৈর্য আছে। এই ধৈর্যর ওপর নির্ভর করেই সে পাটকলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করে নিয়েছে।

নীলিমা বুঝতে পারলো, তার রক্তে চোরের মত চুপি চুপি কি একটা সাড়া এসে পৌঁছুচ্ছে। নীলিমা নড়লো না, যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইলো, যজ্ঞেশ্বর তার হাত ধরলো, ছাড়িয়ে নিলো না নীলিমা। যজ্ঞেশ্বর একটু ঘন হয়ে বসলো, সরে গেলো না নীলিমা। যজ্ঞেশ্বরের বুড়ো রক্তও নেচে উঠলো। যজ্ঞেশ্বর নীলিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি-যেন বললো, শোনা গেলো না। নীলিমা মুখ তুলে তাকালো যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে। এতদিন ভালো করে দেখেনি নীলিমা, অল্প আলোয় হলেও সে বুঝলো—যত কদর্য সে ভাবছে যজ্ঞেশ্বরকে, তত কদর্য সে তো নয়। নীলিমার চোখের দৃষ্টিই গেলো বদলে। তার রক্তেও তরঙ্গ জেগে উঠলো। তার নিশ্বাসও দ্রুত হয়ে উঠলো।

লজ্জায় এক লাফে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেলো বিড়ালটা।

মার্কাস স্কোয়ারে
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের
প্রদর্শনীতে
—বসুমতীর ষ্টলে—
বসুমতীর অমূল্য
গ্রন্থরাজি
১৫% কমিশনে বিক্রয়
করা হইতেছে।

আমাদের প্রতিবেশী

নলিনী কুমার ভদ্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

কেউ রোগাক্রান্ত হলে পর ডাক পড়ে বঙ্-থিঙ্-এর। এই উদ্দেশ্যে যে পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত হয় তার অভিধা মাঙ্-জাগ ফাত। মাঙ জাগ কথাটার মানে হচ্ছে, ভূত বিতাড়ন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই যাবতীয় দরকারী জিনিষ যথা স্থানে রাখা হয়। ব্যবস্থা করা হয় চাল এবং ঘিয়ের, চি বা ধেনো মদের পাত্রগুলি ভরতি করা হয়, প্রজ্বালিত হয় ঘৃত প্রদীপ, সন্নিকটে থাকে ধূপধুনা এবং পুণ্যোদক। অতঃপর একটি ষাঁড়কে নিয়ে আসা হয় ঘরের সামনের দিকের দরজার নিকটে। তার ডান শিং-এ বাঁধা হয় একটি দড়ি, দড়িটির অপর প্রান্ত ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে রোগীকে হাত দিয়ে ধরতে আদেশ করা হয়। বঙ্-থিঙ্ তখন ষাঁড়টির কাছে এসে দেবতার উদ্দেশে বলে—"রোগীর পরিবর্তে এই ষাঁড়ের জীবন নাও। এই রোগীর বদলা হিসাবে আমি দিচ্ছি তোমাকে ষাঁড়টির জীবন। নাও, একে নাও। রোগীর চেয়ে মহত্তর এই উৎসর্গীত ষাঁড়ের দেহ এবং আত্মা। এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো এবং শান্তিতে থাকতে দাও মানুষদের।"

কথাগুলি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বলির পশুটির কপালে ছোঁয়ায় সে 'চি', চাল এবং ঘৃতের নৈবেদ্য। তারপর আরো জোর দিয়ে সে বলে, "বলি দিলেই হবে এই প্রাণীটির দেহ এবং আত্মাকে।" কথাগুলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ষাঁড়ের উপর কুঠারাঘাত করে নিহত করা হয় পশুটিকে। যে কোনো পুরুষ এই হনন ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে, স্ত্রীলোকদের কিন্তু বলিদানের অধিকার নেই। কেন না, এদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, যদি কোনো স্ত্রীলোক পূজার পশু বলি দেয় তা হলে নেমে আসবে চরম দুর্ভাগ্য। এবং নিহত পশুর মাংসও খেতে দেওয়া হবে না কাউকে।

এই পূজার দুইটি অঙ্গ—দ্বিতীয় কৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয় গৃহাভ্যন্তরে। সেখানে নিহত পশুর চামড়ার উপর রাখা হয় টুকরো টুকরো করে কাটা মাংস। পিছনে একটি কলাপাতায় থাকে কিছু চাল। পূজাস্থানের সুমুখে বসে বঙ্-থিঙ্—তার পিঠ থাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পাশে থাকে ধূপ-ধুনায় পূর্ণ পিতল নির্মিত দীপাধার হাতে তার সহকারী। একটি ছোটখাটো অনুষ্ঠানের পর "সা হোম রাম গান দো রাম বু সা ৎসুগ রাম ষু সাম য়িগ রাম বু" (নক্ষত্র দেবতা, গান দো দেবতা, সূর্য দেবতা, সাম য়িগ দেবতা) ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ

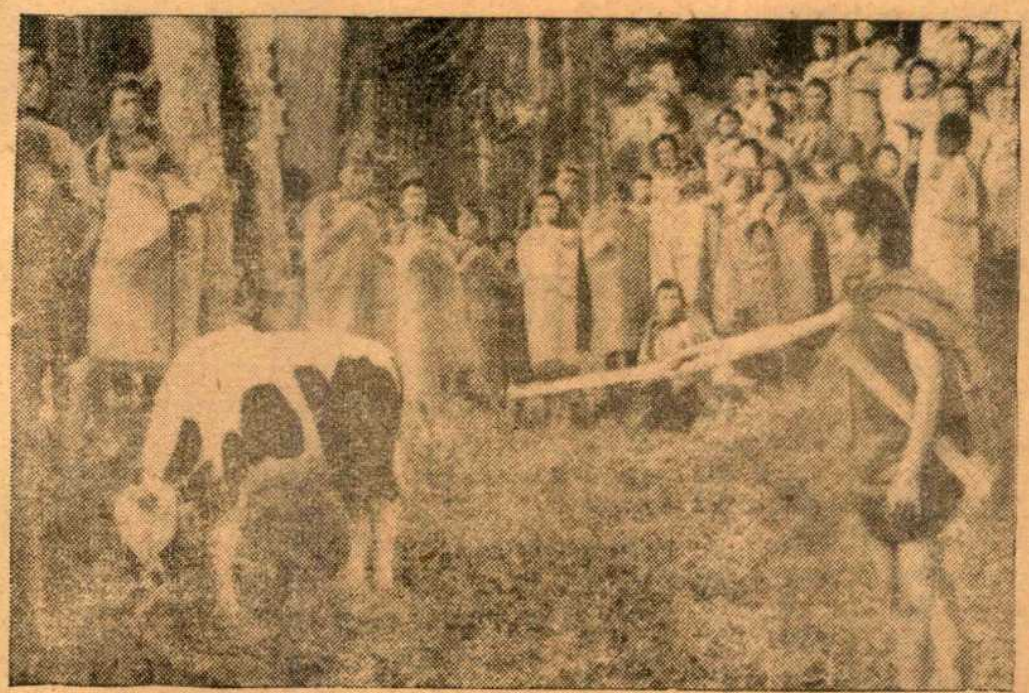

রোগমুক্তির জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে ষাঁড় উৎসর্গ

পূর্বক দেবতাকে আবাহন করে। দীর্ঘ প্রার্থনা শেষ হলে পর সহ-পূজারী হাতে তুলে নেয় রান্না করা কিছু বলির মাংস, চাল আর চি এবং এগুলি নিবেদন করে মে-গুম-মাঙ্ নামক উপদেবতার উদ্দেশে। এই স্তুতোর পর হয় উৎসবের পরিসমাপ্তি।

সংঘের প্রায় যাবতীয় পূজা-পার্বণের উপরে বঙ্ খিঙ্-দের গভীর প্রভাব অবশ্য এমন কয়েকটি পূজাও আছে যা তাদের আওতার বাইরে। যেমন সকল শিকারীদের দ্বারা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত, বন্য পশুদের রক্ষক পঙ্-রাম-এর পূজা। এই দেবতার পত্নীর নাম শিঙ্-রাম। কোনো স্ত্রীলোককে এই পূজা স্থানের নিকট আসতে দেওয়া হয় না। পূজায় ব্যবহার্য 'চি' তৈরি করতে, নিদেন পক্ষে একটি পূজার পাত্রে ঢালতে হয় কোনো অক্ষতযোনি কুমারীকে, আর যে সমস্ত পাখী বলি দেওয়া হয় সেগুলি যোগাড় করবার ভার থাকে কোনো সচ্চরিত্র যুবার উপর।

সিকিমে লামা ধর্মের প্রসার হয় লামা সা-ৎসুন-চেন-পো কর্তৃক। তিনি দক্ষিণ তিব্বতে জন্মগ্রহণ করেন ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। বহু স্থান পরিভ্রমণের পর তিনি এসে উপস্থিত হন সিকিমে এবং লামাধর্ম প্রচার করেন সেখানে লেম্স-দপা-চেন-পো এবং রিগ-আৎ-সিন-চন-পো নামক অপর দুইজন লামার সহযোগিতায়। ভোটব্রহ্ম ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক কিরাতদের মধ্যে কয়েকটি জাতি মাত্র বৌদ্ধধর্মের আওতায় এসেছে। সিকিমের যে সমস্ত লেপ্চা বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই জন্মান্তর-বাদ ইত্যাদি আদর্শের কথা পরিজ্ঞাত আছে।

কোনো কোনো জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয়দের সঙ্গে ইন্দো-তিব্বতীয় কিরাত জাতির আত্মিক সম্পর্ক সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ তান্ত্রিকতা এবং শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে। শক্তি উপাসনার উদ্ভব হয় যে কিরাত জাতির মধ্যে তার উল্লেখ আছে যোগিনীতন্ত্রে। তাতে শিব উমাকে বলছেন—"অয়ি, সকল সিদ্ধ-গণের রাণী (উমা), যোগিনী অর্থাৎ কামরূপের পুণ্যতীর্থে ধর্ম (ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ) কিরাতোদ্ভূত বলে পরিগণিত।

কেউ কেউ আবার এই মতও পোষণ করেন যে, পূজায় পশু বলি-দানের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়েছিল ইন্দো-তিব্বতীয়দের মধ্যে। বৈদিক যুগে এই প্রথার যে ধরণের বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল তা সম্ভবত আর্য, দ্রাবিড়, কিরাত এবং অন্যান্য আদিম জাতির মিশ্র প্রভাবের ফল। দুর্গা-পূজায় সমর নেপালের গোরখাদের মধ্যে মোষ বলি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে দুর্গোৎসব উপলক্ষে মোষ বলি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। বলির পর মোষের রক্ত হাতে মেখে যে তাণ্ডব নৃত্য হয় তা আদিম সংস্কারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। লেপচাদের 'মাঙ-জাগ-ফাত' অনুষ্ঠানে গো-হত্যার কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। গো-মাংস ভক্ষণ যখন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ হয় নি সেই অতি প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণরাও তো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গোবধ করতেন। মোট কথা, যদি ভোটব্রহ্ম এবং ইন্দো-তিব্বতীয়' গোষ্ঠীর মানুষদের সম্বন্ধে আরো ব্যাপক ও গভীর ভাবে গবেষণাকার্য চালানো যায় তা হলে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাদের সমাজ-জীবন থেকে সমাহৃত মাল মসলার মিশ্রণে একদা ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল দৃঢ় ভিত্তির উপর, সেই সকল অনার্য-দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সিকিম, ভুটান এবং আসামের কিরাত জাতির মানুষ।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩'০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১৮০
(প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে)

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ! এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্রয়ের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত
মূল্য দুই টাকা
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভারত দর্শন

রাজঘাট :

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি পরলোকগত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পূত চিতাভস্ম পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে ২৬শে মার্চ যমুনা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শাসিসভার সকল মন্ত্রিবর্গ ও দিল্লীর বিশিষ্ট নাগরিক সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

এ সপ্তাহে লোকসভায় চীনের সমর প্রস্তুতি ও উড়িষ্যার প্রধানসচিব শ্রীপট্টনায়কের যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বিবৃতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। চীনের সমর প্রস্তুতি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চীনের আবারও ভারত আক্রমণ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারা তিব্বতে তাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে ও চীন ভারত সীমান্ত-বরাবর নূতন সৈন্য সমাবেশ করেছে ও সীমান্তে অনেক নূতন রাস্তা নির্মাণ করেছে। তাদের সমরনায়কেরা ভারতকে অযথা দোষারোপ করছেন ও ভারতের বিরুদ্ধে নিত্য নূতন অভিযোগ আনছেন। এর প্রতিও প্রধানমন্ত্রী সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। তাদের অভিযোগের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, তারা যাই বলুক না কেন কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ মেনে না নিলে ভারত চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত নন এবং ভারত সর্বশক্তি দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আণবিক শক্তি বিভাগের বাজেট দাবীর বিতর্কের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে চীন আণবিক বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে এ কথা কোন প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায় নি এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে আণবিক শক্তির উন্নয়ন ব্যাপারে ভারত চীনের অগ্রবর্তী।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে শ্রীযুক্ত পট্টনায়ক যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের নিকট যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে শ্রীযুক্ত পট্টনায়ক তার অনুমোদন-ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত পট্টনায়কের বিবৃতি বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয়। মন্ত্রিসভার আসন্ন বদল ও তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী হবার সম্ভাবনার কথাও শ্রীযুক্ত পট্টনায়ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে শ্রীযুক্ত পট্টনায়ক সাধারণভাবে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর বিবৃতির বিকৃত প্রকাশে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বাংলা-বিহার ডি-ভি-সি অঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব মিটাবার জন্য তৃতীয় যোজনায় কি কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে সে প্রসঙ্গে সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম লোকসভায় বলেছেন যে কয়লা বাঁধ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ১৩৬৯) নির্মিত হবে।

লাওসের রাজা সাবং বাথান তিন দিনের জন্য ভারত ভ্রমণে এসেছেন। তাঁর পুত্র রাজকুমার ফি সাবং ও লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভন তাঁর সঙ্গে এসেছেন। তাঁকে রাজ-ধানীতে রাজোচিত মর্যাদায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়। দিল্লীর নাগরিকদের পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেছেন যে লাওস ভারতের কাছে নানাভাবে ঋণী এবং ভারতের সঙ্গে তার দেশের এ সম্পর্ক স্থায়ী হউক এইটেই তাঁর কাম্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক সৈনিক সর্দার শার্দুল সিং কাইরম ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন। তিনি বহু বৎসর এ, আই, সি, সি-র সদস্য ছিলেন ও বহুবার কারা নির্যাতন ভোগ করে-ছিলেন।

দিল্লীর ক্রমবর্দ্ধমান সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ, টহলদারী গাড়ী বাড়ান ও রীতিমত টহল দেওয়ার ব্যবস্থা [illegible] হচ্ছে।

বহু অপেক্ষিত রাশিয়ার বিরা[illegible] কায় বিমান টি-উ-১১৪ ২৩শে [illegible] দিল্লীর পালম বিমানঘাঁটিতে অবত[illegible] হয়। বিমানটি দ্বিতল, বিশ্বর[illegible] দ্রুতগামী (১৬ ঘণ্টায় মস্কো থে[illegible] হাভানা যেতে পারে)। পৃথিব[illegible] বৃহত্তম ও যান্ত্রিক জগতে রাশি[illegible] ক্রম অগ্রগতির আর একটি নিদর্শন।

মার্কিণ এভারেষ্ট অভিযাত্রী দ[illegible] অন্যতম সদস্য ২৭ বৎসর বয়স্ক [illegible] ই, হেনটেনবর্কের হিমবাহ দুর্ঘটন[illegible] মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মৃত্যু সং[illegible] অন্যান্য অভিযাত্রীদল এগিয়ে যে[illegible] মনস্থ করেছেন।

পাঞ্জাব :

পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার দলীয় বিরো[illegible] ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে। বি[illegible] সে সঙ্গে বিরোধী দলও ভা[illegible] ধরেছে। প্রধান বিরোধীপ[illegible] প্রগ্রেসিভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মে[illegible] ২৩ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন দলত্য[illegible] করে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন[illegible] তাতে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ো[illegible] ১০৪ জন

বিরোধী পক্ষের অভিযো[illegible] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল অস্বী[illegible] দিয়েছেন যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে[illegible] সংবিধান অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র ও বিচা[illegible] বিভাগ বিভিন্ন করণের ক[illegible]জ সীলগির[illegible] শুরু হবে।

পাঞ্জাব সরকার কৃষক সমবা[illegible] সমিতি ও বিদেশী একটি কোম্পানী[illegible] সহযোগিতায় পাঞ্জাবে একটি ট্রাক্ট[illegible] নির্মাণ কারখানা স্থাপনের সিদ্ধা[illegible] গ্রহণ করেছেন। উদ্যম অভিনব [illegible] প্রশংসনীয়।

অন্ধ্র ও মহীশূর :

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর জ[illegible] বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনে[illegible]

জন্য শ্রীযুক্ত গুলাটীর নেতৃত্বে যে কমিটী গঠিত হয়েছিল, তাদের সুপারিশ প্রচারিত হয়েছে। কমিটীর দু'একটি প্রস্তাব এখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর বিবেচনাধীন।

মহারাষ্ট্র :

রাষ্ট্রসংঘের অনুরোধে কংগোতে প্রেরিত যে ভারতীয় বাহিনী ফিরে এসেছে বোম্বাইতে, তাদের এক স্বাগত সম্ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন বলেছেন "আপনারা কংগোতে এক মহান কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেছেন। এখন আপনাদের মাতৃভূমির রক্ষার আরও মহান কর্তব্যে ব্রতী হতে হবে।'

উড়িষ্যা :

উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীপট্টনায়কের) নির্ব্বাচন বাতিলের দরখাস্ত আবেদনকারীর অনুরোধ মত সুপ্রীম-কোর্ট নামঞ্জুর করেছেন।

রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিম জার্ম্মাণ সরকার ৪৫ কোটী টাকা ঋণ দানের সিদ্ধান্ত করেছেন।

পশ্চিম বাংলা :

বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কটই দেশের সর্ব্বত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিধান সভায় এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন আশ্বাস দিয়েছেন 'বাংলা-দেশে দুর্ভিক্ষ নাই, হ'তে দিব না।'

বিরোধী দলের আর একটি প্রশ্নোত্তরে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বলেছেন যে, বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে বাংলাদেশ থেকে যে প্রস্তাব পাঠান হয়েছে সেটা এখনও দিল্লী সরকারের বিবেচনাধীন।

রাওয়ালপিণ্ডির পর কলকাতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা এবারও নিষ্ফল হয়েছে। এটা আলোচনার চতুর্থ কিস্তী। আলাপ-আলোচনার মাঝখানে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মিতালী আলোচনার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে।

আসন্ন বিভিন্ন উপনির্ব্বাচন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আইন-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এ, কে, সেন বিরোধীদলদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, দেশের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে প্রত্যেক দল ও প্রার্থীকে নির্ব্বাচন পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও সরকার নিযুক্ত কমিশনারের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য ও কর্পোরেশন পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের নির্দ্দেশ মত নিযুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যপালের আদেশ মত

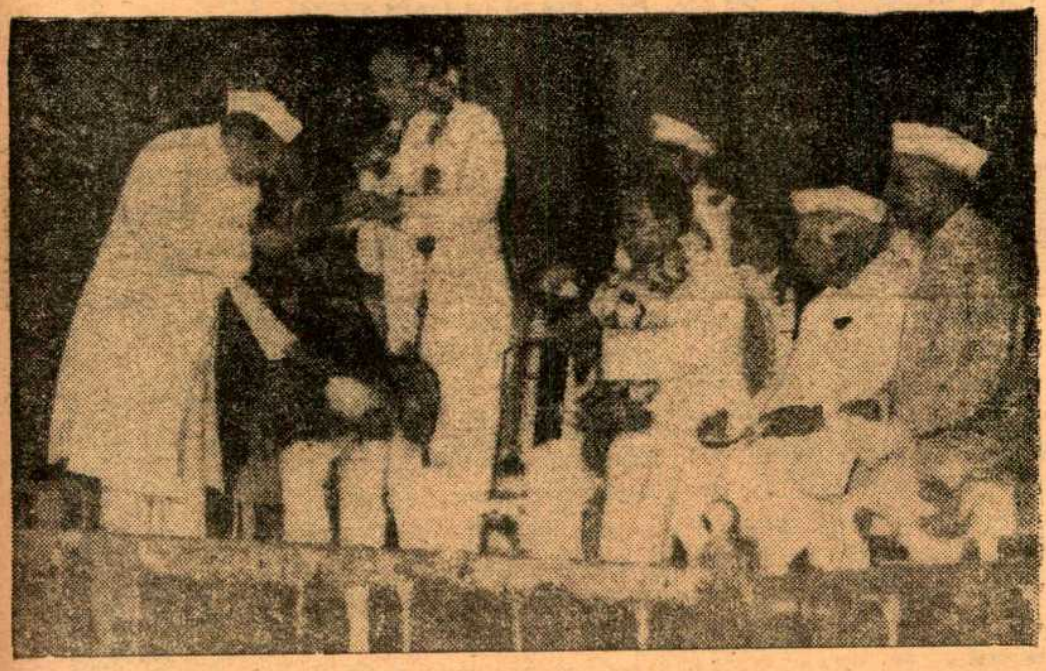

দিল্লীতে লাওসের রাজার সম্বর্দ্ধনা

গুজরাট :

ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি ইউ, এন, ধেবর খাদি ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণ ও সে উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করবার জন্যই লোকসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন।

গুজরাট বিধান সভার তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য—রমণ ভাই পেটেল, লাল সিং বিহর ও হামির ভাই সোলাঙ্কি নির্ব্বাচনে—বোম্বাই হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। তাদের প্রতীক 'ধ্রুবতারা' ধর্ম্মমূলক কাজেই, রিপ্রেজেনটেশন অব পিপলস সংবিধানের ১২৩ (৩) ধারা বিরোধী।

কমিশনারের কার্য্যপারাধ এবং কার্য্যকাল নির্দ্ধারণ করে ও তাঁদের কার্য্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে কাউন্সিলাররা যে প্রস্তাব পাশ করেছেন এখন তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪শে মার্চ্চ লালবাজার থানার বিপরীত দিকে বিকানীর বিল্ডিং-এ দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে দমকল বাহিনীর ৪ জন কর্ম্মী গুরুতররূপে আহত হন। ১৯৬২ সালের অপর এক অগ্নিকাণ্ডে এই একই বাড়ীর এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। রবিবারের ঘটনাকে সে অগ্নিকাণ্ডের মর্ম্মান্তিক পুনরাবৃত্তি বলা চলে।

পশ্চিমবঙ্গ ও কৃষি উৎপাদন

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-সমস্যা গত কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার পর্য্যালোচনা হয়েছে। এই পর্য্যালোচনা অবশ্য শুরু হয়, যখন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীনন্দ রাজ্যের তৃতীয় যোজনা নিয়ে আলোচনা করতে আসেন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদন লক্ষ্যে উপনীত হ'তে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে লক্ষ্য কতখানি পূরণ হবে তাই আজকের বিবেচ্য বিষয়। এবং অভিজ্ঞ মহলের মতে এবিষয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী হওয়া কষ্টকর। দেশের বর্ত্তমান আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে এ রাজ্যের পক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টন বাড়তি খাদ্য-শস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা হয়ত পরিবর্ত্তিত করতে হবে। এ কথা আজ রাজ্যের কৃষি দপ্তরকেও স্বীকার করতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি এবং কৃষকের সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও তীব্র, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজ্যের ২৮ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৭ লক্ষ পরিবার পিছু জমির পরিমাণ দুই একর অথবা আরও কম। প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ কৃষকের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা প্রায় স্থায়ী।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। পরবর্ত্তী যোজনা কালে কৃষির জন্য ব্যয় হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা, যদিও এই বাবদ রাখা হয়েছিল প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। এর অর্থ প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। অথচ এই বিপুল অর্থব্যয়ের পরে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সমস্ত রাজ্যে চাষের জমির পরিমাণ মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর। এর মধ্যে মাত্র ১৬ ভাগ জমিতে দু'বার চাষ করা সম্ভব এবং মাত্র ২০ ভাগ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। যদিও পাটের উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ধানের উৎপাদন যেন হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৫৭ সালে ধান উৎপাদন হয়েছে ৩৮ লক্ষ টন। আর আজ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৫ লক্ষ টনে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষির এই অবস্থার জন্য প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া হয়ত অসমীচীন হবে না। গত দশ বছরে বন্যা ও অনাবৃষ্টির ফলে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতি দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সেটাই কি সম্পূর্ণ সত্য। পরিকল্পনার অব্যবস্থা, প্রশাসনিক অকর্ম্মন্যতাও কি কিছু কম দায়ী? যে রাজ্যে ৮২ ভাগ জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যে ২৪০টি গভীর নলকূপ বসান হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৮০টির বেশী পুরাপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি। যেগুলো চালু হয়েছে সেগুলো থেকেও পুরাপুরি জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার ও ভাল বীজের কথা সরকারী প্রচার দপ্তর বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের শুনিয়ে আসছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মাত্র ১৬ ভাগ জমির কপালে ভাল বীজ জুটেছে। আর রাসায়নিক সার যেটুকু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাও প্রশাসনিক দুর্ব্বলতার জন্য দুর্নীতির রন্ধ্রপথে গেছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের চাষী বঞ্চিত এবং রাজ্যে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১১০টি কৃষিখামার নির্ম্মিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ চাষীর ফলনের তুলনায় বহু কৃষিখামারের উৎপাদনের হার আজও সন্তোষজনক নয়। কিন্তু ভাল বীজ তৈয়ারী, আধুনিক কৃষি শিক্ষাদান

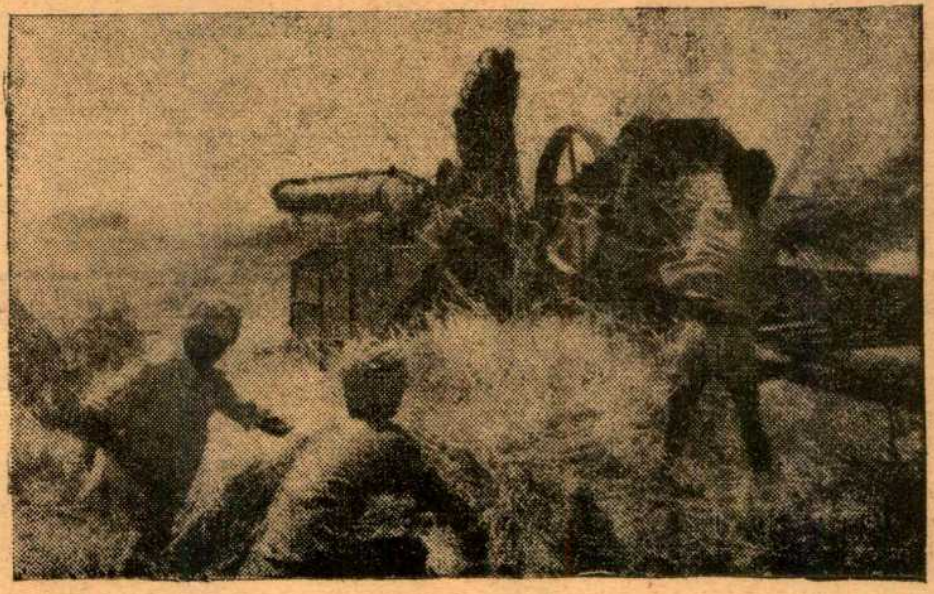

বুলডোজারে জমি সংস্কারের কাজ চলিতেছে।

আর এক নীরো

"সরকারের স্বর্ণনীতি অভ্রান্ত"—মোরারজী দেশাই

প্রতি মূল উদ্দেশ্যই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এ খামারগুলি রাখবার অর্থ কি?

পাটচাষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু পাটচাষীর ভাগ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির কি সুফল জুটেছে। পাটচাষীদের ন্যায্য-মূল্য দেবার সরকারী প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। এ কথা আজ সরকারী মুখপাত্রও স্বীকার করছেন। কিন্তু বাঞ্ছিত পাট চাষীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির উন্নতিও যে বিপন্ন হচ্ছে এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় সরকার বারবার রাজ্য-সরকারদের কৃষির উন্নয়নের উপর জোর দিবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিছুদিন আগে যোজনা কমিশন তাদের উপদেষ্টাদের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি পরিকল্পনাগুলি যাতে সুষ্ঠু ভাবে কার্যকরী হয় তার জন্য তিনটি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট দল গঠন করেছেন।

কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়ন এতদিন যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। সব-চেয়ে বড় গাফিলতি হয়েছে পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে। সেচ, সমবায় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগের অভাবে অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। আশা করা যায় অতীতের ভুল শুধরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে। বর্তমান অবস্থায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সামরিক শক্তি বৃদ্ধিরই সহায়ক। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন, "production of foodgrains is as important as that of bullet" পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই এ কথা স্মরণ রাখবে।

রঙ্গজগৎ

সাত পাকে বাঁধা

দু'একজন ব্যতিক্রম স্বীকার করে নিয়ে বাংলা চিত্রপরিচালকদের মোটা-মুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দলে পড়েন সেইসব স্বল্পসংখ্যক পরিচালক, যাঁরা অধুনা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টিতে প্রয়াসী। তাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব থাকলেও, আন্তরিকতা ও শুভ ইচ্ছা সহানুভূতির দাবী রাখে। দ্বিতীয় দল সংখ্যায় ভারী। তাঁরা চলচ্চিত্রের সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করে, বিশ্বব্যাপী এই শিল্প নিয়ে যে সব নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বাংলা ছবির একান্ত নিজস্ব সনাতন ঢংকে আঁকড়ে ধরে আছেন। বিদগ্ধ দর্শকেরা প্রথমোক্তদের সৃষ্টিগুলিতে উৎসাহিত বোধ করেন, আর দ্বিতীয় দলটি ঘটনা ও সংলাপের ঘনঘটায় নিরীহ ভালমানুষ দর্শকদের কখনো শোকাকুল, কখনো ক্ষুব্ধ, কখনও বা সহাস্যবদন করে তোলেন।

'সাত পাকে বাঁধা' ছবিটি দেখে মনে হ'ল—পরিচালক শ্রীঅজয় কর এই দুই পথের কোনটিই অবলম্বন করেন নি। ফলে বিচারশীল দর্শকেরা মননের অভাবে পীড়িত বোধ করছেন আর অন্যান্যরা তৃপ্ত হতে পারেন নি আবেগ-প্রধান নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির ব্যর্থতায়। অশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক অতি পুরাতন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবির কাহিনীটি গড়েছেন। গরীব প্রফেসরের স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা সত্ত্বেও এই অসাম্য এবং তৎসঙ্গে মেয়ের মা নানা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি ও নায়িকার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছবির সমাপ্তি। হৃদ্য ও শিল্পসম্মত ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মানসিকতা, তাদের পরিবেশের প্রতিকূলতা বা অন্তর-সংঘাতের সম্যক পরিচয় দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে কাহিনীটি তুলে ধরা যেত। কিন্তু কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার কারণে অকারণে যখন-তখন দুই শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। অনেকে হয়ত' এই অকারণ কোঁদলের মধ্যে যুগ-যন্ত্রণা খুঁজতে যাবেন। কি একমাত্র দর্শকের যন্ত্রণা ছাড়া অ কোন যন্ত্রণাই চোখে পড়ল না বর্তমান সমালোচকের।

এই ট্রাজেডির যেরকম কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রস্তুতি নেই, তেমনি প্রস্তুতি নেই নিখিলেশ নামে একটি সুদর্শন যুবকের নায়িকার (স্বামী-বিচ্ছেদের পর) প্রতি প্রেম নিবেদনের; অর্থ নেই চিত্রোত্ত ইতিহাস-প্রেমী নায়ক-নায়িকার মধু-চন্দ্রিমা যাপনের টুকিটাকি দৃশ্যের। এ সব না থাকলেও, 'আছে'র তালিকা বড় কম ভারী নয়। অপরিচিত তরুণ-তরুণীর অকস্মাৎ অস্বাভাবিক পরিবেশ

'সাত পাকে বাঁধা'-র নায়িকা সুচিত্রা সেন। আর ডি বনশল নিবেদিত ছবিটি সাড়ম্বরে মুক্তিলাভ করলো

ও পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ (boy meets-girl জাতীয় ব্যাপার), এম-এ পরীক্ষায় নায়িকার ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়া, নায়কের ছাত্রের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রথম হওয়া (কৃতিত্ব নায়কেরই প্রাপ্য), পর্দার আড়াল থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি সব শুনে ফেলা—নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এক ধনীর দুলালকে খাড়া করা,—প্রথানুগ ছবির (conventional film) এ সমস্ত মোক্ষম হাতিয়ারগুলি যথাযথই রয়েছে।

হয়। তা ছাড়া এই এক 'অকারণে-রাগী' ছেলের দুরূহ ভূমিকায় তার এর বেশী করবারও কিছু ছিল না।

আশা করা অন্যায় নয় যে, শত দোষ সত্ত্বেও সপ্তপ্রদক্ষিণ ও বিবাহ-মন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্য আগামী বারে এর কপালেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারটি জুটবে।

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের সংকটা-

ই. কে. প্রোডাকসনসের প্রযোজনায় আগতপ্রায় চিত্র 'কালস্রোত'-এর নায়িকার রূপসজ্জায় সুমিতা সান্যাল।

অকারণ হাসি আর ভ্রূভঙ্গি যদি অভিনয় হয়, তা হলে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন-এর অভিনয় সার্থক বলে মানতে হয়। শ্রীমতী সেনের এই অদৃষ্টপূর্ব তরল অভিনয়ে চরিত্রের গভীরতা প্রাপ্য নয়। সুচিত্রা সেনের এই দাপটের সামনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অনেকটা অসহায় মনে

পন্ন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃত গুণী শিল্পী এই পুরস্কার পেলে দু'ভাবে উপকৃত হতে পারেন। পুরস্কারের প্রেরণা তাঁকে কর্মে উদ্দীপনা যোগাতে পারে, পুরস্কারলব্ধ ধন জোগায় আর্থিক আনুকূল্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের যে আদর্শ আমাদের সামনে বর্তমান, তা'তে দেশের প্রকৃত গুণী ও প্রতিভাবান শিল্পীরা কোন উৎসাহ পেতে পারেন না। "পথের পাঁচালী" বা "অপুর সংসার" সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে বটে, কিন্তু 'অপরাজিত', 'অযান্ত্রিক' বা "কাঞ্চন-জঙ্ঘা"র মত মহৎ শিল্পসৃষ্টি এ সম্মানের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়নি। সামান্য দু' একটা প্রশংসাপত্র ছাড়া 'গঙ্গা', "মেঘে ঢাকা তারা", "বাইশে শ্রাবণ" বা "ক্ষণিকের অতিথি" কোন যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। এদিকে এমন সব ছবিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে শিল্প বিচারের সাধারণ মানদণ্ডে যে সব ছবি সম্পূর্ণ অচল। লজ্জার সঙ্গে স্মরণীয়—'যে বছর অপরাজিত'কে অগ্রাহ্য করা হল সেই বছরই ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ঐ ছবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছিল। আর গত বছর সত্যজিৎ রায়ের 'সমাপ্তি'কে ডিঙ্গিয়ে "সিষ্টার নিবেদিতা"কে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হ'ল নিছক আদর্শ বাদ প্রচারের খাতিরে, অথচ ঐ ভাবালুতাপূর্ণ আকৃতিবিহীন ছবিটি ভেনিসে প্রদর্শিত হবার ফলে সে দেশের চলচ্চিত্রজ্ঞানী-দের মনে ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা জন্মেছে তার কথা আমাদের একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক মারফৎ আমরা পেয়েছি।

এ বছরও অবস্থা অনুরূপভাবেই শোচনীয়। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র মত পরিণত পরীক্ষামূলক ছবি বা ঋত্বিক ঘটকের "সুবর্ণরেখা" (বিদগ্ধ কয়েকজন ছবিটি দেখে বিশেষ প্রশংসা করেছেন) আঞ্চলিক নির্বাচনেই স্থান পেল না। আর "অভিযান"কে অতিক্রম করে "দাদাঠাকুর"-এর মত সস্তা আবেগধর্মী ছবি সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল (দয়া করে বিদেশে না পাঠালে মানরক্ষা হবে!) অথচ আঙ্গিকসিদ্ধি ও বিষয় গভীরতার বিচারে "দাদাঠাকুর" যে শুধু "অভিযান"-এর কাছাকাছি আসে না তাই নয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কে কোন আলোচনায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতাই রাখে না। "অভিযান" ত' বটেই, "কাঁচের স্বর্গ" বা "নিশীথে" দু'টি ছবিই "দাদাঠাকুর"-এর চেয়ে

শ্রেয়তর। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এঁদের বিচারের মানদণ্ডটা কি? এর উত্তরে বলা হয় যে শিল্পগুণ ততটা নয়, যতটা আদর্শবাদের রূপায়ণ ইত্যাদি। তাও যদি হয়,—"অভিযান", "কাঁচের স্বর্গ" বা "নিশীথে" ছবিতে বিচারকেরা কি আদর্শবাদ কিংবা মানবতাবোধের সন্ধান পেলেন না? তাছাড়া শুধমাত্র জীবনীচিত্র বলেই যে কোন ছবি মহৎ আদর্শের বাহক হবে, এরকম দাবী অর্থহীন। জীবনীকারকেও শিল্পপ্রকরণের মৌলিক সূত্রগুলিকে মানিতে হয়। না হলে তো স্কুলপাঠ্য জীবন রচয়িতা আর লুডউইস্—মোরোয়ার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না। তাই এ জাতীয় বিচারে কলাগত গুণই চূড়ান্ত মানদণ্ড হওয়া উচিৎ—সবদেশেই তাই হয়। এই যদি পুরস্কারের নমুনা দাঁড়ায়, তবে এমন আশঙ্কা কি অসঙ্গত যে বিচারকদের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানেরই অভাব আছে? তাই "বাঙালীরাই সব পুরস্কার পেয়েছে" বলে আহ্লাদে আটখানা হয়েই বা চলচ্চিত্র শিল্পের কোন্ মোক্ষলাভ হবে?

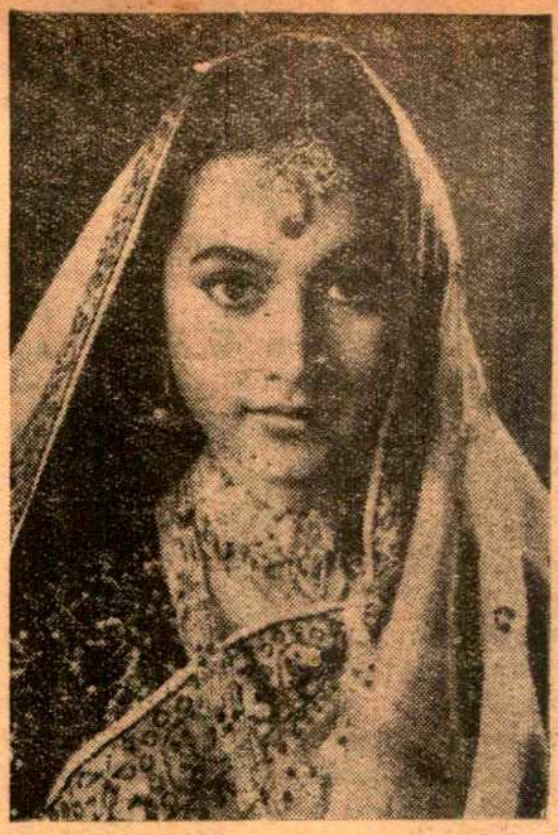

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ও তিন, শান্তারাম প্রযোজিত 'পলাতক' চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৬২) প্রদর্শিত জঁা-লুক-গডার্ড পরিচালিত "ভিভ্রে সা ভি" ছবির একটি দৃশ্য।

সঙ্গীতের বিকাশ ও তার আদিরূপ

ডাঃ (শ্রীমতী) নীহারকণা মুখোপাধ্যায়

যুগপরিবর্তনের ফলে সমাজ প্রতিবেশের যেমন পরিবর্তন সাধিত হয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনি ভাবে পরিবর্তিত হয় তার রূপ। বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পবিত্র গঙ্গাধারার মতো বয়ে চলেছে যে অমরসঙ্গীতের ধারা, ভারতভূমিতে সেই সঙ্গীতের উৎস এল কোথা থেকে তা হয় তো সঠিক করে বলা সম্ভবপর নয়, তবুও ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের মাধ্যমে তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। প্রকৃতির বুক থেকে প্রথম মানুষের কাছে যে সঙ্গীত দিল ধরা, তার মূল সূত্রের সন্ধান নিলে বলা যেতে পারে, অন্তত আজ থেকে ৩৫০০।৪০০০ হাজার বছরেরও অনেক পূর্বে ভারতের মাটিতে হয়েছিল সঙ্গীতের সূত্রপাত।

অনুসন্ধিৎসার অধিকার নিয়ে জন্মেছে মানুষ, অনুভূতি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অনুসন্ধানের পথে। সন্ধানী মানুষ আহরণ করেছিল সঙ্গীত অনুকরণের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবেতর জীবজগতের আনুকূল্যে। পশুর বিবিধ চলার ভঙ্গী আদিমানবের মনে এনে দিয়েছিল লীলায়িত ছন্দের গতি, প্রকৃতির দেওয়া সুরসম্ভার যুগিয়ে দিত গানের প্রেরণা। অসহায় মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিল প্রকৃতির কোলে। সে চাইত প্রকৃতির সাহায্যে নিজেকে জানতে। একান্ত নিঃসঙ্গতা দূর করতে গিরি-মরু-প্রান্তর, অতল জলধি, জীবজন্তু ও পশুপক্ষী এরাই ছিল আপনার। তাই সে প্রার্থনা জানাত অদেখার উদ্দেশ্যে! আপন মনের ভাব প্রকাশ করত সুরে সুরে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মানুষ কুড়িয়ে পেয়েছে প্রকৃতির ভাণ্ডারের মণিকোঠায় সুররত্ন। এমনি করে চিরদিনই মানুষ চলেছে সম্মুখের পানে এগিয়ে, অনুসন্ধিৎসা মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে প্রগতির পথে। সঙ্গীতও ক্রমোন্নতির পথে পা বাড়িয়ে স্খলন, পতন ও ত্রুটির গণ্ডী পেরিয়ে উন্নত হ'তে উন্নততরে পৌঁছেচে ভারতবর্ষে।

এমনি করে একদিন মানবেতর হ'তে মানুষের কাছে দিল সঙ্গীত ধরা। সেই অনিবদ্ধ সঙ্গীত একদিন মুক্তি পেল মানুষের হাতে বন্ধনে, অনুরঞ্জিত করল মানুষের মনঃশক্তি। ভারতের সেই সুপ্রাচীনযুগ কৃষ্টির উন্নত সোপানেরই সাক্ষ্য দিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সঙ্গীত যে নিয়েছিল উন্নতরূপ, তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি সিন্ধু সভ্যতার প্রতীক মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত তন্ত্রীযুক্ত বীণা, সপ্তছিদ্রসমন্বিত বংশী, চর্মনির্মিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, সুবেশবিন্যাসিতা নৃত্যরতা তাম্রনির্মিতা নটী ও নটরাজের শিল্পচাতুর্যপূর্ণ ভগ্নমূর্তিতে। আদিম সিন্ধু উপত্যকার সুসমৃদ্ধ মহানগরীর অন্তরে যে সঙ্গীত ও নৃত্যানুশীলন হ'ত তার প্রমাণ রয়েছে ঐ সব মূর্তি ও বাদ্যযন্ত্রে। অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, সে যুগে দেবদাসী প্রথারও প্রচলন ছিল।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতও ক্রমোন্নতির সোপানে পা বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সমতালে তাল রেখে উচ্চাদর্শের পিছনে পিছনে। পিছিয়ে সে পড়ে নি কোন দিনই, যুগের ভাঙ্গাগড়ার অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে কখনো বা নিয়েছে একটু বিশ্রাম, হয় তো বা কখনো এসেছে গতির মন্থরতা। পাথর চাপা পড়ে পচা মরণের যন্ত্রণা সে ভোগ করে নি কোন দিনই। কখনো সে চলেছে ঝরণার বুক বেয়ে, কখনো বা আশ্রয় নিয়েছে পাখীর কণ্ঠে, বন মর্মরের মর্ম বেদনার মর্মরধ্বনিতে, গিরিগুহার গভীরতম গহ্বরে, তরুরাজিকোটরে, কখনো বা অনুন্নত আদিমানবের কণ্ঠে। আবার কখনো সে উন্নততর মানুষের সুপরিমার্জিত সুকণ্ঠে, কখনো তন্ত্রী বীণায়, কখনো বা নৃত্যরতা রমণীর নূপুরনিক্কণে নানা সাজে সেজে আপনাকে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছে তার চিরনিভৃতার সাক্ষ্য দিতে। অমৃতময়ী সঙ্গীত চির-অমরতা নিয়ে আজও এগিয়ে চলেছে সমুখের দিকে। ঘাত-প্রতিঘাতে মুষড়ে ভেঙ্গে পড়েনি সে আজও, ফেলে আসা সুখ-দুঃখের দিনগুলি তাকে ডাকে পিছনের দিকে হাতছানি দিয়ে। পিছন ফিরে কখনো বা তাকায়, কিন্তু পিছনের চলাপথ তাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত (সি. আই. টি.) রোড, কলিকাতা-১৪

শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯

● স্কুল-কলেজের যাবতীয় বই ● উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক

● ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থের সমাবেশ ●

কলেজ-স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই হয়

সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে। প্রকৃতির আলো চিরদিনই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে নিবিড় অন্ধকার থেকে মুক্তির চিরমুক্ত প্রাঙ্গণে।

মানুষ যখন ছন্নছাড়া জীবনের আওতা ছাড়িয়ে পা বাড়াল সুশৃঙ্খলা আবেষ্টনীর মাঝে, এককের সীমা অতিক্রম করে বহুর মাঝে পেল নিজেকে, স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী পেরিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে বিশ্বমানবের সমষ্টির প্রাকারে আবদ্ধ হ'ল সমষ্টির প্রয়োজনে, তখনই এল উৎকর্ষের চিন্তা। নির্জন বন প্রান্তরের একান্ত একার সমাধি হ'ল প্রকৃতির সৃষ্ট বহু মানবের ভীড়ে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তখনই পড়ল আশ্রয়ের ছাউনি। এতদিন যারা ছিল একান্ত আপনার, সেই পশু-পক্ষী, নদী-গিরি ও বনানীকে আড়াল করে গড়ে উঠল জনকোলাহল মুখরিত মানবসমাজ বনানীরই প্রান্তে। তখনো এরা শক্ত করে ঘর বাঁধতে শেখেনি, শেখেনি নিজের প্রয়োজনের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিতে, তাই ভাঙ্গাগড়ার ফাঁক পূরণ করতে এগিয়ে চলেছিল দৃষ্টি ও মননের পিছনে পিছনে যাযাবরের মতোই স্থিতিহীন বৈচিত্র্যের দিকে। এল ক্লান্তি, চলাপথ থেমে গেল কখন এসে পথপ্রান্তে, শক্ত করে ঘর বাঁধবার প্রয়াস পেল। এল শৃঙ্খলা, পেল ছোট্ট সমাজ, তাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবার চিন্তা যে গল প্রেরণা। তখন প্রকৃতির বিপর্যয়ের সমাধানে মানুষ দিল মনোযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব পূরণে তারা হয়ে উঠল সচেতন। তখনকার উন্নততর মানুষ অনুভব করল, মানুষের শক্তির উপরেও একটি বিরাট শক্তি আছে এবং সেই শক্তিকে তারা তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করবার, জীবন মরণ ও সুখ-দুঃখ নিরাকরণের উপায়-স্বরূপ বলে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করল না। সেই যুগের মানুষই প্রথম চেষ্টা করেছিল বিশেষ করে সুরসপ্তকে গেঁথে কথে কথে করুণ উপঢৌকন দিতে দেবতার উদ্দেশ্যে।

সেই সুশৃঙ্খলিত ও সুসজ্জিত সঙ্গীতের ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন আদি মানবের পরবর্তী যুগে বৈদিক ঋষিগণ প্রথম ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের ঋষিরা যাগযজ্ঞ এবং সমস্ত ক্রিয়াকার্যের মধ্যে সঙ্গীতকে নিয়েছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তাই কর্মোপাসনায় ঋগ্বেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলিকে কখনো বা সপ্তস্বরযোগে কখনো বা পঞ্চস্বরযোগে নানা উপায়ে সুরসৌন্দর্যমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে গান করতেন। বিভিন্ন সুরছন্দে মণ্ডিত ঋক্ মন্ত্রগুলি বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ সহযোগে সাম-গানের উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে যজ্ঞভূমির চতুর্দিকে একটি মঙ্গলময় মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করত। উদার-চরিত ঋষিগণ নিজেদের সমান অধিকারই দিয়েছিলেন স্ত্রীজাতিকে সেই যুগ থেকেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে চলে এসেছে সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যাপকভাবে প্রচলন

এই ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র সামবেদ এবং বিশ্বসঙ্গীতের বীজ সামের অন্তরে নিহিত ছিল সামশব্দে আমরা গানকেই বুঝে থাকি। বেদ ও উপনিষদের প্রায়শ মন্ত্রই বহু প্রয়োজনে বহু ক্রিয়াকর্মে সামগরা সঙ্গীতের রূপে রূপায়িত করে তাকে সামগান বলে আখ্যা দিয়েছেন এই কারণে। আচার্য সায়ণ বেদভাষ্য-ভূমিকায় বলেছেন :—

"তথা গীয়মানস্তু সর্ব আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। গীত রূপা মন্ত্রাঃ সামানি।"

বৈদিক যুগে প্রথমদিকে সপ্তস্বর ঋক্‌মন্ত্রকে আশ্রয় করে প্রথম রূপ নিয়েছিল সঙ্গীতে। আত্র আচার্য সায়ণ বলেছেন :—

"সামোক্তিরুদাহৃতা গীতায়ামৃচি কেবলে।
গানে বা গান এবোক্তি স্বর্যতে সপ্তমে দিতম্।"

তখনকার সামগান বহু [illegible]য়ে লোক-সমাজে দেবাচনার পূজা অর্চনা হয়ে সমাজ সেবার অধিকার পেয়েছিল— সমস্ত বেদোপনিষদ-দর্শনে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে পেরেছিল নিজের স্বাধীনতা নিয়ে। গণ্ডীর সীমানা পেরিয়ে গেতে পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন ঋষি সামগরা। বহুরূপীর সৃজ সে নিয়ে-ছিল, কিন্তু সে অবিভ্রান্ত নয়, সুম ও সুসম্বদ্ধ রীতির মধ্যেই। গোড়ে একঘেয়েমি কু-সংস্কার একঘরে রখেনি সমাজের অন্তরালে সামগা কখনো। ঐ সময় নানা উ বিভিন্ন ধারায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরযো ঋগক্ষর বিশিষ্ট স্তোত্রমন্ত্র সকল

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যি
রচিত কয়েকখানা
ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী
৬ষ্ঠ ভাগ—প্রতি খণ্ড ।৷৹

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে

সরসীবালা বসুর—
শিবানী

বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য

চারুবালা বসুর—
পতিব্রতা

ক ঞ্চনমালা দেবীর—
স্তবক ও রসির ডায়ারী একত্রে

দি বসুমতী প্রাইভেট লি
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রী
কলিকাতা-১২

পাকিস্তান হইতে ভারতে অবাধে জ্যান্ত কচ্ছপ আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। —সংবাদ

য় হ'ত। তখনকার সমাজ কারুকেই রে সরিয়ে রাখত না অপাংক্তেয় রে। তাই তো উদার ঋষি উদাত্ত রে আহ্বান করে বলেছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—আমরা বাই অমৃতের পুত্র, সবাই আমরা ধিকার। সেই উদারতা সমস্ত সঙ্গীতকে রেছিল মিতালীর প্রীতি। তাই রণ্যে গেয়গানের পাশেপাশেই ামে গেয়গানের প্রচলন হয়েছিল বদিক সমাজে সমভাবে। বৈরিতা রে অরণ্যে গেয়গান গ্রামগেয়গানকে স্পৃষ্ট করে রাখেনি, একান্ত মৈত্রী নেই বেঁধেছিল পরস্পর পরস্পরকে। াই প্রেমের ভাবে সাম্যের গাথা ামগান গ্রামেগেয়গীতিকে দিয়েছিল াল। সে যুগে অরণ্যেগেয়গান মন প্রসার লাভ করেছিল অরণ্যবাসী ষিদের ভিতরে, তেমনি গ্রামগেয়গান মোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল ামাবণ লোকসমাজে। উদাত্তাদি চ্চ, নীচ ও মধ্যস্বর হিসাবে বেদে ুবহৃত হ'ত। তাছাড়া শিক্ষাগুলির াধ্যমে আমরা জানতে পারি যে দাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি ৌদিক স্বর থেকে ষড়্‌জাদি সাতটি ৌকিক স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। আর্থিক, গাথিক, সামিক প্রভৃতি স্বর-সংখ্যার প্রয়োগানুযায়ী গ্রামগুলির নাম ছিল। "সঙ্গীত" শব্দের প্রয়োগ তখন ছিল না। গান, উদ্‌গান, গীতি, গাথা, স্তোক, স্তোভ, গান্ধর্ব, উহ, উহ্য প্রভৃতি এত প্রকারের গানের প্রচলন ছিল অরণ্যবাসী ঋষি ও লৌকিক সমাজে।

তাই তো বলতে হয় আদি সঙ্গীত ছিল প্রকৃতিরই পরিপূর্ণ ভাণ্ডারে। মহতী শক্তির সত্তা অনুভব করেছে মহামানবই, তাই সে বলেছে দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান, এমন কি বলেছে "সোঽহং" অর্থাৎ আমিই সেই। যদিও এই অনুভূতি আসতে অনেক যুগ কেটে গেছে—তেমনি সঙ্গীতের মধ্যে অধ্যাত্মভাবের আবির্ভাব হ'তেও সময় লেগেছে অনেক। তাই তো বৈদিক ও ঔপনিষদিক সাহিত্যাদির প্রতি ছত্রে ছত্রে মেলে সঙ্গীতের সন্ধান ও আধ্যাত্মিকতার বাণী। ভারতবর্ষীয় মানুষের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে, উৎসবে, আনন্দ অনুষ্ঠানে এই মঙ্গলময় আধ্যাত্মিকভাবের পরিপোষক সঙ্গীতের প্রচলন দেখতে পাই। এই মধুর সুরধ্বনি চিত্তের একাগ্রতা সাধিত করে বিশ্বাত্মার সন্ধান দিতে পারে। এই সঙ্গীতের দ্বারা সব কিছু সাধিত হ'তে পারে বুঝেই ঋষিগণ সঙ্গীত সৃষ্টি করে জগতের কল্যাণ সাধিত করেছেন। তাই তো শাস্ত্রকার বলেছেন—"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম সাধনায় যে পরমবস্তু পেয়ে ঋষিরা বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানবজাতির কল্যাণে—হয় তো বা সঙ্গীতের সেই অতীত ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শুধুমাত্র পূর্ব-স্মৃতিই বহন করে চলেছে। তাই যমুনার নীলরেখার মতো অবশিষ্ট রয়েছে সঙ্গীতধারার। তাহলেও সে মরেনি, তার প্রাণস্পন্দনের সাড়া এখনো শুনতে পাওয়া যায়, আভাস পাওয়া যায় অতীতের ঐতিহ্যের সকল সঙ্গীতের মূল এই এক, সর্বপ্রকার সঙ্গীতের প্রাণসত্তাই অভিজাত সঙ্গীতের প্রাণসত্তা। সেই আদিযুগের সৃষ্ট স্বরাদিকেই পরিক্রমা করে সমস্ত সঙ্গীত ঘুরে বেড়াচ্ছে সকল স্থানে। আমাদেরই পূর্বপুরুষ আদিযুগের ভারতবর্ষের সঙ্গীতস্রষ্টাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ধারা চলে এসেছে ভারতের প্রতিটি সমাজ ও মানবের মধ্যে।

বিজ্ঞান

অধ্যাপক সত্যেন লোধ

যে কোন কাজ করতে হলে চাই শক্তি, শক্তি ছাড়া কোন কাজ হয় না। দৈহিক শক্তিতে মানুষ আর কতটুকু কাজ করবে! তাই মানুষের পরিশ্রমকে লাঘব করে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে শক্তির চাহিদা আজ অফুরন্ত। এই চাহিদা মেটাতে পারে একমাত্র যন্ত্রশক্তি। তাপশক্তিকে অবলম্বন করে মানুষ আজ যন্ত্রশক্তি ও বিদ্যুৎ-শক্তির উদ্ভাবন করেছে। উভয় শক্তির বলে মানুষ কত বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তুলছে। কত বিস্ময়কর ঘটনার সূচনা করছে।

তার উপর পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২,০০০ সালে জনসংখ্যা ২৪০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৭০০ কোটির মত। এই বিপুল লোকসংখ্যার শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্যেই ২,০০০ সালে প্রায় পাঁচ গুণ শক্তির প্রয়োজন হবে। এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবন ধারণের মানও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানীদের হিসাব মত পৃথিবীতে প্রতি ২৫০০ মানুষের মধ্যে প্রত্যেক একজন মানুষ যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে, তা ২০০০ থেকে ৩০০০ কিলো তাপের সমান। কিন্তু সাধারণতঃ পৃথিবীতে মানুষ খাদ্যের যে শক্তি অপচয় করে, তার চেয়ে প্রায় দশগুণ শক্তি বেশী খরচ করে জালানী হিসাবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে মানুষের থেকে যন্ত্রের জন্যে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বেশী শক্তি খরচ হয়।

বর্তমানে শক্তির এই চাহিদা মেটাতে বছরে ১৭০ কোটি টন কয়লা ও প্রচুর তেল খরচ হয়। পৃথিবীতে কয়লা ও তেলের সঞ্চয় তো আর অফুরন্ত নয়। একদিন ফুরিয়ে যাবেই। এই কথা ভাবতে গিয়ে শক্তির সন্ধানে মানুষের উদ্যম ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বর্তমান যুগে পদার্থ বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে মানুষ নূতন এক শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে পদার্থের অভ্যন্তরে। বুঝেছে, পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন। শক্তির ঘনীভূত রূপই পদার্থ। এই পারমাণবিক শক্তির প্রকাশ মানুষ প্রত্যক্ষ করে অ্যাটম্ বোমার, যার বিস্ফোরণের ফলে জাপানে মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড ঘটেছিল। হিসাব করে দেখা গেছে ১৫০৯ টন কয়লা যে শক্তি উৎপাদন করে মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণের ফলে সেই শক্তিই পাওয়া যায়। যান্ত্রিক অসুবিধা ও আণবিক জ্বালানীর বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়তার কথা বাদ দিয়েও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন, যে এই শক্তির উৎস ইউরেনিয়াম। থোরিয়াম ধাতুর সঞ্চয়ও অনন্তকালের জন্যে নয়।

প্রয়োজনকে উদ্ভাবনের জননী বলা হয়। তাই শক্তির অন্যান্য উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠেছেন। আগামী দিনে যে সব শক্তির উৎস মানুষকে বাঁচবার জন্যে শক্তি

সোলার কুকারে খাদ্য রন্ধন করা হইতেছে।

গয়ে যাবে সেগুলি হচ্ছে সূর্য্য, বায়ু, ...ল ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং ...র্ভের তাপশক্তি। এর মধ্যে সৌর ...ক্তই অপরিমিত ও অফুরন্ত।

অমিত শক্তির আধার এই সূর্য্য ...লে একটি অগ্নিকুণ্ড। এর ...ভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা ২ কোটি ... ডিগ্রীর মত। সৌর শক্তির লক্ষ ...ভাগের ১ ভাগ মাত্র পৃথিবীতে ...ত, কিন্তু তাপ কি প্রচণ্ড। হিসাব ...য় দেখা গেছে এই শক্তি প্রায় ২৫ ... কোটি অশ্বশক্তির সমান। এর ...ংশ অপচয় হয় উপরের বায়ু-...—প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও তির্য্যক-...তনের জন্যে। আর কিছুটা অংশ ...ষিত হয় গাছের পত্রহরিৎ দ্বারা। ...য় অপচয় বাদ দিয়েও যদি মাত্র ... দশমাংশ শক্তি আমরা তাপশক্তি ...রূপে আহরণ করতে পারি, তবে ...র পরিমাণ দাঁড়ায় আড়াই লক্ষ ...টি অশ্বশক্তির সমান। এই ...মাণ শক্তি কয়লা জালিয়ে সংগ্রহ ...তে হ'লে বছরে ২৭,০০০ কোটি ... কয়লার প্রয়োজন। অতএব ...জেই অনুমান করা যায় উপযুক্ত ...া অবলম্বন করলে কি বিপুল শক্তি ...রা সূর্য্য থেকে সংগ্রহ করতে ...র। শিশুরা আতসী কাঁচ দিয়ে ...র্য্যের রশ্মি সংগ্রহ করে কাগজ ...ায়। কতকগুলি তাপরশ্মি এক ...ন কেন্দ্রীভূত হয়ে তাপ বাড়ে, তাই ...জ জলে। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস ...নায় প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি সংহত ...া দূরে শত্রুর জাহাজে আগুন ...য়ে দিয়েছিলেন। মূলতঃ ব্যাপারটা ...ই। আধুনিক সৌরশক্তি ...াদনের ব্যবস্থা মানুষের বৈজ্ঞানিক ...ন ও যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড শক্তির ...সে পরিণত হয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী ...ভোয়ান লাভোয়াশিয়েই ১৭৭৪ সালে ...ম সৌরশক্তির সাহায্যে লোহা ...ন। কয়েক বছর আগে মিজৌরীর ...ট কলেজের উইলিয়াম এম, এন ...কলেজে ১০ ফুট দীর্ঘ একটি ...তাকার এ্যালুমিনিয়াম-এর আয়-...সাহায্যে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে ...০ সেঃ তাপ উৎপন্ন করেন।

সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবার চেষ্টাও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। সূর্য্যের তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রে বিজ্ঞানীরা ধাতু নির্ম্মিত সমতল চাদর, লেন্স ও রিফ্লেক্টর ব্যবহার করেছেন। সৌরশক্তি থেকে বিরাট শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার।

আর্ম্মেনিয়ার আরারাট উপত্যকায় ১৯৫৭ সালে রাশিয়া প্রথম সৌরশক্তি আহরণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিন চতুর্থাংশ মাইল ব্যাসের এক বৃত্তাকার স্থানে কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে মোট ১২৯৩টি আয়না বৃত্তাকারে সূর্য্যের দিকে মুখ করে ঘোরে। প্রত্যেকটি আয়না থেকে প্রতিফলিত রশ্মি ১২০ ফুট উঁচু মঞ্চের উপরে স্থাপিত একটা বয়লারের ওপরে পড়ে। প্রতিফলিত সূর্য্য-রশ্মির উত্তাপে বয়লারের জল বাষ্পে পরিণত হয়। মাত্র ১ ঘণ্টায় ১৩ টন জল বাষ্পীভূত হয়ে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড চাপ বিশিষ্ট বাষ্পরাশিকে পাইপের ভিতর দিয়ে টারবাইনের মধ্যে চালিত করা হয়। টারবাইন ঘোরে ও বিদ্যুৎশক্তি তৈরী হয়। এই সৌর বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তিতে আরারাট অঞ্চলের মরুভূমি শস্য-শ্যামলা। আবার ঐ টারবাইন ঘোরাবার পরে উদ্বৃত্ত বাষ্পরাশিকে নিয়ে দূরবর্ত্তী সহরাঞ্চলের ঠাণ্ডা বাড়ী-ঘর গরম করা হয়। শুধু তাই নয়, নিকটবর্ত্তী ফলমূল টিনজাত করবার একটি কারখানায়ও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে।

কৃত্রিমনাভস্থ ইনষ্টিটিউটের একজন কর্ম্মী সৌরশক্তির সাহায্যে চালিত যন্ত্রে বরফ তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রটি ৫০০ ওয়াট শক্তি সম্পন্ন ছিল। কর্ম্মীটি নাকি মাত্র ১২০ ওয়াট ব্যবহার করবার পরে বাকীটুকু অ্যাকুমুলেটরের মধ্যে রেখে দিতেন। রাত্রে এবং মেঘলা দিনে ঐ অ্যাকুমুলেটর থেকে প্রয়োজন মত শক্তি সংগ্রহ করে বরফ তৈরী করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন। আমেরিকার মেটিরিয়েল্‌স্ পলিসী কমিশন স্থির করেছেন যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১৩০০০০০টি যন্ত্র বসানো হবে সৌরশক্তির সাহায্যে তাপ শক্তির উৎপাদনের জন্যে। এর ফলে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত জাতির মোট শক্তির যে চাহিদা তার শতকরা দশ ভাগ মেটানো সম্ভব হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌সের ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির তত্ত্বাবধানে হোয়েট সি হোটেলের সৌরশক্তির সাহায্যে প্রতিদিন ১২০০ গ্যালন গরম জল ঐ হোটেলে সরবরাহ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মেরিয়া টেলকিজ সৌর তাপ সংরক্ষণের একটি রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ জন্যে তিনি গ্লবার্স বাল্ট নামক রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন। ৯০° থেকে ১০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট্ তাপে ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটি রাসায়নিক সংগঠনে পরিবর্ত্তন ঘটে। ১ ঘন ফুট গ্লবার্স বাল্ট ও তার সম পরিমাণ জল ৮০° থেকে ১০০° ফাঃ গরম করলে গ্লবার্স বাল্ট জলের তুলনায় সাড়ে আটগুণ অধিক তাপ ধরে রাখতে পারে।

আমেরিকার ফ্লোরিডা, টেক্সাস, আরিজোনা প্রভৃতি স্থান সাবট্রপিক্যাল অঞ্চল। গৃহস্থালীর কাজের জন্যে যে গরম জলের প্রয়োজন হয়, এ সব এলাকায় তা সৌর তাপের সাহায্যেই গরম করা হয়। এক বা দুই স্তর কাঁচের নীচে, উন্মুক্ত আকাশের তলায়, গৃহের ছাদের ওপর বহু নল থাকে। সৌর তাপে এই সকল নলের জল ১৫০° ফাঃ পর্য্যন্ত গরম হয়। এই জল একটি তাপ অপরিবাহী পাত্রে সঞ্চয় করা হয়।

ভারতের পুণাস্থিত ন্যাশানাল ফিসিক্যাল গবেষণাগারেও ছোটখাটো ইঞ্জিন, জলের পাম্প ও যান্ত্রিক তাঁত চালাবার চেষ্টা হচ্ছে সৌরশক্তির সাহায্যে এবং সৌরশক্তির সাহায্যে রান্না করা যায় কি না, এ বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা চলেছে। ১৯৫১ সালে যে নমুনা সৌর-চুল্লী তৈরী হয়েছে তা ৪-৫ জনের খাদ্য রন্ধনের উপযোগী। এই সৌর-চুল্লী অতি হাল্কা ও সুটকেসের মতন সহজেই বহন করা যায়। তাই আমরা আশা করছি যে, অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তিকে আরও বহু কাজে লাগান যাবে।

খেলা ধুলা

জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় শোকাবহ ঘটনা

খেলাধূলোকে ভালবাসার পুরস্কার স্বরূপ যদি মৃত্যুকে বরণ কোরতে হয়, তবে তার চাইতে দুঃখদায়ক ঘটনা আর কি হোতে পারে? রাজধানীর বুকে, সদ্য-সমাপ্ত জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় রেলওয়ের দুই প্রতিযোগী প্রকাশ এবং কানিয়াপ্পানকে সেই চরম এবং ভয়াবহ পুরস্কারই লাভ কোরতে হোয়েছে। এ দু'টি অকালমৃত্যু ভিন্ন, রেলওয়ের হরবল সিং ও কিষেণচাঁদ এবং অন্ধ্রের জগন্নাথন মারাত্মক ভাবে আহত হোয়েছেন।

অপত্য স্নেহ এবং পত্নীর অশ্রু-সজল দুটি আঁখির সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা কোরে, পরিণত বয়স্ক প্রকাশ শুধু খেলাধূলোর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসার তাগিদেই জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কোরতে এসেছিলেন। কে জানতো তখন যে সাক্ষাৎ মৃত্যু তাঁর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছে, কে জানতো তখন যে এ যাত্রাই হবে তাঁর অগস্ত্য যাত্রা?

জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে ১৮০ কিলোমিটার রোড রেসে অংশ গ্রহণকারী মোট ৪৮ জন প্রতিযোগীর রাজপথে, দিবালোকে, নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের শেষ পাদ অতিক্রম করবার সময়ে, সামরিক বাহিনীর একটি ট্রাকের অতর্কিত ধাক্কারই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের জীবনান্ত ঘটে, আর জগন্নাথন সাংঘাতিক আহত অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে নীত হ'ল এবং পরে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ দু'জন ক্রীড়াবিদের এই শোচনীয় মৃত্যুর অনতিবিলম্বে পূর্ণ তদন্ত এবং যাঁদের কর্ত্তব্যচ্যুতির ফলে এ দুর্ঘটনা সংঘটিত হোয়েছে তাঁদের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

মুষ্টিযোদ্ধা ডেভি মুরের জীবনাবসান

শুধু ভারতেই নয়—ভারতের বাইরেও সম্প্রতি মুষ্টিযুদ্ধে এমন একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে যা বিশ্বের চতুর্দ্দিকে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এমন কি ভ্যাটিকানের পোপ জনও বিরূপ মন্তব্যে বলেছেন—'মুষ্টিযুদ্ধ বর্ব্বরতা প্রসূত এবং স্বাভাবিক রীতি-নীতি বহির্ভূত ক্রীড়া'।

ঘটনাটি ঘটে লজ এঞ্জেলসে, গত ২১শে মার্চ্চ। বিশ্ব ফেদার ওয়েট বিজয়ী আখ্যাধারী মুষ্টিযোদ্ধা ডেভি মুর দুগার রামোশের বিরুদ্ধে খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন হোয়ে পড়েন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বটে, কিন্তু সে সংজ্ঞা আর ফিরে আসে নি! ২৫শে মার্চ্চ সোমবার প্রত্যুষে তিনি শুধু ক্রীড়াজগৎ থেকেই নয়, এ পৃথিবী থেকেই চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন।

ডেভি মূর পেশাদাররূপে ৬৬টি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। এর ভেতরে ৫৮ বার তিনি জয়ী হোয়েছিলেন এবং উনত্রিশটিই নক্-আউটে। ডেভি মূরের জীবনে নক্-আউটে পরাজয় ছিল এই প্রথম। এই পরাজয় যে সর্ব্বগ্রাসী হবে কেউই তা অনুমান কোরতে পারেনি।

ডেভি মূরের এই শোচনীয় মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদের ভেতরেও প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি কোরেছে। সেনেটর কেফভার—ডেভি মূরের শোচনীয় মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মুষ্টিযুদ্ধ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকল্পে ফেডারল আইন প্রণয়নের জন্যে আইনসভায় তাঁর পূর্ব্বেকার বিলটি পুনরুত্থানের সিদ্ধান্ত কোরেছেন। এ ছাড়া পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ বিলোপ করবার উদ্দেশ্যে গণভোট নেবার প্রস্তাব জানিয়ে কালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের আইনসভায় একটা খসড়া বিল পেশ করা হোয়েছে।

আবার মুষ্টিযুদ্ধ বাতিলের প্রস্তাবে আপত্তিও জানিয়েছেন বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ এসোসিয়েশনের এশিয়া শাখার সহ-সভাপতি মিঃ জাষ্টিলিয়ানো মল্টানো। এ ছাড়া নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মিড সাংবাদিক বৈঠকে, মুষ্টিযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানান। তাঁর মতে 'মুষ্টিযুদ্ধ আধুনিক মানুষের পৌরুষ প্রকাশক এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে আত্মবিশ্বাসের।'

ক্রীড়াবীর মেজর ধ্যানচাঁদকে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নিকট হইতে অর্জ্জুন পুরস্কার গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে।

জাতীয় হকিতে রেলওয়ে দলের প্রাধান্য

মাদ্রাজে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফাইন্যালে রেলওয়ে দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শক্তিশালী সার্ভিসেস একাদশকে ২—১ গোলে পরাজিত কোরে রঙ্গস্বামী কাপ লাভের গৌরব অর্জ্জন কোরেছে। রেলওয়ে দলের জাতীয় হকিতে সাফল্য এই প্রথম নয়। রেলওয়ে দল

১৯৩০ সালে প্রথম অংশ গ্রহণ কোরেই সাফল্য লাভ করে তারপর ১৯৫৭—৫৯ সালে ধারাবাহিক তিনবার এবং ১৯৬১ সালে আরও একবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ কোরেছিল।

রঙ্গস্বামী কাপ

এবারে তা'দের ষষ্ঠ সাফল্য। জাতীয় প্রতিযোগিতায় মোট একুশটি দল অংশ গ্রহণ করে। কেরালা যোগদান কোরেও পরে নাম প্রত্যাহার কোরে নেয়।

আগামী শরৎকালে ফ্রান্সে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জ্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা এবং আগামী বৎসরের টোকিও অলিম্পিকের পরিপ্রেক্ষিতে, এবারের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। বিশেষতঃ ভারতের কাছে, এখন বিশ্ব-হকিতে হৃত মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটিই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই কোরে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায় তাঁদের শিক্ষণের ব্যবস্থা কোরতে পারলে, এ সংকটাবস্থা অতিক্রম করা ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। সুখের বিষয়, ভারতীয় হকি ফেডারেশন, জাতীয় প্রতিযোগিতার শেষে আন্তর্জ্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল গঠন-কল্পে প্রাথমিকভাবে ৪৪ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত কোরেছেন। আগামী জুন মাসে এঁদের জন্যে জলন্ধরে একটি ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে।

এই নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের ভেতরে বাংলা থেকে মনোনীত হোয়েছেন চারজন খেলোয়াড়—কাষ্টমসের গুরুবক্স সিং, মোহনবাগানের যোগীন্দার সিং, ইষ্টবেঙ্গলের কুশল-কুমার এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সরিফুদ্দিন। যে চারজন বাংলা থেকে মনোনীত হোয়েছেন এঁরা বাংলা দলেরই খেলোয়াড় কিন্তু সত্যিই কি এঁদের জন্যে বাংলা গর্ব্বানুভব কোরতে পারে? ব্যক্তিগত স্বার্থ ভিন্ন বাংলার সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কতটুকু? বছরের ন' মাসাধিককাল বাংলার বাইরে থেকেও এরা বাংলার খেলোয়াড়—এর চাইতে দুঃখের আর কি থাকতে পারে? জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে খাঁটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় ছিলেন মাত্র দু' জন—গোলরক্ষক এস কে সেন আর রাইট উইং ডি ঘোষ। প্রথমজন আবার ছিলেন বদলী গোলরক্ষক। বাদ বাকী সবাই ছিলেন বহিরাগত। মাদ্রাজের কাছে বাংলার পরাজয়ের জন্যে অনেকেই বহিরাগত খেলো-য়াড়দের আন্তরিকতার অভাবকেই দায়ী করেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় প্রতিবছরই বাংলা দেশে বহিরাগত হকি খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।—আর এর মূলে রয়েছেন সেই সব ক্রীড়াসংস্থা, যাঁরা বাংলার খেলাধূলোকে আঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রণ কোরে আসছে [illegible] দের চেতনা কবে ফিরবে কে জানে।

জয়পাল সিং কমিটী বাতিলের সম্ভাবনা

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালি সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে ঘোষণা কোরেছেন যে, বিগত রোম অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সামগ্রিক ভূমিকায় অনুসন্ধানের জন্যে যে জয়পাল সিং কমিটী গঠিত হোয়েছিল—সুদীর্ঘ তিন

বাঙ্গলাদলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগীন্দার সিং

বৎসরেও সেই কমিটী রিপোর্ট পেশ না করায় কমিটী নিয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হোয়েছে। ডাঃ শ্রীমালি আরও জানিয়েছেন যে, 'জয়পাল সিং কমিটী'র পরিবর্ত্তে নূতন এক কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।'

রোম অলিম্পিকের অনুসন্ধান কমিটী ভাঙ্গা-গড়া কোরতেই যদি অলিম্পিক এসে যায়, তবে এ ধরণের অনুসন্ধান কমিটীর স্বার্থকতা জন-সাধারণ উপলব্ধি কোরবেন কি কোরে?

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

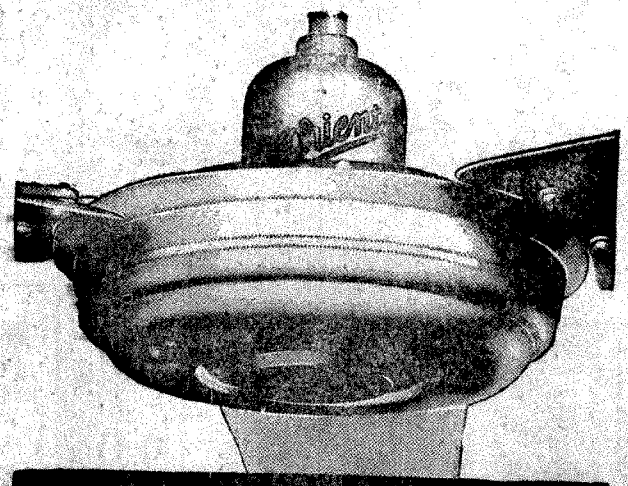

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH

BETTER ENGINEERING

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-14

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 4th April, 1963
PHONE : { 34-3487 / 34-3488 GRAM : "BASUMATI" Price : 25 nP.

Viewing the world through glass

With GLASS it's more view and more room too ! Wherever it goes Glass opens up exciting new possibilities. Gone is that cramped, confined, closed-in feeling. The bright, cheerful, open look is in.

And glass goes everywhere. To homes, hotels, hospitals—to offices, schools and stores. In windows and doors, in buses and cars.

Manufactured in India by Hindusthan-Pilkington Glass Works Limited, quality tested sheet glass is available in a wide variety of sizes and thicknesses to suit every purpose.

For the finest, most durable glass you can depend on

HINDUSTHAN-PILKINGTON GLASS WORKS LIMITED
Managing Agents: Talukdar Law & Company Private Limited
Hindusthan Buildings, 4 Chittaranjan Avenue, Calcutta 13

9 APR 1963

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র
১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

11. 4. 63
67/47

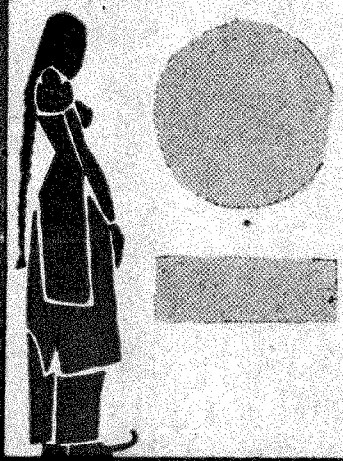

শিল্পী চন্দ্রবর্তী

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

পশ্চিম বঙ্গের আধুনিকতম
ও
অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

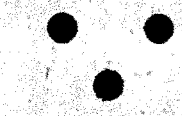

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ
২১, গিরি বাবু লেন
কলিকাতা—১২
ফোন ৩৪-৩৩৫৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩
আজকের দিনে	..	৪
সহর কলকাতা	...	৫
দিল্লী থেকে	শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৭
রঙ্গদর্শন	...	১১
কবিতা :—		
তাই ভালো	মনীশ ঘটক	১৩
সীমান্ত সৈনিক	দিনেশ দাশ	১৩
সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন	অজিতকুমার বিশ্বাস	১৪
আন্তর্জাতিক		১৫
নতুন নামে	আশাপূর্ণা দেবী	২৫
আমাদের প্রতিবেশী	সর্বদর্শী	৩০
ভারত দর্শন	...	৩৩
দণ্ডকারণ্যে সৌন্দর্য	অনসূয়	৩৬
সংবাদ চিত্র		৩৯
শিল্পায়মান দেশের করনীতিতত্ত্ব ও প্রয়োগ	সেবা রায়	৪০
বিজ্ঞানের হালখাতা	দিগ্‌দর্শক	৪৩
রঙ্গজগৎ	...	৪৫
খেলাধূলা	...	৪৭

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম্‌ আর-এ-এস্‌ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীস্থ বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্‌ হাইনেস্‌ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্‌ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস, এম, দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার এস্‌ ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল প্রভৃতি।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭৷৶০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৶০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৶০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯৷৶০, বৃহৎ—৩৮৷৶০। **মোহিনী** (বশীকরণ) **কবচ** ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১৷৶০, বৃহৎ—৩৪৶০, মহাশক্তিশালী ৩৮৭৬৶০। **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্ম্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ—৯৶০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৶০, মহাশক্তিশালী—১৮৪৷০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব) ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটস্থ গেট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৫। সময়—বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস** ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১

—উপন্যাস—

নির্ম্মলকান্তি মজুমদার—
স্মৃতির দিগন্ত ৩·৫০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস
ঋণশোধ ৩·৫০ স্মৃতি ৩৲
রামপদ মুখোপাধ্যায়
মনকেতকী ৬৲ দুরন্তমন ৩৲
মাটির গন্ধ ৪৲
তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের
কুমারী ধরম ৫·৭৫
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালোচোখের তারা ৩·৫০
প্রমথনাথ বিশীর
যা হলেও হতে পারতো ৩·৫০
নীলবর্ণ শৃগাল ৪·০০
বাংলার কবি ৪·০০
প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস
লাল পাথর ৩৲ সমান্তরাল ৩·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
জানালার ধারে ৪·০০
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫·৫০

গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগ পুরা ৪৲
সুবোধ চক্রবর্ত্তী-একটি আশ্বাস ৬·৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায়-আনন্দ নট ৩৲
শক্তিপদ রাজগুরু—বনমাধবী ৩·৫০
সত্যব্রত মৈত্র—বনদুহিতা ২·৫০
আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩·৫০
ইন্দুমতী ভট্ট—আতপ্ত কাঞ্চন ৩৲
বেলা দেবী—জীবনতীর্থ ৩৲
অখিল নিয়োগী—বহুরূপী ৩৲
বিমল কর—দিবারাত্রি ৩৲

—নাটক—

স্বামী বিবেকানন্দ (অভিযাত্রী) ২·৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) ২·০০
লক্ষহীরা (মহেন্দ্র দত্ত) ২·৫০
পান্থশালা (রমেন লাহিড়ী) ২·৫০
চাঁদির কৌটা (উৎপল দত্ত) ২·০০
সন্তান (বাণীকুমার) ৩·০০
পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী) ২·০০
সূর্য্যমুখী (প্রশান্ত চৌধুরী) ২·০০
প্রত্যাবর্ত্তন ২·০০ লাল পাথর ২·৫০
অনর্থ (সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২·৫০

পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত
কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম ১৫·০০
আদি মধ্য অন্তলীলা সম্পূর্ণ—
শ্রীহরিসাধক কণ্ঠহার ১·৫০
ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০·০০
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ৮·০০
অশোক গুহের অনূদিত
নগরীতে ঝড় ৫·০০
বনেদী ঘর ৩·৫০
যোগেশচন্দ্র বাগলের
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬·০০
ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪·০০
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বাংলা সাহিত্যে একাদশক ৪·৫০
সাহিত্যের স্বরূপ ২·৫০
অভিযাত্রীর উপন্যাস
অনির্ব্বাণ শিখা ৫·০০
নষ্টচন্দ্রের আলো ৬·০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী ঃ ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪

মুখেই
সৌন্দর্য্যের প্রকাশ

সুন্দর মুখের অধিকারিণী হলেই হাজার জনতার মধ্যে থাকলেও আপনার রূপলাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
বিউলাক্স বিউটি ক্রীম শুধু যে মুখটিকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, ত্বকের যে কোন দাগ নিশ্চিহ্ন করে তাতে উজ্জ্বল মাধুরিমা এনে দেয়।
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক (ডি, এস,সি, এবং ডি, ফিল) এর আবিষ্কৃত বিউলাক্স বিউটি ক্রীম মৃদুগন্ধযুক্ত এবং লানোলিন ও ক্যালামিন সহযোগে তৈরী একটি অনুপম প্রসাধন সামগ্রী।

অংকর ইণ্ডাষ্ট্রীজ,
৭।৮, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

IPB/N-1/63b

পরিবেশক ঃ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড ট্রেডার্স

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ২৮শে চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Thursday, 11th April, 1963
25 Naya Paise

756.3
.0031
Y67m

নববর্ষ

নববর্ষ সমাগত। রুদ্র কঠোর রূপেই তার আবির্ভাব। গ্রীষ্ম যেন বিশ্বপ্রকৃতির তপস্যার ঋতু। নববর্ষের আহ্বান তাই আয়াস, শান্তি বা বিলাসের নয়; তার আহ্বান দৃঢ় সঙ্কল্পের, অনলস কঠিন সাধনার। এই আহ্বানে যেন প্রতিধ্বনিত আমাদের জাতীয় জীবন-মন্ত্র।

বিগত বছরে আমরা যে জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি—সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এবার নববর্ষের আগমন যেন গভীরতর তাৎপর্য্যমণ্ডিত। বর্ত্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতেই বিশেষভাবে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, বসন্তের উচ্ছ্বাসময় পুষ্পশোভায় সজ্জিত হয়ে কেন এই নববর্ষ আসে না, কেনই বা নববর্ষের সমাগম ঘটে বৈশাখের এমন তাপদগ্ধ রুক্ষতায়? এই রুক্ষতায় আছে কঠোর তপস্যার ইঙ্গিত। যেন কঠোর পৃথিবীতেই মানুষের জীবনারম্ভ। জীবনের সূচনা হয় যদি এইভাবে—তবেই ত জীবনের পরিণতিতে যথার্থ সার্থকতা লাভ করা যায়। আমাদের এই জীবন তপস্যার কঠোরতায় সিদ্ধিলাভ করে এই সার্থকতাকে আনন্দমণ্ডিত করে তুলবে। তাই মামুলি বাঁধা কথায় নববর্ষ উদ্‌যাপন করবার দিন আজ নয়। নববর্ষ এনেছে যে আহ্বান—তার সার্থকতা যেন উপলব্ধি করি।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বিপদ আসে, সঙ্কট আসে, আসে দুঃখের পরীক্ষা। এই বিপদ বা সঙ্কটকে যদি কেউ এড়িয়ে গিয়ে পালাতে চায়—তাহলে সে মনুষ্যত্বকে অপমানিত করে; কেন না এই সব পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসই মনুষ্যত্বকে সার্থক করে তোলে।

স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম আমরা জাতীয় জীবনের এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। এ-সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভ করতে অনেক দুঃখ হয়ত আমাদের পেতে হবে। কিন্তু এ-সঙ্কট শুধু দুঃখ যন্ত্রণাই ত' আনেনি, তার সঙ্গে এনেছে দীপ্ত এক প্রেরণা—যে প্রেরণা জাতীয় চৈতন্যকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে। এ-সঙ্কট সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সীমা মুছে দিয়ে অখণ্ড জাতীয় সত্তার এক গভীর উপলব্ধি আমাদের মনে এনে দিচ্ছে। আমাদের দেশের সঙ্কটের একটি কল্যাণের দিকও তাই আছে বলে মনে হয়। জাতির মেরুদণ্ডকে এ-সঙ্কট সুদৃঢ় সবল করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ ব্যক্তির বেলায় যেমন—জাতির বেলাতেও তেমনি অতি নিরাপদ নিশ্চিন্ততাই শৈথিল্যের জনক। আবার, জাতীয়তা বলতে ভারতবর্ষ যা বোঝে তা বুঝি বর্ত্তমান অন্য বহু দেশের ধারণার থেকে পৃথক। জাতীয়তার মূলেই দেশসত্তা। ভূগোল ও ইতিহাসের সুদীর্ঘ ঘনিষ্ঠ মিলনেই কোথাও কোথাও পরমাশ্চর্য্য এক দেশসত্তার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে তাই ঘটেছে। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার সাধনা নানা দুর্য্যোগ বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটি দেশ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে—পৃথিবীতে যা অনন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থ এই চেতনার ব্যাপকতার কাছে অতি তুচ্ছ।

যে অখণ্ড জাতীয়তা ও মৌলিক ঐক্য বিপদের মুহূর্ত্তে ভারতবাসীর মনে সংগঠিত হয়েছে—এই নববর্ষের তপস্যার অঙ্গ হিসাবে তাই আমাদের অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদে চির বলীয়ান হলেই আমাদের মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তাই নববর্ষের কঠোর সাধনার আহ্বানকে যথোচিত মর্য্যাদার সঙ্গে আমরা যেন অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

শ্রীকেশব দেও মালবিয়া

বর্তমান সপ্তাহে যে ব্যক্তিটিকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে—তিনি কে? লোকসভার ফ্লোর থেকে সুরু করে দেশের সংবাদপত্রগুলির প্রধান হেডলাইন—কে, ডি, মালবিয়া। পুরা নাম শ্রীকেশব দেও মালবিয়া। কেন্দ্রীয় শুল্ক ও গোয়েন্দা বিভাগের এক গোপন চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট এই ঝড়ের কারণ বলে জানা যায়। কলকাতার বিখ্যাত একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে খনিজ পদার্থ রপ্তানীর লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমালবিয়া সব রকম নিয়ম ভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলি গুরুতর। ঘটনাটি বর্তমানে এটর্ণী জেনারেলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

শ্রীযুত মালবিয়া অবশ্য গত বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় স্বীকার করেছেন যে, দলের (কংগ্রেসের) নির্বাচনী খরচের জন্য তিনি দশ হাজার টাকা ঐ কোম্পানীর কাছ হতে চাঁদা নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন হঠাৎ ঐ কোম্পানীর কাছ থেকে এত টাকা চাঁদা নিলেন, তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা তিনি করেন নি।

শ্রীযুত কেশব দেও মালবিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র। ১৯২৯ সালে কানপুর হারকোর্ট বটলার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট হতে তৈল-সংক্রান্ত বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৩১ সালের মহাত্মাজীর আহ্বানে দেশের ডাকে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি কয়েক বছর ধরে পালন করেন। কর্মজীবনে শ্রীযুত মালবিয়া প্রথমে ঐ প্রদেশের কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক, পরে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন। তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, উপমন্ত্রী, পরে পূর্ণমন্ত্রী। ধাপে ধাপে প্রমোশন।

শ্রীযুত মালবিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নেবেন কি না—এ নিয়ে রাজধানীতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে।

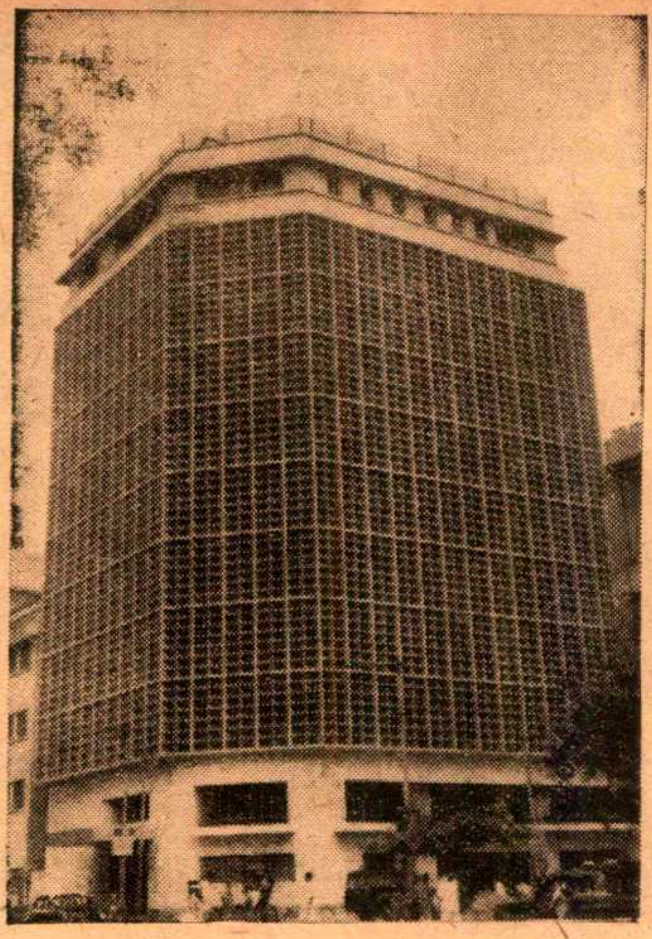

শহর কলকাতা

নীচু জলাভূমি, এখানে ওখানে ঘন জঙ্গলে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকছে! অপেক্ষাকৃত উঁচু ডিহি অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রাম দু' চারটি নজরে পড়ে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে জব চার্ণক শহর কলকাতার ভিত্তি স্থাপনা করে কতদূর দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বিচার করার অবকাশ আর মিললো না! হুগলী নদীর তীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ধীরে ধীরে রূপ নিলো এই আজব শহর। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত লালদীঘি অঞ্চলে বিদেশীদের বাসযোগ্য পাকা কোঠা বাড়ী কিছু কিছু উঠলেও বাকি কলকাতার রূপ ছিলো অবর্ণনীয়। চার দিকে ডোবা, জঙ্গল, কাঁচা রাস্তা। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত কুঁড়ে ঘর ও মাটির দালান! খোলা নর্দ্দমার অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা আলোহীন রাস্তার দু'ধারে। এই সব রাস্তায় এক পাল্‌কী ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলা প্রায় অসম্ভব ছিলো। সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। জোলো স্যাঁৎ সেঁতে আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, মহামারী ও মড়ক লাগতো সারা শহরে? তবুও অবিশ্বাস্যভাবে এ শহর ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে আজ আয়তনে কমনওয়েলথ-এর দ্বিতীয় স্থান অধিকার লাভে সমর্থ হয়েছে। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার লোক সংখ্যা ছিল ১২,০০০। ১৯৬১ সালের আদম-সুমারীতে জানা যায়, আজকের দিনে আমরা ২,৯২৭,২৮৯ মানুষ সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা নামে তিনটি অখ্যাত গ্রামের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা শহর কলকাতার অধিবাসী। সেই সব কাঁচা বাড়ী, বন্য পশু বিধ্বস্ত ঝোপ ঝাড় বা জঙ্গল, মশাল জালিয়ে রাত্রিবেলা পাল্‌কীর চলা ফেরার দৃশ্য আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোম্পানীর আমল থেকে আমাদের কলকাতা মহারাণীর শাসন—কৌলিন্যে ক্রমশঃ নবরূপ ধারণ করে তারপর বিদেশী শাসন মুক্ত স্বাধীন দেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ও বৃহত্তম নগরী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কলকাতার আদি ইতিহাস গবেষণা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই শহর (যাকে "Chance created, Chance directed.) Kipling বলেছেন, কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে ওঠে নি। প্রয়োজন অনুসারে ফাঁকা জায়গা ক্রমশঃ ভরাট হয়ে উঠেছে এলোমেলো বিচ্ছিন্নতায়। অভিজাত ইমারতের পাশেই হয় তো অপরিচ্ছন্ন বস্তি, শিশুদের খেলাধূলার পার্কের ধারে কুরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর খাটালের পরিবেশ। আধুনিক শহর কিন্তু বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা বিবেচনা করে তৈরী করা হয়। যে কোন গৃহস্থ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাসগৃহের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও সুখকর করে তুলতে চান। বাসগৃহের সন্নিকটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক মিলন ক্ষেত্র ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকলে তাঁর নানা অসুবিধা ঘটতে পারে। আবার কর্ম্মক্ষেত্রের দূরত্ব বেশী হলে যাতায়াতে যে অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার ঘটে, তাও নিরর্থক ও ক্ষতিকর। আদর্শ শহরের যে বৈশিষ্ট্য আমরা যে কোন modern town planning এর উপর লিখিত বইতে পাই, কলকাতা শহরের সঙ্গে সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দর সাজানো ছবির সঙ্গে মেলে না। ইঁটের পর ইঁট মাঝে মানুষ কীটের মুক্ত বায়ু, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা

এখানে দুঃস্বপ্নের মত ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

এই সমস্যা অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু সমাধানের প্রশ্ন আজও প্রশ্ন রয়ে গেছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে আমাদের নাগরিক জীবন যে কতদূর হানিকর সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া যে আমাদের মানসিক সত্তাকে ক্রমশঃ শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলছে, সে বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠার প্রয়োজন আজ অনেকেই অনুভব করছেন। গলির অপরিসর এলাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলা করতে হয়। এই সীমাবদ্ধ অপরিসরতার মাঝখানে যারা বেড়ে উঠছে, ইস্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের বোঝা যতই বাড়ুক না কেন, তাদের মন অসুস্থ সংকীর্ণতার সীমা ছাড়াতে পারবে না। অল্প বয়সে এই সব ছেলেরা আজ যে অকাল পক্ক ও অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে, এই বিশাল সামাজিক সমস্যাটিরও অন্যতম কারণ হোল আমাদের শহরের উন্মুক্ত খোলা জায়গার নিদারুণ অভাব। ট্যাটিসটিক্স কষলে নিশ্চয় দেখা যাবে আদর্শ একটি শহরে যে পরিমাণ পার্ক খেলার মাঠ অথবা চওড়া রাজপথ থাকা প্রয়োজন, কলকাতায় তা নেই। তাই পিপাসার্ত্ত চাতকের মতো ভাগ্যবানেরা বিকেলের পর হাওয়া খেতে ছোটেন ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়ালে, লেকে, ময়দানে অথবা গঙ্গার ধারে। কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ীর ভীড়। ঠিক মারে বেলফুলের পশারী, আইসক্রিম ম্যান, চিনাবাদামওয়ালা অথবা "শুশাইনের" দল। কিন্তু সেই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অধিকারী মুষ্টিমেয় ক'জন ছাড়া বাকি সংখ্যাতীত মানুষেরা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় সমস্ত সম্পর্ক ছেঁটে বাদ দিয়ে ইঁট কাঠের জগতে কোন গতিকে প্রাণধারণ করে মাত্র।

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগ্যানাইজেশন একটি 'বৃহত্তর কলিকাতা'র পরিকল্পনা করে যে প্রারম্ভিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছেন, তা বাস্তবে রূপায়িত হলে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয় তো হবে। কিন্তু আজকের দিনে দ্বিখণ্ডিত বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের ভীড়সকুল শহর কলকাতার সমস্তাচ্ছন্ন নাগরিক জীবন যে দ্রুত ও অনিবার্য্য বিপর্য্যয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার কথা।

সুন্দরী নগরী হিসাবে শহর ক'লকাতা সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত হলেও ক'লকাতার কয়েকটি অঞ্চলের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্য-কর। সাধারণ দর্শকের চোখে কিংবা বিদেশী পর্য্যটকের দৃষ্টিতে এই সকল অঞ্চল সহজে ধরা পড়ে না—তাই হয় তো সরকার এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানের নজর নেই এই সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অঞ্চলের প্রতি। ক'লকাতার মত খ্যাতিমান শহরের ফুটপাথে বাস্তহারা ভিখারী ও ভবঘুরে প্রভৃতি জাতীয় সংসারহীন নরনারীর সংসার সৃষ্টির চেষ্টা আমরা সর্ব্বক্ষণই দেখতে পাই। তা ছাড়া, ক'লকাতার কয়েকটি বাজারকে কেন্দ্র করে নানা ধরণের দুষ্কৃতিকারীদের দলকে বাজারের আশেপাশে আড্ডা গড়তে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়, কলকাতার সত্যিকার বাসিন্দা কারা? যাঁরা নিয়মানুযায়ী ট্যাক্স দিয়ে চলেছেন তাঁদের অবস্থা আজ জর্জ্জরিত।

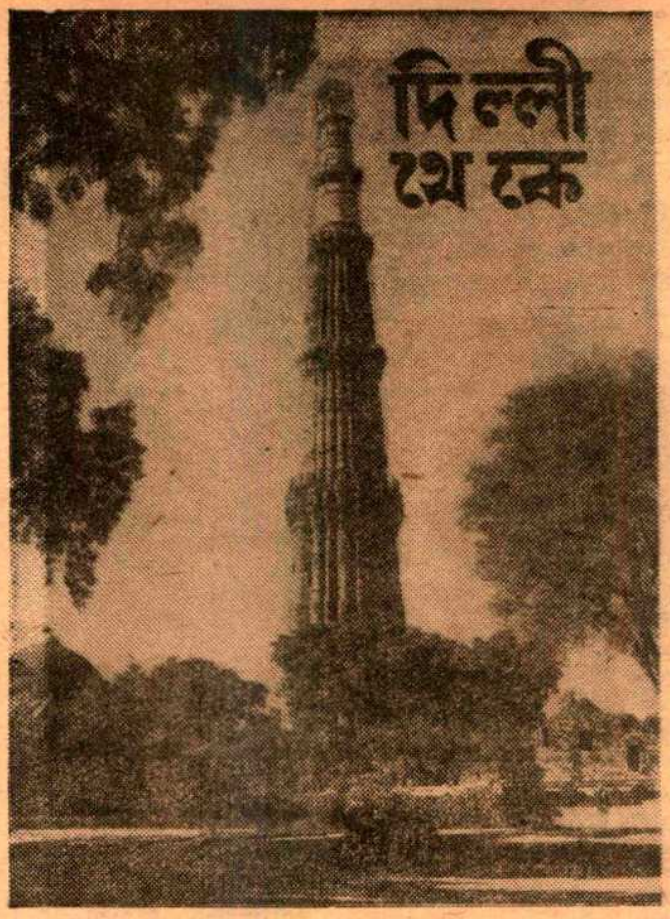

দিল্লীর মোগল্‌স্ গার্ডেন্স-এর ঠিক পিছনে যে বিরাট উদ্যানটি নানারঙের ফুলের শয্যা তৈরী করে রুক্ষ দিল্লীর বুকেও রোমান্স্ জাগায় তার নাম তালকটোরা। তাল মানে হ্রদ কটোরা মানে বাটি। বাটির মতন একটা প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল বলে এর নাম তালকটোরা। আরাবল্লী পাহাড়ের ঠিক গায়ে এই আধুনিক পার্কটা যেন নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না। যেন একটা অপরূপ গ্রাম্য সুন্দরীকে শহরের আধুনিকার বেশে খাড়া করা হয়েছে। তা হোক, এই তালকটোরা উদ্যানের একটা বিরাট ইতিহাস আছে।

আজ থেকে সোয়া দু'শো বছর আগে ঠিক এই মাঠে মারাঠা সেনানী এসে আক্রমণ করেছিল মোগল মহামাত্যদের। শুধু আক্রমণ করে নি। সর্বপ্রথম দিল্লীতে পদার্পণ করেই তারা জয় লাভ করেছিল। "দিল্লী চলো"র অভিযানে তারাই কি ছিলো প্রথম পথ পরিচায়ক?

ইংরেজের ভারত ত্যাগের পরে এই তালকটোরা উদ্যানে একটা নতুন জীবনের সাড়া জেগেছে। বছরের পর বছর ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শত শত ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে এই ঐতিহাসিক প্রাচীন উদ্যানে যেন জেগে ওঠে নতুন জীবনের স্পন্দন। বছরের পর বছর দেখেছি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানে শত সহস্র মুখ। যে মুখে ছিল নবযৌবনের ছাপ, চোখে প্রতিশ্রুতি, মনে নতুন আশা। ইন্টার ইউনিভার্সিটি ইউথ ফেস্টিভ্যালের দিনগুলো দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে সত্যিই স্মরণীয়।

শত সহস্র মাইল দূর থেকে যে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাঁদের সামাজিক জীবনের একটা ছোট্ট ছবি এঁকে দিয়েছেন অল্প ক'দিনের প্রবাসবাসে, লাভটা বোধ হয় তাঁদেরই বেশী হয়েছে। একটা সমাজের ছবি দেখিয়ে তাঁরা দেখেছেন বাকী বিভিন্ন প্রান্তের সমাজ-চিত্র। সমস্ত ভারতবর্ষে এ সাংস্কৃতিক মহা মিলনের এ নব পন্থার তুলনা নেই। ভবিষ্যৎ ভারতে নির্মাণ যাঁদের হাতে, অল্পক্ষণের জন্য হলেও তাঁরা বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি ভাষা, সমাজ-চিত্রের সাথে পরিচিত হবার একটা সুযোগ পান।

এঁদের ভিতর দিল্লীতে হয় তো আর কেউই কখনও আসবেন না হয় তো বা কেউ আসবেন। কেউ আসবেন শাসন কর্তার চাপরাশ হাতে কেউ আসবেন সাধারণ বেতনভোগী চাকুরে হিসাবে। তাতে কিছু যায় আসবে না, এই ক্ষণমিলনের শুভফল সুদূরপ্রসারী। পাঞ্জাবের কথা উঠলেই মনে পড়বে পরিচিত বন্ধুদের ভাংগ্‌রা নৃত্যের প্রাণপ্রাচুর্য কেরালার কথায় মনে পড়বে কথাকলির দৃশ্য, বাংলার কথা উঠলে মনে পড়বে বিস্মৃতপ্রায় বান্ধবীর মধুকণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীতের আমেজটুকু তাই তালকটোরার শূন্য উদ্যানে বসে আজ নানা কথাই মনে পড়ছিল।

আজ আর কেউ তালকটোরায় বড় একটা বেড়াতে আসেন না। কোন একদিন ছিল এই তালকটোরা আকর্ষণে দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র কলেজ থেকে, মসীজীবী দপ্তর থেকে এক নিঃশ্বাসে এই কটোরা উদ্যানে আসার জন্য প্রহর গুণতো। ফুটবল বাঙ্গালীর প্রাণ। দিল্লীতে সে ফুটবলের জন্ম এই তালকটোরা উদ্যানে।

সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় মহেন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতায়। একপ্রান্তে বাংলা থেকে

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

শুরু করে অপর প্রান্তে বেলুচিস্থান পর্যন্ত এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশ বিদেশ থেকে খেলোয়াড়ের দল এসে সমবেত হন এই তালকটোরা উদ্যানে। সর্বভারতের চারটি প্রতিযোগিতার ভিতর অন্যতম গণ্য হয়। এ প্রতিযোগিতা ক্রীড়াক্ষেত্রে সেদিন দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী এক আভিজাত্যপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশনের জন্মদাতা বঙ্গসন্তান। দিল্লীর ফুটবল জগতের নেতৃত্ব আজও বাঙ্গালী

ঐতিহাসিক তালকটোরা উদ্যানে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মিলনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সমবেত নৃত্য।

ছাতে। আজকাল শ্রীযুত অনিল চন্দ হলেন দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্ণধার। রাইসিনা স্পোর্টিং হল গত তিন বছরের 'রেইনিং চ্যাম্পিয়ান।'

দিনে দিনে ফুটবল প্রীতি সংক্রামক ব্যাধির মতন অবাঙ্গালী ক্রীড়া-মোদীকেও আক্রমণ করেছে। তবুও খেলার মাঠের ত্রিশ হাজার দর্শকের ভিতর আজও আপনি দেখতে পাবেন অন্তত কুড়ি হাজার বাঙ্গালী দর্শক।

আজকাল আর তালকটোরা উদ্যানে ফুটবল ম্যাচ খেলা হয় না। আজকাল ম্যাচটা খেলা হয় কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে, রাজঘাটে যাবার পথে দিল্লী গেটের সংলগ্ন মাঠে। দর্শক সংখ্যা কলকাতার সংখ্যার সমান না হ'লেও উত্তেজনার আধিক্য কম হয় না। এখানেও দর্শকের উৎসাহ আতিশয্যে বৃক্ষশাখা ভেঙ্গে পড়ে। এখানেও খেলার ফলাফলের উপর গোলমার্কেটের মাছের দাম কম বেশী হয়। মিষ্টির দোকানে ভীড় হয়।

ফুটবল উৎসাহীর সংখ্যা দিল্লীতেও নেহাৎ কম নয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের বা একাডেমিক কাউন্সিলের সভা স্থগিত করে পরে ডাকা হয়, যদি সেদিন কলকাতার টিমের খেলা থাকে। বিশ্বাস না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন্ অব্ দি ফ্যাকালটি অব্ সাইন্সের ডক্টর রমেশ মজুমদার মশাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

খেলার মাঠে ডাক্তার তৈরী হয়ে বসে থাকেন খেলোয়াড়দের জন্য নয়, দর্শকদের জন্য। খেলার পর খেলোয়াড়দের যেমন মালিশ করা হয়, ঠিক তেমনটি গলাতে 'থ্রোট পেইন্ট' লাগাতে হয় শত শত দর্শকদের—অধ্যাপক দিলীপ সান্যালের তো বটেই তবে হ্যাঁ এ খেলাগুলো ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের হওয়া চাই। এরিয়ান্স বা রেলের টিম হলেও খেলায় খানিকটা প্রাণ এসে পড়ে—।

একবার সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবকে দিল্লীর মাঠে খেলা দেখতে নিয়ে গিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম। ফাইনাল ম্যাচ—ইষ্টবেঙ্গলের সাথে গোর্খার। দু'টোই জব্বর টিম। লোকে লোকারণ্য। হাজার ত্রিশেক দর্শক। বাঙ্গালীর সংখ্যা হাজার পনেরো। চারিদিকে ভয়ানক উত্তেজনা। হঠাৎ সৈয়দ সাহেব বলে উঠলেন, "শিটি মারো। দেখছো কি?"

আমি জানালাম, 'আমার শিটি মারা আসে না।

সৈয়দ সাহেব বললেন, আরে বাপু মুখে আঙ্গুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারো, তাহলে ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে এসেছো কেন? রবিঠাকুরের 'ডাকঘর' দেখতে গেলেই পারো।

সৈয়দ সাহেব কিন্তু মুখে আঙ্গুল পুরে অবলীলাক্রমে হুইসিলের পর হুইসিল বাজিয়ে চললেন।

ইষ্টবেঙ্গল জিতে নিজেদের চেয়েও দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালীর মানটাই যেন বাঁচিয়ে গেল।

ডুরাণ্ড্ বা ডি সি এম-এর ফাইন্যাল ম্যাচ দেখতে প্রবাসী বাঙ্গালীরা ছুটে আসেন মীরাট, আগ্রা, সাহাদারা, গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ থেকে। হলিডে মুডে আসলেও মাঝে মাঝে ভাঙ্গা মন নিয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের খেলার

ফলাফল শুধু খেলার মাঠেই শেষ হয় না। ফলাফলটা সুদূরপ্রসারী।

কলকাতার টিম হেরে গেলে বহু বঙ্গসন্তান পরদিন দপ্তরে যান না। কলকাতার এই টিমগুলো সম্বন্ধে তাঁরা নিজেদের প্রতিবেশীদের বা দপ্তরের সতীর্থদের সর্বদা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে রাখেন। তাই তাদের পরাজয়গ্লানিটা হজম করতে একটু সময় লাগে।

সুদূর প্রবাসে ইষ্টবেঙ্গল মোহন-বাগান সব এক হয়ে যায়। তবে যদি এই দু'টি টিমের ভিতর ম্যাচটা পড়ে সেদিন খেলাটা যেন জমে ওঠে। মাঠের ওপরের চেয়েও সেদিন খেলাটা যেন বেশী জমে মাঠের বাইরে! সেদিন শতকরা নব্বুইজন দর্শক হল বঙ্গ-সন্তান। বাকী দর্শক খেলা দেখতে আসেন না, তাঁরা দেখতে আসেন গ্যালারিগুলো। সত্যিই দেখবার মতনই দৃশ্য বটে।

একাধিকবার আমাকে পরিচিত হতচিত্ত দর্শককে গাড়ীতে বসিয়ে তাঁদের নিজ নিজ বাসাতে পৌঁছে

বারো বছর আগেও খেলার মাঠে কোন ভীড় হতো না। আন্তর্জাতিক প্রথম এশিয়ান গেমস (১৯৫১) এর ফুটবল খেলার (আফগানিস্থান বনাম ভারতবর্ষের) একটি দৃশ্য :

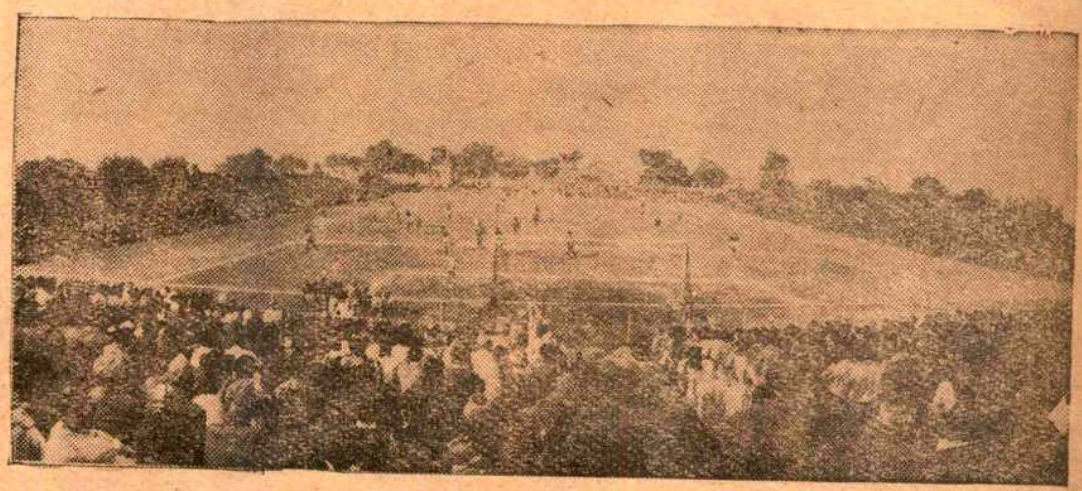

দিল্লীতে ডুরাণ্ড ফাইন্যালের একটি দৃশ্য

দিতে হয়েছে। তাতেও তাঁরা খুশী নন। মাঠে মারা গেলেই যেন প্রাণটা ওঁদের বেঁচে যেত।

একবার ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের খেলাটা ঠিক যেন জমে উঠছিল না। মাঠের একজন দর্শক খেলোয়াড়দের উপদেশ দিলেন টিকিট কেটে কলকাতায় ফিরে যেতে।

আর যাবে কোথায়?

দেখতে দেখতে দু' দশ পঁচিশজন বেচারাকে আক্রমণ করলো। বেচারা উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নিবেদন করল এই কি সেই প্রতাপশালী বেঙ্গল টাইগার ইষ্টবেঙ্গলের খেলা, যাদের ভয়ে কলিকাতার কেন বাইরের টিমগুলো থরহরি কম্পমান? এই কি তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড?

অবাক কাণ্ড। তাইতো টিকিট কাটতে বললে কি হয় এও তো ওদের দলে। দর্শকদের সবাই মিলে তার সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ঠিকই কইছেন। হ্যাঁ দাদা টিকিট কাটে কইলকাতার টিকিট কাটো!

এই তো গেল খেলার মাঠে।

খেলার মাঠের বাইরের ফলাফলটা দু' রকম। একটা বাড়ীতে—এটা হচ্ছে সম্প্রতি। আর একটা দপ্তরমহলে, ক্লাবে পথে, ঘাটে। দপ্তরমহলের ফলাফলের বর্ণনাটা তো আগেই দিয়েছি। এবার বাড়ীতে খেলার ফলাফলের কথাটা বলি।

মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল তো কর্পোরেশন গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেললো, একদল জিতলো অপর দল হারলো। দু'দলই 'মতিমহলে' মুর্গা মসল্লম, কাবাব, বিরিয়ানি, কোপ্তার ফিষ্ট করে নয়াদিল্লী কালীবাড়ীতে সংবর্ধনা সভায় যোগদান করে (পরাজিত দল অবশ্যই অনুপস্থিত থাকবেন) কলকাতায় চলে যাবেন, এ দিকে কত ঘরে তাঁরা অন্তর্বিবাদের বীজ ছড়িয়ে গেলেন তাঁরা সে খবর রাখেন কি?

ইষ্টবেঙ্গলের সাপোর্টারের নতুন সম্বন্ধ হয়েছে পরিণয়সূত্রে। মোহনবাগান কুটুমদলের ক্লাব। 'তকল্লুফের' জন্যও অন্তত ভদ্রতার খাতিরে তাই ইষ্টবেঙ্গলের কট্টর সাপোর্টারও মোহনবাগানকে সমর্থন করে চলে। অপর পক্ষে মোহনবাগানের সাপোর্টার

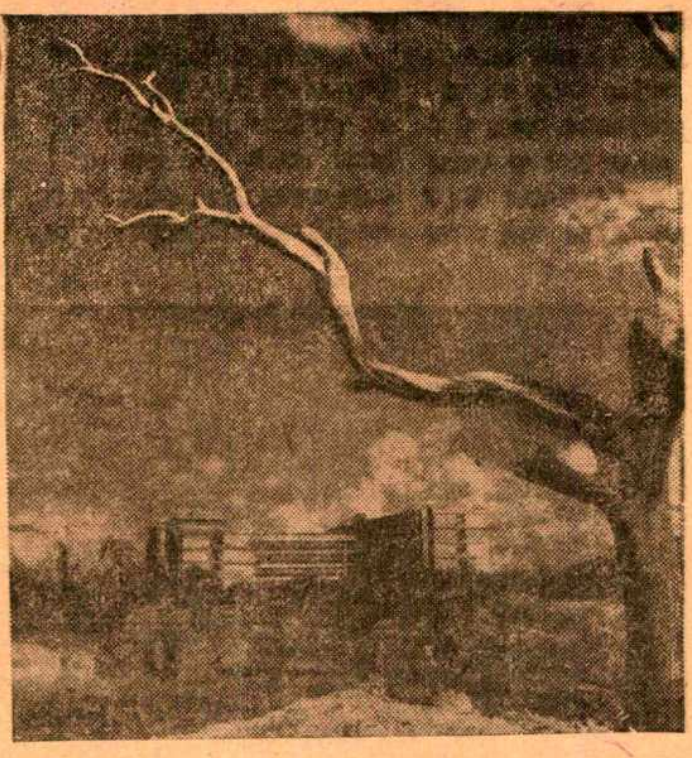

নয়াদিল্লীর একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের (সেণ্ট্রাল রেভিনিউ) আফিস

নয়াদিল্লী গড়ে উঠছে পুরোনো ধ্বংসস্তূপের ওপর। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিকতম সৌধরাজি আজ নয়াদিল্লীকে নতুন রূপ দিচ্ছে

দর্শিকা নতুন আত্মীয়দলের ক্লাব ইষ্টবেঙ্গলকে সমর্থন করে চলেন। কিন্তু জব্বর একখানা 'সীন' হয় যখন চুণী গোস্বামী বা বলরাম গোলের ভিতর একখানা গোল ঢুকিয়ে দেন।

কুটুমের ফুটবল টিম হলে কি হবে মেঘাচ্ছন্ন সমথিকার গলা দিয়ে ইলিশমাছের ঝোল নীচে নামতে চায় না। বাড়ীটাতে একটা গুমোট ভাব যেন ছেয়ে থাকে। মনে হয় দমটা বুঝি বা বন্ধ হয়ে এলো। এর থেকে বোধ হয় ইষ্টবেঙ্গলের না জেতাই ভালো ছিল। রেফারীর নিন্দে করে, গোলটাকে 'অফ্ সাইড্' ডিক্লেয়ার করে বাড়ীতে তখন মান ভাঙ্গাতে হয়। এটা 'মান ভঞ্জনের' নতুন সংস্করণ।

অপর পক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দল হেরে গেলে বাড়ীতে মিষ্টির প্রাচুর্যটুকু যেন হঠাৎ একটু বেড়ে যায়। সে মিষ্টি কিন্তু গলা দিয়ে নীচে নামে না কিছুতেই। ধর্মসঙ্গিনী তখন নানা পন্থা অবলম্বন করেন বাড়ীর আবহাওয়াটুকু হাল্কা করতে। নেহাৎ যখন কোনোটাই খাটে না তখন তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেন "ক করে জিতবে বলো? ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়ই বলো আর যাই বলো খেলোয়াড়রাও মানুষ তো? সারাটা দিন কুতুবমিনার, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ ঘুরে বেড়ালে গোল দেবার এনার্জি থাকে? দেখো তো মোহনবাগান ক্লাবকে। কালীমন্দিরে কেমন করে মাথা খুঁড়ছিল। নেহাৎ মা কালীর দয়ায় এ যাত্রায় ওরা জিতে গেল। যাই বলো না কেন খেলেছিল ইষ্টবেঙ্গলের বীরবাহাদুর, বাহাদুরই বটে।"

ভাবতে পারেন দিল্লীতে ফুটবল কতখানি আসর জমিয়ে বসেছে!

বঙ্গদর্শন

কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া। কোলকাতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে নদীয়া জেলার গঙ্গার ধারে এই গ্রামটি একদিন নগরীর মর্য্যাদা পেয়েছিল। আজ থেকে ৫২৩ বছর আগে এখানে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল একদিন তাঁর কাব্যের আস্বাদ পেয়ে সমগ্র বঙ্গবাসীই গৌরব অনুভব করতো। শুধু তাই নয়, মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণের কাহিনী বাংলার সমাজ-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন কৃত্তিবাস। আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত হয়। বাঙ্গালী সংস্কৃত মহাকাব্যের আস্বাদ পেয়েছে শুধু নয়, নিজের সামাজিক জীবনও অনেকাংশে গড়ে তুলেছিল বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের কল্যাণে।

নদীয়া জেলার বর্ত্তমান ফুলিয়া ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি আদি ফুলিয়া গ্রাম আজ অবহেলিত। একদিনের ঘনবসতিপূর্ণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ ফুলিয়া গ্রাম নগরীর মর্য্যাদা পেয়েছিল। শুধু বাংলা দেশ নয়—দূর দূরান্তর থেকে আসতো কত লোক। এখানকার তাঁতীর তৈরী বয়ড়ার উড়ুনী বাঙ্গালীকে আভিজাত্যের মর্য্যাদা দিয়েছিল।

আর একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শেও এই গ্রাম ধন্য হয়েছিল। এই ফুলিয়াতেই যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের বন্ধনে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখী বন্ধন করেছিলেন।

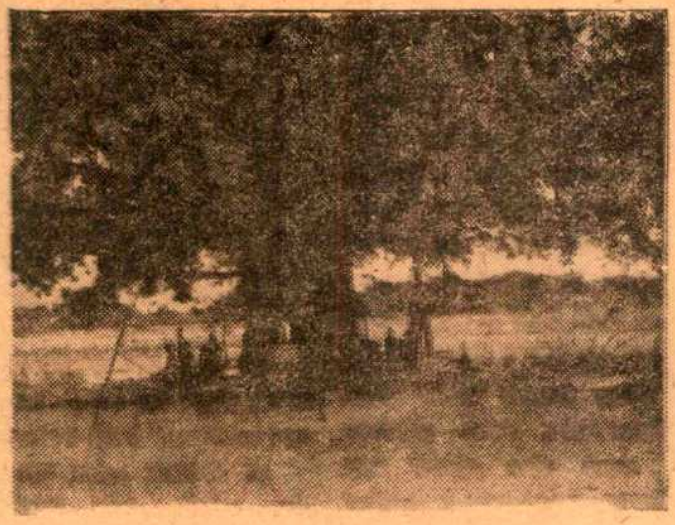

এই বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

আজকের ফুলিয়া ষ্টেশন থেকে নেমে কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমির কথা জিজ্ঞেস করলে সেখানের অনেক লোক হয় তো তার নিশানা দিতে পারেন না।

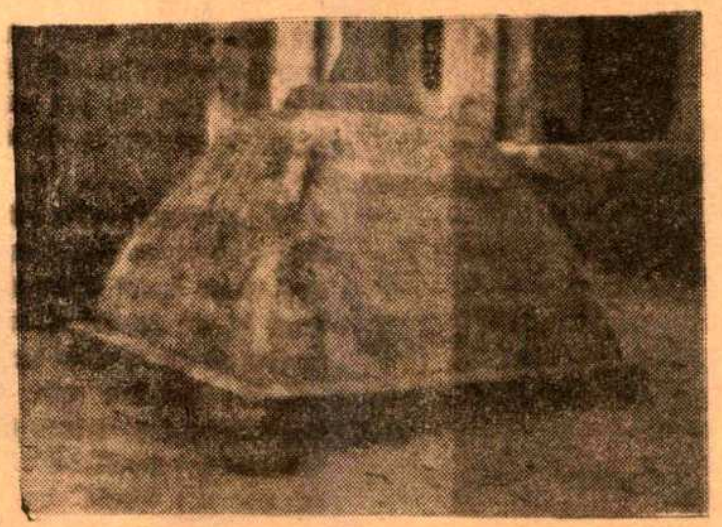

মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি ও তাঁর পেছনে যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাসের সাধনস্থল আজ অবহেলার মধ্যে প'ড়ে আছে।

ফুলিয়া বলতে আজকের লোক নব গঠিত ফুলিয়া উপনগরীর কথাই মনে করে। তখনকার দিনের বইচা, উদয়পুর, পরেশপুর ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে বর্ত্তমান উপনগরী ফুলিয়া গঠিত হয়েছে। এখানে বাস করেন পূর্ব্ববঙ্গ থেকে ভিটে-মাটি হারা হয়ে চলে এসেছেন এমন বহু সহস্র উদ্বাস্তু পরিবার। এঁদের স্থায়ী পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যেই নূতন উপনগরী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। বিজ্ঞানের দানে সমৃদ্ধ হতে চলেছে বর্ত্তমান উপনগরী। এখনকার বাসিন্দাদেরও অভাব অভিযোগ আছে। আজো সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু পরিবারের আর্থিক পুনর্ব্বাসন প্রশ্নের বিষয়বস্তু। তবু ভরসা আছে, আছে সরকারী পরিকল্পনা। দোষ ত্রুটি কাটিয়ে একদিন এই উপনগরী হয় তো নগরীর মর্য্যাদা পাবে।

কিন্তু কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান—ব্রহ্ম হরিদাসের সিদ্ধিক্ষেত্র ফুলিয়া বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। গঙ্গার ধারে ছিল কবি কৃত্তিবাসের বসতবাটি। কালপ্রবাহে গঙ্গা চলে গেছে অনেকদূরে। সেদিন গঙ্গার ধারে নিজ বসতবাটির কাছেই একটা বটগাছের তলায় বসে কবি কৃত্তিবাস আদি কবি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কতরাত্রি বিনিদ্রভাবে এই বটতলায় তিনি শ্লোকের পর শ্লোক

গেঁথে তাঁর বিচিত্র কাব্যের মালা রচনা করেছেন। আজ এই সুপ্রাচীন বটগাছ দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর সেদিনের সেই সমৃদ্ধময় স্মৃতি মন্থন করে।

আর যে গৃহে কবির জন্ম হয়েছিল, যে ভিটার আলো-বাতাসে কবি গড়ে উঠেছিলেন আজ সে বসতবাটি বিস্মৃতির অতলে। কৃত্তিবাসের বসতবাটির ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গ্রামের পুরাতন বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে আর অন্যান্য নিদর্শন দেখে আনুমানিকভাবে তাঁর বসতবাটির নিশানা ঠিক করা হয়েছে। কয়েক বৎসর আগে এই স্থানে একটি স্মৃতিফলকও স্থাপিত হয়েছে।

ফুলিয়া গ্রামের পুরাণো অধিবাসীদের ধারণা এখানে মৃত্তিকাগর্ভ খনন করলে কবির পরিচয় বহন করার অনেক জিনিসপত্র ও তথ্যাদির সন্ধান মিলতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কোন পক্ষ থেকেই করা হয় নাই। এই বসতবাটির কাছে কবির সমাধিস্থল বলে পরিচিত স্থানটিও আজ অবহেলায় পড়ে আছে।

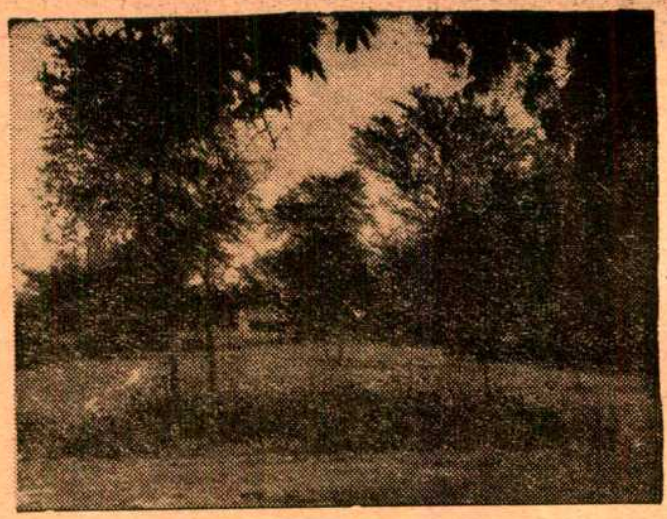

এইখানেই কবি কৃত্তিবাসের আদি বসতবাটি ছিল। কিন্তু আজ তার ধ্বংসস্তূপেরও চিহ্ন নেই। এই জমির উপরই সরকার কর্তৃক "মেমোরিয়াল কাম মিউজিয়াম" তৈরী করার কথা।

যে বটগাছের ছায়ায় বসে কবি তাঁর রামায়ণ রচনা করেছিলেন অনেকেরই ধারণা সে গাছ আজ আর নেই। এখন যে গাছটি আছে পণ্ডিতেরা মনে করেন সেটি ঐ পুরাতন বটগাছের শাখা গাছ।

বৎসর বৎসর আজো দায়-সারা গোছের কবি স্মৃতি দিবস পালিত হয় কিন্তু ফুলিয়ায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন আয়োজনই চোখে পড়ে না। তিন বৎসর আগে কবির জন্মস্থানে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি "মেমোরিয়াল-কাম-মিউজিয়াম" স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু কাজ সুরু হওয়ার কোন নিদর্শনই পাওয়া যাচ্ছে না।

জনবসতি এই গ্রামটি আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কবির নামে স্থাপিত একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছাড়া এই গ্রামের কোন সমৃদ্ধিই আজ নেই। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে রাণাঘাট থেকে তারাপুর-নীলনগর পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা চলে গেছে বটে কিন্তু গ্রামের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পথ আজ বিপন্ন

গ্রামের অধিবাসীদের দিন কাটাতে হয় দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে। সেচের কোন ব্যবস্থার অভাবে জমিতে ফসল ফলছে না বলে প্রধানতঃ কৃষিজীবী অধ্যুষিত এই গ্রামটির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। মাত্র তিন মাইল দূরে গড়ে উঠছে আধুনিক পদ্ধতিতে নূতন উপনগরী। সেই উপনগরীর সঙ্গে সঙ্গে কবি-কৃত্তিবাসের জন্মভূমি আর ব্রহ্ম হরিদাসের সাধনাক্ষেত্র ফুলিয়া গ্রামের উন্নতি আজ শুধু ফুলিয়ার অধিবাসীদের নয়, যে কোন বাঙ্গালীরই কাম্য।

কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিফলক

সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলন

অজিতকুমার বিশ্বাস

ব্যক্তিবিনাশী কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থাকে সবচেয়ে ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখেন শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজ। কেন না ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজন তাঁদেরই বেশী কম্যুনিজমের সর্বগ্রাসী ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে বাংলা দেশের অনেক সাহিত্যিকই মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন। চীনের ভারত আক্রমণের পর সেইরূপ অন্য এক আয়তনে দেখা দেয় তাঁদের কাছে। এই সংকটের সময় দেখা গেল ভারতের কম্যুনিজমও দেশপ্রেম রহিত। দেখা গেল কম্যুনিষ্ট দলের একটি বড় অংশ পঞ্চমবাহিনী-সুলভ ঘৃণ্য কর্মকে তাদের পরম কর্তব্য কাজ মনে করছে।

বাংলা দেশের একদল অগ্রগণ্য শিল্পী ও সাহিত্যিক ঠিক করলেন দেশের এই সংকটের সময় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে

শ্রীকৃ-না-সুব্রমনিয়ম

শ্রীবালকৃষ্ণ রায়

জানাতে হবে "কম্যুনিজম তত্ত্বের দিক থেকে ভ্রান্ত, আদর্শের দিক থেকে ভ্রষ্ট, শ্রেয় ও নীতিবোধের দিক থেকে বিকৃত এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে এ যুগের সবচেয়ে বলবান ও হৃদয়হীন হন্তারক।" সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হ'ল 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ।' সমাজের কাজে এগিয়ে এলেন বাংলার শীর্ষস্থানীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক, আগ্রহ দেখালেন ছোট-বড়-মাঝারি লেখক সম্প্রদায়।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে কলকাতা সহরে ডাকলেন জনসভা! একটি পুস্তিকাও ছাপা হ'ল। দু'টোর অভূতপূর্ব সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আয়োজন করা হল সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন। সংকটকালীন যে চিন্তা বাংলা দেশের লেখককুলকে ভাবিয়ে তুলছে, সেই চিন্তা-ভাবনায় অন্য রাজ্যের সাহিত্যিকরাও আক্রান্ত কি না জানা দরকার। দরকার ভাবনার বিনিময়ের। কেন না, সীমান্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকলেও ঘরের ভেতরে ভাবনার ক্ষেত্রে আপাতত যুদ্ধ বিরতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ডাকে সাড়া দিলেন অন্য রাজ্যের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সহযোগিতায় ২৮, ২৯ ও ৩০শে মার্চ বসল সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন। গুজরাট থেকে এলেন উমাশঙ্কর যোশী, ওড়িষ্যা থেকে নিত্যানন্দ মহাপাত্র, মাদ্রাজ থেকে কা না সুব্রাহ্মণীয়ম, উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রী সি, বি, রাও এবং উর্দু সাহিত্যের ডক্টর হীরালাল চোপরা, তা ছাড়া বক্তা হিসেবে উপস্থিত হলেন বাংলা দেশের নামকরা কয়েকজন অগ্রগণ্য মনীষী সাহিত্যিক। সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদা দত্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, দক্ষিণা রঞ্জন বসু প্রভৃতি। বক্তৃতা দিলেন তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আলোক সরকার। মোটামুটি প্রতি-নিধিমূলক সমাবেশ।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ জানান শ্রীঅশোককুমার সরকার। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লিখিত ভাষণও পাঠ করা হয় এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন সুকমলকান্তি ঘোষ।

সন্তোষকুমার ঘোষের উপর ভার পড়েছিল স্বাধীন সাহিত্য সমাজের রুক্তব্য তুলে ধরার। শ্রীঘোষ বলেন, চীনের ভারত আক্রমণের পর আমরা ভাল করে টের পেলাম খোলা জানালা দিয়ে ভয়াবহ পরধর্মী হাওয়ার হামলা দীর্ঘকাল চলছে। আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনা চুরমার করে দিতে হাতিয়ার বাড়িয়েছে। দেখতে পেলাম আমাদের মাটির মত আমাদের মনও আক্রান্ত। বাহির দুয়ারে কপাট লাগানোর ভার জওয়ানেরা নিয়েছেন, ভিতরের দুয়ার আঁটসাঁট করার ভার আমাদের হোক। দরজায় শুধু পাহারাওয়ালা না বসিয়ে কি বাড়ির ভিত আর দেওয়াল মজবুত করতে হবে। এবং সেই কারণেই সমাজ, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিন দিন ছিল তিনটি আলোচনার বিষয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতির সংকট। প্রতি দিনের আলোচনায় একটি সুরই বাজতে থাকে। সেই সুর বারবার বলে দেয়, চিন্তার স্বাধী-নতা চাই, প্রকাশের স্বাধীনতা চাই।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র

শ্রীউমাশঙ্কর যোশী

স্বাগতভাষণে শ্রীঅশোককুমার বলেন, ফরমায়েশ মত সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যিকদের প্রধান সম্বল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। উমাশঙ্কর যোশী, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদা দত্ত প্রমুখ বক্তারাও বলেন, কোন কিছুর অজুহাতে চিন্তার স্বাধীনতাকে নষ্ট করার অর্থ বিনাশ ঘটানো।

তিন অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন সাত আট হাজার শ্রোতা। সম্মেলন সমাপ্তির পর সকলের মুখেই একটি কথা ধ্বনিত হয়—চিন্তার স্বাধীনতা চাই এবং তার জন্যে চাই দৃঢ় সংকল্প ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে ব্যক্তি-বিনাশী পরধর্মী হাওয়াকে রুখতে হবে।

আন্তর্জাতিক

পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ

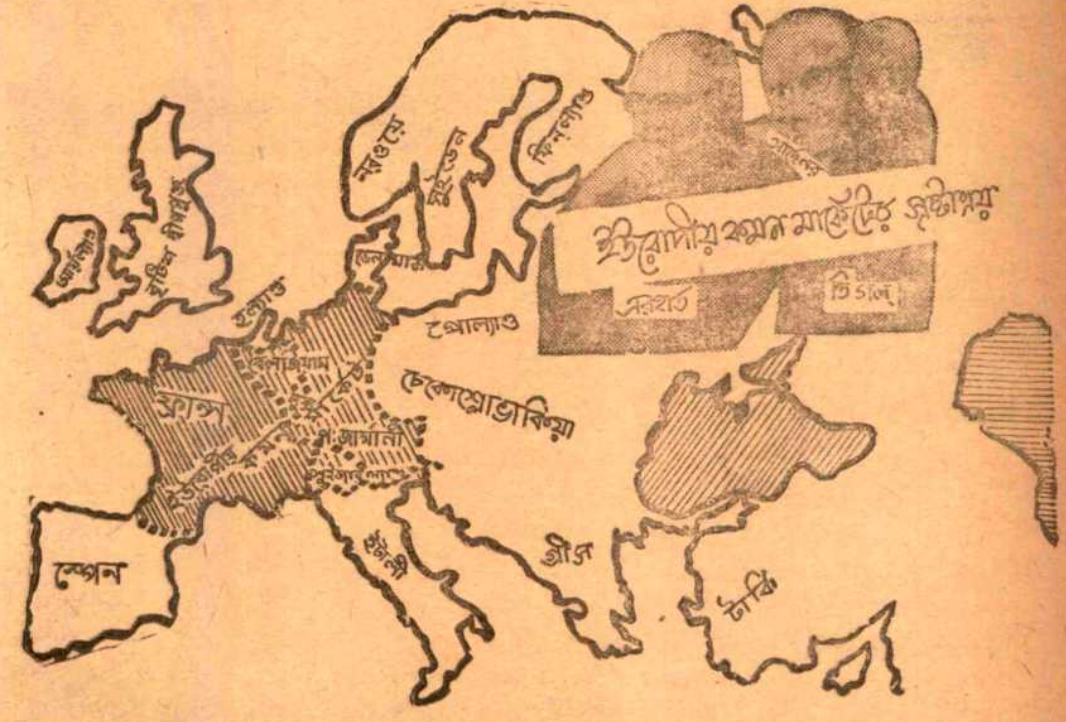

দ্য গল

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ;

ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার ও তাতে ইংলণ্ডের প্রবেশাধিকার নিয়ে ফ্রান্সের অনমনীয় বিরোধিতা সারা পশ্চিম ইয়োরোপব্যাপী এক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। ইতিমধ্যে এই বাজারের চেহারা ও চরিত্রের দ্রুত রূপান্তরও বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

১৯৫৭ সালে রোম-চুক্তির দ্বারা ছয়টি ইয়োরোপীয় দেশ, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণী, ইতালী বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ এবং হলেণ্ড, যখন একটি সাধারণ বাজারের গোড়া পত্তন করে, তখন ব্যবসাক্ষেত্রে শুল্ক ও বাণিজ্য বিধির একটা সাধারণ নীতি মাত্র এরা অনুসরণ করবে বলে 'ঠিক' করা হয়, যাতে নিজেদের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যে কতকগুলি সুবিধা এদের থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলি একটা অধিকতর সংহত অর্থনৈতিক সংস্থারূপে সাধারণ বাজারকে পশ্চিম ইয়োরোপে দাঁড় করানোর দিকে এগিয়ে চলল যার উদ্দেশ্য বাজার বহির্ভূত দেশগুলির প্রতি ব্যবসার দিক থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ করা। পশ্চিম ইয়োরোপের সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির যুদ্ধ পরবর্তীকালের অভূতপূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধি এই জোটবদ্ধ একচেটিয়া ব্যবসায়িক ঝোঁকের জন্য দায়ী।

বৃটেন প্রথমে সাধারণ বাজারে যোগ দেয়নি। কিন্তু পরে যখন সে হিসেব করে দেখল যে, সাধারণ বাজারে যোগ না দিলে পশ্চিম ইয়োরোপের সমৃদ্ধ বৈভব থেকে সে বঞ্চিত হবে তখন সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠল। কমনওয়েল্থ্ দেশগুলি নিষেধ করেছিল বৃটেনকে। বৃটেন শুনল না। কিন্তু বেঁকে বসল ফ্রান্স। ফ্রান্স বৃটেনকে সাধারণ বাজারের পূর্ণ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী নয়। ফ্রান্সের দ্য গল্ মনে করেন সাধারণ বাজারে বৃটেনকে প্রবেশ করতে দিলে ফ্রান্স পশ্চিম ইয়োরোপে আর নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ বাজার কমিশন কতকগুলি

ডঃ কে এডেনয়ার

নিয়মের খসড়া রচনা করে। পরবর্তী ধাপে কী ভাবে সাধারণ বাজার সদস্য রাষ্ট্রগুলি অগ্রসর হবে তার প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় সার্বভৌমত্বের অনেকটা বিসর্জন দিতে হবে, আর একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক সাধারণ কাঠামোর ভিতর দিয়ে এমনভাবে চলতে হবে এদের, যে এই সাধারণ বাজার শুধু তাঁদের ঘরোয়া অর্থনীতিতেই হাত বাড়াবে তা' নয়, বাইরের জগতের চাপের বিরুদ্ধেও আশ্রয় মিলবে এর ভিতর। সাধারণ বাজারের কাঠামোর মধ্যে পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে মিতালির বন্ধন আরও দৃঢ়তর করার প্রয়াসে ফ্রান্সের স্তু গল উঠে 'পড়ে' লেগেছেন। অবাধ মূলধন লগ্নী ও মজুর লেন-দেন এর উদ্দেশ্য। এ' বছরের জানুয়ারী মাসে পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে ফ্রান্সের একটা রাজনৈতিক ও রণনৈতিক সন্ধি হয়েছে এবং যে ভাবে চিরকালের শত্রু এই দুই দেশ ক্রমশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চলেছে তা' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটো গোষ্ঠীতে এ্যাংলো-আমেরিকার প্রভাবের বিরুদ্ধে এ' ভাবে একটা শক্ত দেয়াল দাঁড় করানোই প্রেসিডেন্ট স্তু গলের মনোমত অভিপ্রায়।

ফ্রান্সের স্তু গল আর কানাডার ডিফেন বেকার সম্প্রতি প্রকাশ্যেই আমেরিকা বিরোধী অভিযানে নেমেছেন। যদিও এর মূলে মৌলিক কোন নীতি জড়িত নয় ততটা, যতটা রয়েছে ব্যক্তিত্বের অহমিকা জনিত সংঘাতের প্রকোপ।

পশ্চিম জার্মাণী ঃ

আর পশ্চিম জার্মাণীতে মতান্তরের তরঙ্গ উঠেছে চ্যান্সেলার এডেনয়ার ও ভাইসচ্যান্সেলার এরহার্ডের মধ্যে। এরহার্ডকেই বলা চলে পশ্চিম জার্মাণীর বর্তমান সমৃদ্ধ জীবনের একক ভাস্কর। অর্থনীতিতে তিনি প্রায় যাদুর ভেল্কী দেখিয়েছেন বলা চলে। শাসক দল ক্রীশ্চিয়ান ডিমক্রেটিক ইউনিয়নের নেতা হিসাবে যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মাণীকে তিনি যেভাবে গড়ে তুলেছেন তা' বিস্ময়কর। এডেনয়ারের

পশ্চিম জার্মাণীর অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক এরহার্ড

উত্তরাধিকারী বলেই তিনি চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে নাটো সংস্থাকেই অধিকতর শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাই নূতন ফরাসী জার্মাণ চুক্তির সমালোচনায় তিনি অত্যন্ত মুখর। স্তু গলের আমেরিকা বিরোধী নীতিরও তিনি কঠোর সমালোচক। পশ্চিম জার্মাণীর রাজনৈতিক আবহাওয়া তাই একাধারে জটিল ও ধোঁয়াটে বলেই মনে হয়।

পূর্ব জার্মাণ সরকারে নাজী অফিসার ঃ

পশ্চিম জার্মাণীর পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, পূর্ব জার্মাণ সরকারী দপ্তরে বহু-সংখ্যক নাজী ও ফ্যাসিষ্ট উচ্চপদে এখনও বহাল রয়েছে। তাদের ভেতর কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল।

(১) কৃষিমন্ত্রী রিসেন্ট। ইনি ১৯৪৩ সালে নাজী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

(২) শিক্ষামন্ত্রী বেন্ট্ জিন। ইনি নাজী পার্টির সভ্য হন ১৯৪৪ সালে।

(৩) নৌ-বাহিনীর সর্বাধ্য রিয়ার এড্মিরাল ন্যুকারচু, যাকে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে স্পেনে যুদ্ধ করার জন্য স্বয়ং হিট্লার সম্মানিত করেছিল।

(৪) বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কেগেল, যিনি নাজী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালে।

(৫) ভূতপূর্ব নাজী ব্রেক এখন পূর্ব-জার্মাণ প্রধানমন্ত্রীর প্রচার বিভাগের অধিকর্তা।

পশ্চিম জার্মাণীতে ভারতীয় ছাত্র

১৯৬১ সালে পশ্চিম জার্মাণীতে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৪২০ জন। ভারতীয় ছাত্র ও গবেষকদল পশ্চিম জার্মাণীর ফিসার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের অতিথি হিসাবে অনেক মূল্যবান তথ্যের অধিকারী হয়েছে। পশ্চিম জার্মাণীর এই মৎস্য-গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর যার পরিমাণ ৪১০ কোটি টন।

ইস্রাইল ঃ

এক ধরণের উন্নত সাব-মেশিন গান উৎপাদনে ইস্রাইল আজ প্রায়

তীয়। এক ধরণের প্যারাস্যুটও
ী করতে সক্ষম হয়েছে ইস্‌রাইল
ঘারা ইচ্ছামত নামার গতি নিয়ন্ত্রণ
চলে।

মেরিকা :

আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্যের
মাণ আগামী আর্থিক বছরে প্রায়
কোটি টাকার মত কমে' গেলেও
তকে দেয় সাহায্যের পরিমাণ
বে বলে' মনে হয় না। বিশেষ
র চীনের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে
তের আত্মরক্ষামূলক সাহায্যের
তশ্রুতি আমেরিকা দিয়েছে তা সে
লন করবেই।

আমেরিকার আর একটি উল্লেখ-
গ্য উন্নতির ক্ষেত্র কৃষি। খবরে
াশ ১৮৬২ সালে যেখানে
মেরিকার শতকরা ৬০ ভাগ লোক
তে আবদ্ধ ছিল সেখানে ১৯৬২
ল সে হারের পরিমাণ মাত্র শতকরা
ভাগ। কিন্তু তাতে উৎপাদনের

প্রেসিডেন্ট কেনেডি

মাণ কমেনি বরং বেড়েছে।
জন কৃষক ১৮৬২ সালে ৪·৫ জনের
পাতে খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী উৎপাদন
ত। আর ১৯৬৩ সালে তা'
ড় দাঁড়িয়েছে ২৭-এ। কৃষিপণ্যের
র্যতাই আমেরিকাকে বাধ্য করছে
বোধে সাহায্য করতে।

মরক্কোর রাজা ও তাঁর ভগ্নীর
আমেরিকা ভ্রমণোপলক্ষে

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

সেখানে একটা উদ্দীপনার আবহাওয়ার আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে।

ইংলণ্ড :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে একটা মন্দার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পনের বছরেরও ওপর ইংলণ্ড যে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্লাবনে ভাসছিল তাতে

আর এ বাটলার

ভাটা পড়েছে। গত বছরের তুলনায় আরও দু' লাখ বেড়ে এখন বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত লাখ বিশ হাজার। গত সপ্তাহে পার্লামেন্টের দিকে বেকারী মিছিলের সঙ্গে

প্রাক্তন শ্রমিক দলের নেতা স্বর্গত হিউ গেটস্কেল

অশ্বারোহী পুলিশের যে হাতাহাতি সংঘর্ষ হয়ে গেছে সেই ম্যাগনা কার্টার আমলের পর এ যাবৎ আর এরকম কাণ্ড কখনও ঘটেনি ইংলণ্ডে। পরদিন আবার পাঁচ হাজার ক্রুদ্ধ শিক্ষকের এক বিক্ষোভ মিছিলে দাবী জানানো হয়,—মাইনে বাড়াতে হবে। নিঃসন্দেহে টোরি দলের আজ সুদিনের অবসান সূচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে লেবার পার্টিকে এরা ঠেকাতে পারবে বলে মনে হয় না। এ সময় গেটস্কিলের অভাব লেবার পার্টি খুবই অনুভব করছে, তবে তার তরুণ উত্তরাধিকারী উইল্‌সনের প্রতিশ্রুতিও সম্ভাবনায় কম উজ্জ্বল নয়।

ফ্রান্স :

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঁশিয়ে বিদো-কে নিয়ে ওদেশে রীতিমত একটা নাটকীয় পরিস্থিতির চমক খেলে গেল। পলাতক বিদো অনেক রাষ্ট্রের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল, রাজনৈতিক আশ্রয়। এমন কি স্পেনের কাছেও। কিন্তু আশ্রয় দিতে রাজী হল না কেউ। অবশেষে সে ব্রেজিলের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছে, সেই সুদূর আশ্রয়স্থল থেকে দ্য গলের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম চালাবে ব'লে ঘোষণা করেছে।

দ্য' গল আজ পশ্চিম ইউরোপীয় কেন্দ্রের যদিও প্রায় মধ্যমণি বিশেষ, এবং ইংলণ্ডের কাছ থেকে নেতৃত্বের মুকুট ছিনিয়ে নেবার জন্য বদ্ধপরিকর, তবু তার নিজের দেশে, খাস ফ্রান্সে, তাকে আজ গুলী নিরোধক গাড়ীতে চড়ে' যাতায়াত করতে হচ্ছে। জীবন তার নিরাপদ নয়। গত বছর আগষ্ট মাসে প্যারিসের উপকণ্ঠে তার গাড়ীতে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আক্রমণকারীরা হচ্ছে তার সেই শত্রুদলভুক্ত যারা আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। অবশ্য তারা বলেছে দ্য' গলের জীবন নাশ তাদের কাম্য নয়, তাকে তারা বন্দী করে' বিচার করবে। কিন্তু ফরাসী সরকার সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজী নয়।

এই ফরাসী সন্ত্রাসবাদী দল সারা ফ্রান্সে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এখনও দ্য গল বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। এদের দলে রয়েছে ফরাসী বাহিনীর অনেক প্রাক্তন অফিসার। স্থল, নৌ এবং বিমান এই তিন শাখারই প্রাক্তন অফিসার তারা। আলজেরিয়াকে স্বাধীনতাদানের ঘটনাকে এরা কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজী নয়। এদের ধারণা দ্য'গল জীবিত থাকতে ফ্রান্সের মুক্তি সম্ভব নয়।

দ্য' গলের শক্তির উৎস কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ, যাদের কাছে যুদ্ধ-পরবর্তী ফ্রান্সের বর্তমান শক্তিমত্তা, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকই হ'ল প্রেসিডেন্ট দ্য'গল। দ্য' গল তাদের দেশকে এক শোচনীয় ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

মিশর :

হিট্‌লারের আমলে যে সমস্ত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক ভি-২ বোমা তৈরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাদেরই একটি দলকে নাকি মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের মিসাইল তৈরীতে নিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে দুটো মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী হয়েছে যার একটার পাল্লা ২৩০ মাইল আর অন্যটির ৩৭০ মাইল। প্রথমটির নাম 'এল্-জাফির' বা জয়। দ্বিতীয়টির নাম 'এল-কাহির' বা বিজয়ী। অস্ত্রগুলির পরীক্ষাও সমাপ্ত হয়ে গেছে। গত ৩রা এপ্রিল প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয় ইস্রাইলের পক্ষে এই ক্ষেপণাস্ত্র-ভীতি নিরসনের জন্য তিনি পশ্চিম জার্মাণ সরকারকে অনুরোধ করবেন কি না যাতে জার্মাণ বৈজ্ঞানিকরা মিশরের এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতিতে আর অংশ গ্রহণ না করে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির জবাব থেকে বোঝা যায়, ইস্রাইল ইতি মধ্যেই পশ্চিম জার্মাণ সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়েছে। চ্যানসেলার আদেনয়ার নাকি চিন্তা করছেন যে মিশর গমনেচ্ছু বৈজ্ঞানিকদের পাশপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় কি না। প্রেসিডেন্ট কেনেডি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে উত্তাপ সঞ্চারিত-হোক তা চান না। এবং সেই জন্যই তিনি ইস্রাইলকে কোন সামরিক সাহায্য দিতেও রাজী হন নি।

ইতিমধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে জনকয়েক ইস্রাইলী গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হ্যারল্ড উইলসন

যে তারা জনৈক জার্মাণ বৈজ্ঞানিকের পুত্রদের ভীতি প্রদর্শন করেছে। উক্ত বৈজ্ঞানিক মিশরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের বিরুদ্ধে আরও

অভিযোগ যে তারা আরও কতিপয় জার্মাণ বৈজ্ঞানিকের অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য পাঠিয়েছে।

আফ্রিকা ঃ

দশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে

মধ্য আফ্রিকার নায়াসাল্যাণ্ড, উত্তর রোডেশিয়াকে নিয়ে মধ্য আফ্রিকার ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। নায়াসাল্যাণ্ডের প্রচুর চাষের জমি ও উত্তর রোডেশিয়ার অফুরন্ত তাম্র-সম্পদ দক্ষিণ রোডেশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পোন্নয়নের সহায়ক হবে—এই অর্থ নৈতিক কারণে ফেডারেশন গঠন করা হয়েছিল।

যখন ফেডারেশন গঠিত হল, সূচনা হল ৬০ লক্ষ কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের উপর ২ লক্ষ শ্বেতকায়ের শাসনের। তখন লেবার সদস্য জিম গ্রিফিথ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সখেদে বলেছিলেন "এ শুধু আগ্নেয়গিরির চূড়োর উপর একটা প্রাসাদ গড়া হল।

মধ্য আফ্রিকার ফেডারেশন আজ ভাঙনের মুখে। শুরুতেই অবশ্য এর শেষের অঙ্ক অনুমান ঠিকই করা গিয়েছিল। উত্তর রোডেশিয়া আর নায়াসাল্যাণ্ডের শ্বেত শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল নেতা সার রয় ওয়েলেন্সকী এক রকম জোর করেই দুটো দেশকে একত্রিত করে ফেডারেশন তৈরী করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের দ্বারা এই অংশের আফ্রিকান জনসাধারণের উপর শোষণের প্রভুত্ব বজায় রাখা।

সার রয় ওয়েলেন্সকী নিজে পোলিশ পিতা-মাতার সন্তান এবং সেই হিসাবে এমন একটা জাতির বংশধর যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে পেয়ে এসেছে শাসনের নামে নিরবচ্ছিন্ন শোষণ ও অত্যাচার। ভাগ্যের পরিহাসে আজ কালো আফ্রিকায় সেই হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ধারক ও বাহক।

কিন্তু তাকেও আজ পিছু হঠিয়ে দিচ্ছে কালো আফ্রিকারই দুই শক্তিমান নেতা, উত্তর রোডেশিয়ার কেনেথ কুণ্ডা আর নায়সাল্যাণ্ডে হেষ্টিংস বান্দা। কুণ্ডার বিচিত্র রঙ্গীন ও রোমাণ্টিক জীবনদর্শনে গান্ধীবাদের প্রভাব প্রায় অপরিমেয়। এই দুই নেতা, কুণ্ডা ও বান্দা, একত্র হাত মিলিয়ে মধ্য আফ্রিকার শ্বেত-শাসনের বিরুদ্ধে এমন এক কীলকাক্রমণের সূচনা করেছেন যে ওয়েলেন্সকীর কোন প্রতিরোধই আর কার্যকরী হচ্ছে না। ইংলণ্ডের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আর, এ, বাটলার ঘোষণা করেছেন যে, অনিচ্ছুক কোন অংশকেই জোর করে' ফেডারেশনে টানা হবে না। কুণ্ডাকে জানানো হয়েছে যে

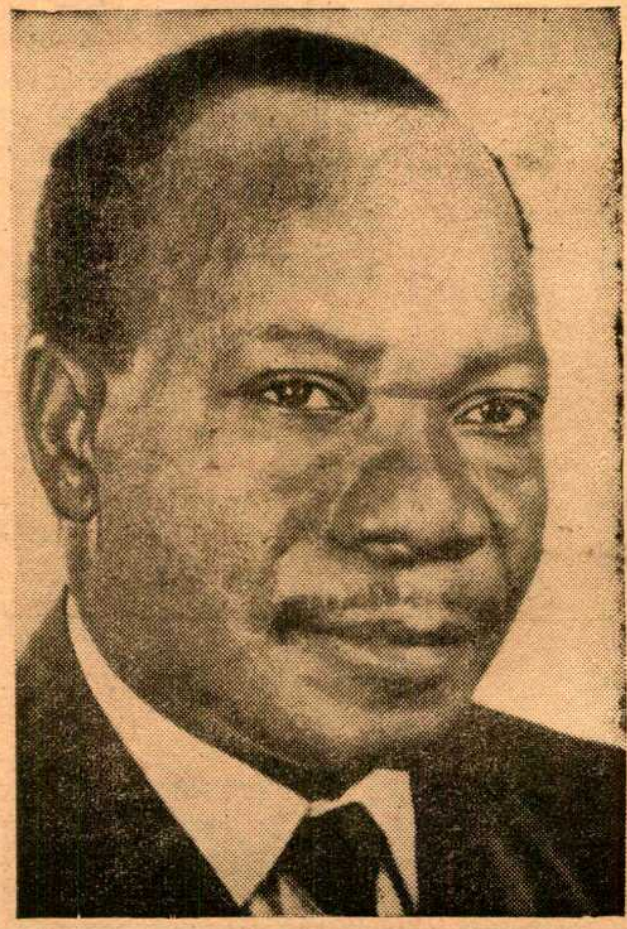

হ্যারি এন কম্বুলা

মধ্য আফ্রিকার ফেডারেশন থেকে নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডিশিয়া ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। সুতরাং এর পরের স্তরেই আশা করা যাচ্ছে যে নায়াসাল্যাণ্ডের মতই উত্তর রোডেশিয়ারও সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করা হবে।

একে একে ঘুমন্ত আফ্রিকার বুকে আজ নবজাগরণের দীপ্তি নিয়ে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র স্বাধীন সত্তায় জেগে উঠছে। ঘানা, সুদান, নাইজেরীয়া টাঙ্গানায়িকা, ফরাসীর আফ্রিকান সাম্রাজ্য, আলজেরিয়া, কেনিয়া, আর এখন নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়া। অবশিষ্টরাও যে যথাসময়ে স্বাধীন হতে পারবে তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আজ আর কোথায়ও অস্পষ্ট নয়।

রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার রয় ওয়েলেনস্কি

কঙ্গো :

ভারতীয় বাহিনী তার যথা কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে সম্প্রতি কঙ্গো থেকে দেশে ফিরে এসেছে। ভারতীয় বাহিনীর অপসারণে কঙ্গোতে যে সামরিক শূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কঙ্গোর পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে বলে মনে হয় না। আদুলার কেন্দ্রীয় সরকার এখনও

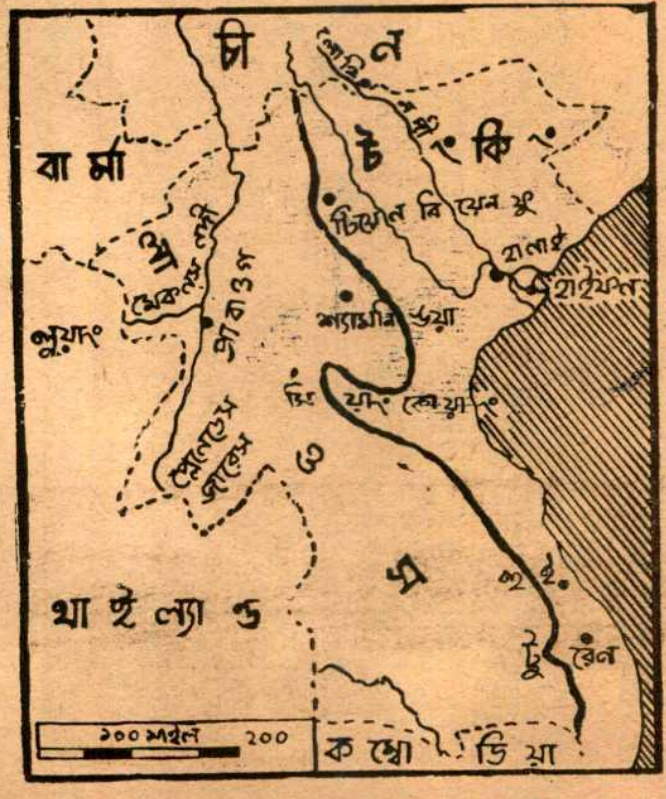

সম্পূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে পারেনি। সৈন্যবাহিনীর স্বেচ্ছাচার এখনও অব্যাহত বললেই চলে। কাতাঙ্গায় এমন দিন যায় না, যেদিন সেখানে সৈন্যদের গুলীতে অসামরিক নাগরিকদের জীবনহানি না ঘটে।

রাষ্ট্র-সংঘের সক্রিয় ব্যবস্থা ব্যতীত কঙ্গোতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের আশা আজও সুদূরপরাহত। কঙ্গো থেকে ভারতীয় বাহিনী সরিয়ে আনার পর যদি রাষ্ট্র-সংঘ তার অন্যান্য সমুদয় বাহিনীকেই সরিয়ে নেয় তবে সেখানে যে অনতিবিলম্বে আবার গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং সারা দেশ-ব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অবর্ণনীয় দুর্দশার সূত্রপাত হবে, তাতে মোটেই সন্দেহের অবকাশ নেই।

লাওস :

মাস আষ্টেক শান্তি বিরাজ করার পর লাওসে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে

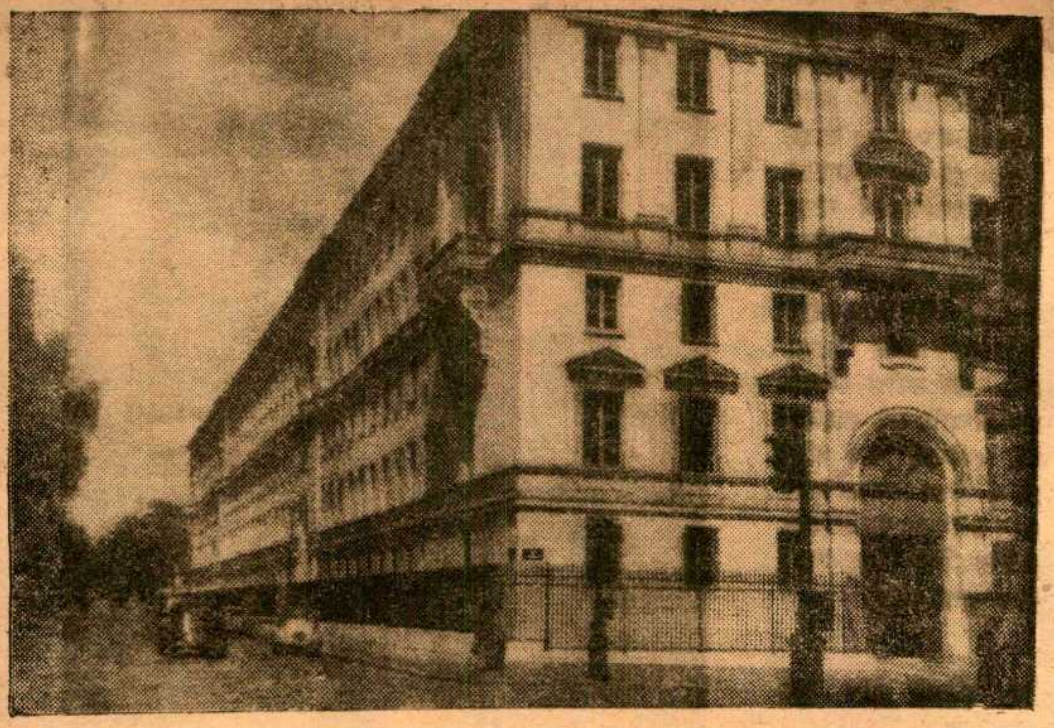

ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভবন

রণ শহরের দৃশ্য

লাওসের নিহত পররাষ্ট্র মন্ত্রী
কুইনিম ফলসেনা

এসেছে। আটমাস আগে জেনেভায় চৌদ্দটি রাষ্ট্রের সালিশী সভার পর এটাই স্থির হয়েছিল যে, লাওস ভারতের মত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপেই থাকবে এবং আশা করা গিয়েছিল যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু লাওসের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কুইনিম্ ফলসেনা-র হত্যাকাণ্ডের পর সেখানে আবার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

লাওসের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমা আর ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সুফানু ভভ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু দু'জনেই পরস্পর বিরোধী দুই শিবির ভুক্ত। লাওসের সরকারকে আমেরিকা বহু কোটি টাকা সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু তবু সুফানু ভভ সেদিন রেডিওযোগে আমেরিকা বিরোধী এক ক্রুদ্ধ বক্তৃতায় বলেছেন যে আমেরিকার গুপ্ত চক্রান্তই ফলসেনা হত্যার জন্য দায়ী। যে অভিযোগ আমেরিকা দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে' অস্বীকার করেছে।

ইতিমধ্যে লাওসের প্রধান মন্ত্রী দেশবাসী সকলের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করে বলেছেন যে, যদি অস্ত্রত্যাগ করে সকলে শান্তির পথে ফিরে না আসে তবে তাদের দেশের আর অস্তিত্বই থাকবে না, লুপ্ত হয়ে যাবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

চন্দ্রের দিকে বিগত ২রা এপ্রিল সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দ্বারা আর একটি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। রকেটের ওপর রয়েছে নভোস্থার একটি

লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না

স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন চন্দ্রের কাছা
সেটি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গে
ষ্টেশনটির নামকরণ হয়েছে, 'মুন-৪'

এর আগে আরও তিনবার সো
য়েট ইউনিয়ন চাঁদের দেশে এ
রকেট পাঠিয়েছিল। তার
প্রচেষ্টার সুরু ২রা জানুয়ারী ১
সাল। সে সময় যে সমস্ত যন্ত্রপ
রকেটে পূর্বে দেখা হয়েছিল তাতে
পড়েছে চাঁদের চুম্বক ক্ষেত্রের বিরে
আর সেই ক্ষেত্রের বাইরে মহাজাগ

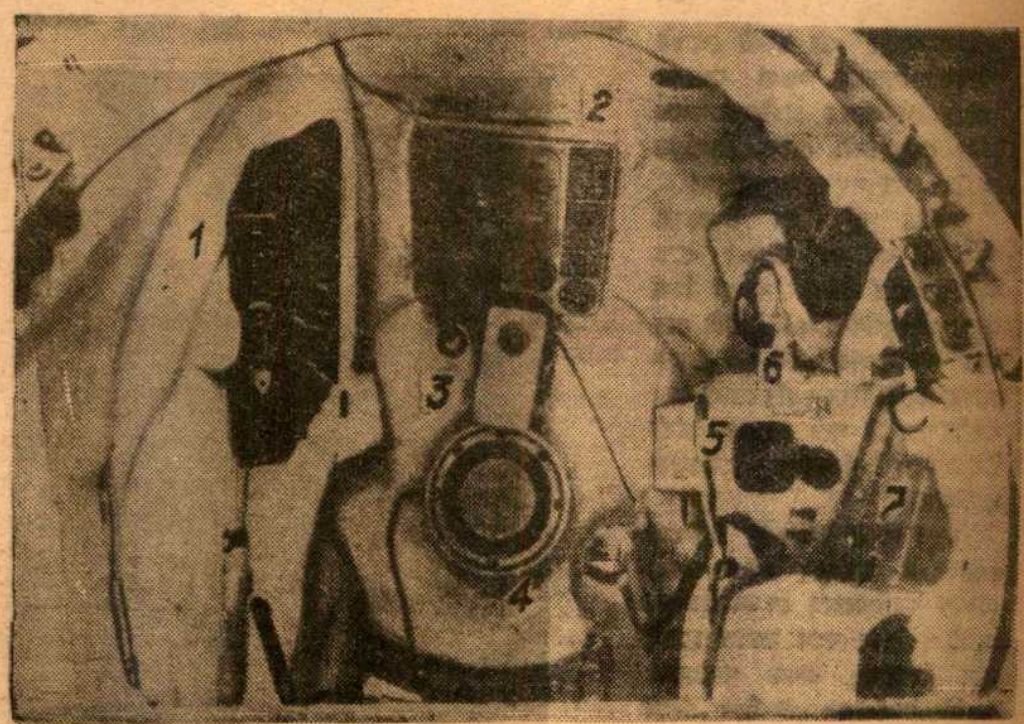

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ্জ পম্পেডো

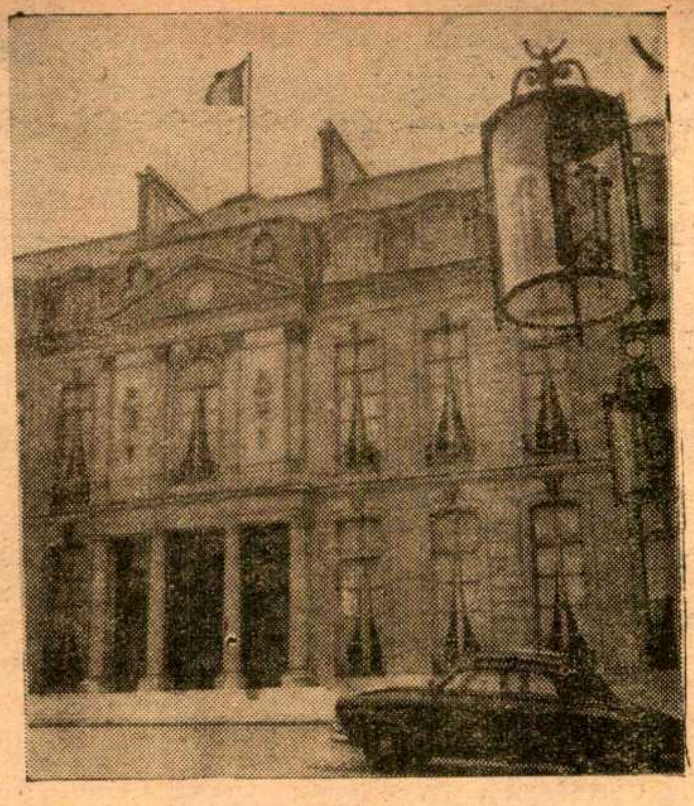

ফরাসী প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ

রশ্মির গতি ও প্রকৃতির কথা। ৭।৮ তারিখে রকেটটি ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে' যেতে নিজস্ব এক কক্ষপথে সূর্যের আকর্ষণে চলে যায়। ইহাই জগতের প্রথম মনুষ্যসৃষ্ট গ্রহ।

দ্বিতীয় 'লুনিক' উৎক্ষিপ্ত হয় ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ সালে। রকেটটি সেবার সরাসরি চন্দ্রের বুকে গিয়ে আঘাত করে। এই রকেট থেকেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়েছে সে চন্দ্রের চারদিকে কোন চুম্বক ক্ষেত্র নেই, কোন তেজস্ক্রিয় বিকীরণ বলয় সেখানে অনুপস্থিত।

তৃতীয় 'লুনিক'-এর উৎক্ষেপণ কাল ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৯। এতে ফটো নেওয়ার যে সব ব্যবস্থা ছিল তাতে ৭ই অক্টোবর ৪০ মিনিট ধরে প্রায় ৫০ হাজার মাইল দূর থেকে চন্দ্রের উল্টো দিকের ছবি তোলা হয়। তৃতীয় রকেটটি পরে মানুষের তৈরী উপগ্রহরূপে পৃথিবীর পরিবারভুক্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ রকেট উৎক্ষেপণ উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ক্রমাগত এই রকেট পরীক্ষার ফলে সম্ভবত চন্দ্রেই হবে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। সোভিয়েট বিজ্ঞান এই দিক দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। উপরন্তু লেনিনগ্রাডের মহাকাশ পদার্থ বিজ্ঞানী নিকোলাই কোজিরেভ পৃথিবী থেকে চন্দ্রের যে ফোটো তুলেছেন তাতে অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সমস্তই চন্দ্রে মনুষ্য অভিযান পরিচালনার প্রাথমিক ভূমিকা মাত্র। গ্যাগারিণ এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন।—যদি বিজ্ঞানী এবং কবিদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে চন্দ্রই হবে প্রথম গ্রহ যার ধূলিলিপ্ত পথে মানুষই হবে প্রথম চারণ।

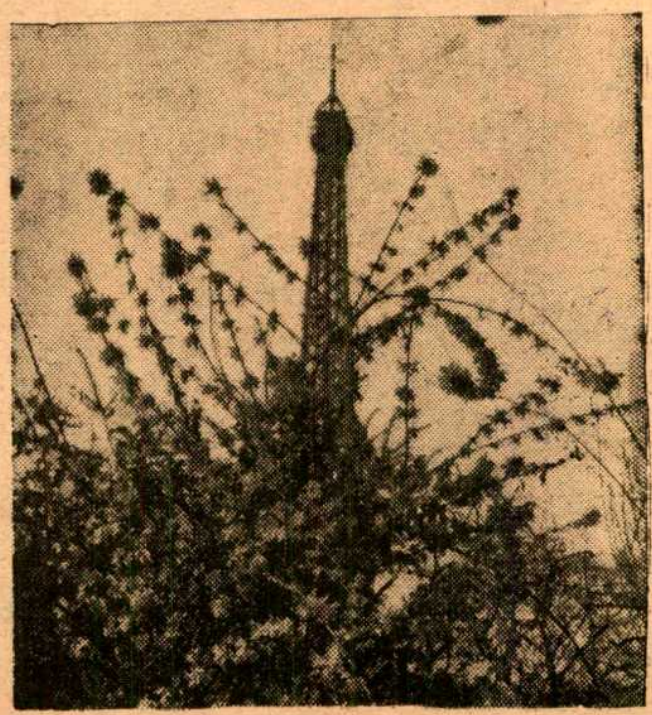

ফ্রান্সে বসন্ত আগত প্রায়

ঝুনুর নাম

আশাপূর্ণা দেবী

ঝুনুকে আমি তার ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। যখন সে ঘুঙবেরঙের ফ্রকও ধরেনি, মায়ের সঙ্গে ছেলেদের মত, কখনো জাঙিয়া আর 'সামারকুল' গেঞ্জি পরে, কখনো ঢোলা পায়জামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেদের মতই চুল ছাঁটা।

ঝুনুর বাবা সুকান্ত সেন সেই তখন এ পাড়ায় এসে বাসা বেঁধেছিল। কোন গ্রহ-নক্ষত্রের খেলায় কে জানে ঝুনু প্রথম দর্শনেই আমার প্রেমে পড়ে বসলো। সেই প্রেমের চাহিদা মেটাতে আমাকে সদা সর্বদা টফি চকোলেট আমসত্ত্ব কাজুবাদাম মজুত রাখতে হ'ত। দেখা হ'লেই ঝুনু আমার হাত কাঁধ যেটা ধরতে পারতো, ধরে ঝুলে পড়ে বলতো, 'আজ কি আছে?'

তারপর তো ক্রমশ ঝুনু ফ্রক ধরল।

সঙ্গে বধ। তার সঙ্গে ধরল কোঁকড়া চুলে ফিতে বাঁধতে। ওর মা ওকে সর্বদা ফুলটির মত করে সাজিয়ে রাখত। রঙিন প্রজাপতির মত ফুরফুরে এক ঝাঁক মেয়ের দলে পার্কে খেলতে আসত ও সবচেয়ে হৌলুস নিয়ে।

তখন ঝুনু বেজায় পাকা পাকা কথা বলতো।

বেজায় ভাল লাগত শুনতে।

ফ্রক ছাড়ার পর ঝুনু কিছুদিন সালোয়ার পাঞ্জাবী পরে গলায় ওড়না দুলিয়ে বেড়াতে লাগল, আর পাকা পাকা কথা ছেড়ে ন্যাকা ন্যাকা কথা ধরল।

তখন যেন তেমন ভাল লাগত না ঝুনুকে।

কি জানি কেন ওই 'হাফ্ তরুণী' মেয়েগুলো আমার চিরকালের অসহ্য। ওই যে ওরা 'এইমাত্র মাটির পৃথিবীতে নামলো' গোছের মুখ নিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে আদুরে আদুরে কথা কয়, অথচ চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলায়, ওটা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না।

ঝুনু যখন, ওই পর্যায়ে, তখন ঝুনুর সঙ্গে আমার তেমন লেন দেন রইল না। কিন্তু বেশী দিন নয় সেটা। ওটা একটা হাওয়া লাগা মতন অবস্থা হয়েছিল। পার্কের সেই এক ঝাঁক প্রজাপতির মত ফুর ফুরে বাচ্ছাগুলো ইতাবসরে এক দঙ্গল হাফ্‌তরুণী হয়ে উঠেছিল কিনা।

শাড়ী ধরার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠল ঝুনু। লেখা-পড়াতেও দস্তুর মত ভাল হতে থাকল ক্রমশই। তখন আর ঝুনু পাকাও রইল না। ন্যাকাও রইল না শুধু যেন একটু রোখা হয়ে উঠল। যাকে ভাল জেদ থেকে রোখা যায় না সেই রকম 'রোখা' আর কি।

সুকান্তর একান্ত ইচ্ছে ছিল ওর মেয়ে অঙ্কস নিয়ে পড়বে, ঝুনু বাবার কথা হেসে উড়িয়ে সায়েন্স নিল। ঝুনুর মায়ের ইচ্ছে ছিল না তার অমন লাবণ্যবতী মেয়েটি বইয়ের বোঝা বয়ে বয়ে আর রোদে জলে কলেজ যাওয়া আসা করে শুকিয়ে যাক, বুড়িয়ে যাক, লাবণ্য ফুরিয়ে ফেলুক। তাই ঝুনু কলেজে উঠতে না উঠতেই পাত্র খুঁজতে সুরু করেছিল। কিন্তু ঝুনু মায়ের বাসনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বি-এ তে অনার্স নিল, এম-এ পড়ল, ফার্ষ্টক্লাশ নিল, রিসার্চ করতে সুরু করল।

তবু বলবো ঝুনুর মা মীনা সেন যতই আক্ষেপ করুক আর সুকান্ত সেনকে যতই গঞ্জনা দিক রূপ-লাবণ্যে বিশেষ কিছু ঘাটতি দেখা গেল না ঝুনুর। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, রূপেও ঝুনু পাড়ার সেরা মেয়ে হ'য়েই বিরাজ করতে লাগল।

পাড়ার ফাংশানে ঝুনু প্রধানা, পাড়ার সার্বজনীনে ঝুনু প্রধানা, পাড়ার ছেলেদের হৃদয় মন্দিরে ঝুনু প্রধানা। এই কিছুদিন আগেও যে ছেলেগুলো হাফ্‌প্যাণ্ট পরে পার্কে বল খেলতো, তারা তো সকলেই প্রায় লায়েক হয়ে উঠেছে, অনেকেই বেশ কেষ্ট বিষ্টুও হয়ে উঠেছে। কাজেই 'হৃদয় মন্দির'ও গঠিত হয়েছে প্রায় সকলেরই। তবে মানুষটা তেমন জুটছে না কারুরই।

পার্কেন্দ্রিক পাড়াগুলোর এই এক অসুবিধে, ওই যে সবাই হাফপ্যাণ্ট পরা, বেবিসুট পরা অবস্থা থেকেই দেখেছে, দেখে নিয়েছে, সেই কারণে এখন তারা যতই 'টাই' এঁটে অফিসে যাক তাদের সেই ডাক নামগুলো আর ঘোচে না। 'বিদেশ' ফেরা না আসা পর্যন্ত পৌঁছেই না কেউ।

পার্ক বর্জিত পাড়ায় ঠিক এ রকমটা হয় না।

অবিশ্যি পার্কের পাড়ায় প্রেমের চাষ হয় না এ কথা ভুল, চাষ যথেষ্টই হয়, কিন্তু সে নেহাৎই পাতাবাহারের। শাখা-প্রশাখা সম্বলিত 'বৃক্ষ'র দেখা কদাচিৎ মেলে। বলতে গেলে মেলেই না।

তাই ঝুনু একদিন যখন পাড়ারই একটা ছেলের সঙ্গে বেশ একখানি প্রেমে পড়ে বসল, নিজে সে তাকে মহীরুহ মনে করলেও আসলে স্রেফ পাতাবাহারই।

মীনা সেন আর সুকান্ত সেন একদিন এসে 'হাপসে' পড়ল। বলল, শুনেছেন কাণ্ড?'

বললাম, 'শুনেছি বৈকি।'

'এখন বলুন মা বাপ হয়ে ঐতে প্রশ্রয় দেব? ঐটে কি ঝুনুর যুগ্যি!

'যুগ্যি' কি না সে তর্ক তুললাম না।'

কারণ জানি আগে যেমন লোকে নিজের বুদ্ধি আর পরের টাকা বেশী দেখত, একালে তেমনি লোকে নিজের নম আর নিজের মেয়ের দাম' অতিরিক্ত বেশী দেখে। সন্দেহ প্রকাশ করলে ক্ষ্যাপে।

তাই তর্ক না তুলে বললাম—'পাগল! কিসে আর কিসে? কিন্তু ঝুনুকে তো আমি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই জানতাম।'

'এই একটি জায়গায় সব ছেলে মেয়েই ভোঁতা।'

'তা' ও কি বলে? বিয়ে করতে চায়?'

'তাই বা কই?' মীনা সরোষে বলে,' তাহলেও তো বুঝলাম একটা কিছু হল, একটা ব্যবস্থা করবার স্কোপ পেলাম। তাও না। বলে, এক্ষুণি বিয়ের কথা তোলবার দরকার কি আছে?'

'বল কি?'

'তবে আর দুঃখ করে মরছি কেন?

'বেশ না হয় এখন না হ'ল, ওকেই করবে তো?'

'ঈশ্বর জানেন—' মীনা সেন ঠোঁট উল্টোয়, 'আর ওরাই জানে। অথবা ওরা নিজেরাও জানে না।'

তা' মীনা সেনের কথাটা ফেলনা নয়।

ওরা নিজেরাই জানতো না।

জানতে পারে নি।

'মন' নামক বস্তুটাকে নিয়ে তো তলায় না—এ যুগের মেয়ে ছেলেরা? শুধু সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই সবই ওদের ভাসা ভাসা, মাটির নীচে শিকড় নেই ওদের।

সে যাক।

না থাকুক গে। এখন সমস্যাটার সমাধান হয় কি করে? অত বড় বড় মেয়ে ছেলেকে "ইদিক উদিক চাইবি না" বলা চলে না। যদি বা লেখা পড়ায় একটু গাড্ডু খেত তো, সেই খোঁটা তুলে ধমক দেওয়া যেত। তাও না। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে যে পরীক্ষার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তা তো নয়। ওদিকে ঠিক আছে। ঝুনুতো ওরই মাঝখানে থিসিস সাবমিট করে ফেলে 'ডি-ফিল' হয়ে বসল।

ভেবেছিলাম অতঃপর বিয়েটা লাগবে।

কিন্তু দেখা গেল, একজনের লাগল, একজনের নয়। সেই ছেলেটাদের বাড়ীর ছাতে একদিন ম্যারাপ বাঁধা হ'ল, বাড়ীর সামনে বিস্তর আলো

ফোন : ২২-৮৮২০

"নবীন অপটিক্ হাউসে"র

'চশমা' ও 'গগলস'

সকলকে মুগ্ধ করে ● পরীক্ষা প্রার্থনীয়

২৮৫।বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জলল, আর আশ্চর্যের কথা পাড়ার প্রধানা ঝুনু সেই ফংশানেও প্রধানা রূপেই সাজে সজ্জায় কথায় হাসিতে ঠিকরে বেড়ালো।

চুপি চুপি বললাম 'ঝুনু ব্যাপার কি বল তো?'

ঝুনু বলল, 'দূর ওটা আবার একটা মানুষ না কি? ওয়ার্থলেস!'

তারপর আরও দু' চারটে 'অমানুষ'কে নিয়ে ঘুরল ঝুনু। ত্যাগও করল।

আর এরপরেই একদিন দেখলাম ঝুনু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চাকরী করতে যাচ্ছে। সুকান্ত সেনের ওই একটাই মেয়ে, আর সুকান্ত সেন ইদানীং টাকার 'আণ্ডিল' হয়েছে, অথচ অমন মেয়েটাকে বিয়ে না দিয়ে চাকরী করতে দিল।

আমাদের সেকেলে চোখ তো।

কেমন যেন ভাল লাগল না। মুস্কিল।

'বিদ্যের পাহাড় নিয়ে বসে থাকুক মেয়েগুলো' এটা বলতে সভ্যতায় বাধে, অথচ সমস্ত বয়েস কালটা কলেজের নোট আর অফিসের ফাইল চিবিয়ে কাটাক এ ভাবতেও প্রাণ ফাটে।

মীনা সেনেরও প্রাণ ফাটছিল।

সে মেয়ের মতামত অগ্রাহ্য করে পাত্র খুঁজছিল, আর তলে তলে মেয়ের গহনা কাপড় দান সামগ্রী কিনে কিনে বাড়ী বোঝাই করছিল।

অবশেষে এক জায়গায় যখন কথা প্রায় পেকে এসেছে, আর ঝুনুর বাবা গডরেজের ফার্ণিচারের অর্ডার দিয়েছে, সেই সময় ঝুনু একটা ছেলের হাত ধরে এসে এক গাল হেসে মা বাপকে প্রণাম করল।

অফিসেরই সহকর্মী।

এইমাত্র রেজেষ্ট্রী করে এসেছে।

প্রণামের 'শক'এ—সুকান্ত সেনের ষ্ট্রোক্ হয় হয়; কোন মতে রক্ষে পেল সে যাত্রা মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে। মীনা সেন কাঁদল, হাত পা আছড়াল, তারপর আবার চোখের জল মুছে কোমর বেঁধে সামাজিক বিয়ের আয়োজনে লাগল। মেয়েকে বলল 'রেজেষ্ট্রীর কথাটা চেপে যা, দু'চারটে দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক।'

না বলে কি করবে বেচারা।

কোন্ কাল থেকে মেয়ের বিয়ের ঘটার পরিকল্পনা চালাচ্ছিল! পাড়ার সবাইকে টেক্কা দেবার মতলব ভাঁজছিল।

তা যাক ঘটার ত্রুটি হ'ল না।

হঠাৎ বড়মানুষের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে যতটা যা হবার সবই হ'ল। শাড়ীর পাহাড় দেখে মনে হ'ল ইহ-জীবনে আর শাড়ী কিনতে হবে না ঝুনুকে, আর ফার্ণিচারের বহর দেখে পাত্রপক্ষ থেকে বলল, দয়া করে ওগুলো আপনার বাড়ীতেই রেখে দিন, আমাদের বাড়ীতে জায়গা নেই।'

এটা তাদের বিনয় প্রকাশ নয়, নেহাৎ সত্যি কথা। জায়গা আদৌ নেই তাদের। ছাপোষা গেরস্থ, একান্নবর্তী পরিবার। ছেলেটা ডেক্রনের প্যান্ট আর লাইলনের সার্ট পরে অফিসে আসত, খুব চটকদার কথাবার্তা বলতো, চেহারাটও বেশ আকর্ষণীয়। বাইরে থেকে ধরা যায় নি, বাড়ীতে দানসামগ্রী তোলার জায়গা নেই। আর সার্ট প্যান্ট ওই একটাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সাবান জলে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে দেয়, সকালে গায়ে চড়িয়ে অফিসে আসে।

চালচলন দেখে মনে হ'তো তুচ্ছ একটা কাজ যে করতে এসেছে সে, সেটা নেহাৎই সখ করে। যেমন ঝুনু এসেছে। অতএব ছেলেটাকে সমগোত্র ভেবেছিল ঝুনু।

প্রথম ভুল ভাঙল বাড়ীর জায়গা নিয়ে।

ঝুনু সেকালের ঘোমটা টানা বৌ নয়, শিক্ষিতা, স্বাধীনা। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, যদি ফার্ণিচার রাখবার মত জায়গা নেই তো বো রাখবে কোথায়?'

বাড়ীতে ডেক্রন নাইলন নয়, আধাসিল্কের লুঙ্গি আর হাতকাটা গেঞ্জি, তা ছাড়া পুরুষের আত্মাভিমান বলে কথা।

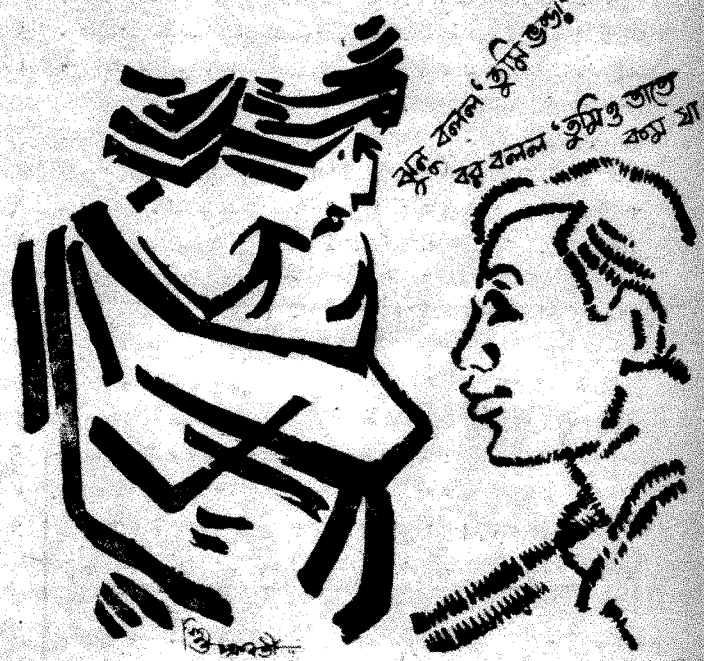

বর বলল, 'যেখানে বাড়ীর আরও দু'টো বৌ আছে'

'আছে! ওকে কি থাকা বলে? অমন গোয়ালের গরু হয়ে থাকতে পারব না'

বিয়ের আগে পুরাগ করে করে সব রাগ-রক্তমাংস মুছে ফেলে এবং তাই কথা কাটাকাটিটা বেশ বিষয় লিষ্টিকই হল। বর বলল—মনে রেখো আমিও এই গোয়ালেরই একটি গরু।'

ঝুনু বলল 'তুমি ভণ্ড'

বর বলল 'তুমিও তাতে কম যাও না। মনে পড়ছে না, বলেছিলে

তোমার স্বপ্নই আমার স্বপ্ন, তোমার সাধনাই আমার সাধন'—'

'মনে পড়বে না কেন? খুব পড়েছে। তবে, এ কথা বলিনি—তোমার গোয়ালই আমার গোয়াল।'

বর বলল, 'বলেছিলে আমরা দু'জনে স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে—'

বলেছিল বটে।

সলে যাবার কথা নয়। লেকে, বোট্‌নিকালে, সিনেমায়, রেস্তোঁরায়, অফিসের করিডোরে, চলন্ত ট্যাক্সীতে অহরহ বলেছে। তাই অস্বীকার করল না ঝুনু। শুধু নাক শিকেয় তুলে বললে,—'হ্যাঁ, বলেছিলাম। বলেছিলাম 'আমরা দু'জনে'—'আমরা বাইশ জনে' নয়। তোমার ওই মা, বাপ, কাকা, ঠাকুমা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি হাবি-জাবি আত্মীয়দের না ছাড়লে আমায় পাবে না।'

বর বলল, 'এখনো ভেবে দেখ।'

ঝুনু বলল 'ঢের ভেবে দেখেছি।'

তারপরও অবিশ্যি চলল অনেকদিন। এ যুগে বিয়ে ভাঙে বলেই এক কথাতেই ভাঙে না। বর এসে এসে খোসামোদ করে। শ্বশুর শাশুড়ীকে সালিস মানে। সুকান্ত সেন বলে, 'আমি ও সবের মধ্যে নেই—মীনা সেন বলে 'তা বাবা আমার মেয়ে যদি তোমাদের রাবণের গুষ্টির মধ্যে গিয়ে থাকতে না পারে!'

ও পক্ষেও অবশ্য মা বাপ আছে।

বাড়তি হাবিজাবিরাও আছে।

তারা বলল, 'ছেলেটার জীবন মহানিশা হবে! নে বাবা আলাদা একটা ফ্লাটই নে।'

নিজেরাই তারা চেষ্টা বেষ্টা করে ফ্লাট যোগাড় করে দিল, বৌদি সাজিয়ে দিয়ে গেল, দাদা চুপিচুপি —'দরকার পড়লে সাহায্য করবো—' আশ্বাস জানিয়ে বিদায় নিল।

অতঃপর মিটল বাধা। ঝুনু এইবারে বাপের দেওয়া সেই সব ফার্ণিচার নিয়ে বিজয়গৌরবে পতিগৃহে বাস করতে গেল। হাস্যবদনে আমায় নেমন্তন্ন জানিয়ে গেল—'যেও আমার বাড়ী।'

আহ্লাদে ডগমগ করছে ঝুনু। মুখ দেখে বোঝা ভার—এম্‌-এ, ডি-ফিল। মাথায় এক ধ্যাবড়া সিন্দুর, কপালে ইয়া বড় টিপ। কেমন যেন গাঁইয়া গাঁইয়া শুনলাম, ওই লেটেষ্ট ফ্যাসান।

এই পর্যন্ত আমি এক নাগাড়ে দেখেছি ঝুনুকে। সেই জাঙিয়া গেঞ্জি-পরা বয়স থেকে। দেখেছি, অবাক হয়েছি। বুঝতেই পারিনি কোথাকার মাটির রস আহরণ করে ওর মন পুষ্ট হচ্ছে।

তা' ঝুনুর নেমন্তন্নটা আর তখুনি তখুনি রক্ষা করা সম্ভব হল না আমার। হঠাৎ বেশ কিছুকালের জন্যে বাইরে যেতে হ'ল।

ফিরলাম বছর দেড়েক পরে।

আর ফিরে খোঁজ নেবার আগেই দেখা পেলাম ঝুনুর ..... ঘরের জানলা থেকেই দেখলাম।

সেই তার আশৈশবের পার্ক প্রদক্ষিণ করা রাস্তায় ধীরে ধীরে চলেছে ঝুনু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। মুখের সেই লাবণ্য অন্তর্হিত, ঠোঁটের রেখায় বিষণ্ণ ছাপ। পরনে এত সাদাসিধে শাড়ী ব্লাউস যে, দেখে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কাঁটা দিল।

ছুটে নেমে এলাম।

ও ততক্ষণে বাসে উঠে পড়েছে।

ওদের বাড়ী গিয়ে বললাম—'ব্যাপার কি সুকান্ত?'

সুকান্ত নীরবে কপালে হাত ঠেকালো।

তা হলে, যা ভেবেছি, তাই।

বললাম 'কবে এমন হল?'

সুকান্ত ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ওর মা বলতে পারবে।'

ওর মা বলতে পারবে?

এটা আবার কী ভাষা।

তবে কি যা ভাবছি তা' নয়?

না।

তা নয়।

মীনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সন্দেহভঞ্জন হ'ল। মীনা একেবারে ফেটে পড়ল। 'এতদিনে এলেন

গ্রন্থালয়ের কয়েকখানি অসামান্য বই

গোরাকালার হাট
অশোক গুহ : ৮৷৷০
প্রকাশিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বইখানা সম্বন্ধে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সুধিবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতিকালে আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে।

কর্ণাটরাগ
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪৲
দরদী লেখকের হাতে প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য—এমনকি জুবেদা-হাতীও চির-দিনের জন্য মনে থাকবে। পত্র-পত্রিকার দরদী লেখনী প্রশংসিত।

অন্যনয়ন
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪৲
লেখকের এই নূতন, উপন্যাসখানিতে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব তাই নয়, সাহিত্যের মূল্যায়নায় প্রোজ্জ্বল ও অনবদ্য।

আরও অনবদ্য উপন্যাস

অ্যাক্‌সিডেন্ট	।।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	।।	২·৫০
সীমান্ত	।।	শিশির দাশ	।।	৩·০০
সঙ্ঘমিত্রা	।।	সঙ্কর্ষণ রায়	।।	২·৫০
চৌধুরী বাড়ি	।।	বিশ্বনাথ রায়	।।	৪·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আপনি। আপনাকেই শুধু একটু জানতো, আর আপনিই এ সময়—'

মানে না যে ওরা কাউকেই, স্বয়ং ভগবানকেও না, সেকথা আর উচ্চারণ করলাম না। নিমপাতা বেশী নাড়া-চাড়া না করাই ভাল। শুধু কথার শেষ শোনবার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলাম।

মীনা সেনের অনেক আক্ষেপ অনেক হাত পা আছড়ানির মধ্যে থেকে এইটুকু আবিষ্কার করতে পারলাম বৈধব্য নয়, বিচ্ছেদ।

বরের সঙ্গে বনিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ঝুনুর, তাই—

অবাক হয়ে বলি, কেন, আবার সেই রাবণের গুষ্ঠি এসে ওর ফ্ল্যাটে হানা দিল না কি?

'না না। তারা কেন, তাদের কী সাধ্যি। জামাই! ওই জামাইটিই আমার একায় একশো। ত্যাঁদোড়ের শিরোমণি, অবাধ্যর রাজা। কোন বিষয়ে যদি ঝুনুর মতে চলবে!'

'আশ্চর্য্য তো! তোমার অমন রূপবতী বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সামান্য—একটা কেরানী ছোকরাকে কায়দা করতে পারল না?'

'পারবে কোথা থেকে? প্রতি পদেই যে মতবিরোধ। আমিও বলেছি—ঠিক আছে, আমাদের মতন নিরুপায় তো নয়? লেখাপড়া শিখেছিস চাকরী করে খা।'

না বলে পারলাম না।

ফস্ করে বলে ফেললাম। 'তা' খাওয়াটাই তো শেষ কথা নয়?'

মীনা ভারী মুখে উত্তর দিল। 'তা আর কি করা যাবে? আগেকার দিনে ঘরে ঘরে কত বালবিধবাও তো থাকতো।'

বোধ করি একটু 'চমকেছিলাম। তারপর মনে পড়ল, না চমকাবার হেতু নেই। নতুন কিছু নয়। আমার নিজের পিসিমাকেই তো দেখেছি স্বামী জীবিত সত্ত্বেও আজন্ম বাপ ভাইয়ের ঘরে পড়ে থাকতে। বিয়ের পরে না কি জানা গিয়েছিল পিসেমশাইয়ের বোনের অকুলীনের ঘরে বিয়ে হয়েছিল। সেটা তারা গোপন করেছিল। আমার ঠাকুরদা সেই পতিত ঘর থেকে জন্মের শোধ —মেয়ে নিয়ে চলে এসেছিলেন। বলেছিলেন 'বিধবা মেয়েও তো ঘরে থাকে।'

হঠাৎ মনে হ'ল চিরদিন আমার সেই পিসিমার ঠোঁটের কোণে অমনি একটা বিষাদ বিষণ্ণতার ছাপ আঁকা দেখেছি, এই একটু আগে যেমন দেখলাম।

মনে পড়ল প্রকৃতির নিয়মে না কি কোনও শূন্যস্থানই শূন্য থাকে না। নতুন কোন চেহারায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। বাল্যবিবাহ উঠে যাবার পর ঘরে ঘরে পিসিমাদের যে জায়গাটা কিছুদিন শূন্য ছিল, এই ঝুনুরা সে জায়গাকে পূর্ণ করবার ভার নিয়েছে। শুধু বাপের বাড়ীর কাজের জাঁতাটাকে কাঁধে তুলে না নিয়ে অফিসের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিচ্ছে এরা। ভাইপো ভাইঝিগুলো ছিল পিসিমাদের অবলম্বন, এদের স্বাবলম্বনই অবলম্বন। এই যা।

চলে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল বললাম—'কিন্তু ওদের সেই ভালবাসা

'সেই তো সেইটিই তো হয়েছে— 'কু'য়ের গোড়া—' মীনা বিরক্তকণ্ঠে বলে, 'বলে বলে তো হদ্দ হয়ে যাচ্ছি বলছি আইন যখন রয়েছে মিথ্যে বে জীবনটা বরবাদ দিবি। বলে কি 'দরকার নেই বেশ আছি।'

বেশ আছে

ঝুনুর সেই হৃতসর্বস্ব চেহারাটা ম পড়ল। তা' হোক তবু ঝুনু 'বে আছে।' তবে আর বলবার কি আছে?

বলতেই যদি হয়, শুধু এইটুকু বলা যায়, 'বেশ' না থেকে উপ কি ঝুনুর। এতো আর পাঁ সমাজপতিদের কাটা খালে ডু মরছে না ঝুনু! ডুবছে স্বখা সলিলে।

তা' বেচারার দোষই বা কি?

হতভাগা বরটা যদি ওর মতে চলে, ও কি করবে?

অবিস্মরণীয় প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবময় পুনঃ প্রকাশ
বাঙলার ও বাঙালীর চির আরাধ্য
পরম পবিত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ

কাশীরাম দাসের

মহাভারত

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"। পুণ্যবান কাশীরাম দাস অমিয় পয়ার ছন্দে ভারত গান গাহিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন— কালের প্রভাবে তাহা অবিনশ্বর। "রুচিবাগীশগণের অশ্লীলতা-আতঙ্ক নীতি" অনুসরণ করিয়া আমরা এই পুণ্যময় গ্রন্থের সংস্কারে সংহার করি নাই। প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে মুদ্রিত—সুসংস্কৃত—রাজাধিরাজ সংস্করণ— দুই খণ্ডে সুসম্পূর্ণ—তিরিশখানি সুরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশ। কাশীরা দাসের জীবনী সহ এই মহান গ্রন্থ প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য।

মূল্য প্রতি খণ্ড ৬৲ টাকা মাত্র।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের প্রতিবেশী

সর্বদর্শী

সংবাদপত্রের পাতায় বেশ ফলাও করে ছাপা নবদম্পতির প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবিখানা দেখালাম তাকে।

ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির টুকরোটুকু ঈষৎ বিস্তৃত করে সে বলল : মার্কিণী মুলুকের প্রজাপতি প্রাচ্যে এসেছিল বসন্তের হাওয়ায় ভেসে ; কিন্তু হিমালয়ের মায়ায় বাঁধা পড়ল চিরদিনের জন্য। এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

গ্যালব্রেথ

কাঞ্চনজঙ্ঘার অঙ্কশায়িত ত্রিস্রোতার স্নেহপুষ্ট সিকিম, রাজ্য হিসেবে নগণ্য। ডলারের দেশের, স্কাইস্ক্রেপারের দেশের মেয়েকে জাগতিক সম্পদ দিয়ে সে বাঁধবে কি করে? কিন্তু আতলান্তিকের নীল জল পেরিয়ে যে নীলনয়না শুভ্রা সরস্বতী দেবস্থান হিমালয়ের বুকে নেমে এলেন সিকিমের বর্ণাঢ্য শোভাকে ভালবেসে তিনি তার যুবরাজকেও ভালবেসে ফেললেন।

পূর্বে তিব্বত ও ভুটান, পশ্চিমে নেপাল আর দক্ষিণে ভারতবর্ষ। সমুদ্রের প্রস্তরীভূত ঢেউয়ের মত পর্বতশ্রেণী আর উপত্যকার অপূর্ব সমাবেশ। কোথাও এর উচ্চতা ১৪০০০ ফুট কোথাও বা মাত্র হাজার ফুট। বছরের প্রায় সব সময়েই শীতাতপের বিভিন্ন মাত্রা আস্বাদন করা যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। বর্ষার প্রাচুর্য তাকে দান করেছে অপূর্ব শস্য সম্পদ। তিস্তার জলধারা করেছে ফসল প্রদায়িনী। তাই তিব্বতীরা সিকিমকে নাকি বলে ডেনডং—চালের ভাণ্ডার। ফল-ফুল, কীট পতঙ্গের কত অজস্র প্রকারভেদ! রডোডেনড্রনই নাকি আছে চার হাজার ধরণের। প্রজাপতি আছে ৬০০ ধরণের। ফার্ণ পাওয়া যায় আড়াইশো রকমের, আছে অপরূপ চামরী গাই কস্তুরী মৃগ আর প্রায় সাড়ে সাত হাজার জাতের কীট-পতঙ্গ। কেবলমাত্র নিসর্গশোভার প্রভাবে এই ছোট্ট রাজ্যের মাঝে যুগ যুগ ধ'রে আটকে আছে এরা। সেই বর্ণসুষমা, হিমালয়ের যোগীজনোচিত পরম গাম্ভীর্য কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ শোভা একজন শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীকে যদি বশীভূত করে ফেলেই তবে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। নব-পরিণীতা সিকিমের ভাবী মহারাণী শ্রীমতী হোপ নামগেয়াল সাংবাদিকদের আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলেছেন যে, তাঁর সবই ভাল লেগেছে। যুবরাজকে ভাল লেগেছে, ভাল লেগেছে বেনারসী ব্রোকেটে তৈরী সিকিমি বধূর বেশ, ভাল লেগেছে রাজগুম্ফা, ভাল লেগেছে তার দেওয়ালে আঁকা সুরাসুরের, ড্রাগনের বিচিত্র চিত্রাবলী, ভাল লেগেছে পেমিয়াচি মঠের লামাদের উচ্চারিত গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ।

সারা সিকিম থেকে এসেছিল লেপচা, ভুটিয়া ও নেপালী প্রজাবৃন্দ। হাতে তাদের সামান্য উপহার বস্তু। আট হাজার নর-নারী শিশু বৃদ্ধকে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন বাগানে খাদ্য-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন বৃদ্ধ রাজা। বাগানের ফুলের সমারোহের পাশে তাদের সাতরঙা রামধনুবর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ ইন্দ্রপুরী করে তুলেছিল

নব পরিণীতা স্ত্রীসহ সিকিমের মহারাজকুমার

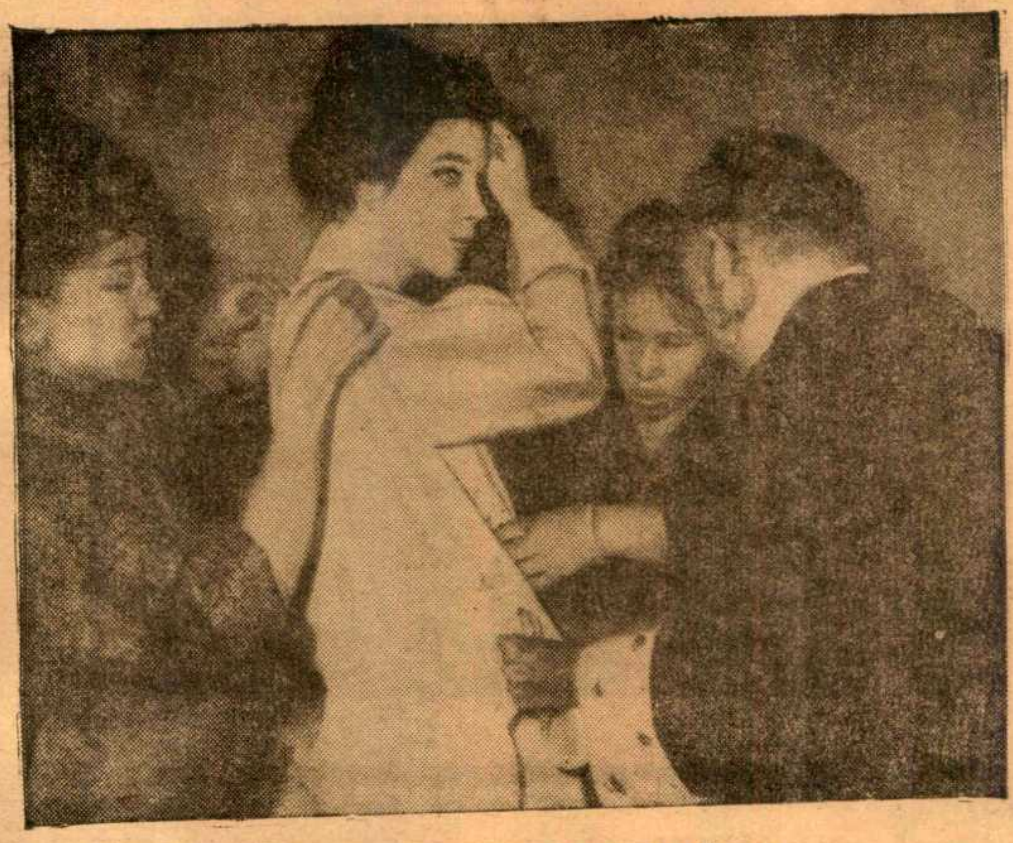

মিস হোপ কুকুকে কনের-বেশে সজ্জিত করা হইতেছে।

সেদিন গ্যাংটকের রাজপ্রাসাদ। শিল্পী রাজার চোখ সজল হয়ে উঠেছিল, রাজবধূর পাশে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী, খুশি হয়েছিলেন নির্বাসিত দলাই লামার ভগ্নী ও আর পরিজনবর্গ।

ইতিহাসের ছাত্রী হোপের চিন্তা ধারা হয়ত বর্তমান পেরিয়ে অতীতের দিকে ধেয়ে চলেছে তখন—সেই সুদূর অতীতে যখন কলোম্বাস তাঁর পিতৃভূমি আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি। কিম্বা তারও আগে যখন মঙ্গোলিয়ার সম্রাট কুবলাই খাঁ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন নানা দেশে। ইংরেজ আমেরিকায় গেল, এল ভারতবর্ষে। বিরোধ বাঁধল তিব্বত নিয়ে। সিকিমের দিকেও তার নজর পড়ল। ১৮৯০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত আশ্রিত রাজ্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল ইংরেজ। অবশেষে ১৯৪৭-এ ইংরেজকেও ভারত থেকে বিদায় নিতে হ'ল। সিকিম পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করল। নবীন ভারতও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না তাকে।

মহারাজকুমার কিন্তু তিব্বতী। তাঁর আত্মীয়স্বজন তিব্বতী। তিব্বত আধুনিকতা বিবর্জিত ছিল। সিকিমও তাই। সিকিমের লোকেরা নির্বিরোধী, অল্পে সন্তুষ্ট। তাদের ধর্মগুরু লামাদের মত তারাও যেন ত্রিকালজ্ঞ। তাই মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীন। নিজের ক্ষেত আর ছোট বাড়ী—এই নিয়ে তারা সুখী। রাজা-প্রজায় বিরোধ নেই, রাজনীতি-অর্থনীতির কলা-কৌশল নেই, বিজ্ঞানের আত্মঘোষণা নেই। সিকিমের রাজবাড়ীই শুধু স্বতন্ত্র, আধুনিক। মহারাজ কুমার নামগেয়াল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। আই-সি-এস। বহুদেশ ঘুরেছেন। নানা ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর প্রথম যুবরাণী অকালে লোকান্তরিতা হয়েছেন। দু'টি পুত্র-কন্যা রেখে গেছেন। ৩৯ বছরের যুবরাজ তাই দু'বছর পর আবার বিয়ে করলেন। কিন্তু এবারে সাগর পারের বিদুষী ও ধনী ২২ বছরের মেয়ে শ্রীমতী হোপকে। তাঁর বক্তৃতায় একটু ছেদ পড়তেই বিদেশী অতিথিদের তালিকার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তাঁর ভ্রূ-ধনু বাঁকা হয়ে উঠল। তালিকায় আছেন মাননীয় অধ্যাপক গ্যলব্রেথ—শ্রীমতী হোপের পক্ষ হয়ে যিনি 'ম্যারেজ রেজিস্টারে' সই করেছেন, আছেন মাননীয় রাষ্ট্রদূত গে'র-বুথ। আরও নানা দেশের রাষ্ট্রদূতেরা।

তাঁর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই বললাম: বধূরাণী শুনেছি সিকিমের ইতিহাস রচনা করতে ব্রতী। সে কোন্ ইতিহাস—অতীত না বর্তমান? তিনি রাগ করলেন। এমন সুন্দর একটা প্রেম উপাখ্যান রাজনীতি আমদানী করে আমি নাকি নষ্ট করে দিলাম। রাগ করবার সঙ্গত কোন কারণই কিন্তু নেই। ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় পড়েছিলাম গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা লিচ্ছবী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করে নিজের

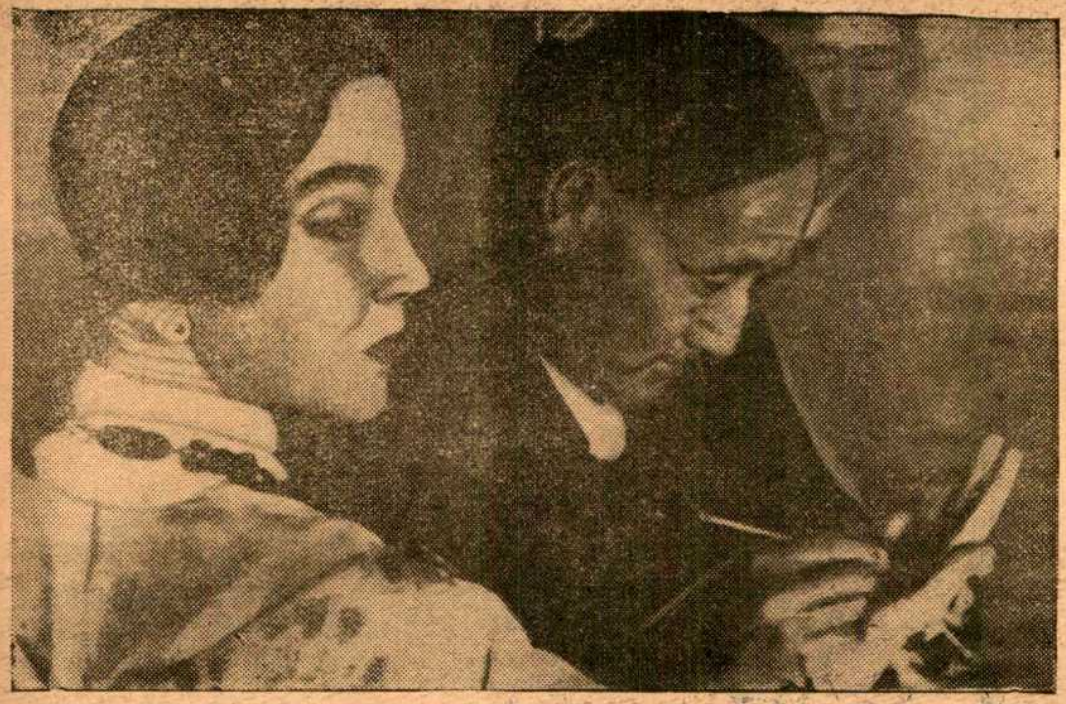

প্রভাব বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আরও বড় হয়ে ইউ-রোপের ইতিহাসে রাজনীতিক বিয়ের প্রভাব অপপ্রভাবের ছড়াছড়ি দেখেছি। তারপর অবশ্য রাজাগিরি প্রায় উঠে যেতে বসেছে। রাজনীতিক বিয়ের প্রচলনও বিরল হয়েছে আজ। তবু সিকিমে তো সেকেলেই র'য়ে গেছে, আধুনিক হবার সুযোগই পায়নি। কিন্তু যুবরাজ তো আধুনিক।

অথবা চীনের অভিযান তিব্বতের আকাশে ঝড় তুলে নিশ্চিন্ত অতীতকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। সেই ঝড়ো হাওয়া সিকিমের আকাশেও ঝড়ের ইঙ্গিতকে ব'য়ে এনেছে। চীন তিব্বতকে গ্রাস করেছে সুদূর অতীতের গ্রন্থিসূত্র ধরে—সিকিমকেও যদি সেই একই সূত্র ধরে সে টানাটানি করে? চীন ম্যাকমেহন লাইন মানে নি সাম্রাজ্যবাদীর চুক্তি ব'লে। ১৮৯০ সালে ইংরাজের সঙ্গে সিকিমের সীমানা নিয়ে যে চুক্তি সে করেছিল তাই যে সে মানবে তার প্রমাণ কি? পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। চীনের আক্রমণ সত্ত্বেও ভারত-ভূমিতে অন্য কোন রাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আমরা করতে দিইনি। আমাদের নিরপেক্ষতা আমরা ত্যাগ করিনি। কিন্তু সিকিমের গ্যাংটক ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে।

গ্যাংটকের বাজারের দৃশ্য।

জবাব পেলাম : রাজনীতি, কূটনীতি পুরুষের নীতি' পুরুষই ভাল জানে। ইংরেজ বা আমেরিকা রাষ্ট্র হিসাবে যা' ভাবে ভাবুক আমরা কামনা ক'রব, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে যুবরাজ আর যুবরাণী সুখী হোন। ইংরেজ আর আমেরিকা? তাঁদের রাষ্ট্রদূতেরাও আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ করতে গেছেন। উৎসব অন্তে চামরী গাইয়ের চামড়ার আস্তরণের মধ্যে শুয়ে যদি অন্য কিছু ভেবেও থাকেন তার সঙ্গে রাজপরিবারের সম্পর্ক কি।

ভারতদর্পণ

চীনের হুমকী

রাজধানী :

চীনে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। ভারতের ঔদার্য্যকে দুর্ব্বলতা ভেবে, ভারতের বন্ধুত্বের প্রসারিত হস্ত অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতান্ধ চীনের বর্ত্তমান শাসকেরা ভারত আক্রমণ করে দু'দেশের মধ্যে যে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালিয়েছে তার বিষময় পরিণাম এখন তারা বুঝতে পারছে। ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ভারতের দৃঢ়তা ও বিপর্য্যয়ের মুখেও ভারতের ঐক্য তাদের কল্পনাতীত ছিল। চীনের সমর-নেতারা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চীন বিরোধী কার্য্য বলে অভিহিত

দালাই লামা

করছেন। আত্মরক্ষার জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ, উন্নত অস্ত্রে সৈন্য পুনর্গঠন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ও অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার প্রচেষ্টা তাদের চক্ষে ভারতের দুরভিসন্ধির পরিচায়ক।

চীন হুমকি দিয়েছে যে ভারতের অন্তরীণ চীনাদের প্রতি যে 'অকথ্য নির্য্যাতন' চলেছে সেটা তারা অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরে বরদাস্ত করবে না। চায়নার দৈনিক "পিপলস্ ডেইলী" কেন্টনে এক জনসভার উল্লেখ করে ভারত প্রত্যাগত এক চৈনিকের বক্তৃতা উদ্ধৃত করেছে "আমরা (প্রবাসী চীনারা) আর পূর্ব্বের মতন অসহায় নই। আমরা যে দেশেই বাস করি না কেন আমাদের শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে পারি।" চীনারা সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করেছে এটা নাকি নিছক কল্পনা ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে অধিক সাহায্য পাবার একটা ফন্দি। দালাই লামা বা তিব্বতীদের প্রতি সহানুভূতি দেখান ও ভারতের চীন বিরোধী কার্য্যকলাপের অন্যতম। পিপলস ডেইলী আর এক সংবাদে প্রকাশ করেছে যে নাথুকাপাশ অতিক্রম করে চীনা এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা নাকি প্রতিরক্ষাব্যূহ প্রস্তুত করছে।

ভারতের সমর প্রস্তুতির প্রতি বিষোদ্গার করলেও চীন কিন্তু আপোষের জন্য কোনরকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কলম্বো প্রস্তাব ভারত সম্পূর্ণ মেনে নিলেও চায়নার গড়িমসির জন্য আপোষ প্রস্তাব মোটেই এগুচ্ছে না। কলম্বো প্রস্তাব সম্বন্ধে চায়নার অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উক্তি কারুরই দৃষ্টি এড়ায়নি। চীনের বহির্বিভাগীয় দপ্তর থেকে ৪ঠা এপ্রিল এক ঘোষণায় ভারতীয় সৈন্য চীন সীমানা অতিক্রম করেছে এই অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে, যদি অচিরে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ না করা হয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে।

অন্যান্য রাষ্ট্রের মোট সাহায্যের বরাদ্দ কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের সাহায্যের পরিমাণ বাড়ান নিয়ে চীনে ও পাকিস্তানে ঘোর প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের মাসিক পত্রিকা 'ডিফেন্স জার্নাল'র এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের ভারতকে সাহায্যদান চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মিতালী রোধ করার একটি পন্থা মাত্র।'

চীনের 'পিপল্‌স্ ডেইলী'তে এক প্রবন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে লেখা হয়েছে যে, ভারত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে যতই বড়াই করুক না কেন, ভারত আসলে মার্কস্ ও এঞ্জেলের বর্ণিত সমাজতন্ত্রী দেশ নয়। অপর এক প্রবন্ধে ভারতের অর্থনৈতিক যোজনাকে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় যোজনা আসলে "রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য পুঁজিবাদ" (State monopoly Capitalism.)

রেঙ্গুনের দৈনিক পত্রিকা 'নেশন' চায়নার দূর প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়ার নমুনা বিবৃত করেছে। কম্বোডিয়ায় চায়না একটি প্লাইউড, একটি কাপড়ের ও একটি কাগজ নির্ম্মাণ কারখানা নির্ম্মাণ করেছিল। প্রত্যেকটাতেই নাকি শুরু থেকে উৎপাদনে যান্ত্রিক গোলযোগ লেগেই আছে এবং প্রিন্স সিহানুক চীন থেকে আর সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করেছেন।

পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বক্তৃতায় ভারতের আত্মপ্রস্তুতি পাকিস্তানের পক্ষে ভয়ের কারণ বলে অভিহিত করেছেন এবং ভারতকে নিজের স্বার্থে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিবৃদ্ধি থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান নাকি শীগ্‌গিরই নেপাল সফরে যাবেন।

বোধ হয় করাচী—কাটমুণ্ডু—পিকিং এক্সিস সম্পূর্ণ করতে।

কোলমংটাক্ চায়নার এক প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোষ্ট এক প্রবন্ধে

রাষ্ট্রপতি

বলেছে যে চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে নূতন করে কোন রকম সংযোগের কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করেছেন। ওয়াশিংটন পোষ্ট আর এক প্রবন্ধে চীন-পাকিস্তান চুক্তি ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে অধিকতর সুবিধা আদায় করবার ফন্দীমাত্র বলে অভিহিত করেছেন।

রটারডামের এক দৈনিক কাগজে নাকি এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে চায়না হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত দেশগুলিকে সংযুক্ত করে তাদের একটা তাবেদারী রাষ্ট্র নির্ম্মাণ করবার চেষ্টা করছে!

যুক্তরাষ্ট্র তারাপুর এটমিক পাওয়ার ষ্টেশন নির্ম্মাণ জন্য ৭ কোটী টাকা সাহায্য দান করতে অস্বীকার করেছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী ভারতবর্ষকে চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য সর্ব্বভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টাইমস্ অ· ইণ্ডিয়ার এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে ভারতের চাহিদা মত জঙ্গী বিমান সরবরাহ করতে নাকি যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃত হয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সফল হবার কতখানি সম্ভাবনা জানার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী শ্রীওয়াল্টার রোষ্টোকে ভারতে পাঠিয়েছেন। শ্রীরোষ্টো ভারত পরিদর্শন করে এক বিবৃতিতে ভারতের প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

লোকসভা:

লোকসভার বর্ত্তমান অধিবেশনের এখনও পরিসমাপ্তি ঘটেনি। চীন আক্রমণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ও পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করবার উপায় অনুধাবন চিন্তাই এখন দেশবাসীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান চিন্তা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং নেফায় পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে যে কমিটী নিয়োগ হয়েছে তাদের কি কি বিষয় অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে তাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে চীনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে চীনারা ১০ই এপ্রিল থেকে আরও ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দেবে।

প্রধানমন্ত্রী

আইনখাতে ব্যয়-বরাদ্দের বিতর্কের উত্তরে আইন-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এ, কে, সেন বলেছেন যে, দেশের এ দুর্য্যোগেও নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত করা হয় নাই।

এ সপ্তাহে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৩০ বৎসর পূর্ব হল। এই উপলক্ষে এয়ার মার্শাল শ্রীইঞ্জিনিয়ার এক ভাষণে বিমান বাহিনীর অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, জাতীর এ গুরুতর সঙ্কটকালে মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মসন্তোষ বোধ অথবা যুদ্ধপ্রস্তুতি শিথিল করা সমীচীন হবে না। এ উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গত নেফা যুদ্ধে বিমান বাহিনীর কর্ত্তব্য পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ বৎসরের একাডেমী ওয়ার্ড বিতরণ করেন। এ প্রসঙ্গে এক ভাষণে তিনি ভারতীয় ভাষার উপর ইংরেজী ভাষার প্রভাবের উল্লেখ করেন। বহু প্রতিজ্ঞার পর রাশিয়ার নাবিক তারাসভের বিচারের পরিসমাপ্তি হয়েছে। বিচারে তারাসভ মুক্তিলাভ করেছে। মুক্তির পরও ভারত থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে তারাসভ এক বিবৃতিতে ভারতীয় আইন ও আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের পথে চলেছেন।

অসন্তোষজনক পরিচালনার জন্য ভারত সরকার দিল্লীর বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারের পরিচালনাধীন আনিবার সাব্যস্ত করেছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন বর্ত্তমানে দিল্লীতে চলছে। এ অধিবেশনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার কি কি ব্যবস্থা হয়েছে এবং কলকাতার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু'জন মন্ত্রীর অর্থ নেওয়ার যে অভিযোগ হয়েছিল তার আলোচনা। ভবিষ্যতে কোন মন্ত্রী এরকম টাকা পেলে তার সঠিক হিসাব রাখবেন কমিটী এ নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

মাদ্রাজ:

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন মাদ্রাজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে দেশবাসীকে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে 'আমাদের কোন সমস্যা নেই এই ভেবে যেন আমরা নিশ্চিন্ত না থাকি।' তিনি আরও বলেছেন যে দল

নিরপেক্ষ, সকল ভারতীয়েরই গণতান্ত্রিক জীবন যাত্রা রক্ষা করার জন্য একমত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি এ কথাও বলেছেন যে 'আমরা জাতি হিসাবে অনুসন্ধিৎসু, নির্ভীক ও উদার। আমাদের প্রতিভা দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আসাম ঃ

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চালিহা, চীনাদের ভারত সীমান্তে প্রস্তুতি

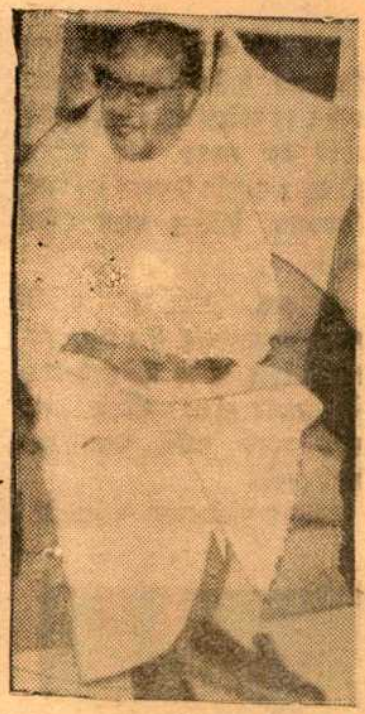

পি, বি, চালিহা

সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আসামের নাহারকোটিয়ার নূতন তৈলকূপে তৈল উৎপাদন সুরু হয়েছে। এক কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা খরচে যে নূতন পাইপ লাইন নির্ম্মিত হয়েছে তা দিয়ে ২৫০ মাইল দূরে গৌহাটীতে অশোধিত তৈল পাঠান সুরু হয়েছে।

রাজস্থান ঃ

গত ৩০শে মার্চ্চ রাজস্থানের সৃষ্টি থেকে ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই ১৪ বৎসরে রাজস্থানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হচ্ছে জায়গীরদার প্রথার অবসান ও গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠা। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ক্রমে ও সেচপ্রণালী বিস্তারে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ঘাটতি থেকে এখন প্রাচুর্য্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ৭·৫ মেগা ওয়েট থেকে ১০৯ মেগা ওয়েটে বেড়েছে। তৃতীয় যোজনায় উভয় ক্ষেত্রেই আরও উন্নতি হবে অনুমিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীকেশব চন্দ্র বোস একটি গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে ভারত রক্ষা বিধির দুইটি ধারার অধীনে আটক ব্যক্তিদের দেশদ্রোহী বলা অথবা তারা দেশদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত, এইরূপ বলা অন্যায় অথবা পার্লিয়ামেন্টারী রীতি-নীতি বহির্ভূত নয়।

বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বলেছেন বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার জন্য যে চেষ্টা চলছে সেটাকে ত্বরান্বিত করা হ'বে।

চরু চ্যাটার্জ্জী

দণ্ডকারণ্য উন্নয়নসংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন পদত্যাগ করতে পারেন এ সংবাদে বাংলাদেশে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। লো সভার বিতর্কে বাংলাদেশের সদ শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ এ সম্পর্কে বলেছে যে, এ সংবাদ সত্যি হ'লে পূ বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন প্রচেষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটবে।

দেবেন্দ্র দত্ত

লক্ষাধিক টাকা রপ্তানি শুল্ক ফ ৫০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বৈদেশি মুদ্রা ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে গ রবিবার সামুদ্রিক শুল্ক আইনে বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসা ধৃত কলকাতার ব্যবসায়ী মহম্ম সিরাজুদ্দিন-এর বিচার শুরু হয়েছে।

আসন্ন মেয়র ও ডেপুটি মেয় নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেস পক্ষ থে চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী ও দেবেন্দ্রলা দত্তের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে এঁদের নির্ব্বাচন এক রকম সুনিশ্চি বলা চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমব অনুমোদিত কলেজে ছাত্রদের জ এন, সি, সি, ট্রেনিং বাধ্যতামূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

মধ্যপ্রদেশ রাজনীতিতে ভূতপূ মন্ত্রী শ্রী ডি, পি, মিশ্রকে যোগ দিবা অনুমতি এ, আই, সি, সি, দিয়েছেন শ্রীযুক্ত মিশ্র তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করেন। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত মিশ্রে বিশেষ প্রভাব এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

দণ্ডকারণ্যে সৌন্দর্য

সভ্যমানুষের ধারণা, সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত সংস্কার। পদার্থটি মৌলিক, ওর আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

এ কথা হয় তো বয়ঃপ্রাপ্ত বিদগ্ধজন সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর মনে এ-বোধ থাকে কি? যদি থাকে তবে কী রূপে? আর যদি না থাকে, তবে জন্মায় কী করে?

আদি মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ কবে কী ভাবে গড়ে উঠল?

সৌন্দর্যের অনুভূতি এক থেকে অন্যে সঞ্চারিত হতে পারে। অর্থাৎ, এক জনের মনের যে ঝঙ্কনা জেগে ওঠে সুন্দরের স্পর্শে, তার অনুরণনে অন্য মনেও অনুরূপ ভাবের উৎপত্তি হতে পারে।

অনসূয়

সৌন্দর্যের অনুভূতি এক থেকে অন্যে সঞ্চারিত হতে পারে। অর্থাৎ একটি মনের সাময়িক স্পন্দনেই এর পরিসমাপ্তি নয়। সৌন্দর্যের যে চেতনা কখনো মৃদু সন্তোষ, কখনো অবাক বিস্ময় বা উচ্ছ্বাস অথবা গভীর সমাধিরূপে চিত্তে পরিস্ফুট হয়, তা মূর্তরূপে প্রকাশিত হয়ে অন্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় এবং গ্রহীতার মনে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করতে পারে।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় স্রষ্টা বা গ্রহীতার মনোভাব নয়। আমাদের জিজ্ঞাসার বস্তু উভয় মনের অন্তর্বর্তী রূপমূর্তি যার দ্বারা রসস্রষ্টা রসগ্রাহীর মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

দণ্ডকারণ্যের বস্তার জিলায় বাস এমন কতগুলি মানুষের যাদের মন অতি বিদগ্ধ নয়। এদের শিল্পকলা অনুশীলন করলে হয় তো সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাবে আদিম মানুষের সৌন্দর্য-বোধের মূল কোথায়। এই ভরসায় বিদগ্ধ শিল্পী-সমালোচকের জগৎ ছেড়ে দণ্ডকারণ্যেই প্রবেশ করা যাক।

বস্তারের শিল্পে মূর্তি গড়া হয় কাঠের অথবা ধাতুর। পাথরের মূর্তিও আছে, কিন্তু তার ইতিহাস জটিল। ভাস্করও সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু কাঠ খোদাই-এর কারিগর প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে। এরা স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী নয়, সাধারণ আদিবাসী পরিবারেই এদের উৎপত্তি এবং বিলয়।

পক্ষান্তরে ধাতুমূর্তি নির্মাতারা বস্তারের সমাজের বিশিষ্ট একটি শ্রেণী। মূর্তিগুলি প্রায়ই হয় কাঁসার কিন্তু তাদের স্রষ্টারা 'কাঁসারি' নয়। কাঁসারিরা একটি বিভিন্ন জাতি। মূর্তিশিল্পীদের শ্রেণীগত নাম 'ঘড়ুয়া'। হয় তো এরা কোনোদিন কাঁসার ঘড়া তৈরী করত, কিন্তু তার খ্যাতি আজ লুপ্ত, বিখ্যাত এদের তৈরী কড়াই। তাও দুষ্প্রাপ্য। আজ ঘড়ুয়ারা বস্তারে খ্যাত মূর্তি-স্রষ্টারূপে।

এদের শিল্পের অন্যতম সন্ধানী শ্রীমতী মীরা দেবী তিনি বলেছেন, "এদের হাতের কাজ আমি অনেকদিন আগেই দেখেছিলাম। এদের কাজের দু'টি গুণে আমি এদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হই। সে দু'টি গুণ, প্রাণশক্তি এবং নিঃসঙ্কোচ আবেদন। কিছুই জানতাম না আমি এদের সম্বন্ধে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে কাঁসা পিতলের মূর্তিগুলি যাদের করা তারা দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর মাটির বুকে।"

বাস্তবিকই, এরা এবং এদের গড়া মূর্তিগুলোও মাটিরই উপর দাঁড়িয়ে আছে। যে মাটিতে এদের বাস সেখান থেকেই এরা সংগ্রহ করে তাদের মূর্তি গড়ার সবগুলি উপকরণ। আর মূর্তিগুলোও দাঁড়িয়ে থাকে মাটির উপর।

উদাহরণ, "মাঙ্গি"। মূর্তিটি রূপকের ভাষায়ও বটে, যার বাস্তবিকও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপর। মাঙ্গি বস্তারের মুরিয়া মাড়িয়া এবং অন্যান্য অনেক জাতি উপজাতির উপাস্য দেবী।

বস্তারের মূর্তিগুলোর কাঠামোটা

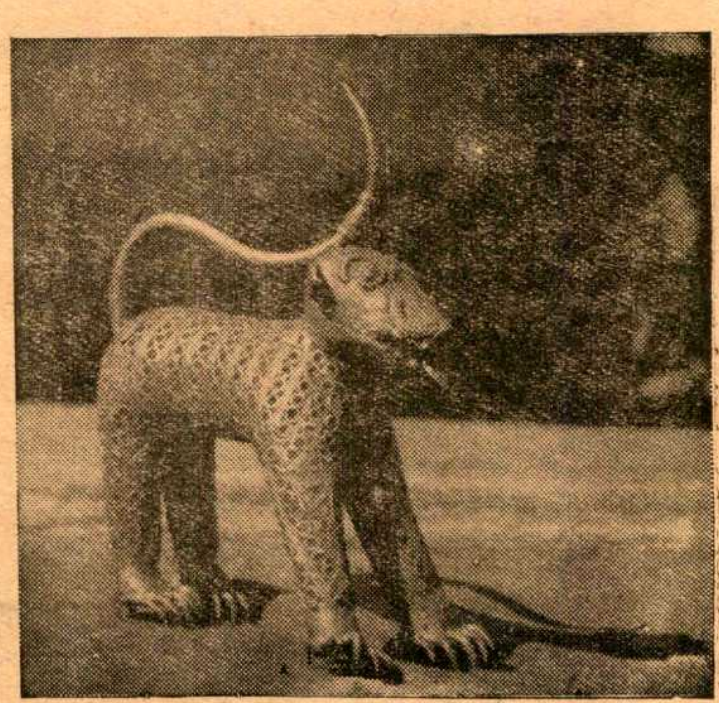

চতাবাঘের থাবা

হচ্ছে কাঠ-খড়ের নয়, মাটির। সেই কাঠামোর উপর মোমের মতো জড়িয়ে বসিয়ে তৈরী হয় মূর্তির ভবিষ্য রূপটি। পরে মাটির আস্তরণে মোমটিকে ঢেকে সেটি গালিয়ে নেওয়া হয় এবং শূন্যস্থানটা পূর্ণ করে গলিত কাঁসা।

অনেক রকম মাটি মিশিয়ে তৈরী করা হয় মূল কাঠামোটা। তার সে রূপে মূর্তির বাহ্যরূপ বা অলঙ্কার আড়ম্বর কিছুই থাকে না, থাকে শুধু তার সারবস্তু, হস্তপদমুণ্ডবিহীন দেহ-পিণ্ডটি। আর্টের সূক্ষ্মরূপের একটি দৃঢ় মেরুদণ্ডের প্রয়োজন—মাটির গড়া কাঠামোটি এই মেরুদণ্ড। মূর্তি গড়া যখন শেষ হয়, তখনও এই দৃঢ় মাটির কাঠামোর উপরেই কাঁসার পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু, যা ছিল রোদে শুকোনো কাঁচামাটি, তা হয় কালো পোড়া মাটি।

এই পিণ্ডদেহটির উপর শিল্পী আরোপ করে ধ্যানদৃষ্ট, সালঙ্কারা, সম্পূর্ণা মূর্তি। সৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী ধ্যানচ্যুত হয় না। বস্তারের মূর্তির মধ্যে যে দৃঢ়সন্নদ্ধ সামগ্রিক একতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান।

মূর্তিগুলি ছাঁচে গড়া নয়, প্রত্যেকটি মূর্তিই নতুন গড়া সৃষ্টি। যখন এরা সৃষ্টিসাম্য চায়, তখনও বিনা ছাঁচেই গড়ে এরা—যেমন দু' পায়ের দু'টি নূপুর—একটি আরেকটির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, অথচ দু'টিকেই গড়া হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে আলাদা আলাদা। কিন্তু আবার পর পর গড়া দু'জোড়া নূপুরে নক্‌শা আলাদা। বৈচিত্র্য বা সাম্য আকস্মিক নয়, সম্পূর্ণ ধ্যানানুসারী।

এদের রূপসৃষ্টির একমাত্র সমস্যা সমগ্র মূর্তিটিকে ধ্যানগোচর করা। তার পর পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত কারু-শিল্পীর হাত সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ধ্যান থেকে বাস্তবে। সে হাতে দ্বিধা নেই।

এ পদ্ধতি শুধু বস্তার নয়, ভারতীয় চারু-কারু শিল্পী সবারই। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, রাজারাণী প্রভৃতি স্থপতি ভাস্করদের উত্তরপুরুষ আজকের মহা-রাণাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীণ, তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনিও এই উত্তরই দেন। যারা "দৈত্যের মতো গড়ে, মাণিকারের মতো সম্পূর্ণ করে" সেই সব শিল্পীদের কাজে কেন কখনও খুঁত থাকত না, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজেরই কথা বলেন,—

"ছ' বছর বয়স থেকে হাতুড়ি বাটালি ধরেছি, সঙ্গে সঙ্গে শুনেছি যে মূর্তি আমি গড়ব তার ধ্যানমন্ত্র। বাবার হাতের কাজ দেখেছি। এক টুকরো পাথরের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে কাজ করে যাচ্ছেন—দৃষ্টান্ত নেই, নক্‌শা নেই, ক্রমে ক্রমে মূর্তিটি বেরিয়ে আসছে পাথর থেকে। মূর্তিটি যেন চিরকালই ছিল পাথরের ভিতর। বাবা শুধু তাকে দেখতে পেয়েছেন তাঁর হাতের হাতুড়ী-বাটালি মূর্তিটির আবরণ সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে।"

কথাকলি নৃত্যশিল্পীরাও এইই করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে সাজে। মুখে কথা নেই, সাজায় ডুবে আছে। সাজা তাদের সাজা নয়, লোক দেখানো নয়—তাদের রঙ-করা মুখোশ-পরা মুখগুলোই যেন তাদের সত্যিকারের মুখ। সাজা যখন তাদের শেষ হল, তখন আর তারা বর্তমান যুগের কেরলীয় নয়, তারা বীর রাম, সতী সীতা, বালি,

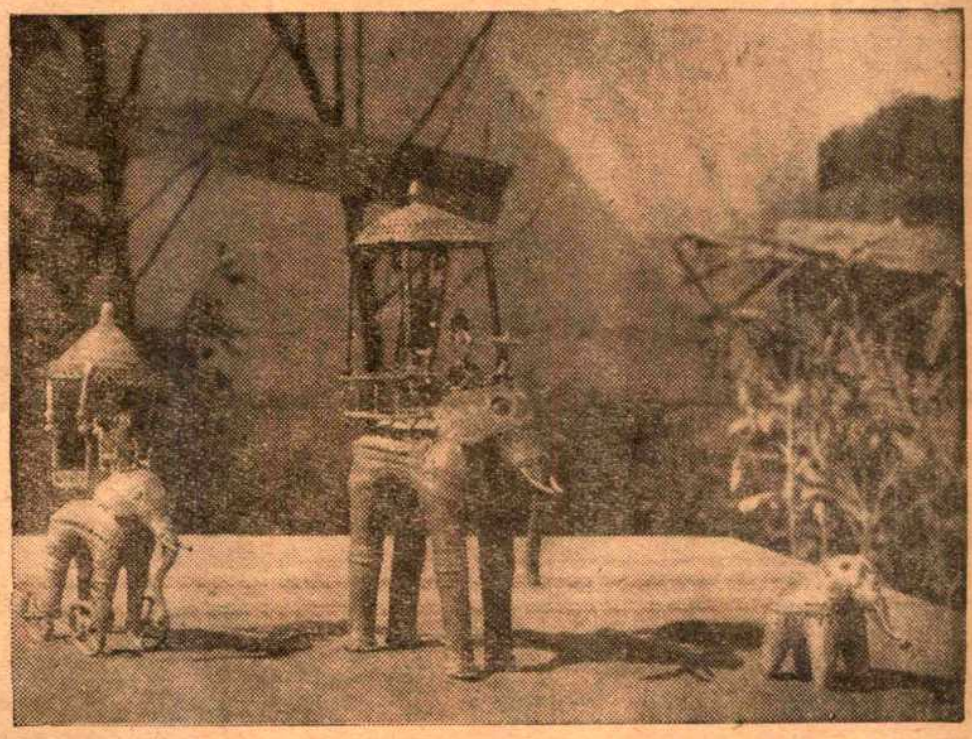

বস্তারের ৩ জন শিল্পী ৩টি ভিন্ন ভিন্ন হাতী তৈরী করেছেন। ক্ষুদ্রতম পুতুলটির সূক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষ্যণীয়।

নৃসিংহ অথবা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু।

এই সব শাস্ত্রীয় শিল্পীদের রসসৃষ্টির সঙ্গে বস্তারের কাজের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। কাঁসার এই কারিগরেরা হয় তো মোহেঞ্জোদড়োর যুগের ঐ ধ্রুবাহী শিল্পকার মোহেঞ্জোদড়োর নটীর মূর্তির সঙ্গে বস্তারের শিল্পীদের আদিম কাজগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মীরা দেবীর ধারণা বস্তারের মাতার মূর্তির সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে দক্ষিণ আমেরিকার একটি ইণ্ডিয়ান উপজাতির মাতৃমূর্তির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। এটা ঠিক, যে বস্তারের কাঁসার শিল্পীদের উৎপত্তি আদিবাসী মুরিয়া মাড়িয়াদের মধ্য থেকে নয়। অথচ মূর্তিগুলি গড়ে তারা আদিবাসীদেরই জন্য। বহু পুরুষ ধরে আদিবাসীদের জন্য মূর্তি গড়ে আসার ফলে এদের শিল্পে স্পষ্ট একটি আদিবাসী ছাপ পড়েছে। বস্তারের কাঁসার "ধুলা" দেখে অন্ধ্র মন্দিরের চোকস সোনা, রূপো বা পিতলের দোলনার কথা মনে হয় না, বরং মনে হয় শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য বন্য মাড়িয়ারা যে সব কাঠ খোদাই এর কাজ গুলো করে তার কথা।

"এই কারিগরেরা পূজোর জন্য ব্যবহৃত মূর্তি বা ধাতুপাত্র তৈরী করে। কারিগরেরা, এবং ক্রেতারা —উভয়েই স্মরণ রাখে এ সৃষ্টির প্রেরণা পূজায়। তাই স্রষ্টারা তাদের সশ্রদ্ধ কর্মনৈপুণ্য প্রয়োগ ক'রে কাজ গুলি সম্পূর্ণ করে। এবং তার মধ্যে ক্রেতারা বাছাই করে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি গুলি।" (মীরা দেবী)

এই দেওয়া-নেওয়ায় উপজাতিদের মানস চেতনার খানিকটা, সম্ভবত অনেকটা, কারুশিল্পীদের মনে প্রবেশ করে। শতাব্দীর বিবর্তিত সৌন্দর্য বোধ তাতে লুপ্ত হয় না—তার নিদর্শন অলঙ্কারে। কিন্তু আদিবাসীদের চোখে অলঙ্কারটাই আসল কথা নয়। মূর্তিটি যখন সে নিরীক্ষণ করে তার দৃষ্টি খোঁজে সেই চিহ্নটি—চন্দ্র, সূর্য, যেটি না থাকলে তার মধ্যে দেবত্বের গুণ জন্মায় না; মূর্তিটি হয় শুধু একটি রোবা পুতুল, কাঁসা বা পিতলের একটি খণ্ড। এই দৈব চিহ্ন যে যে মূর্তির সঙ্গে থাকে তারই মধ্যে থেকে সে বেছে নেয় সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আজকের আধুনিক অতিবিদগ্ধ রসদ্রষ্টার চোখে বস্তার শিল্পের যে কাজ কটি সবচেয়ে ভালো লাগে, দক্ষ আদিবাসীরাও বাছাই করে সেই গুলিকেই এমন হয় একবার নয় বার বার, যে বিদগ্ধ কোনো আগন্তুক নানান্ কারিগরের নানা কাজের মধ্য থেকে একটি কাজ বাছাই করে, পরে কিনবে বলে; পরের হাটে এসে দেখে সে মূর্তি অন্তর্হিত। সম্পন্ন কোনো আদিবাসী প্রধান এসে সেটিকে নিয়ে গেছে, পরিবর্তে দিয়ে গেছে একটি মূল্যবান মহিষশাবক। কী প্রমাণ হয় এ থেকে যে, মানুষে মানুষে একটা মূলগত রুচি-সাম্য আছে? না-ও হতে পারে। এও হতে পারে যে, বহু ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা এবং রসচর্চার ফলে বিদগ্ধ রসগ্রাহীর মনে আদিবাসীরই রুচিবোধ আরোপিত হয়েছে। আদিবাসী কী খোঁজে তার মূর্তি নির্বাচনে? হয়তো ঐ "নিঃসঙ্কোচ আবেদন", "প্রাণশক্তি", শক্তি-ব্যঞ্জক দৃঢ়মূল স্থাপত্য॥ অলঙ্কার তাকে প্রথমে আকৃষ্ট করে নি, তার কাম্য ছিল মূর্তিটির আত্মপ্রত্যয়॥ অলঙ্কারের বাহুল্য তার চোখ ধাঁধায় নি, সে মুগ্ধ হয়েছিল অলঙ্কারের সৃষ্টি এবং বিন্যাসে অলঙ্কারিকের অন্তরের শক্তায়। নৈপুণ্যের যাদুকরী তার চোখ ঠকায় নি, তার চোখ মূর্তির চেয়েছিল সিদ্ধির অঙ্গীকার

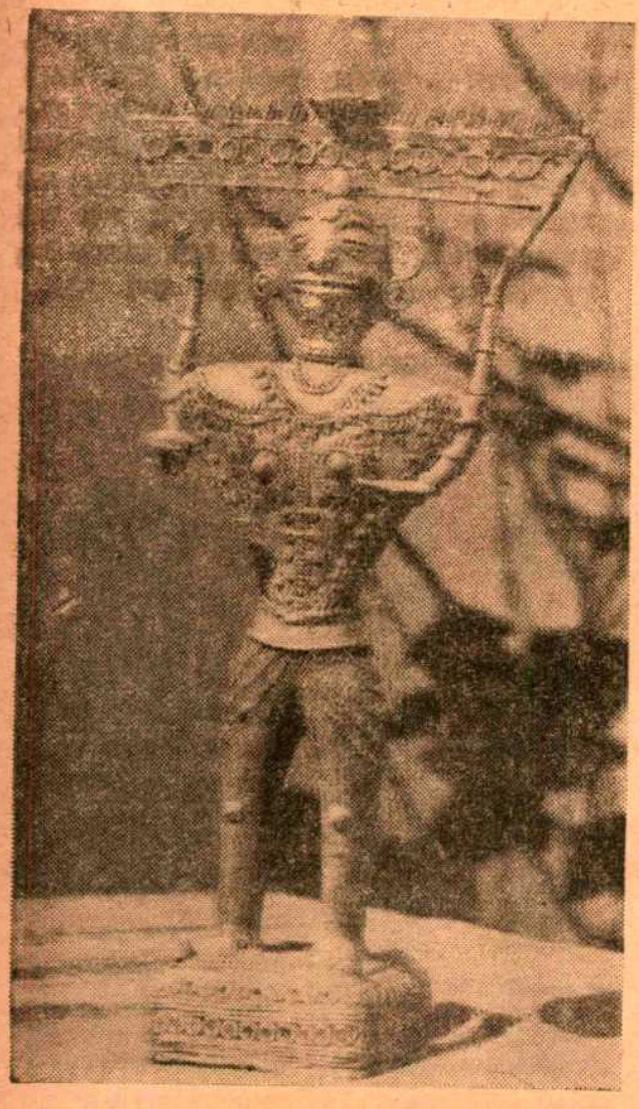

বস্তারী ঢংএর প্রভাবলী হস্তে কারুকার্য খচিত মাঙ্গ মূর্তি।

সংবাদ-চিত্র

ক্রিষ্টিন কীলার

লাস্যময়ী মডেল ক্রিষ্টিন কীলার ফিরে এসেছেন আবার লণ্ডনে। লণ্ডন শহরের বুকে বিরাট আলোড়ন তুলে তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন স্পেনে।

তাঁকে নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টেও ঝড় উঠেছিল। জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জন প্রোফিউমো। পার্লামেন্ট ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়েছে পার্লামেন্টে। বলেছেন, এক বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ক্রিষ্টিনের সাক্ষাৎ হয়নি। বিবৃতির পর গিয়েছিলেন সস্ত্রীক নাচঘরে। পরমানন্দে সকলের সামনে নেচেছেন দু'জনেই।

২১ বছরের তরুণী কীলারের প্রধান উপজীবিকা নিজের প্রতিকৃতি বিক্রী করা। আর সব মডেলের মত তাঁরও পুরুষ বন্ধু থাকা স্বাভাবিক। বান্ধবীর কৃপালাভের জন্য তাদের মধ্যে রেশারেশি থাকাও বিচিত্র নয়। এমনি, একজন কৃপাপ্রার্থী ৩০ বছরের তরুণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের জন এজকোম্বে। কীলারকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে সাত বছর কারাদণ্ডে আজ এজকোম্বে দণ্ডিত। এই মামলায় কীলার সাক্ষীর কাঠগড়ায় না উঠে হয়েছিলেন নিরুদ্দেশ। ২৯শে মার্চ্চ লণ্ডনে ফিরে এলে বিমান ঘাঁটিতে তাঁকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল সাংবাদিকদের মধ্যে। জখমও হয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ।

এজকোম্বে আপীল করেছেন তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে। এই উচ্চ আদালতের মামলায় হাজির না হলে কীলারকে জরিমানা দিতে হবে ৪০ পাউণ্ড। অনাদায়ে কারাভোগ করতে হবে এক মাসকাল।

শিল্পায়মান দেশের করনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ

সেবা রায়

[ফলিত অর্থনীতির শাখাগুলির মধ্যে করনীতির সংগেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্পর্ক নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ, কারণ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের কর দিতেই হয়, কর দেওয়া এবং আমাদের পকেটের পারস্পরিক সম্পর্ক বিপরীতমুখী, কাজেই আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কর মাত্রেই "প্রয়োজনীয় আপদ"—এই মনোভাব খুবই স্বাভাবিক এবং করদাতাদের বৃহত্তম অংশ যদি সন্তুষ্ট মনে করভার বহন করতে না চান, তবে অবাক না হয়ে বা তাঁদের উপর দোষারোপ না করে করনীতির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তা তাঁদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা "পুলিশী" রাষ্ট্র থেকে কল্যাণব্রতী

রাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে এবং সংগে সংগে করনীতির তাত্ত্বিক দিকটিরও রূপান্তর ঘটেছে। আজকের তাত্ত্বিক করনীতি কল্যাণ আদর্শাশ্রয়ী একটি ফলিত বিজ্ঞান; অবশ্য বলা বাহুল্য, সে কল্যাণ সামগ্রিক। কিন্তু আধুনিক অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত এই বিজ্ঞানের আলোচনা এবং বিবর্ত্তন মুখ্যতঃ উন্নত দেশগুলির পটভূমিকাতেই হয়েছে, যার ফলে এর সাধারণ সূত্রগুলি ধনতান্ত্রিক (বা সংশোধিত ধনতান্ত্রিক) এবং অগ্রসর অর্থনীতির কাঠামোতেই পুরোপুরি প্রযোজ্য। শিল্পায়মান অনগ্রসর দেশের পটভূমি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, কাজেই এই পরিবর্ত্তিত পটভূমিতে মূলসূত্রগুলির প্রয়োগ ন্যূনাধিক সংশোধনসাপেক্ষ। উদাহরণ হিসেবে, অগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামোয় তেজী-মন্দার অনভিপ্রেত চক্রের নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হিসেবে করনীতি প্রয়োগের প্রয়োজন, কিন্তু শিল্পায়মান অনগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামোয় সে সমস্যা প্রায় অনুপস্থিত। শেষোক্ত ক্ষেত্রে করনীতির ভূমিকা নিয়ন্ত্রণমূলক না হয়ে গঠনমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ ত্বরান্বিত মূলধন গঠনে সুপরিকল্পিত করনীতি অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর দেশগুলি তাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য করবিন্যাসের উপর যথেষ্ট নির্ভর করছে, এবং আমাদের দেশেও করনীতির উপর এই গুরুত্ব সমানভাবে আরোপিত।

করনীতির গঠনমূলক প্রয়োগ ছাড়াও অগ্রসর এবং অনগ্রসর উভয়শ্রেণীর অর্থনৈতিক কাঠামোতেই অবস্থা বিপাকে যুদ্ধকালীন বা জরুরী অবস্থাকালীন করনীতির অনুসরণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সে প্রয়োজন বর্ত্তমানে দেখা দিয়েছে। আমাদের আজকের করনীতি তাই গঠনমূলক এবং জরুরী অবস্থাকালীন করনীতির মিশ্রিতরূপ এবং এই নীতির অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলিকে জনসাধারণের সামনে সহজভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সমস্যার স্বরূপ বোঝার জন্য তাত্ত্বিক করনীতির মূলসূত্রগুলির সংগে কিছুটা পরিচিতি অপরিহার্য্য, কাজেই নীচে কতকগুলি গোড়ার কথা বলে নিতে হ'চ্ছে]

কর কি? আমরা কর দিই কেন?

আমরা প্রায় সকলেই ট্যাক্স বা কর দিয়ে থাকি। এই কর দেওয়ার প্রথা মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। কর সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা তাই অনেকেরই আছে এবং প্রতিবার বাজেটের আগে (এবং পরে) আমাদের ট্যাক্সসচেতনতা নানারকম আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ট্যাক্সের বোঝার পিছনে যে যুক্তিগুলি আছে, সেগুলি সম্পর্কে ধারণা অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট না হওয়ায় ট্যাক্সগুলিকে

"প্রয়োজনীয় আপদ" বলেই মনে হয় এবং সমকালীন করবিন্যাসের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করলেই এই আপদের মনোভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

করনীতির উদ্দেশ্য বিচারের আগে কর সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

আমরা সরকারকে অনেক রকম ভাবে পয়সা দিয়ে থাকি, যেমন ধরুন খাম-পোষ্টকার্ডের দাম, জমির খাজনা, মামলা-মোকদ্দমার কোর্ট ফি এবং সর্বোপরি নানারকম ট্যাক্স। এর সব গুলিই কিন্তু ট্যাক্স নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের বিনিময়ে পয়সা দেই, যেমন, খাম পোষ্টকার্ডের দাম এবং কোর্ট ফি, আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা যে পয়সা দিতে বাধ্য হই তার সরাসরি বিনিময়ে ঠিক সমমূল্যের ব্যক্তিগত উপকার আমরা পাই না, যেমন, আমি ৫০ টাকা আয়কর দিলে আমার ক্রয়-ক্ষমতা ৫০ টাকা কমে যায়, কিন্তু সোজাসুজি কোনও উপকার আমার হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রদেয় পয়সাগুলিই ট্যাক্স; কারণ এগুলি আমরা বাধ্যতামূলক ভাবে সরাসরি ব্যক্তিগত উপকার ছাড়াই দিয়ে থাকি।

ট্যাক্স মোটামুটি দু'রকমের—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যেখানে আমার দেওয়া ট্যাক্স আমি অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না, সেখানে ট্যাক্স প্রত্যক্ষ—যেমন, আয়কর; আর যেখানে যিনি ট্যাক্স দিচ্ছেন তিনি সমান পয়সা (কিছু কম বেশী) অন্যের কাছ থেকে তুলে নিতে সক্ষম হন, সেখানে ট্যাক্স পরোক্ষ। যেমন, সেলস্ ট্যাক্স বা বিক্রয়-কর, যা সরকার দোকানদারদের কাছ থেকে আদায় করলেও তার আসল বোঝাটা আপনাকে আমাকে বইতে হয়। কতদূর পর্য্যন্ত এইভাবে ট্যাক্স স্থানান্তরিত করা সম্ভব, সেটা অবশ্য নির্ভর করবে যে জিনিষের উপর ট্যাক্স বসেছে তার চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতার উপর, অর্থাৎ যদি এমন জিনিষের উপর ট্যাক্স বসে যা দাম পড়া সত্ত্বেও আমাদের প্রায় সমান পরিমাণই কিনতে হয়, তবে দোকানদারের পক্ষে ট্যাক্স স্থানান্তর করা সহজ হবে, কারণ বর্দ্ধিত দামেও তার মোট বিক্রয়ের বিশেষ তারতম্য হবে না। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত কম অপরিহার্য্য জিনিষের উপর ট্যাক্স স্থানান্তরিত করলে বিক্রির পরিমাণে যথেষ্ট তারতম্য হবে, কাজেই দোকানদার যতদূর সম্ভব নিজে ট্যাক্সের ভার বয়ে দাম অপরিবর্ত্তিত রাখার চেষ্টা করেন। ট্যাক্স স্থানান্তরকরণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আলোচনা আমাদের বিষয়-বস্তুর জন্য নিষ্প্রয়োজন।

উপরে আলোচিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর ছাড়াও আধুনিক করনীতি আরও কয়েক উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে পয়সা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে—যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে ট্যাক্সের মধ্যেই পড়ে না। এই অতি-গৌণ করগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে কৌশলে ক্রয়ক্ষমতা তুলে নেয়। ধরুন—কৃত্রিম উপায়ে অর্থসৃষ্টি করে মূল্যমান বাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু জনসাধারণের আয় বাড়তে দেওয়া হল না। ফলে আপনি আমি আগের চেয়ে কম জিনিষ কিনতে পারব এবং সমাজের পক্ষ থেকে কিছুটা উদ্বৃত্ত

সৃষ্টি হবে, যেটা অন্যভাবে কাজে লাগান যাবে। কাজেই যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন করই বসানো হয়নি, তবুও প্রকৃতপক্ষে ফল ট্যাক্স বসানোরই সমান দাঁড়াচ্ছে। সরকার কর্ত্তৃক জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার মধ্যেও এই অতি-গৌণ করের নীতি প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করে।

আধুনিক কর-সমষ্টির প্রকারভেদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেলাম। এখন আমরা দেখব—এই কর-সমষ্টির যৌক্তিকতা কোথায় এবং বিশেষ করে আমাদের মত অনগ্রসর অর্থনীতিতে সেই যৌক্তিকতার নিরিখ কি কি? এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে, সরকারের কাঠামো বজায় রাখার জন্য এবং তার সর্ব্বনিম্ন কাজকর্ম্ম চালানোর জন্য টাকা দরকার এবং এ টাকা জনসাধারণের কাছ থেকেই সরকারকে নিতে হবে। কাজেই কিছুদূর পর্য্যন্ত ট্যাক্সের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা সীমার পর থেকেই প্রশ্ন উঠবে যে, ট্যাক্স হিসেবে তোলা টাকা নিয়ে সরকার যেসব কাজ করছেন বা করতে চাইছেন, সেগুলি সরকারের করাই অপরিহার্য্য কি না। অর্থাৎ সংক্ষেপে করনীতির যৌক্তিকতা রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে মতভেদ বহুদিন আগেই বিদেশে হয়েছে এবং বৃটেনের গ্লাডষ্টোন সাহেবের মতে টাকা যতদূর সম্ভব লোকের পকেটে থাকাটাই সমষ্টিগত ভাবে শুভকর হিসেবে একসময় বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে এবং আজকের সামাজিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নের নিরিখে বহুক্ষেত্রে টাকা সরকারের হাতে খরচ হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে বর্ত্তমান করবিন্যাসকে সর্ব্বাধিক সামাজিক কল্যাণ এবং সর্ব্বনিম্ন সামাজিক ত্যাগ—এই দুই দিক থেকে বিচার করা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এককভাবে করা সম্ভব নয় এ রকম কয়েকটি বিশেষ কাজ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকই তাঁর নিজের টাকা তাঁর নিজের মতে সবচেয়ে কল্যাণকর ভাবে খরচ করবেন এবং যেহেতু ব্যষ্টিকে নিয়েই সমষ্টি, ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক কল্যাণের যোগফল নিশ্চয়ই সমাজের পক্ষেও সর্ব্বাধিক কল্যাণকর হবে। আপাতদৃষ্টিতে এ যুক্তি জোরালো মনে হলেও, একটু চিন্তা করলেই এর গলদ ধরা পড়বে। ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক কল্যাণের যোগফল তখনই সর্ব্বাধিক সামাজিক কল্যাণকর হবে, যখন একজনের ব্যক্তিগত কল্যাণের সঙ্গে আর একজনের ব্যক্তিগত কল্যাণের কোন বিরোধ নেই।১ অন্যথায়

[১ ব্যক্তিগত কল্যাণের যোগফল বলতে কোন পরিমেয় উপযোগিতা সমষ্টি (cardinal utility summarian)

আবার কল্যাণ যে পরিমাণ বাড়বে, তার তুলনায় আপনার কল্যাণ যদি বেশী কমে যায়, তাহলে মোট সামাজিক কল্যাণ না বেড়ে কমে যাবে। যে কোন বাস্তব সমাজে এইরকম পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। যেমন ধরুন পাড়ার মধ্যে খানিকটা খালি জায়গায় আমি যদি ইঁট পুড়িয়ে নিই তাহলে আমার বাড়ী তৈরীর খরচ কম পড়ে এবং আমার কল্যাণ হয় কিন্তু ইঁট পোড়ানির অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ায় পাড়ার সকলের যে অকল্যাণ হবে তার ফলে সমষ্টির পক্ষে ব্যাপারটা শুভকর না হয়ে রীতিমত অশুভকর হবে অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় মোট সামাজিক কল্যাণ না বেড়ে কমে যাবে। আবার ধরুন আমার মতে জমানো টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে একটা ভাল গাড়ী আমিয়ে নিলে আমার সবচেয়ে বেশী কল্যাণ হয়, কিন্তু সে টাকাটা দিয়ে একটা ছোট কারখানা করলেও কিছু লোকের কর্ম্মসংস্থান হয় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এখানেও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কল্যাণ পরস্পর বিরোধী।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কার্য্যকলাপের দুটি দিক আছে, একটি ব্যক্তিগত উপকার এবং অন্যটি সামাজিক উপকার। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ দু'টি যে সব সময় সুসমঞ্জস হবে সাধারণতঃ তার তেমন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই অভিপ্রেত সমঞ্জস বিধানের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রের হাতে বিন্যাস ভার ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়। সে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্ব্বনিম্ন সামাজিক ত্যাগের ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে সর্ব্বাধিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সে অর্থ নিয়োজিত করবে।

সামাজিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নানাবিধ করের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং সে অর্থের ব্যবহার—উভয়ই উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। উৎপাদন পূর্ব ব্যক্তিস্বতন্ত্র সমাজব্যবস্থায় যে বিন্যাস অনুযায়ী হত করবিন্যাস এবং রাষ্ট্রের উৎপাদনমূলক কার্য্যকলাপের ফলে সে বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রে করনীতি প্রভাব আরও স্পষ্ট এবং সুদূর প্রসারী। সরকার কর আদায় করেন মোটামুটি করদাতাদের ক্ষমতা অনুযায়ী, কাজেই অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন স্তরগুলির উপরই করভার বেশী পড়ে। সংগৃহীত অর্থের ব্যবহার কিন্তু সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্যই—কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই—করা হয়। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে আয়ের পুনর্বিন্যাস হয় এবং সমপরিমাণ অর্থের মূল্য ধনীর চেয়ে দরিদ্রের সঙ্গে বেশী হওয়ায় এই পুনর্বিন্যাস সাধারণতঃ সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। (অবশ্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম আয় পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টা মূলতুবী রাখার প্রয়োজন হয়ঃ এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে)।

আমি বোঝাতে চাইছি না। 'Ordinal aggregation' (Scitarstry'র community indifference' তুলনীয়) এর অর্থেই যোগফলের উল্লেখ করা হয়েছে। Social aggregation-এর তাত্ত্বিক অসুবিধাগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক ধরে নেওয়া হয়েছে।]

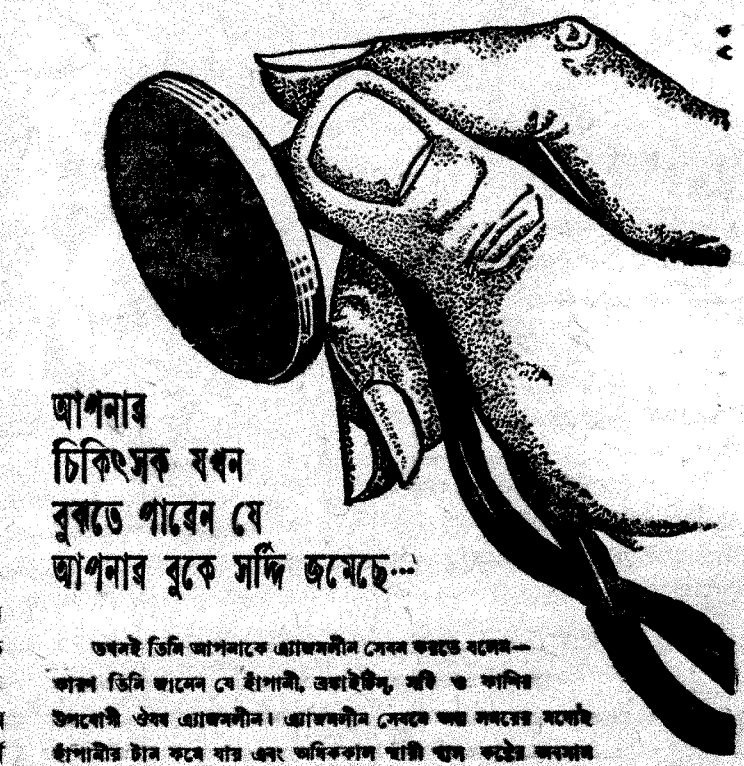

আপনার
চিকিৎসক যখন
বুঝতে পারেন যে
আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলেন—
কারণ তিনি জানেন যে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দি ও কাশির
উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই
হাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিককাল স্থায়ী ঘন কফের অবসান
ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত আরাম লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন

শ্বাসকষ্টের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ

প্রস্তুতকারক—
ডি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ
১১।১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩

বিজ্ঞানের গতিপথ

দিগ্‌দর্শক

পৃথিবীতে নতুন নতুন কত জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে, উদ্ভাবন হচ্ছে, তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন থেকে তার একটা পরিচয় মেলে—যার সংখ্যা দাঁড়াবে বহু লক্ষ। কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্ভাবনই অভিনব হলেও, তার মধ্যে কতকগুলির জাত একেবারেই আলাদা। এই আলাদা জাতের উদ্ভাবনের মধ্যে প্রায় পাঁচ বছর আগের স্পুটনিককে নিশ্চয় আলাদা জাতের বলা চলে। বলা চলে: এমনটি এর আগে আর হয় নি। তেমনি, সম্প্রতি অ্যামেরিকাতে আর একটি নতুন উদ্ভাবন হয়েছে। ব্যাপারটা যাঁরা ছবি তোলেন তাঁদের পক্ষে একটি অতি আশ্চর্য সংবাদ। এমনটি এর আগে আর হয় নি।

এই অদ্ভুত উদ্ভাবন হয়েছে রঙিন ফিল্ম-এর প্রোসেসিং-এর ব্যাপারে। এর আগে রঙিন ছবি তোলা সহজ হয়ে এসেছিল। দ্রুত এক্সপোজার দেওয়া যায় এমন ফিল্মও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু প্রোসেস্ করতে সেই প্রচুর সময় লেগেই যাচ্ছিল। ছবি তোলার পর ছবি ডেভেলপিং-এর দোকানে দিতে হচ্ছিল—দোকানদার সময় বুঝে সেটিকে পাঠাচ্ছিল ল্যাবরেটরিতে। সেখানে অন্তত একদিন প্রয়োজন হচ্ছিল। সব সাকুল্যে রঙিন ছবি পেতে তিন দিন লাগছিল—অ্যামেরিকাতেই। আমাদের দেশে আরো বেশি সময় লাগছিল।

কিন্তু এ সমস্যা আর অ্যামেরিকাতে থাকবে না। পরে, আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীতেই এই আশ্চর্য উদ্ভাবনের পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা। ছবি তোলার মধ্যে আনন্দ নেই, কারণ ক্যামেরার শাটার টিপলে একটি অল্প আওয়াজ হয়—আসল আনন্দ ছবি দেখবার সময় হয়। কিন্তু ছবি তোলা আর ছবি দেখার মধ্যে সময়ের ব্যবধানে ছবি তোলার আনন্দ যায় কমে। সেই কারণে পৃথিবীতে যত ক্যামেরা আছে তার তুলনায় ছবি তোলার সংখ্যা অনেক কম। চট পট যদি ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখা যায় তাহলে ছবি তোলার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষত যদি ছবিটা হয় রঙিন?

দু-এক মিনিটে সাদা কালো ছবি তোলা, ছবি দেখা যেত বহু বছর আগেও। রাস্তায় রাস্তায় আমরা দেখেছি এই ছবি তোলা। তা ছাড়া বিলেতের নানা দোকানে, ষ্টেশনে স্বয়ংক্রিয় ছবি তোলা, ছবি ডেভেলপ করা, প্রিন্ট করার যন্ত্র থাকে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট মুদ্রা ফেললেই হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, এবং দু'-এক মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা হাতল টিপলেই ছবি বেরিয়ে আসে। এর-জন্য কোনো মানুষের সাহায্য লাগে না। কিন্তু এগুলো তাড়াতাড়ি হলেও প্রোসেসিং করতেই হত আলাদা-ভাবে। রাস্তায় যারা ছবি তোলে, তাদেরও বড় বাক্স থাকে, তাতে তারা ডেভেলপ করে থাকে, আর বিলেতের ছোট ছবিঘরেও স্বয়ংক্রিয় ডেভেলপিং এর ব্যবস্থা।

• • •

পোলারয়েড কোম্পানী এই সমস্যা সমাধান করেছিলেন। সাদা-কালো ছবি যাতে ক্যামেরার মধ্যেই প্রোসেস করা যায়, এমন ব্যবস্থা করে এমন ক্যামেরা বাজারে অনেকদিনই বেরিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে সেটির জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই হঠাৎ আশ্চর্য করে দেওয়া সংবাদ—রঙিন ছবি ক্যামেরার মধ্যেই প্রোসেস করার ব্যবস্থা এবং সর্ব সাকুল্যে সময় লাগছে যে জন্য মাত্র দু' মিনিট, এই আশ্চর্য সংবাদে পৃথিবীর ফটো তোলা মানুষ উৎফুল্ল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য ক্যামেরা এবং ফিল্ম কোম্পানীর মাথা ব্যথা।

অবশ্য আমাদের দেশে এরকম ক্যামেরা হয়ত আসতে আসতে বেশ কয়েক বছর কেটে যাবে। আর আমাদের দেশে এরকম জিনিস তৈরি করতে কেটে যাবে কয়েক কুড়ি বছর।

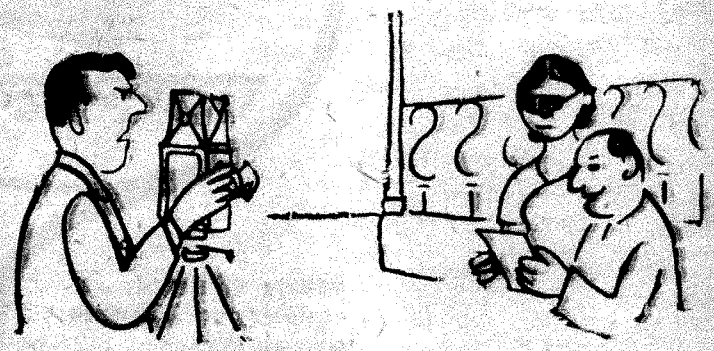

রঙিন ছবি, তোলার পরেই দেখা যাচ্ছে।

বিদেশে যে কত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে তার জন্য তাদের উদ্ভাবনী শক্তিই যে দায়ী তা নয়। প্রয়োজনের জন্যই কতকগুলো জিনিস তৈরি করে নিতে হয়। প্রয়োজন আছে বলেই সে সম্বন্ধে গবেষণা হয় এবং গবেষণা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। যখন কিছুতেই ঘড়ি আর সঠিক হয় না, তখন কার সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছিল? যে লোকটা বাড়িতে থাকে, অফিসে যায়—ফিরে আসে তার ঘড়ি যদি দিনে দু-এক মিনিট দ্রুত থাকে, বা দু-এক মিনিট পিছিয়ে থাকে তা হলে তার কোনো রকম অসুবিধেই হয় না। যেটুক হয়

সেটুকুর জন্য বিরাট কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে লোকটি সমুদ্রে রয়েছে, তার পক্ষে কিন্তু সময়টা যত সঠিক

পুরনো আমোলের ছবি তোলা।

হয় ততই তার পক্ষে ভাল। সময় সঠিক থাকলে দিকও তার ভুল হয় না। তাই ইংল্যাণ্ডের সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, সঠিক ঘড়ি আবিষ্কারককে কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এরকম ঘড়ির আবিষ্কারকের পুরস্কার পেতে বিলম্ব হয় নি। অবশ্য "সঠিক" ঘড়ি বলতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যা বোঝেন তার তুলনায় দু'শো বছর আগে সে ঘড়ি সঠিক ছিল না। কিন্তু কাজ চলে যেত। আজকাল ইলেকট্রিক ঘড়ির সাহায্যে এক সেকেণ্ডকে দশলক্ষ ভাগের এক ভাগেরও যাতে গরমিল না হয় তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

* * *

প্রয়োজন তাই আবিষ্কার। প্রয়োজন নেপোলিয়নের—সেনাবাহিনীকে খাদ্য যোগানোর। কিন্তু জিনিসপত্র ঠিকমত রাখা যাচ্ছে না সব পচে যাচ্ছে। দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কি করলে খাদ্য বেশিদিন রাখা সম্ভব? নেপোলিয়ন বললেন, যিনি খাদ্য টাটকা রাখবার কৌশল আবিষ্কার করবেন তাঁকে কয়েক হাজার টাকা দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ফল হল।

আবিষ্কার হল খাদ্যকে টিনে ভর্তি করার কৌশল। দেখা গেল খাদ্যকে ফুটিয়ে নিয়ে বায়ুহীন টিনে ভর্তি করলে সে খাদ্য টাটকা থাকে বহুদিন।

এই আবিষ্কার হঠাৎ কারুর মাথা থেকে বেরোয়নি। এই অভাবটা ছিলই। বহুলোকই তার সমস্যা সমাধানের কথা ভেবেছে, কিন্তু কার্যত কিছু হয়নি।

তার কারণ সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য যোগানোর সমস্যা অমন প্রবল ভাবে এর আগে আর দেখা দেয়নি।

* * *

দেখা গেল পাহারাদাররা নানা-রকম ভুল করতে পারে। এটি হল সমস্যা। তারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তারা ঘুষ নিতে পারে, তারা ভুল করে শত্রুকে মিত্র মনে করতে পারে—এবং মিত্রকে শত্রু তো মনে করতে পারেই।

যান্ত্রিক পাহারাদার কি সৃষ্টি করা যায় না?

আবিষ্কার হল ইলেকট্রিক আই!

এর সাহায্যে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত। এমন কি চুরির খবর দিয়ে দেয় পুলিসকে।

হাঁ হাঁ করে পুলিস আসে ছুটে।

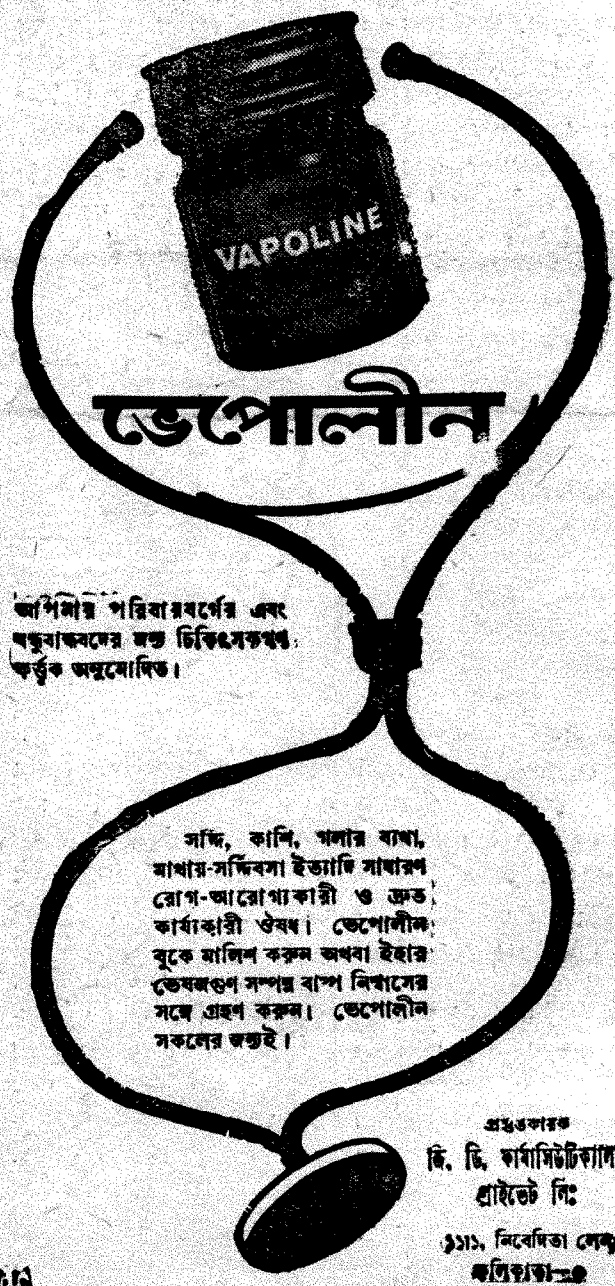

রঙ্গজগৎ

সৎ ভাই

মা, তার গর্ভজাত পুত্র, সতীন-পুত্র ও দুই পুত্রবধূ— কান এক গ্রামের এই পাঁচটি চরিত্র আশ্রয় করে স্নেহ ও প্রেমরসের চতুর্থ-দশকীয় বন্যা; নিকৃষ্ট হিন্দী ছবির অনুকরণে বিভিন্ন সময়ে শর্টস, সুইমিং কস্ট্যুম ও ঘাঘরা পরা এক ধনীকন্যার জলকেলি, প্রণয়ীর সঙ্গে গীটার ও ইংরাজী গান সহযোগে প্রেমলীলার বিকৃত রস; ভানু-জহর-নৃপতি পরিবেশিত হাস্যরস; দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বীররস; কয়েকটি কিশোর বালকের একটি নধরপুষ্ট খাসী কেটেকুটে রান্না করে খাওয়ার (তা'ও আবার নৃত্যের তালে তালে) বীভৎস রস এবং পরিশেষে দু'টি মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক-সঙ্গীতের করুণরস ইত্যাদি যাবতীয় রসে টইটম্বুর ছবি 'সৎ ভাই'। তার সঙ্গে রয়েছে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উন্নতি নিয়ে বাগাড়ম্বর, শিল্প ও কৃষির হাস্যকর দ্বন্দ্ব।

তারু মুখোপাধ্যায়ের আগের ছবি দু'টিতেও ("অ্যাটম বোম্" ও "ইঙ্গিত") এমনি নিদারুণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিতই অবশ্য বর্তমান ছিল। তাই অবাক হয়ে ভাবি, এমন ছবি তোলার জন্যে পয়সাও জোটে, প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহও পাওয়া যায়! অথচ ঋত্বিক ঘটকের "সুবর্ণরেখা" বা বারীন সাহার "তেরো নদীর পারে"র মত ছবি নাকি পরিবেশক ও প্রদর্শকের অভাবে স্টুডিওর অন্ধকার গুদামে বন্দী হয়ে আছে। দেশের আপৎকালীন অবস্থায় অপচয় অপরাধ। তারু মুখোপাধ্যায়ের মত পরিচালকদের (প্রযোজক ও কাহিনীকারও বটে) শুধু এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

স্বামীজীর ডাক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-দপ্তর 'স্বামীজীর ডাক' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারী চিত্র পরিবেশন করেছেন। ছবিটির পরিচালক সমীর ঘোষ। ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাঙালী যুবসমাজকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, উনিশশ' তেষট্টি সালের যুবাদের উপদেশ দিতে গিয়ে সমীর ঘোষ সেই সমস্ত কথা ব্যবহার করেছেন। এই চতুরতাটুকুর জন্যে অনেকের কাছে আধুনিক যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-গুলি আরো ভারী মনে হয়েছে। আধুনিক যুবকদেরই একজন হয়ে সমীর ঘোষ তাদের মনঃসমীক্ষণ করতে কতখানি সফল হয়েছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে তাঁর কথাই যদি মানতে হয়, তাহলে সবাইকে বুদ্ধির চর্চা, শিল্পের চর্চা ছেড়ে দিয়ে কুস্তি এবং অন্যবিধ শরীরচর্চার দিকেই মনোনিবেশ করতে হয়। প্রাচীন কলকাতার দৃশ্য

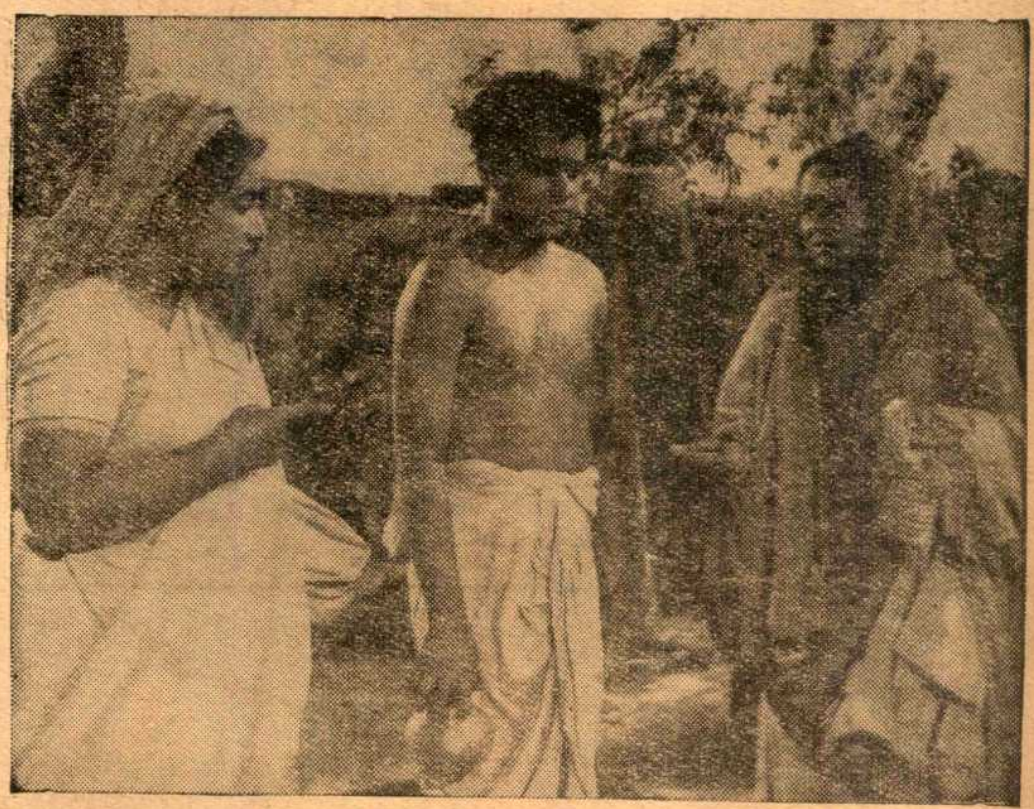

"সৎভাই" চিত্রে সন্ধ্যারাণী, সুখেন ও রেণুকা রায়

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত রাজীব পিকচার্সের "হাই হিল" ছবির একটি দৃশ্যে রেণুকা রায় ও সন্ধ্যা রায়

সংস্থাপনে কিম্বা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব-সংকটে পর্দার ওপর বিবেকানন্দের ব্যথাক্লিষ্ট মুখের স্থিরচিত্র প্রক্ষেপণে সত্যজিৎ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ" ছবিটির কিছু প্রভাব চোখে পড়ে। কফি-হাউসের ব্যালকনি থেকে নেওয়া দৃশ্যে, ক্লান্তির দৃশ্য—ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শটে ক্যামেরার ভাল কাজ দেখিয়েছেন সৌম্যেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসু। নেপথ্য ভাষণ পীড়াদায়ক।

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যাভিনয়ঃ চণ্ডালিকা

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চণ্ডালিকা" অবলম্বনে রূপায়িত ব্যালের উপস্থাপন করে নৃত্যশিল্পী বৈজয়ন্তীমালা বোম্বাই ও দিল্লীতে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতায় সে অভিনয়ের আয়োজন করবার জন্য "কলা-কেন্দ্রমে"র আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবারই কথা। কিন্তু অভিনয় আসরের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, আর দর্শকদের অশালীনতা মিলে অভিনয়ের আসরটিকে পণ্ড করেছিল। প্রবেশ পত্রের অবিশ্বাস্য উচ্চমূল্য এই অভিনয়কে প্রথম থেকেই সাধারণ মধ্যবিত্তের আওতার বাইরে রেখেছিল। 'চণ্ডালিকার' মত ভাবগভীর নাটক দেখবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া ত' দূরের কথা, ভলান্টিয়ারের যাতায়াত, ফেরিওয়ালাদের কর্ণবিদারক মহাসঙ্গীতের সঙ্গে দর্শকবর্গের স্থায়ী কলকোলাহল মিলে ফুটবল মাঠের অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখবার চেয়ে চিত্রতারকাদর্শনের আগ্রহই প্রবলতর ছিল। এরকম জঘন্য পরিবেশে "চণ্ডালিকা" অভিনয় অর্থহীন। নিউ এম্পায়ারে সম্ভব না হলেও মহাজাতি সদনে ব্যবস্থা করলেও, অল্পসংখ্যক লোক দেখলেও, তাঁরা অন্তত দেখতে পেতেন হাটুরে হট্টগোলে সমস্ত উদ্যমটা এভাবে মাটি হত না।

এ অবস্থাতেই অতদূর দেখা গেল শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা মূলত ভারত-নাট্যমের আঙ্গিকে নাটকের কোরিও গ্রাফী রচনা করেছেন তার সঙ্গে মাঝে মাঝে লোকনৃত্যও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মূল নাটকও যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবেই অনুসৃত। তাঁর ব্যক্তিগত নৃত্যে অভিমানাহত নারীর জাগ্রত আত্ম-মর্যাদাবোধ জীবন্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মুদ্রাবিন্যাস ও 'অভিনয়' ভাল ভাবে দৃষ্ট না হওয়াতে চরিত্রের নাটকীয় রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্বের সম্পূর্ণ পরিমাপ সম্ভব হয়নি। মায়ের নৃত্যাভিনয়ে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। নৃত্য-পরিকল্পনায় নাটকের গঠনকে বিশেষ যত্নের সঙ্গেই বজায় রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" গান অবলম্বনে রচিত ফসলকাটার দৃশ্য এবং "শুধ একটি গণ্ডুষ জল" গানটির নৃত্যরূপায়ণ অনাবশ্যক দীর্ঘ হওয়ায় নাটকের গতি ব্যাহত হয়েছে—মনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন নৃত্যাংশ দেখছি। মায়া-নৃত্যের পরিকল্পনাটি শিল্পসম্মত; তাপস সেনের আলোকসম্পাতে বিমূর্ত বর্ণালীর সংযত ব্যবহার নাটকীয় সংঘাত রচনায় সহায়ক। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপর কারিকুরি চেষ্টা না করে স্বাধীনভাবে এই নৃত্যাভিনয়ে সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ রচনায় রবিশঙ্করের সাফল্য ভবিষ্যতে এ ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ খুলে দিল॥

খেলাধূলা

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্যের অটুট বন্ধন রচনা করবার অন্যতম মাধ্যম—খেলাধূলা। সংকীর্ণতা বিহীন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত খেলাধূলার আসর, শুধু মানসিক প্রসারতা বৃদ্ধিই করে না, বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন দেশকে আরও বেশী পরস্পরের নিকটে নিয়ে আসে। এই আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্যের আসরই বসেছে প্রাগে। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায়, পৃথিবীর প্রায় সকল অকম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট দেশের অন্যূন ছয় শতাধিক প্রতিযোগী এখানে সম্মিলিত হোয়েছেন।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে কম্যুনিষ্ট চীনের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। ১৯৬১ সালে, পিকিংয়ে চীন জাপানকে পরাজিত কোরে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত সোয়েথলিং কাপ জয় করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন কোরেছিল। এবারেও প্রাগের আসরে, চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াই এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, চীন এবং জাপানের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে ক্রীড়াবিদ্‌দের ধারণা। কম্যুনিষ্ট চীনের খেলোয়াড়দের প্রধান হাতিয়ার, তাঁদের 'বিদ্যুদ্‌গতি ড্রাইভ'। এর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে জাপান, সুইডেন, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্ব-বিশ্রুত খেলোয়াড়েরা দিবারাত্র উদ্বেগ-মিশ্রিত প্রবল উৎসাহের সঙ্গে পাল্টা 'লুপ' বা 'চরকি' মারের অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন।

প্রাগের এই আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া-আসরে, দেশে জরুরী অবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও, চারজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় প্রতিনিধিদল যোগদান করেছেন। এই দলে আছেন পি. হালদালকার, আর. চাচাদ, জি, দেওয়ান ও জে ভোরা এর ভেতরে প্রথম দু'জন আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াদ্বন্দ্বে নবাগত। জি, দেওয়ান ১৯৫৬—১৯৫৯ পর্য্যন্ত একটানা চার বৎসর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবং ডর্টমুণ্ডে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন। জে ভোরা বর্ত্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং তিনিও ডর্টমুণ্ডে এবং ষ্টকহোমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের অন্যতম প্রতিযোগী ছিলেন।

ভারতীয় দলের ম্যানেজার, আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সুধীর থ্যাকার্সে ভারতীয় দলের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে এক মন্তব্যে বলেছেন, 'ভারত যথাসাধ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরবে।

'প্রতিযোগিতায় জয়লাভ নহে অংশ গ্রহণই বড় কথা', এটাই তো অলিম্পিকের মূল-বাণী সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হোয়ে ভারতের নবীন খেলোয়াড়েরা যদি প্রাগের এই মহা-সম্মেলন থেকে এতটুকুও নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরতে পারেন, সেটাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্পদ।

ডেভিস কাপ—পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোয়ার্টার ফাইন্যাল

সম্প্রতি আর একটি আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলার ক্ষুদ্র আসর বসেছিল ভারতে। পুণায় অনুষ্ঠিত, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভারত সহজেই প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৪-১ ম্যাচে পরাজিত কোরে সেমি ফাইন্যালে মালয়ের বিরুদ্ধে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা অর্জ্জন কোরেছে। অপর কোয়ার্টার ফাইন্যালে মালয়কে ব্রহ্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হোতে হোয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত মালয়ই ৩-২ ম্যাচে জয়ী হয়।

ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন রমানাথ কৃষ্ণাণ, জয়দীপ মুখার্জ্জী ও আখ্‌তার আলি, অপরপক্ষে ছিলেন ইফ্‌তিকার আমেদ, মুনীর পীরজাদা, কুতুবুদ্দিন ও রহিম। পাকিস্তানের ইফ্‌তিকার আমেদ প্রবীণ খেলোয়াড়। অবিভক্ত ভারতে ইনি ভারতেরও

আজও ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। রমানাথ কৃষ্ণান এবারকার ডেভিস কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সহজেই জয়ী হন।

প্রতিনিধিত্ব কোরেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দল দু'টোর দলগত শক্তিতে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রহিম ভারতের আখ্‌তার আলীকে পরাজিত কোরে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অপর তিনটি সিঙ্গলসে এবং ডাবলসের খেলায় ভারত সহজেই জয়ী হয়।

মালয় বনাম ভারতের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি কুয়ালালামপুরে ২১শে ও ২২শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হ'বে।

জয়দীপ মুখার্জ্জী

ভারতীয় দলে থাকবেন রমানাথ কৃষ্ণাণ, জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎলাল। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এস এ আজমান, কিওক ই ইয়েল, বিলি ইয়াপ ও এডমণ্ড ইয়ংয়ের ভেতর থেকে মালয় দল নির্ব্বাচিত হ'বে।

খেলাধূলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্ব আরোপ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের এক ঘরোয়া বৈঠকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখ্য সচিব শ্রী পি. এন. কৃপাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন খেলাধূলাকে অগ্রাধিকার দানের সরকারী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। শ্রী কৃপাল বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের ভেতরে খেলা-ধূলাকে জনপ্রিয় করবার প্রচেষ্টা চালান এবং এই প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার প্রদানই ভারত সরকারের নীতি। তিনি আরও বলেন যে, বিদ্যালয়েই তরুণদের খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট এবং এখান থেকেই তাদের ভেতরে সত্যিকারের ক্রীড়াবিদের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলোর যাতে বাস্তব রূপায়ণও ঘটে, সেদিকে নজর রাখলে, অচিরেই অসংখ্য তরুণ প্রতিভার সন্ধান মিলবে বলে আশা করা যায়।

ক্রিকেট থেকে উমরিগড়ের বিদায়

বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় পলি উমরিগড় রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতায়ও অংশ গ্রহণ না করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা কোরেছেন। এর আগে তিনি টেষ্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত কোরেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে পলি উমরিগড়ের আবির্ভাব। ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কোরে আসছেন। বোম্বাই তাঁর

পলি উমরীগড়

অধিনায়কত্বেই উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন কোরেছে। ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে উমরিগড় ৩১৪টি ইনিংসে অংশ গ্রহণ কোরেছেন। এর ভেতরে ৯৪টি টেষ্ট ইনিংস এবং ৭০টি রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতার ইনিংস।

রামচাঁদের পর উমরিগড়। ভারতীয় ক্রিকেটের অপূরণীয় ক্ষতি, তবুও Old order changeth, yielding place to new.

প্রথম ডিভিশন হকি লীগ

স্থানীয় প্রথম ডিভিশন হকি লীগ প্রায় সমাপ্তির মুখে। একমাত্র

কলকাতার হকি লীগে বি, এন, আর দলের হামিদ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন

মোহনবাগান ভিন্ন চ্যাম্পিয়নশীপের পাল্লায় আর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রগতিই ব্যাহত হোয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল অপচয় করেছে দুই, বি এন আর তিন, মহমেডান স্পোর্টিং ও কাস্টমস পাঁচ পয়েন্ট। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলই কেবলমাত্র অপরাজিত আখ্যা এখনও অক্ষুন্ন রেখেছে। মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান —বি এন আর এবং ইষ্টবেঙ্গল—বি এন আর, হকি লীগের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই খেলা তিনটি অনুষ্ঠিত হ'বে,—মোহনবাগান বোম্বাই থেকে ফেরবার পর।

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

BAWA

Glass E-Crockeries Private Ltd.

TEA	SET	Rs.	8/-
LEMON	SET	Rs.	4/-
FRUIT	SET	Rs.	2/-

63-H, Radha Bazar Street, Calcutta.

Phone : 22-1494

- CROCKERY
- CUTLERY
- GLASS WARE
- WINDOW GLASS
- PLY WOOD
- HARD BOARD
- SOFT BOARD

BAWA
POTTERIES' CROCKERY

AGENTS
BAWA
AGENCIES PRIVATE LTD.

BRANCHES ALL OVER INDIA

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 11th April, 1963
PHONE : { 34-3487 34-9488 GRAM : "BASUMATI" Price : 25 nP.

রেলওয়েকে
আপনার
দোরগোড়ায়
এনে দিয়েছে

বাড়ী বাড়ী গিয়ে মাল নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পূর্ব রেলওয়ে করেছে কলকাতায় তা অনুসৃত হচ্ছে। সাধারণ ভাড়ার উপর সামান্য কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে আপনিও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। রেলওয়ের অনুমোদিত কন্ট্রাক্টর মেসার্স রোড কেরিয়ারস্, ২০, মল্লিক ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯ (টেলিফোন নং ৩৩-৬৮৮৬ এবং ৩৩-৭৮৯৪) অথবা হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সিকট চব্বিশঘণ্টা আগে খবর পাঠালে তাঁরা মাল পাঠানোর ও পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যদিনে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেবার এবং সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত মাল নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ রবিবার এ সুবিধা পাওয়া যায় না, তবে বিশেষ ব্যবস্থাকমে রবিবার শুধুমাত্র পচনশীল মাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। কোন মালের ক্ষেত্রে বুক করার সময় বাড়ীতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ যদি না থাকে এবং প্রেরক যদি পরে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চান, তবে অনুমোদিত কন্ট্রাক্টরের কাছে আবেদন করলে রেলওয়ের সুবিধামতো সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

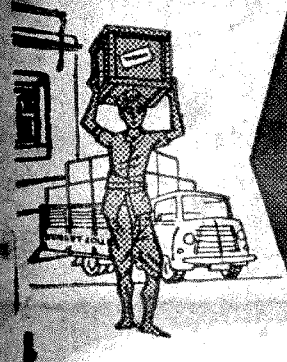

S
স্ট্রীট
C
কানেকসন য়্যাণ্ড
D
ডেলিভারী
সার্ভিস

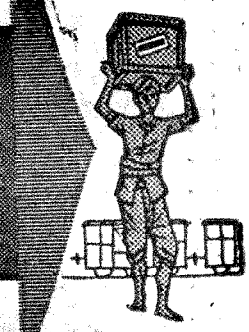

নীচের আটটী অঞ্চলে বিনামূল্যে সংগ্রহ এই ব্যবস্থা রয়েছে :
খিদিরপুর
বালিগঞ্জ
বেলিয়াঘাটা
শ্যামবাজার
টালিগঞ্জ
পার্ক ষ্ট্রীট
বৌবাজার
কাশীপুর

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করুন :

(১) চীফ পার্সোনেল অফিসারের ই. ব. রে. কে ঘ, ঘা ও ঘা (পার্সোনেল ব্রাঞ্চিস) টেলিফোন নং ৩৩-৩৪১১

(২) ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ (পার্সোনেল ব্রাঞ্চিস) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৩) ডব্লু ইন্সপেক্টর, হাওড়া (ডব্লু ব্রাঞ্চিস) টেলিফোন নং ৬৬-৩৩৫৩

(৪) ডব্লু ম্যানেজ ইয়ার্ড সুপারভাইজার, শিয়ালদহ (ডব্লু ব্রাঞ্চিস) টেলিফোন নং ৩৫-১২১১

(৫) চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর অফিস ৭, কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১ টেলিফোন নং ২৩-৩২৫১

(৬) অতিরিক্ত রেলওয়ে অফিস

পূর্ব রেলওয়ে

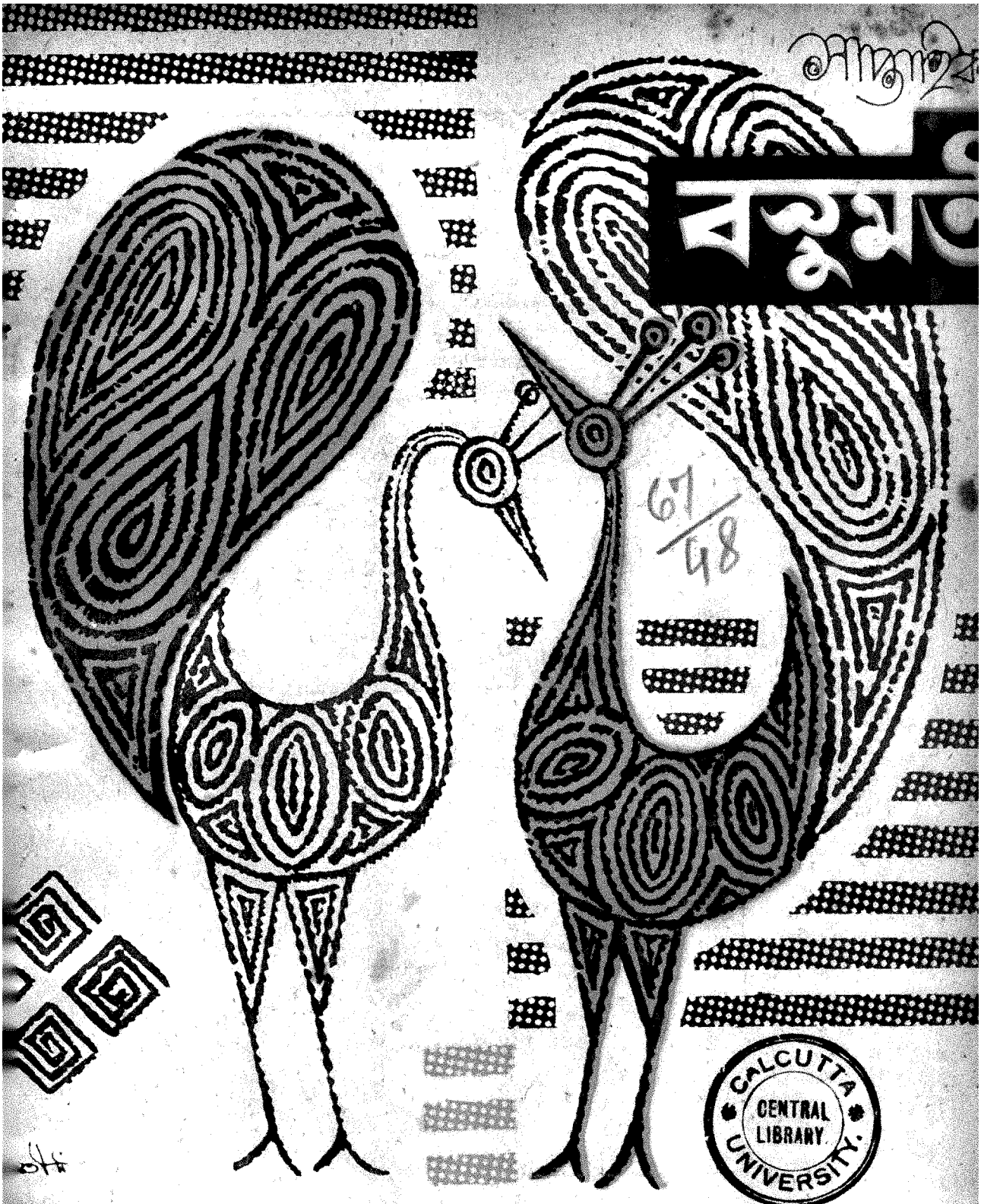

67/48

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৬৭ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী

গ্লিসারিণ সাবান

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH
BETTER ENGINEERING

Orient
FANS

Years ahead in looks and performance

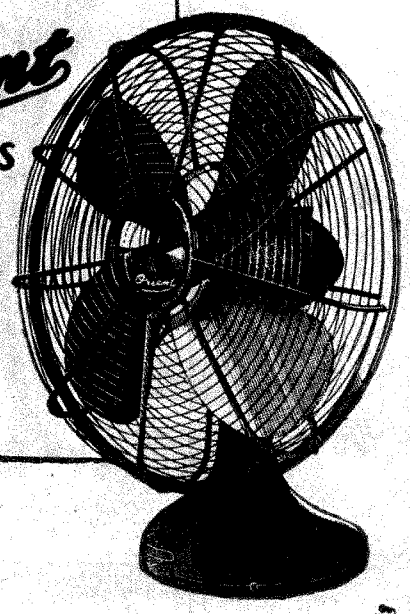

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-12

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩
আজকের মানুষ	...	৪
শহর কলকাতা	...	৫
কবিতা :—		
ঝড়ের পরে	গোপাল ভৌমিক	৮
নব নাটক	আনন্দ বাগচী	৮
দিল্লী থেকে	শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৯
রঙ্গদর্শন	...	১৪
নেফা বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ও তাহার কিংবদন্তী	শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত	১৬
আন্তর্জাতিক	...	১৯
গ্রন্থমেলা	...	২৬
সাপ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৮
ভারত দর্শন	...	৩৪
পশ্চিম জার্মানী	...	৩৯
লণ্ডন থেকে	সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়	৪২
রঙ্গজগৎ	...	৪৪
খেলাধূলা	...	৪৬

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রাজভাষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩'০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১'০০
(প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে)

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব। বহু পরিশ্রমে দুটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : ধারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পূণ্যপ্রভা মাত্র ১।।০ টাকা

স্মরণীয় বই ● অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

।। প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয় ।।

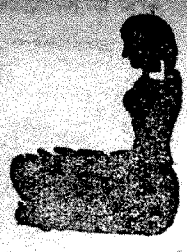

অ্যাসোসিয়েটেড-এর সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ :

প্রবাসী ও 'Modern Review'-এর সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫·৭৫

১৯৩২ সালের রবীন্দ্রনাথ যখন রেজা শাহ্-পাহলবী ও রাজা ফৈসলের নিমন্ত্রণে ইরাণ ও ইরাক ভ্রমণে যান তখন লেখক রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন। এই দুটি দেশের সর্বত্র কবি যে সাদর অভ্যর্থনা ও বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তার পূর্ণ বিবরণ ও চিত্র-পরিচয় লেখক পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। ইরাণ ও ইরাকের প্রাচীন ও আধুনিককালের ইতিবৃত্ত সভ্যতা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিচয় সহ প্রায় একশতখানি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে এই দুটি প্রাচীন দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, রাজনীতি, সভ্যতা ও সমাজ মনসালোকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ডীন অফ দি ফ্যাকালটি অব ড্রামা—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় :
চেয়ারম্যান বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় :
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০৲

সেকালের অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ

নাট্যমঞ্চ ও নাটজীবন এক অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতিতে এসে পৌঁছেছিল নাট্যোৎকোবিদ নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সংসারপথ পরিক্রমায়। তিলে তিলে দিনে দিনে দিনে ঊনবিংশ শতকের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে কলকাতার অলিন্দ থেকে, ভেসে উঠছে নব চেতনার বিংশ-শতক। এবং এই সন্ধিক্ষণই প্রবল সিন্ধু তরঙ্গের মতো তাঁকে এনে দিয়েছিল নাট্যলক্ষ্মীর সাধন-মন্দিরে। এই বিবর্তন যেমন তীব্র নাটকীয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আগ্রহ-উদ্দীপক। এক আন্তরিক ও অকপট আত্মকথনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টিতুল্য পর্যবেক্ষণ ও আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই সুবৃহৎ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে এক অপরূপ রসলোকে, নাট্যতীর্থ থেকে সাহিত্যতীর্থে উত্তরণের এ এক নাটকীয় স্বাক্ষর বলা যেতে পারে।

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত

বিবিধার্থ অভিধান

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন অভিধান

—এতে আছে—

১। বাংলা বিশেষার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ (Idioms & Phrases—অর্থসংকেত) ২। বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন (প্রত্যেক প্রবাদের অর্থসমেত) ৩। বাংলায় আগত বিদেশী শব্দ (ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, জার্মাণ, আরবী, ফার্সী) ৪। বাংলায় আগত অন্য ভারতীয় শব্দ (হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটি ইত্যাদি) ৫। যুদ্ধোত্তর নূতন বাংলা কথা ৬। বাংলা ভাষার অশিষ্ট ও অপশব্দ (Slang words) ৭। গ্রাম্য শব্দ ৮। অনুকার শব্দ। ৯। সাংবাদিক নূতন বাংলা শব্দ ১০। বাংলা দ্বিরুক্ত শব্দ ১১। বিপরীতার্থক শব্দ ১২। সমষ্টিগত শব্দের তালিকা ১৩। কৃৎ ও কৃদ্ভবাচক শব্দ ১৪। সহচর শব্দ ১৫। পরিভাষা (বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক পরিভাষা)।

এ ছাড়া আরও অনেক আবশ্যকীয় বিভাগ আছে।

৩৫০ পৃষ্ঠা : মূল্য ৬·৫০

সর্ব্বকালের সর্ব্বত্র নপ্রিয়

অমর কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

চিরনূতন গল্পগ্রন্থ

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুরুচিসম্পন্ন অভিজাত অভিনব প্রচ্ছদপটে
সুসজ্জিত বেশে নবরূপে, নবকলেবরে প্রকাশিত হোল

দাম : ছয় টাকা

স্নেহাস্পদ, প্রিয়জন বা শ্রদ্ধেয়জন
সকলের হাতেই দেওয়া যায় সানন্দে
—এমন একখানি চিরকালের বই।

সুশীল রায়ের (উপন্যাস) **পদ্মিনী ২·৫০**

চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা ও সর্বোত্তম রমণী পদ্মিনী।
তেমনি এক স্ত্রী এই উপন্যাসের নায়িকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না ৩·২৫

* আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি *

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

আজকের মানুষ

মিঃ চেষ্টার বোলস

প্রতিভাধর ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই সার্থক—মিঃ চেষ্টার বোলস-এর জীবনই তার প্রমাণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়বার তাঁকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতবর্ষে পাঠাচ্ছেন। মিঃ বোলস্ জীবন আরম্ভ করেছিলেন সাংবাদিক হিসাবে। তারপর বৃত্তি নিলেন প্রচারণার। প্রচারণা ক্ষেত্রে তাঁর নিত্য-নূতন চমকপ্রদ উদ্ভাবনা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, মানবচরিত্রে তাঁর জ্ঞান কত গভীর। পরবর্তীকালে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশ-বিদেশের রাজনীতিতে তাঁর পটুত্ব অনন্য দুর্লভ। ভারত সম্পর্কে তাঁর লেখা বই "এ্যামবাসাডর্স রিপোর্ট" সর্বজন সমাদৃত। তাঁর লেখা অন্যান্য বই: 'নিউ ডাইমেনসন অব পিস' এবং 'টুমরো উইদাউট ফিয়ার'-ও রাজনীতিতে তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিচায়ক। কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁকে সমাদর করে তিনি অকৃত্রিম ভারতপ্রেমিক বলে। শুধু তিনিই নন তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলেই ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তাকে আপন করে নিতে চান। পূর্ববার যখন তিনি ভারতে আসেন—তখন পুত্র-কন্যাকে দিল্লীর স্কুলেই ভর্তি করে দেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী কন্যা সিন্থিয়া পরেও ভারতে এসেছেন বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার কাজে—ভারত সম্বন্ধে 'At Home in India' নামে বই-ও লিখেছেন একখানা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন তিনজন প্রেসিডেন্ট—মিঃ রুজভেল্ট, মিঃ ট্রুম্যান এবং মিঃ কেনেডি তিনজনই বোলস্-এর প্রতিভার যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। আজ তিনি আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা।

ভারতের বর্তমান রাজনীতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বোলস্-এর রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

পনের বছর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ফলে ইলেকশন্ বা নির্বাচন পর্বের গুরুত্ব আমরা মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। পাঁচবছর পরে পরে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের নির্বাচন করার তোড়জোড় শহর জুড়ে লাগলে পরিচিত রাস্তা ঘাট প্রচার-কর্মের বাহুল্যে রাতারাতি ভোল পালটে সচল বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়ায়। দেওয়ালে, পাঁচিলে, ল্যাম্পপোষ্টে তিলধারণের জায়গা থাকে না পোষ্টারের দাপটে। মাইক্রোফোনের কর্কশ আর্তনাদ, মিছিলের ভিড়, স্বেচ্ছাসেবকদের জোরালো আবেদন সব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার। বাই ইলেকশনের কৌলীন্য অবশ্য সে তুলনায় অনেক কম—গত ৭ই এপ্রিল শহর কলকাতার চৌরঙ্গী কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনে রাজপথে বেরিয়ে সে কথা অনুমান করতে দেরী হয়নি।

কয়েকদিন আগে নিছক কৌতূহল বশত টহল দিয়েছি ও অঞ্চলে ১৯৬২ সালের বিগত নির্বাচনের রাজকীয় সমারোহের কথা স্মরণ করে। এবারে তেমন উদ্দীপনী-ব্যঞ্জক দৃশ্য কিছু চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে এক আধটা জীপগাড়ী বোঝাই জনাকয়েক স্বেচ্ছাসেবক মাইকে সরব ঘোষণা করছিলেন বটে—'ভোট ফর' দেওয়ালের গায়ে সারি সারি জোড়া বলদের ছবিও দেখেছি। পতাকা সম্বলিত পোষ্টারও হয়তো ছিলো চোখ ধাঁধানো। কিন্তু ছিলো না সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ।

চৌরঙ্গী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিনোদানন্দ ঝা মল্লিকবাজারে আহূত জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। কংগ্রেসের জয়লাভ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার পক্ষে অত্যাবশ্যক, এ কথা বার বার বলা সত্ত্বেও কিন্তু শহর কলকাতার শতকরা পঞ্চাশ জন ভোটদাতাও সেদিন রবিবারের ছুটির আবহাওয়াকে বিঘ্নিত করে ভোট দিতে আসতে উৎসাহ বোধ করেননি। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যান্য উপনির্বাচন কেন্দ্রগুলির ভোটদাতার মোট সংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ পঁচিশ হাজার। তার মধ্যে মাত্র এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার ভোটদাতা ভোট দেন। এই নিষ্ক্রিয়তার মূলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের নানা দুর্গতি ও হতাশা-জনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সব কিছুর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে কি? ফলাফল নিয়ে অবশ্য মতবিরোধের প্রশ্ন ওঠেনি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে চৌরঙ্গী কেন্দ্রের শূন্য আসনে কংগ্রেস প্রার্থী তাঁর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়ে বিপুল ভোটে জিতে গেছেন। অন্যান্য চারটি আসনেও কংগ্রেস জয়লাভ করেছে বিরোধী দলকে হারিয়ে। বিনা দ্বিধায় নির্বিকারে একটি বিশেষ দলকে সমর্থন

শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

করে জনসাধারণ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, আশা করা যায় সরকারও ভবিষ্যতে সমর্থনকারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

উপনির্বাচনের দিনই ছিলো কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের শুভলগ্ন। কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সূচনা অবশ্য এখনও শহর কলকাতার অধিবাসীদের ভাগ্যাকাশে উদিত হয় নাই, তবু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুমোদিত শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী এবং শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার সুসংবাদে নতুন করে আশান্বিত হয়ে উঠতে আমাদের বাধা নাই। নূতন মেয়র সভা-সমিতি বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করে নিজ কর্তব্য পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে পৌর-প্রতিষ্ঠানের নব-নির্বাচিত কর্ণধারদের আমরা স্বাগত জানাই।

* * *

চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যাবেলা চোখ ধাঁধানো আলোর ঘটা দেখতে দেখতে হঠাৎ সংবাদপত্রের ছোট এক টুকরো খবরের কথা মনে পড়লো। গত বুধবার কলকাতায় হারিকেন ব্যবসায়ীদের দ্বারা আহূত এক সভায় ঘোষণা করা হয়েছে যে হারিকেন লণ্ঠনের ব্যবসা দিনে দিনে কেঁপে উঠছে। দেশের পুরো চাহিদা মিটিয়ে আফ্রিকা, মালয়, সিংহল, বর্মা, ইরাক, ঈজিপ্ট ইত্যাদি দেশগুলোর এখন আমরা অবাধে হারিকেন লণ্ঠন রপ্তানী করতে পারব। আমাদের দেশে বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হারিকেন লণ্ঠন তৈরী হয় যার মূল্য আনুমানিক দেড় কোটি টাকা।

আজকের কলকাতায় পথ চলতে চলতে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। অনেক অনেক কাল আগে। সেই আদি গ্রাম্য কলকাতার দুর্গম নিষ্প্রদীপ পথ ঘাটে যখন লোকে মশাল নিয়ে চলা ফেরা করত। তারপর যুগের হাওয়া অনুযায়ী মহানগরীর পথে ঘাটে, ঘরে ঘরে অনেক আলো জ্বলল। গ্যাসের বাতি, মোমবাতীর ঝাড়লণ্ঠন এবং অবশেষে বিজলী বাতি। আজকে গড়ের মাঠ থেকে হঠাৎ এসপ্লানেড অথবা চৌরঙ্গীর দিকে তাকালে মনে হবে রাতকে দিন করে ফেলার কৌশল বুঝি আমরা আয়ত্ত করে ফেলেছি। কিন্তু তবু হারিকেন লণ্ঠনের ব্যবসা স্ফীতির কারণ কি? শুধুই কি মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলেই এর প্রয়োজন?

শহর কলকাতার যে কোন এলাকার অধিবাসীরা সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ার দুর্ভোগ কাকে বলে সে কথা অবশ্যই বহুবার হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যুদ্ধের ভীতি যতদিন ছিলো (এখনও অবশ্য একেবারে নেই বলা যায় না, তবু অন্যান্য দুর্ভোগের মত এও কতকটা গা সওয়া হয়ে গেছে) ব্ল্যাক্ আউটের মহড়া দিচ্ছি মনে করে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। অধুনা কলকাতায় আরও বেশীমাত্রায় বিদ্যুৎ সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ বহু অর্থব্যয়ে ও শ্রমে গঠিত দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। নানা অসুবিধা অবশ্য তাদেরও রয়েছে। দৈনিক ১৯২ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহ তাঁরা করতে পারেন না, অথচ কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর দাবী মধ্যে মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। এই সমস্যা নিয়ে আমাদের বেশী বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নাই। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আসন্ন বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন। সঙ্কট থেকে রেহাই পাওয়ার

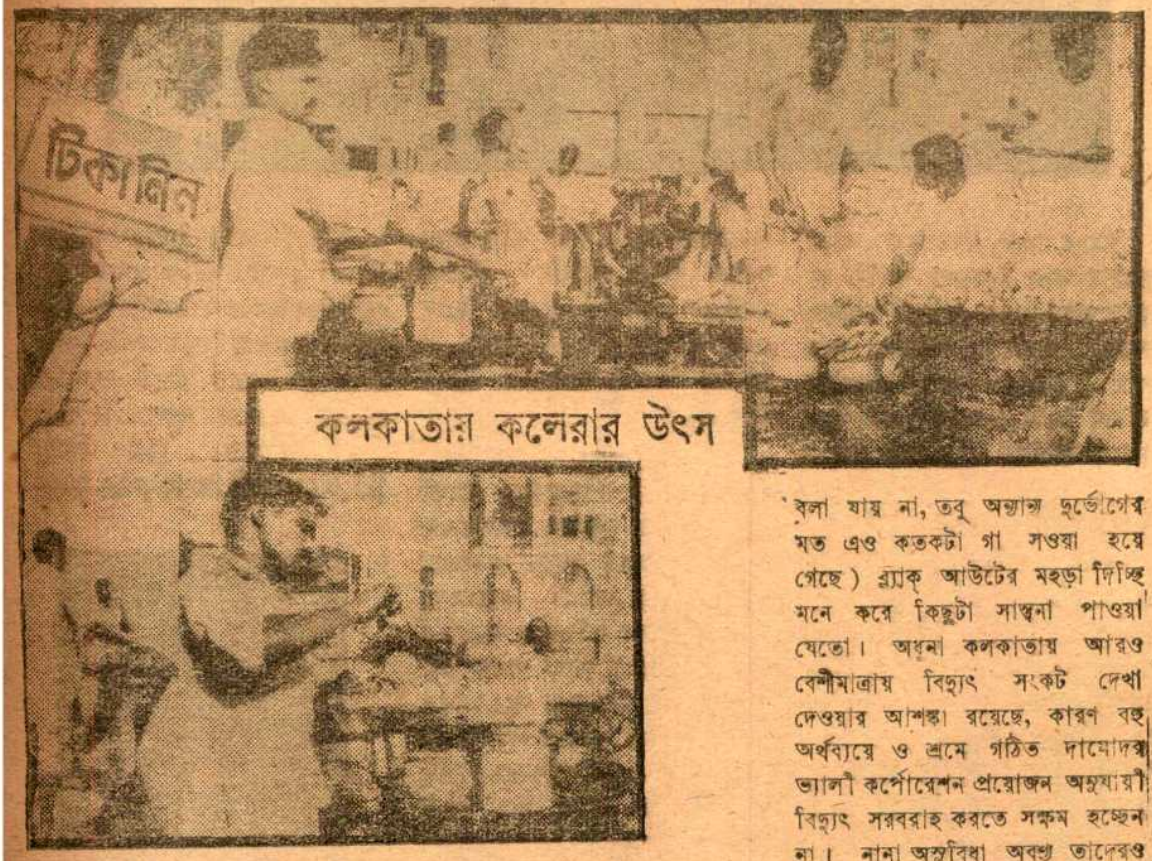

কলকাতায় কলেরার উৎস

পথ সম্পর্কে নানা আলোচনাও চলেছে যদিও কোনও সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই। আমরা সাধারণ মানুষেরা হারিকেন লণ্ঠনের ব্যবসা স্ফীতির কথা স্মরণ করে পুলকিত হয়ে উঠছি। শ্রীমোরারজী দেশাই-এর কেরোসিনের উপর অহেতুক সুনজর না পড়লে আজ মুক্তকণ্ঠে হারিকেন ব্যবসায়ীদের অভিনন্দন জানানো যেতো।

শীতের লোভনীয় মরশুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের চাকচিক্য দু'চারদিনের জন্য আমাদের কলকাতা শহরে মলয় বাতাস, কোকিলের কুহু-ধ্বনি ইত্যাদি নানা আনুষঙ্গিক উপকরণ নিয়ে দেখা দিয়ে যায়। তারপর রুদ্র বৈশাখের আবির্ভাব। শীতের জড়ত্ব কেটে প্রকৃতি যেমন নূতন রূপ ধারণ করে, আমাদের মনের জগতেও তেমনি নানা রূপান্তর ঘটতে থাকে। চোখ ঝলসে ওঠে ঢাকুরিয়া লেকে বেয়ানী রঙের ফুলে ভরা গাছটার দিকে চেয়ে। বসন্তের সঙ্গে গ্রীষ্মের অনেক তফাৎ। গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি রুক্ষ হয়ে ওঠে। জনবিরল দুপুরের রাজপথে পিচগলা দুঃসহ তাপ। বরফের দোকানে, কাটা-ফল সাজানো স্টলে, আইসক্রিম-ওয়ালার বাক্সের চার পাশে লোকের ভিড়ে। তারপর বসন্তকালের বসন্ত রোগ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবার আগেই গরমকালের অবশ্যম্ভাবী মহামারী কলেরার প্রকোপ।

প্রতি বছরের মত এবারেও সারা বসন্তকাল কলকাতায় ভয়াবহ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্যণীয়। কর্পোরেশন থেকে বাধ্যতামূলক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা সত্ত্বেও বস্তি অঞ্চলে বহু লোক টিকা না দেওয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলো। এমন কি একজন টিকাদার বিনা দোষে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছিলেন—এ খবরও সংবাদপত্রের পাতায় দেখা গেছে। তারপর কলেরার পালা। এ রোগটি গ্রীষ্মকালীন। গরম পড়লেই শহরে জলাভাব দেখা দেবে—মাছি বাড়বে, রাস্তায় রাস্তায় জমবে জঞ্জালের স্তূপ। মাছের বাজারে বরফ দেওয়া বাসি মাছ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ আরও বাসি হয়ে যাবে। মাছি ভন ভন করা কাটাফল-গুলো শুকিয়ে উঠবে। আমরা জেনেশুনেও প্রতিষেধক গ্রহণে শৈথিল্য দেখাবো। কাটাফল, পচা মাছ, বীজাণুকীটকিত ফুচকার ব্যবসা বাড়া সত্ত্বেও বস্তি অঞ্চল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার কোনো ব্যবস্থাই করা হবে না। আর হাসপাতালে রোগীর ভিড় জমবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কলকাতা শহরের এই অসহনীয় অবস্থার উন্নতি ঘটার আশা নেই। বসন্ত ও কলেরা রোগের সঙ্গে আমাদের বহুকালের পরিচয়। আগেকার যুগে মহামারী হলে মা শীতলা ও দেবী ওলার কাছে পূজা অর্ঘ-নিবেদন করে লোকে রোগমুক্তির ব্যবস্থা খুঁজত। সে অন্ধবিশ্বাস আজও যে আমাদের মনের কোণে বাসা বেঁধে রয়েছে, তার প্রমাণ ল্যান্সডাউন রোডে সার্বজনীন পন্থায় মস্ত বড় প্যাণ্ডেল বাঁধা, আলোর মালা জ্বালা গর্দভবাহিনী শীতলা মূর্তির পূজামণ্ডপে পাওয়া গেল। সাধারণত আমরা মহামারী লাগলে আজকের দিনে কর্পোরেশনকে, জাতীয় সরকারকে এবং নিজ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি। কর্পোরেশন অথবা জাতীয় সরকারও আমাদের মতই এ বিষয়ে আগের দিকে মাথা ঘামান না। তারপর মহামারী লাগলে অবশ্য আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে। প্রতি বছর এই একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগের মানুষ হয়েও শহর কলকাতার অধিবাসীদের এই প্রাগ-ঐতিহাসিক অবস্থার কি কোন উন্নতি হবে না?

'রূপা'র বই

ভারতীয় ভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ

উনিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ

যাদু-কাহিনী

দাম আট টাকা

অজিত কৃষ্ণ বসু

[অ. কৃ. ব.]

মঞ্চে, মহলে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর, ভেলকিওয়ালা, মাদারি। এদের তাকলাগানো খেলাগুলোরও নানা রকম নাম—ম্যাজিক, যাদু, ভেল্‌কি, ভানুমতির খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘদিন অন্তরঙ্গ বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই বহু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

এ বইতে যাঁদের কথা আছে

এ দেশের : ৺গণপতি ● ৺রাজা বোস ● ৺বিমল গুপ্ত ● ৺ডাঃ কালীকিংকর পি. সি. সরকার ● রয় দি মিস্টিক ● আশু দে ● দেবকুমার মৃণাল রায় ● ডি. সি. দত্ত ● বিমলাকান্ত ● এ. সি. সরকার তকমাওয়ালা সাঁই...প্রভৃতি

বিদেশের : হুডিনি ● চুং লিং সু ● লাফায়েৎ ● থার্সটন ● ডেভান্ট ম্যাসকেলিন ● ক্যালিওস্ট্রো ● ফরাসী যাদুসম্রাট উদ্যাঁ হোরেস গোল্ডিন ● নিকোলা ● কেলার ● হার্ম্যান...প্রভৃতি

অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.]-র অন্যান্য বই : যাতাসী বিবি [উপন্যাস] ৪·০০ ; শহরতলির শয়তান [অনুবাদ] ৪·৫০ · শেষ বসন্ত [উপন্যাস]—যন্ত্রস্থ

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

কবিতা

ঝড়ের পরে

গোপাল ভৌমিক

কাল রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি
ঝড়ের দাপটে অন্ধকারে,
মনে হয়েছিল বুঝি সব শেষ
প্রলয়ঙ্কর এ ধারাসারে
হুম্ হুম্ আর সাঁই সাঁই রব
ঘাতাসের মহা উপদ্রব
সুপ্ত শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলে
এনেছিল কোন উপপ্লব।
কে যেন আমাকে চ্যাঙদোলা করে
শূন্যে ছুঁড়েছে, নিয়েছে লুফে,
ভাবলে সে কথা দেহ হয় হিম
বেঁচে আছি আমি জানি না কিরূপে।

ধ্বংসকারায় দুর্যোগময়
সে রাতের শেষ হবে না জেনে
নিজের এবং পৃথিবীর শেষ
মনে প্রায় যেই নিয়েছি মেনে
হঠাৎ তখন পূবের আকাশে
দেখি উষা হাসে নীরব হাসি
সজল পৃথিবী, আকাশ মধুর,
কোথায় কৃষ্ণ-মেঘের রাশি!
চোখ রগড়িয়ে এদিকে ওদিকে
তাকাই কেবল সবিস্ময়ে,
দেখি ডালপালা ভেঙে পড়ে আছে,
স্মৃতি-সমুদ্র জমাট ভয়ে।

হঠাৎ পাখীর ভোরের কূজন
শোনা যায় আলো-আঁধারিতে,
মনে হয় শেষ হয়নি গানের,
এবং প্রাণের পৃথিবীতে।

নব নাটক

আনন্দ বাগচী

শতচক্ষু অন্ধকার ডানলো পিলো গদিতে পিঠ দিয়ে
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ভারি প্রেক্ষাগার, পর্দার ওপিঠে
আমি জানি তুমি আছো, সংলাপের সূত্রধার দূরে
মঞ্চের ফোকরে স্থির, নায়ক এখনো গ্রীণরুমে
চেনা আধ চেনা পথে কিছু অপার্থিব আলোছায়া
অদৃশ্য কাহিনী যেন অভিসারিকার মুখ চেয়ে
জেগে আছে ; আর আমি তোমাকে দেখবো বলে আজ
এখানে এসেছি বহুকাল ঘুরে, ব্যর্থ কোন প্রাক্তন প্রণয়ী
বুকে ঈর্ষা চোখে প্রেম বাক্যহীন দাঁড়িয়ে রয়েছি।

পর্দা ঘন পর্দা ফেলা, প্রচ্ছাদিত চোখের পলক,
হয়ত এখুনি বাঁশি বেজে উঠবে, চোখ খুলে তাকাবে
অন্ধকার, যবনিকা সরে যাবে, প্রক্ষেপক আলো
বহুরূপী ভ্রমরের মত ঘুরাবে তোমার মুখের
চারপাশে, রজনীর শেষনটী প্রদীপ্ত নাটকে
নিঃসঙ্গ অথবা সঙ্গীহীনা গ্রীণরুম থেকে কেউ
হয়ত আসবে না শুধু কিছু স্বগতোক্তি ছুঁড়ে দিয়ে
বরমাল্য পেয়ে যাবে, করতালি অপেক্ষায় আছে।

সর্বভারতের শিল্পকলার প্রাণকেন্দ্র নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী

দিল্লীর আর্ট জগতে বেঙ্গল স্কুল

অব পেন্টিং-এর বিরুদ্ধে একটা মার-

মুখো ভাব দেখে আমার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটা গল্প মনে পড়লো। ঠাকুর বলতেন একটা ঘুড়ি আকাশে উড়ছিল। উপরে উড়তে উড়তে হঠাৎ ঘুড়িটার মনে হল সুতোটাই যেন তার উপরে ওঠার পথে বাধা। ওটা না থাকলেই অবাধে সে আরও উপরে উঠতে পারতো। সে তাই একটা হেঁচ্‌কা টান মারলো।

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

যা হবার তাই হলো। ধীরে ধীরে ঘুড়ি নেমে এসে রাস্তায় পড়লো।

দিল্লীর আর্টের জন্মদাতা বেঙ্গল স্কুল। দিল্লীর প্রথম আর্টের স্কুল হলো উকিল স্কুল অব্ আর্ট। সারদা উকিল, বরদা উকিল যার প্রাণ। দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্র্যাপ্‌ট্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উমানাথ সেন। দিল্লীর আর্ট স্কুলগুলোর শিক্ষকবৃন্দ শতকরা আশি-জন আজও বঙ্গসন্তান।

বর্তমান ভারতের আর্টের উৎস হল অবনঠাকুর গগনঠাকুরের তুলি। নন্দলালের রামকিঙ্করের তুলি। কলকাতা স্কুল অব আর্টের দৌলতে আজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই যেন বেঙ্গল স্কুলের বিরুদ্ধের এই জেহাদের এক একজন পাণ্ডা। সুতোটাই গণ্ডগোলের মূল। ওটা ছিঁড়লেই আরও উপরে ওড়া যাবে।

আজ শুধু এই আর্টিষ্টদের ভিতরই এই জেহাদ সীমাবদ্ধ নয়, আর্ট যাঁদের পেশা নয়, আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁদের নামমাত্র, বেঙ্গল স্কুল অব পেন্টিং সম্বন্ধে তাঁদের গলার স্বরটাই যেন একটু বেশী

বিখ্যাত শিল্পী স্বর্গীয় সারদা উকিল। দিল্লীর আর্ট জগতে সারদা উকিলের অবদান চিরদিন স্মরণীয় থাকবে।

দিল্লীর আর্ট জগতের মুকুটহীন সম্রাট বরদা উকিল

রকম চড়া! সমালোচকদের আমি শ্রদ্ধার চোখেই দেখি যদি তাঁদের সমালোচনায় ভুল না থাকে। সমালোচনা শুধু সমালোচনার জন্যই নয়, যদিও 'আর্ট ফর আর্টস্ মেক' হতে পারে। তাতে গঠনমূলক প্রস্তাব থাকা দরকার।

এখানে একটা কথা বলা দরকার।

দিল্লীর আর্ট জগতে বেঙ্গল স্কুল অব পেন্টিংই শিল্পকলার উদ্বোধন করেছে বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে।

আজ থেকে চারশো বছর আগে দিল্লীতে মোগলদের পদার্পণের সাথে সাথে দিল্লীতে দেখা দিল একটা নতুন চঙের আর্ট। পারস্য আর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে এই নতুন ষ্টাইলটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বিরাট ক্যানভাসের উপর স্বল্প তুলির সাহায্যে যে নতুন শিল্পকলার জন্ম হল তার নাম 'হাম্‌জা নামা'। সম্রাট আকবর শুধু সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিলন গানেই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন দেশের একতার জন্য সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতের প্রসার ও প্রগতি অপরিহার্য। মিলনের জয়গানে শিল্পকলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দিল্লীর শিল্পীদের তিনি নির্দেশ দিলেন 'হাম্‌জা নামা' অঙ্কনের। মোগল পেন্টিং-এর আর একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল 'রাজম্ নামা'! এই চঙে আঁকা ছবি দেখা যায় নয়া দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত 'বাবর নামা', 'লায়লা মজনু' এই সব বইতে। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও দিল্লীর এই পেন্টিং সংযোজিত বইগুলোর অসংখ্য নমুনা আছে।

আকবরের সময়ে এই চিত্রাঙ্কন আবদ্ধ ছিল শুধু পাণ্ডুলিপির ভিতর। জাহাঙ্গীরের সময়ে এ ছবি আরও জনপ্রিয়তা লাভ করল এর সহজ চঙে ও সামাজিক বিষয়-কেন্দ্রে। ঔরংজেবের সময় থেকে মোগল ষ্টাইলের চিত্রাঙ্কনের ব্যাহতি দেখা যায়। দীর্ঘকাল পরে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী দিল্লীতে এসে এখানকার আর্ট-জীবনে নব প্রাণ সঞ্চারিত করলেন।

আজও একজন বঙ্গসন্তান—বিচিত্র কুমার ভৌমিক—অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ সোসাইটির কর্ণধার। সারদা-বরদা প্রতিষ্ঠিত উকিল স্কুল ছাড়া দিল্লীর আর্ট জগতে যাঁরা নতুন জীবন এনেছিলেন তাঁদের ভিতর অল্ ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্র্যাফট্স্ সোসাইটির স্যার উমানাথ সেনের সাথে সাথে একটা নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটা হল সোসাইটির প্রাণ পুতুল রায়। এখন তিনি হায়দারাবাদের সালর জঙ্ মিউজিয়মের কর্ণধার।

বেঙ্গল স্কুলের পেন্টিং-এর সবচেয়ে ভালো সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যাবে 'বৈকুণ্ঠে'—স্যার শোভা সিং-এর প্রাসাদে। ইনি নয়াদিল্লী নির্মাণের অন্যতম কর্ণধার। এঁর পুত্র খুশবন্ত সিং ইংরিজী সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলার সংস্কৃতির প্রতি এঁদের পরিবারের সকলেরই রয়েছে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। খুশবন্ত একদিন খুব আগ্রহের সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "নজরুলের স্বাস্থ্য কেমন আছে জানো?" তাঁর মাথার অসুখটা তো আর সারলো না।"

অবাঙ্গালী বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে

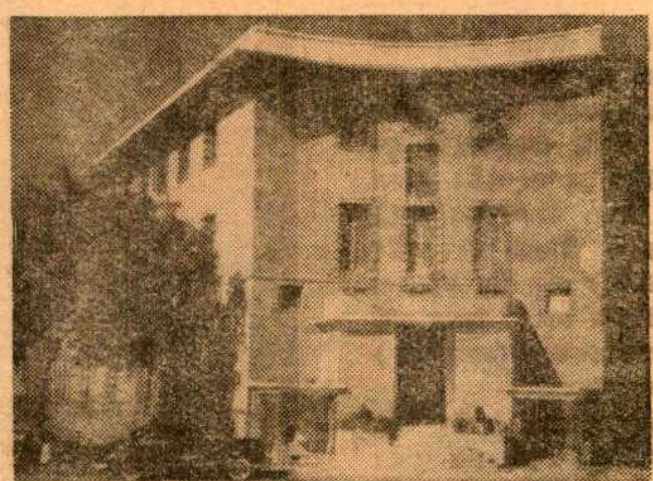

অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ সোসাইটিতে প্রতিদিনই একাধিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীবৃন্দ এসে সোসাইটি হলে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেন।

বললেন, বুঝলে না বাংলা সাহিত্যের "নিরালার" কথা বলছি। দু'জন কবির জীবন পরিণামে কতই না সাদৃশ্য।

মনে মনে লজ্জা পেলাম। তাই তো। নজরুলকে তো প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। সুদূর পাঞ্জাবের সন্তান দিল্লী প্রবাসী ইংরিজী লেখকের কতই না মনো-বেদনা, কতই না সহানুভূতি!

মনে মনে বললাম সাহিত্য শাল্মলীবৃক্ষের শিকড় কতই না সুদূর প্রসারী। দূর বাংলার বুলবুলের কণ্ঠ না শুনে প্রবাসী ডিন্ সাহিত্যের পূজারীর মনে কতই না ব্যাকুলতা। মনে প্রাণে অনুভব করলাম ভারতবর্ষে সাহিত্য কি ভাবে বিভিন্নতার ভিতরও এনেছে সমন্বয়। আর্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এসে পড়ছে সাহিত্য। উপায় নেই। কান টানলে যেমন শুড় শুড় করে মাথাটিও এগিয়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবে দিল্লীর ইলাইট্' মহলে 'বাংলা আর্টের কদরের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে বাংলার সাহিত্যের প্রতি তাঁদের প্রীতিবন্ধনের উল্লেখ।

* * *

স্বাধীনতা লাভের পর অর্থ নৈতিক, সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকে দিল্লীতে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নতুন উৎসাহে, নতুন আশার বাণী নিয়ে যেমন এগিয়ে এসেছেন সরকারী সংস্থানগুলো, ঠিক তেমনিভাবে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এসেছেন বেসরকারী জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো।

আজ স্বাধীন ভারতে আর্টের প্রগতির একটা ঝলক দেখা যায় ভারতবর্ষের কলা মন্দিরের প্রাণকেন্দ্র ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে। এই আর্ট গ্যালারীতে বঙ্গসন্তানের শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন দেখে মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। গ্যালারীর প্রধান কর্মকর্তা প্রদোষ দাশগুপ্ত বঙ্গ সন্তান। দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন কলাশিল্পের জ্ঞান।

ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীর একটু [illegible]য়েছে ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম।

অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস সোসাইটির নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বর্গীয় ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। ছবিতে সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় স্যর উষানাথ সেন ও বর্তমান সভাপতি শ্রীবরদা উকিলকে দেখা যাচ্ছে।

সেটাও তৈরী হয়েছে স্বাধীনতার পর। এখানে রাজপুত ও পাহাড়ী স্কুল অব্ পেণ্টিং-এর যে সংগ্রহ রয়েছে তা যে কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিকে অভিভূত করবে।

সংক্ষেপে স্বাধীনতার পর দিল্লীতে শিল্পকলা প্রসারে অভূতপূর্ব প্রগতি দেখা দিয়েছে। এটা একটা শুভ চিহ্ন। দিল্লীর আর্টের এই প্রগতিতে বাঙ্গালীর অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তবু একটা বড় প্রশ্ন আজ মনে জাগছে। সেটা হল তথা কথিত মডার্ণ আর্টিষ্টদের বেঙ্গল স্কুলের বিরুদ্ধে জেহাদ। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সম্প্রতি দিল্লীর বিখ্যাত আর্ট গ্যালারীগুলোতে সর্বভারতীয় খ্যাতিমান আর্টিষ্টদের যে সব ছবি দেখলাম তাতে যদি একটা প্রতিশ্রুতি মূলক নতুন ষ্টাইল বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন থাকতো তাহলে তথা কথিত ক্রিটিকদের মুখবিকৃতি কোনো রকমে হয় তো সহ্য করা যেতো। কিন্তু এই সব আর্ট গ্যালারীতে যা সব দেখছি তাতে শুধু মনে হতাশাই আসছে না, আসছে বিস্ময়! আর্টের নামে যাঁরা চুরি করছেন তাঁদের কি বলে বর্ণনা করব? আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

দিল্লীর আর্টিষ্টদের ভিতর গুজরাণের তুলিতে একটা নতুন প্রতিশ্রুতি দেখা দিচ্ছে। দেশ বিভাগের বেদনার একটা প্রতিচ্ছবি সেখানে সম্যগ্ ভাবে প্রকটমান। চীনা দস্যুর ভারত আক্রমণের প্রতিক্রিয়াও কোনো কোনো শিল্পীর তুলিকে বলিষ্ঠতর করে তুলেছে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পী যেন আজ পরভৃতিকা রূপে বিদেশী আর্টের বিকৃত নকলে ব্যস্ত রয়েছেন।

সম্প্রতি একটা প্রদর্শনীতে ভারত বিখ্যাত অন্তত ছ'জন আর্টিষ্টের ছবিতে আমি দেখলাম বিদেশী আর্টের নগ্ন নকল। দর্শকদের তাঁরা নিতান্তই হটেনটট্ ধরে নিয়েছেন। না হলে কোন্ সাহসে তাঁরা স্যার জন রোদেন্ষ্টিন্-এর "বৃটিশ আর্ট মিল্স্ ১৯০০" বইখানা থেকে ছ'খানা প্লেটের পুনরঙ্কন করেছেন?

দুঃখের বিষয় হল এই যে, এই ছ'খানার ভিতর সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিখানিও সামিল রয়েছে।

আমি নিজে আর্ট ক্রিটিক নই। বইখানার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে এটা হঠাৎ আমার নজরে পড়লো। যাঁরা এই নতুন পন্থায় ছবি আঁকছেন, যাঁদের তুলির ফল পরভৃতিকার মতন দিন দিন দিল্লীর আর্ট জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে, তাঁরা কিন্তু আজ অনেকেই বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। শিল্প জগতে তাঁরা বেশ নাম করেছেন; শুধু নাম নয়, বেশ ভালোভাবে নিজেদের আধিপত্যও বিস্তার করেছেন। বেঙ্গল স্কুলের আধিপত্যে তাই তাঁদের গাত্রজ্বালাটা যেন একটু বেশী!

* * *

শৈলজ মুখার্জির সম্বন্ধে দু' চারটে কথা না বললে দিল্লীর আর্ট জগতের বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হবে না। দিল্লীর আর্টিষ্ট মাত্রই স্বর্গত শৈলজের প্রিয় বন্ধু। সতীর্থদের ভিতর শৈলজ সম্বন্ধে দিল্লীতে বহু কাহিনী প্রচলিত। একবার ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বাড়ী থেকে একটা টেলিফোন এলো শৈলজকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে। শৈলজ বিকেল বেলা গিয়ে লাটসাহেবের সাথে দেখা করলেন। জানালেন তাঁকে যে, ওয়াভেল-নন্দিনী ভারতীয় শিল্পকলার অনুরাগিণী। শৈলজের কাছে তিনি ভারতীয় শিল্পকলা শিখতে চান। শৈলজ জানালেন লাটসাহেবের বাড়ীতে এসে শেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ওয়াভেল নন্দিনী বরং তাঁর স্কুলে (উকিল স্কুলে) আসতে পারেন।

ঠিক তাই হলো।

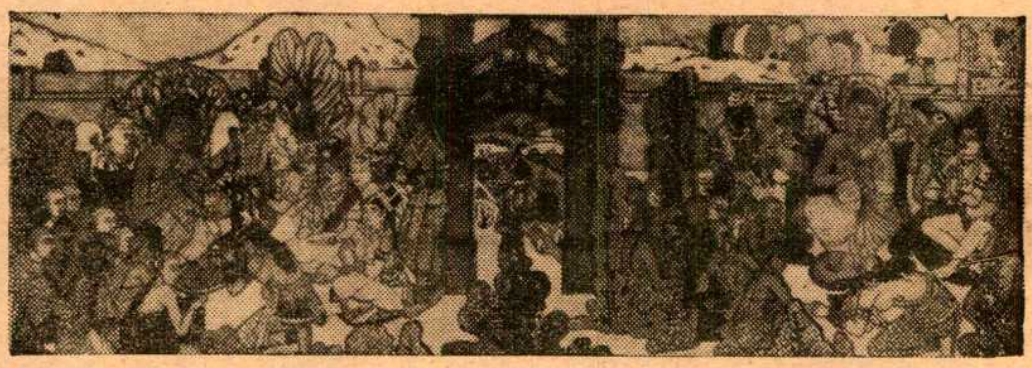

তাদের সাথে বুদ্ধ: কুমারিলের আঁকা একটি ছবি। কুমারিল শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

কম্পোজিশনের এদিক ওদিক করে শিল্পীর দল বিদেশী ছবির পুনরঙ্কন করে চলেছেন। বেঙ্গল স্কুলের নিন্দায় বঙ্গসন্তান হিসেবে এতদিন মনোবেদনায় চুপ করেই ছিলাম। বেঙ্গল স্কুল পুরোনো, 'অব্সলিট্'-ই তো বটে। সেখানে ছবিটা দেখে আমরা যে চিনে ফেলতে পারি। আল্ট্রা মডার্ণ হলো সেইটে, যেখানে বিদেশী শিল্পীর তুলির আঁচড়ে পবিত্র নাজানা বস্তুর ছবি সামনে দেখানো হয়। সম্প্রতি দিল্লীর একাধিক পত্র-পত্রিকায় আধুনিক ছবি উল্টোভাবে ছেপে গেছে! সবচেয়ে বড় মজা হল একমাত্র আর্টিষ্ট নিজে ছাড়া সে ভুলটা কেউ ধরতে পারেন নি। আমরাও বুঝতে না পেরে নিজেরা নিজেদের অজ্ঞতায় চুপ করে এই তথাকথিত মডার্ণ পেন্টিং-এর বাহবা দিয়ে নিজেরাও মডার্ণ সাজার ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

বিশেষ করে সমস্ত ফাইন্ আর্টস-এর শিল্পীদেরই একটা সবচেয়ে বড় দোষ হল তাঁরা সাধারণত বড়ই আত্মকেন্দ্রিক হন। এটার ব্যতিক্রম যে নেই তা হলফ করে বলতে পারি না। তবে একটা ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই—শৈলজ মুখার্জি। আর্ট জগতে তাঁর কোনো শত্রু ছিল না।

পৃথিবীর শিল্পজগতে একমাত্র নিজের অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে শৈলজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাশ্চাত্যে সেজানে বা মাতিসের যে স্থান, প্রাচ্যে শৈলজের সেই স্থান বলে যাঁরা অভিহিত করেন তাঁরা হয় তো একটু অত্যুক্তি করেন। এই অত্যুক্তিটুকু বোধ হয় প্রীতিসিঞ্চিত বর্ণনার ফল।

শৈলজ বহুদিন উকিল স্কুল অব আর্টে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর প্রাণ ছিল।

বিরাট গাড়ী করে ভাইপুরয়-দুহিতা কুইন্স ওয়েতে (বর্তমান জনপথ) অবস্থিত ষ্টুডিওতে আসতে সুরু করলেন। চারিদিকে সবাই ভয়ে তটস্থ। পুলিসের লোক এসে কফি হাউসের দু'পাশের ছোট ছোট দোকানগুলো রাতারাতি উৎখাত করে দিয়ে গেল। বহু বছর ধরে কনট্ সার্কাসের ঐ বারান্দায় বসে বেচারারা যে নিজেদের অন্ন সংস্থানের পথটুকু বেছে নিয়েছিল তাও গেল। রাতে ষ্টুডিও থেকে নেমে সিগারেট কিনতে এসে শৈলজ দেখলেন দোকান-পাট সব তচনচ করে দেওয়া হয়েছে। সিগারেটওয়ালা, পানওয়ালা, মাসিক পত্রিকা ও বইএর দোকানদার কেউ নেই। পরদিন সবাইকে খুঁজে-পেতে বার করলেন। সবাই বিনীতভাবে জানালো তাঁর জন্যই তাদের এ বিপদ।

পরদিন যথারীতি [illegible]

হুইহিতা যখন ছবি আঁকতে এলেন তখন শৈলজ বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন ছবি আঁকা শেখানো তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। দরিদ্র বন্ধুদের লাঞ্ছনায় তিনি মনোবেদনা পেয়েছেন। যতক্ষণ তাদের দোকান-পাট খোলার বন্দোবস্ত না করা হবে ততক্ষণ তিনি কোন কাজে মনোনিবেশ করতে অপারগ।

অনতিবিলম্বে সব দোকানদারদের খুঁজে তাদের পুরোনো জায়গায় বসানো হ'লো। শৈলজ ভইসরয়-নন্দিনীকে তুলি ধরার তালিম দিতে শুরু করলেন। এ কাহিনী শৈলজ নিজে বহুবার আমাকে শুনিয়েছেন। আজও দিল্লীর পলিটেক্‌নিকের আর্ট-ডিপার্টমেণ্টের স্নাতকবৃন্দ বা উকিল স্কুল অফ আর্টের প্রাক্তন ছাত্রদল বা দিল্লীর আর্টিষ্টমাত্রই শৈলজের নামে ছলছলে চোখে ক্ষণেকের জন্য যেন সব কিছু ভুলে যায়।

মৃত্যুর ক'দিন পূর্বেও শৈলজ একদিন বলেছিলেন, শৈশবে কেমন করে সরস্বতীর তীরে বাঁশঝাড়ের ছায়াঘন সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের আবিরছটায় তাঁর মনে ছবি আঁকার প্রথম প্রেরণা এসেছিল। বাংলা দেশের সেই ছবি-খানি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পীর মনে গাঁথা ছিল। মাতিস্, সেজানের শিল্পকলার সাথে এত সুপরিচিত হয়েও তিনি অবনঠাকুরের তুলির ওপর কারুর স্থান দিতে রাজী হন নি।

দিল্লীতে বেঙ্গল স্কুলের যাঁরা ধারক ও বাহক, এক কথায় উত্তর সাধক, তাঁদের ভিতর দু'জন শিল্পীর নাম আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে। দু'জনেই দক্ষিণ ভারতের —শুধু নামে মাত্র। না হলে কথায় বার্তায় চালে চলনে তাঁরা সম্পূর্ণ বঙ্গসন্তান।

কুমারী জয়া আপ্পাস্বামী ও কুমারিল স্বামী দু'জনেই শান্তি নিকেতনের প্রাক্তন স্নাতক। গড় গড় করে তাঁরা দু'জনেই বাংলা বলেন। জয়া বিখ্যাত কুমারাপ্পা ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাগ্নী। কুমারিল, জয়া ছাড়া অপর একজন শিল্পীর নাম এখানে উল্লেখ করছি, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার শিল্পকলার ধ্যানে যিনি সর্বদা নিজেকে বাংলার সাথে একীভূত করে রেখেছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ-এর আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অসিত হালদারের ছাত্র—ব্রজমোহন জিজ্ঞ'। কাশ্মীরের সন্তান। তিনি শুধু গড় গড় করে বাংলা বলতেই পারেন না। বাঙ্গালীদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের হাবভাব আচার ব্যবহার সব খুঁটিনাটিভাবে আয়ত্ত করেছেন, ঠিক যেমনটি একদিন করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সুব্রহ্মনিয়ম্ ভারতী। চারুদত্ত অধরকরের মতন তিনি মন দেওয়া নেওয়া কতবার করেছেন ঠিক জানি না, তবে পঙ্কজেশ চিরকুমার চিত্রশিল্পী ব্রজমোহন শুধু বাংলা কবিতা নয়, বাংলার বহু প্রবাদবাক্য অনর্গল বলে যেতে পারেন। বাংলার দৃশ্য বর্ণনায় শিল্পীর চোখে দেখা দেয় টলমলে অশ্রুবিন্দু। তিনি হঠাৎ নির্বাক হয়ে পড়েন। সদা প্রফুল্ল মুখমণ্ডলীতে নেমে আসে ঘোর কালো মেঘ। একদিন হাসতে হাসতে তাঁকে বলেছিলাম, "জিজ্ঞাসাহেব (ভারী মজার ব্যাপার, হিন্দীতে জিজ্ঞাসাহেবের অর্থ হলো 'জামাইবাবু'।) মন দেওয়া নেওয়া কতবার করেছেন ঠিক জানি না, মনটা হারিয়ে ফেলেছেন কিনা তাও এতদিনে' ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, তবে একটা কথা আপনার অস্বীকার করার উপায় নেই। নিশ্চয়ই আপনি এতদিন নূপুরের মতন বহুবার চরণে চরণে বেজেছেন। বলবেন কি সেই সৌভাগ্যবতী বঙ্গললনার নাম?

উদাস শিল্পী কথার জবাবটুকু এড়িয়ে যান।

—ভারী সুন্দর কবিতাটা না ভাই! বলো তো আবার, বলে নিজেই আবৃত্তি করেন।

"মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।"

কবিতাটা অনেকবার শুনেছি। কোথায় আছে বলো তো?

অবিস্মরণীয় প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবময় পুনঃ প্রকাশ

বাঙলার ও বাঙালীর চির আরাধ্য

পরম পবিত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ

কাশীরাম দাসের

মহাভারত

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"। পুণ্যবান কাশীরাম দাস অমিয় পয়ার ছন্দে ভারত গান গাহিয়া ভূতলে অতুল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন—কালের প্রভাবে তাহা অবিনশ্বর। "রুচিবাগীশগণের অশ্লীলতা-আতঙ্ক নীতি" অনুসরণ করিয়া আমরা এই পুণ্যময় গ্রন্থের সংস্কারে সংহার করি নাই। প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে মুদ্রিত—সুসংস্কৃত—রাজাধিরাজ সংস্করণ—দুই খণ্ডে সুসম্পূর্ণ—তিরিশখানি সুরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশ। কাশীরাম দাসের জীবনী সহ এই মহান গ্রন্থ প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য।

মূল্য প্রতি খণ্ড ৬৲ টাকা মাত্র।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা মল্লরাজাদের প্রাচীন কীর্ত্তিক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস বিষ্ণুপুর রাজ্যের ইতিহাস। বিষ্ণুপুরের রাজারা মল্লভূমে রাজত্ব করতেন। আজো বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দির আরো অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ মল্লরাজাদের গৌরবময় স্মৃতি বহন করে চলছে।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিষ্ণুপুর সম্পর্কে বলেছেন, "গৌরবময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময় দেশ।"

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতসাধকগণ নিজেদের প্রতিভায় এক সময় সারা ভারতের সঙ্গীত-সভায় যুগান্তর এনে ছিলেন—আজো বিষ্ণুপুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে।

এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন "শূন্যপুরাণ" রচয়িতা রামাই পণ্ডিত, দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রমুখ স্বনামধন্য কবি। এই জেলারই গৌরব আধুনিক বাংলার অন্যতম মনীষী ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিখ্যাত গাণিতিক শুভঙ্কর এই জেলারই সন্তান। শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি।

বাঁকুড়া জেলার কুটীর শিল্প এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করে। বিষ্ণুপুরের রেশম, তসর ও গরদের বস্ত্রশিল্প, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, শাঁখা ও শোলার মালা, মাতিচুর ও অম্বুরী তামাক শুধু বাঙ্গালীকেই আকর্ষন করেনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোককেও আকর্ষণ করেছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তার নিদর্শন রয়েছে জোড়বাংলা, শ্যামরায়, মদন-মোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি মন্দিরে। দুর্গ নির্ম্মাণেও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লালগড়, গুমগড়, পাথর-দরজা বিষ্ণুপুর স্থপতিদের দুর্গ-নির্ম্মাণের কৌশলের পরিচয় দিচ্ছে।

বাঁকুড়ার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতি আর লোকসঙ্গীত। ইতুপূজা, তুষুগান ও ভাদুগানে মেতে ওঠে বাঁকুড়ার গ্রামীণ অধিবাসীরা। বাঁকুড়ার 'ছৌ' আর গাজনের নাচ। অধিবাসীদের সহরায় ও বাহা উৎসব সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। দোলপূর্ণিমার দিন আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলেই সেজেগুজে বাহা উৎসবে যোগ দেয়। নাচগানে মেতে উঠে তারা।

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঁকুড়ার সমৃদ্ধি অবলুপ্ত হয়েছে দীর্ঘ দিন আগে। সারা জেলার সর্ব্বাঙ্গে নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ। শুষ্ক প্রান্তর জলের অভাবে খাঁ খাঁ করে। বৃষ্টির স্বল্পতা, অনমনীয় ভূমি, কঙ্করময় মাটি, মাটির জলধারণ শক্তির অভাব, নদী প্রবাহের সাময়িকতা এবং সেচের অসুবিধা বাঁকুড়ার কৃষি উন্নয়নকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে।

সুসম খাদ্যের অভাব, কুষ্ঠরোগের প্রাচুর্য্য, পানীয় জলের অভাব, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাধিক্য, ভূমিহীন শ্রমিকের আধিক্য, মৃতপ্রায় কুটীর শিল্প, বৃহৎ শিল্পের একান্ত অভাব আজ বাঁকুড়া জেলার অর্থ নৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দিনের পর দিন কমে আসছে। বাঁকুড়ার বনাঞ্চল

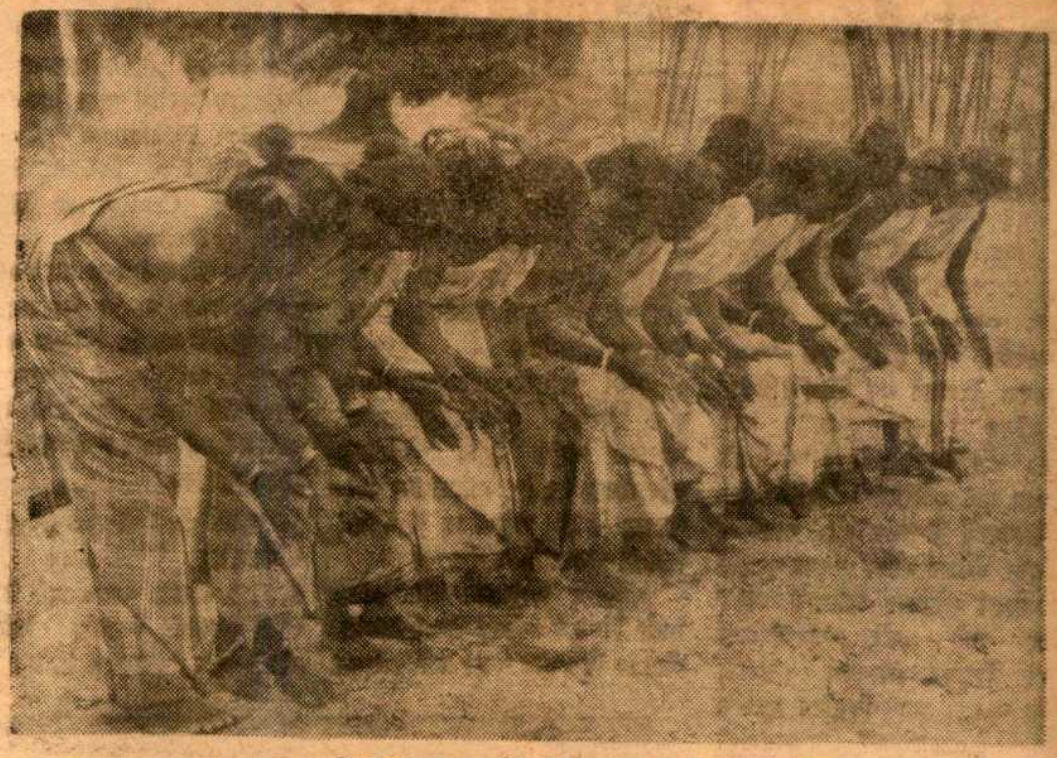

বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী মেয়েদের নৃত্য

আজ মুমূর্ষু। সরকারী প্রচেষ্টায় নূতন বনীকরণ সুরু হলেও সুপ্রাচীন নামকরা বনগুলো আজ অবলুপ্তির পথে।

দরিদ্র গ্রামবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। বিকল্প কর্ম্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নাই। সেচ ব্যবস্থার উপরই জেলার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অথচ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় ৫টির বেশী গভীর নলকূপ খনন করা হয় নি। ডি-ভি-সি-র সুযোগ খুব কম এলাকাই পাচ্ছে। কংসাবতী প্রোজেক্টের কাজ শেষ হয়নি—হলেও বাঁকুড়া জেলা খুব বেশী উপকৃত হবে না।

বাঁকুড়ার ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, বাঁকুড়ার দারিদ্র্যও তেমনি দীর্ঘদিনের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উন্নয়ন ব্লক, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্ম্মসূচী ধীর গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমস্যার মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা বারিবিন্দু কি করবে?

২৪ পরগণা ঃ

সুন্দরবনের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে পড়েছে। পর পর অজন্মা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা এক সময়ের শস্য ভাণ্ডার সুন্দরবনকে আজ রিক্ত করে ফেলেছে। সুন্দরবন থেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে সহরের দিকে লোকজন আসছে অনবরত।

সুন্দরবনের উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনার জন্য কিছুদিন আগে সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। গত ৮ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সভাপতিত্বে এই বোর্ডের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে সুন্দরবন এলাকার প্রত্যেক বিধানসভা সদস্যকে তার এলাকার উন্নয়নের জন্য ছোট ছোট পাইলট স্কীম রচনা করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ২০ হাজার টাকার মধ্যে করতে হবে। আগামী ২৮শে মে সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের যে বৈঠক হবে তার আগেই এই পরিকল্পনাগুলো দাখিল করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ সবই সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

বর্দ্ধমান ঃ

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাকে একটি পৃথক জেলা এবং দুর্গাপুর মহকুমাকে একটি পৃথক মহকুমা করার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আপদকালীন অবস্থা কেটে গেলেই কাজ সুরু করা হবে। এই ঘোষণায় কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বর্দ্ধমান জেলায়। বর্দ্ধমান সদরের অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এতে বিক্ষুব্ধ। তাঁরা প্রকাশ্যেই বলছেন, যে এ প্রস্তাবের তাঁরা বিরোধিতা করবেন।

মেদিনীপুর ঃ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে আগামী ২৮শে এপ্রিল থেকে দীঘার সমুদ্রসৈকতে তিন দিবসব্যাপী রাজনৈতিক সম্মেলন সুরু হচ্ছে। সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

মেদিনীপুর জেলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সর্ব্বশেষ অধিবেশন হয় ১৯১৯ সালে। এতদিন পর আবার এখানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবার। বর্ত্তমান পরিস্থিতে সম্মেলনের গুরুত্বও অনেক বেড়েছে। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তার তোড়জোড়ও চলছে পুরাদমে।

নেফা বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ও তাহার কিংবদন্তী

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর বরাবর হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে, তিব্বত ও চীনের লিংকিয়াং প্রদেশের দক্ষিণে ও ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে অবস্থিত অরণ্য সঙ্কুল ৩৩০০০ বর্গমাইল পার্ব্বত্য ভূখণ্ডকে উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্ত অঞ্চল (অথবা ইংরাজী নর্থ ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির সংক্ষেপ "নেফা") বলা হয়। এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। অধিবাসীরা অধিকাংশই উপজাতীয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এ অঞ্চলে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে ইহাদের কোনরূপ যোগসূত্র ছিল না। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহারা এরোপ্লেনকে আকাশচারী কোন পক্ষী অথবা দেবদেবীদের যানবাহন মনে করিত।

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

বৃটিশ আমলে এ অঞ্চল সর্ব্বতোভাবে অবহেলিত ছিল। ভারতের অপর অংশের গণচেতনা এই সরল উপজাতীয়দের মধ্যে যেন প্রবেশ করিতে না পারে সে উদ্দেশ্যে ভারতীয় জীবনধারা হইতে ইহাদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই এই অঞ্চলকে ভারতের 'বিস্মৃত সীমান্ত' এই আখ্যা দেওয়া হইত। ক্ষমতা-অন্ধ পররাজ্য লিপ্সু চীনের আক্রমণের পর হইতে এই সীমান্ত কিন্তু আর বিস্মৃত সীমান্ত নহে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক ভারতীয়ের অন্তরে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও কল্যাণ সর্ব্ব প্রধান চিন্তা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার কয়েকবৎসরের মধ্যেই অসংখ্য বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও এই সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ভারতীয় শাসনাধীনে আনা হয়। শাসনাধীনে আনার সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অরাজকতা, গ্রাম লুণ্ঠন বিভিন্ন উপজাতীয়ের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বহুলাংশে তিরোহিত হয়। শুধু আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেই নহে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষতঃ শিক্ষা, কৃষি ও চিকিৎসা পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

নেফা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কেন্দ্রীয়বহির্বিভাগীয় মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক ইহার শাসনভার পরিচালিত হয়। প্রাদেশিক রাষ্ট্রপালের উপর রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে শাসনভার অর্পিত আছে।

শাসনের সুব্যবস্থার জন্য নেফাকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব এক একজন পলিটিকাল অফিসারের উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক অফিসারের উপদেষ্টা হিসাবে আছেন একজন চিকিৎসক ও একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যেক বিভাগে আছে এক একটি Basic Education Centre, Demonstration School, Hindi Training Centre ও Health Training Centre.

নেফা পরিশাসকদের প্রধান প্রচেষ্টা যত শীঘ্র সম্ভব স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য হইতে একদলকে শিক্ষিত করিয়া তোলা যেন তাহারা পশ্চাদবর্ত্তী উপজাতীয় ভ্রাতা-ভগিনীদের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির সহায়ক ও পথপ্রদর্শক হইতে পারেন।

আগেই লেখা হইয়াছে যে নেফার অধিবাসীরা উপজাতীয়। উপজাতীয়দের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে যেমন মিসমী, আবোর, মার্কপা, ওয়াঙ্কু ইত্যাদি। এই

নেফার একটি মিসমী মেয়ে তাঁত বুনছে।

যোদ্ধার বেশে নেফার (ইদু) যুবক।

সরল, অজ্ঞ উপজাতীয়দের মধ্যে নানান প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, কিংবদন্তীগুলি সর্ব্ববিষয়েই মৌলিক বলা চলে। নিম্নে কয়েকটি কিংবদন্তী উল্লেখ করা হইল।

পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপজাতীয়ের মধ্যে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—যথা মিসমী উপজাতীয়দের বিশ্বাস সমুদ্রগর্ভ হইতে সাদা একপ্রকার কীটাণু আনীত কাদামাটী হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি।

সারদুকপিনদের বিশ্বাস সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী জলাকীর্ণ ছিল। আকাশে অবস্থানকারী প্রচণ্ড শক্তিশালী দুই ভ্রাতা ক্রীড়াচ্ছলে আকাশে প্রস্ফুটিত এক বিশাল পদ্মফুল নিম্নস্থিত জলে নিক্ষেপ করেন। পদ্মফুলের পাপড়িতে সম্পূর্ণ জলাকীর্ণ স্থানটি আচ্ছাদিত হয়। তাহার পর আসে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণ হইতে বাতাস। উত্তর বায়ু আনে শ্বেত মৃত্তিকা। পশ্চিম বায়ু আনে হরিদ্রা মৃত্তিকা, পূর্ব্ব বায়ু আনে ধূসর মৃত্তিকা ও দক্ষিণ বায়ু আনে কৃষ্ণ মৃত্তিকা। এই বিভিন্ন মৃত্তিকার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় পৃথিবী। অসমান মিশ্রণে পৃথিবীর সীমান্ত হইয়াছে অসমান—কোথায়ও পাহাড়, কোথায়ও নদী, কোথায়ও জলা ও কোথায়ও উপত্যকা।

চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী মৌলিক সন্দেহ নাই। সৃষ্টির আদিতে না কি ছিল দুইটি সূর্য্য। এই দুই সূর্য্যদেবের রশ্মিতে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ, পশুপক্ষী ও দেবদেবী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সূর্য্যদেবদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তাহাদের অব্যর্থ বিষাক্ত তীরের আঘাতে এক সূর্য্য ম্লান হইয়া চন্দ্রে পরিণত হয়।

ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধেও অনেক কিংবদন্তী আছে। যেমন পৃথিবীটা না কি একটি বিরাট চতুষ্পদ জন্তুপৃষ্ঠে অবস্থিত। তাহার গাত্র-পরিবর্ত্তনে পৃথিবী কম্পিত হয়। আবোরদের ধারণা, দেবদেবীরা পৃথিবী হইতে অভীষ্ট পূজা পার্ব্বণ না পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে কম্পিত করেন। ওয়াঞ্চুদের বিশ্বাস দেবদেবীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিলে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়।

বজ্র ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীও মৌলিক বলা চলে। অনেক উপজাতীয় বিশ্বাস করে যে, বজ্র ও বিদ্যুৎ সন্তানশোকে মুহ্যমানা কোন জননীর বিলাপধ্বনি। কামেউদের মতে বজ্র ও বিদ্যুৎ আলিঙ্গন-উদ্যত প্রেমিক ও প্রেমিকের আলিঙ্গন হইতে পলায়মান প্রেমিকার প্রতিচ্ছবি। সারক উপজাতীয়দের মধ্যে কিংবদন্তী—বজ্র বিবদমান স্বামী ও স্ত্রীর বিলাপধ্বনি।

আবোরদের মধ্যে বানরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মজার কিংবদন্তী আছে। তাঁহারা ডারউইনের গবেষণায় বানরেরাই যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মানুষ হইতে বানরের সৃষ্টি। কোন সময়ে এক পরিবারের অলস ও কপট এক ভ্রাতা বনবাসে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিত সেই মানুষটির বনবাসকালে লেজ গজায় ও সে ক্রমশঃই বৃক্ষারোহী হয়। সেই নির্ব্বাসিত মানুষটিই বানরদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

বিখ্যাত দার্শনিক উইনটার নিজে লিখিয়াছেন যে, মানুষের যে কোন দেশাচারের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিলে দেখা যায়, তাহা পবিত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রেরণা মানুষের কল্পনায় যাহা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তাহাই। নেফার অধিবাসীরা উপজাতীয় হইলেও তাহাদের উপকথা ও চারণগীতিতে মানুষের উপকারের জন্য আত্মত্যাগ বা আত্মদানকে খুব উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রজার হিতার্থে রাজার আত্মত্যাগ, মানুষের উপকারের জন্য বৃক্ষের চূড়ান্ত আত্মবলি তাহাদের উপকথার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।*

* কিংবদন্তীগুলি ডঃ ভেরীয়ার এলিউনের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

"ব্রাণ্ডেনবার্গ স্তম্ভ" পশ্চিম বার্লিনের উন্টার ডেন লিণ্ডেন রাস্তা

ইউরোপ ঃ

প্যারিসে সিয়াটো মন্ত্রণা পরিষদের অধিবেশন সুরু হয়েছে ৮ই এপ্রিল থেকে। এই অধিবেশনে চীনের ভারত আক্রমণকে সর্ব্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচীব এই আক্রমণের মধ্যে অতি বৃহৎ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য লক্ষ্য করেছেন।' তিনি আরও বলেছেন "চীনের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করলেও ও রেহাই পাওয়া যায় না সারা পৃথিবী তা জানতে পারল।" লর্ড হোম বলেন "এ আক্রমণে প্রমাণ হচ্ছে জোট বহিভূত থাকলেও কমিনিষ্ট আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না" ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন "দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় চীনই এখন প্রধান সমস্যা। কিন্তু পাকিস্তান সিয়াটোর সভ্য হওয়া সত্ত্বেও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোকে এই অধিবেশনে পাঠায় নাই।

যদিও প্রত্যেক সভ্যদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিল। চীনের সঙ্গে মিতালির পর থেকে এই পর পর তিনবার সিয়াটোর অধিবেশনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাজির হন নাই। উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিমান দেখিয়ে যদি ভারতকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষ থেকে তা যদি বন্ধ করা যায়।

সাহারায় ফরাসীর পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণে আফ্রিকার দেশ-গুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানান হয়েছে। আলজিরিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সাহারায় বিস্ফোরণ আলজিরিয়ার সার্ব্বভৌমত্বের উপর হস্ত নিক্ষেপ হচ্ছে।

ইংলণ্ড ঃ

লণ্ডনে মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারা এবং বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ ডানকান স্যাণ্ডস-এর মধ্যে ভারতকে পশ্চিমী সাহায্য দানের প্রশ্ন সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়েছে। অনুমিত হচ্ছে যৌথ ইংগ-মার্কিণ-কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া বিমান প্রতিরক্ষা মিশনের রিপোর্ট, এ বৈঠকের অন্যতম বিবেচনার বিষয়।

মার্কিণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে মার্কিণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছেন, ভারতের সামরিক সাহায্য এশিয়ার উপমহাদেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পটভূমিকায় বিচার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় এবং ভারত পাকিস্তান বিরোধ মীমাংসার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এই উপমহাদেশের সামরিক দুর্ব্বলতা অপসারণে ভারতের প্রচেষ্টার উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের নিকট চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করা হবে।

পার্লামেন্টের বর্ত্তমান অধিবেশনে "অনিচ্ছুক লর্ডদের" পদবী বর্জ্জন করবার অধিকার দিয়ে একটা আইন প্রণয়ন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিলাতের আইন অনুসারে হাউস অব লর্ডসের সভ্যপদ জন্মাধিকার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হয়। হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্ব করে

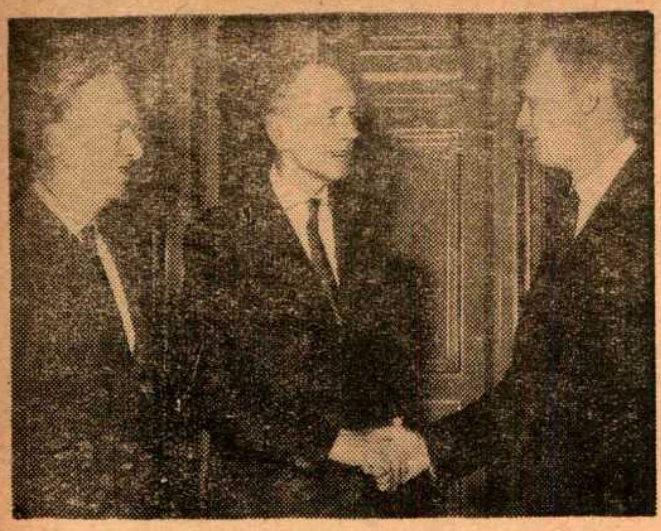

ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মরিস মুরভিলে (দক্ষিণে) ১ই এপ্রিল কুয়াই ডি ওসেতে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হোমকে (মধ্যে) স্বাগত জানান। বামে ফ্রান্সস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত সার পিয়ার্সন ডিক্সন দণ্ডায়মান। সিয়াটো সম্মেলন উপলক্ষে লর্ড হোম এখানে আসেন।

দেওয়ায় প্রতিভাবান লোকদের কাছে হাউস অব লর্ডসের সভ্যপদ এখন মোটেই আকর্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসর ধরে অনেক লর্ডই উচ্চ পরিষদের সভ্য হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ আন্দোলনের ফলেই অবশেষে "অনিচ্ছুক" লর্ডদের পদবী ত্যাগের অনুমতি দেবার আইন প্রণয়ন হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে মিঃ ম্যাকলিওড উপহাসচ্ছলে বলেন "বহুদিন পর্য্যন্ত হাউস অব কমন্সের সভ্যপদের অধিকার থেকে 'মেয়ে', 'লর্ড' 'পাদ্রী', 'প্রাগোল'...বঞ্চিত ছিল। ১৯১৮ সালে মেয়েদের বেলায় এ বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়। এবার লর্ডদের পালা। কিন্তু আশা করি উল্লিখিত তালিকা বরাবর আমরা বিধিনিষেধ প্রত্যাহার বিষয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হব না।'

মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারা

রাশিয়া ঃ

রাশিয়ার সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" জানিয়েছেন যে সোভিয়েট চন্দ্রলোক রকেট লুনিক-৪ মহাকাশে বিলীন হয়ে গেছে। শনিবার ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা ৬-৪৫তে লুনিক-৪ চন্দ্রের ৫৩০০ মাইল উর্দ্ধপথে আকাশ অতিক্রম করেছে। 'তাস' আরও জানিয়েছেন যে, রকেটটির সঙ্গে বেতার যোগাযোগ আরও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তার লেগেছে ৯০ ঘণ্টার মত সময়। পৃথিবী থেকে বৈজ্ঞানিকেরা তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং লুনিক থেকে বিশ্বস্ত-তার সঙ্গে প্রত্যেকটি নির্দ্দেশ পালিত হয়েছে। অনাগতকালে মানুষের চন্দ্রলোক অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব্বে "লুনিক-৪" এর দান অসামান্য বলেই স্বীকৃত হবে।

প্রাভদার এক সংবাদে জানা যাচ্ছে যে সাইবেরিয়ায় বিরাট ইনিসি নদীর উপর বাঁধ নির্ম্মিত হয়েছে। এই বাঁধ নির্ম্মাণ করে রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারেরা এক অসাধ্যসাধন করেছেন। এ বাঁধ নীপার ও ভল্‌গা নদীর বাঁধ থেকেও অনেক বড় এবং এতে রাশিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পাবে।

যুগোশ্লাভিয়া ঃ

তানজুক সংবাদ সরবরাহের এক সংবাদে প্রকাশ করা হয়েছে যে যুগোশ্লাভিয়ার এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ও সে সঙ্গে দেশকে এক নূতন নাম ও নূতন পতাকা দেওয়া হয়েছে। নূতন শাসনতন্ত্রে যুগোশ্লাভিয়াকে 'ফেডারেল রিপাবলিক

রাশিয়াতে ভারতীয় নৃত্য দেখাচ্ছেন মামুদ এসামবেভ

অব যুগোশ্লাভিয়া' অভিহিত করা হয়েছে। নূতন শাসনতন্ত্র মতে পার্লামেন্টের ২টির জায়গায়, ৫টি বিভিন্ন পরিষদ হবে যথা ফেডারেল চেম্বার, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কৃষ্টি, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য এবং রাজনীতি বিষয়ক চেম্বার। প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্র-নায়ক কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শাসন-চালনার ভার থাকছে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত ফেডারেল কাউন্সিলের সভ্যদের উপর। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ হবে চার বৎসর তবে পুনর্নির্ব্বাচিত

হতে পারবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট টিটো যতদিন জীবিত থাকবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

ইজিপ্ট ঃ

ভারতীয় উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন কায়রোতে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে নির্ম্মীয়মাণ সুপারসনিক ফাইটার বিমান প্রস্তুত কারখানা পরিদর্শন করেন। কারখানায় যে ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে তা শব্দ থেকে দ্বিগুণ ভাড়দগতিতে চলতে সক্ষম হবে।

মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে আলাপ আলোচনার পর এ দেশ তিনটির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র সরকার পার্লামেন্ট ও পুলিশবাহিনী থাকবে ও কূটনৈতিক দপ্তরগুলি সম্মিলিত করা হবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হবে কায়রোতে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে মিশরের ৪টি ও সিরিয়া ও ইরাকের ৩টি করে আসন থাকবে। অর্থনৈতিক ঐক্যের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠিত হবে।

ঐ যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মত প্রকাশ করবার এখনও সময় আসে নি। তবে ইতিহাসের পাতা থেকে মানুষ যে জ্ঞান অর্জ্জন করেছে, তা থেকে ঐটুকু বলা চলে যে, যে মিলনের প্রেরণা জনগণের সত্যিকারের একাত্ম বোধ থেকে আসেনি তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

আরব যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি সঞ্চয়ে ও আরব একতা প্রতিবেশী ইসরাইলকে ভীত করে তুলেছে এবং সেখানেও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা শুরু হয়েছে। উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণও চলেছে। দক্ষিণ ইসরাইলে তৈল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর পূর্ব্বে একই স্থানে আরও তিনটি তৈলকূপ খনন করা হয়েছিল। ঐ তৈলকূপের তৈল পাইপ লাইন দিয়ে হাইফায় তৈল শোধনাগারে পাঠান হবে পরিশোধিত হবার জন্য।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

কায়রোয় প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাক সংযুক্ত সরকার গঠনে এবং একটি সংযুক্ত সামরিক বাহিনী গঠনে স্বীকৃত

জাকির হোসেন ও নাসের

হয়েছে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধা কর্মকর্তা হবে প্রেসিডেন্ট এবং তি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে সরকার গঠি হবে। এই কাউন্সিলে সংযুক্ত আরবে থাকবে চার ভোট, ইরাক ও ইরা প্রত্যেকের থাকবে তিন ভোট। আর জগতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা বিবেচনা করে তা এই বাড়তি ভোটের অধিকার দেও

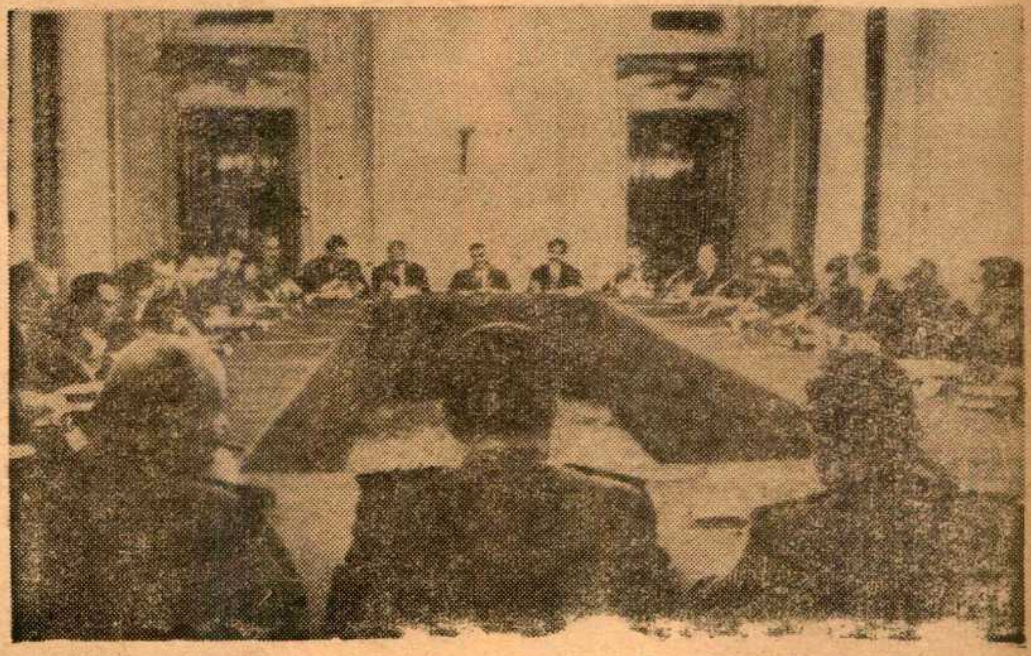

মিশরে আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্য সম্পর্কে সম্মেলন হইতেছে। চিত্রে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরকে (ঘরের টেবিলের মধ্যস্থলে) অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে দেখা যাইতেছে।

কিউবা হতে মুক্ত যুদ্ধবন্দীরা গৃহে ফিরে এলে যে অসীম আনন্দের সৃষ্টি হয়, সেই দৃশ্য ওপরে দেখা যাচ্ছে।

হয়েছে। কাউন্সিলের সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। তিন রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা আপাতত পৃথকই থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা সংস্থা থাকবে যার কাজ হবে তিন রাজ্যের অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধন করা। এই পরিকল্পনা কমিশন-এর সিদ্ধান্ত তিন রাজ্যই মেনে নেবে।

আরব দেশগোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। দূরপ্রাচ্যের এক রাজনীতিতে এই সিদ্ধান্ত সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। ভবিষ্যতের ফলাফল যাই হোক না কেন আরবরাজ্যগোষ্ঠীর এই মিলন প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

ইথিওপিয়া ঃ

ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায়ে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির এক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। ২০শে মে-তে বৈঠক সুরু হবে। সেজন্য এখন থেকেই তোড়জোড় সুরু হয়েছে। বৈঠকটি পাঁচদিন ব্যাপী চলবে ও তাতে প্রধান আলোচনার বিষয় হবে আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন করা যায় কি না। আমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশের রাজধানী থেকে—কায়রো, রাবাট, এলজিয়ার্স, ফাট্‌ন, আক্‌রা, মোনরোভিয়া নানান রকম প্রস্তাব পাঠান হয়েছে আফ্রিকার সংঘাতির একটা ভিত্তি স্থাপনের জন্য যথা—আফ্রিকা কমন মার্কেট, আর্থিক যোজনা ও পরিকল্পনা। আফ্রিকান ব্যাঙ্ক ও আফ্রিকান ভাষা।

রোডেসিয়া ঃ

সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন থেকে ন্যায়শলেণ্ড ও উত্তর রোডেসিয়া স্বতন্ত্র হবার অধিকার স্বীকৃত হবার পর দক্ষিণ রোডেসিয়া বৃটিশ সরকারের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিল। ঐ দাবী বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন নি। দক্ষিণ রোডেসিয়ায় মাত্র দুই লক্ষের কিছু অধিক শ্বেত অধিবাসীরা সংখ্যাধিক্য আফ্রিকানদের উপরে কৃত্রিম উপায়ে আধিপত্য করছে।

কংগো ঃ

কংগোর সঙ্গে কাটাঙ্গার একীকরণ হলেও কংগোতে রাষ্ট্রসংঘের কাজ শেষ হতে এখনও অনেক বাকী। কংগোতে এখনও অরাজকতা পুরোদমে চলেছে। আইন আদালত নাই বললেই চলে—সৈন্যদের মধ্যে নাই শৃঙ্খলা। আদুলা সরকারের হুকুম সর্ব্বত্র পালিত হয় না। রাষ্ট্রসংঘের আরও দীর্ঘকাল কংগোতে থেকে শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পূর্ণ না করা গেলে কংগোকে আবার অরাজকতার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ

ভারতকে সাহায্যদান ঃ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নবনির্বাচিত আই-ডি গ্র্যাডমিনিষ্ট্রেটর মিঃ ডেভিড বেল এইড-ইণ্ডিয়া-ক্লাবের এক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন ভারতকে যে সাহায্য আমেরিকা দেবে তাঁর পরিমাণ চীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত করা হবে। কিন্তু কি পরিমাণ টাকা ভারতকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে তার কোন আভাস দিতে বেল অস্বীকৃত হন। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার

চেষ্টার বোলস্

পরিবর্তনশীল কি না সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতেও তিনি রাজী হন নি।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি শ্রী চেষ্টার বাওলসকে ভারতের পরবর্ত্তী আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছেন। শ্রী চেষ্টার বাওলস ইতিপূর্ব্বেও (১৯৫১-৫৩) একবার ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তদানীন্তন তার ভারত থাকা কালীন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব দৃঢ় হয়েছিল। তিনি অন্তরের সঙ্গে ভারতকে ভালবাসেন কাজেই তার নিয়োগ সংবাদ ভারতে সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় ভারতের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় করতে সক্ষম হবেন।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিক অধিকার দান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এ সম্মান অন্য দেশীয় কেউ-কোন প্রধানমন্ত্রীর নয়ই এর পূর্ব্বে আর পান নি। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডি মিঃ চার্চ্চিলকে 'এ যুগের সবচেয়ে সম্মানজনক ও সম্মান্বিত বলে অভিহিত করেছেন এ সম্মান গ্রহণ করে মিঃ চার্চ্চিল বলেছেন 'আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক ভালবাসার নিদর্শন পেয়েছি কিন্তু এ সম্মানের

সার উইনস্টন চার্চিল

তুলনা নাই। আমি এ (সম্মান প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করছি।

কানাডা ঃ

গত সাধারণ নির্ব্বাচন-এর ১৮ মাসের মধ্যে কেনাডায় আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। ফলাফল যতখানি প্রচারিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে অন্যদল নিরপেক্ষ গরিষ্ঠতা না হলেও একক গরিষ্ঠতা লিবারেল পার্টির হবে। গত দু' নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লিবারেল পার্টি কানাডা শাসন করেছেন ৬ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ডিফেনবেকারের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল মন্ত্রীত্ব দখল করে।

পূর্ব পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে চারিদিক দিয়ে গোলমাল লেগে উঠেছে। সংবিধান নিয়ে আইন-সভায় অচল অবস্থা সৃষ্টি তো হয়েছেই ; আইন-সভার বাইরেও নানা ক্ষেত্রে বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। চট্টগ্রামে রেল-কর্মীদের উপর গুলী চলেছে, ফলে কয়েকজন রেলকর্মী নিহত হয়েছে এবং শতাধিক লোক আহত হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করেছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কর্মীরা

ন্যু ইয়র্ক সাধারণ পাঠাগারে থাকে থাকে সাজানো গ্রন্থ। এই পাঠাগারে বৎসরে প্রায় তিন হাজার রকম ভাষার গ্রন্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে। ছবিতে দক্ষিণে পাঠাগারের সভাপতি শ্রীগিলবার্ট চ্যাপম্যান ও বামে পাঠাগারের অর্থ সংগ্রাহক কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীডেভিড শেফার্ডকে দেখা যাচ্ছে।

তা বিশ্বাস করে নি। ১০ই এপ্রিল সকালে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা গেটের সম্মুখে জমায়েত হয়। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তারা পাহাড়তলী রেল স্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানেও ইতিমধ্যে বহু লোক জড় হয়। রেলশ্রমিক, কর্মচারী ও অন্যান্য লোক নিয়ে জনতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০০০ হাজার। ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ৩০ রাউণ্ড গুলী ছোড়ে। পুলিশ পাহাড়তলী বাজার, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ববর্তী সরাইপাড়াতেও গুলীবর্ষণ করে।

বাহাদুরাবাদ ও চাঁদপুরেও ছোটখাট হাঙ্গামা হয় তবে কোন হতাহতের খবর সেখান থেকে পাওয়া যায় নাই।

ভারতের আণবিক শক্তি-শাখার সম্পাদক ডঃ হোমি জে, ভাবা জাতিসঙ্ঘের জেনেভা সম্মেলনে ১৬০০ প্রতিনিধির সম্মুখে—অনুন্নত স্থানে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা উন্নতি সাধন সম্পর্কে প্রথম ভাষণ দান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার গত ৬ই এপ্রিল এক আদেশ জারী করে ধর্মঘট সংক্রান্ত কোন খবরাখবর সংবাদপত্রে প্রকাশ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের মেয়াদ আরও চৌদ্দ দিন বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার অথবা অন্য কোন সরকারী সংস্থার কর্মচারীদের ধর্মঘটের কোন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না। এই আদেশ প্রথম বলবৎ হয়েছিল গত ২৪শে মার্চ।

ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ঃ

গত ১০ই এপ্রিল ঢাকাতেও এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা 'দাবী দিবস' উপলক্ষে ধর্মঘট প্রতিপালন করে। আমতলায় এক সভা অনুষ্ঠানের পর ছাত্ররা এক শোভাযাত্রা সহকারে কার্জন হলের পূর্ব গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন ধরণের শ্লোগান দিতে থাকে। আব্দুল গণি রোডে পূর্ব হতেই বহু পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছিল। এবারে

রাশিয়ায় চিকিৎসা বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইস্পাত কারখানায় গিয়েও সেখানের চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের এক্স-রে গ্রহণ করেন। ওপরের ছবিতে তারি এক অংশ দেখা যাচ্ছে।

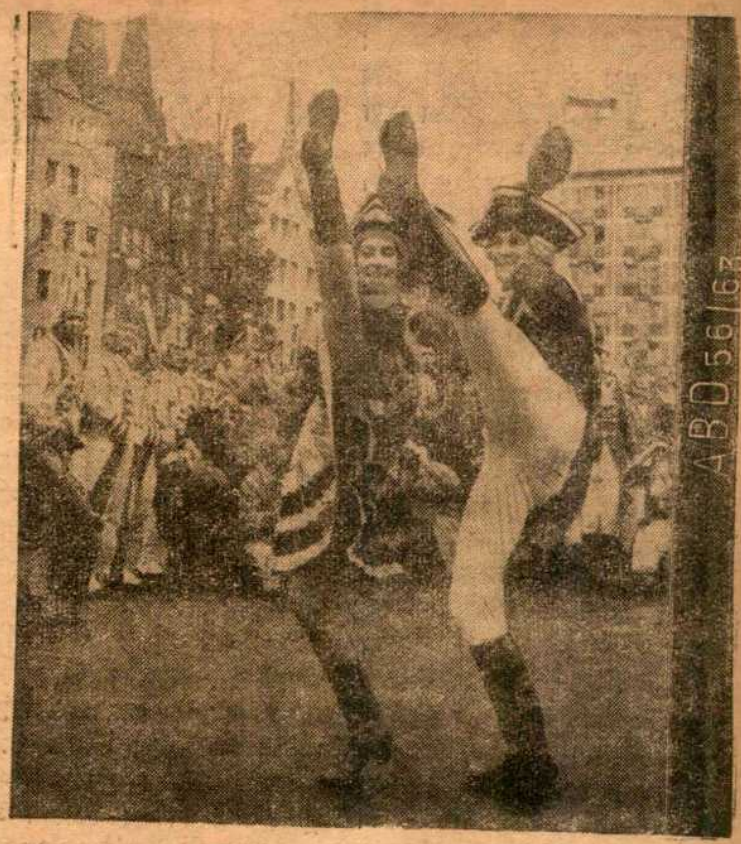

পশ্চিম জার্মানীর ক্যানভ্যাল উৎসবে জনমুখর রাজপথ। ট্রাউজার পরিহিত জেনারেল ম্যানেজার ও তার ক্লিওপাট্রাবেশী স্টেনোগ্রাফারটিকে উৎসবে নৃত্যরত দেখা যাচ্ছে।

ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে তারা ছাত্র-জমায়েতের দিকে এগিয়ে যান। ছাত্ররা তার আদেশ মত সেখান থেকে চলে যেতে অস্বীকৃত হয়। ডেপুটি কমিশনার তখন লাঠি চার্জের হুকুম দেন। বহু ছাত্র আহত হয়। তিন-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ ও মারপিট করার পূর্বে পুলিশ ভাইস-চ্যান্সেলারকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই। ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ এম ও গণি সাংবাদিকদের নাকি বলেছেন কার্জন হল প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশ করা উচিত হয় নাই।

নেপাল ঃ

নেপালের নবগঠিত রাজসভার চেয়ারম্যান ডাঃ কে-আই-সিং পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন এবং নেপালরাজ তা গ্রহণও করেছেন বলে এক সংবাদ পাওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার চেয়ার-ম্যান ডাঃ তুলসী গিরি বলেছেন যে, পদাধিকারের গুরুত্বের প্রশ্নেই নাকি শ্রীসিং পদত্যাগ করেছেন। শ্রীসিং বলেছেন যে, তিনিও একদিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, কাজেই ডাঃ গিরির পদমর্যাদা তাঁর থেকে বেশী হতে পারে না।

সাবমেরিণ থ্রেসার ঃ

পৃথিবীর বৃহত্তম আণবিক শক্তি মার্কিণ সাবমেরিন থ্রেসার ১২৯ জন আরোহীসহ খোয়া গিয়েছে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল মিঃ জর্জ আণ্ডারসন বলেছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে থ্রেসার সন্ধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি এক বার্তায় এজন্য দুঃখপ্রকাশও করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, যতদিন আত্মত্যাগ করবার মত (থ্রেসারের কর্মী-বাহিনীর) লোক আমেরিকায় থাকবে ততদিন যুক্ত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

মনু ভুলা

বাজারে বইয়ের হুড়াহুড়ি। কোন্‌টা পাঠ্য, আর কোন্‌টা অপাঠ্য—সেই ভাবনা বড় ভাবনা। পাঠক চায় সব সময় একটা ভাল কিছু পড়তে। অবশ্য পাঠকদের মধ্যে যেমন স্তরভেদ আছে, তেমনি ভালো-মন্দ গ্রন্থের স্তরভেদ থাকবেই। থাকে বলেই ভালো-মন্দ বই নিয়ে বইয়ের বাজার।

পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্পের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু গ্রন্থাকারে যেই বের হল, অমনি তাদের চাহিদায় যেন ঘাটতি পড়লো। সব গল্প-লেখকের ভাগ্যেই যে এমন দশা ঘটে, তা নয়। গল্পের কথা থাক। উপন্যাসের বাজার দর কিছুটা চড়া। বড় গল্পই তা ফেঁপে-ফুঁপে উপন্যাসের আকার ধারণ ক'রে বাজারের মিতব্যয়ীদের মান রক্ষা করে। বড় বড় উপন্যাস সম্পর্কে বড় বড় কথা শোনা যায়। সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে পাঠক এমন উপন্যাস দাবী করেন যার ওজনটাই প্রাথমিক বিচারে গ্রাহ্য। ভালো-মন্দের কথা পরে বিবেচ্য। (নানাবর্ণের কালিতে পুস্তকেই সে মন্তব্য খোদাই করে তা ফেরৎ দেওয়া হয়।) অবসর যাপনের একমাত্র উপায় বৃহদাকার উপন্যাস। তাই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক।

আর এক দিকে পাঠকের শব্দ-গ্রাসী ক্ষুধা ভয়ঙ্কর: যেমন রম্যরচনা। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক গল্প-উপন্যাস অনেক সময় সংসার পন্থীদের কাছে অনাদৃত, পাশাপাশি প্রায় সকল বয়স্ক পাঠকের কাছে শিশুপাঠ্য পুস্তক অবহেলিত।

বর্তমান কালে কেন, সমসাময়িক প্রায় সব কালেই সাধারণ পাঠকের কাছে কবিতার মূল্যবোধ কিম্ভূত-কিমাকার। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে অধুনা আধুনিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে পরিসংখ্যান বিভাগের সাহায্য দরকার হবে। এতে সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ উভয়বিধ লক্ষণই নিহিত আছে। কিন্তু কবিতা রচনায় এখন অনধিকারীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সব কালেই এ ব্যাপার ঘটেছে, এখনও ঘটবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। তবে পাঠকদের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য সৎ সমালোচক অপরিহার্য। তার দায় ও দায়িত্ব মন ও মননজাত হওয়া প্রয়োজন।

এ কথা সত্য, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনার সাধারণ বাজার তেমন অনুকূল নয়। যে কোন সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস-কবিতা যদি শিরা-উপশিরা ধমনী বা হৃৎপিণ্ড হয়, তাহলে রচনা সাহিত্য হচ্ছে তার মেরুদণ্ড। শুধু মৌলিক প্রবন্ধই নয়,—জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে ভাষার সর্বমুখী প্রসারতাই বিভিন্ন জাতীয় প্রবন্ধ-রচনা উৎপত্তি করে; সেই ভাষা মানুষের মন ও মননকে দৃঢ়তর ও স্বাবলম্বী করে তোলে।

বাংলা দেশের পাঠকের কাছে তার ভাষা ও সাহিত্য সমাদৃত হবে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যিনি বিদেশীর কাছে সমাদৃত করে তোলেন তিনি নিঃসন্দেহে বাঙালী জাতির কাছে ধন্যবাদার্হ। তাঁর দুঃসাধ্য ব্রতের বিনিময়ে আমাদের

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রদত্ত বাহ্যিক সম্মানের কোনো মূল্যই যথেষ্ট নয়। তাঁর ব্রত সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যদি সেই গ্রন্থ সাধারণের কাছে সহজলভ্য হয়। কিন্তু গ্রন্থটিই যদি একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় তাহলে জাতির সমস্ত মানুষের কাছে সেটা লজ্জাজনক ঘটনা। এ ঘটনার অবসানই আমাদের কাম্য।

"The Origin & Development of the Bengali Language." গ্রন্থটির কি অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছে? অস্থিসার যা হাতে আসে, পাঠকের কাছে পরম সম্পদ হিসেবে গণ্য বলেই তা ব্যবহার করা কঠিন হয়ে ওঠে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঐ মূল্যবান গ্রন্থ দুই ভল্যুমে ১৩০০ পৃষ্ঠায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। ঐ গ্রন্থ দর্শন দুর্লভ হয়েছে। অথচ ঐ গ্রন্থ বহু গ্রন্থের উৎসস্বরূপ। ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে L.A. Schwarzschild, M.A. (oxon), মেলবোর্ণ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি মূল্যবান দীর্ঘায়ত প্রবন্ধ রচনা করে নতুন দিকেই আলোকপাত করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা মূল গ্রন্থ আমাদের কাছেই অনুপস্থিত। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এই গ্রন্থের মূল্য বোঝানো বাহুল্য মাত্র। বাঙালী সাহিত্যিকদের কাছেও এ গ্রন্থ অপরিহার্য। কেননা, ভাষা তার সাহিত্যের সংগে সম্পৃক্ত। আমাদের ভাষা সম্পদ কেমন, আমরা জানব না,—এ কথা ভাবাও যায় না। আমরা যে সাহিত্যের গর্ব করি, তার ভাষা-গৌরব কতোখানি তা জানা যে নিজেকে জানার মতোই। ঐ ভাষাতে আমরাও যে কথা বলি। তাই স্যার গ্রীয়ার্সনের মতে—

"It gives me great pleasure to have this opportunity of publicly wishing God speed to Professor Chatterji's admirable work and of recommending it to all students of the modern languages of India."

আশ্চর্যের ব্যাপার, বছরের পর বছর গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে রয়েছে, কিন্তু পুনর্মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থার কথা আমাদের জানা নেই। গ্রন্থটি পরিবর্ধনের অজুহাত যদি বিলম্বিত হওয়ার কারণ হয়, তাহলে ডক্টর সুনীতিকুমারের কাছে আমাদের অনুরোধ—তিনি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ

পাঠকের কাছে সহজ পন্থা করে তুলুন।

আনন্দের সংবাদ, Bengali Literature in the Nineteenth Century-র ২য় সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায় প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে। পঁয়ত্রিশ টাকা দামের এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ডক্টর সুশীলকুমার দে গ্রন্থটিকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করার জন্যে যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তার জন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত দে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জীবন-চর্যার যুক্তিমূলক আলোচনার সহিত উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা বাংলা সাহিত্য আলোচনার নতুন দিগ্‌দর্শন হিসেবে একদা স্বীকৃত হয়েছিল। সে গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ আছে। গ্রন্থটি পুনর্লিখিত হওয়ায় বরং গৌরব বৃদ্ধিই পেয়েছে। ডক্টর দে'র আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও সহজবোধ্য ও রসগুণান্বিত। জটিল আলোচনার পাশে সরল উদ্‌ধৃতিও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে।

ডঃ সুশীলকুমার দে

"তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি
ভালবাসিতো।"

সামাজিক পটভূমিকায় কবি-মনের বিচার বিশ্লেষণে এমন উদ্‌ধৃতি সম্ভব হয়েছে শ্রীযুক্ত দে স্বয়ং একজন কবি বলেই।

গ্রন্থটি দেশী-বিদেশী পাঠকদের কাছে আর যে দুষ্প্রাপ্য নয়, এই সংবাদ নিশ্চয়ই আনন্দের।

নিবারণ বাঁশী বাজাতে ভালবাসত।

এমন দিনে, এই বৈশাখের সন্ধ্যায় আমতলার ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাত।

তখন তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল। তাই কেমন বাউল বাউল দেখাত মানুষটাকে।

আকাশে যেদিন চাঁদ উঠত সেদিন তো কথাই ছিল না। বাড়ির সামনের বিশাল প্রান্তর জুড়ে চাঁদের আলো থৈ থৈ করত। মেঠো হাওয়ায় নিবারণের মাথার ঘন কোঁকড়া চুল ফুলে ফেঁপে উঠত। আর সেই হাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে উদোম গা হয়ে বসে কত রাত পর্যন্ত যে সে বাঁশী বাজাত।

অন্ধকার রাত্রেও আমতলায় বাঁশী নিয়ে বসত সে।

কিন্তু ঝোপ-ঝাড় থেকে একটু দূরে সরে বসত।

গ্রীষ্মকাল, তার ওপর মাঠের মিষ্টি হাওয়া—তায় কি না অমন পাগল করা বাঁশীর সুর।

অনেকেই নিবারণকে সাবধান করে দিত।

'বাবা, ভাল জিনিস সকলেরই ভাল লাগে। মিষ্টি হাওয়া, মিষ্টি সুর, মিষ্টি গন্ধ—বুঝলে না?'

বুঝতে পেরে নিবারণ ঠোঁট থেকে বাঁশী সরিয়ে নিয়ে হাসত।

'আর মিষ্টি মুখের কথা বললে না? চাঁদপানা মুখ?'

'হ্যাঁ, তাও বটে।' একদিন বুঝি বুড়ো রাখহরি এসেছিল নিবারণকে সাবধান করে দিতে। হাতের লাঠি ঠক ঠক করে রাখহরি আমতলায় এসেছিল। যেন গরমের জ্বালায় বুড়ো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। কথা বলার সময় রাখহরির মাথাটা ঠক-ঠক করে নড়ছিল। নিবারণের কথায় বুড়ো দন্তহীন মাড়ি বার করে হেসে ফেলেছিল।

'হ্যাঁ, তাও বটে। সুন্দর মুখ চাঁদপানা মুখ।' একটু থেমে থেকে রাখহরি পরে বলেছিল—'তাও সত্য। সুন্দর মুখের জন্য দেবতা যেমন হাত বাড়িয়েছে তেমি দৈত্যও হাত বাড়িয়েছে। চাঁদপানা মুখের জন্য দেবতায় আর দৈত্যে যুদ্ধ হত।'

'এখন হয় না?'

'এখনও হয়। এই সংসারে মানুষের মধ্যে দেবতা আছে, শয়তান আছে।

আছে না কি!'

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। অন্ধকারে তারা জ্বল জ্বল করছিল। হাওয়ার জোর ছিল। হাওয়া যত

বেগে বইছিল ঠিক একটা তারা যেন তত বেশি জ্বলছিল। পাখার হাওয়া দিলে উনুনের নিভু নিভু কয়লা যেমন আবার গনগনে হয়ে ওঠে, হেসে ওঠে।

বাঁশের বাঁশী কোলের ওপর ফেলে রেখে নিবারণ আকাশের দিকে চোখ রেখে বুড়োর কথাটা ভাবছিল। আমগাছের মাথায় পাতার সর সর শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা শুনে রাখহরি নিবারণের মুখ দেখছিল।

'তা বলে কি আর কেউ বাঁশী বাজান বন্ধ রাখে?—রাখে না। তবে কি না ঝোপঝাড় থেকে একটু দূরে সরে বসে—'

'না হয় তাই বসলাম, সর্পদংশন থেকে বাঁচলাম।' কোলের বাঁশী হাতে তুলে নিয়ে নিবারণ গাছের অন্ধকার ও জ্যোৎস্নায় চিত্রিত অদূরের ফুলমনসা ও আঁশশ্যাওড়ার ঘন

জঙ্গলটার ওপর একবার চোখ রাখল। কিন্তু তা বলে কি নিবারণ ভয়ে শিউরে উঠেছিল। তা নয়। কিন্তু অদৃশ্য সাপের কথা উঠতেই ভয় পেয়ে দাঁত কপাটি লাগবে এমন ভীরু সে কোনদিন ছিল না। এবং আলো অন্ধকারের রহস্যময় রেখাগুলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে সেদিন সে কৌতুকের হাসি হেসেছিল।

'কিন্তু ঘরে যদি চাঁদপানা মুখ আসে, তখন? তখন যদি শয়তান হাত বাড়ায় আমার ঘরের জিনিসকে আমি কোথায় লুকোব!'

প্রশ্ন শুনে বুড়ো রাখহরি একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

বস্তুত রাখহরি চট করে জবাব দিতে পারে নি।

বাঁশীর সুর জঙ্গলের সাপকে টেনে আনে, সুন্দর মুখ শয়তানকে টেনে আনে। রাখহরি সাপ এড়াবার কৌশল বলে দিয়েছিল, কিন্তু শয়তান তাড়াবার ব্যবস্থা দিয়ে যেতে পারে নি।

কেন না দিন কতক বাদে বুড়ো মরে গেল। আশী বছরের আয়ু পেয়ে তিন তিনটে সুন্দরী বৌ রাখহরি ঘরে এনেছিল।

তার ঘরের দিকে শয়তান হাত বাড়িয়েছিল কি না নিবারণের তাও জানা হয় নি। না কি হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু কেমন করে শয়তানকে তাড়াবে ভাবতে ভাবতে বুড়োরও সারাজীবন কেটেছিল।

তাই এমন একটা জটিল প্রশ্ন সরল মন নিবারণের সামনে তুলে ধরে নিবারণকে জটিলতার পাকে জড়িয়ে রেখে বুড়োটা সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে।

কথাটা নিবারণ অনেকদিন ভেবেছে।

ভাবতে ভাবতে একদিন চাঁদপানা মুখ ঘরে এনেছে।

তখন আর নিবারণ বাঁশী বাজাত না। মাথার বাবরিও কেটে ফেলেছে। কেননা সে জুট মিলে চাকরি নিয়েছে। পাটের আঁশ চুলে জড়িয়ে থাকে বলে রাগ করে চুল ছোট করে দিয়েছে। একেবারে এইটুকুন এইটুকুন।

সত্যি, আমতলায় পা ছড়িয়ে বসে মেঠো হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বাঁশী বাজাবার মতন অঢেল সময় নিবারণের জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। এবং বাঁশী বাজান বন্ধ রাখতে রাখতে একদিন সে সাপের কথাটাও ভুলে গেল।

মিষ্টি সুর নেই তো কিসের লোভে দুষ্ট আসবে।

কিন্তু নিবারণ থেকে থেকে চকিত হয়ে উঠেছে।

যখন ঘরে থেকেছে তখন জানালার বাইরে, কখনো দরজার বাইরে একটা ভয়কাতর দৃষ্টি চট করে বুলিয়ে নিয়েছে। বাইরে থেকে যখন ঘরে

ঢুকতে গেছে তখন জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে দরজার আধা ভেজানো পাল্লা দু'টোর মাঝখান দিয়ে একটা সন্ত্রস্ত সন্দিগ্ধদৃষ্টি ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ চাঁদের আলো ছোপানো গায়ের চামড়া, অমাবস্যার অন্ধকার জমানো এক মাথা চুল, ঢলঢলে চোখ, টানা ভুরু, গুরু নিতম্ব ও সুঠাম স্তনজোড়া নিয়ে মেনকা যেদিন ঘরে এসেছে সেদিন থেকে নিবারণের এই অসুখ এই অশান্তির সৃষ্টি।

সকালে তাড়াতাড়ি করে সে কাজে ছুটে যায়।

তোম্ন চটকলের ছুটির ভেঁপু বাজতে একটা হাউইয়ের গতি নিয়ে ঘরের দিকে ধাওয়া করে।

সঙ্গী সাথীরা হাসাহাসি করে।

কোথায় সেই হাসি, ঢেউ খেলানো ধারার, কোথায় গেল তার বাঁশী। মানুষটা কেমন হয়ে গেল যে!

'বৌ-পাগলা হয়ে গেছে নিবারণ।' সঙ্গীরা বলাবলি করে, 'চিতা বাঘিনীর মতো সুন্দরী বৌ পেয়ে লোকটা দুনিয়ার সব কিছু ভুলেছে।'

'না কি সুন্দরী চিতাকে নিবারণ পোষ মানাতে পারছে না।' আর একজন মন্তব্য করেছিল। শুনে বাকি তিনজন ঠেঁ-টেপা হাসি হেসে বিষয়টা উপভোগ করেছিল।

কিন্তু তারা জানত না সেদিক দিয়ে নিবারণ কত বড় ভাগ্যবান। এই যে এখন কাজ সেরে ঘোড়ার গতি নিয়ে সে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কপালে ঘাম, পায়ে ধুলো, গলার খাঁজে খাঁজে কানের গর্তে নাকের ছিদ্রের কাছে পাটের আঁশ ময়লা ছাঁট জমে ভূতের চেহারা হয়ে আছে একটু পরেই নিবারণের আর এই চেহারা থাকবে না।

নতুন মানুষ হ'য়ে যাবে সে।

বোঝাই যাবে না সারাদিন লোকটা চটকলে খেটে এসেছে। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে ভর্তি তিনটে বালতি সাজান আছে নিবারণের স্নানের জন্য। বালতির পাশে তোয়ালে, সাবান, তেলের শিশি, সাবান দিয়ে কাচা শুকনো গেঞ্জি, লুঙ্গি সব ঠিক ক'রে রেখেছে মেনকা বলে কি না পোষ মানাতে পারে নি বৌকে।

নিবারণ যে কত সুখে আছে যদি সঙ্গীরা একবার তার অন্তঃপুরে উঁকি দিয়ে দেখত।

মেনকা প্রাণপাত করছে স্বামীকে আরাম দিতে আয়েস দিতে। কালো কুচকুচে গায়ের রং, তেম্নি পাথুরে গড়ন নিবারণের।

স্নান হয়ে গেলে মেনকা ফরসা সুন্দর হাত দু'টো নেড়ে নেড়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দেয়া তখন যদি বাইরের মানুষ, যেমন নিবারণের সঙ্গীর, মেনকার চেহারা দেখত। কী ভয়ংকর নিষ্ঠা ওর সুন্দর চোখ দু'টোতে পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠের বাঁকে বাঁকে ফুটে ওঠে। যেন দরকার হলে তোয়ালে ফেলে দিয়ে মাথার নিবিড় ঘন চুল দিয়ে পাথুরে শরীরটার সবটুকু জল শুষে নেবে ও। যেন একটা মূল্যবান পাথর যত্ন করে তুলে রাখবে বলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিল মেনকা।

তারপর ভাত খেতে দেবে নিবারণকে।

কাছে বসে মেনকা পাখা নেড়ে বাতাস করবে।

নিবারণ খেয়ে উঠলে মেনকা স্বামীর এঁটো পাতে চারটি ভাত নিয়ে নাকে মুখে গুঁজে হাঙ্গামা শেষ করে দেবে। আলো নিবিয়ে রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে এদিকে। বিছানা করবে। ততক্ষণ নিবারণ বিড়ি খেয়েছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গাছপালার অন্ধকার দেখেছে, দূরের মাঠ দেখেছে, জ্যোৎস্না দেখেছে।

কিন্তু চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ শোনা মাত্র ভিতরে চলে এসেছে। মাঠ বন আকাশ জ্যোৎস্না সব পিছনে পড়ে রইল।

থাকবেই। কেননা এখন নিবারণের ঘরের ভিতর সাত রাজার ঐশ্বর্য। আর এই ঐশ্বর্য সে একলা ভোগ করবে।

আইন তাকে অধিকার দিয়েছে, সমাজ তাকে এই অফুরন্ত ভোগের অনুমতি দিয়েছে।

কিন্তু আইন ও সমাজ এখানে কতটুকু।

আইন ভাঙতে, সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করতে শয়তান সর্বদা হাত উঁচিয়ে আছে।

তাই গাত্রাবাস সরিয়ে রেখে রূপের ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে মেনকা যখন ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে আসে নিবারণ তখন কাঠ হয়ে থাকে। একটা অনিশ্চিত ভয়ের ডেলা তার বুকের ভিতর ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে।

আর ইঁদুরটা নড়লে সে কান খাড়া করে রাখে। বাতাসের শব্দ হলে চকিত হয়ে ওঠে।

'কিসের এত ভয়? ভয় পাচ্ছ কেন?' একদিন মেনকা প্রশ্ন করছিল। থতমত খেয়ে নিবারণ বোয়ের মুখ দেখছিল। ঠিক ধরে ফেলেছে মেনকা। নিবারণ ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের তেল পুড়ছে। জেগে চুপ করে বসে আছে। রোজই ব'সে থাকছে। অথচ ভাল করে রোদ না উঠতে যাকে কাজে বেরোতে হচ্ছে।

'মাঠের ওপর ঘর।' আমতা আমতা করে নিবারণ জবাব দিয়েছিল, ধারে কাছে পড়শী টড়শী বলতে বিশেষ কেউ নেই—'এই পর্যন্ত বলে সে থেমে থেকেছিল।

'অ—চোর ডাকাতের ভয়ে মরছ!

মুখতে পেরে মেনকা এক পশলা হেসেছিল। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, যুঁইফুলের মতো দাঁত। হাসিটা নিবারণকে কতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তেমনি বুকের ভিতর ভয়ের ডেলাটাও ধীরে ধীরে দুলছিল।

'হুঁ', বেশ কিছুক্ষণ পর নিবারণ সংক্ষেপে উত্তর করেছিল। 'চোর-ডাকাত।'

'কী আর আছে, চোরে চুরি করতে আসবে, ডাকাত লুঠ করতে আসবে!' আর হাসেনি মেনকা। গম্ভীর হয়ে স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। দু'খানা কলাই করা থালা, গ্লাস, এলুমিনিয়মের দু'টো হাঁড়ি কড়াই। আমার একটা ফাইবারের স্যুটকেস। ভেতরে ক'খানা শাড়ি ব্লাউজ আছে তুমিও জান। আর সোনাদানা গায়ে কত আছে দেখতে পাচ্ছ। গরীবের ঘরের মেয়ে। জেনেশুনে বিয়ে করে এনেছ।'

নিবারণ চুপ ছিল।

'না কি তোমার চটকলের পোষাক ময়লা সার্ট পেণ্টটা নিতে আসবে।' কি ভেবে আবার হেসে ফেলেছিল মেনকা। 'না দড়ির ওই ভেজা লুঙ্গি গামছাটা!'

তথাপি মানুষটাকে নীরব দেখে মেনকা হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিল। প্রায়ই দেয়।

'কাজেই ঘরে যখন সোনা মুক্তা হীরা জহরত নেই তখন খামকা ভয় পাওয়া কেন, রাত জেগে শরীর খারাপ করা কেন, ঘুমোও।'

নিবারণ ঘুমোয়নি। বিছানায় শুয়েছিল ঠিক।

ঘুমোচ্ছিল মেনকা।

ঘুমোচ্ছিল মেনকা। নাক ডাকছিল।

নিবারণ তখন কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। মেনকা না ঘুমোলে সে কথা বলতে পারে না। কেবল তাকিয়ে থেকে ওর সুন্দর মুখ দেখে, সুন্দর শরীরটা দেখে, সেই সুন্দর চোখের পাতা বুজল তো নিবারণের কথা আরম্ভ হল। কিন্তু মুখ দিয়ে না, মনে মনে কথা বলে তখন নিবারণ।

'হুঁ, হীরা জহরত তোমার গায়ের রং। মণি মুক্তা তোমার চোখ দু'টো, নাকটা, দাঁতগুলো। আর সোনাদানা তোমার আঙুলের নখ, মাথার চুল, ভুরু, চোখের পালক। তোমায় নিতে চোর আসতে পারে, ডাকাত আসতে পারে। কিন্তু তারা এত বেশি শয়তান তাদের চোখে দেখা যায় না। বাতাসের সঙ্গে বাতাস হয়ে মিশে থাকে, অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার হয়ে জমে থাকে। তাই আমার ভয়। শয়তানকে হঠাৎ চেনা যায় না বলে দুশ্চিন্তা।'

বলতে কি, দুশ্চিন্তায় নিবারণ গায়ে গতরে শুকোতে আরম্ভ করল। চেহারা খারাপ হতে লাগল। লোহার মতো শক্ত শরীর ঘুণে খাওয়া কাঠের চেহারা ধরল। বন্ধুরা নতুন করে এ ওর দিকে চেয়ে ঠোঁট টেপা-টেপি করতে লেগে গেল।

'তবে বোধ হয় তাই হল। পোষ মানাতে পারে নি। তাই মন খারাপ বুকে অশান্তি। তাই শরীরের এই হাল হয়েছে মানুষটার। অথচ মুখ ফুটে বলতে পারে না।'

'বেচারা।' একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। 'ন মাসে ছ মাসে কি আর বোঝা যায়—বোঝা যায় নি। বিয়ের পর স্বাস্থ্যটা ভালর দিকে যাচ্ছিল নিবারণের। মনের ফুর্তিতে ছিল। নতুন ঘর নতুন ঘরণী। এখন

বুঝি বাপ মোসল ছাড়ছে। আসল চেহারাটা দেখতে পেয়ে নিবারণ ভেঙে পড়েছে।'

কিন্তু তা নয়। কেন না দেখা যাচ্ছে নিবারণ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তার মেজাজ রুক্ষ হচ্ছে —যতক্ষণ ঘরে আছে খিট্‌খিট্‌ করছে।

আর মেনকা যেন তত বেশী স্বামীর দিকে নজর দিচ্ছে। নিবারণের স্বাস্থ্য দেখছে সুখ-সুবিধা দেখছে।

বেচারার খাটুনি বেড়ে গেছে। ব্যস্ততা বেড়েছে।

'তুমি খাও, সময় মতো খেয়ে নাও। এমন গুম মেরে বসে আছ কেন?'

গুম মেরে বসে থাকে নিবারণ। ফরমাই করা বেড়ে গেছে।

প্রায়ই কাজে যাচ্ছে না। বাড়ি থেকেই বেরোচ্ছে না। যেন হাট-বাজারের জন্যও বাইরে যেতে অনিচ্ছা। কেবল চুপ করে ঘরে বসে থাকার ইচ্ছা। কিন্তু মেনকা যদি খাওয়ার জন্য স্নানের জন্য তাড়া দেয় নিবারণ আরো বেশি চটে যায়। খিট্‌খিটানি বেড়ে যায়। বৌয়ের কাজের হাজারটা ত্রুটি ধরতে আরম্ভ করে দেয়।

'আমায় নিজের মতো থাকতে দাও।' সময় সময় বৌকে যে সে না বোঝায় এমন নয়। 'আমাকে আমার ভাবনা নিয়ে একলা চুপ করে থাকতে দাও—আমায় ঘাঁটাবে না, ঘাঁটালে মেজাজ আরো বিগড়ে যায়।'

কাজেই মেনকা চুপ করে থাকে। আগের মতো কথায় কথায় হাসে না ভুরু নাচায় না। মুখ বুজে ঘরের কাজ করে। নিবারণ তার ভাবনা নিয়ে থাকে।

ভাবতে ভাবতে এক সময় অস্থির হয়ে পায়চারি আরম্ভ করে। প্রথমে ঘরে তারপর বাইরে—উঠোনে। পায়চারি করতে করতে শেষটায় উঠোন পার হয়ে আমতলায় চলে যায়। সেখানে চুপ করে দাঁড়ায়। বসন্ত গেছে গ্রীষ্ম শেষ। এখন বর্ষা। আকাশ মেঘে মেঘে থমথম করছে। ব্যাং ডাকছে। গাছের পাতা ভারি হয়ে গেছে। সবুজ ঘন হয়ে কালো রং ধরেছে। হাওয়া নেই। গুমট।

আমতলার সামনের মাঠটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে নিবারণ। ওই মাঠে ফিনিক দিয়ে আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঝরে। কোকিল ডাকে। এলোমেলো বাতাস গাছের মাথায় সরসর শব্দ তোলে। একটা উৎসবের সোরগোল সুরু হয়। আগে হত। আর উৎসব যোলকলায় পূর্ণ হত নিবারণের বাঁশীর মিঠা সুরে।

মনে পড়ে নিবারণের বুকের ভিতর হু হু করতে থাকে। সব শেষ হয়ে গেছে। বুড়ো রাখহরি সব শেষ করে দিয়েছিল। তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যেদিন সেদিন থেকে সে আর আমতলায় বাঁশী নিয়ে বসত না।

তারপর সেই ভয় বাড়তে বাড়তে আজ আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। বাতাস বন্ধ। এখন টিকটিকির ডাক শুনলে সে চমকে ওঠে। ভয়ে গা ছমছম করে। এদিক ওদিক তাকায়। বুঝি ওটা এল। ওটা যে কোন্‌দিক দিয়ে আসবে বোঝা যায় না। বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। অন্ধকারে গা মিশিয়ে থাকে। সে সন্দেহ করে যে-কোন দিক দিয়ে যখন তখন শয়তান হানা দেবে। শয়তানের ভয়ে নিবারণ প্রতি মুহূর্তে মরছে। বুড়োটা—পাজি রাখহরিটা তার এই সর্বনাশ করে গেছে। তাকে এমন ভাবে মারছে।

তার চেয়ে সাপের কামড় খেয়ে একেবারে মরে যাওয়া ভাল ছিল না কি।

নিবারণ ভাবতে লাগল। ভেবে ভেবে একদিন হাট থেকে একটা বাঁশী কিনে নিয়ে এল।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'মরতে।'

মেনকা চমকে উঠল। মানুষটা বলছে কি! হাতে বাঁশী। নিবারণের চোখ দু'টো দেখল সে। মাথাটা কি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

তখন সন্ধ্যা। স্নান করে ধোয়া একখানা শাড়ি পরেছে মেনকা। কপালে টিপ পরেছে। চোখে কাজল বুলিয়েছে। পায়ের দিকে চোখ গেল নিবারণের। আলতা পরেছে। আলতা পরা পা দু'টোকে দু'ফালি আগুনের মতন দেখাচ্ছে।

নিবারণ আজ একটু বাইরে গেল হাটে গেল, আর সেই ফাঁকে বৌ সাজগোজও করল। ভেবেছে কি স্বামীর মন ভাল হয়েছে, বাইরে টাইরে যাচ্ছে, এবার থেকে নিয়মমত কাজে যাবে। তাই খুশী হয়ে এই সাজের বহর।

বৌয়ের রূপ দেখে নিবারণ নতুন করে জ্বলছিল। চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

'কোথায় চললে?' মেনকা আবার প্রশ্ন করল।

কথা না বলে নিবারণ আঙুল দিয়ে আমতলার পাশে আশশ্যাওড়ার ঝোপটা দেখাল। মাত্র একটা জোনাকী তখন ঘুরে ঘুরে নাচছে।

'ওখানে কি?' মেনকা ঢোক গিলল।

'ওখানে বসে বাঁশী বাজাব।'

মেনকার মুখে হাসি ফুটল। সে শুনেছে নিবারণ আগে বাঁশী বাজাত। দিনরাত বাঁশী নিয়ে থাকত। হয় তো বাঁশী ছেড়ে দিয়েছে বলে মানুষটার আজ এই দশা। যার যা নেশা। নেশা ছেড়ে মানুষ কখনো থাকতে পারে।

মেনকার চোখে খুশী টলটল করছিল।

ফোন : ২২-৮৮২০
"নবীন অপটিক্ হাউসে"র
'চশমা' ও 'গগলস'
সকলকে মুগ্ধ করে ● পরীক্ষা প্রার্থনীয়
২৬৫বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

'তাই বাজাও। তুমি বাঁশী বাজাবে আমি শুনব। আমি ঘরের কাজ করতে করতে তোমার বাঁশী শুনব।'

যেন এখনি বৃষ্টি নামবে। আকাশ কালো হয়ে আছে। মেঘের গুরুগুরু শব্দ হচ্চে থেকে থেকে। এদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে।

নিবারণের শুকনো ঠোঁটে এক ফালি হাসি জাগল।

'যদি শয়তান আসে?' বৌয়ের দিকে তাকাল সে। মেনকা ভয় পেল।

'ওকথা বলছ কেন—কে শয়তান'—কেমন বিড়বিড় করছিল বৌ।

'শয়তান কে তুমি জান না—দেখনি কোনদিন?'

'না তো?'

বুড়ো রাখহরি যেমন গালে জিভ ঠেকিয়ে হেসেছিল নিবারণও সে ভাবে হাসল।

'বাঁশীর মিষ্টি সুর শয়তানকে ডেকে আনে, ফুলের মিষ্টি গন্ধের লোভে শয়তান আসে, তেমনি মিষ্টি হাওয়া—সুন্দর মুখ—'

'অঃ দাঁড়াও!' যেন এখন মেনকা বুঝল. ফিক্ করে হাসল। 'সাপের কথা বলছ? তোমার বাঁশী শুনে সাপ আসবে!'

'হুঁ,' নিবারণ মাথা ঝাঁকাল, 'আমার যম—'

যেন মেনকা এখন আর একটু বেশি বুঝল তাই আর হাসল না।

'তাই বল, সেই ভাবনা নিয়ে তুমি মরছ—সেই ভয় তোমায় কাহিল করে দিয়েছে।'

'হুঁ, ভয় আমার ঘরে বাইরে দু' জায়গায়।' নিবারণ অকপটে স্বীকার করল।

'সেই তো দেখছি। ভয় তোমার মনে—

সাপ তোমার বুকে বাসা বেঁধেছে। ঐ যে বলে, বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায়'

অনুকম্পার চোখে মেনকা দেখছে তাকে।

নিবারণ টের পেল। তাই কাতর গলায় হাসল।

'তাই একেবারে মরতে চাইছি। রোজ রোজ মরে বাঁচার চেয়ে একদিন শয়তানের ছোবল খাব। একবার মরব।' নিবারণ চলে যেতে পা বাড়াচ্ছিল।

মেনকা ধমক দিল। 'দাঁড়াও।'

'কি।'

'এটা রাখ।'

একটা বাঁশের কঞ্চি। মাটি থেকে তুলে নিবারণের হাতে দিল মেনকা।

'কি হবে।' লিকলিকে কঞ্চিটা শূন্যে নাচিয়ে নিবারণ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল: 'এটা হাতে থাকলে শয়তান ভয় পাবে?'

'পাবে।' অন্ধকারে মেনকার চোখ দু'টো হঠাৎ জ্বলে উঠল। 'আমার ইচ্ছা আমার মন এই বাঁশের চটার মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। যতক্ষণ আমার মন তোমার মুঠোর মধ্যে ধরা আছে ততক্ষণ সাপ বাঘ পিশাচ দানব কাছে ঘেঁসতে পারবে না।'

অপরূপ ভঙ্গিতে মেনকা হাসল।

অপরূপ লাগছিল অন্ধকারের এই নারীমূর্তি।

যেন নতুন করে নেশা ধরল নিবারণের।

পুরুষের মতো 'মরবে সে। শয়তানের মুখোমুখি হবে। কাপুরুষের মৃত্যু নিয়ে দিনের পর দিন বেঁচে থাকবে না। আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে 'আমতলার অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল নিবারণ তার এক হাতে বাঁশী আর এক হাতে মেনকার মন।

'কিছু ভয় নেই—কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টি বসাতে পারবে না।' পিছন থেকে বৌ সাহস দিল তারপর পা পা করে ঘরে ফিরে গেল।

নিবারণ অবাক হল। বাঁশীটাও চমৎকার। এমন ভাল বাঁশী বড় একটা হাতে পড়ে না। প্রাণ খুলে সে বাঁশী বাজাল। কত রাত পর্যন্ত আমতলার ঝোপের কাছে বসে বাজাল খেয়াল নেই।

যখন খেয়াল হল তখন সে অবাক। আকাশে চাঁদ উঠেছে। এক ছিটা মেঘ নেই কোথাও। হাওয়া ছেড়েছে। হাওয়ায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে সব মেঘ। ঝকঝক করছে আকাশ। আর অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় মাঠ বন ভেসে যাচ্ছে। যেন কোথাও একটা গাছে নতুন কদমফুল ফুটেছে।

ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো, মিষ্টি হাওয়া, বাঁশীর সুর—সব ফিরে পেয়েছে নিবারণ। চোখে জল এল তার।

মেনকা তাকে সব পাইয়ে দিয়েছে। মেনকার মন মেনকার ইচ্ছা। বাঁশের কঞ্চিটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। ওটা কাজে লাগেনি। সাপ আসেনি। কোনদিন আসবে না।

নিবারণের বুক শক্ত হয়ে গেল।

যেন ভয়ের ডেলাটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

সোনার ঘণ্টা বাজছে সেখানে। রূপের ঘণ্টা, কামনার ঘণ্টা, জীবনের ঘণ্টা। সব ভয় কেটে গেছে।

নিবারণ উঠে দাঁড়াল।

রাখহরিকে মনে মনে অনুকম্পা করল।

বুড়ো সারাজীবন যন্ত্রণা নিয়ে মরেছে দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাটিয়েছে। তিনটে বৌ তার ঘরে এসেছিল। হয় তো মেনকার মতন সুন্দরী ছিল তারা। কিন্তু মেনকার মন ছিল না একটিরও। তাহলে বুড়ো রোজ শয়তানের ভাবনা নিয়ে মরত না।

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। আর বাঁশী না। অনেক বাজিয়েছে অনেক জ্যোৎস্না উঠেছে। কদমের গন্ধে ভুর ভুর করছে হাওয়া। এখন মেনকাকে তার দরকার। একটি মিষ্টি মুখ।

জলতেষ্টা পাওয়ার মতন একটা তেষ্টা নিয়ে সে ঘরের দিকে ছুটল। দূর থেকে দেখে সে বুঝল ঘরে আলো জ্বলছে।

বাশী শুনছিল বৌ জেগে থেকে।

কাছে গিয়ে সে দেখল ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। মেনকাকে ডাকল। সাড়া নেই। স্বাভাবিক। চাঁদ ঢলে পড়েছে। হাওয়ায় ভোরের গন্ধ। কদমের গন্ধ মজে গিয়ে পদ্মের গন্ধ ছাড়ছে। যেন কোনো একটা দীঘিতে পদ্ম ফুটতে আরম্ভ করেছে। মেনকা ঘুমোচ্ছে।

তা হোক। ভিতর থেকে খিল আঁটা থাকলেও নিবারণ বাইরে থেকে তা খুলতে জানে। বৌ জাগবে ভয়ে তাকে আর ডাকল না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

হ্যারিকেনটা ধুকপুক করে জ্বলছে। তেল ফুরিয়েছে।

দু'জনের বিছানাটি ঠিক পাতা আছে। কুজো, জলের গ্লাস, দেশলাই —জায়গা মতন সব রাখা হয়েছে। মেনকা নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখে সে অবাক হল। একটা আধ-পোড়া সিগারেটের টুকরো তক্তপোশের পায়ার কাছে পড়ে আছে। নিবারণ সেটা হাত দিয়ে তুলল। তারপর সে মনে করতে চেষ্টা করল কখন সিগারেট খেয়েছিল। নিবারণ তো সিগারেট খায় না। বিড়ি খায়। আ কি কোন সময় সিগারেট খেয়েছিল নিবারণের মনে নেই। যে জিনিস মনে নেই তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামান তার স্বভাব না। তাই সে পোড়া সিগারেটটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে হ্যারিকেনটা তুলে নিল। মেনকা হয় তো ওদিকের দরজা দিয়ে বাইরে গেছে।

এক পা এক পা করে নিবারণ সেদিকে এগোল।

নিবারণ অবাক হল।

রান্নাঘরের দরজা খোলা।

ভোর হয়ে এসেছে ভেবে মেনকা তা হলে এখনই উনুন ধরাতে লেগে গেছে। ভেবেছে সকালে ভাত খেয়ে নিবারণ কাজে বেরোবে। যেন কোথায় মুরগী ডাকছিল।

মনে হেসে নিবারণ রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর তার ঠোঁটের হাসি নিভে গেল।

হ্যারিকেনটা দু'হাতে তুলে ধরে কাঠের মতো স্থির শক্ত হয়ে সে

... দড়ি বেঁধে মেনকা ঝুলছে।

দাঁড়িয়ে রইল। একদৃষ্টে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। যেন নিবারণ কিছু কিছু বুঝল। চালের বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মেনকা ঝুলছে।

কিন্তু—

নিবারণের চোখ দু'টো হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। আলোটা আর একটু তুলে ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে জিনিসটা সে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল। দেখতে নিবারণের দু' চোখ আবার বড় হয়ে গেল। পরমুহূর্তে আবার সূক্ষ্ম হল।

মেনকার গলায় ফাঁস পরানো দড়িটা এত কালো কেন, এমন চিক-চিক করছে কেন!

এবার আলোটা মাথার ওপর তুলে ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে নিবারণ চোখ বড় করে জিনিসটা দেখতে লাগল। নিবারণ ঘামতে লাগল। কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না। এতকাল সাপ সাপ করে এখন দড়ি ও সাপের মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল বলে তার ভয়ানক আফশোষ হচ্ছিল। সাপের ফাঁস গলায় জড়িয়ে মেয়েরা কখন মরে ভাবতে লাগল সে। যেন মনে মনে সে এখন বুড়ো রাখহরিকে খুঁজছে।

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্ত্তিমান বিকাশ—
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্ব্বরসের সাগর-
একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্ত্তি নাট্যকার,
সর্ব্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

রাজকৃষ্ণ রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলনীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, প্রহ্লাদ চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

৪র্থ ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিহর লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, টাটকা-বাসি, বঙ্গভূষণ, বেলুনে বাঙালী বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

শ্রীজগদীশ গুপ্তের

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রাজধানী– চীনের রাজনীতি

চীনের ড্রাগন ক্রমশঃই রূপ বদলাচ্ছে। এক কথায় তাদেরকে বহুরূপী বলা যেতে পারে। একদিকে সীমান্তে সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করছে, তাদের বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে বলে আস্ফালন করছে; আবার সে সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির ও চীনা সীমান্ত লঙ্ঘনের অপবাদ দিচ্ছে। নিরপেক্ষ শক্তিদের শান্তির প্রস্তাব (কলম্বো প্রস্তাব) যা ভারত সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছে, তাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে।

অথচ ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের জন্য যেন কত ব্যস্ত এ ভাব দেখাচ্ছে। একই সঙ্গে আবার বহির্জগতে ও অনুন্নত দেশগুলিতে নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য ফলাও করে ভারতবন্দীদের মুক্তি দেবার প্রস্তাবকে বহুল প্রচার দিচ্ছে। অপপ্রচার শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের চারিপার্শ্বের ও বিশেষতঃ সীমান্তের রাষ্ট্রগুলিকে ছলে বলে কৌশলে সপক্ষে আনবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চলেছে। চায়নার বহুল প্রচারিত পিপলস্ ডেইলিতে এক সংবাদে প্রকাশ করা হয়েছে যে বার্ম্মা, নেপাল ও পাকিস্তানে ভারতের প্রস্তুতিকে "প্রসার নীতি" বলে অভিহিত করছে ও এই প্রসার নীতির বিরুদ্ধে সংযুক্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, নেপাল, পাকিস্তান ও বর্ম্মার কাগজ থেকে বেছে বেছে সংবাদ পরিবেশন করছে। নেপালের এক সাপ্তাহিক কাগজে এশিয়ার সমস্ত অশান্তির জন্য নাকি ভারতকে দায়ী করা হয়েছে। ভারতে নাকি সীমান্তের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা চলেছে। পাকিস্তানের 'দৃং' পত্রিকায় ওরা এপ্রিলে লিখেছে যে ভারতের যে নেতারা গোষ্ঠী বহির্ভূত থাকবার নীতিকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করতেন, তারাই এখন পালাক্রমে ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন সাহায্য ভিক্ষা করতে। যেন পাকিস্তান কখনও সাহায্য নেয়নি। বর্ম্মার ভেঙ্গার্ড এক সম্পাদকীয়তে বলছে ভারত এখন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই না।

চীনের কূটনীতি এ তিনটি রাষ্ট্রে কতখানি অনুপ্রবেশ করেছে উপরের উদ্ধৃত অংশ থেকেই অনুমান করা যায়। চায়নীজ সংবাদপত্রের কাংপেতে এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীভুট্টো আগামী সিয়াটোর বৈঠকে যোগ দিবেন না। পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর ভারতকে সাহায্যদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই নাকি তিনি যোগ না দিতে মনস্থ করেছেন।

ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও চীনা পত্রিকায় ভারত ও কুওমিনটাং চীনের মধ্যে এক কাল্পনিক যোগসূত্র আবিষ্কার করে আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করেছে। চীনের সিংপো সংসদ পরিষদের আর এক সংবাদে বলা হয়েছে ভারত শীগগিরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে লীজ—লেণ্ড বন্দোবস্তে এরোপ্লেন ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম পাবার আশা করতে পারে। চীনের সংবাদপত্রের মতে চীনের সমর প্রস্তুতির মিথ্যা অভিযোগ করেই নাকি ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র "বাল্টিমোর সান" এক সংবাদে বলেছে যে চীনের ভারতবন্দী মুক্তিটা ভারত ও নেপালের মধ্যে একটা বিরোধের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ ভারতীয় বন্দীদের মধ্যে অনেক নেপালী সৈন্য রয়েছে যাদের মধ্যে বন্দী অবস্থায় বিদ্বেষ বীজ বপন করা হয়েছে

প্রাচীন ভারহুত ভাস্কর্যে যক্ষন রী

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ওয়াই, বি, চ্যবন ও ব্রিটেনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডস্‌কে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে অস্ত্রসরবরাহ চুক্তিতে সই করতে দেখা যাচ্ছে।

উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ইরানের স্পীকার শ্রী সর্দার ফকের হেকমৎ-কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে "পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়ে মাও-সে-তুং নেপাল অভিমুখে নূতন রাস্তা নির্মাণ করছে ভারত আক্রমণ করবার জন্য। ভারত ও চীনের মধ্যে নেপাল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ভারত এ সীমান্তে এতদিন যে রকম নিশ্চিন্ত ছিলো সহস্র বৎসরের সে নিশ্চিন্তি এখন দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়েছে।" হল্যাণ্ড ও কেনাণ্ডার সংবাদপত্রেও চীনের অভিসন্ধি সম্বন্ধে ভারতকে হুঁসিয়ার করা হয়েছে।

ডেইলি টেলিগ্রাফ এক সংবাদে প্রকাশ করেছে যে ভারত নাকি শীগগিরই আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে একটি নৌঘাটী নির্মাণকার্য্য শুরু করবে। ঐ কাগজে আরও লেখা হয়েছে, পোর্ট ব্লেয়ার এমন জায়গায় অবস্থিত যে, সেখান থেকে মলাক্কা প্রণালীর ওপর আধিপত্য করা সম্ভব হতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ৮ই এপ্রিলের সংখ্যায় প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রতিনিধি মিঃ রোস্টোর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে শ্রী রোস্টো ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন, দুদেশের নেতাদের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা বিভাগের ভিত্তিতে কোন চুক্তি হ'তে পারে কি না তা জানতে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে শ্রীনগর ও উত্তর অঞ্চলটা পড়বে ভারতের ভাগে, ও অপর অংশ যাবে পাকিস্তানে।

নাগারা আবার উপদ্রব সুরু করেছে। ৯ই এপ্রিল রাত দশটায় লামডিং-মরিয়ান সেকশনে রাঙ্গা-পাহাড় ও সুভনসিঁড়ি ষ্টেশনের মাঝ পথে নাগা বিদ্রোহীদের ডিনামাইটে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন ও চারটি কামরা উল্টে যায়। এই আক্রমণে নিহত হয়েছে পাঁচজন এবং আহত হয়েছে ২৭জন।

লোকসভা ঃ

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করে বলেছেন, বিদেশ থেকে অর্থ পেয়েই হোক, অথবা আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির জন্যই হোক, এই জাতীয় ঘটনা যখন ঘটছে তখন তাকে দমনের ব্যবস্থা দৃঢ় হস্তেই করতে হবে। এই ঘটনার জায়গায় ৫০ ফুট লম্বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার পাওয়া গেছে। ঐ তার নাগারা কোথা থেকে পেয়েছে তিনি বলতে পারেন না। "তবে আমরা অনুমান করে নিতে পারি" বলে মন্তব্য করেন।

প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চ্যবন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, ভারত

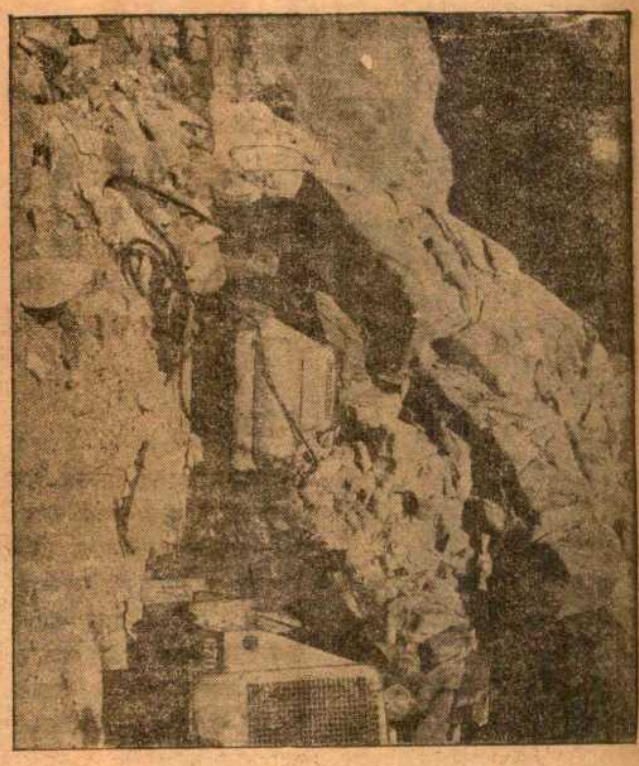

লাডাক সীমান্তে শীতের কনকনে হাওয়ার মধ্যে পথ-নির্মাণরত ভারতীয় সৈনিক

প্রতিরক্ষা শক্তি দৃঢ় করার সংকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার অবিচলিত আছেন। তিনি আরও বলেন যে প্রতিরক্ষা শক্তি দৃঢ় করবার জন্য দু'বৎসরের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী দ্বিগুণ করা হবে। অন্যান্য ব্যবস্থা—বিমানবাহিনী সম্প্রসারণ ও আধুনিকরণ, উৎপাদন বুনিয়াদ শক্তিশালী করা যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। তিনি আরও বলেন, "দেশের সংহতি রক্ষার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালান প্রয়োজন এবং দেশবাসীর সে জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

লেখা পাঠাতে অহমদাবাদ ভারতীয় [illegible]

এ-আই-সিসি ঃ

এ-আই-সিসির দিল্লী অধিবেশনে চীনের আক্রমণ সর্ব্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব পাশ হয়েছে। আর এক প্রস্তাবে রাষ্ট্রজোটের বাইরে থাকবার নীতি এবং সমাজতন্ত্রনীতি অনুসরণ করে স্বাধীনতা রক্ষার নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন "নিরপেক্ষতা বর্জ্জন মানে

শ্রীমতী চারুশীলা ধর

[illegible] স্বাধীনতা আংশিক ভাবে বিসর্জ্জন করা। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের মধ্যেও আমরা নিরপেক্ষতা বর্জ্জন করব না। একমাত্র নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়েই ভারত তার আর্থিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে"।

কঙ্গোতে রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর সেনানায়ক হিসাবে প্রশংসনীয়ভাবে সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্য ব্রিঃ নরোনহা ও লেঃ জেঃ প্রেমচাঁদকে প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা পদক দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব ঃ

অকালীদলের বিভিন্ন উপদলকে একীকরণের জন্য নূতন করে চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রকাশ, ঐ চেষ্টার পিছনে রয়েছেন পাতিয়ালার মহারাজা। অকালীদলের প্রধান দুটি উপদলের নেতা হচ্ছেন মাষ্টার তারা সিং ও সন্ত ফতে সিং। প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পথে অনেক অসুবিধা আছে যথা সন্ত ফতে সিং বিশ্বাস করেন হিন্দু-শিখ ঐক্য—যাতে মাষ্টার তারা সিংএর নাকি আর আস্থা নাই।

কাশ্মীর ঃ

রোটারী ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রচারিত এক মানচিত্রে শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকাকে পাকিস্তান এলাকা ভুক্ত দেখানো হয়েছে বলে ভারতীয় ক্লাবের অনেক শাখার প্রতিবাদ জানান হয়েছে। কাশ্মীর সরকার একটি পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করেছেন প্রদেশের বিভিন্ন শিল্পের-(যথা দেশলাই, ঔষধ, চামড়া) দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য।

রাজস্থান ঃ

রাজস্থানে কংগ্রেস শাসনে অন্যান্য দিকে উন্নতি হলেও দুইটি সমস্যার এতদিনে সমাধান হয়নি, যথা সশস্ত্র ডাকাতি ও চোরা কারবার। প্রদেশে ক্রমবর্দ্ধমান সমালোচনায় অবশেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমাথুর দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ন এবং একজন নূতন ডি-আই জি নিয়োগ করেন। তাঁর চেষ্টায় এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার হয়েছে। একটা চিঠির সূত্রধরে নিভুল ভাবে দেখা যাচ্ছে এ দলের

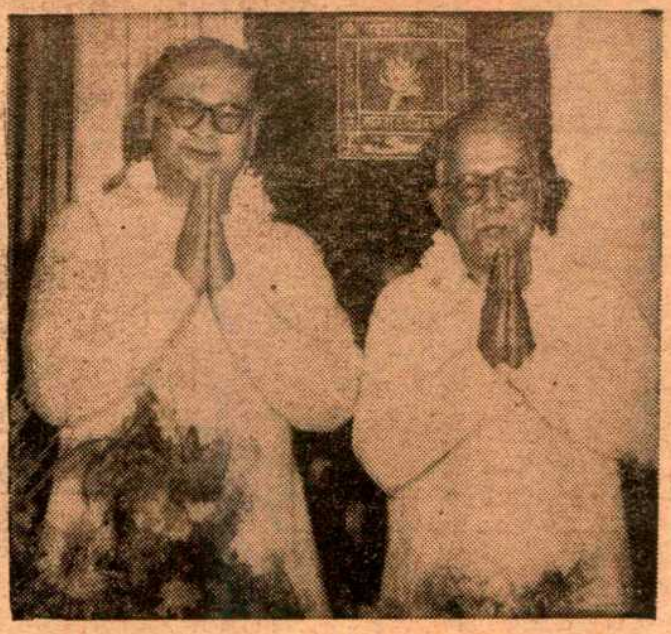

নব-নির্বাচিত মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি ও ডেপুটি মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত

পিছনে রয়েছেন রাজস্থানের এক প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবার—রামরতন কোচার ও তার ভাই। তাকে ও তার ভাইকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। রাজস্থানের অধিবাসীদের বিশ্বাস এবার অবস্থার উন্নতির আশু সম্ভাবনা।

মধ্য প্রদেশ :

মুখ্যমন্ত্রী মনডলয় ও শ্রম সচিব ড্রেভিড দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কারণ শ্রীড্রেভিডের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করান যায় কি না। এক বিবৃতিতে শ্রীড্রেভিড বলেছেন কি কি কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন, তা তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সবিস্তারে জানিয়েছেন। পদত্যাগ-পত্র তিনি প্রত্যাহার করবেন কি না এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি কংগ্রেস 'হাইকমাণ্ডের' নির্দ্দেশ মাথা পেতে নেবেন।

গুজরাট :

সংযুক্ত মহারাষ্ট্র দলের অনুকরণে গুজরাটে সকল বিরোধীদল নিয়ে একটি সংযুক্ত গুজরাট বলে দল গঠন করা যায় কি না সেজন্য শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক কথাবার্ত্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। গুজরাটের তিনটি প্রধান বিরোধী দল হচ্ছে স্বতন্ত্র, পি, এস, পি : ও জনতা পরিষদ।

মহারাষ্ট্র :

গত ৭ই এপ্রিল থেকে বোম্বাই-এ ভারতীয় সেরামিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনের উদ্বোধনে এক ভাষণে আন্তর্জ্জাতিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমনুভাই শা সেরামিক শিল্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে রপ্তানী বৃদ্ধি করে আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য দেশকে সম্প্রসারণ করা তাদের কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল পাবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি অনুরোধ করেন যে অসুবিধার জন্য যেন শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত না হয়।

আসাম :

আসামের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রেরণের সুবিধার জন্য বিভাগীয় পরিচালনায় যে যানবাহন সংস্থা গঠিত হয়েছিলো তাকে লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনাধীন।

নাগাভূমির চীফ কমিশনার শ্রীশীলু আও। পি, ডাব্লিউ ডি, সচিবকে নিয়ে দিল্লী গিয়েছেন। নাগাভূমি শাসন ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য নাগা জাতীয় পরিষদের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি আলাপ আলোচনা করবেন। বিদ্রোহী নাগারা না কি আত্মসমর্পণ করবার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজছে—এ বিষয়ে রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট্ দৌত্য করছেন। দিল্লীতে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীযুক্ত আও ঘোষণা করেছেন যে 'নাগারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শেষবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষা করবে।

উড়িষ্যা :

উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপট্টনায়ক শ্রীযুক্ত রাজাজীকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করায়, উড়িষ্যা বিধান সভায় তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ :

পি, এস, পি ও সোসালিষ্ট পার্টির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

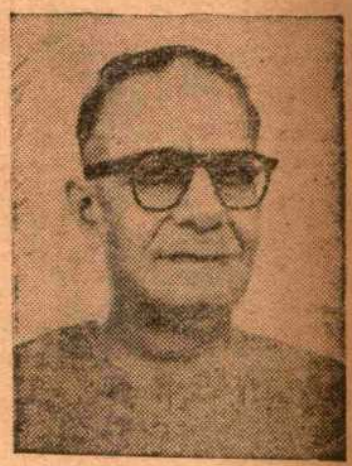

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

এ দু'দলকে সংযুক্ত রাখবার প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে। আসন্ন ফরাক্কা বাঁধ উপনির্ব্বাচনে উভয় দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বদ্ধপরিকর পি,এস,পি পার্টির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আগামী ৫ই মে থেকে অধিবেশন শুরু হবে।

এ সভার প্রধান কার্য্যসূচী হচ্ছে কি করে উভয় দলের মধ্যে স্থায়ী মিল ঘটান যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

বিধান সভার পাঁচটি উপনির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পাঁচটি আসনেই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছে। নরেশনাথ মুখার্জ্জি (চৌরঙ্গী) শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায় (বড়জোড়া), শ্রীরাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ (পুরুলিয়া) শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক (বর্দ্ধমান) শ্রীযুক্তা চারুশীলা ধর (বনগাঁ) বড়জোড়া কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে এ আসনটিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ৮,০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলো।

তৈল শোধনাগার স্থাননির্ব্বাচক কমিটি কলকাতায় শোধনাগার স্থাপনের সুপারিশ করা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে কলকাতার দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। এখন প্রকাশ পেয়েছে যে তার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

আসানসোলকে পৃথক জিলা করার দাবী রূপায়ণ জরুরী অবস্থার জন্য আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় গত সোমবার কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্তকে যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। অভিনন্দনের উত্তরে মেয়র সদস্যদের কাছে আবেদন জানান তারা যেন সব সময়ই সভার মর্য্যাদা বজায় রেখে চলেন।

কলকাতায় সাংবাদিকদের দেখানোর জন্যে বিশ্ববিজ্ঞানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির নাম ছিল 'বিশ্ববিজ্ঞান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র'। প্রায় ষাটজন সাংবাদিক দর্শকের চোখ দিয়ে প্রদর্শনীটি উপভোগ করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কলকাতার খিয়াগারাজা হলে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন 'ইউ,এস,আই,এস'এর প্রেস অফিসার শ্রীরাল্‌ফ্ সেগম্যান।

এই প্রদর্শনী সাধারণ দর্শকদের জন্যেও ২রা মার্চ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত রবিবার ছাড়া প্রত্যহ দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা রাখা হোত।

প্রদর্শনীতে দেখানো হোল, বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারে মার্কিণী বিজ্ঞানীর অবদান। একে ভাগ করা হয়েছিলো—'সৌরজগৎ', 'শক্তি', 'যোগাযোগ', 'প্রাণ' এবং 'বস্তু'—এই পাঁচটি ভাগে।

সমস্ত প্রদর্শনীতে গাইড হিসাবে কাজ করেছেন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও গবেষণা মন্দিরগুলির স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ত্রিশজন ছাত্রছাত্রী।

* * * *

১৩৬৯ সালে সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কয়েকটি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। 'প্রফুল্লকুমার' ও 'সুরেশচন্দ্র' পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীরমাপদ চৌধুরী ও শ্রীকালিদাস রায়। মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীবুদ্ধদেব বোস, মৌচাক ও উল্টোরথ প্রদত্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও উমা দেবী।

বুধবার সায়াহ্নে মহাজাতি সদনে আয়োজিত এক সভায় বাংলার মুখ্য-মন্ত্রীর ৬৫তম জন্মদিবসে স্বাস্থ্য ও শতায় কামনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত মল্লিক এ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

দক্ষিণ কলকাতায় খিয়াগারাজা হলে 'বিশ্ববিজ্ঞান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র' শীর্ষক প্রদর্শনীতে মার্কিণ মহাকাশচারীদের তোলা চাঁদের প্রথম ছবি দেখানো হচ্ছে।

এখন দুপুর। পশ্চিম বার্লিনের সিটি হলের টাওয়ারে বাজছে 'স্বাধীনতার ঘণ্টা'। রোজ বাজে। মধ্যাহ্নে। প্রত্যহ সে এই বার্তাটি পৌঁছে দেয় সকলের কাছে, "ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে স্বাধীনতার নবজন্ম হোক্।" পশ্চিম বার্লিনের বিধ্বস্ত রূপ বদলেছে। ভাবতে পারা যায় না কি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ও প্রচণ্ড মনোবলের পরিচয় দিয়ে চলেছে বার্লিনবাসীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। শতকরা ৮৫ ভাগ শিল্পক্রম সোভিয়েট অধিকৃত কর্মকর্তাগণের নির্দেশে অচল। সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ করেছে সোভিয়েট আদেশ। লেনদেন ছাড়া সমস্ত হিসেবনিকেশও স্তব্ধ। সেই সমস্ত হারিয়ে ফেলা বার্লিনের পুনর্জন্মের জন্য এগিয়ে এলেন ফেডারেল রিপাবলিক; উদার হস্ত প্রসারিত করলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের বিভীষিকা ও সোভিয়েট প্রতিবন্ধকতায় ১৯৫০ সনে বেকার সংখ্যা ভয়াবহ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। বার্লিনের সেই প্রচণ্ড দুঃসময়ে, তার সামগ্রিক ত্রাণকল্পে কঠোর সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন চ্যান্সেলর এ্যডুনেয়ার। বার্লিনকে আবার গড়তে হবে শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা সব কিছু। এই সুদৃঢ় প্রত্যয় তখন দৃঢ়বদ্ধ হল, রক্তপাত ছাড়াও যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। ১৯৫০ সনে চ্যান্সেলর এ্যডুনেয়ার ও ভূতপূর্ব মার্কিণ মিলিটারী গভর্ণর জেনারেল ক্লে বার্লিনের সিটি হলে এই 'ফ্রিডম বেল' স্থাপন করলেন। সেই থেকে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে সে বাজে। এই 'স্বাধীনতার ঘণ্টার সংলগ্ন ১৭ মিলিয়ন আমেরিকানের সই সমন্বিত Crusade for Freedom'এর অঙ্গীকারপত্র আজও অম্লান। তের বছর হল এ ঘণ্টা বেজে চলেছে। এ্যডুনেয়ার আজও চান্সেলর। কিন্তু এবার বোধ হয় তাঁর দিন ফুরালো। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এরহার্ড-এর সঙ্গে তাঁর বর্তমান মত বিরোধের কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হয়নি। নতুন চ্যান্সেলর অনুসন্ধানে ডাঃ ভন ব্রেণটানো সময় নিয়েছেন। এই সময় নেওয়াকে আবার অনেকে সমালোচনা করছেন। এতে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে. সুনামের হানি হচ্ছে। পশ্চিম

পশ্চিম বার্লিনের বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনতা ঘণ্টার নীচে সুপরিচিত সোনেবার্গ কয়েরের বালকগণ

জার্মাণীর অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুটার আলগামাইনে এ সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে যে ডাঃ ব্রেণটানো ও তার সি, ডি, ইউ—সি, এস, ইউ-এর পার্লামেণ্টারী পার্টিকে অতি অবশ্যই সমগ্র জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক প্রয়োজন ও বাস্তবানুগ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। চ্যান্সেলর কর্তৃক ভেটো প্রয়োগ সমর্থিত হয়নি এদের কাছে। চান্সেলর এ্যডুনেয়ার কি সত্যসত্যিই পদত্যাগ করবেন?—এ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে এদেশে।

* * *

আশী বছর বয়স পূর্ণ হল, কার্ল ইয়েসপারের। বর্তমান জার্মাণ ভাবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। ১৮৮৩ সনে ওল্ডেনবার্গে জন্ম। জীবনের কর্ম শুরু করলেন চিকিৎসা ক্ষেত্রের গবেষণায় ও সাইকিয়াট্রিষ্ট হিসেবে। ১৯২১ সনে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করলেন। সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। যদিও তিনি নাৎসী আমলে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর বই The question of guilt—(১৯৪৬) এ তিনি সমগ্র জার্মাণবাসীর সামগ্রিক দোষ অস্বীকার করেছেন। একদিন তিনি বলেছেন, "পৃথিবীকে কেবলমাত্র তখনই বাঁচানো যেতে পারে যদি ব্যক্তি নিজে নিজেকে নিজের মধ্যে দমন করতে পারে।" প্রতি ব্যক্তিই নূতন পৃথিবী গঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান অস্তিত্ববাদের পথ সুগম করবার ক্ষেত্র ছাড়াও তাঁর চিন্তাশীল মননপ্রবণতা ধরা পড়েছে। তাঁর অতিশয় সুনিশ্চিত ও মূল্যবান

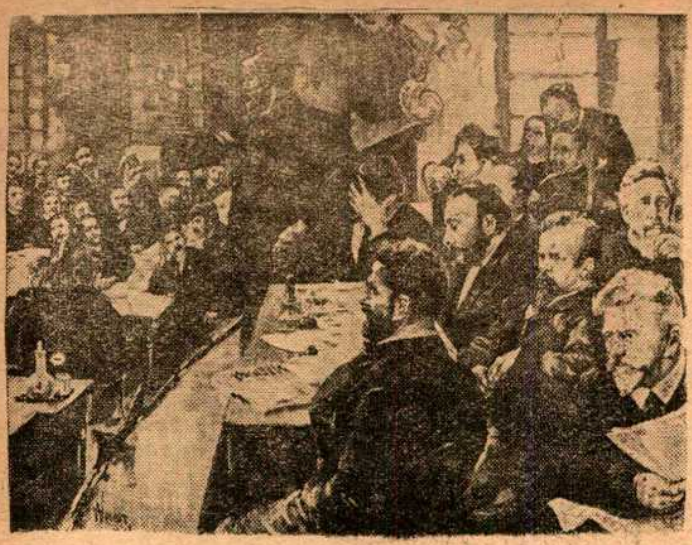

'জার্মান ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন' ও 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কাস পার্টি'—এই দুই দল মিলিত হবার পর যে "জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" গঠিত হয়—তার শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হতে চলেছে ১৯৬৩-তে। এই পার্টি যেমন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; তেমনি পশ্চিম জার্মাণীর উন্নতি সাধনে প্রভূত সাহায্য করেছে।

মতবাদ সমন্বিত সাম্প্রতিককালের দুরূহ সমস্যাকীর্ণ "The Atom Bomb and the Future of Mankind প্রবন্ধে। এ যুগের স্পষ্টতা ও ক্ষমতা প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষে যে মূল্যায়ন কাল ইয়েসপারের দার্শনিকতায় পরিবেশিত তা আধুনিক মানবের "বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের মধ্যে চিহ্নিত কার্ল ইয়েসপারের চিন্তাধারা ফ্রান্স তো বটেই, এ্যাংলো-আমেরিকার বহুক্ষেত্রেও আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে সুপ্রকট।

*

হামবুর্গে যদি এখন কেউ আসে, যদি সে তার ভূ-গর্ভস্থ রেলপথে ভ্রমণ করে, তবে সে নয়নাভিরাম কিছু দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাবে বই কি, হামবুর্গের নগর-কর্তৃপক্ষ মাটির নীচের পঞ্চান্নটি রেল-ষ্টেশনকে সৌন্দর্যময় করে তুলতে বর্তমানে ব্যস্ত। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হবার জন্য আয়োজিত এই ভাস্কর্যে ও কারুকার্যে এবং সমতল পৃষ্ঠ থেকে ধাতু নির্মিত মূর্তির উন্নত অংশের ভেতর জীবন দর্শনের প্রতীকীকরণ লক্ষ্যণীয়। হামবুর্গের ভূ-গর্ভস্থ প্রধান রেলষ্টেশনের এই ধরণের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিতে মানবজাতির জলের ওপর নির্ভরতার প্রতীকীকরণ দেখা গেল। কর্মক্লান্ত মানুষের চোখের সম্মুখে এর সৌন্দর্যের আবেদন নিমেষের জন্য ক্লান্তিহরণ করবে, তার কর্মভার জর্জরিত চিত্তে মুহূর্তের জন্য সৌন্দর্যানুভূতির আবেগ কম্পন জাগিয়ে তুলবে নগরকর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টাকে হামবুর্গবাসী সানন্দে গ্রহণ করেছে। ভ্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আর্টের এই আনন্দটুকু পাওয়া, যাকে আমরা রথ দেখা আর কলা বেচার সঙ্গে একাসনে বসাতে পারি তা সত্যই প্রশংসনীয়।

জার্মাণ প্রজাতন্ত্রের আর একটি চমৎকার উদ্যমের উল্লেখ করা যাক। সে উদ্যম মাছের কথা মাছকে শুনিয়ে মাছ ধরা। শুনতে আশ্চর্য লাগে। মানুষ মাছের কথা, ধরবে কেমন করে, আর তা মাছকে শোনাবেই বা কেমন করে? হামবুর্গ ইনস্টিটিউটের ডাঃ ফ্রেটাগ বিগত দু'বছর ধরে গবেষণা করছেন সমুদ্রজলতলের নানারকমের

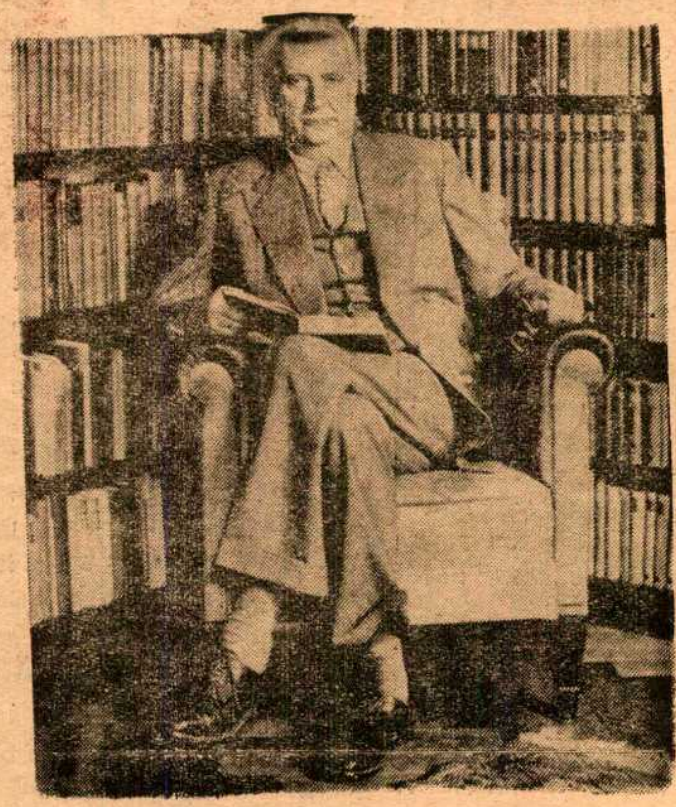

জার্মাণ দার্শনিক কার্ল ইয়েসপার

শব্দকে কেন্দ্র করে। উপকূলাঘাতের, তরঙ্গ-সংঘর্ষের, পার্বত্য-খাঁড়ির, পাহাড়ের আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের প্রতিধ্বনি প্রভৃতি অজস্র ধ্বনিতরঙ্গ তিনি ধরে রেখেছেন টেপ রেকর্ডে। এমন কি জার্মাণ সমুদ্র উপকূলের নানারকম জলজ প্রাণীর শব্দও তিনি রেকর্ড করেছেন। এই জলের তলের ভাষা আবার অন্য দেশের জলের তলের ভাষা থেকে পৃথক; জলজ প্রাণীদের, যার মধ্যে মাছ একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে, তাদের এক একটি বিশেষ ধরনের অ্যাকুয়েরামের ভেতর রেখে পরীক্ষার পর দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ মাছের সাক্ষাৎ পেলেই তারা ধ্বনি তোলে। নচেৎ তাদের কোন শব্দ নেই। এবছর জলের তলে লাউড-স্পীকার সহযোগে মাছেদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। মাছেদের ভাষায় যে ভাষা টেপ রেকর্ড করা হয়েছে এবং নানা পরীক্ষার পর যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, মাছেরা তাতে সাড়া দিয়ে জলের ভেতর এসে পড়বে। এ পরীক্ষা সফলতা অর্জন করলে অন্যান্য দেশেও এই প্রক্রিয়ার উপকৃত হতে পারবে।

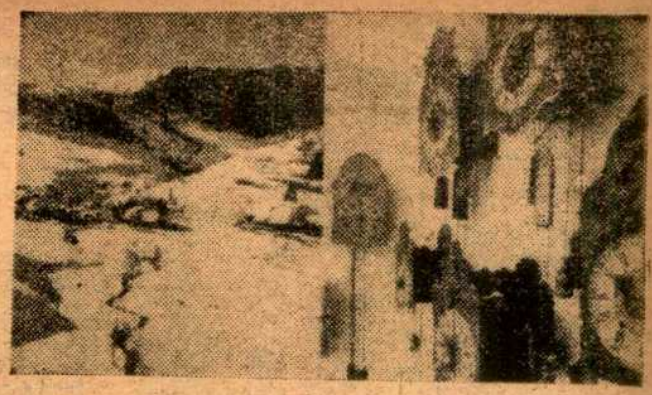

পশ্চিম জার্মাণীর 'নীল অরণ্য' (ব্ল্যাক ফরেষ্ট)। বিদেশী পর্যটকদের কাছে এ এক অতি লোভনীয় স্থান। এই স্থান ঘড়ির কাঠামো তৈরীর সূক্ষ্ম শিল্পে যে প্রভূত উন্নত, তা ঘড়িগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই প্রমাণিত হবে।

ওপরে যে চতুষ্পদ সারমেয় পুলিশগুলিকে দেখা যাচ্ছে, তাদের অ মেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মোয়েন্দা দপ্তরে পাঠাবার আগে রোগ প্রতিরোধক ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে।

লণ্ডন থেকে

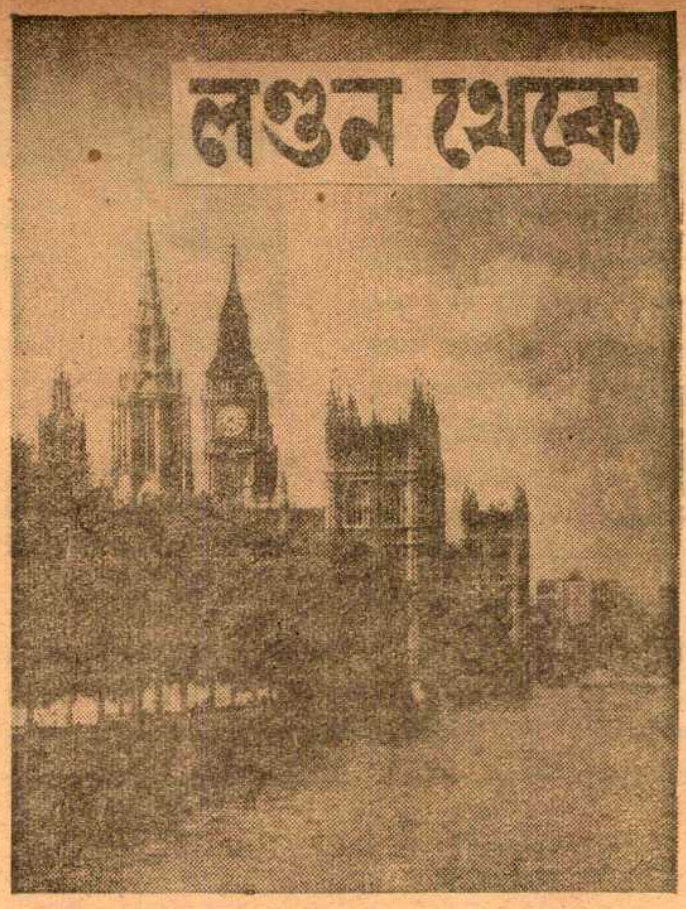

পার্লামেন্ট ভবন

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

ভাবশেষে বসন্ত। কনজারভেটিভ পার্টী এই বসন্তকে স্বাগতম জানালেন গ্রেট ব্রিটেনের অর্দ্ধেক রেলওয়ে ষ্টেশন বন্ধ করে দিয়ে। তাছাড়া পার্লামেন্টের সামনে রোজ যে বিপুল বেকার সম্প্রদায় বোদ পোহানোর জন্যে আসে, তাদের নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথার শেষ নেই। Vassall Tribunalএর পর এদেশের দু'জন সাংবাদিক জেলে বেড়াতে গেছেন। হলফোর্ডের বিচারসভায় ফ্যাশন-প্যারেড এই নব বসন্তকে আরো রোমাঞ্চকর করে তুলছে। আমরা যে ক'জন নেটীভ এদেশে আছি তারা 'বসন্ত আগত দ্বারে' গানটা কোরাসে ধরতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। কেন না গত বছরের বসন্ত-প্রাদুর্ভাব হেতু হেনস্তার কথাটা এখনো স্মৃতিকোঠায় জ্বগজ্বল করছে।

বি-বি-সি টেলিভিশন সম্প্রতি পরপর দুই controversial অনুষ্ঠান প্রচার করার ফলে এদেশে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। প্রথম অনুষ্ঠানটি "প্যানোরামায়" মশিয়েঁ বিদোর ইন্টারভিউ। বলা বাহুল্য মশিয়েঁ বিদো একজন নামকরা অ্যান্টি দেগলিষ্ট এবং স্বদেশে তাঁর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারটি সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে নানা মতের ঝড় উঠেছে, তখন এই শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন বি-বি-সি টেলিভিশনের সম্মান বাড়িয়েছে। বি-বি-সির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমার্শিয়াল টেলিভিশনও ঐদিনে তলস্তয়ের "ওয়ার এ্যাণ্ড পীস" উপন্যাসটির নাট্যরূপ প্রদর্শন করেন। টেলিভিশনের কথায় মনে পড়ল ইরাকী বিপ্লবের সময় জেনারেল সালান ও তাঁর সঙ্গীদের "execution" ইরাকী টেলিভিশনে দেখানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এতো বীভৎস ও কদর্য্য যে, এদেশে তার প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বর্ণবৈষম্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত "Beyond the Blues" কবিতা সঙ্কলনটির নাম। নিগ্রো-কবিদের প্রথম কবিতা সঙ্কলনটির সম্পাদিকা Dr. Rosey. E. Pool সঙ্কলনটিতে ভালোমন্দ মিশিয়ে প্রায় ছাপ্পান্ন জন কবির রচনা স্থান পেয়েছে। সাধারণতঃ "প্রতিবাদ-কবি" বলে যাঁদের লেবেল মারা হয় তাঁদের এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত বই পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছে। একজন অ-নিগ্রো কবির কাছে যে ভাষা ও ভাব অকল্পনীয়, তারই সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে 'Beyond the Blues' বইটিতে। উদ্ধৃতি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে।

"Didn't want me to eat
with you,
scared I might sit with you,
but with that Atom Bomb, Joe.
looks like I'm Gonna die
with you !
Don't seem right, does it Joe ?

Ought to have a seperate bomb for coloured !" (Ray Durren) ১৮৩৬র ১লা জানুয়ারী, Emancipation from Slavary যখন ঘোষিত হয়েছিল, তখন প্রথম মুক্ত নিগ্রো কবি গান গেয়ে উঠেছিলেন—"Slavary chain done broke at last, Gonna praise God till I die"; তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

এতো তর্ক-বিতর্কের ইন্ধন যোগায় যে, শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেন্টেও এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মশিয়েঁ বিদো বর্ত্তমানে পর্তুগালে নজরবন্দী হয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি একটি মার্কিন ডকুমেন্টারী "Sabotage in South Africa"। ইতিমধ্যেই এই ছবিটি সাউথ-আফ্রিকাতে নিষিদ্ধ এবং সরকার কর্ত্তৃক তীব্র ভাষায় নিন্দিত। আমরা এই ডকুমেন্টারীর আন-কাট ভার্সান দেখার সুযোগ পেলাম এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। যে ক'জন 'সুস্থ' সাউথ-আফ্রিকান (সাদা কালো মিশিয়ে) এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আজ তাঁরা প্রায় সকলেই নজরবন্দী কিংবা নির্ব্বাসিত। ডকুমেন্টারীটি কেবল মাত্র তীব্র সমালোচনাই নয়, এক নিপুণ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর। এদেশে যখন টেলিভিশনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে

নিগ্রোদের অসাধারণ আত্মত্যাগে, চার হাজার মৃত সৈনিকদের স্মৃতি খোদাই করা হলো :

These truely are the Brave,
These men who cast aside
old memories, to walk the
blood-stained pave.
of sacrifice....
....to suffer and to die
for Freedom –when their own is
yet denied !"

আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাদেরই একজনের আর্তনাদ শুনুন—

"Count down to zero,
end this tortured hour
And slaughter all the
"images of God" ;
Spare nothing living,
murder every flower—
So demonise the air,
pervert the sod" (R. L. Browne)

এই সংগ্রামের শেষ হয় তো একদিন হবে (সেদিন হয় তো খুব দূরেও নয়), কিন্তু ততোদিন আমরা, যারা কালো কিম্বা ব্রাউন, আশ্বাস খুঁজবো এই "প্রতিবাদ সাহিত্যিকদের" লেখায় মডার্ণ জ্যাজে কিংবা নিগ্রো আধ্যাত্মিক সংগীতে।

এ যুগের "সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস" Giuseppe di Lampedusa'র "The Leopard" সম্প্রতি পেপারব্যাকে প্রকাশিত হয়েছে। এই অনন্যসাধারণ উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রখ্যাত ইতালীয়ান পরিচালক ভিসকান্তি।

লণ্ডনে উপস্থিত "কামসূত্রে"র পরপর দুটি অনুবাদ (একটি ভারতীয় সংস্করণ ও অন্যটি Allen & Urwin) এখানে অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। নানা পত্রিকায় কার্টুন পর্যন্ত বেরিয়েছে।

ভারতীয় অনুবাদটির দাম প্রায় সাত পাউণ্ড (আমাদের হিসেবে ১০০ টাকা)—কালোবাজারে কতো সঠিক জানা নেই। এইখানে বলা দরকার যে, "লেডী চ্যাটার্লির লাভার" প্রকাশিত হবার পরই ফেব্রুয়ারীর 'বেষ্ট সেলার' "কামসূত্রের" আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে। আর একটি সুসংবাদ হেনরী মিলারের "ট্রপিক অফ ক্যান্সার" অবশেষে এদেশে ছাড়পত্র পেয়েছে।

হিউমার জিনিষটা জীবনের নানা মোড়ে নানা রঙে এসে হাজির হয়। আমরাও সেই মতে লণ্ডন এয়ারপোর্টে চীনা-মন্ত্রীর, সকলের সঙ্গে বাদবিচার না করে করমর্দন করার জুলুমকেও চৈনিক রসিকতা বলেই মেনে নিয়েছি। তবে এই হিউমারই মোক্ষম ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে ২২শে মার্চ আমেরিকার Sing Sing কারাগারে। সেখানে খুনী Wilfred Wood-এর জীবনাবসান ঘটে ইলেকট্রিক চেয়ারে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত কারাগাররক্ষীদের উদ্দেশ্যে Wood বললেন : "Gents, this is an education project. You are about to witness the damaging effect electricity has on wood. Enjoy yourselves."

** খবরে প্রকাশ মিশরে বিদো সাউথ আমেরিকাতে Political asylum পে...

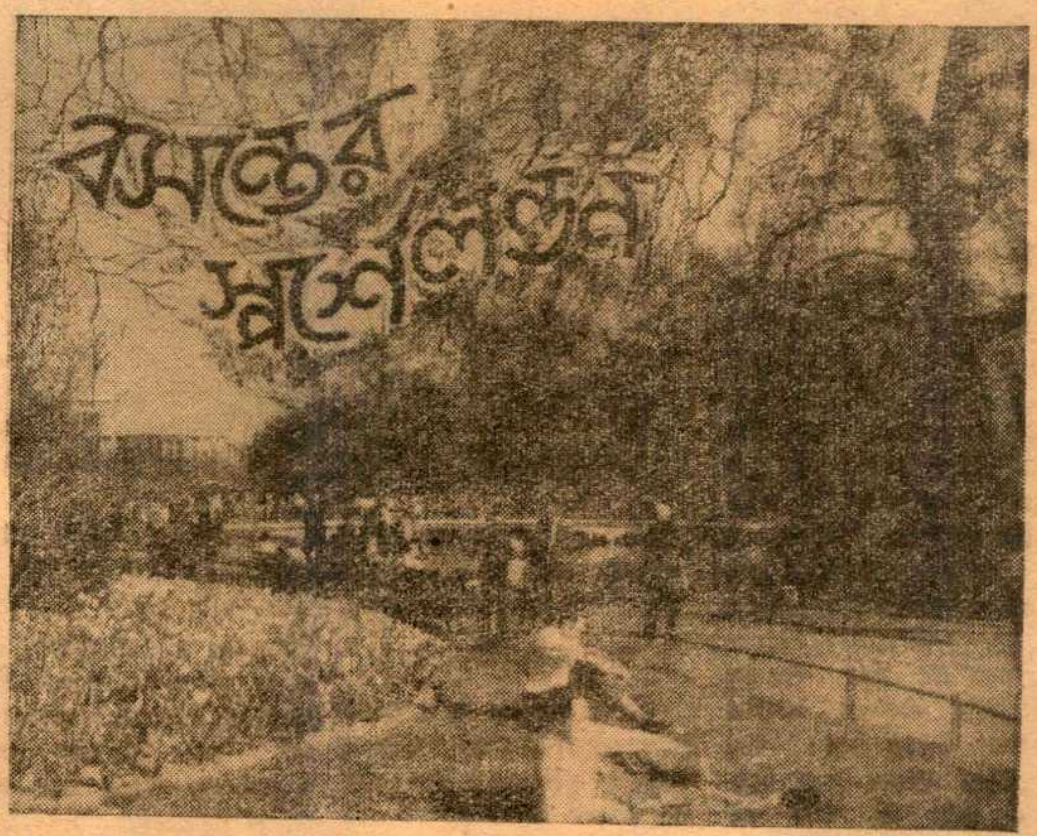

সেন্ট জেমস পার্ক

রঙ্গজগৎ

তিতাস একটি নদীর নাম

বিদেশের লিটল থিয়েটার আন্দোলনের যে ঐতিহ্যকে স্মরণ করে উৎপল দত্ত তাঁর দলের নামকরণ করেন তার লক্ষণ হলো কেবলমাত্র ছোট ছোট প্রযোজনার মারফতই নাট্য সংস্কৃতির চর্চা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বৃহদাকারের প্রযোজনায় অনেক সময়ে মনোরঞ্জনের তাগিদে শিল্পের সর্ত পালন অসম্ভব হয়ে ওঠে। অর্থাগমের দিকে জোর দেওয়ায় নাটক ও নাট্যশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই লিটল থিয়েটারের আন্দোলন।

এঁদের চলতি নাটক "তিতাস একটি নদীর নাম"-এ দর্শকরা প্রযোজনার বিভিন্ন অভিনব কৌশল লক্ষ্য করবেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত মালো জীবন সম্পর্কিত উপন্যাসের এই নাট্যরূপে উৎপল দত্ত এক বলিষ্ঠ গোষ্ঠীজীবন উপস্থাপনার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রয়োজনে মঞ্চ প্রসারিত হয়ে দর্শকদের মধ্যে এসে পড়েছে। অভিনেতার প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ হয়েছে দর্শকদের মধ্য দিয়ে। আলোকসম্পাত হচ্ছে প্রেক্ষাঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে। আর এঁদের বিশাল ভূমিকা-লিপির নানা অভিনেতারা সংগ্রামশীল মালো জীবনের প্রাণময় প্যাটার্ণ তৈরীর চেষ্টা করেছেন দ্রুত গমন নির্গমনে ও উচ্চৈঃস্বরের কথনে ও গানে। নির্মল চৌধুরীর গানগুলি প্রীতিদায়ক। কিন্তু প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতা এ জাতীয় নাটকে বেমানান লাগে।

"অঙ্গার"-এর মতন "তিতাস একটি নদীর নাম"-এর প্রাথমিক অভিঘাতও বিস্মিত করে। যাঁরা "অঙ্গার"-এর অভিনয় ভণ্ডুল করেছিলেন জানি না তাঁরা এই নাটকটি সম্বন্ধে কি ভাবেন। কিন্তু অন্য এক বিচারে দু'টি নাটকের গুণগত পার্থক্য খুব নিকট দৃশ্য পড়ে। সামগ্রিক বিচারে "অঙ্গার" এর একটা অখণ্ডতা একটা সংহতি ছিলো, যে সংহতি সেই বহুনিন্দিত প্রাবনের শেষ দৃশ্যেও শিথিল নয়। তুলনায় "তিতাস একটি নদীর নাম" অনেকাংশে অসংবদ্ধ। আর অভিনেতাদের প্রায় সকলেরই (দু'এক জন বাদে) উদ্দীপ্ত অভিনয় সত্ত্বেও মনে হয় যে শ্রেণীসংঘর্ষ ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রযোজকের আইডিয়াগুলি নাটকের মধ্যে ঠিক জীবন্ত হয়ে উঠলো না। আর ট্রাজিক শেষ দৃশ্যে কিশোরের মৃত্যুর সময়ে মনে হয় গোষ্ঠীজীবনের পটভূমিকাটি হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠীজীবনের সমন্বয়ে নাটকীয় অখণ্ডতা ঠিক মতো যেন রচিত হয় নি এই নাটকে।

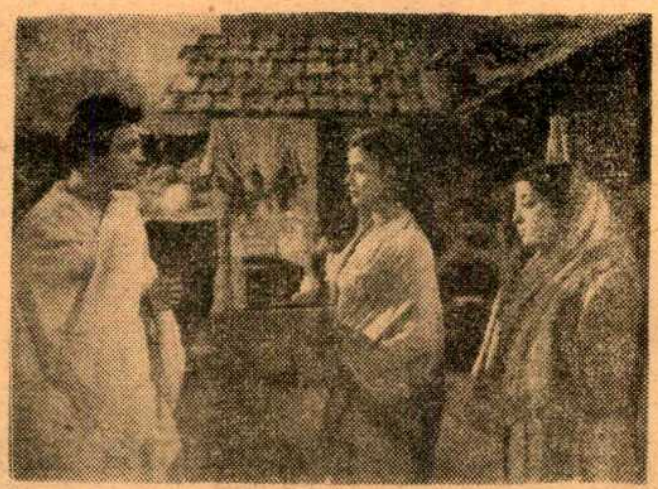

শ্রীদীপচাঁদ কাংকারিয়া নিবেদিত পারশমল দীপচাঁদ প্রযোজিত [illegible]রের 'উত্তরায়ণ' চিত্রে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী
পরিচালনা—অগ্রদূত, সংগীত—রবীন চ্যাটার্জী

দ্বীপের নাম টিয়া রঙ

দ্বীপের নাম টিয়া রঙ। লেখক রমাপদ চৌধুরী এই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করেছিলেন সাহিত্যের তাগিদে। ছবি যাঁরা করেছেন তাঁদের পরিচয় সেই উপন্যাসকে চিত্রে রূপদান করে কারা যে এমন অপরূপ ছবি সৃষ্টি করেছেন ছাপাতে দেওয়া হয় নি। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ক'রে ছবির আগে পরিচয় লিপি কেন যে সৃষ্টিকর্তারা দেন নি, তা বলাই বাহুল্য।

ছবির পরিচয় দেওয়ার আগে দ্বীপটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ছবির আগে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে (মনে হল বিকাশ রায়ের।) ঘোষিত হল যে দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠে। ছবি দেখে মনে হল জায়গাটা বোধ হয় ভারতের ইতিহাসে কেরালা নামে পরিচিত।

দ্বীপের যাঁরা বাসিন্দা তাদের মধ্যে সন্ধ্যারায় ও নিরঞ্জন বহুল পরিচিত। ওখানে মেয়েদের পোষাক নানান রকমের। কেউ কেউ অতি আধুনিক, মার্কিনী নমুনার হাইনেক ব্লাউস ও ওয়েষ্ট লাইন আঁকা স্কার্ট পরেন—যেমন সন্ধ্যা রায়। যাঁরা ফিরেইন নন এবং ক্যামেরায় দেহ-রেখা লেখার সুযোগ পান না, তাঁরা সাঁওতালি মেয়েদের মতন আটসাঁট জামা পরেন—যেমন আকালী। অন্যান্যরা পরেন যখন যা পান এবং কেউ কেউ যা ইচ্ছে। ছেলেদের পোষাক—খালি গা এবং ধুতি।

কোন এক জায়গায় ডায়ালগে বলা হয়েছে ওখানকার বাসিন্দারা পর্তুগীজ জাতীয়। ছেলেদের পোষাক দেখলে মনে হয় আমাদের দেশের সাঁওতালিরাও অবশ্যই তাই—কারণ পোষাক এবং মাথায় পালক গোঁজার পদ্ধতি একই।

চিত্রযুগের দ্বীপের নাম টিয়া রঙ চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও দীপা চ্যা.চা.জ.

টিয়া রঙ দ্বীপের ভাষায় কলকাতিয়া বাংলার প্রাধান্য। মাঝে মাঝে পূর্ব বঙ্গের কথাও কিছু আছে এবং সাঁওতাল চংও দেখা যায়। একটি বাচ্চা ছেলের কথা শুনে মনে হল মালায়্যালি ভাষারও চল ও দেশে আছে।

এই বিচিত্র পোষাক ও ভাষা ছাড়া ঐ দ্বীপে আর যা আছে তা ভালোবাসা। ওখানে সবাই সবাইকে ভালোবাসে। টিয়া রঙ দ্বীপের নায়িকা টিয়া (সন্ধ্যা রায়) সকাল সন্ধ্যা স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য সমুদ্র কিনারে অপেক্ষা করলেও সে নায়ককে (নিরঞ্জন) ভালোবাসে। আকাশী, টিয়ার সঙ্গিনী, সে গায়েনকে ভালোবাসে এবং টিয়ার স্বামী যখন ফিরে এল' তখন তাকে ভালোবাসলো। বলা বাহুল্য, ভালোবাসলেও, প্রকাশ ভঙ্গি প্রত্যেকেরই এক—আড়ষ্ট। কিছুটা আন্দাজে বুঝতে হয় এবং বাকিটা বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারা যায়।

ঐ দ্বীপের আরও একটি বৈশিষ্ট্য তাদের মৃত্যুর হার ও পদ্ধতি। দু' ঘণ্টায় পাঁচজন মরল'। প্রথম মরল' আকাশীর বাবা বন্দুকের গুলিতে। তারপর মরল' টিয়ার স্বামী—আকাশীর হাতে ছুরি খেয়ে! আকাশী মেয়েটার গায়ে কি জোর ভাবুন—নাচতে নাচতে পেটে ছুরি ছোঁয়ালো আর মাংসপেশীওয়ালা টিয়ার স্বামীর পতন ও মৃত্যু! তারপর মারা গেলেন কাঠ-কাট কোম্পানীর বড় সাহেব কাদার মধ্যে (ওটাকে বলা হয়েছে ফাঁদ!) পড়ে এবং মরবার আগে গুলি ক'রে মারলেন আকাশীকে। শেষ মৃত্যু টিয়ার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানের! সবাই যখন জাপানীর ভয়ে (জাপানীরা ব্রিটিশ ফাইটার প্লেনে এসেছিল) দ্বীপ ছেড়ে পালালো কোম্পানীর জাহাজে (জাহাজটা মনে হল ছাড়ল কলকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে!) তখন টিয়ার ছোট্ট ছেলেটাকে বেড়ালে খেয়ে গেল।

টিয়া রঙ-এর সঙ্গীত পদ্ধতি যে মার্কিনী ধরণের তা আগেই বলেছি। ওদের নাচের ধারা হল রক'ন রোল। টিয়ার স্বামী যে ধরণের নাচ দেখালো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সে মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে গিয়ে যখন নিরুদ্দিষ্ট হ'য়েছিল, তখন ভারতে এসে রাজকাপুরের "যিস্ দেশমে গঙ্গা বহতি হ্যয়"—ছবিখানা কম করে বার চারেক দেখেছিল।

সারা বিশ্বে যেমন দিনও রাত্রি পর পর আসে যায় ওখানে তা নয়। ওখানে ঘরের সামনে রাত, একটু স'রে গেলেই দিন—যেমন ধরুন টিয়া যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন দিন অথচ তারপরেই সটেই যখন মাতালবাবুর মুখোমুখি তখন রাত। আবার ধরুন, টিয়ার ঘরে বিদ্যুতের ঝলক অথচ যখন সমুদ্রের কিনারায় এলো আকাশীর সঙ্গে ওর স্বামীকে দেখতে তখন মেঘের গর্জন থাকলেও বিদ্যুৎ নেই। ছবি তুলেছেন অনিল গুপ্ত। এটা তাঁরই অনন্য কীর্তি।

সব শেষে ঘোষক মহাশয় তাঁর বক্তব্য বলতে বলতে কাঁদলেন। বলা বাহুল্য আমরা আগেই কেঁদেছি। পরিশেষে ব্যাপার দেখে টিয়ার বাকরোধ হল।

এবার ছবির কথা। ছবিটি একদম বাজে॥

খেলা ধুলা

ভারতীয় ক্রিকেটের অনির্ব্বাণ শিখা—পংকজ রায়

মুস্তাক আলি, ক্রিকেটের শের-ই-বঙ্গাল পংকজ রায় সম্পর্কে এক মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'Either he is No. One or no one in the team. ক্রিকেট সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শংকরী প্রসাদ বসু পংকজ রায় সম্পর্কে লিখেছেন, 'নির্ব্বাচকের বিরুদ্ধে ইতিহাস মন্থন করে যখন ভূরি ভূরি প্রথম ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে

পঙ্কজ রায়

ফেলেছি, তখন প্রাণে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল ডাকওয়ার্থের একটি বাণীতে। তিনি পংকজকে বসিয়ে না দিতে অনুরোধ করলেন, ছেলেটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় ভবিষ্যৎ আছে।' ক্রিকেটে বিগত যৌবন পংকজ রায় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিচারে যখন ভারতীয় দল থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ভারতীয় ক্রিকেট রস-পিপাসুদের কাছে আলোচ্য-বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু পংকজের ক্রিকেট জীবনে এ ঘটনায় কোনও বৈচিত্র্য নেই। কারণ সূচনায়, ব্যর্থতার গ্লানিতে যখন তিনি পরিপূর্ণ করেছিলেন ক্রিকেটের স্কোর-বোর্ড, তখনও আমাদের অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন বিজয় মার্চ্চেন্ট। তিনি মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ব্যর্থতা সত্ত্বেও পংকজ রায়কে দলভুক্ত করে রাখবার সার্থকতা, এই যোগ্য ওপেনিং খেলোয়াড়টি উপযুক্তভাবে প্রমাণ করেছেন।'

এবারে কিন্তু বিজয় মার্চ্চেন্ট বা মুস্তাক আলি নয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে যে চারজন প্রখ্যাতনামা ফাষ্ট বোলার ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা একবাক্যে পংকজ রায়ের কথা উল্লেখ কোরে বলেছেন,—রায় ওঁদের চার-জনের বিরুদ্ধে নতুন বলে যেমন খেলেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি। তাঁদের মতে, পংকজ রায়ই এখন নতুন ফাষ্ট বলের বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান। পংকজ রায়ের মত খেলোয়াড়কে গত বছর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় দলভুক্ত করা হয় নি বলে তাঁরা বিস্ময়ও প্রকাশ কোরেছেন।

এ মন্তব্যে হয় তো বা কারও একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু সব সংশয়ের নিরসন কোরেছেন পংকজ রায় স্বয়ং, সদ্য সমাপ্ত জে ডি ইরাণী ট্রফির খেলায় তাঁর অধিনায়কোচিত অনবদ্য ভূমিকায়। বর্ণাঢ্য ট্রফি বিজয়ী অমিত শক্তিশালী বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট বাছাই দলের অধিনায়ক হিসেবে তিনি যে ক্রীড়াশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন, তা সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলীদেরও চিন্তার ইন্ধন যোগাবে। অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৩৯৭ রাণের ভেতরে পংকজ রায়ের ব্যক্তিগত রাণ সংখ্যা ১৩২; এ ছাড়া মধু গুপ্তও ৯৩ রাণ করেন। বোম্বাই ৫ উইকেটে ৫৬৬ রাণে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা কোরলে, অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সংগৃহীত হয় ৬ উইকেটে ২১১ রাণ। বোম্বাইয়ের তরুণ খেলোয়াড় অধিকারীর ১৭৩, প্রবীণ উম্রীগড়ের অপরাজিত ১২৪ ও নাদকার্ণির ৯১ রাণ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ কোরে উম্রীগড়ের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এটি ই ছিল শেষ খেলা।

বোম্বাই, প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ইরাণী ট্রফি জয় কোরেছে। ১৯৬০ সালে জেড এ ইরাণী ট্রফির উদ্বোধনী বৎসরেও বোম্বাইদলই জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন কোরেছিল। পরবর্ত্তী দু'বছর অবশ্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নি।

কিন্তু যে প্রশ্নের অবতারণা কোরেছিলাম,—শের-ই-বঙ্গাল পংকজ রায় কি আবার টেষ্ট ক্রিকেটে ফিরে আসবেন? ইরাণী ট্রফির কথা বাদ দিলেও, এবারকার রণজি ট্রফির প্রতিটি খেলায় তাঁর অধিনায়কোচিত নৈপুণ্য ক্রিকেট রসিকদের মনে সেই প্রশ্নই জাগিয়ে তুলেছে। শংকরীপ্রসাদ বসুর ভাষায়ই বলি,—'সহজ প্রতিভায় পংকজ অসাধারণ নন। কিন্তু পরিশ্রমের পণ্যে কি ভাবে দারিদ্র্য নিবারণ করা যায়, পংকজ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্রিকেটের এমন সাধনা কোনো বাঙ্গালী কোরেছেন কিনা সন্দেহ।

পংকজের সাধনা সফল হোক, টেষ্ট ক্রিকেটে ফিরে এসে তিনি আবার ক্রিকেট-চাতকদের রসনা তৃপ্ত করুন, এই প্রার্থনাই করি।

উবের কাপে আমেরিকার সাফল্য

দলের সাফল্যের মূলে দলভুক্ত সকল খেলোয়াড়েরই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর থাকে। কিন্তু তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, একজন খেলোয়াড়, অবশিষ্ট সকলের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে যান, দলের সাফল্যের মূলে তাঁর ভূমিকাই থাকে

খেলাধুলায় রেলওয়ে দলের প্রাধান্য অনস্বীকার্য্য। রেলওয়ে দলের লক্ষ্মীকান্ত দাশ এবার ভারো[illegible] লনে অর্জ্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন

মুখ্য। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা,—উবের কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় বিজয়ী আমেরিকার দলনেত্রী জুডি হাসম্যান সেই কৃতিত্বের অধিকারিণী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উন্নততর ক্রীড়া-চাতুর্য্যই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাফল্যের পথ সুগম কোরে দেয় সুতরাং তিনি গর্ব্ববোধ কোরতে পারেন বৈ কি।

টেবিল টেনিসে এশিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য

ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হোয়েছে। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায়,

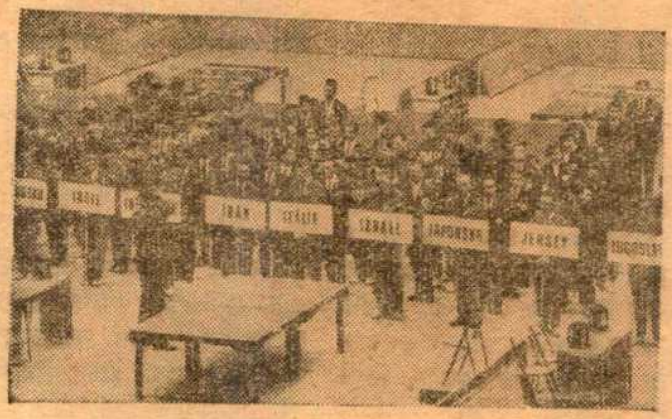

বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ সারিবদ্ধ অবস্থায়
বিভিন্ন রাষ্ট্রের দল (বাম হইতে দক্ষিণে) ইংল্যাণ্ড, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইস্রায়েল, ইতালী, জাপান, জার্সি ও যুগোস্লাভিয়া।

৩—১ গেমে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও, ইংলণ্ড শেষ পর্য্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে খেলায় সমতা আনে। কিন্তু শেষ ডাবলস খেলায়, আমেরিকার জুডি হাসম্যান ও কালিনি ষ্টার্কি ইংল্যাণ্ডের রোজার্স ও প্রিট্‌চার্ডকে পরাজিত কোরলে, উবের কাপ আমেরিকার করায়ত্তই থেকে যায়।

উবের কাপ প্রতিযোগিতা প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং সূচনা থেকেই (১৯৫৭) এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই তিনবারই জুডি হাসম্যান সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ভেক্‌সিন অয়েন্টমেণ্ট (তরল)
(রেজিষ্টার্ড)
টিকা, হাজা, ক্ষত, বসন্ত, ফোড়া সারিয়া যায় ও ত্বকের লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে। সর্বত্র পাওয়া যায়। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ, ডজনে ডাকমাশুল ফ্রি ৭·৫০
২/১এ ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯

এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, চীন ও জাপান সোয়েথলিং ও করবিলন কাপে বিজয়ীর সম্মান লাভ কোরে, বিশ্ব টেবিল টেনিসে পুনরায় এশিয়ার প্রাধান্যকে অম্লান রেখেছে। পুরুষদের দলগত সোয়েথলিং কাপে প্রজাতন্ত্রী চীনের এটা উপর্য্যুপরি দ্বিতীয় সাফল্য। ১৯৬১ সালে তারা সর্ব্বপ্রথম জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। করবিলন কাপ ১৯৫৯ সাল থেকে একনাগাড়ে জাপানের কাছেই রয়েছে।

চীন সোয়েথলিং কাপের ফাইন্যালে জাপানকে ৫—১ ম্যাচে আর করবিলন কাপে জাপান ৩—০ ম্যাচে রুমানিয়াকে পরাজিত কোরেছে। করবিলন কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় জাপানের মহিলা দল একটি ম্যাচেও পরাজয় বরণ না কোরে, বিশ্ব টেবিল টেনিসে এক অভিনব রেকর্ড স্থাপন কোরেছে।

একক প্রতিযোগিতায়, বিগত বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপের মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন জাপানের ইচিরো ওগিমুরা ও কিমিয়ো মাৎসুজাকি, কমুনিষ্ট চীনের প্রতিযোগীদের কাছে ইতিমধ্যেই পরাজয় বরণ কোরেছেন।

সোয়েথলিং কাপ প্রতিযোগিতায় ভারত পোলাণ্ড ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে পরাজিত কোরলেও ইংল্যাণ্ড, জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরাজয় বরণে বাধ্য হোয়েছে।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৯২৭ সালে। ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত একটানা ২৫ বছর পর্য্যন্ত বিশ্ব টেবিল টেনিসে ইউরোপের প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ১৯ তম বিশ্ব প্রতিযোগিতায়, সর্ব্ব প্রথম জাপান অংশ গ্রহণ কোরেই ইউরোপীয় প্রাধান্যকে খর্ব্ব কোরে দেয়। আজ চীন ও জাপান দু'য়ে মিলে টেবিল থেকে সমগ্র ইউরোপকে ব্যাত্যুত কোরেছে বললেও অত্যুক্তি হ'বে না। এশিয়ার এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হোক

খেলাধূলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি দেখা যাচ্ছে। এবার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতা এম. এল. মিত্র কাপের খেলায় যাদবপুরের জয়ন্ত নন্দী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এবং এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রও এই আদর্শেই যেন অনুপ্রাণিত হয়।

জাতীয় স্যুটিং প্রতিযোগিতা

নয়াদিল্লীতে সদ্য সমাপ্ত জাতীয় স্যুটিং প্রতিযোগিতায়, পশ্চিম বাংলার হরিচরণ শা ২২ বোর ফ্রি রাইফেল স্যুটিংয়ে, শীর্ষস্থান দখল করে উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করলেন। মহিলা প্রতিযোগিনী-দের ভেতরেও পশ্চিম বাংলার শ্রীমতী শোভিতা চ্যাটার্জ্জী ২২ বোর ফ্রি রাইফেল চালনায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। শা ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৪৯১ এবং শ্রীমতী চ্যাটার্জ্জী ৪৫০ পয়েন্টের ভেতরে ৩৮৪ পয়েন্ট লাভ করেছেন। এন সি সির জন্যে নির্দ্দিষ্ট ২২ বোর ফ্রি রাইফেলে সুনীল রোহাংগি প্রথম স্থান দখল করেছেন।

প্রতিযোগিতার শেষে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, দেশের যুবক-যুবতীদের অধিকসংখ্যায় বন্দুক চালনা শিক্ষা করবার উপদেশ দেন। তিনি স্যুটিংয়ের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

হকি লীগ

প্রথম ডিভিশন হকি লীগের চাম্পিয়নশীপ ত্রিবর্ণায়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলা বাকী থাকলেও অবনমনের প্রশ্ন মীমাংসিত হোয়ে গেছে। আদিবাসী এবং নবোন্নীত ক্যালকাটাকে আগামী বছর দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে। ক্যালকাটা একটি পয়েন্টও অর্জ্জন করে নি,—তাদের বিরুদ্ধে গোলের সংখ্যাও শতাধিক। তবুও খেলাকে খেলা হিসেবে নিয়ে শেষ পর্য্যন্তও তারা যে ভাবে উদ্দীপনা সহকারে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে, স্থানীয় যে কোনও দলের কাছেই সেটা অবশ্য অনুকরণীয়।

ভবানীপুর এবং আদিবাসীর লীগ তালিকায় অবস্থিতি ছিল সমান সমান, কিন্তু শেষ দু'টো খেলায় ভবানীপুরের নাটকীয় সাফল্য, অন্ততঃ এবারের মত তাদের অবনমনের হাত থেকে রেহাই দিয়েছে।

দ্বিতীয় ডিভিশনে, মেসার্স ও সেন্ট জেভিয়ার্স চ্যাম্পিয়নশীপ ও রাণার্স আপ লাভ করবার দরুণ, আগামী বছরে প্রথম ডিভিশনে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
গ্রন্থাবলী
মূল্য সাড়ে তিন টাকা
কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শর্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।
বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে
ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব
—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—
কালো ভ্রমর, করেঙ্গেয়া মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তকুণ্ডী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ধূম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।
বিখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী
১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মণিলাল গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲
রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস।
মূল্য ৩৷৷০।
প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্ব্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

পুরাতনে চিরনূতন মণিমঞ্জুষা
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী
প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত—হুতোম প্যাঁচার নক্সা। বাংলা উপন্যাসের প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—ভ্রান্তিবিলাস। একত্রে ২৲ টাকা মাত্র।
প্রখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা
প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
গ্রন্থাবলী
৬খানি সেরা বই—২৷৷০

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

BAWA

Glass E-Crockeries Private Ltd.

TEA	SET	Rs. 8/-
LEMON	SET	Rs. 4/-
FRUIT	SET	Rs. 2/-

63-H, Radha Bazar Street, Calcutta.

Phone : 22-1494

* CROCKERY
* CUTLERY
* GLASS WARE
* WINDOW GLASS
* PLY WOOD
* HARD BOARD
* SOFT BOARD

BAWA
POTTERIES' CROCKERY

AGENTS
BAWA
AGENCIES PRIVATE LTD.

BRANCHES ALL OVER INDIA

Regd. No. C 71
PHONE : { 34-3487 / 34-3488
SAPTAHIK BASUMATI
GRAM : "BASUMATI"
Thursday, 18th April, 1963
Price : 25 nP.

পি প্যাক

এল লেবেল

এম মার্কা

আপনার মাল পি প্যাক এল লেবেল এম মার্কা পদ্ধতিতে রক্ষা করুন

ক্ষতিগ্রস্ত বা হারানো মালের খেসারত মেটাতে প্রতি বছর রেলওয়ের কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। আপনার সামান্য যত্নে জাতীয় অর্থের এই বিরাট অপচয় প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হতে পারে।

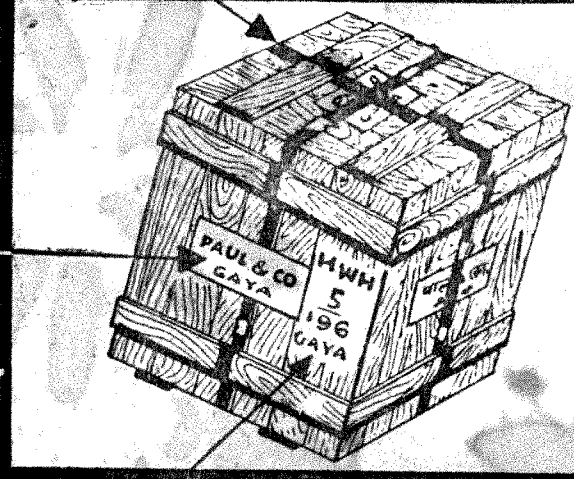

আপনার করণীয় :

- পাকাপোক্ত ভাবে পেরেক লাগান।
- বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে এমন জিনিস প্যাকিং এর কাজে ব্যবহার করুন।
- একটি বা দুটি পরিচয় পত্র এবং লেবেলের একটি নকল বাক্সের ভেতরে রাখুন।
- পুরনো মার্কা তুলে ফেলুন।
- পাকা কালিতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে ঠিকানা লিখুন।
- নির্ভুলভাবে মার্কা দিন।
- কি ধরনের মাল তা' লিখে দিন।

পূর্ব রেলওয়ে

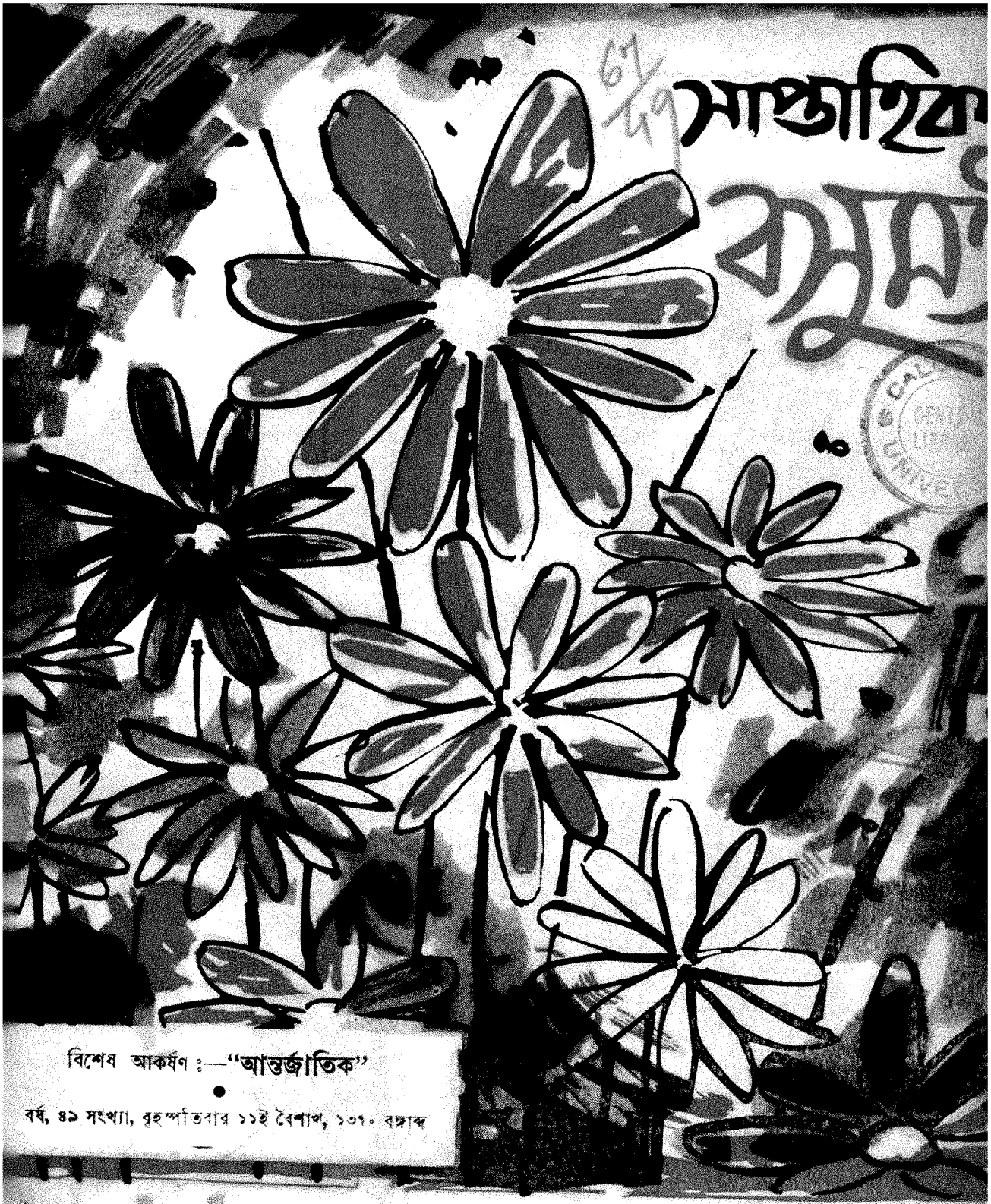

বিশেষ আকর্ষণ :—"আন্তর্জাতিক"

বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১১ই বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

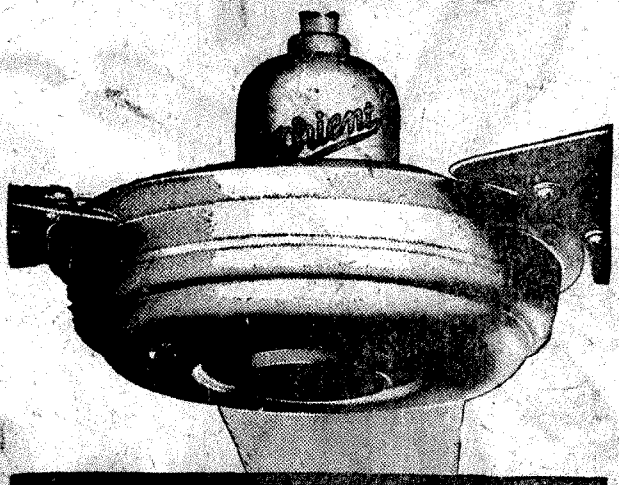

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH
BETTER ENGINEERING

Orient
FANS

Years ahead in looks and performance

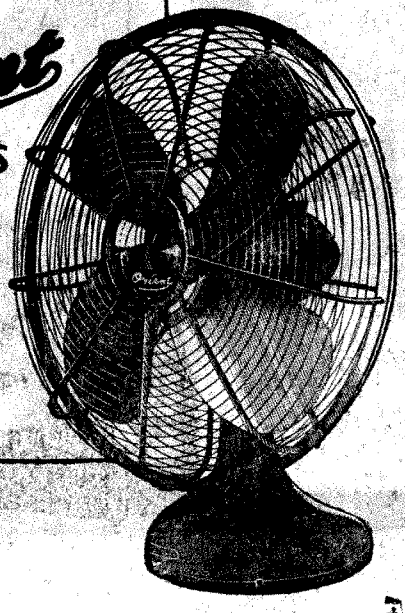

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-12

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩
আজকের মানুষ	...	৪
শহর কলকাতা	...	৫
দিল্লী থেকে	শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৭
কবিতা :—		
অন্য ভুবন	শ্রীসুনীল বসু	১২
দ্বিপ্রহরের 'লেক'	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১২

—উপন্যাস—

নির্মলকান্তি মজুমদার—
স্মৃতির দিগন্ত ৩·৫০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস
ঋণশোধ ৩·৫০ স্মৃতি ৩৲
রামপদ মুখোপাধ্যায়
মনকেতকী ৬৲ দুরন্তমন ৩৲
মাটির গন্ধ ৪৲
তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের
কুমারী ধরম ৫·৭৫
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালোচোখের তারা ৩·৫০
প্রমথনাথ বিশীর
যা হলেও হতে পারতো ৩·৫০
নীলবর্ণ শৃগাল ৪·০০
বাংলার কাব ৪·০০
প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস
লাল পাথর ৩৲ সমান্তরাল ৩·৫০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
জানালার ধারে ৪·০০
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫·৫০

গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪৲
সুবোধ চক্রবর্তী-একটি আশ্বাস ৬·৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায়-আনন্দ নট ৩৲
শক্তিপদ রাজগুরু—বনমাধবী ৩·৫০
সত্যব্রত মৈত্র—বনদুহিতা ২·৫০
আশাপূর্ণা দেবী—অতর্কান্ত ৩·৫০
ইন্দুমতী ভট্টা—আতপ্ত কাঞ্চন ৩৲
বেলা দেবী—জীবনতীর্থ ৩৲
অখিল নিয়োগী—বহুরূপী ৩৲
বিমল কর—দিবারাত্রি ৩৲

—নাটক—

স্বামী বিবেকানন্দ (অভিযাত্রী) ২·৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) ২·০০
লক্ষহীরা (মহেন্দ্র গুপ্ত) ২·৫০
পান্থশালা (রমেন লাহিড়ী) ২·৫০
চাঁদির কোটা (উৎপল দত্ত) ২·০০
সন্তান (বাণীকুমার) ৩·০০
পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী) ২·০০
সূর্যমুখী (প্রশান্ত চৌধুরী) ২·০০
প্রত্যাবর্তন ২·০০ লাল পাথর ২·৫০
অনর্থ (সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২·৫০

পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত
কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম ১৫·০০
(আদি মধ্য অন্তলীলা সম্পূর্ণ)
শ্রীহরসাধক কণ্ঠহার ১·৫০
ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০·০০
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ৮·০০
অশোক গুহ অনূদিত
নগরাতে ঝড় ৫·০০
বনেদী ঘর ৩·৫০
যোগেশচন্দ্র বাগলের
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬·০০
ডঃ মখনলাল রায়চৌধুরীর
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪·০০
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বাংলা সাহিত্যে একাদশ ৪·৫০
সাহিত্যের স্বরূপ ২·৫০
অভিযাত্রীর উপন্যাস
অনির্বাণ শিখা ৫·০০
নষ্টচন্দ্রের আলো ৬·০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ১১ই বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

Thursday, 25th April, 1963
25 Naya Paise

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY
756.3
.003/3
X.67 no. 49

সরকারী ভাষার ভবিষ্যৎ

সরকারী ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে পুনরায় দেশে একটা মন-কষাকষির আশংকা দেখা যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে, ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরেও হিন্দী ছাড়া সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবেই ইংরেজী চালিয়ে যাবার জন্যে লোকসভায় আনীত সরকারী ভাষা বিলকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত ঘটনা। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সংসদে প্রধানমন্ত্রী সর্বভারতীয় সুবিধার্থে ভাষা সম্পর্কিত যে সরকারী নীতির আভাষ দেন, সেই অনুসারেই এই বিল আনা হয়। অবশ্য এই বিলে ইংরেজীকে সুনির্দিষ্টভাবে সহযোগী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়ে গেছে। কেবল সরকারী ও সংসদের কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্যে হিন্দীর সঙ্গে তা চালু থাকবে। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী হতে হিন্দী একমাত্র মুখ্য সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত হবে। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী হতে দশ বৎসর অতিবাহিত হবার পর—সরকারী কাজকর্মে শুধু হিন্দী চালু করা যায় কি না—তা বিশেষ কমিটি বিচার করে দেখবেন। দেখা যাচ্ছে, এতেও হিন্দীভাষীরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এই অবস্থায় গরিষ্ঠ সংখ্যক অহিন্দীভাষীরা বিপর্যয় বোধ করলেও কিছু বলা যায় না।

শ্রীনেহরু কংগ্রেস পার্লিয়া-মেণ্টারী পার্টিতে উক্ত ঘটনার পর যে সব মন্তব্যমত প্রকাশ করেছেন—তা প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজীকে সহযোগী ভাষা হিসেবে রাখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন। শ্রীনেহরু অহিন্দীভাষীদের বারবার আশ্বাস দিয়েছেন, তবু তাঁর আশ্বাস কিছু উগ্র হিন্দী প্রেমিকের জন্যই নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী সত্ত্বেও তাঁদের হয়তো ধারণা যে, গণভোটের জুলুমবাজিতে সর্বভারতে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা জাতীয় শ্লোগানকে কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব হবে। যে ইংরেজী ভাষা দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাকে ঠেলে ফেললে তাতে যেমন আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তেমনি অহিন্দীভাষীরা ইংরেজীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে—হিন্দী-ভাষীরা একমাত্র হিন্দীর জোরেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে সুযোগ লাভ করবেন, তাতে জনসাধারণের কাছে 'সমানা-ধিকার' কথাটি হাস্যকর হয়ে উঠবে।

এই সব কারণে হিন্দীভাষীরা যা করছেন, শুধুমাত্র তাঁদের মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দী যদি সর্বভারতীয় সরকারী ভাষা হবার গৌরব রাখে, তবে তার জন্যে দাবী ওঠা উচিত ছিল অহিন্দী-ভাষীদের পক্ষ থেকেই। এখনো হিন্দীভাষীরা যদি মনে করেন যে, অন্যান্য ভাষা দাবিয়ে রেখে হিন্দী চালালেই চলবে,—তা কিন্তু মস্ত ভুল। শিল্পীর হাতে প্রাণ পায় যেমন মাটির তৈরী মূর্তি, মহৎ সাহিত্যিকদের লেখনীর স্পর্শে তেমনই জীবন্ত হয়ে উঠে সাহিত্য। ঋদ্ধ হয় ভাষা। বাংলা, তামিল, তেলেগু প্রভৃতির উন্নতির জন্যে কারো মুখা-পেক্ষী হতে হয়নি। তবু তাদের ঐশ্বর্যের তুলনা নেই। সেইভাবেই হিন্দী ভাষারও উন্নতি সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

হিন্দীভাষীদের স্বরূপ দেখে আজ অ-হিন্দীভাষীরা সত্যি সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই যদি হিন্দীভাষীদের আজকের চেহারা হয়, হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মুখ্য বা একক মর্যাদা পেলে তখন তাদের দাপট কি-ই না হবে। হিন্দী ভাষা তাই আমাদেরকে উদ্বিগ্নই করে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আলি সাবরি

রাষ্ট্রের কর্ণধার সমরনেতা হলে দেশের অপর সকল ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রভাবে সহজেই হয়ে পড়ে নিষ্প্রভ। কিন্তু আরব - বিশ্ব - ভাগ্যাকাশে প্রেসিডেন্ট নাসের মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ভাস্বর হলেও—স্বকীয় মর্যাদার আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে তাঁর পাশে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আরব প্রজাতন্ত্রের কার্য নির্বাহক পরিষদের সভাপতি আলি সাবরি।

আরব অভ্যুত্থানের গোড়ার দিকে যাঁদের ধারণা ছিল আলি সাবরি তাঁর প্রেসিডেন্টের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না, তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ তিনি জোরালো ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। আফ্রো-এশিয় ঘটনা প্রবাহে তাঁর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অমিত মেধা ও অপূর্ব সংগঠন শক্তি নাসেরের পরম সহায়।

কলম্বো সম্মেলনে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের একটা সহজ, সরল সূত্রে উদ্ভাবনের দ্বারা তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। চীন-ভারত সীমান্ত মীমাংসার এই কলম্বো প্রস্তাব নিয়ে তিনি চলেছেন চীনে। সেখান থেকে দেশে ফিরে যাবার পথে ২৬শে এপ্রিল আসবেন নয়া দিল্লীতে।

আরব জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে সুরু করেছে। তা' সত্ত্বেও নাসেরই সেখানে প্রধান অধিনায়ক। এই সেদিন কায়রো সম্মেলনে স্থির হয়েছে সিরিয়া ও ইরাক নিয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের হবে সম্প্রসারণ। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আরবের উষর-ভূমিতে জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরণে নাসেরের পক্ষে আলি সাবরির মত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষটি হয়ে পড়েছে অপরিহার্য।

আলি সাবরি আত্মপ্রচার পছন্দ করেন না মোটেই। তিনি হলেন নীরব, নিরলস কর্মী। তাই এতদিন তিনি আরব প্রজাতন্ত্রের মুখ্য রূপকার হলেও বাইরের লোকে তাঁকে বেশী জানতে পারে নি।

নীলনদের গভীর নীল-কাজল জল পরিবেষ্টিত ব-দ্বীপের একটি অখ্যাত, গণ্ডগ্রাম জাগাজিগ এই শক্তিধর পুরুষটির জন্মভূমি। তিনি মিলিটারী একাডেমী এবং বিমানবাহিনী একাডেমীর গ্রাজুয়েট। ১৯৫২ সালে মিশরের বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন একজন উইং কমাণ্ডার। এই বিপ্লবে তাঁর ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দেশবাসীর নিকট তাঁদের এই প্রিয় নেতা "বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি" রূপেই সম্মানিত।

বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানের ভারতীয় সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে। তাই বোধ হয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষ রাজনীতিতে সংযুক্ত আরব ভারতের পরম মিত্র হতে পেরেছে।

শহর কলকাতা

ছোট অথবা বড় কোন নতুন সমস্যা মাথাচাড়া দিলেই আমরা, কলকাতার নাগরিকেরা কিছুদিন তার-স্বরে তার প্রতিবাদ করতে থাকি। যতদিন নূতনতর আর একটি সমস্যার প্রাদুর্ভাব না ঘটে, ততদিন শেষতম সমস্যাটি নিয়েই প্রতিবাদ চলে। আর যেহেতু এই মহানগরীতে কখনও সমস্যার অভাব ঘটে না, আমাদের সেই প্রতিবাদগুলোও খুব একটা একঘেয়ে শোনায় না। ইতিমধ্যে আস্তে আস্তে পুরান সমস্যাগুলোর সঙ্গে একটু একটু করে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকি। তাতে সমস্যাগুলোর ধার আদৌ কমে না, কিন্তু সেগুলোকে সমাধানহীন জেনে মেনে নেওয়া সহজতর হয়। এমনি করে একের পর এক সমস্যা নিয়ে, উপেক্ষা করে হয়ত বা প্রশ্রয় দিয়ে কলকাতার নগর-জীবন আজ বিপর্যস্ত। কোন ইজম নেই, কোন রাজনীতি নেই।

ঘরে, বাইরে, হাটে, মাঠে, কলেজে, রেল ষ্টেশনে, কারখানায়, অফিসে, আদালতে সর্বত্র সমস্যা। যে কাজটি হওয়া উচিত এক মিনিটে—তার জন্য অন্তত একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে নানা অন্তরায় অতিক্রম করতে নাগরিক মাত্রেরই আজ প্রাণান্তকর অবস্থা। সমস্যা—সমস্যা, সমাধান নেই !!···

শহর কলকাতার সর্বত্রই সমস্যা। ট্রেনে, বাসে, ট্রামে, বাজারে, সরকারী-বেসরকারী অফিসে— দৈনন্দিন জীবনের এমন একটা দিন নেই, যে দিনটা সমস্যা কণ্টকিত নয়। নাগরিককে যেখানে প্রতিনিয়ত বিব্রত হতে হয় না, বিপর্যস্ত হতে হয় না। কিন্তু নাগরিককে বিব্রত করা, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নাজেহাল করার ব্যাপারে শিয়ালদহ ষ্টেশনের বোধহয় জুড়ি নেই। শিয়ালদহ ষ্টেশন—মানে কলকাতার অন্যতম প্রবেশদ্বার। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ষ্টেশন। দৈনিক দশ লক্ষ লোক যাতায়াত করে এই পথে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যদি মুহূর্তের জন্যও মনে করেন যে, বিংশ শতাব্দীর কোন সভ্য শহরে এসে পৌঁছলেন, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তার খেসারত গুণতে হবে। ষ্টেশনে নেমেই আপনার চোখে প্রথম পড়বে চোর জুয়োচোর নিকটেই আছে। অতএব কুলির কাঁধে মাল চাপাবার আগে কুলির নম্বরটা সযত্নে তুলে নিন, এবং তার পরও দৃষ্টি সজাগ রেখে কুলির পিছন পিছন ছুটতে থাকুন। শক্তির অপচয়—কিন্তু কলকাতার এই রীতি।

প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে আসার সুদীর্ঘ অবকাশে যদি আপনার মাল খোয়া গিয়ে না থাকে তবে আপনার একটি ট্যাক্সির প্রয়োজন। কিন্তু শহর কলকাতায় অধৈর্য হলে চলবে না। ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খোলা রাস্তার উপর লাইনে দাঁড়িয়ে এক আধ এমন কি দুই ঘণ্টা আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। ইতিমধ্যে যদি জলে নাও ভেজেন তবে রোদে অন্তত পুড়তেই হবে, গরমেও পচতে হবে। আপনার মেজাজও খিটখিটে হয়ে যাবে। তারপরে বরাতে থাকলে একটা ট্যাক্সি পেলেও পেতে পারেন। আপনার বিশ-শতকীয় রুচিতে বাধছে ?—কিন্তু কলকাতা কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হবে না।

সম্প্রতি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৌরসভা ও পুলিস কর্তৃপক্ষের এক মিলিত বৈঠকে স্থির হয়েছে মহা-

কলিকাতায় কলেরার উৎস

নগরীর রাজপথ থেকে ঠেলাগাড়ী ও অন্যান্য শ্লথগতি যানবাহন ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হবে। সে পথে অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে স্থির হয়েছে—ঠেলাজাতীয় সমুদয় শ্লথগতি যানের রেজিষ্ট্রেশন এবং লাইসেন্স দানের ক্ষমতা অতঃপর রাজ্য-সরকারের,—কর্পোরেশনের নয়। কর্পোরেশন এই সূত্রে বছরে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা অর্জন করতেন। রাজ্যসরকার সে ক্ষতি পূরণ করে দেবেন। যে সব কর্মী কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাজ করতেন, তাঁরাও রাজ্যসরকারের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু ঠেলাগাড়ী এবং তার বহনিন্দিত সহযাত্রী রিকশা ইত্যাদি যখন সভাই উঠে যাবে, তখন কি হবে হাজার হাজার ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালার? ঠেলাওয়ালার সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। আর রিকশাওয়ালা, তাও প্রায় ঐ রকম। সরকার স্থির করেছেন, ঠেলার রিকল্প হিসেবে আরও ১০০টি তিন চাকাওয়ালা ভ্যানের লাইসেন্স দেবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কি অর্ধলক্ষ সংসারের বোঝা বইতে পারবে!

গরম সুরু হতে না হতেই কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের এ্যাম্বুলেন্সগুলি রোগী স্থানান্তরের অস্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। বেলেঘাটা সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে কলেরা রোগীর শয্যা-সংখ্যা যথেষ্ট বাড়ানো সত্ত্বেও রোগীর ভীড় সামলাতে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিগণ নাজেহাল হচ্ছেন। রাজ্যসরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কী ভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে তা নিয়ে সরকারী মহলে ইতি-মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। প্রায় ৬ লক্ষ শহরবাসীকে ইতিমধ্যে কলেরার টীকা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী ডি, এস, রাজু সম্প্রতি লোকসভায় বৃহত্তর কলকাতা পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে বলেছেন যে, এই সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারিং তদন্ত সমাপ্ত হতে ৩ বৎসর সময় লাগবে।

এই তদন্ত কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে আর অগ্রসর হবেন না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও জানান যে, বৃহত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে কলেরা সংক্রামক আকারে দেখা দিয়েছে, সেখানে জল সরবরাহের উন্নতির জন্য নলকূপ বসান সম্পর্কে কলকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ ও বি, এস-সি (পাসকোর্স) পরীক্ষার কোনো কোনো প্রশ্নপত্রে গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এই অভিযোগগুলি যথারীতি—প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত হওয়া। প্রশ্ন রচয়িতার ঔদাসীন্য, দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন রচনা এবং কঠোর প্রশ্নে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

বৃহস্পতিবার বিহারীলাল মিত্র ইনষ্টিটিউট ডোমেষ্টিক সায়েন্স কলেজ

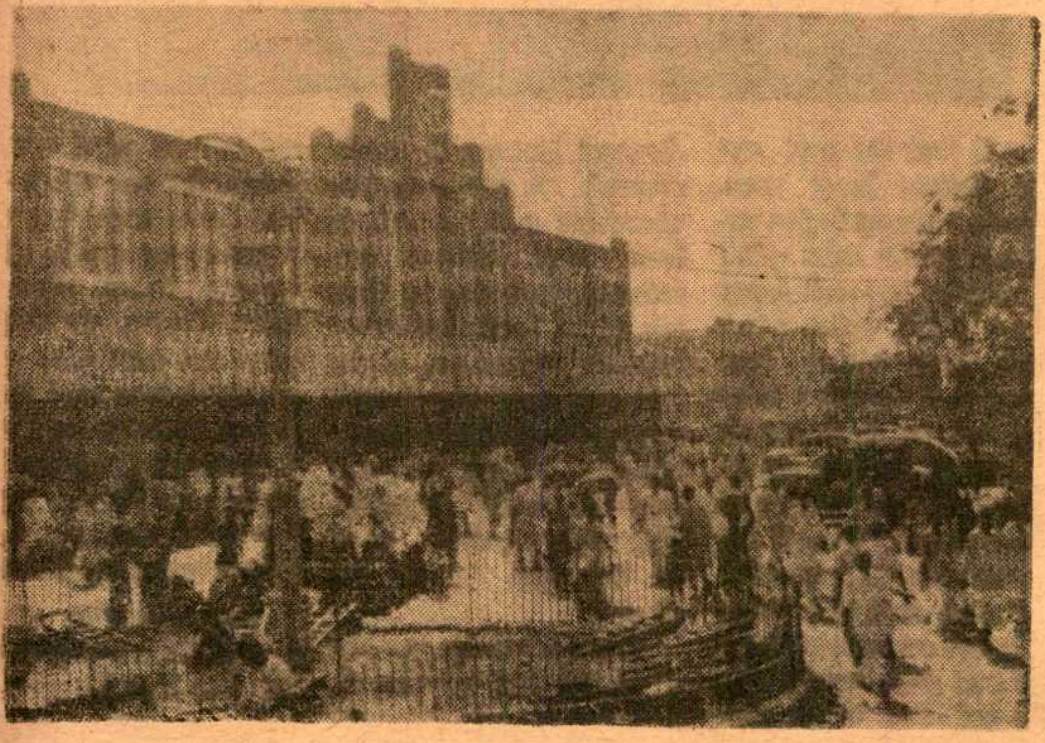

শিয়ালদহ ষ্টেশনে সকালের যাত্রী

বি, এস, সি সমাজ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে মোট নয়টি প্রশ্নের মধ্যে ৭টি প্রশ্নই সিলেবাস বহির্ভূত বলিয়া অভিযোগ উঠে। প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্রীরা মাথায় হাত দিয়ে কান্নাকাটি সুরু করে দেয়। কলেজের অধ্যক্ষা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন। ইহা ছাড়া অর্থ-নীতির তিনটি প্রশ্নপত্র, ইংরেজী দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র কঠিন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইহার যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। ২২।৪।৬৩।

দিল্লী থেকে

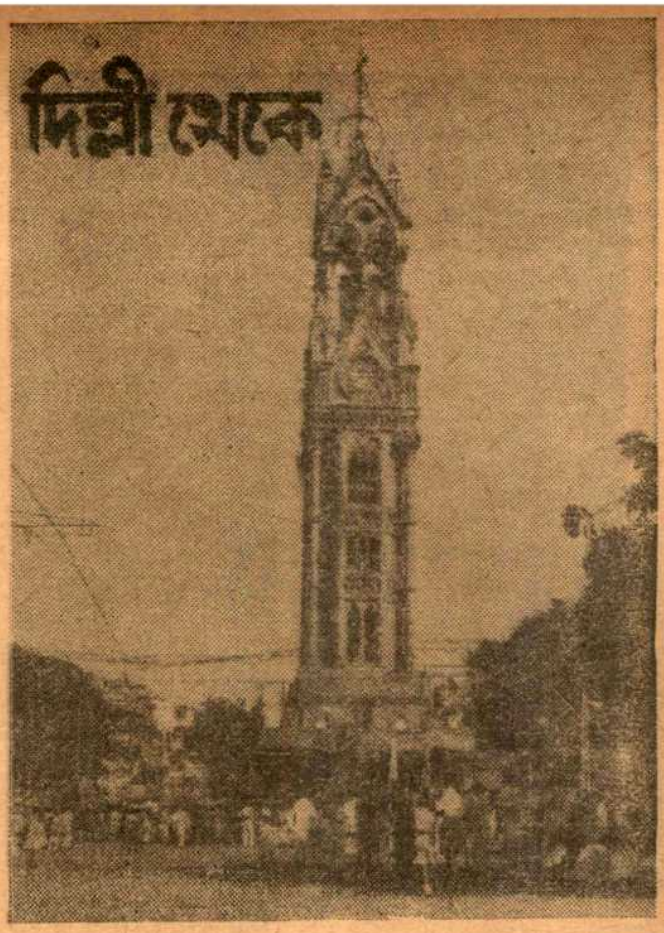

বিখ্যাত ঘন্টা ঘর। আজ এটা শুধু একটা ঐতিহাসিক স্মারকের অংশাবশেষ। নবাগত দর্শক দিল্লীতে আর এই মনোরম ঘন্টা ঘরটি দেখতে পাবেন না। ফাটল পড়ায় সম্প্রতি এটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীর চাঁদনী চকে চাঁদী পাওয়া যায় না। সেখানে আর সব কিছুই পাওয়া যায়। লাল কিল্লার সামনে যে বিরাট লাল মন্দিরটি রয়েছে ওটা জৈনদের একটা মহান্ তীর্থস্থান। মন্দিরটার নামও লাল মন্দির। মার্কস্ সাহেবের জন্মের শ' তিনেক বছর পূর্বেই দিল্লীর একেবারে বুকের ওপর এ লালের প্রাবাল্যে অনেকেই অবাক হবেন। রেড্ ফোর্ট, রেড্ টেম্পল্ থাকলেও রেড্ স্কোয়ার হয়েছে অনেক পরে, তাও বে-সরকারীভাবে সীমাবদ্ধ কতিপয় বন্ধুর বেসরকারী বর্ণনায়। মোগল যুগে রেড্ ষ্টেন্টার প্রতি কর্তাদের একটু দুর্বলতা ছিল। মোগল যুগের একাউন্টেন্ট অধিকাংশই জৈন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁরা সবাই মিলে এই সুন্দর মন্দিরটি খাড়া করেছিলেন আপন সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায়।

মন্দির সংলগ্ন হাসপাতালটি সমগ্র ভারতবর্ষ বিখ্যাত। এটি পাখিদের হাসপাতাল। 'পাখিদের' মানে পাখী। নানা জাতের অসুস্থ পাখী রয়েছে চিকিৎসাধীনে। মন্দিরের সামনেই ফুলের হাট। পুজো, বিয়ে, উৎসবের ফুল এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। দিল্লী রাজধানী হলে কি হবে, পথে ঘাটে সম্প্রতি সপুষ্পবাটিকা থাকলেই বা কি হবে, দিল্লীর বাজারে ফুলের কোনো স্থান নেই। কলকাতায় যেমন যখন তখন নোটিশ ছাড়া ফুল-শয্যার আয়োজন করা চলে এখানে তা নয়।

ফুল আনতে ছুটতে হবে ফুলমণ্ডীতে; চাঁদনী চকের এই প্রথম বিপণিসারি কিন্তু আজকের নয়। জাহানারার আত্ম-কাহিনী পড়ুন, সেখানে পাবেন এর বিশদ বর্ণনা। এই ফুলের দোকানগুলোর পাশে আগে ছিল ফলের দোকানের সারি, যাকে বলে ড্রাই ফ্রুট। দিল্লীর ড্রাই ফ্রুট শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। জাঞ্জিবর, মেসোপটামিয়া, বাগদাদ, জাবুলিস্থান, কাবুল, কান্দাহার দূর দুরান্ত থেকে সারিবদ্ধ উটের পিঠে চড়ে আসতো পসারির দল। সেরা দেশ হিন্দুস্থান যার মাটিতে সোনা ফলে আর আসমানে সর্বদা মেঘের সাথে খেলে বেড়ায় চাঁদনী খুবসুরত—স্বর্গীয় সৌন্দর্যরাশি। সেই হিন্দুস্থানে এসেছে সবাই ব্যবসার আশায়। তখনও লণ্ডন মানি মার্কেট জন্মায় নি। নিউইয়র্ক মানি মার্কেট তো গড়ে উঠলো এই সেদিন আমাদের চোখের সামনে। দুনিয়ার মানি মার্কেটের প্রাণকেন্দ্র ছিল দিল্লীর এই চাঁদনী চক্।

লালকিল্লার ঠিক সামনে দিয়ে বিরাট রাজপথ গিয়ে মিশেছে ফতেপুরীর মসজিদে। মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ছিল ছোট্ট খরস্রোত ক্যানাল। এখানে সেখানে ফোয়ারা। রাস্তাটা যোবনচঞ্চলা সুন্দরীর মতন ছিল চপলা। ডান পাশে ছিল বিরাট প্রমোদ উদ্যান। আজও আছে, প্রমোদ কানন আর নেই, সেখানে হয় রাজনৈতিক সভা-সমিতি।

এই প্রমোদ কাননটি তৈরী হয়েছিল ধর্মপ্রাণা মহীয়সী জাহান্ আরার নির্দেশে। জাহান্ আরার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে চাঁদনী চকের রাজপথের একটা রোমান্টিক ঘটনা ছিল জড়িত। এই রাজপথে একদিন সম্রাট সাজাহানের বিনা অনুমতিতে সর্বপ্রথম অপরিচিতভাবে সম্রাট কন্যা আপন প্রিয়তম হিন্দু সেনাপতি দুলেবার সাথে গোপন অভিসারে বেরিয়েছিলেন। চারিদিকের অগুরু চন্দন গোলাপের সৌরভ সেদিন এই প্রণয়াসক্ত যুগলমূর্তিকে জানিয়েছিল তাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে আলোকিত

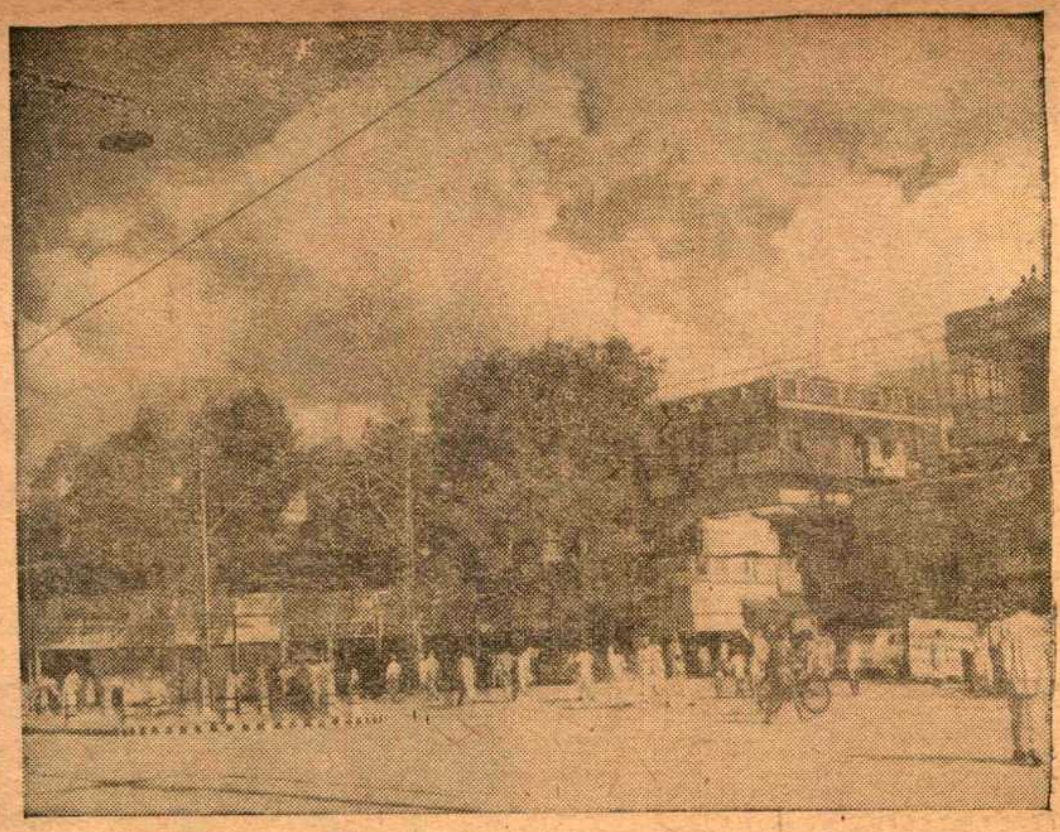

চাঁদনী চকের রাজপথের একটি দৃশ্য

রাজপথটি জ্যোৎস্নাস্নাতা সুন্দরীর মতন করত ঝলমল। তাই এর নাম চাঁদনী চক। আজকাল নিয়ন্ লাইটের কল্যাণে মহানগরীর বহু রাজপথই জ্যোৎস্নাস্নাতা। তবুও চাঁদনী চকের সাথে তাদের তুলনাই নেই। অর্থ-নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে নগরীর সম্প্রসারণের অঙ্গ হিসাবে দিল্লীর জায়গায় জায়গায় আজ অনেক নতুন বাজার খুলেছে তবুও পূজোর সময়ে, ঈদের পরবে, বড়দিনের ছুটিতে একবারটি চাঁদনী চকের রাজবাটিতে টহল না দিয়ে নিলে মন ভরে ওঠে না।

দিল্লীতে নতুন নতুন শাড়ীর দোকান যতই খুলুক না কেন, আভিজাত্যে ও রুচিতে যতই কনসার-ভেটিভ হোক না কেন, চাঁদনী চকের পাঁচশো বছরের পুরোণো গলিগুলোর দোকানের শাড়ীর ষ্টকের সাথে টেক্কা দেবার সাহস দিল্লীতে আজও কারুর হয়েছে বল্‌লে বিশ্বাস করব না। গলিটার নাম পুরোণো সেকেলে, বড়ই সেকেলে — পড়োটাওয়ালা গলি। দোকানগুলো আগলে যারা বসে রয়েছে নেহাৎ জানাশুনো না থাকলে মোটে বিশ্বাসই করার উপায় নেই যে তাঁরা কত ধনের অধিকারী।

দরিবার ঠিক প্যারালাল গলি।

দরিবাতে শুধু সোনা, রূপো, মণি, মুক্তা, পান্না, আইভরির দোকান। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভর্তি শুধু অলঙ্কারের ঝলকানি।

একটু দূরে বাঁদিকে যে গলিটা গেছে সেটার নাম নয়া সড়ক, মানে নতুন রাস্তা। কত শত বছর ধরে সড়কটি নয়াই রয়ে গেছে তার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিরাট ঘণ্টাঘর—ঘড়িওয়ালা বাড়ী। সম্প্রতি সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। নয়া সড়ক ভর্তি শুধু বই-এর দোকান। এটার সাথে তুলনা দেওয়া চলে শুধু কল-কাতায় কলেজ স্কোয়ারের—সরস্বতী যেখানে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছেন লক্ষ্মীর সাথে কম্প্রোমাইজ করে।

আরেকটু দূরে গেলেই বাঁদিকে পড়বে বিল্লি মরণ। দিল্লীর বিখ্যাত জরির কাজকরা জুতোর দোকান। গলিটা ভর্তি শুধু হোল্‌সেল জুতোর দোকান। এখানে একাধিক দোকানের মালিক গড় গড় করে বাংলায় কথা বলতে পারেন। স্বদেশী যুগে এঁদের অনেকে বাংলায় গিয়েছিলেন। কলকাতার সাথে এঁদের ব্যবসাসূত্রে আজও যোগাযোগ আছে। আমি একবার নাগরা চাইতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। ফর্সা ধপধপে বৃদ্ধ মালিক লক্ষ্ণৌ কাট্ কুর্তা পরে হাসতে হাসতে পরিষ্কার বাংলায় আমাকে বললেন, নাগরা তো দিচ্ছিই দাদা, বলো তো বিদ্যাসাগরী চটিও দিতে পারি। বললাম, তাই নাকি? তাহলে দিল্লীতে বসে বাংলা দেশের অন্ন কেড়ে নিচ্ছেন বলুন।

কি বলছো দাদা? দোকানের নাম পড়েছো?- দিল্লী বাংলার প্রশ্ন নয়। সমস্ত হিন্দুস্থানেই আমার বাড়ী।

বাইরে এসে দোকানের নাম পড়লাম, "স্বদেশী সু ষ্টোরস্।"

জরির জুতো ছাড়া দু' পাঁচটা

দোকানে এদিক ওদিক আজও আতর খুসবই বিক্রী হয়।

চাঁদনী চকের একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কি? যতগুলো দোকানের বর্ণনা করলাম তার প্রায় সবগুলোই—অলঙ্কার, সুগন্ধ, শাড়ী, জরির কাজ করা জুতো সবগুলোই নারীর প্রসাধন সামগ্রী। পুরুষদের প্রয়োজনীয় জিনিষের বড় একটা দোকান এখানে নেই। এই সব দেখে মনে হল মোগল যুগ থেকেই দিল্লীতে সমাজে নারীদের শুধু একটা শীর্ষস্থানই ছিল না, দেশ-বিদেশের মানীগুণীজন যখন ধ্যান করতেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা তখন দিল্লীর নাগরিকবৃন্দ শুধু হৃদয়েশ্বরীরই সেবা করতেন। তাঁরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। তবে চাঁদনীতে কারিডরগুলোতে ভয়ানক দরাদরি করতে হয়। একটা মজার ঘটনা বলছি

একবার বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-শিল্পী শ্রদ্ধেয় প্রবোধকুমার সান্যাল মশাই এসেছিলেন দিল্লীতে নিখিল ভারত মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণে। হঠাৎ প্রবোধ বাবুর খেয়াল হল তাঁর একটা নতুন জহরকোট কেনা নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁকে দু'একবার জানালাম যে দিল্লীতে ঠাণ্ডা জহর কোটের রেওয়াজ নেই, সুতরাং রেডি-মেড জহর কোট পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বললেন, চলো চাঁদনী চকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

চাঁদনী চকে দোকানে দোকানে ঘুরেও যখন কোন সুবিধে হল না তখন কারিডরে একখানা সুন্দর চাদর দেখে আমি তার দাম জিজ্ঞাসা করলাম। পসারি জানাল তার দাম আটাশ টাকা। আমাদের চাদরের কোনো প্রয়োজনই ছিল না তবুও কৌতূহল ভরে আমি বললাম এর দাম ছ-সাত টাকা। প্রবোধবাবু বললেন, কি বলো তুমি? ওর দাম পাঁচ টাকা। হ্যাঁ রে পাঁচ টাকা হয় তো দিয়ে দে। বলেই ট্যাক্সিতে উঠে গাড়ী ছাড়তে বলে দিলেন। একটুখানি অতিরঞ্জিত না করে বলছি লোকটা পাঁচ টাকাতেই সেই চাদরখানা দিয়ে দিল।

ফতেপুরের মসজিদটার ডান দিকে যে বিরাট ধর্মশালাটা আছে প্রবাসী

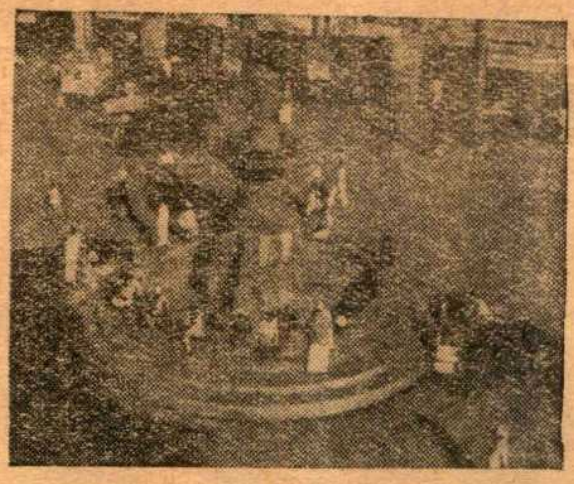

দিল্লীর চাঁদনী চকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফোয়ারা। পূর্বে এই ফোয়ারার পাশ দিয়ে একটা ক্যানাল প্রবাহিত ছিল

দিল্লীর বাঙ্গালীর সাথে রয়েছে তার একটা স্নেহমাখা স্মৃতি জড়িত। এই ধর্মশালা প্রাঙ্গণে বছরের পর বছর পুরোণো দিল্লীর বঙ্গ সন্তানেরা সমবেত হয়েছেন দশপ্রহরণধারিণীর বন্দনায়। দুর্গাপুজো, থিয়েটার, পংক্তি ভোজনে সমবেত হতেন শত সহস্র প্রবাসী বঙ্গ সন্তান। শুধু দিল্লী প্রবাসী বললে ভুল হবে, দিল্লীর বাইরে থেকেও বাঙ্গালী আসতেন পাণিপথ, সোনিপথ রোহতক থেকে। এর সাক্ষী রোহতকের অধ্যক্ষ সোমনাথ সান্যাল মশাই এর পূর্ণ বিবরণ দিতে পারবেন। স্থানীয় অধ্যাপক কেশবচন্দ্র নাগ মশাই তো বটেই।

চাঁদনী চকের বাজারের বর্ণনাকালে একটা কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। এর তিন দিকে তিনটি বড় রাজপথের নামের সাথে বাংলার তিনটি সন্তানের নাম জড়িত। লালকিল্লার সামনে চাঁদনী চকের গা ঘেঁষে যে রাজপথটি দরিয়াগঞ্জ পার হয়ে রাজঘাটের মুখে পড়েছে তার নাম নেতাজী সুভাষ রোড্। ফোয়ারার সামনের রাজপথটির নাম ডঃ এচ, সি, সেন রোড্। জয়পুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সংসার সেনের বংশধরের নামানুসরণে এর নাম। এচ্, সি, সেনের পুত্র "আদুবাবুর" নাম দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজে সবাই জানেন। দানশীলতা ছাড়াও সমাজ সেবায় তিনি দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছেন। আদুবাবুর একটা ভালো নামও আছে, কিন্তু সমস্ত শহরে তিনি এই প্রিয় নামেই পরিচিত। তৃতীয় রাস্তাটি গেছে এচ, সি, সেন রোডের গা ঘেঁষে জংশন ষ্টেশনের সামনে দিয়ে। রাস্তাটির নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড। রাজধানীর বুকের ওপর ঐতিহাসিক চাঁদনী চকের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তিন তিনটি রাস্তার নাম শুনে বুকটা আনন্দে গর্বে ফুলে ওঠে না কি?

প্রটোকলের দিক থেকে দিল্লীর চাঁদনী চকের পর যে বাজারটির নাম আসে সেটা হল কনট সার্কাসের জনপথের বাজার।

কনট্ প্লেসকে দিল্লীর চৌরঙ্গী বলা চলে। যুদ্ধের সময়েও কনট প্লেসের দোকানগুলো বেশ ঝলমল করত। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এ ঝলমলে ভাবটা যেন আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। সে ঔজ্জ্বল্যটা যেন শুষ্ক প্রদীপের সল্‌তেটুকুর শেষ জ্বলন। দেশ বিভাগের পর কনট প্লেসের কারিডরগুলো ভরে গিয়েছিল উদ্বাস্তু বিপণির হিড়িকে। কনট প্লেসের এই বড় বড় রাঘব বোয়ালগুলো যেন পুঁটি খলসের কাছে হার মানলো। ধীরে ধীরে কারিডর থেকে তাদের সরিয়ে বসানো হলো রাজপথের নবনির্মিত দোকানগুলোতে। দামে যেমন অনেকটা সুবিধে আছে ঠিক তার চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হল এদের ভদ্র ব্যবহার।

দোকানীদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু। ব্যবসা এদের অণু-পরমাণুতে। এদের ধৈর্য অপরিসীম, পরিশ্রম শক্তি কঠোর, মেজাজ নিতান্তই মোলায়েম যদি সেখানে নিজেদের স্বার্থ থাকে।

কলেজ স্কুলের ছেলে মেয়ে কেন রাস্তার সাহেবরাও কন্ট্ সার্কাসে একটা সন্ধ্যা চক্কর মারতে পারলে হয়। সেবারটির কথা কেন বিশেষ করে মনে আছে তাই বলছি। উত্তর ভারতে ভাল চিকন পাওয়া যায়। চিকনের ব্লাউজ মেয়েদের খুব পছন্দ। সবচেয়ে ভালো চিকন লক্ষ্ণৌতে পাওয়া গেলেও দিল্লীর জনপথেও সে চিকন দুষ্প্রাপ্য নয়। একটা দোকানে আমরা গিয়ে ঢুকলাম। আমার বান্ধবী জানালেন তাঁর প্রয়োজন।

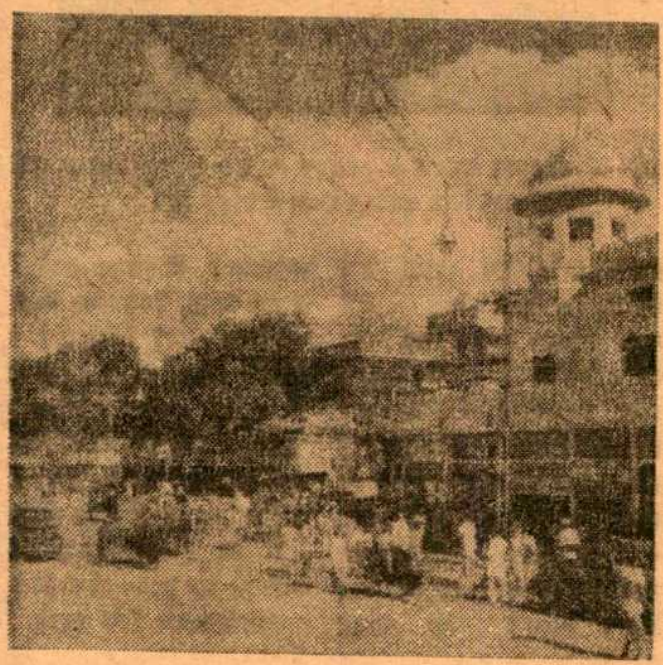

চাঁদনী চকের জনবহুল আর একটি দৃশ্য।

যেন খানিকটা জোস্ ফিরে পান। শপিং-এর নাম করে যে সব আধুনিকা নিপুণিকার দল সুন্দরভাবে মডার্ণ শকুন্তলা-অনুসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রকৃসি দেন তাঁরা নিশ্চয়ই দিনান্তের ক্লান্ত পসারীর দোকানে এক ঝলক পাগল-করা উন্মুক্ত দমকা হাওয়ার মতন ঘুরে তার মনে একটু পরিবর্তন এনে দেন। তবে মাঝে মাঝে আধুনিকাদের এই শপিং-এর এ্যাড্ভেঞ্চারটা একটু রিস্কি হয়ে পড়ে। পসারির পেশেন্স্ এর পরীক্ষা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পসারিরই জয় হয়। তবে আধুনিকাদের সাথে যদি কোন গাইড্ থাকেন তার বিপদটাই একটু বেশী।

একবার আমি আমার এক বান্ধবীকে জনপথের মার্কেটে নিয়ে যাই। একবার কেন প্রায়ই নিতে হয়। সুন্দরকান্তি পসারি এসে জিজ্ঞাসা করল, কি রকম চিকন চাই?

তারপর শুরু হল তার চিকন দেখানোর পালা।

ধীরে ধীরে আমাদের সামনে চিকনের একটা ছোটোখাটো পাহাড় খাড়া হয়ে গেল। বান্ধবীর কোনোটাই যেন পছন্দ হয় না। আমি মনে মনে বিপদ গুণছিলাম। কে জানে বাবা এখন যদি আবার হুকুম হয় চাঁদনী চকের ক্রেওস সোসাইটিতে চলো! তাহলেই তো গেছি। তাছাড়া বেচারা পসারিটার মুখ দেখেও মায়া হলো। শীতকাল, দিল্লীর শীতেও বেচারার সমস্ত মুখে যেন গঙ্গা যমুনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে একটির পর একটি চিকন সে বিনা প্রতিবাদে দেখিয়ে যাচ্ছে। এর ভিতর আর দোকানে ক্রেতাদের একটা রেগুলার কিউ জড়ো হয়ে গেছে। অবশেষে আমার বান্ধবী জানালেন এর কোনোটাই তার পছন্দসই নয়।

বাঁচি কি মরি করে আমি ওপরে রাখা দু'খানা ব্লাউজ পিস্ তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বান্ধবীর বাজুবন্ধের সাথে মিলিয়ে বললাম, সুন্দর ম্যাচ করেছে হে, নিয়ে নাও এই দু'টোই।

পসারি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

হলপ করে বলতে পারি অন্য কোনো দেশে কোন পসারির এতখানি তিতিক্ষা, এতখানি ধৈর্য, এতখানি পরিশ্রম একটা সামান্য চিকন পিস্ বিক্রীর পিছনে দেখা যেত না। এঁদের ধৈর্যের বাঁধন বড়ই শক্ত। এইটেই এদের ব্যবসায় সফলতার ট্রেড্ সিক্রেট।

আজকাল চাঁদনীর ড্রাই ফ্রুটের দোকানগুলো চলে না। সেগুলো সব এসে যেন জনপথের দোকানে বসে গেছে। সবই আছে ফল, খাবার, কুলপী, শাড়ী, জরির জুতো, খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী নেই শুধু ফুল। এত বড় মার্কেটে একটা ফুলের দোকান নেই। সেক্সপীয়র বলেছিলেন না— যাঁরা ফুল ও শিশু ভালবাসেন না তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষই নন? এঁদের সম্বন্ধে সেক্সপীয়র কি বলতেন জানি না, তবে জীবন-দ্বন্দ্বে, প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাতে; প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের ক্লান্তিতে, জীবনের মাধুর্য-মণ্ডিত কোমলতা যে অনেকখানি মুছে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এইবার আমরা যাব দিল্লীর আধুনিকতম মার্কেটে।

আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের গ্রামের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলার সাথে পরিচিত। দিল্লীর আধুনিকতম মার্কেট আনারকলির দিকে আমি দিনের যে কোনো সময়েই তাকাই না কেন, আমার মন ছুটে যায় সহস্র মাইল দূরে বাংলার গ্রামে যেখানে অবারিত মাঠ গগনললাট চুম্বন করে, যেখানে রয়েছে অতি পরিচিত ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়গুলো; যেখানে পল্লবঘন আম্রকাননতলে ঢাকের গুরু গুরু

নয়াদিল্লীর কনট প্লেস সংলগ্ন জনপথের মার্কেটের একটি দৃশ্য।

যাত্রে পথহারা পথিক খুঁজে পায় মেলার পথ। ছুটির দিনের তো কথাই নেই, সেদিন তো শত সহস্র ক্রেতার ভীড়। ছুটির অবসর ছাড়াও আনারকলি মার্কেটের জমজমাট ভাবটা যেন ষোড়শীর যৌবনচঞ্চল মন। কিছুতেই শান্ত হয় না।

আনারকলি মার্কেটের সাথে বর্তমান পাঞ্জাবের ইতিহাস বিশেষ ভাবে জড়িত। অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের সর্ববৃহৎ মার্কেট 'আনারকলি'। অতি প্রিয় নাম। শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, প্রাচুর্যে যে পাঞ্জাব একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শস্থল ছিল, র‍্যাডক্লিফের অমোঘ আঘাত তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। পারে নি আহত করতে পাঞ্জাবীর মন। তাই নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্দীপনায়, নতুন আশায়, নব প্রেরণায় উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীভাই বাঁধলো নতুন বাসা, নতুন ব্যবসায়, নতুন লক্ষ্মীমন্দির। ফেলে আসা আনারকলির স্বপ্ন আজও সে ভুলতে পারছে না। তাতে সে হতচিত্ত হয় নি। ভাঙ্গা মনে ভিক্ষে করা পাঞ্জাবীর কল্পনার বাইরে। তাই সে নতুন আনারকলি তৈরী করল। স্বাধীন ভারতের রাজধানীর সর্ববৃহৎ এই উদ্বাস্তুদের গড়া মার্কেট দিল্লীর পুরোণো সমস্ত ব্যবসাকেন্দ্রকে ছাপিয়ে উঠেছে। নবদৃপ্ত যৌবনে নব জাতির নব অভিযানের পথে দিল্লীর আনারকলি হল একটা জয়তিলক। একটা শুভ চিহ্ন।

একদিকে অরবিন্দ রোড, অপর দিকে পুসা রোড। দু' মাইলেরও বেশী লম্বা আজমল খাঁ রোড বিস্তৃত এই মার্কেট। বাজার হাট মেলা সব মিলিয়ে যেন এক হয়ে গেছে আনারকলি মার্কেটে।

মানুষের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যাবে এই মার্কেটে। বাঙ্গালীদের জন্য পসারি যত্ন করে পটল, কাঠাল, কাঁচা আমটা যেমন নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি ভাবে সে নিয়ে এসেছে নারকেল, কাঁচকলা, তেঁতুল তার মাদ্রাজীভাই এর জন্য। বিবেচনাবোধ আছে বৈ কি।

শাড়ী অলঙ্কার প্রসাধন পোষাক পরিচ্ছদ অ.হ.র্য কি চাই? চাঁদনী চক যদি বয়সের জন্য হয়ে থাকে গম্ভীর তাহলে জনপথের নতুন মার্কেট প্রৌঢ়—শুধু প্রৌঢ় নয় অকাল-প্রৌঢ় আনারকলি প্রাণ প্রাচুর্যে যৌবনা।

আজকাল দিল্লীর শপিং সেন্টার তাই আজমল খাঁ মার্কেটের এই 'আনারকলি।'

অর্থনৈতিক সুবিধেটুকুও কম নয় যে শাড়ীখানা আপনি কনটপ্লেসে কিনবেন পঞ্চাশ টাকায়, চাঁদনীতে তার দাম পঁয়তাল্লিশ, আনারকলিতে পঁয়ত্রিশ নামে মাত্র মার্জিন রেখে এখানকার পসারি আপনাকে জিনিষটি দিয়ে দেবে। তার মধুর ব্যবহার তার দোকানের পরিপাটি ছিম ছাম সাজানোর ষ্টাইল আপনাকে আকৃষ্ট করবে। সর্বোপরি "বাদশো" বলে সে যখন আপনাকে আহ্বান করে নিয়ে কুশনের ওপরে রাজসম্মান দিয়ে বসাবে, তখন আপনার দরাজ দিল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেই দুর্বল মুহূর্তে মনে প্রাণে শাহান্‌শা বাদশা সাজাহানের চেয়ে আপনি কোন অংশে কম নন। পসারি তখন মমতাজের হাতে গুঁজিয়ে দেবে কাঞ্জিভরম্ খান দুই, কয়েকখানা ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বাঙ্গালোর চান্দেরীগুলো না হয় পরেই নিলেন দাম? দামের জন্য সে মোটেই চিন্তা করে না। সে জানে তার একটি নয় পয়সাও মারা যাবে না।

এই হলো দিল্লীর 'আনারকলি' মার্কেট। রাজধানীর আধুনিকতম মার্কেট। 'মার্কেট' নয়, 'মার্ক ইট'—দিল্লীর অর্থনৈতিক জগতের নতুন চ্যালেঞ্জ!

বঙ্গদর্শন

দেবানন্দপুরে অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের পুরণো দুইটি ধ্বংসপ্রায় মন্দির

"দেবের আনন্দধাম,
দেবানন্দপুর গ্রাম,
তাহে অধিকারী রাম,
রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়,
দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদার
পড়াইল পারসী।"
—ভারতচন্দ্র।

হুগলী জেলার **দেবানন্দপুর গ্রাম**। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মেরও বহু পূর্বে পারসী-ভাষা শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। এখানে কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামে পারসী-ভাষা শিখেছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর আত্মকথায় এখানকার সুপ্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের কথা শুধু যে স্বীকার করেছেন তা নয়। সেদিনের সমৃদ্ধিপূর্ণ গ্রামকে তিনি দেবের আনন্দধাম বলে অভিহিত করেছিলেন। আজ দেবানন্দপুরে একটি স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ ভারতচন্দ্রের এই স্বীকৃতি অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে দেবানন্দপুর। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামটি আজ রস-পিপাসু বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার কিছু কিছু আয়োজনও সুরু হয়েছে—এটা আশার কথা।

"কিন্তু দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম আজ অবহেলিত।

ব্যাণ্ডেল সহর থেকে অল্প দূরে দেবানন্দপুর কিন্তু সহর-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত। আর দশটা সাধারণ গ্রামের মত পানীয় জলের অভাব জীর্ণ দশ-প্রাপ্ত রাস্তা-ঘাট, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া দেবানন্দপুরের গ্রাম-বাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই গ্রামে প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন শিবমন্দির এবং আরও পুরাতন কয়েকটি মন্দির আছে। কিন্তু অবহেলায় প্রাচীন কারুকার্যবিশিষ্ট এই মন্দিরগুলি ধ্বংসের মুখে।

ভারতচন্দ্র যে পারসী বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের নিদর্শন সেই সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের সামান্য ভগ্নাবশেষ শুধু আজ দাঁড়িয়ে অতীত দিনের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই ভগ্নাবশেষের কাছেই হুগলী জেলা বোর্ডের কল্যাণে স্থাপিত একটি স্মৃতি-ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে ভারতচন্দ্রের স্বীকৃতি। ঐটুকু ছাড়া দেবানন্দপুরের অতীত—ঐতিহ্য আজ অবলুপ্তির পথে।

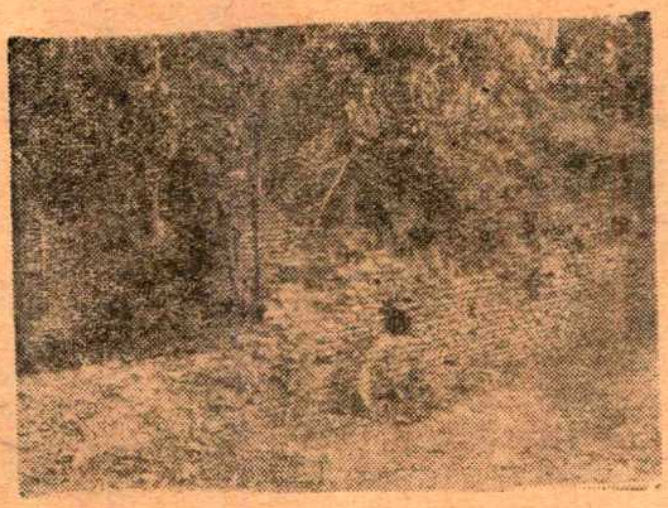

এই স্থানে বসে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র পারসী ভাষা শিখেছিলেন

হুগলী :

প্রত্যেক বছরই হয়, কিন্তু এ বছরের মত নয়। এ বছরে তারকেশ্বরে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন মেলায় জন-সমাবেশ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ঘটনা-দুর্ঘটনাও কম ঘটেনি।

মেলার মধ্যেই বাবার ব্রত পালন-কারিণী এক মধ্যবয়সী মহিলা দেহরক্ষা করলেন। তিনি এসেছিলেন নাকি উড়িষ্যা থেকে। নিখোঁজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০ জনের ওপর। এর অধিকাংশই তরুণী।

আটজন পড়লেন কলেরায়, দু'জন নিউমোনিয়ায়। পঞ্চাশজনের মত 'ভিড়ের' চাপে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। আর অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন, এর সংখ্যাও দু'শোর ওপর।

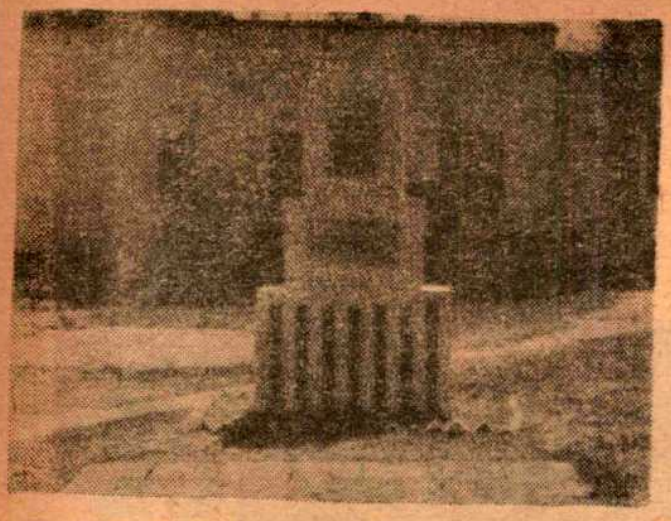

শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘর ও বসতবাটীর কাছেই স্থাপিত শরৎ-স্মৃতি ফলক

চব্বিশ পরগণা :

সুন্দরবনের কয়েকটি এলাকায় বিশেষ করে ক্যানিং থানায় বসন্তের প্রকোপ কাটতে না কাটতে কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে। গত তিন মাসে এই থানায় ২১২ জনের মৃত্যু হয়েছে কলেরা আর বসন্তে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকি চিকিৎসার অভাব-ই মৃত্যুর কারণ। ইতিমধ্যে আরো প্রায় সাড়ে তিনশত জন অসুখে ভুগছেন।

স্থানীয় স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের কর্মীরা যথারীতি টিকা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, ফিনাইল বা ডি ডি টি স্প্রে করা—এসবের কোন পাত্তা নেই। টিকা নেওয়ার আগেই কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে। কোন কোন গ্রামের দু' একটি পরিবারই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার সুন্দরবনে জলের অভাবে গত দু' বৎসর ধরে শস্য জন্মেনি। এবার চাষীরা মরছে মহামারীতে।

মেদিনীপুর :

দেনার দায়ে সাধারণ গৃহস্থকে পথে দাঁড়াতে হয়। কোর্টের পেয়াদা এসে দাঁড়ায় ডিক্রি নিয়ে। এবং ঘটি-বাটি পর্যন্ত ক্রোক করে। কিন্তু সাধারণ লোক যে সরকারী সম্পত্তি ক্রোক করার ডিক্রি পায় এরকম ঘটনা হামেশা ঘটে না, তার ওপর রেল স্টেশন ক্রোক।

কিন্তু 'মেদিনীপুর হিতৈষী'র খবরে দেখা যাচ্ছে তাও সত্যি হল। ক'দিন আগেই নাকি মেদিনীপুরের রেলওয়ে স্টেশন ক্রোক করার ডিক্রি পেয়েছে জনৈক ব্যক্তি।

আবেদনকারীর নাম শ্রীজীবনরাম মুরারকা, তাঁর মালের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৩,৪৪৪ টাকার দাবী জানান এবং আদালতের পরোয়ানা সমেত ভদ্রলোক পাইক পেয়াদা নিয়ে স্টেশন ক্রোক করতে হাজির হলে সবাই রীতিমত অবাক হয়ে যান।

অবশ্য কাগজে-কলমের ব্যাপার—তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশী দূর গড়ায় নি।

পশ্চিম দিনাজপুর :

ইউনিয়নটা রয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রের একটা জেলায় আর রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে সেই ইউনিয়নই রইল পাকিস্তানের দখলে। তাজ্জব ব্যাপার! অবশ্যই ত্রুটি আর তার সংশোধনও হয়। কিন্তু গত '৫৩ সাল থেকে এই তেরটি পর্যন্ত এ ত্রুটি সংশোধনের কোন তোড়জোড়ও দেখা গেল না। এখনও বোধ হয় বিষয়টি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার কাইলে।

ইউনিয়নটা পশ্চিম দিনাজপুরের খট্টা মাধব পাড়া। ১৯৫২ সালে এ সীমান্ত জরীপ করার সময় এই ভুলটা চোখে পড়ে এবং জরীপকারীরা ইউনিয়নটা পাকিস্তানের দখলে দেখে গোটা হিলি থানা এলাকাই জরীপ করা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। একটা ভারতীয় এলাকা এই রকম পাকিস্তানের দখলে থাকার প্রতিবাদ জানিয়ে হিলির বিশিষ্ট অধিবাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছেন, লেখালেখিও করেছেন।

উত্তরে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যথারীতি বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি পাঠান হল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছু ফললাভ তো দূরের কথা, এখনও বিবেচনা চলছে।

মুর্শিদাবাদ :

বহরমপুর করদাতাদের ওপর পৌর-সভার নতুন কর বৃদ্ধির প্রস্তাবে সাধারণ লোকের মধ্যে বেশ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এখনই পৌর-সভার বছরে আয় হচ্ছে ৪,৩৩,২০৪৲ টাকা, তার ওপর নতুন বোঝা চাপছে ১,১০, ৪৪৩৲ টাকা। অবশ্যই মিল মালিক থেকে সাধারণ খড়ের ঘরের বাসিন্দা কেউই বাদ পড়েনি। তবে রোখটা নাকি বেশী পড়েছে ভাড়া বাড়ির ওপর।

জলপাইগুড়ি :

অন্যান্য জেলার মত জলপাইগুড়ি জেলাতেও প্রায় প্রতিটি জিনিষেরই আগুন দাম। তার ওপর তরি-তরকারী চোখে পড়ে না, বাঙ্গালীর অতি প্রিয় মাছ সাড়ে চার টাকা, কমের দিকে চার-এর নিচে নয়। চালের মণ তিরিশ।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছেন স্থানীয় পৌরসভা আর ইলেকট্রিক কোম্পানী। দু'পক্ষই নোটিশ দিয়েছেন একপক্ষ বিদ্যুতের খরচের প্রতি ইউনিটে দু' নয়া পয়সা রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করেছেন ১লা এপ্রিল থেকে; আর এক পক্ষ ট্যাক্স চাপালেন সাধারণ করদাতাদের ওপর। আগে যা ছিল তার কোন ক্ষেত্রে দু' গুণ, কোথাও তিন গুণ

ট্যাক্স, ট্যাক্স আর ট্যাক্স। ট্যাক্সের চাপে চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান ক্রমশই নিচের দিকে নেমে চলেছে আর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বাড়ছে অসন্তোষের মাত্রা।

ইউরোপ ঃ

আটলান্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান কি করে কমান যায় তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলেছে। প্যারিসে ও লণ্ডনে 'নাটো' বৈঠকের পর মে মাসে আবার কানাডার রাজধানী অটোয়াতে বৈঠক হবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে সহযোগী দেশগুলির মধ্যে আণবিক অস্ত্র বিতরণের বিষয়ে আলোচনা হবে।

ব্যবধান সৃষ্টির জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে দায়ী করা হচ্ছে। ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে বৃটেনকে অন্তর্ভুক্ত না করা ও অন্য দেশ নিরপেক্ষ আণবিক অস্ত্রে ফ্রান্সের স্বাধীনতা—এ দু'বিষয়ে তার অনমনীয় মনোবৃত্তির জন্যই নাকি ব্যবধানের সৃষ্টি

অটোয়া বৈঠকে কোন মীমাংসা হয় কি-না দেখা যাক। ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মানীর এক কূটনীতিকের মতে যতদিন দ্য গল ফ্রান্সের রাজনীতির কর্ণধার ততদিন কোন আশা নেই।

ওয়েষ্ট জার্মানী ঃ

চ্যান্সেলার এডেনয়ারের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ আসন্ন এরকম গুজব অনেকবার ইউরোপে প্রচারিত হয়েছে। তিনি নিজেও অনেকবারই অবসরের কথা বলেছেন। কিন্তু কোনবারই কাজে তা করেন নি। এবার তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন এ বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।

যুগোশ্লাভিয়া ঃ

যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযুক্ত প্রচেষ্টা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা বেলগ্রেডে হয়েছিল। এখন চুক্তি লেখাপড়া হচ্ছে। আগামী বৈঠকে বুদাপেস্তে তা স্বাক্ষরিত হবে। এ চেষ্টা সফল হলে দু-দেশেরই বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেক বেড়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট নাসের নিকট ভবিষ্যতে যুগোশ্লাভিয়া পরিভ্রমণে আসবেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে উভয় দেশের ও আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা।

যুগোশ্লাভিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের এক বৈঠকে দেশের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতীয়দের আর্থিক ও সামাজিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টার জন্য একটি ৭ বৎসর মেয়াদী যোজনার আলোচনা চলছে।

বৃটেন ঃ

গত সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর লণ্ডনের বুকে আণবিক যুদ্ধ-বিরোধী পদযাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত। ৬০ মাইল পদযাত্রার শেষে ৩৫,০০০ সত্যাগ্রহী এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে। হাইড পার্কের কাছে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক এক সারিতে পনের জন দাঁড়ালেন পথ রোধ করে। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে চাইল। পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল লাঠি। কয়েকজন পুলিশ ঘায়েল হল। তারপর চলল ইতস্তত ধস্তাধস্তি, মারামারি। জন বারো সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল খবরটা গুরুতর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাহ্য।

চমকপ্রদ খবর হচ্ছে এই পদযাত্রার মিছিলে বিলি করা হয়েছে হাজার হাজার ইস্তাহার। সেই ইস্তাহারে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে বৃটেনের অতি গোপনীয় সামরিক দলিল। যদি আণবিক যুদ্ধ হয় তাহ'লে বৃটেনে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তারই খসড়া দলিল থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে রচনা

ডাঃ কে, এডেনয়ার

করা হয়েছে এই ইস্তাহার। রচনাও বিতরণ করেছেন 'শান্তির গুপ্তচর'। ইনি একক বা বহু—ব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠান—কেউ জানে না। কি করে এই গুপ্ত দলিল তাঁর হস্তগত হয় তাও কেউ বলতে পারে না। বৃটেনের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ হেনরী ব্রুক তাঁর দপ্তরের গুপ্ত দলিল ফাঁস হয়ে যাওয়াতে রীতিমত বিব্রত হয়ে প'ড়েছেন। কি করে এই ধাক্কা সাম্‌লাবেন তাই ভেবে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানও হিম্‌সিম খাচ্ছেন।

এই দলিলে বর্ণিত ব্যবস্থাবলীর উল্লেখ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থাবলীর যৌক্তিকতা থাকতে পারে, কিন্তু সে-গুলি নিঃসন্দেহে মর্মন্তুদ। এই দলিলে সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, আণবিক যুদ্ধের ফলে সামাজিক জীবনের কোন অস্তিত্বই থাকা সম্ভব নয়। অবশিষ্ট থাকবে শুধু একান্তে অবস্থিত "বাঙ্কার," আর সেখানে লুক্কায়িত কয়েকজন অফিসার। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খিদমত করবেন আর তদারক করবেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ মৃত দেহের।

ইংলণ্ডের এই নব-মীরজাফরেরা গুপ্তকথা ফাঁস করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তিকামী মানবদরদী রাসেলের বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে আণবিকপ্রলয় রোধ করবার জন্য এই প্রকাশনারও বুঝি বা প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর চোখে ভারত

ইংলণ্ড ঃ

গত ১৪ই এপ্রিলের 'অবজারভার' পত্রিকা রেভারেণ্ড—মাইকেল স্কটের দিল্লীস্থ এক উক্তি উল্লেখ করে বলেছে যে, তিনি আশা করছেন ভারত সরকার আর বৈরী নাগাদের ভেতর একটা যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হবে। পত্রিকাটি অবশ্য সন্দেহ করে যে বৈরী নাগারা পাকিস্তানের নিকট থেকে সাহায্য পাচ্ছে।

১৫ই এপ্রিলের 'ডেইলী এক্সপ্রেস' কিঞ্চিৎ গর্বস্ফীত হয়ে বলেছে যে, ভারতের জন্য ইংলণ্ড কিছুই করেনি বলে জাতীয়তাবাদীরা যতই আস্ফালন করুক না কেন লোকসভায় নতুন যে ভাষাবিল উত্থাপন করা হয়েছে তাতে কিন্তু ইংরেজীকে সরকারী ভাষার মর্যাদাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাগজটি এর স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল উন্নাসিকতায় এও বলেছে যে, বৃটেনের সাহায্য ব্যতীত ভারতীয়রা একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে অক্ষম। পত্রিকাটির কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে প্রাক্ বৃটিশ যুগে ভারতীয় তীর্থ পর্যটকদের দল উত্তর ও দক্ষিণে অবাধে যাতায়াত করে এসেছে এবং তারা তখন বোবা হয়ে থাকেনি কেউ। সংস্কৃত এবং পরবর্তী যুগে হিন্দুস্থানীকে স্থানচ্যুত করেই ইংরেজ শাসক ভারতে ইংরেজীকে সরকারী ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল তা আজ তাদের স্মরণ নেই।

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান কে ডি মালব্যকে নিয়ে এক দীর্ঘ ফিরিস্তি রচনা করেছে। কংগ্রেসের জন্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তিনি টাকা নিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু। এ ব্যাপারটার বহুল প্রচারে মনোযোগ দিয়েছে এরা এই কারণে যে, তাদের মতে মালব্যজী হচ্ছেন কৃষ্ণ মেননের গোষ্ঠীভুক্ত।

মার্সাল টিটো

বি-বি-সি'র প্রতিনিধি আইভর জোন্স কিছুকাল আগে দিল্লী এসে-ছিলেন। সম্প্রতি ভারতের আপদ-

কালীন জরুরী অবস্থা সম্পর্কে একটি বেতার ভাষণে তিনি ভারত সরকারের এক জোরালো সমালোচনা করেছেন। তাঁর এমনও সন্দেহ হয়েছে যে আপৎ-কালীন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যে বিরাট পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছে সরকারী প্রশাসনিক অব্যবস্থার দরুণ সে টাকাটারও সদ্ব্যবহার হবে না। তাঁর কণ্ঠে সেই রক্ষণশীল বিরূপতার সুর স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে যা এশিয়াতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত।

লণ্ডন টাইমস্ ১৫ই এপ্রিলের সংখ্যায় নতুন অতিসুনাফা করের সমালোচনা করে বলেছে যে, এটা উপযুক্ত কার্যক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেবার প্রচেষ্টা। এতে করে, ভারতে বৈদেশিক মূলধন প্রয়োগের নীতি বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ভারতের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল হতে হবে।

সিরিয়া :

দামাস্কাসের অল্-মানার পত্রিকা তাদের সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় ভারতের 'যুদ্ধ-নয়' প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে পাকিস্তানকে সমালোচনা করেছে। পত্রিকাটি বলেছে যে ভারত বিগত পাঁচ ছ' বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব দিয়ে আসছে এবং আজও সে তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই—ভারতের আন্তরিকতার এটাই যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং পাকিস্তানের

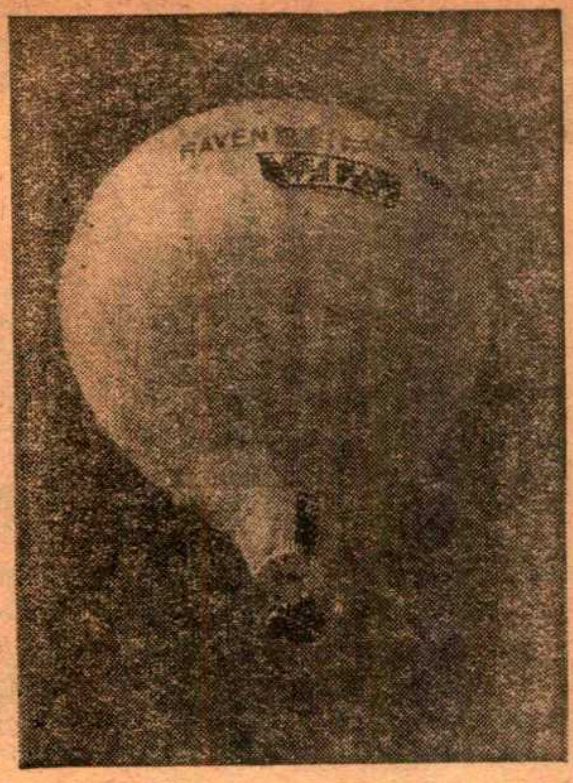

আমেরিকার ইয়স্ট ও পিকার্ড পুরাতন রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া তিন ঘণ্টার মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ করার অভিসন্ধি আছে বলে যে সেখানে কলরোল উঠেছে তা' নিতান্তই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন।

ইটালী :

ইটালীর দৈনিক পত্রিকা ডেইলী কোরিয়ার ডেলা সেরা গত ২৫শে মার্চের সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছে যে, বসন্তের শেষে চীন আবার ভারত সীমান্তে আক্রমণ চালাবে। ভারতের গণতান্ত্রিক জীবন গঠনের প্রয়াসকে মাও সে-তুং ধ্বংস করে দিতে চায়। মাও-এর পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে পররাজ্য গ্রাসের লোভে এই আক্রমণ পরিচালিত হবে। তিব্বতের রাস্তা ঘাট তুষারমুক্ত হলেই আবার চৈনিক আক্রমণ আরম্ভ হবে। পত্রিকাটির মতে চীন বহু বছর ধরে বন্ধুত্বের ছদ্ম আবরণের আড়ালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়ে এসেছে এবং ভারতকে বহুকাল ধরে' এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। নয়া চীনের যে মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে মাও এশিয়া তথা সারা পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তারে অভিলাষী, ভারত আক্রমণ তারই অনিবার্য নীতি সম্ভূত পরিণতি মাত্র এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতের গণতান্ত্রিক জীবনকে বিধ্বস্ত করা প্রয়োজন। এবং ঐ কারণেই আজ

পশ্চিম জার্মানীতে শস্য কর্তন উৎসব

মাও-সে-তুং

কলম্বো প্রস্তাব ও পণ্ডিত নেহরুর আন্তর্জাতিক সালিশী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে' চীন তার আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে।

নিউজিলাণ্ড ঃ

গত পঁচিশে মার্চের সংখ্যায় নিউজিলাণ্ড হেরাল্ড একটি মূল্যবান সম্পাদকীয় লিখেছে। শিরোনামা দিয়েছে, "চীন সীমান্ত পথ তৈরী করছে।" সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে, চীন আজ যুদ্ধের পথে এগিয়ে চলেছে। নিষ্ঠুর পাশবিকতায় তিব্বতকে কুক্ষিগত করার পর সমগ্র এশিয়ায় কম্যুনিজমের বিকল্প হিসাবে স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতের স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্ব আজ চীনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রগুলিও ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আক্রমণকে বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করছে। সিড্‌নীর এ্যাডভোকেট পত্রিকা তার ২৫শে মার্চের সংখ্যায় চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছে যে, কাশ্মীরের পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত অংশ চীনকে দান করার ফল বিষময় হতে বাধ্য। এর ফলে চীনের পক্ষে তখন ভারতের পূর্ব-সীমান্তে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া অনেকটা অনায়াস সাধ্য হবে এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশে চীনের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে।

নেপাল ঃ

ভারতবিদ্বেষ এবং চীনের গুণগান করার জন্য নেপালী সংবাদ পত্রগুলির পিছনে চীন অজস্র টাকা ছড়াচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে নয়া সমাজ নামে যে হিন্দি সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয় তার ১৪ই এপ্রিলের সংখ্যাটি পড়লেই এর সত্যতা অনেকটা আঁচ করা যাবে। সে সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যাতে ভারতকে অভিযুক্ত করা হয়েছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বাহক বলে আর চীনের পঞ্চশীলের নীতির প্রতি তথাকথিত আনুগত্যের উল্লেখ করে তার প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে প্রচুর। প্রবন্ধে আর বলা হয়েছে যে, সীমান্তের গোলযোগের জন্য ভারতই দায়ী, চীন নয়। চীনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসতে নাকি ভারত রাজী হচ্ছে না, প্রবন্ধকারের তাও এক অভিযোগ। অথচ কলম্বো প্রস্তাবের কথা এবং তা যে চীন অগ্রাহ্য করে চলেছে সে কথা লেখক একবারও উল্লেখ করেন।

পাকিস্তান ঃ

পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলি অবশ্য তাদের ঐতিহ্যানুসারে ভারতবিরোধী প্রচারকার্য সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। নাগা বৈরীদের সমর্থনে তাদের চিত্ত বিক্ষেপের আর অন্ত নেই। নাগা-ভূমিতে নাকি ভারত সরকার অবর্ণনীয় অত্যাচারের রথ চালিয়ে যাচ্ছে। ৮ই এপ্রিলের সংখ্যায় করাচীর 'ডেইলী লিডার' ফিজোর সঙ্গে এক তথাকথিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছে। ফিজো নাকি সেই সাক্ষাৎকারে বলেছে যে নাগারা চিরকালই মোঙ্গলীয়। তারা কখনই ভারতীয় নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম থেকে 'ইউনিটি' নামে একটি কাগজে পণ্ডিত নেহরুকে সাম্রাজ্যবাদী বলে' আক্রমণ করেছে। আমেরিকাকেও আক্রমণ করতে

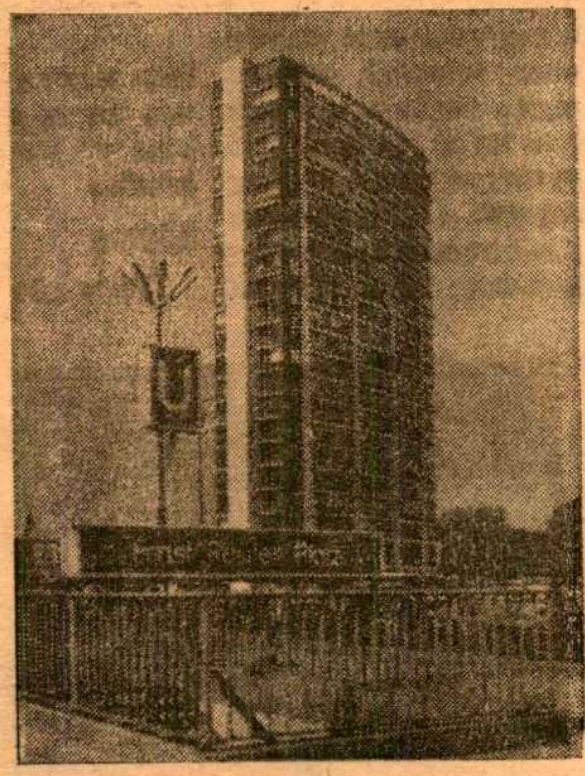

পশ্চিম জর্মানীর অতি আধুনিক ধরণের সুউচ্চ সৌধ। প্রাক্তন মেয়র আনস্ট রয়টার ধ্বংসাবশেষের ওপর এই সৌধের গোড়াপত্তন করেছিলেন বলে তাঁর নামেই ইহা উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

ছাড়েনি এই কাগজটি। আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকা ভারতে অস্ত্র-সাহায্য দিচ্ছে। চীনের পত্রিকাগুলি পাকিস্তানের এ'সব বিরূপ সমালোচনা উদ্ধৃত করে প্রচার করে চলেছে যে, ভারতকে আমেরিকার অস্ত্রসাহায্য পাকিস্তান বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

'ডন' এবং আরও পাকিস্তানী পত্রিকার মন্তব্য উল্লেখ করে চীন সবাইকে প্রত্যক্ষ করাতে চাইছে যে ভারত-চীন বিরোধে পাকিস্তান একান্ত-ভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে এবং চীনের পক্ষে।

আমেরিকা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি কমিশন দাবী করেছেন যে, আণবিক যুগের তৃতীয় দশক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারমাণবিক 'রিএ্যাকটরে' স্বল্পমূল্যের বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। আণবিক শক্তি কমিশন এখন Breeder Reactor-এর উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিয়েছে। কারণ Breeder Reactor যে পরিমাণ জ্বালানী আত্মসাৎ করে, তৈরী করে তার চেয়ে অনেক বেশী। আর Convertor Reactor ঠিক তার উল্টো। তাতে জ্বালানী যা' তৈরী হয়, তার চেয়ে Reactor-এ প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। Breeder Reactor-এর উন্নতি এখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এর গঠন পদ্ধতিও সহজতর।

সারা আমেরিকায় এখন মাত্র একটি Breeder শ্রেণীর Reactor তৈরী হয়েছে মিচিগানে, ডেট্রয়েটের কাছে। সেখানে ১৯৬৩ সনের শেষাশেষি কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। কমিশন প্রদর্শনীর জন্য একটি Breeder R[illegible]r-এর নক্সা তৈরী করেছে, যা [illegible]য়ে সুষ্ঠুভাবে সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরীর কলাকৌশল অনায়াসে দেখানো যেতে পারবে। আগামী বারো বছরে আমেরিকায় বিশটি Reactor তৈরী করার পরিকল্পনা করেছে, তার ভেতর সরকারী সাহায্যে ব্যক্তি-মালিকানায় তৈরী হবে অর্ধেক। আর সরকারী মালিকানায় বাকী অর্ধেকের অধিকাংশই তৈরী হবে Breeder শ্রেণীর Reactor.

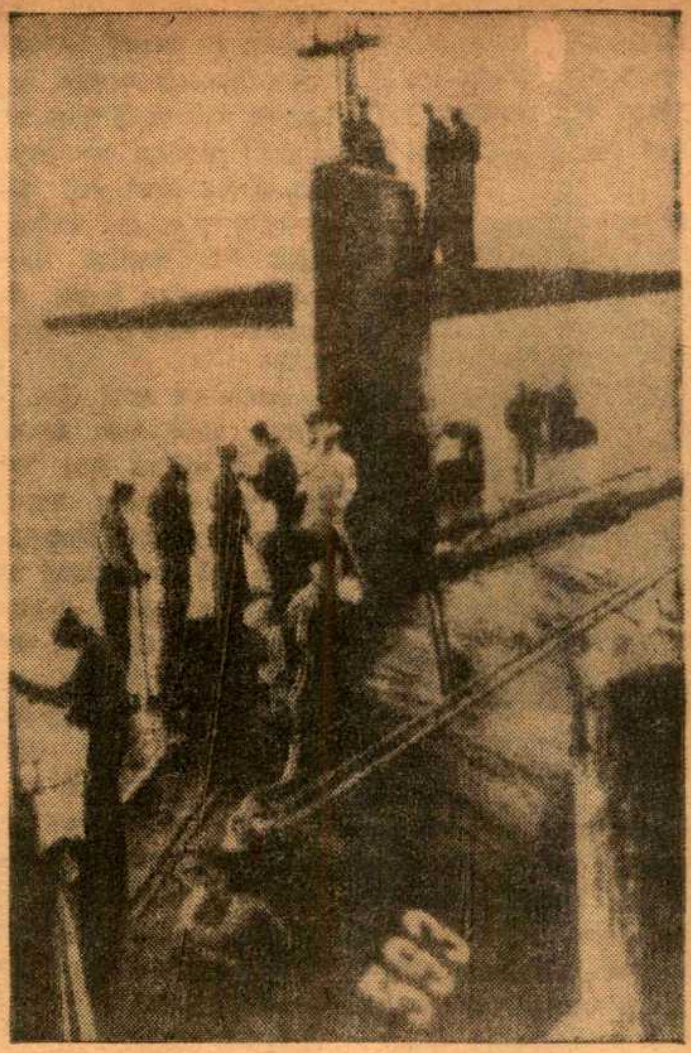

আণবিক শক্তিচালিত স্যাবমেরিণ "থ্রেসার" আটলান্টিক মহাসাগরে ১৩০ জন লোকসহ নিখোঁজ হইয়াছে।

এ পর্যন্ত আণবিক শক্তি কমিশন Reactor তৈরীতে খরচ করেছে ১২৫০ মিলিয়ন ডলার, আর ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পগোষ্ঠী খরচ করেছে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের দু'টো বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদক কারখানায় একটি, কনসলিডেটেড এডিসন রিএ্যাকটর (২৭৫,০০০ কিলোয়াট) নিউইয়র্কে আর অন্যটি, ড্রেসডেন নুক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন (২০৯,০০০ কিলোয়াট) ইলিনয়-এ। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মূলধনে তৈরী হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃহত্তম আণবিক কারখানা আমেরিকা এখন স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে ক্যালিফোর্ণিয়াতে, সেখানে কয়লা ও তেলের বিশেষ প্রাচুর্য নেই। এখানে ৩ লক্ষ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং তার দামও প্রতিযোগিতামূলক হবে বলেই এঁরা হিসাব করেছেন।

আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিণ 'থ্রেসারের' দুর্ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখনও তুমুল বিতর্ক চলেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুধাবনের চেষ্টা চলেছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে যান্ত্রিক গোলযোগ ও নির্ধারিত মাপের অধিক জলের নীচে অবতরণ এ দু'টো কারণকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এরকম দুর্ঘটনায় পুনরাবৃত্তি যেন না

হয় সেজন্য এর মধ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা চলেছে।

স্প্রাউল অবসারভেটরীর ডিরেক্টর ডঃ পিটর ভ্যান ডি ক্যাম্প দাবী করেছেন যে, সৌরজগতের বাইরে

কানাডার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী পিয়ারসন

তিনি একটি গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। গ্রহটিকে তিনি চাক্ষুষ করেন নি। কিন্তু তিনি জেনেছেন যে, পৃথিবী থেকে গ্রহটির দূরত্ব ছয় আলোকবর্ষ। গ্রহটি বার্নার্ডস্ স্টারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাই তিনি তার নাম দিয়েছেন বার্নার্ডস্ স্টার-বি। এই গ্রহটি বৃহস্পতির দেড়গুণ। আমেরিকান অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির এক অধিবেশনে ক্যাম্প এই তথ্য পরিবেশন করেন। সৌরজগৎ ছাড়াও আরও যে অগণ্য নক্ষত্র আছে, তাদের কেন্দ্র করে আরও বহু মণ্ডল যে বিশ্ব-জগতে রয়েছে ক্যাম্পের আবিষ্কার তাই সপ্রমাণ করবে।

অবশেষে আমেরিকার কাইজার স্টীল কর্পোরেশনও তাঁদের উৎপাদিত ইস্পাতজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। গত বৎসর মূল্যবৃদ্ধির যে সূত্রপাত হয় তাতে একমাত্র কাই-জার কর্পোরেশন ছাড়া আমেরিকার সব বড় ইস্পাত উৎপাদকেরাই মূল্য বাড়িয়েছিলেন। মূল্য না বাড়ানোর ফলে ১৯৬২-তে এই সংস্থাকে প্রায় ৫২ লক্ষ ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

কানাডা

কানাডার সাধারণ নির্বাচনের ফলে মোট ২৬৫টি আসনের মধ্যে লিবারেল পার্টি ১২৮টি আসন দখল করেছেন। রক্ষণশীল দল পেয়েছে ৯৬টি আসন। বাকী ৪১টি আসন পেয়েছে অন্যান্য পার্টিরা। সোসিয়াল ক্রেডিট পার্টি লিবারেল পার্টিকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মিঃ ডিফেনবেকার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন।

উদারনৈতিক দলের নেতা মিঃ পিয়ার্সন ১৯৪৮ সালে কানাডার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স যখন মিশর আক্রমণ করে তখন তিনি একটি ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন ও তাঁরই চেষ্টায় প্রথম রাষ্ট্রসংঘের একটি নিজস্ব সৈন্যদলের প্রস্তাব আলোচিত হয়। বিশ্বশান্তির জন্য চেষ্টার পুরস্কার হিসেবে ১৯৫৭ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি উদারনৈতিক দলের নেতা নির্বাচিত হন। মিঃ পিয়ার্সন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে বলেছেন যে, আমি প্রথম চেষ্টা করব সকলের বিশ্বাসভাজন হতে ও বহির্জগতে কানাডার সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

নিউ ইয়র্ক ঃ

১১৪ দিন ধর্মঘটের পর প্রথম যেদিন কাগজ বেরোয়, সেদিন নিউ ইয়র্কে একটা স্বস্তির ও আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় জনতা তাদের প্রিয় কাগজগুলি অধীর আগ্রহে পড়তে ব্যস্ত থাকে। একটি কাগজ প্রধান শিরোনামা দিয়ে লিখল : 'নিউইয়র্ক ইজ অ্যালাইভ এগেন', নিউইয়র্ক আবার বেঁচে উঠেছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' বেরোবার পর প্রথম রোববারে ৭০০-এরও বেশী পৃষ্ঠার কাগজ বের করে যেন এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির অভাব খানিকটা মেটাবার চেষ্টা করল। সেই সংখ্যার ওজন ছিল সাড়ে তিন সের!

নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনের এক ব্যঙ্গচিত্র দেখা গেল জনৈক

'এসো আমার বুকে'

নিউইয়র্কবাসী তাঁর প্রাণের 'টাইমস' কাগজকে বুকে ফিরে পেয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন।

চিলি ঃ

চিলিতে এক নূতন রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হচ্ছে—ক্রিশিয়ান ডেমোক্রাটস্। তাদের নেতা হচ্ছেন ক্রডোয়ার্ডো ফ্রে। তিনি সেন্টিয়াগো ক্যাথলিক ইউনিভারসিটির প্রফেসার। সম্প্রতি চিলিতে স্থানীয় নির্বাচনে (প্রায় ২০ লক্ষ লোক ভোট দিয়েছেন) এঁরাই সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন। আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে অনেকের ধারণা এঁরাই কৃতকার্য হবেন। শ্রী ফ্রে বলেন, "আমাদের পক্ষে তিনটি জিনিষ কাজ করছে—পুরাতন দলগুলির প্রতি জনসাধারণের বীতশ্রদ্ধা, দক্ষিণপন্থীদের প্রতি সন্দেহ ও কমিউনিষ্টদের প্রতি বিদ্বেষ।

রাশিয়া ঃ

ইটালীর কোন দৈনিকের মস্কোস্থিত সংবাদদাতার এক সংবাদকে কেন্দ্র করে ইউরোপে রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আসন্ন বলে একটি গুজব রটেছে। এ গুজব

অনুসারে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে নাকি অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ প্রধানত নাকি চীনের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য। এর প্রমাণ হিসাবে ক্রুশ্চেভের রাশিয়ার সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সংবাদ সত্য হোক বা না হোক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে এ কথা সত্যি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি এভটুসেঙ্কোর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কবিতা রাশিয়াতে সর্বজন আদৃত। তাঁকে রাশিয়ার সাহিত্যিক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করবার জন্য প্রস্তাব হয়েছে।

রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ ডঃ অনিকিনির এক বক্তৃতায় জানা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে হার মানান।

'সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আইন' কাগজের সম্পাদকের এক বক্তৃতায় জানা যায় যে, রাশিয়ায় আইন আদালতের সংস্কার শুরু হয়েছে। তিনি বলেন ষ্ট্যালিনের সময়ের অনেক আইন-এর এখন পরিবর্তন করা হচ্ছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে যে, বর্তমান আইনে বিচারক ও অভিযোগকারীদেরও ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তি দেওয়া সম্ভব—যা ষ্ট্যালিনের আমলে চলত না।

রাশিয়ার এক ধর্মযাজক বিশপ কেশরিণ বলেছেন যে, রাশিয়াতে কোন সময়েই ধর্ম প্রচার নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, যদিও সাম্যবাদ ও রাশিয়ার ধর্মযাজকদের মধ্যে ব্যবধান অনেক তবুও কেউ কারুর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না।

রোডেসিয়া ঃ

আফ্রিকান পিপল্‌স ইউনিয়নের নেতা রেঃ সিথোল আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর দেশের হয়ে সাহায্য চাইতে গেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ রোডেসিয়ায় বর্তমান সমস্যা মিটাবার দুটি পথ আছে—এক নিয়মতান্ত্রিক পথ ও দ্বিতীয় বিপ্লব। দক্ষিণ রোডেসিয়ার বর্তমান শাসকেরা নিয়মতান্ত্রিক পথে মীমাংসার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছেন কাজেই তাঁদের পক্ষে একমাত্র উন্মুক্ত রয়েছে বিপ্লবের পথ

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মত দক্ষিণ রোডেসিয়াতেও সামান্য দু'লক্ষ শ্বেতাঙ্গ তিনকোটি স্থানীয় লোকের উপর শাসন চালাচ্ছে—যেন দেশটা তাদের আর যারা আফ্রিকার অধিবাসী, তারা যেন নিজের দেশেও সর্বস্বত্বহীন।

ইয়েমেন ঃ

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইয়েমেনে গণতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধের অবসান হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী উভয়পক্ষের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যে কেবলমাত্র ইয়েমেনদেরই

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সুভাষা ফুমা

ক্ষতি সাধন করছিল তা নয়, আরব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বৃহত্তর সংঘাতেরও কারণ হয়ে উঠেছিল। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট ও তাঁর নিযুক্ত সালিশ ডঃ রালফ বুঁচের মধ্যস্থতায় বিষয়টার সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। অবশেষে গদীচ্যুত ইমাম এল-বদর ও তাঁর প্রধান সমর্থক সৌদি আরব ইয়েমেনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুঝেছেন যে, ইয়েমেনে রাজতন্ত্র আর প্রবর্তন করা যাবে না। তিনি সৌদি আরবে গিয়েই বসবাস করবেন। সৌদি আরবও স্বীকার করেছে যে, গণতন্ত্র বিরোধী কোন উপদলকে আর সে সামরিক সাহায্য দেবে না। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রও ইয়েমেন থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবেন। ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের কর্ণধাররা যদি মনে করেন যে, তাঁদের সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের প্রয়োজনে সামান্যসংখ্যক সামরিক কর্মচারীর সহায়তা আবশ্যক হবে,

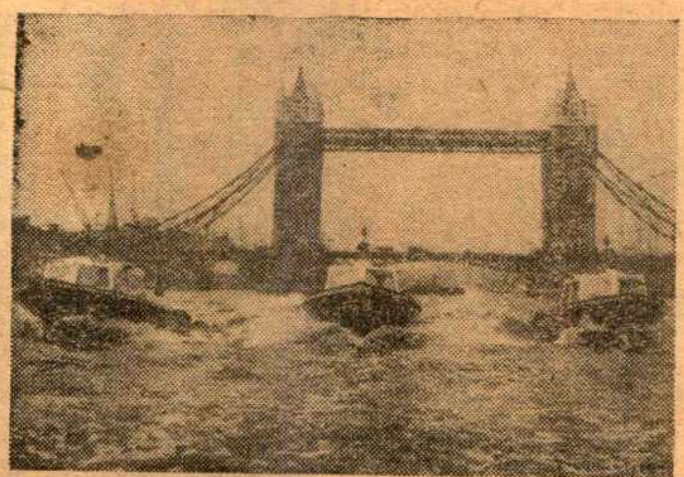

লণ্ডনের নদীবক্ষে পুনর্গঠনের জন্য দ্রুতগামী ও অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যের তিনটি লঞ্চ দেখা যাইতেছে।

তবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সে ক'জন অফিসার ইয়েমেনে রেখে দেবেন। সৌদি আরব, ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্র এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না। এই চুক্তি যাতে যথোচিতভাবে প্রতিপালিত হয় তা দেখবার জন্য জাতিসংঘের সৈন্যদল সীমান্ত পুলিশ হিসাবে কাজ করবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রমুখ রাজ্যগুলো এ ব্যবস্থা অনুমোদন করবেন। কিন্তু তাঁরা এ কথাও মনে করেন যে, এ ব্যবস্থার ফলে আপাতত যুদ্ধবিরতি হোল বটে, কিন্তু এতে ক'রে এই অঞ্চলের রাজনীতিক জটিলতার নিরসন হ'ল, এ ভাববার কোন কারণ নেই। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি যদি চুক্তির সর্ত আন্তরিকভাবে মেনে চলে তবেই স্থায়ী ফললাভ করা যাবে, নতুবা যে কোন অছিলায় আবার যুদ্ধ বেধে ওঠা বিচিত্র নয়।

লাওস ঃ

খবর পাওয়া গেছে যে, জার্স-এর সমতলভূমিতে প্যাথেট লাওসের দল এবং জেনারেল কঙ্‌লী পরিচালিত একদল নিউট্রালিষ্ট যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষে জনকুড়ি সৈন্য নিহত হয়েছেন, এবং জার্সের সমভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর জিয়েং সুয়ে নিরপেক্ষতাবাদীদের হস্তচ্যুত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রিন্স সুভান্না ফুমা ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এই কমিশনের সেন্টার দেশগুলি হল কানাডা, পোল্যাণ্ড এবং ভারত। এবং চেয়ারম্যান হল ভারতের শ্রীঅকৃতার সিং। লাওসে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ফোল সেনার হত্যা এবং জার্সের যুদ্ধ কোয়ালিশন সরকারের ভবিষ্যৎ বিঘ্নময় করে তুলবে। এর পেছনে যে কম্যুনিষ্ট চীনের হাত রয়েছে তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

আফগানিস্তান ঃ

আফগানিস্তানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ডঃ মহম্মদ ইউসুফ বলেন যে, আফগানিস্তানে এখন গণতন্ত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে ও রাজা জহির শা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শাসনতান্ত্রিক রাজ্য হিসাবে আফগানিস্তানে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর মতে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দেশের জনগণের শিক্ষার নিম্নমান।

ইন্দোনেশিয়া ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা সংস্থার ডিরেক্টর মিঃ ডেভিড বেল সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, ইন্দোনেশিয়াকে তাঁর সংস্থা সহায়তা করবে না। তিনি বলেছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি খুবই জটিল। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না এবং সেখানকার অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তাকে অর্থসাহায্য দিতে পারে না।

এদিকে প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো জোর গলায় ঘোষণা করেছেন যে, রাশিয়ার কাছ থেকে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র পাবেন এ কথা নিশ্চিত। তিনি কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্যের কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেছেন যে, চীনের রাষ্ট্রপতি মিঃ লি সু চী আর তিনি একই পথের পথিক।

স্তাভ্য পাহাড়ে লা ক্রুসাজ পার্বত্য রেলে চড়িবার প্ল্যাটফর্ম

রাজধানী :

চীনাদের হাত থেকে সদ্যোমুক্ত ১৪৪ জন ভারতীয় সৈন্য "ভারতমাতা কী জয়", "জয় হিন্দ" ধ্বনি করতে করতে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং নতজানু হয়ে মাতৃভূমির পূত মৃত্তিকা চুম্বন করে। প্রায় পাঁচ মাইল পথ হেঁটে এসে এরা কিবিতুতে প্রথম গরম চা ও চাপাটী খায়। তারা বলে যে গত পাঁচ মাসের মধ্যে এই প্রথম চিনি ও দুধ দিয়ে চা পান করল। তারা দেখতে হয়ে গেছে শীর্ণ, ক্লিষ্ট ও অবসন্ন। চীনারা কিন্তু বলেই চলেছে—ভারত-বন্দীরা তাদের কাছে নিজেদের দেশের থেকে অনেক যত্নে ছিল এবং চীন ছেড়ে আসবার সময় তারা নাকি অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি। (পিপলস ডেইলি—১১ই এপ্রিল)। নাৎসী জার্মানীর প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, "Repeat a lie, and it will become the truth." চীনের প্রচার বিভাগের কর্তারাও বোধ হয় এ উক্তিতে বিশ্বাস করেন।

চীন কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এশিয়ার সর্বত্র অসন্তোষ প্রকাশিত হচ্ছে এমন কি নিরপেক্ষ নেপাল ও ইন্দোনেশিয়াতেও এর প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে। নেপালের "স্বতন্ত্র সমাচারে" (৯ই এপ্রিল) লেখা হয়েছে যদিও চীন প্রথমে কলম্বো প্রস্তাব সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়েছিল ও ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছিল, কিন্তু এখন তারাই (চীনারাই) তাদের মুখোস খুলে সত্যাকারের রূপ প্রকাশ করেছে। চীনের কলম্বো প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত ভেল্কিবাজী ছাড় আর কিছুই নয়। ইন্দোনেশিয়ার বহুল প্রচারিত "দুতা মাসজারাকাট" (১১ই এপ্রিল) এক প্রবন্ধে ভারত-চীন যুদ্ধের উল্লেখ করে লিখেছে যে, এ বিবাদের মীমাংসার শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে উভয় দলের কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করা। যদিও ভারত তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে চীন এখনও গড়িমসি করছে

চীন-পাকিস্তান চুক্তি সম্বন্ধে 'নিউইয়র্ক পোষ্ট' এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তিতে নূতন এক সমস্যার সৃষ্টি

বুদ্ধগয়ার মন্দির

হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এই চুক্তি করে পাকিস্তান সিয়াটো ও সেনটোর দসস্ত হিসাবে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান নিজেদের মতলব ঢাকবার জন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যতই ব্যঙ্গ ও বিদ্রোপাত্মক করুক না কেন এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, চীনের কূটনীতির ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মিতালির সর্বপথ রুদ্ধ হয়েছে। কাশ্মীর গণভোট সম্বন্ধে পাকিস্তানের দাবীর উত্তরে উক্ত প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে, কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ বলেই তার ভবিষ্যৎ গণভোটে নির্ধারিত হবে

'বাল্টীমোর সান' পত্রিকার এক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, চীনের সঙ্গে সংগ্রামে তৎপরতার সঙ্গে সাহায্য করায় ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রতা প্রগাঢ় হয়েছে। চীনের আক্রমণের পরে ভারতের এক নূতন জাগরণ এসেছে বলে পাশ্চাত্য দেশীয় কাগজে যে উল্লেখ করা হয় তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চীনের আক্রমণে দেশে একটা আলোড়ন জেগেছে এ কথা সত্যি তবে তার মতে ভারতের জাগরণের সঙ্গে চীনা আক্রমণের কোন সম্পর্ক নাই। এ জাগরণ ঘটেছে ও ঘটছে মূলত আর্থিক যোজনা, সরকারের বিভিন্ন সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা ও শিক্ষার প্রসার থেকে। তিনি ভারতের জোটবহির্ভূত থাকার নীতিকে এ প্রসঙ্গে আবারও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন।

চীনাদের হাত হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় জওয়ানেরা

রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়েছে গুণী ব্যক্তিদের।

সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' লাভের গৌরব অর্জন করেন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এবং সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ পাণ্ডুরঙ্গ কামন কানে।

এ ছাড়াও যে তিনজন 'পদ্মবিভূষণ' লাভ করেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত ভায়াচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'পদ্মভূষণ' লাভ করেছেন ন'জন। এবং ১৯ জন 'পদ্মশ্রী'র মধ্যে আছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবীণ নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীপূর্ণেন্দু কুমার ব্যানার্জী।

কংগ্রেস সেমিনার ঃ

এ আই সি সি অধিবেশনের ঠিক পূর্বে দিল্লীতে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ও সারবান অনেক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রধানত কংগ্রেস দলের ও কংগ্রেস শাসনের দুর্বলতা ও তার প্রতিকারের পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়। এ বৈঠকের উদ্বোধন-ভাষণে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস কর্মীদের সমাজতন্ত্রের উপর আস্থা রাখতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'সমাজতন্ত্রের উপর যদি কর্মীদের আস্থা কমে যায়, তাহ'লে কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের লোকদের শেষগ্রন্থিও টুটে যাবে। ভারতবর্ষে আমরা সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক বক্তৃতা করি, কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্রের পথে চলি ধীরে ধীরে।' তিনি আরও বলেন, 'তিনটি যোজনায় দেশের লোকের সুযোগ সুবিধা অনেক বেড়ে গেলেও তাতে ধনীরাই বেশী উপকৃত হয়েছে। দীনদরিদ্র যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। আজকে দেশে এরকম অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বিভিন্ন যোজনার প্রাচুর্য গিয়ে মোটে পৌঁছায়ই নি। আর্থিক অগ্রগতি তাদেরই হয়েছে যারা স্বচ্ছলতার জন্য তার সুযোগ ও সুবিধা নিতে পেরেছে। তিনি আরও বলেন যে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি যদিও সাম্য, তবু তা আয়ত্ত করতে গিয়ে যাদের আছে তাদিকে যাদের নেই তাদের মতন দুর্বল করা উচিৎ নয়। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন এজন্য যে সেটাই আর্থিক উন্নতির সবচেয়ে কার্যকরী পথ।

পদ্মশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত (বাম হইতে দক্ষিণে) শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার ব্যানার্জী। সর্ববামে 'পদ্মশ্রী'র প্রতীক

একটি প্রবন্ধে দুঃখ করা হয় যে, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসকর্মীদের নির্বাচনে জয়লাভটাই প্রথম এবং প্রধান এবং একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদিকে সমাজতন্ত্রের সত্যিকারের

রূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না।

প্রবন্ধটিতে আরও বলা হয় যে, উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করবার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের দু'ভাগে বিভক্ত করা উচিৎ। যথা—যাঁরা স্থানীয় ও বিধান সভার প্রতিনিধিত্ব করেন, ও সারা দেশে প্রচারকার্য করতেন।

ডঃ জাকির হোসেন

লোকসভার সভ্য শ্রীঅমরনাথ বিদ্যালঙ্কার একটি প্রবন্ধে দুঃখ করেন যে, উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হবার সুযোগ না পেয়ে অনেক কর্মী রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছে। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে কংগ্রেসের শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা কমে যাচ্ছে।

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শাসকদের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান এবং সরকারী চাকুরেদের মধ্যে অসাধুতা সম্বন্ধে শ্রীনন্দ একটি প্রবন্ধে বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা যে ভাবে বর্ধিত হয়েছে তাতে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করবার পুরাতন আইন-কানুন এখন আর কার্যকরী নয়। তিনি বলেন যে, এখন এমন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যাতে নাগরিকদের অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়।

'পদ্মবিভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত—উপরে শ্রী এইচ, ভি, পটাসকর। নীচে (বাম হইতে দক্ষিণে) ডঃ এ, এল মুদালিয়ার ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপরে বামে 'পদ্মবিভূষণ' পুরস্কারের প্রতীক।

লোকসভার অন্যতম সদস্য শ্রীভাগবৎপ্রসাদ ঝা একটি সারবান প্রবন্ধে বলেন যে, বর্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে তিনটি। যথা—

১) ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তার অভাব
২) বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও
৩) দুর্নীতি।

তিনি বলেন যে এপেলবী রিপোর্টে বিশেষজ্ঞদের উপর শাসনক্ষমতা দেবার যে সুপারিশ করা হয়েছিল তা তো কার্যকরী হয়ই নি, পরন্তু শাসকেরাই বিশেষজ্ঞ হয়ে বসে আছে। কিন্তু এর থেকেও বিপজ্জনক হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এর প্রতিকারের জন্য তাঁর মতে প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের কার্যে উৎসাহ বাড়ান। আর তা করতে হ'লে কার্যকালের মেয়াদ থেকেও (seniority) কার্যক্ষমতা (efficiency) উন্নতির মানদণ্ড করা উচিৎ এবং আরও প্রয়োজন সরকারী কার্যে জনসাধারণের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

সংস্কৃত পণ্ডিত—(বাম হইতে দক্ষিণে) শ্রীহরি দামোদর বেলাঙ্কর, শ্রীঅগ্নিহোত্রম থাথাদেসিগা থাথাচারিয়ার ও পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু

টাস সংসদ পরিষদের এক সংবাদে জানা যায় যে, ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্য ১৯৬৫ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বেড়ে যাবে—

পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬৫-২৭৫ মিলিয়ন ডলার। কলকারখানার ভিন্ন সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে লোহা ও তেল থেকে তৈরী জিনিষপত্র যা ভারতের কারখানা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করবে।

শ্রীজওহরলাল নেহরু

ভারতে মিগ বিমান নির্মাণের জন্য সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের এক চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতে অস্ত্রসজ্জা ও ক্ষেপণাস্ত্র সমেত সমগ্র বিমান নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে ১৮ মাস থেকে ২ বৎসরের মধ্যে ভারতে এ ধরণের এরোপ্লেন তৈরী সম্ভব হবে।

গত ১৩ই এপ্রিল লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৫ সালের পরও ইংরেজী ভাষা চালু রাখার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলের সংক্ষিপ্ত বিধান ১৯৬৫ সালের পর আরও ১০ বৎসর ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসাবে চালু থাকবে। তারপরে ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এক কমিটীতে হিন্দীর বিস্তার সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হবে। এ বিলের প্রতিবাদে উগ্র হিন্দী সমর্থনকারীরা লোকসভায় তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি করেন এবং ফলে ৩ জন সভ্যকে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। উগ্র হিন্দী-পন্থীদের এ বিল প্রসঙ্গে উন্মত্তের মত আচরণে অহিন্দী-ভাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। মিঃ এন্টনী এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে আকারে বিলটি পার্লামেন্টে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে অহিন্দীভাষীদের প্রতি (যারা সংখ্যা-গুরু) ঘোর অবিচার করা হয়েছে এবং প্রধান মন্ত্রী ও ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থজী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খিলাপ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই কেরোসিনের উপর কর ভার আংশিক কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত লোকসভায় ঘোষণা করেছেন।

আসাম ঃ

নাগা বিদ্রোহীরা আবার মাথা উঁচু করে উঠেছে। আসামের লামডিং ও মরিয়ানী জংশনের মধ্যে পথে যাত্রিবাহী একটি ট্রেনগাড়ী লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ছোঁড়া হয় ও মেসিনগান থেকে গুলী ছোঁড়ার ফলে ৭ জন যাত্রী আহত হয়। নাগা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। এবং এ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বিমান থেকে তাদের লুক্কায়িত ঘাঁটী লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয়। রেলমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং আসামে উপদ্রুত অঞ্চলে পরিদর্শন করে প্রত্যেক গাড়ীতে রক্ষী মোতায়েন ও উপদ্রুত অঞ্চলে রেল-লাইন বরাবর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার নির্দেশ দেন। নাগাদের এ আক্রমণের পেছনে বিদেশীদের হাত আছে বলে অনেকে অনুমান করছেন।

ধবড়ীতে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় নিহত হয়েছে ৬২ জন এবং আহত হয়েছে ৫০০ জন।

উড়িষ্যা ঃ

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের বেকার স্বর্ণ-শিল্পী যুবক শ্রীআদামিক বৈরা আচারী আত্মাহুতি দিয়েছেন সালফিউরিক এসিড পান করে।

বেশ কিছুদিন ধরে প্রায় অনাহারেই দিন কাটছিল, শুক্রবার এসিড দিয়ে সমস্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছেন।

মহারাষ্ট্র ঃ

ডঃ পি, ডি, কানেকে এ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার 'ভারত রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ডাঃ কানের লিখিত "History of the Dharma Shastra" হিন্দু ধর্ম বিষয়ে প্রামাণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষার এ মহান পণ্ডিত পুরাকালের ঋষিদের মত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন। তাঁর জীবনের আকাঙ্খা ছিল শিক্ষক হবার কিন্তু অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে চাকুরী ত্যাগ করেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে এ প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখে তিনি এ যুগের শাস্ত্রকার হয়েছেন অর্থাৎ তাঁর জীবনের যে আদর্শ সেই সত্যিকারের শিক্ষক হয়েছেন। দেশ-বাসীর প্রার্থনা ৺ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

গুজরাট ঃ

ভীরবালে ইণ্ডিয়ান রেয়ান কর্পোরেশন লিঃ-এর নবনির্মিত কারখানার উদ্বোধন করবার সময় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত শ্রীগলব্রেথ ঘোষণা করেন যে, কারখানাটি আরও প্রসারিত করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক দু'কোটি টাকার আর্থিক ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

গলব্রেথ

উত্তর প্রদেশ ঃ

যুক্ত প্রদেশের উপনির্বাচনে কংগ্রেস তরফ থেকে শ্রীযুক্ত কৃপালনীর বিরোধিতা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। খুব সম্ভবত শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে

কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে মনোনীত করান হবে।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন

বিহার ঃ

বিহারের কোশী নদীর উপর অবশেষে বাঁধ নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে বাঁধটীর দৈর্ঘ ৩৭৭০ ফিট এবং ভারতে এইটেই বৃহত্তম বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণ করতে মোট ৪৫ কোটী টাকা খরচ হয়েছে। ১৫১ মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ হওয়ায় এবার কোশী নদীর তীর বরাবর গ্রামাঞ্চল বাৎসরিক প্লাবনের বিপদ থেকে রেহাই পাবে আশা করা যায়।

মজঃফরপুর উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছে।

মহীশূর ঃ

সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যে চাষীদের শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রটি উদ্বোধন করবার সময় জার্মান রাষ্ট্রদূত এক ভাষণে বলেন যে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কৃষকদের সহযোগিতা ভিন্ন শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানীতে যদিও কৃষকদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ১৪জন তবুও দেশের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিদ্রব্য তারা উৎপাদন করে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

গত সোমবার চিত্রকলা শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের ৭৭তম জন্মদিবস তাঁর বাসভবনে এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অন্য অনেকের সঙ্গে সর্বশ্রী উদয়শঙ্কর, মেয়র চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী ও লেডী রাণু মুখার্জী এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় বলেন, "জীবিকার সঙ্গে আপন মতবাদের সমন্বয়সাধনই জীবনকে সার্থকতা দেয়"। দেশবাসীর প্রার্থনা তিনি শতায়ুঃ হোন।

একটি বাঙ্গলা রেজিমেন্ট গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধ গৃহীত হয় নাই।

'পদ্মবিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত স্বর্গত পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন

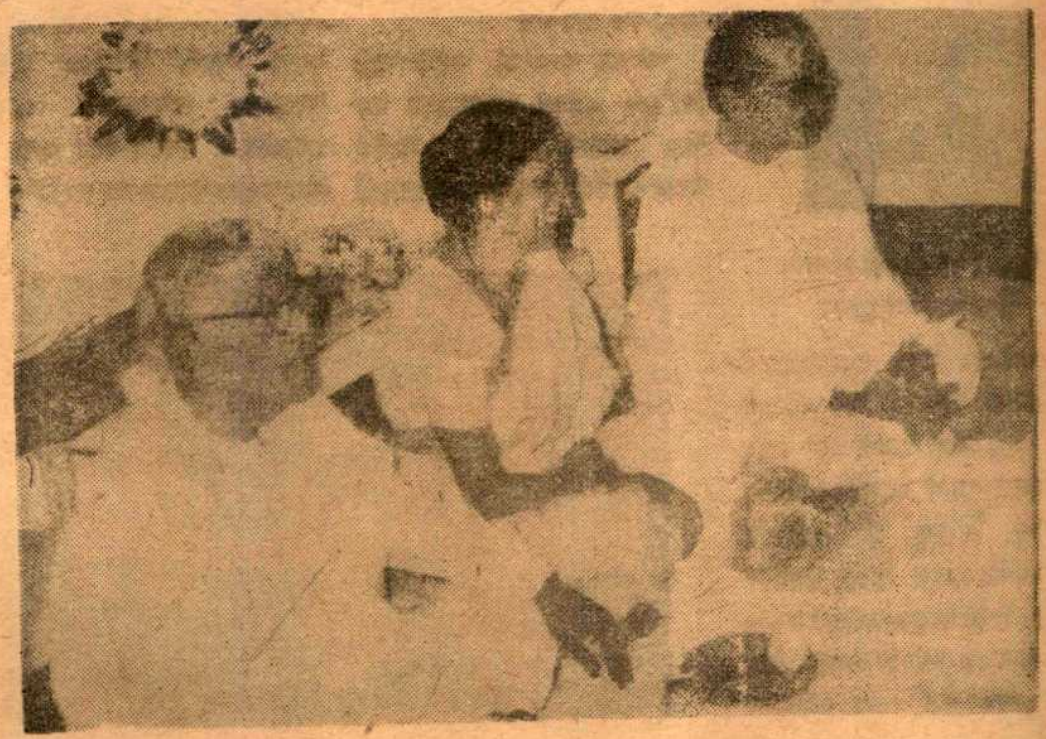

শিল্পী যামিনী রায়ের জন্মদিনে তাঁহার বাসভবনে যামিনী রায়, লেডী রাণু মুখার্জী ও উদয়শঙ্কর

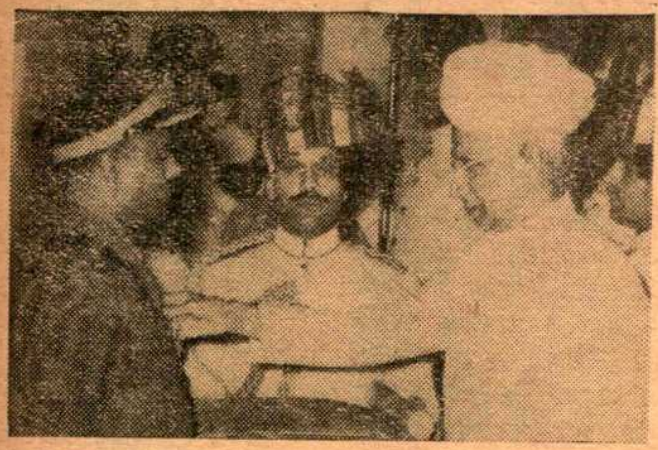

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ব্রিগেডিয়ার কে, এ, এস, রাজাকে প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা মেডেল অর্পণ করিতেছেন

লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, জাতিগতভাবে সৈন্যদের বিভিন্ন দলের নাম রাখার রীতিতে উৎসাহ দান করা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নয়

আরবী পণ্ডিত ডাঃ মহম্মদ নিজামুদ্দীন ফারদৌস

মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের জীবনাবসান হয়েছে। গত রবিবার দার্জিলিং-এ ইডেন হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল সিংহল ও রাশিয়ার লেলিনগ্রাডে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার ১২৫ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গত ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সোনার গহনা সম্পর্কে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী এক রুল জারি করেছেন। আবেদনকারীর বক্তব্য যে ভারতরক্ষা আইন এবং/অথবা স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সোনার গহনা সম্পর্কে আইন জারী করা যায় না।

শনিবার কলকাতা থেকে স্বর্ণ-শিল্পীদের ষাটজন স্বেচ্ছাসেবক পদ যাত্রা করলেন। কাঁথির পথে। আসন্ন রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আসছেন কাঁথিতে। স্বর্ণ-শিল্পীদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্বেচ্ছাসেবকরা দাবী পেশ করবেন।

শুক্রবার রাত্রে উত্তরবঙ্গের তুফানগঞ্জে ঘূর্ণিবাত্যায় প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। সরকারী খবরে মৃতের সংখ্যা ২৬ কিন্তু বেসরকারী খবরে ৫০ জন। আর গৃহহীন হয়েছে প্রায় দশ হাজার লোক। বহু সম্পত্তি, গবাদি পশুও বিনষ্ট হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত শনিবার কলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় জনজাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি এ বৎসর 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সর্বজনবরেণ্য শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এ সম্মানে তাঁর দেশবাসী সন্তোষ লাভ করেছে বলা বাহুল্য।

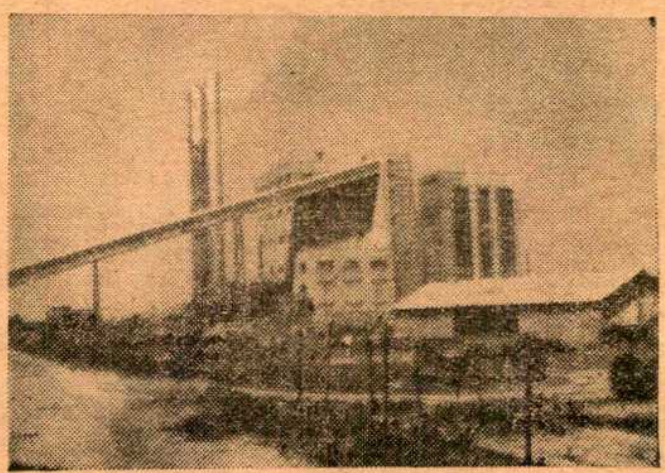

দারোণী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

ধরা পড়ত না লোকটা, তাড়াতাড়ি ক'রে রাস্তা পেরোতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। বাস-ষ্টপে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যে বাসটা এখনি ছাড়বে, তাতে যাত্রীরা উঠছে, বসছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন নয়, মফঃস্বলে যাবার বে-সরকারী বাস। ভারতমাতার সুসন্তান-দের ছবি, নদী-নৌকা ও তালগাছের দৃশ্য, নানারকম আপ্তবাক্য বাসের সিলিং-এ শোভা পাচ্ছে। কণ্ডাকটর নিচে দাঁড়িয়ে বাসের গা চাপড়ে যাত্রীদের ডাকে। আটাকলের শব্দ, ধূলো, নেড়ী-কুকুরের বচসা। বাসের ভিতর উঠে হরেক রকম জিনিষ ফেরি করে, ভিখিরী ভিক্ষে চায়, জুতোপালিশ ছোকরা। ও লোকটা ভিক্ষে চাইতেই উঠেছিল।

বুড়োমানুষ, তায় ভদ্র পোষাক-আশাক। ওকে খোঁড়া জেনে সবাই সাধ্যমত দিয়েছিল। বাস ছাড়বার সময় হতে লোকটি তাড়াতাড়ি নেমে

দিয়ে বলল, 'বাঁচান বাবুমশাই, আমায় বাঁচান। আমি মিথ্যে কথা বলিনি।' দু'খানা হাত তুলে সে চেঁচাতে থাকল, 'বাঁচান, আমায় আপনারা বাঁচান।'

বৈঠকখানায় আর বসে থাকা গেল না। বেরিয়ে এলেন সদানন্দ। ভারী গলায় বললেন—হচ্ছে কি? মানুষটাকে মেরে ফেলবে নাকি?'

যারা তাঁকে চেনেন, তারা নানারকম মন্তব্য করল। যারা চেনে তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'গত রোববারে এসেছিল লোকটা, আবার এ রোববারেও। লোকটা চীট!'

'তোমরাও ত' চীট করেছ ওকে। পিটতে কসুর করনি।' একটু হেসে নিয়েই ভুরু কুঁচকোলেন। বললেন—'যা হয়েছে হয়েছে, ছেড়ে দাও। খুব শিক্ষা হ'য়ে গেল ওর, আর এদিকে আসবে না।'

লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে একজন দু'জন করে সরতে থাকে, ভিড় পাতলা

সদানন্দ পা দুটি তুলে বসেন। বলেন, 'তা কি আমি বুঝিনা? আগেই চিনেছি ওকে যখন বাস থেকে নেমে এদিকে আসছে, তখন মুখ দেখেই মনে পড়েছে লোকটাকে ঠিক একই ফিকিরে আলিপুরে ঘুরতে ফিরতে দেখেছি।'

'তবে ওকে বাঁচাতে গেলে কেন?'

'বাঁচাতে গেলাম কেন?' চশমা খুললেন সদানন্দ, চোখদুটো কেমন ঘোলা আর দৃষ্টিশূন্য দেখাল। মুখের ভাপ দিয়ে কাঁচটা পরিষ্কার ক'রে আবার চশমাটা গলিয়ে নিলেন নাকে। বললেন, 'কি জান, মনটা কেমন যেন হ'য়ে যায়। এই সব ছোটখাট ঠক্‌দের দেখলে পরে ...'

'ঠক্‌দের বিষয়ে দুর্বলতা।'

'হাসতে চাও, হাস। কিন্তু ভেবে দেখ ঠক্‌জোচ্চোর ধরা পড়লে আমরা এত ক্ষিপ্ত হই কেন?'

'বাঃ, একটা ঠক্।'

'হ্যাঁ, আসলে মানুষ ঠকে যেতে

প্রতারক

সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য

রাস্তা পেরোতে যায়। ক্রাচটি পড়ে গিয়েছিল,—সেটি তুলে নিল। তখন দেখা গেল, না লোকটি বেশ দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।

তারপরই জমল ভিড়। মানুষ আজকাল সহজেই চটে, একটুতেই ধৈর্য হারায়। করুণায় গলতে যদি বা সময় নেয়, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে এতটুকু দেরী হয় না। সবাই ঘিরে ধরল তাকে। যতটা খোঁড়া মনে করা গিয়েছিল, তা ত' নয়। ক্রাচ ছাড়া একেবারে চলতে পারে না—তাও মনে হচ্ছে না। এ কথার জবাবে ও কথা। লোকটির মুখে কথা নেই, মার খেয়েও উঃ আঃ করে না। যারা পয়সা দিয়েছিল, তারা ত' মারবেই, ন্যায্য অধিকার আছে। যারা দেয়নি, তারাও মারতে চায়। কিন্তু একটু মারতে না মারতেই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকল, হো হো ক'রে কেঁদে উঠল লোকটি। হাত দুটো বাড়িয়ে

চায় না। বোকা বনতে চায় না। অথচ, যদি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার কর—ও লোকটা মানুষকে বড় রকম কোন প্রবঞ্চনা করছে না। বড় জোর চারআনা, ছ'আনা—এক একটাকা।'

বন্ধু দু'টির মনে পড়ল পথের ধূলো থেকে লোকটি পয়সা কুড়োচ্ছিল। এক নয়াপয়সা, দু' নয়াপয়সা।

'নয়া পয়সার যুগে ওদের অসুবিধে বেড়েছে বই কমেনি। এক নয়াপয়সা দিতে যাদের বাধে তারা দু' নয়া পয়সা দেয়। অর্থাৎ আগেকার দিনের একপয়সা। অথচ লোকটার জামা কাপড় তেমন ময়লা নয়, কথাবার্তাতেও মনে হয় ভদ্দরলোক। আগেকার দিন হ'লে এমন লোকটিকে একটি আনি দিতে হ'ত।'

'হ্যাঁ, সকলকে হাতে তুলে এক পয়সা দেওয়া যায় না। তারচেয়ে ঠকা না দেওয়া ভাল।'

'তা হ'লে তুমি আমার কথাটা মেনে নিলে?' সদানন্দ হাসলেন। একটা পেনসিল তুলে নিলেন তিনি, ছুরি দিয়ে কাটতে থাকলেন। কথা কইতে কইতে পেনসিল কাটা তাঁর অনেকদিনের অভ্যেস। দশ-বারোটা পেনসিল, গোটা দুই ভাল ছুরি তাঁর সামনে থাকে। শিসটা ধীরে ধীরে চেঁছে সরু ক'রে তোলেন সদানন্দ, গোল ও মসৃণ করেন পেনসিলের মাথাটা। দেখলে মনে হয় কোন কথাই কানে যাচ্ছে না ওঁর। মক্কেলরা জানে সব কথা শুনছেন উনি। একটুও শিথিল করেননি মনোযোগ।

পেনসিলের গা চাঁছতে চাঁছতে বললেন, 'তা হ'লে বুঝে দেখ লোকটি তেমন টাকা পয়সা পায় না। তা ছাড়া আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরতে হয় ওকে, খরচে পোষায় কি?'

'বলেছ ভাল।'

'যত মন্দই হোক, একটা পেশা ত'। তা পড়তা থাকছে কত দেখতে হবে না?'

'একটা চীট!'

'হ্যাঁ—চীট। কিন্তু ওদের কাছে আমরা ঠকি না। হতভাগা অবস্থা, দীনহীন চেহারা চোখে দেখলেই আমরা সজাগ হ'য়ে যাই। ওদের দেখলে মন্দ মনে হয় কি না, তাই সতর্ক থাকি খুব। কিন্তু আসল কথাটা শোন। এ রকম লোকেদের সম্পর্কে··· আহা, ঘটনাটা শুনতে হয়।'

'বলই না!

'অনেকদিনের কথা। তখন দশ বছর হ'ল কেটে বেরুচ্ছি। কালীঘাটেই থাকি পৈতৃক বাড়ীতে। একদিন আমার ভায়ের বন্ধু নলিন এল। এসে নানারকম দুঃখের কথা বললে। বাপ মারা যেতে দুঃখের শেষ নেই। ভাই দুটো ছোট। বোন অবিবাহিত। ওদের বাড়ী সম্পর্কে এত কথা আমি এই প্রথম শুনলুম। আগে আসত যেত, মোহিতের বন্ধু। কোথায় বাড়ী, কি বৃত্তান্ত অত কথা জানি না। আগে খুব বাবুয়ানি ছিল দেখতুম। এখন দেখি মাথায় টাক, চোখের নিচে কালি, তবে জামাকাপড়ের পাটটি ঠিক আছে। আমার বাড়ীতে আসতে যেতে থাকল। শুধু বাইরে নয়, অন্দরেও জমিয়ে নিল। মোহিত কোথায় চাকুরী নিয়ে চলে গেছে। আমার স্ত্রী-র ত' বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। নলিন এসে ওঁর বেশ ভাল হ'ল। দোকানপাট, হাটবাজার, ছেলেপিলের সাতসতেরো ঝামেলা সামলায় নলিন। মাঝে মাঝে ওকে পথে-ও দেখি। সেকেণ্ডক্লাস ট্রামে বসে আছে। সাদা সাট, খাকী প্যাণ্ট। বগলে একটা প্যাকেট। কোন একটা কোম্পানীর হয়ে নাকি তেল, সাবান, স্নো দিয়ে বেড়ায় দোকানে দোকানে।

বাড়ী এসে শুনি ছেলেদের জন্যে লজেন্স এনেছে নলিন, আমার স্ত্রীর

সুন্দর প্রকাশনের সুন্দরতম নিবেদন

নেতাজীর একান্ত সহকর্মী—

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত:

"নেতাজি: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ"

বহু তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত

এবং

দেশবন্ধু সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর

আশীর্বাণী সম্বলিত

প্রথম খণ্ড—দাম বারো টাকা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ:

ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ প্রস্তুতির পথে

আমাদের কয়েকখানি অসামান্য বই:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব) মূল্য—৫৲

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

ললিত বিভাস মূল্য—১০৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের—

নারী ও নগরী মূল্য—৫৲

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

হা মানালে গো মূল্য—৩৲

বিশ্বনাথ রায়ের—

নতুন দিনের আলো মূল্য—২·৫০

সুন্দর প্রকাশন

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

জন্যে ভাল একটা টেবিলঢাকা! আমি বিরক্ত হয়ে বলি, শুনতে পাও ওর বাড়ীতে প্রত্যহ হাঁড়ি চড়ে না। ওর কাছ থেকে নাও কেন এ সব? আসলে নলিনেরও কতকগুলো আলগা খরচের অভ্যেস আছে।

স্ত্রী বলেন সে কথা বল'না। না নিলে বড় দুঃখ পায়। তবু ত' টেবিল-ঢাকার, দাম আমি দিয়ে দিয়েছি। সত্যিই অবস্থা বড় খারাপ ওর। দেখ না, ফস। জামা পরবার অভ্যেস, তা নিজেই কেচেকুচে নেয়। আবার কেমন আত্মসম্মান দেখ না, একটি টাকা অবধি ধার নেয় না কোনদিন।

আমারও, বলতে নেই ছেলেটার দিকে মনটা অজানতে বেশ ঝুঁকছিল। এমন কথাও মনে হচ্ছিল ম্যাট্রিকের পর আর পড়েনি, বলতে গেলে মূর্খ। নইলে কাজ আমি ওকে নির্ঘাৎ জুটিয়ে দিতুম।

এই সময় একদিন একটা কাণ্ড হ'ল।

তখন সুনীলবাবুর কাছে যাই সন্ধ্যে বেলা। স্নেহ করেন, তায় অতবড় উকিল। মাঝে মাঝে কনসাল-টেশান-এ বসি। ফিরতে রাত হ'য়ে যায়।

আমাদের কালীঘাটের বাড়ীর সামনেটা এখন ঘিঞ্জী হ'য়ে গেছে। আগে একটা পুকুর ছিল ওখানে। সাহিসরা ঘোড়া নাওয়াতে আসত, ঝি-রা ক্ষার কাচতে যেত। তারই পশ্চিমে পতু ভট্‌চাজের একখানা বাড়ী ছিল। আমরা বলতুম ব্যারাকবাড়ী। কোন ছিরিছাঁদ নেই, সার সার ঘর আর টানা বারান্দা। ক'ঘর ভাড়াটে থাকে। রাতে ও বাড়ীটার সামনে দিয়ে ফিরি।

সেদিন সকাল হ'তে রাজকেষ্ট হন্তদন্ত হ'য়ে এসে উপস্থিত। রাজকেষ্ট পতু ভট্‌চাজের ভাগ্নে। ও বাড়ীর ভাড়া আদায় করে, ওখানেই থাকে। মায়ের মন্দিরের সামনে ওর ডালার দোকান। ওখানেই অন্ন-প্রসাদ পায়। মাঝে মাঝে যাত্রীরা [illegible] করে থাকে। মন্দির দর্শন করায়, যা বিদায় পায়, বেশ চলে যায়। দোকানে ও বসে বিশ দিন, ওর ভাই বসে দশ দিন। রাজকেষ্ট ছেলেটা বড় ভাল।

আমায় বলে কি—কাকা মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। কাল রাতে ফিরে দেখি আমার দোরগোড়ায় এক মহিলা বসে আছেন। বলে কে নাকি ওঁকে বলেছে, ঐ রাজকেষ্ট চাটুজ্যের কাছে গেলে আশ্রয় পাবে।

বললাম প্রার্থী-টার্থী হবে।

রাজকেষ্ট বলে, তা নয়। ভদ্র লোকের বিধবা ব'লেই মনে হয়।

আমি শুধোলাম,—কি চান?

রাজকেষ্ট বলে, একজন উকিলের পরামর্শ দরকার।

কেন?

মামলা করতে চান।

মামলা করতে চান ত' তোমার মুরুব্বি পাকড়ালেন কি ক'রে?

জিভকেটে মাথাচুলকে রাজকেষ্ট বলে—মুরুব্বি নয় ঠিক। কলকাতা তেমন কিছু জানেন চেনেন না

মুখই
সৌন্দর্য্যের প্রকাশ

সুন্দর মুখের অধিকারিণী হলেই হাজার জনতার মধ্যে থাকলেও আপনার রূপলাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
বিউলাক্স বিউটি ক্রীম শুধু যে মুখটিকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, ত্বকের যে কোন দাগ নিশ্চিহ্ন করে তাতে উজ্জ্বল মাধুরিমা এনে দেয়।
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক (ডি. এস.সি. এবং ডি. ফিল) এর আবিষ্কৃত বিউটলাক্স বিউটি ক্রীম মৃদুগন্ধযুক্ত এবং লানোলিন ও ক্যালামিন সহযোগে তৈরী একটি অনুপম প্রসাধন সামগ্রী।

শংকর ইণ্ডাষ্ট্রীজ,
৭৯বি, বাঙ্কারাম অক্রূর লেন,
কলিকাতা-১২

পরিবেশক ঃ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড ট্রেডার্স
১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, (দ্বিতল) কলিকাতা-১

আমার ছেটখরটা ত' পড়েই আছে। থাকবেন পড়ে এককোণে। যাত্রীরা আসে যায়, অসুবিধে ত' নেই।

আমি খানিকটা গায়ে প'ড়ে উপদেশ দিলাম। চেনা নেই, জানা নেই, ওঁকে ঘরে তোলা ঠিক নয়।

রাজকেষ্ট হাসে বোকার মত। বলে, স্ক্যাংটার নেই বটপাড়ের ভয়। বুড়োমানুষ একপাশে পড়ে থাকবেন, দুটো আতপ চাল ফুটিয়ে খাবেন। আমার ভাবনা কি কাকা?

সন্ধ্যেবেলা নিয়ে এল মহিলাকে। দেখেই যেন আমার কেমন কেমন লাগল। অতি দীনহীন অবস্থা জামাকাপড়ের, তবু কাপড়টা দামী, গায়ে জামা, পায়ে চটি। কত বয়স হ'য়েছে তা ধরা মুস্কিল। মুখ দেখে মনে হয় একসময়ে চেহারা ভালই ছিল। খুব একটা প্রার্থী প্রার্থী ভাব নেই মুখে চোখে। দুঃখে মলিন, তবু বেশ আত্মমর্যাদার ভাব আছে।

মনটা আমার ভারী বিরূপ হ'ল। কোর্টে কত রকম লোক দেখি দু'বেলা। ও বয়স বল, চেহারা বল, ওসব দেখে সব সময়ে বোঝা যায় না।

খুব চোটপাট ক'রে জেরা করি। মহিলা একটু অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন—আমি এ ছেলেটির ওপর জুলুম করতে চাই না। একগাছা হার বের করেন জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে। পাকাসোনার হার বলেই মনে হ'ল, দু'-আড়াই ভরি ওজন। বলেন—এটা বেচে আমায় ক'টা টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিন। সে হার দেখে আমার আরো সন্দেহ হয়। বলি, এ হার আপনি পেলেন কোথায়?

উনি আস্তে আস্তে বললেন—এমন হার দিয়ে আমি একসময়ে লোক-লৌকিকতা করেছি বাবা। আমার কথাটা শুনুন—

মস্ত একটা গল্প ফেঁদে বসলেন। আসামের চা-বাগানে কণ্ট্রাকটর ছিলেন স্বামী। তিনটি মেয়ে আছে, সময়ে বিয়ে হয়েছে। এই কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ী ওদের। বিধবা হয়েছেন আট বছর হ'ল। বিধবা হবার দু'বছর আগে একটি ছেলে হয়। ছেলে হ'তে মেয়ে-জামাইরা খুশী হয়নি। স্বামী সব বুঝলেন। মৃত্যুর আগে জানিয়ে গেলেন—স্ত্রীর নামে খিদিরপুরে একটি বাড়ী কেনা আছে, জলপ ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্কে কিছু টাকা।

টাকা যতদিন হাতে ছিল, মেয়েরা খোঁজখবর নিয়েছে। কিছু কিছু টাকা মাকে বোকা বুঝিয়ে বের করেও নিয়েছে। শেষে বড়জামাই বুদ্ধি দেয় তার নামে ওকালতনামা দিলে কলকাতার বাড়ীতে ভাড়াটে বসিয়ে দেবে, মাসে মাসে টাকা যাবে শাশুড়ীর কাছে। বললে, মফঃস্বলেই থাকুন। কলকাতায় খরচ অনেক বেশী। দিলেন লিখে ওকালতনামা। শেষে যা হয়, টাকা আর যায় না। চিঠি লিখে জবাব পান না। নিজের বলতে কেউ নেই। মেয়েরা খোঁজ নেয় না, ছেলেটিকে নিয়ে সে কি দুরবস্থা। গয়নাগাটি, আসবাবপত্তর, বাসনকোসন বেচে ক'মাস গেল। শেষে দয়াপরবশ হয়ে ওঁর স্বামীর একজন প্রাক্তন কর্মচারী বলে—মা আপনি কলকাতা যান। নিজেই টিকিট কিনে দিয়েছে সে, ছেলেটিকে রেখেছে নিজের কাছে।

কলকাতায় এসে মেয়েদের কাছে ঠাঁই পাননি। তারা অপমান ক'রে মাকে তাড়িয়ে দেয়। খোঁজ নিয়ে জানেন, খিদিরপুরের সে বাড়ী বড়-জামাই নাম ভাঁড়িয়ে কার কাছে নিজের ব'লে বেচে দিয়েছে। অন্য দু' মেয়ে জামাই বলে দিদিকে দিলে, আমাদের বাড়ীর বখরা দিলে না। তা ছাড়া বাবা যে টাকার কাঁড়ি রেখে গিয়েছেন, তা গেল কোথায়, মনের দুঃখে কালীঘাটে এক জ্ঞাতি-ভাই-এর কাছে আসছিলেন। পথে নগদ টাকা ঠিকানা সবই হারিয়ে ফেলেছেন।

বলেন, আমার মালবাজারের বাড়ীতে কাগজপত্তর সব আছে। আপনি শুধু একটু জামাই মেয়েকে ভয় দেখিয়ে বাড়ীটা উদ্ধার করে দিন। আমার ছোটছেলেটা কি পথের ভিখিরী হয়ে থাকবে?

সব শুনে আমি ধমক ধামক দিয়ে ওঁকে তাড়াই। কথাবার্তা যেন কেমন কেমন মনে হয় আমার। রাজকেষ্ট বলে—ঐ হারের লোভে কে মেবে বসবে, কোথায় যাবেন। তার চেয়ে ঠিকানা বলুন, চিঠি লিখে দিই জামাইদের।

পরদিন এসে রাজকেষ্ট বলে—জামাইদের খবর দিতে রাজী নন উনি, তবে মাণিকতলায় এক কাকা থাকতেন, তাঁকে চিঠি দেওয়া হল। বেঁচে থাকলে আসবেন।

সে চিঠির জবাব এল না।

এদিকে দিন কাটছে। দিনতিনেক হয়েছে তারপর। হঠাৎ নলিন এসে দাঁড়াল। বলে, বড় বিপদে পড়েছি, উদ্ধার করুন।

বোনের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। গয়নাপত্তর নয়, নগদের হাজারটি টাকা ওর দরকার। আমাকে হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিল চারমাস বাদেই ওর বাপের ইনসিওরেন্সের টাকাটি পেয়ে যাবে, তখন শোধ দেবে। একবার মনটা খুঁত খুঁত করল বটে। মনে হ'ল মোহিতের বন্ধু, এই পর্যন্ত। সত্যি সত্যি ওর বাড়ীর ভেতরের খবর ত' রাখি না। আবার মনে হ'ল এতদিন ধ'রে যাচ্ছে আসছে কোনদিন একটি পয়সা ধার নেয়নি। হাজার হ'লেও ভদ্রলোকের ছেলে, নাম-ঠিকানাও জানি। শেষে বলি পরশু এস। যা পারি করব।

সকালে এসে নলিন টাকা নিয়ে

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত (সি. আই. টি.) রোড, কলিকাতা-১৪
শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯

● স্কুল-কলেজের বই ● উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক ●
বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থ ●

স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

গেল। বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখি সেই মহিলা ব'সে আছেন। স্ত্রী বলেন, কিছুতেই ছাড়ছেন না, কান্নাকাটি জুড়েছেন। মহিলা বলেন—চিঠির জবাব আসেনি, যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে আমার। দশটা টাকা দিন, আমি ছেলের কাছে ফিরে যাই।

একে কোর্ট থেকেই একটা বেয়াড়া কেস নিয়ে মেজাজ বিগড়ে ছিল। ওঁকে বেদম তাড়া দিলাম। বললাম এখন যদি না যান ত' পুলিশে খবর দেব।

উনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকলেন। শেষে বেরোন বেরোন ক'রতে ক'রতে হুকুর তাড়া ক'রে বের করে দিই ওঁকে।'

সদানন্দ চুপ ক'রলেন।

'শেষ অবধি কি হ'ল ?'

'এখনো বোঝনি' আবার পেনসিলটা কাটতে থাকেন সদানন্দ। বলেন, 'নলিন আমায় ঠকিয়েছিল। বোন নেই ওর, আর সব কথাই মিছে। ও বুঝেছিল আমার দুর্বলতা কোথায়। ওকে অবিশ্বাস করব না বুঝে নিয়ে আমার কানমলে বোকা বানিয়ে গেল। পরে অবিশ্যি সে খুব উন্নতি করেছে। আমার টাকা পেয়েই ওর অবস্থা ফিরতে সুরু করে কি না, তা আজও জানি না।'

'এখন দেখা হয় ?'

'মাঝে মাঝে পথে দেখি। নিজেই ছাপাখানা খুলেছে। গাড়ী ক'রেছে একটা। সুবিধে পেলেই লোককে ঠকায়। মাঝে মধ্যে কেসও আসে ওর নামে। আমাদের কোর্টেই এসেছিল একটা।'

'আর একটা কেস ?'

'কেসই বটে। তা সেখানেও হেরে গিয়েছিলাম। ক'দিন পরে মহিলার খোঁজ ক'রে সত্যিই তার খুড়তুতোভায়েরা এল, বুড়ো কাকা অবস্থাপন্ন লোক। গাড়ী চ'ড়ে এসেছিলেন। বললেন ওঁরা কলকাতায় ছিলেন না, এসে চিঠি পান। শুনলাম মহিলা যা যা বলেছিলেন, সবই সত্যি।'

'বল কি ?'

'হ্যাঁ। সব সত্যি। মেয়ে জামাইরা ভাত দেয়নি, পথে বসিয়েছে। বিদেশে ছোটছেলেটি নিয়ে বাস। আমার তখন মনে ঘা লাগল। ছি ছি, দশটা টাকা দিইনি, মন থেকে বিশ্বাস পাইনি। আবার ভাবি—চিনি না জানি না, বিশ্বাস করিই বা কি ক'রে ?'

'শেষে কি হ'ল ?'

'জানি না। কাকা এবং ভায়েরা অনেক খোঁজ করেন। কিছুই জানা যায় নি, কিছুই না। কোথায় গেলেন, মরেই গেলেন—না পাগল হ'য়ে পথে পড়ে রইলেন তা আর জানি না।'

'ছেলেটি ?'

'অত খবর রাখি না রে ভাই, তবে দু'জামাইয়ের নাম বলছি—চিনলেও চিনতে পার।'

নাম শুনে বন্ধু থ'টি থ হ'য়ে রইলেন। বেশ পরিচিত লোক তাঁরা। শিক্ষিত, নামডাক-ও আছে। একজন মাঝে মধ্যে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কাগজে ছবি বেরোয়।

'কিন্তু আমি ত' ওঁকে চিনি। আহা চমৎকার বলেন যে। আমাদের পাড়ার ছেলেরা সেদিন এনেছিল।'

দ্বিতীয়জনের দিকে চেয়ে সদানন্দ বলেন—জানি তোমাদের বিশ্বাস হবে। সভায় সভায় বক্তৃতা দেয়, কাগজে নাম বেরোয়, সে লোক কি মন্দ হ'তে পারে ?'—যাকগে, কি বলতে এসেছিলে বল, শোনা যাক।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বন্ধুটি, কাজের কথা সুরু ক'রলেন।

অবিস্মরণীয় প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবময় পুনঃ প্রকাশ

বাঙলার ও বাঙালীর চির আরাধ্য

পরম পবিত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ

কাশীরাম দাসের

মহাভারত

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" পুণ্যবান কাশীরাম দাস অমিয় পয়ার ছন্দে ভারত গান গাহিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—কালের প্রভাবে তাহা অবিনশ্বর। "রুচিবাগীশগণের অশ্লীলতা-আতঙ্ক নীতি" অনুসরণ করিয়া আমরা এই পুণ্যময় গ্রন্থের সংস্কারে সংহার করি নাই। প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে মুদ্রিত—সুসংস্কৃত—রাজাধিরাজ সংস্করণ—দুই খণ্ডে সুসম্পূর্ণ—তিরিশখানি সুরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশ। কাশীরাম দাসের জীবনী সহ এই মহান গ্রন্থ প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য।

মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা মাত্র।

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্ত্তিমান বিকাশ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্ব্বরসের সাগর একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্ত্তি নাটকার, সর্ব্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

রাজকৃষ্ণ রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলনীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, প্রহ্লাদ চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

৪র্থ ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিহর, লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, টাটকা টেঁটকা, বঙ্গভূষণ, বেলুনে বাঙাল, বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রাশিয়ায় ২১০০ শতাব্দী

"আমাদের দীর্ঘজীবনের রহস্য?
আমরা কেউ শ্যালিন পত্নী নই,
তাই প্রাণে বেঁচে আছি।"

"ঘরে ফিরে যাও বাছা,
নিজেরা খেতে পাইনা
তোমাদের খাওয়াবো
কোত্থেকে!"

S.K.R

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

আগে ছিল দিল্লীর অদূরে, আজকাল দিল্লীরই ভিতরে বিরাট মহামায়ার মন্দির। জাগ্রতা দেবী। বহুদূর থেকে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। নীরব মন্দির হঠাৎ হয়ে ওঠে মুখরিত।

বছর দশেক আগেই বোধ হয় আমি সর্বপ্রথম সেটা দেখতে যাই। বেড়াবার সখেই গিয়েছিলাম। পুণ্যটুকু ফাউ। তখন যাতায়াত খুব সুবিধাজনক ছিল না। টাঙ্গায় করে গিয়েছিলাম, টাঙ্গাতেই ফিরতে হয়েছিল। সাথে ছিলেন বাংলার কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিক। আমি ছিলাম তাঁর গাইড।

সেদিন মন্দিরটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অদূরেই আরেকটা মন্দির—কাল্কাজী। আজকাল সে মন্দিরটার চারিদিক ঘিরে হয়েছে মানুষের ঘন বসতি। মন্দিরটা কতদিনের পুরোনো কেউ বলতে পারে নি সেদিন, আজও কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে ওটা যোগমায়ার মন্দির মোগল যুগে সম্রাটদের হিসাব-রক্ষকরা মিলে এটা তৈরী করেছিলেন। সম্রাটরা দু'হাত তুলে টাকা ঢেলেছিলেন এই মন্দির নির্মাণে। আমার কিন্তু মনে হল যেন মন্দিরটা আরও অনেক পুরোনো। মন্দিরের সহস্র ঘন্টা যখন একসাথে বেজে ওঠে, দূর দিগন্তে ভেসে যায় তার প্রতিধ্বনি। বহু পথহারা যাত্রী ঐ মঙ্গলধ্বনি শুনে তাদের পথ খুঁজে পেয়েছে। ঘন অরণ্যে আবৃত এই মন্দির আজ দিল্লীর সঙ্গে পড়ে মডার্ণ হয়ে গেছে। সহস্র ঝাড়লণ্ঠন ঠিকই ঝুলছে কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য পাচ্ছে তারা ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড থেকে।

আমার সাহিত্যিক বন্ধু মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে প্রণাম সেরে নিলেন। এ রকম কোনো মন্দির প্রদক্ষিণ করেই নাকি একদিন সমস্ত ভারত জুড়ে তাঁর নাম হয়েছিল। আমি হেসে বললাম, এবার আপনি হবেন জগদ্বিখ্যাত। কেউ আর রুখতে পারবে না।

তিনি যখন সপুষ্পচন্দনে মূর্তিটির সামনে ভক্তিভরে বসেছিলেন, আমি তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। অপূর্ব সুধা ঢেলে কে যেন গান গাইছে। বাজাবার কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই। বোধ হয় দরিদ্র ভিখারীই হবে। একটা মাটির কলসীকে উপুড় করে তবলার মতন ব্যবহার করছে, অপর একটা কলসীকে বানিয়েছে বাঁয়া।

'বাঁয়া তবলা' না হলেও বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি ছিল না। তার কণ্ঠস্বরের মধুর ঝঙ্কার আমাকে আকৃষ্ট করল। আকৃষ্ট নয়, অভিভূত করল। মুহূর্তের ভিতর আমি যেন একটা অজানা জগতে চলে গেলাম। যেখানে সংসারের কোনো গ্লানি নেই, মনে যেখানে অনির্বচনীয় সুখ, পৃথিবী থেকে সে জায়গাটা যেন অনেক উর্ধ্বে।

কতক্ষণ সেখানে ওরকম ভাবে বসেছিলাম হুঁস ছিল না। সাহিত্যিক বন্ধুর করস্পর্শে পরম শান্তিময় চিন্তার জগত থেকে নীচে নেমে এলাম।

কখন সে গায়কটি চলে গেছে খেয়াল নেই। মন্দিরের সবাইকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, ওর নাম রামদাস, অন্ধ গায়ক। রোজ একবারটি এসে মহামায়াকে গান শুনিয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষাই ওর পেশা।

মনে মনে রামদাসের প্রতি ঈর্ষা হল। কি সুন্দর গলা। সুন্দর গলার চেয়েও যেটা আমার মনকে সেদিন আকৃষ্ট করেছিল সেটা তার ভক্তির গভীরতা।

বহুদিন স্বপ্নে তার কণ্ঠধ্বনি শুনেছি—যেন দূর থেকে বাতাসের রেণুতে ভেসে ভেসে এসেছে তার সুর-মূর্চ্ছনা। রামদাস ভাগ্যবান।

বহুদিন তার কথা ভেবেছি। তার গান আমাকে পাগল করেছে। চোখ বন্ধ করলেই আমি যেন শুনতে পাই রামদাসের মনমাতানো কণ্ঠধ্বনি।

ছুটির দিনে আজকাল আমার আর কোনো কাজ হয় না। ছুটে যাই মহামায়ার মন্দিরের দিকে। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নয়, আমি যাই রামদাসের কণ্ঠস্বরের আকর্ষণে। এ যেন একটা নতুন নেশা।

বছরের পর বছর মেলা বসে। ভীড় হয় পুণ্যাকাঙ্খী তীর্থযাত্রীর। পাণ্ডার দল রাত জেগে টাকা গোণে। রামদাস আজও কলসীর বাঁয়া তবলা বাজিয়ে ভিক্ষা করে। দিন দিন তার গান যেন আরও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে। লোকের ভীড় হয়। তীর্থযাত্রীর দল চারিদিকে পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

রামদাসের দারিদ্র কিন্তু ঘোচে না। রামদাসকে একদিন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি? মেলাতে সবাই এত টাকা পয়সা ছুঁড়ে দেয়, পথে ঘাটেও ভিক্ষা মন্দ জোটে না, তবুও হতভাগার এ দুরবস্থা কেন? দিল্লীর প্রচণ্ড শীতে সামান্য বস্ত্রটুকুও নেই কেন? কেন সে খালি পায়ে জীর্ণ বসন পরে কলসী বাজিয়ে অর্ধভুক্ত শীর্ণকায়ায় দিন যাপন করে।

রামদাস বলল, এ সব আলোচনায় সুখ পাবে না ভাই সাহেব। দুনিয়াটা বড়ই ঘোরালো। মন্দিরে মহামায়াকে দু'টো গান না শোনালে রাতে ঘুম হয় না। তাই রোজ আসি। তাইতে পাণ্ডার কি রাগ।

আমি বললাম, পাণ্ডার রাগ কেন? পাণ্ডার এতে কি যায় আসে হে?

রামদাস বলল, আমিও তো তাই ভাবতুম পাণ্ডার কি লোকসান? সে নিজেই সেদিন পরিষ্কার বলে দিল যে, প্রণামীতে টাকা পড়ছে না। তীর্থযাত্রীর দল মৌমাছির ঝাঁকের মতন রামদাসকে ঘিরে থাকে। প্রণামীর বদলে মহামায়ার নাম করে টাকা পয়সা যে যা নিয়ে আসে সব ঐ রামদাসের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

গায়। এমনি করলে মন্দির চলবে কেমন করে?

আমি বললাম, তারপর?

রামদাস বলল, তারপর আর কি? পাণ্ডা বলল, তুমি গরীব মানুষ মহামায়াকে রোজ গান শোনাতে আসো। বেশ ভালো কাজই করো কিন্তু আমাদের মন্দিরের দিকটাও তো দেখতে হবে।

রামদাস বলল, জানো ভাই সাহেব, আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠলো। আমি পাণ্ডাকে বললাম, তাহলে ঠাকুরমশাই তুমি কি তো আমি টাকার বিনিময়ে গান শোনাতে আসি না। ওঁকে গান না শোনালে মনটা স্থির থাকে না, রাতে ঘুম হয় না, তাই তো রোজ ছুটে আসি। যাত্রীরা সবাই দয়া করে যে যা দেয় তুমি তার সব নিয়ে নিয়ো। আমার কিছুই চাই না। অন্ধ গরীব ভিখিরি, কতটুকুই বা আমার প্রয়োজন। পথে ঘাটে যা পাই তাতেই আমার চলে যাবে। তা ছাড়া মহামায়ার পুজোতেই তো সবটা লাগবে। আমি তাতেই খুশী।

মাটির কলসীকে উপুড় করে তবলার মত ব্যবহার করছে

বলতে চাও আমি আর এ মন্দিরে আসতে পারব না?

পাণ্ডা আমার মনের অবস্থাটুকু বোধ হয় অনুমান করে নিয়েছিল। সে দয়া করে বলল, না ভাই তা নয়। তুমি রোজই মন্দিরে এসো। এখানে গানও করো। তবে তীর্থযাত্রীরা সবাই যে টাকাকড়ি ছুঁড়ে দিয়ে যাবে তার সবটা তুমি পাবে না। টাকায় তোমাকে এক আনা করে দেওয়া হবে।

রামদাস বলল, আমার বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে গেলো। আমি বললাম, ঠাকুরমশাই মহামায়াকে

আমি কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। কোথায় রামদাস, কোথায় পাণ্ডা। এ যে কূপমণ্ডুকের সাথে মহাসাগরের তুলনা।

আমি বললাম, তাহলে রামদাস, আমি যে এতদিন এত টাকা দিয়ে গেছি তার একটি পয়সাও তোমার অদৃষ্টে জোটে নি বল?

রামদাস শুধু একটুখানি মৃদুভাবে হাসলো। তারপর বলল, মন খারাপ করো না ভাই সাহেব। ও অর্থ অপচয় হয় নি। মহামায়ার পুজোতেই তো লেগেছে।

রামদাসের কোনো দুঃখ নেই। সে আছে, তার গান আছে আর আছে তার মহামায়ার মন্দির।

আবার শীত সমাগত।

দিল্লীর শীত। প্রচণ্ড মহাদ্যুতির তাপে যেমন রুদ্র বৈশাখে উগ্ররূপে দেখা দেন ঠিক তেমনই হিমাচলের তুষারাবৃত শৈলশিখরের হিম-শীতল তুহিন কণা-রূপে দেখা দেন প্রকৃতি। কুয়াশায় চারিদিক আবৃত। নিজের হাতখানাও সামনে ধরে রাখলে দেখা যায় না স্পষ্টভাবে। গোটা তিন চারেক গরম জামা চাপিয়ে কোনো মতে অফিসে যাই। সেখানে গিয়েই হীটারে হাত পা গরম করে কাজ করতে বসি। ঘন ঘন ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, কফি এই সব দিয়ে কোনোমতে দিন কাটাই।

রামদাসকে বললাম, এবার এক-খানা কম্বল নিয়ে নাও। জানি, ভিক্ষায় আজকাল বেশী জোটে না। কিন্তু এই দারুণ শীতে তুমি যে মারা পড়বে রামদাস। বলে একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিলাম। আমার কি-ই বা সামর্থ্য। ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময়ে কাউকে কিছু দিতে পারি না। বললাম, পরে আবার কিছু নিয়ে নিও রামদাস। দু'পাঁচদিনের ভিতর একখানা কম্বল না কিনে নিলে মারা পড়বে এবার।

খুশী হয়ে রামদাস চলে যায়, মন্দিরে যেতে ভালো লাগে না। সেদিন রামদাসের কাছে ওদের অর্থা-সক্তির নগ্নরূপ দেখে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। ইচ্ছা যে করে না যেতে তা নয়। প্রবৃত্তি হয় না। রুচিতে বাধে। অন্ধগায়ক ভিখিরির মুখের গ্রাসটুকু যারা কেড়ে নেয় তাদের না যাওয়াই ভালো।

মনে মনে দিন গুণছিলাম। আমরা দু'জনে হিসেব করে দেখলাম সেদিনের আর দিন ছয়েকের ভিক্ষালব্ধ উপার্জন সংগৃহীত হলেই রামদাসের একখানা চলনসই কম্বল কেনা যাবে।

তবে কিনা সেই ছটা দিন তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাকে একটা সুতীর জামা দিয়েছি। যতটুকু শীত ভাঙ্গে আর কি।

বিকেলের দিকে হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হলাম। এ যে

আমার অতি প্রিয় অন্ধগায়কের কণ্ঠস্বর। এই অসময়ে রামদাস এখানে কি করতে এলো?

আমার জানালাটির পাশে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে জানে আমি বেরিয়ে আসব।

আমি বললাম, এসো এসো রামদাস। আজ এ অসময়ে এ পাড়ায় কেন এলে?

রামদাস বলল, তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো? তোমার কোথাও যাবার নেই তো? তুমি তো আবার গান পেলে সব কিছু ছেড়ে বসে পড়ো কি না ভাই সাহেব?

আমি বললাম, না রামদাস আমার কোথাও যাবার নেই। তাছাড়া থাকলেই বা তাতে কি আসে যায়? তুমি বসো। দেখি একটু কিছু খাবার টাবার ঘরে আছে কি না।

চা খেতে খেতে অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি রামদাস আমাকে বলল, ভাই সাহেব একটা কথা বলবে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই রামদাস। সে বলল অতি সঙ্গোপনে, বলতে পারো—জওয়ান কাদের বলে? আমি তো জানতাম শৈশবের পরই মানুষ যা হয় তাকেই জওয়ান বলে।

আমি বললাম, তুমি ঠিকই জানো রামদাস। তবে আজকাল যারা দেশ রক্ষা করতে যুদ্ধে গেছে তাদেরই আমরা জওয়ান বলে জানি।

রামদাস বলল, সিপাহী বলো। ঐ যারা পল্টনে যায়।

আমি বললাম, হ্যাঁ। দস্যু দেশ আক্রমণ করেছে কি না। তাই দলে দলে জওয়ান যাচ্ছে তাদের তাড়িয়ে দিতে।

রামদাস বলল, দস্যু না, অসুর বলো। অন্ধ হবার আগে আমি যে মহামায়ার মূর্তি দেখেছি। সেই অসুর আবার বেঁচে উঠেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ রামদাস, মহামায়ার দেশ আজ আক্রমণ করেছে দস্যু চীন।

অবাক হয়ে রামদাস বলল, মহামায়ার ঘুম এখনও ভাঙে নি বলো? মহামায়ার ঘুম ভাঙলে যে মুহূর্তের ভিতর অসুর বিনাশ হয়ে যাবে। তাই দলে দলে জওয়ান চলেছে মহামায়ার পূজো করতে কোথায় বললে হিমালয়ে, মানে, একেবারে মায়ের চূড়ো নিয়েই তারা কাড়াকাড়ি করতে চায় বলো।

বলেই অন্ধ তার চোখ দু'টো বুজে এক মিনিট কি ভেবে নেয়।

—স্কুলে মহামায়ার ছবির রোজ পূজো হত, জানো ভাই সাহেব। মাথায় মুকুট, এক হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা অন্য হাতে বর্শার ফলক। জানো, স্কুলের সেই গানে আমি বরাবর আগে আগে গাইতুম। পরে গাইত স্কুলের ছেলের দল। সে দিন কোথায় চলে গেছে? দেখতে পাই না, তবুও সেই ছবি আজও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে

আমি বললাম, তুমি জওয়ানদের কথা কোথায় শুনলে?

রামদাস বলল, কেন পথে ঘাটে মাঠে আজ তুমি যেখানেই যাও না কেন তুমি তাদের কথা শুনতে পাবে।

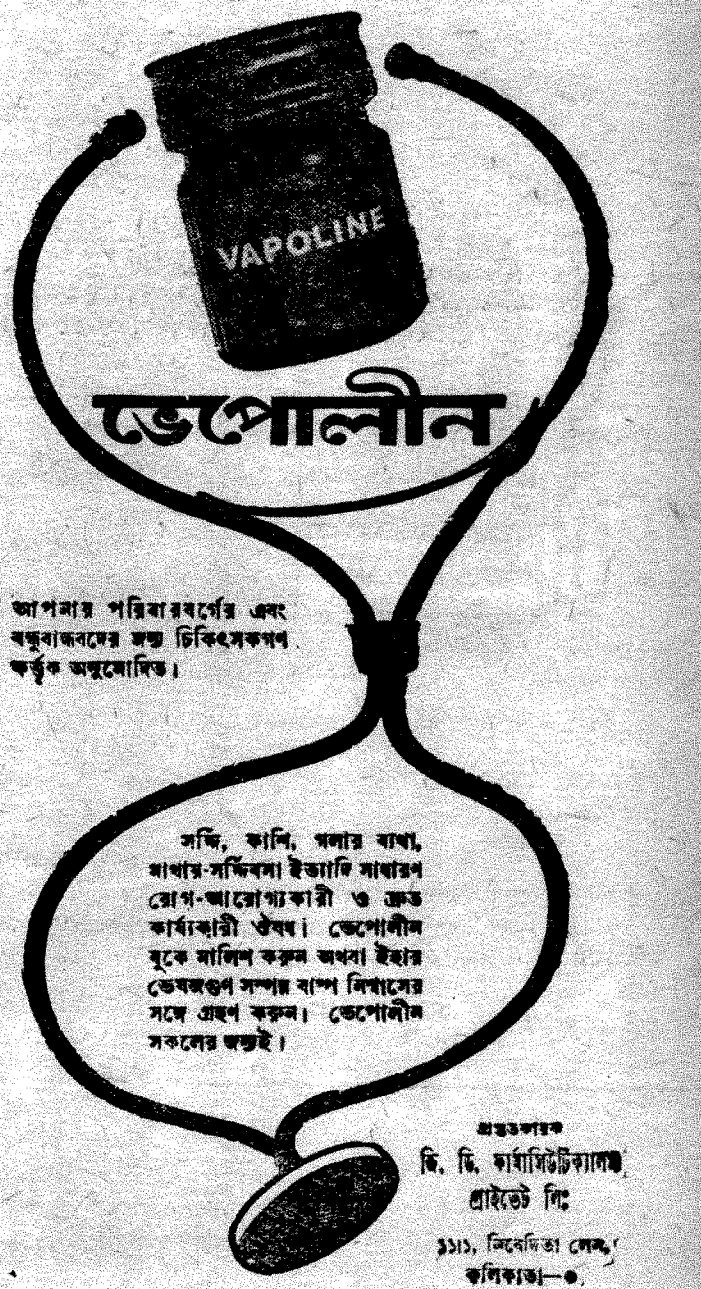

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। রামদাস উঠে পড়লো। মহামায়ার মন্দিরে যাবে আবার। আমাকে বলল, এটা তুমি ভালো করছো না ভাইসাহেব। পাণ্ডার উপর রাগ করে তুমি মন্দিরে যাচ্ছো না? মন্দির যে মহামায়ার সেখানে পাণ্ডা তো প্রহরীমাত্র।

চলে যাবার আগে চুপি চুপি বলল, আর তিনটি দিন মাত্র। তারপরই কম্বলটা পেয়ে যাবো।

তারপর ক'দিন রামদাসের দেখা নেই।

আমি ভাবলাম লোকটা নিশ্চয়ই এতদিনে আরাম করে কম্বল গায়ে দিয়ে মহামায়ার গানে দিন কাটাচ্ছে। তবে মনে মনে ঠিক জানতাম সে নিশ্চয়ই একবার আমাকে কম্বলখানা দেখাতে আসবে।

শীত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দরজা জানালা বন্ধ করে, চীক্ পর্দা ফেলে, লেপ গায়ে দিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একখানা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ মনে হল কে যেন দরজায় কড়া নাড়া দিল।

দরজা খুলে দিলাম কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলো রামদাস।

আমি বললাম, কৈ রামদাস কম্বল জুটলো না আজও?

এক ঝলক হাসি দিয়ে সমস্ত ঘরখানা আলোময় করে রামদাস বলল, আহা হা ভাইসাহেব সেইটে বলতেই তো এসেছি।

সেদিন গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে চলেছিলাম। কম্বলখানা কেনা হয়ে গেছে। মনে আনন্দ ছিল। মহামায়াকে দেখিয়ে সেখানা গায়ে দেব ঠিক করেছিলাম। এমন সময়ে কারা এসে বলল, এখন গানটা থামাও তো একটু সাধুবাবা।

আমি বললাম, কেন বাবা হাঙ্গামা করছো? চুরি করি নি, ডাকাতি করি নি। চলেছি গান গাইতে গাইতে মহামায়ার মন্দিরে। তাতেও বাধা?

প্রহরী বলল, আহা তোমার গানে কে বাধা দেয় রোজ? জানো না ওয়াজির-ই-আজম্, দেশের ওয়াজির-ই আজম্ এসেছেন। সব'ই তাঁর হাতে জওয়ানদের জন্য উপহার পাঠাচ্ছে কি না। তুমি ঐ মোড়টুক পর্যন্ত চুপ চাপ চলে যাও।

মিনিটের ভিতর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি প্রহরীর হাত দু'খানা ধরে বললাম, ভাই দোহাই মহামায়ার! তুই আমাকে একটু তাঁর কাছে নিয়ে যাবি?

সে কি কথা? প্রহরী অবাকভাবে বলল, তুমি ফকীর মানুষ, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে কি করবে?

আমার নিঃশ্বাস পড়ছিল না। আমি বললাম, তারপর কি হল রামদাস?

রামদাস বলল, প্রহরী তা মানবে কেন? লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঠুক ঠুক করে আমিই জোর করে সেখানে চলে গেলাম। ওয়াজির-ই-আজম্-এর হাতে কম্বলখানা দিয়ে বললাম, "হুজুর গুস্তাকী মাপ। ভারতমাতার ইজ্জতের জন্য যে সব জওয়ান্ জান্ কুরবানি দিতে গেছে, ফকীর রামদাস তাদের এই মামুলি কম্বলখানা দিয়ে তার মহব্বত জানাতে চায়। তুমি তাদের কাছে এ কম্বল পৌঁছে দিও।

আমি নগ্ন বক্ষ শীতাক্রান্ত রামদাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, তারপর?

রামদাস বলল, জনতা থেকে সবাই এক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "হিন্দুস্থানের জয়।" ওয়াজির-ই-আজম্ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

লেপ থেকে বেরিয়ে ফকীর রামদাসের পদধূলি নিলাম।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

শ্রীজগদীশ গুপ্তের

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

জাপানী সন্দেশ

অলিম্পিক্ গেম্‌স্। ১৯৬৪ সালে পৃথিবীর নানান্ দেশের খেলোয়াড়দের জটলা হবে রাজধানী তোকিওতে। গত আড়াই বছর ধরে সারা দেশের অলিম্পিকের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। শেষ আছে কি সুব্যবস্থার? নেই বললেই হয়। এসিয়াতে অলিম্পিক এই প্রথম। পাশ্চাত্যের সব দেশের সঙ্গে মডার্ণ ব্যবস্থাপনায় প্রতিযোগিতা করা কি সোজা কথা? প্রয়োজন অর্থের, প্রফেশনাল্ তদ্বিরতদারকের, বিদেশী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকজনের, ভাল মডার্ণ হোটেলের, রাস্তাঘাটের। আরো কত কী

আগে ভাগে তৈরী থাকাই ভাল। জাপানীরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হতে ওস্তাদ। তাই দেশ ছেয়ে রাস্তা মেরামতী আর নতুন সড়ক্ তৈরীর ধান্দা সুরু হয়ে গেছে। যে জাপানে এসেছে সেই জানে যে জাপানী রাস্তা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপদের মধ্যে অন্যতম। ভাল, চওড়া রাস্তার নিতান্তই অভাব। অথচ সমস্ত দেশের মাল চলাচল রেলগাড়ীতে না হয়ে—হয় নদীতে বা ট্রাকে। ভাল 'হাই-ওয়ে' আছে কয়েকটি। তবে সাধ্য কার নিজের গাড়ীতে যাতায়াত করে ঐ রাস্তায়। অনবরত বিরাট বিরাট লম্বা ট্রাক বাহিনী চলেছে তো চলেছেই। শেষ নেই। রাস্তার যে অবস্থা খারাপ হবে—তা' রাস্তার আর দোষ কী? ওরও একটা প্রাণ বলে জিনিষ আছে তো। যাদের নিজেদের গাড়ী আছে তারা নিজেদের বাড়ীর কাছাকাছিই গাড়ী চড়ে ঘোরাফেরা করে। উপায় কি একটু দূরে গেলেই অ্যাক্সিডেণ্ট, অ্যাক্সিডেণ্টের ব্যাপারে আমেরিকার পরেই জাপানের স্থান। 'হাইওয়ে' বাদ দিয়ে সহরের রাস্তাই ধরা যাক্। দু' একটি মেন রাস্তা ছাড় আর সবই সরু, এবড়ো খেবড়ো আর বিপজ্জনক্। মাথা উঁচু করে চলার যো নেই। সব সময়ে মাথা নীচু করে রাস্তা দেখে না চললে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা। রাস্তায় আলো বেশীর ভাগ স্থানেই অপ্রচুর। অবশ্য স্থানভেদে নিঅন আলোর মেলাও আছে বাজার অঞ্চলে। অলিম্পিকের সময়ে জাপানে আসবেন হাজার হাজার বিদেশীর দল। এখানকার রাস্তার অবস্থা দেখে তাঁদের এদেশ সম্বন্ধে ধারণা হবে খারাপ। অতএব লাগাও রাস্তা তৈরী, সড়ক্ মেরামৎ। অলিম্পিকের দৌলতে চেহারা বদলে যাবে জাপানী রাস্তা ঘাটের। শত শত হোটেল তৈরী হচ্ছে। সব নতুন। অবশ্য ব্যবস্থাপকরা অলিম্পিক শেষ হবার পরে কতগুলি হোটেল ফেল্ মারবে তার অঙ্ক ইতিমধ্যেই কষে ফেলেছেন। হোটেলওয়ালারাও আছে তৈরী।

জাপানী সরকার তলব্ দিয়েছেন দেশের যুবক-যুবতীদের। বিদেশী ভাষা শিখতে হবে অলিম্পিক অতিথিদের সঙ্গে কথা কইবার জন্য, তাঁদের দেখাশোনার জন্য, তাঁদের সঙ্গে দেশ ঘুরে দেখানোর জন্য। হাজার হাজার যোয়ানরা ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানীশ্, ইতালি ভাষার সঙ্গে অহরহঃ লড়াই

জাপানী যুবরাজ আকিহোতো (বাম দিকে) ও ওলন্দাজ রাজকুমারী বিয়ে ট্রিক্স (মধ্যস্থলে), গত ৫ই এপ্রিল কাবুকি থিয়েটারে নাটক অভিনয় দেখিতে গিয়া উতামন নাকাম্বরার (ডানদিকে) সহিত সাক্ষাৎ করেন।

"তামা পুতুল"

করে চলেছে। এদের মধ্যে আছে পুলিশ, হোটেল বয়, ম্যানেজার, গাইড, লেডী বাস কণ্ডাক্টার আর দোকান-ভাষীর দল। ভাষার সঙ্গে এই লড়াই-এর শেষ হবে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন জাপানী সরকার। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

এদিকে এরা বিদেশী ভাষা শিখতে এতো সময় নেয় যে দরকারের সময়ে 'শিখতুম ভুলে গেছি'—ছাড়া জবাব পাওয়া যায় না। স্কুলে বছর সাতেক ও কলেজে ঢুকে অ্যাডিশনাল্ সাবজেক্ট হিসাবে ইংরাজী পড়ে এরা। ফলে হবে কি? এক লাইন শুদ্ধ ইংরাজী লেখা বা মিনিট দু'তিন নির্ভুল ইংরাজীতে কথা বলাতে নাজেহাল হ'য়ে যেতে হয় এদের। তা ছাড়া বিদেশী উচ্চারণ করতে বিশেষ অসুবিধা। জাপানী ভাষায় 'ফ' (f) আর 'ল' (l) শব্দ নেই। 'ফ' এর বদলে 'হ' আর 'ল' হচ্ছে 'র'। অতএব বল্ (ball) এদের কাছে 'বো-রু' আর ফাইন্ (fine) হল 'হাইন' অনেকটা আমাদের পূর্ব-বঙ্গীয় ঢংয়ে শালাকে 'হালা' বলার মত আর কি। এই সব বেড়া ডিঙ্গিয়ে বিদেশী ভাষা রপ্ত করা এদের কাছে জগৎ জয় করার মত। অবশ্য অনেকেই নির্ভুল ইংরাজীতে কথা বলতে বা লিখতে পারেন। তবে তাঁদের সংখ্যা বিশ হাজারে জন দু'য়ের মত। তাই বলে রাখি জাপানে এসে যদি শোনো 'অরিম্পিক্' ত'হলে তা' অলিম্পিক্ ছাড়া অন্য কিছু বলে ভুল কোরো না যেন।

আগে লিখেছিলুম জাপানী ট্রেনের কথা। এখন বলি এ'দেশের কমিউটিং (Commuting trains) বিজলী ট্রেনের কাহিনী। কলকাতায় যে নতুন বিজলী ট্রেন চলে হাওড়া—উত্তরপাড়া লাইনে ঐ একই ব্যাপার। তবে অনেক ভাল। দরজা খোলা থাকে না। যাত্রীরা জানলা ধরে বাইরের দিকে ঝুলে 'ফ্রেশ এয়ার' বুক ভরে নিতে পারে না। সচরাচর লেট্ হয় না। গাড়ীর সংখ্যাও প্রচুর। রকমারী গাড়ী। 'তোক্কিউ' মানে স্পেশাল এক্সপ্রেস্। 'কিউকো' মানে এক্সপ্রেস্। 'জুনকিউ' হ'ল ঢিমে তেতালা প্যাসেঞ্জার গাড়ী। 'রিনজী' মানে এক্সট্রা প্যাসেঞ্জার। গতিবেগ ট্রেন হিসেবে কম বেশী। মজা হচ্ছে ট্রেন নিয়ে নয়। মজা বা সাজা যাত্রীদের নিয়ে। ব্যাপারটা নির্ভর করে এদের উপর।

ধর ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে সকলে—হ্যাট্-কোট্-টাই, ফ্রক্-গাউন-হাইহীল্ পরা সুসভ্য লোকেরা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ট্রেন এলো—দরজা খুললো—ব্যাস্! হঠাৎ 'কিউ' ভেঙ্গে সুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। হাসির কথা নয়। সত্যিই দাঙ্গা—মানে 'রায়ট' আর কি। যাকে দেখেছিলে 'কিউ'-এর ল্যাজের দিকে সেই সর্ব্বপ্রথমে কামরায় ঢুকে আসন দখল করেছে! একেবারে ম্যাজিক্। শেখবার মত ম্যাজিক্ এরা সবাই এই ম্যাজিক আয়ত্ত করেছে। তাই এই দাঙ্গার জন্ম ঠেলাঠেলি, মারামারি। সারা জাপানে এই ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে ফলে কেউ হারাচ্ছে চশমা, ঘড়ি; জুতো হারাচ্ছে কেউ; ক্ষণিকের জন্য সন্তান হারিয়ে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠছে মা'র দল; কেউ বা বুকের পাঁজরের ভাঙ্গা হাড় কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে বুক চেপে মাথা গুঁজে থিয়েটারী ভঙ্গিতে ট্যারা চোখে চাইছে এদিক আর ওদিক। দৈনন্দিন ব্যাপার। সবচেয়ে মজা হচ্ছে যখন দেখবে ষ্টেশনের ট্রেন

কণ্ডাক্টারের দল দরজা বন্ধ হবার আগে চিনির বস্তায় চিনি পোরার মত সতিকারের গোঁত্তা মেরে যাত্রীদের ঢুকিয়ে দিচ্ছে কামরার ভিতরে। যাত্রীরা কামরায় ঢুকে কেউ কাউকে বললে না 'সরী'। কে আবার এই দাঙ্গার পর আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে। তার চেয়ে খবরের কাগজ পড়া ঢের ভাল। 'টাইম্ ইজ মানি'।

এক জাপানী প্রফেসর ভাল কয়েকটি অভিমত জানিয়েছেন। বলেছেন, ১৯৬৪ সালে অলিম্পিকের একটি মেন্ ইভেন্ট হতে পারে নীচের এই ক'টি পয়েন্ট।

প্রথমে দশ মিটার হ্যাণ্ডিক্যাপ রেস। প্রতিযোগীদের হাতে থাকবে হাতিয়ার—ঢাল আর বর্শা। ঢালের কাজ চলবে টিফিন পোরা ব্রীফকেস দিয়ে আর ছাতা দিয়ে বর্শার কাজ হবে। ট্রেন এসে পৌঁছুলেই সুরু হবে ঐ দশ মিটারী রেস। যাত্রীরা যারা বেরিয়ে আসছে তাদের ডিঙ্গিয়ে দখল করতে হবে আসন। যারা আসন পাবে তাদের জন্য স্বর্ণপদক। যারা যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে বেরুতে দেবে না তাদের জন্য রৌপ্যপদক। আর যারা এক পা ভিতরে—এক পা বাইরে রেখে দরজায় চাপা পড়ল তারা পাবে ব্রোঞ্জের মেডেল। প্রতি টিমের জন্য দু'জন একস্ট্রার প্রয়োজন। একজন ঠেলক (Pusher) আর একজন ডাক্তার। বিশ্বশান্তিপ্রিয় অলিম্পিকের জন্য এর চেয়ে মজার ইভেন্ট আর কি হতে পারে?

রবিবাবুর সেই :—

"এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার"

কবির মত সনাতনী জাপানী সামুরাইয়ের এক হাতে থাকতো কৃপাণ আর আরেক হাতে চন্দ্রমল্লিকা (Orysan Themum) ফুল। আজ তার হাতে অহোরাত্র শোভা পাচ্ছে টিফিন ভরা ব্রীফকেস্ আর বেটনের মত বেঁটে ফোল্ডিং ছাতা। এই হাতিয়ার তাকে রক্ষা করছে সর্ব্বদা।

থিয়েটারে, সিনেমায়, ট্রেনে ও আরো নানান স্থানে রয়েছে 'নো স্মোকিং' সাইন্। দেখবে কত লোক নির্ব্বিকারে সিগারেটে হুশ্ হুশ্ করে রাম টান মেরে চলেছে ঠিক ঐ সাইনের তলায় দাঁড়িয়ে। যারা সবার গায়ে ছাই ঝাড়ছে তাদের জন্য স্পেশাল্ পয়েন্টস্। যারা অন্যের জামাকাপড়ে সিগারেটের

শ্রীসন্দীপ ঠাকুর

আগুন দিয়ে ছেঁদা করে দিচ্ছে তাদের জন্য স্পেশাল্ কন্সিডারেশন্। অবশ্য যারা ভুলে নিজেদের কাপড়ে ছেঁদা করছে তারা ডিস্‌কোয়ালিফায়েড। অলিম্পিক্ গেমসে যদি এই No smoking—smoking ইভেন্ট ঢোকানো যায় তাহলে রুল্‌স্ রইল বলা।

জাপানে এসে বিদেশীরাও—এদের মধ্যে মার্কিণ ও য়ুরোপীয়ও আছে—যার বিশেষ রকম বদ তারাও দেখবে ঠিক জাপানী মতই ট্রেন আসার আগে সুবিধে জায়গায় পোজিশন্ নিয়েছে। স সঙ্গে লাইন বেঁধে পাশাপাশি দাঁ ট্রেনের চার ফুট চওড়া দরজার ম ঢোকবার জন্য ডাব্বির ঘোড়ার পায়তারা কষছে। কামরায় ঢু সীটের দিকে একটা ফ্লাইং ডাই কারুর দিকে চাওয়া নয়, হোক বুড়ো বা বুড়ী, পোয়াতী মহিলা, সে অপরূপ সুন্দরী। হাঁ, এক সীটে বসে একেবারে ষ্ট্যাচু! নড়ন্ চড়ন্। 'তুমি যে হও সে হও

আপনার
চিকিৎসক যখন
বুঝতে পারেন যে
আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলেন—কারণ তিনি জানেন যে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দ্দি ও কাশির উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিককাল স্থায়ী শ্বাস কষ্টের অবসান ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন

শ্বাসযন্ত্রের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য টনিক

প্রস্তুতকারক —
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ
১১।১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩

নিশিনোমিয়া থেকে রোজ সকালে বিকেলে ওসাকার অফিসে যে লাইনে আমি যাতায়াত করি—এইসব ব্যাপার নেহাৎ তুচ্ছ, দৈনন্দিন। প্রথমে জাপানে এসে একবার চমৎকার ফুলতোলো কিমোনো পরা এক সুন্দরীকে অফার করেছিলাম আমার সীট। মাথা নেড়ে জানালেন—না, দরকার নেই। প্রায় তিন মিনিট ধরে দু'জনে দু'জনকে আসন দেবার পাল্লা দিলুম। ইতিমধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা সবাই আমাদের দুজনের এই পৃথক্ কালচারাল্ সংঘর্ষ দেখে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত বসতেই হোলো আমাকে। নাঃ, শিভ্যাল্‌রীর যুগ এখনও আসেনি এদেশে! আর একবার দেখি এক বৃদ্ধা ষ্ট্র্যাপ ধরে যাঁদের ঝোলা ঝুলছেন আমার চশমার সামনে,—আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি নিজের বিশ বছর বয়সের গুণ্ডার মত দেখতে এক নাতিকে ঠেলে বসিয়ে দিলেন আমার জায়গায়। নো—থ্যাংক্ ইউ!

মত প্রকাশের আগে একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন :

(১) এ হল জাপান। এখানকার সমস্ত নিয়ম এদের নিজেদের। এখানে আসন ছেড়ে দাঁড়ানো আমাদের দেশে খাওয়ার পর হাত না ধোয়ার সামিল।

(২) কারুর জন্য নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়ানো মানে অন্যান্য যাত্রীদের—যারা বসে আছে—অপমান করা। তারা এটা ভাল চোখে দেখে না।

(৩) যারা সীট্ না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা আরো মিনিট পাঁচেক অন্য ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করলেই তো পারতো। তা'হলে ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার সুযোগ পেত।

সীট্ অফার করা বা না করার মধ্যে এখানে তফাৎ নেই একটুও। যদিও এদেশী ব্যবহারে সময়মত অভ্যস্ত হওয়া ছাড়া গতি নেই, তবু সর্বদাই নিজের অসদ্‌ব্যবহারের জন্য খুঁৎ খুঁৎ করে মন। ওদিকে আবার মনে হয় যেন এদেশের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সবাই আমার বিরুদ্ধে কী যেন একটা ফন্দী পাতছেন। ট্রেনে চড়লেই একজন না একজন বৃদ্ধা এসে ঠিক্ আমার সামনে ষ্ট্র্যাপ ধরে ঝুলবেন আর—দয়া করে বসতে দাও—দৃষ্টি হানবেন আমার পানে। কি মুস্কিল!

হ্যাঁ, নতুন কলেজ-ছাত্রের দল তাদের সনাতনী ব্যবহার ত্যাগ করছে ধীরে ধীরে! এরা অন্য কাউকে দেখে আসন ছাড়ুক বা না ছাড়ুক ছেলে কোলে বা কাঁধে মহিলা দেখলেই লাফিয়ে ওঠে তড়াক্ করে। তাই আজকাল জাপানী মহিলারা কোথাও যাবার সময়ে ছেলে কোলে নিয়ে বেরুনো পছন্দ করেন। তা' ছেলে কচিই হোক বা স্কুলের ছাত্রই হোক! কাউকে কোলে বা কাঁধে চাপাতে পারলেই হোলো! ট্রেনে সীট্ পাবার চান্স্ বেশী। নতুন যুগের জাপানীরা ধীরে—অতি ধীরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল দিকটা জানতে চাইছে, শিখতে চলেছে। শুভস্য শীঘ্রম্।

ট্রেন্‌কাহিনীর শেষ হোলো এখানে। যারা জাপানে আসতে চাও এই নীচে লেখা কথাগুলি শিখে নাও। জাপানী সমেতের মারফৎ অনেক ইং—জাপানী (ইংরাজী-জাপানী) কথা শিখতে পারবে। এই শব্দগুলি আজ জাপানী ভাষার অন্তর্ভুক্ত। উচ্চারণও ভালভাবে রপ্ত করা দরকার। তা' না হলে আছে বিশেষ ভোগান্তি।

অম্‌লেট্	(omelette)
মিল্‌ক্	(milk)
পাঁউরুটি	(bread)
সিগারেট্	———
ম্যাচ্	(match box)
চামচ	(spoon)
কফি	(coffee)
রাবার	(rubber)
কাপ্	(cup)
তেল	(oil)
কারী	(curry)
অ্যাপার্ট্‌মেন্ট্	(apartment
ডিপার্ট্‌মেন্ট্	(department store)
ওমুরেৎস্	— omurets
মিরুকু	— miruku
পান্	— pan
তাবাকো	— tabako
মাচ্চি	— macchhi
সুপুন্	— supoon
কোহী	— kohi
গোমু	— gomu
কোপ্প	— koppu
ওইরু	— oiru
খারে, ক রে	— kare
আপাতো	— apato
দেপাতো	— depato

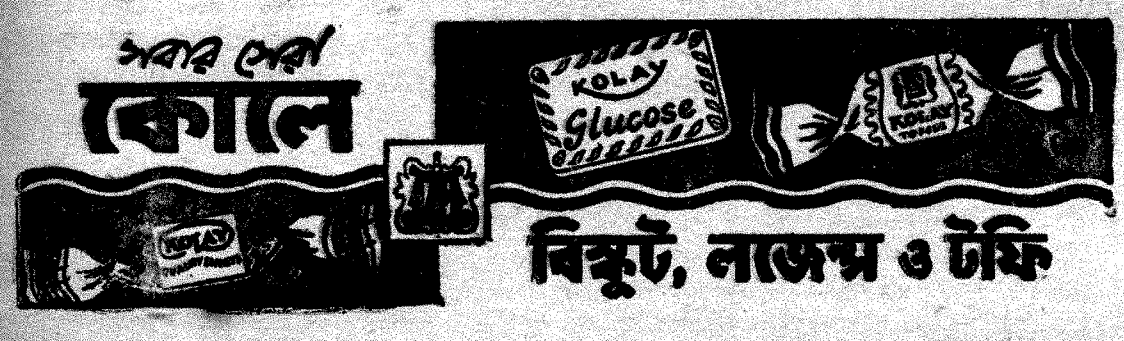

রঙ্গজগৎ

॥ পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন ॥

১৯শে এপ্রিল '৬৩ পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের তিন দিনব্যাপী আড়ম্বর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলো। এ-অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে ১৭ই এপ্রিল '৬৩ মহাজাতি সদনে। প্রথম দিনটি রবীন্দ্র-শ্রদ্ধা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন পূর্বভারতীর উদ্বোধন সংগীতের পর শ্রীস্মিত্রা মিত্র, শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস ও শ্রীউষা সেনগুপ্তের দরদী এবং উদাত্তকণ্ঠ অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। তাঁদের সংগীতের পর কথকনৃত্যে অংশ গ্রহণ করে শিশুশিল্পী শিপ্রা ভট্টাচার্য এবং সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় শ্যামা নৃত্য-নাট্য। শ্যামার ভূমিকায় (সংগীতে) উষা সেনগুপ্তের গীত সংগীতসমূহ সেদিন বেশ প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। তাছাড়া সংগীতাংশের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীঅর্ঘ্য সেন, শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরী বিশ্বাস এবং নৃত্যাংশের শিল্পিবৃন্দের মধ্যে শ্রীশক্তি নাগ, শ্রীহিমাংশু গোস্বামী, শ্রীসবিতা বসু প্রমুখের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল '৬৩ ৭ম বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশন। সেদিন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে অভূতপূর্ব প্রাণসঞ্চার করেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ। প্রায় দীর্ঘদিন পর তাঁর লোভনীয় সংগীতের নতুন আস্বাদ পেল কলকাতার মানুষ। বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তার উপর দুঃসহ পক্ষাঘাতেও তিনি আক্রান্ত। অথচ তা সত্ত্বেও তাঁর আবির্ভাব ঘটলো মহাজাতি সদনে এবং তাঁর অক্লান্ত কণ্ঠে সেদিন এক সঙ্গেই হঠাৎ ছন্দসী হয়ে উঠলো ঈশান মেঘের গর্জন ও নীপবনের বংশীধ্বনি। রুগ্ন, ক্লান্ত দেহভার নিয়ে তিনি সেদিন ইমনরাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে খেয়াল এবং পরিশেষে দেশ রাগের ভিত্তিতে ঠুংরি পরিবেশন করে সত্যিই চমৎকৃত করেছেন প্রত্যেক শ্রোতাকে। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ মুনাব্বর খাঁ।

এই দিনের আরেকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁর সেতার বাদন। তিনি ঝিঁঝিট রাগে আলাপ ও গৎ এবং পরে ধুন বাজান। সবশেষে শ্রোতাদের একান্ত অনুরোধে তিনি সেতারের মতো ভারি যন্ত্রের মাধ্যমে কাজরী ও বাউল সুর পরিবেশন করেন। সেতারের তারে তারে খাঁ সাহেবের দরদভরা ঝঙ্কার ও সুরনির্ঝরের বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। তাঁর এই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের গভীর রস প্রতিটি শ্রোতা সেদিন প্রাণভরে উপভোগ করেছেন।

তাছাড়া সেদিন শ্রীশক্তি বসুর কেদারা রাগে খেয়াল এবং শ্রীকরুণা সরকারের কথক নৃত্যের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণরস ছিল।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১৯শে এপ্রিলের অধিবেশনই সমাপ্তি অধিবেশন। এ দিনের অনুষ্ঠান চলে সমস্ত রাত ধরে। পূর্বভারতীর উদ্বোধন সংগীতের পর বিলম্বিত ও দ্রুত কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীচিন্ময়ী মুখোপাধ্যায় এবং ভারত-নাট্যমে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীলিপিকা গুপ্ত। তারপর মালকুঞ্জে, বিলম্বিত এবং সারঙের অঙ্গ মেঘ রাগে দ্রুত খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে তবলায় শ্রীশংখ চট্টোপাধ্যায় এবং সারেঙ্গীতে শ্রীবচন মিশ্র অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে কথক নৃত্যের মাধ্যমে বহু বিচিত্র ছন্দ ও কলা কৌশল প্রদর্শন করেন কুমারী মায়া চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই মঞ্চে এসে আবির্ভূত হন শুভ্রবসনা সুদর্শনা সুনন্দা পট্টনায়ক। তিনি মিয়াকী মল্লার রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল পরিবেশন করার পরই অপূর্ব কণ্ঠ মাধুর্যের মাধ্যমে উপস্থিত করেন চমক লাগানো তারানা। তারানার পর তাঁর নিজস্ব ঘরোয়ানার একখানি ভজন গেয়েও তিনি শোনান। তাঁর মধুর কণ্ঠের উদার আকাশতলে সেদিন সংগীত যেন মুক্ত বিহঙ্গের মতো আনন্দের ডানা বিস্তার করেছিল।

শ্রীসুনন্দা পট্টনায়কের পর পণ্ডিত ভি, জি, যোগ প্রথমত হাম্বীর রাগে বেহালায় খেয়াল বাজান এবং শেষে কাফী টোড়ীর ভিত্তিতে ঠুংরি পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় অংশ গ্রহণ

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করছেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁন

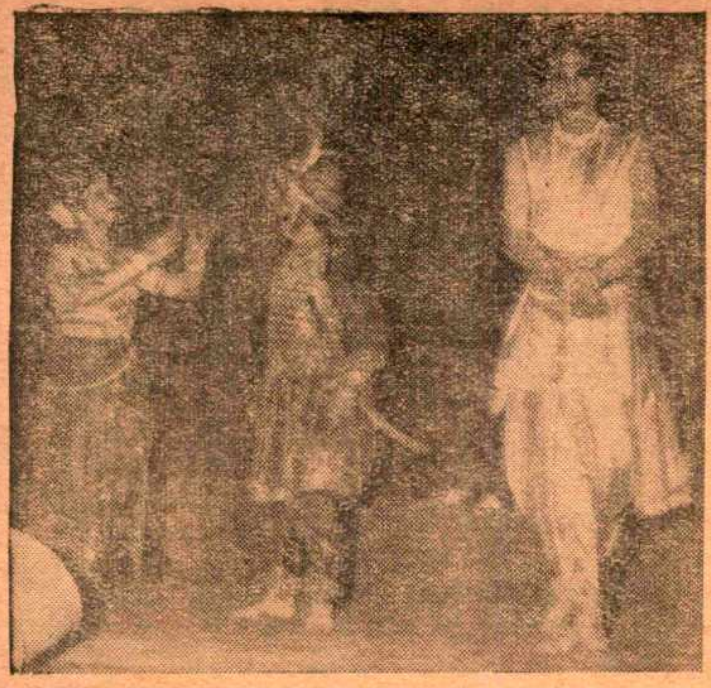

রূপসাজি পরিবেশিত পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মঞ্চে শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

করেন ওস্তাদ আল্লারাখা। শ্রীভি, জি, যোগের বেহালা বাদন কোনো বিশেষণের অপেক্ষা রাখে না। এক কথায় তা অতি উচ্চগ্রামের। সংগীতের অন্তিমপর্বে শ্রীযোগ এবং ওস্তাদ আল্লারাখার মধ্যে তালের সংগ্রাম সুরু হয় এ-সংগ্রাম যে কত মধুর এবং কত দুঃসাহসিক তা চোখে না দেখলে ঠিক অনুভব করা যায় না। অবশ্য প্রতিযোগিতার খাতিরে পাঁড়ে করুণ বেহালার বিন্যাসরণন খানিকটা ব্যাহত হলেও, রসভঙ্গ হয়নি।

গায়ে জ্বর নিয়ে আসেন শ্রীভীমসেন যোশী। অসুস্থ শরীরেও তিনি অফুরন্ত মেজাজ নিয়ে বিলম্বিত এবং দ্রুত লয়ে খেয়াল পরিবেশন করেন ললিতরাগে। খেয়ালের পর তিনি পরিবেশন করেন ভজন। তাঁর বিপুল সম্পদশালী কণ্ঠ প্রতিটি শ্রোতার মন জয় করে অতি সহজেই। তাঁর সর্বশেষের ভজনের পরেও শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আবার কিছু পরিবেশন করার জন্য সংঘবদ্ধ অনুরোধ আসে। কিন্তু শরীরের অসুস্থতার দরুণ তিনি সে অনুরোধ রাখতে পারেননি।

শ্রীযোশীর পর শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় আহিরী-ভায়রোতে সরোদ পরিবেশন করেন। হাত তাঁর যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই মিষ্টি এবং মধুর। তাঁর বাদ্য-রীতির সুবিন্যস্ত গতি সংগীত গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁনের ঘরোয়ানাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবার শেষে আসেন ওস্তাদ আমীর খাঁ—মেজাজ যাঁর সাধনাসিদ্ধ মুনির মতো এবং কণ্ঠে যাঁর শান্ত সমুদ্রের গভীর ব্যঞ্জনা। তিনি নট-ভৈরবীর সমাহিত স্বরগ্রামে দ্রুত এবং বিলম্বিত লয়ে খেয়াল পরিবেশন করেন। তাঁর অপূর্ব সুর লহরীর আশ্চর্য মূর্ছনায় সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে নেমে আসে এক স্বর্গীয় ভাবালোক তিনি একটানা গেয়ে গেছেন প্রায় ঘন্টাদুয়েক। এই দীর্ঘ সময় সমস্ত শ্রোতা অবাক হয়ে শুনছিলেন তাঁর গান, তাঁর দরদী কণ্ঠের সংযত তরঙ্গধ্বনি। মনে হলো যেন তাঁর সুরে সুরেই অন্ধকার সরে গেল, এলো শান্ত উষা, তারপর উষার ললাটেই রক্তবর্ণ রাজতিলকের মতো আবির্ভূত হলো সূর্য সূর্য এসেই ঘোষণা করে সমাপ্তি। সমাপ্তি ঘটে এ বৎসরের মতো পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন।

সুরঙ্গমার "নবীন"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রচারে সুরঙ্গমার ভূমিকা সক্রিয়। গত ৭ই এপ্রিল রক্সী সিনেমায় এঁদের পরিবেশিত "নবীন" নৃত্য-গীতালেখ্য পরিবেশনে সে ভূমিকা অক্ষুণ্ণই ছিল। রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বন্দনায় "নবীন"-এর গানগুলো বিশেষ অর্থবহ। বলিষ্ঠ যৌবনের সেই আহ্বান মন্ত্র সেদিনের অনুষ্ঠানে মূর্ত হয়েছিল। নীলিমা সেনের "বাজে করুণ সুরে" অনেক বসন্ত নিশীথের স্মৃতি উদ্বেল করে তুলেছিল। পূর্ণিমা ঘোষ দিয়ালী সেনের নৃত্যে ("সে কি ভাবে গোপন রবে" ও "আজ দখিন-বাতাসে") নিমন্ত্রণ ছিল নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালার উৎসব-প্রাঙ্গণে। এ রকম অনুষ্ঠানে, যেখানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বক্তব্যের রূপায়ণ সম্ভব, সেখানে পাঠ ও গ্রন্থনার নামে এক অসহ্য ন্যাকামির উৎপাত কেন বোঝা গেল না। আর রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য বা গীতি-আলেখ্যে মঞ্চের পেছনে গানের দল কবে অন্তর্হিত হবে। শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে এই প্রথার যৌক্তিকতা খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু কলকাতার সাজানো স্টেজে, সামনে যখন শ্যামা-বজ্রসেনের অভিনয় চলেছে, কিংবা সখীদের সাথে চিত্রাঙ্গদা চলেছেন মৃগয়ায়, বা ধীরে ধীরে কোনো নাচের মধ্যে রূপ নিচ্ছে বসন্ত, তখন পেছনে একদল ধুতি-সার্ট শাড়ি ব্লাউজ-ওয়ালা ভদ্রলোক —ভদ্রমহিলার উপস্থিতি শুধু বিরক্তি-করই নয়। তা সমস্ত অনুষ্ঠানের তাল ভঙ্গ করে বলে আমার বিশ্বাস।

"রূপকার"-এর "তিলতর্পণ"

প্রহসনকার অমৃতলালকে নবনাট্যের যেসব প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, "রূপকার"-অভিনীত "তিলতর্পণ" তার মধ্যে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। অমৃতলালের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আর নাগরিক রসবোধ "তিলতর্পণ"-এ বিশেষভাবে উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র নাট্যরূপ দিয়ে নাটকের সুরু হয়ে (একটি থিয়েটারে নাটক অভিনয়ের দৃশ্য হিসেবে উপস্থাপিত) থিয়েটার-মহলের ভেতরের সব ব্যাপারগুলো দর্শকের

সামনে উদ্ঘাটিত হয় এবং পেশাদারী মঞ্চ, বিকৃত অভিনয়ধারা, অভিনেতৃ-সমাজ, কাগুজে সমালোচক, নাটকের এই বিচিত্র জগতে তির্যগ্ দৃষ্টি নিক্ষেপে অমৃতলালের বিদ্রূপ ও পরিহাস-নিপুণতার পরিচয় পাই। আপাত অসংলগ্ন দৃশ্যাবলী এবং প্রহসন, ট্র্যাজেডি, বীররস ও কমেডির সমাহারে গঠিত নাট্যরঙ্গ একটি ক্ষীণ সূত্রে গ্রথিত হলেও সম্পূর্ণতার আভাস মেলে অন্ত শেষ পর্যন্ত অভিনয় সৌকর্য্য ও উপস্থাপনার গুণে অসম্ভাব্য ঘটনাবলীই রসের উৎস হয়ে ওঠে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শিত দুটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র

সাধারণভাবে বিদেশ থেকে ছকবাঁধা ছবি ছাড়া আমাদের দেশে চলচ্চিত্র প্রচেষ্টার বিশিষ্ট নিদর্শন দেখতেই পাওয়া যায় না। তাই রসিক দর্শক সাধারণ অভাবতঃই ফিল্ম-সোসাইটি আয়োজিত প্রদর্শনীতে বিশেষ উৎসাহবোধ করেন। গত ১২ই এপ্রিল ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে চেক চলচ্চিত্র "রোমিও জুলিয়েট অ্যাণ্ড ডার্কনেস" প্রদর্শিত হয়েছিল। পরিচালক জিরি ওয়াইস (এঁর আগের ছবি "দি উইফ্ ট্র্যাপ"ও আঙ্গিকসিদ্ধিতে উজ্জ্বল) নাৎসী-কবলিত প্রাগে এক চেক যুবক ও একটি ইহুদী মেয়ের (যাকে ছেলেটি নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল) প্রেমকে কেন্দ্র করে এক অপূর্ব কাব্যিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। সম্পর্কের সুষম বিকাশ ও ঘটনার ট্র্যাজিক পরিণতি দর্শক-মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। নাৎসী বিভীষিকা ছবিটিতে সুস্পষ্ট, অথচ কোথাও মোটা দাগে চিত্রিত নয়। অযথা ভাবাবেগকেও কোথাও প্রশ্রয় দেননি পরিচালক। শহরের আনাচে-কানাচে ডাইনী শিকারী গেষ্টাপো-দলের ঘোরাফেরা, রাজপথে মিলিটারী-ট্রাকের সতর্ক প্রহরা, ব্যাফলওয়াল্, ল্যামপোষ্টের গায়ে-গায়ে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা, অহরহ রেডিওতে ফ্যাসিষ্ট নেতার আতঙ্কর হুঙ্কার, এরকম খণ্ড খণ্ড অংশে পরিচালকের যুগচেতনার আভাস মেলে। আবার বন্দী নায়িকার দিবাস্বপ্ন, মেঘ আকাশের বিরাট প্যানোরামিক শটে নায়ক নায়িকার মনে বিশ্বনাচের দোলা বা তারভরা আকাশের নীচে তাদের নির্জন সংলাপ এই দৃশ্যগুলো আমাদের চিত্র-শব্দ মিলনে তৈরী এক অপূর্ব রসলোকে পৌঁছে দেয়। গত ১৪ই এপ্রিল দেখানো হল জাক্ তাতি পরিচালিত "মসিয়ে হুলোজ হলিডে।" যুদ্ধোত্তর ফরাসী চলচ্চিত্রে তাতি-প্রতিভার অবদান সজীবতার আভাসে উজ্জ্বল। পুরোণো ফরাসী কৌতুকচিত্রে অসম্ভব-নির্ভর ভঙ্গী ও শ্ল্যাপষ্টিকের সমাবেশে তাতির ছবিতে চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের নিপুণ পরিবেশন উল্লেখ্য। সেজন্যই তাঁর ছবিতে সংলাপ গৌণ, বিভিন্ন ইমেজের শিল্পসম্মত ব্যবহারে বক্তব্য পরিস্ফুট। ফ্রান্সের এ সমুদ্রসৈকতে অবকাশ-ভোগীদের মজার কাণ্ডকারখানা এ ছবির বিষয়বস্তু। শিশুর নিষ্পাপ সারল্য আর বয়স্কসুলভ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিণত। তাই তাঁর ব্যঙ্গতে হুল নেই, আর মানবিক সম্পর্কের গভীরতায় আস্থাজ্ঞাপনেই ছবিটির সমাপ্তি।

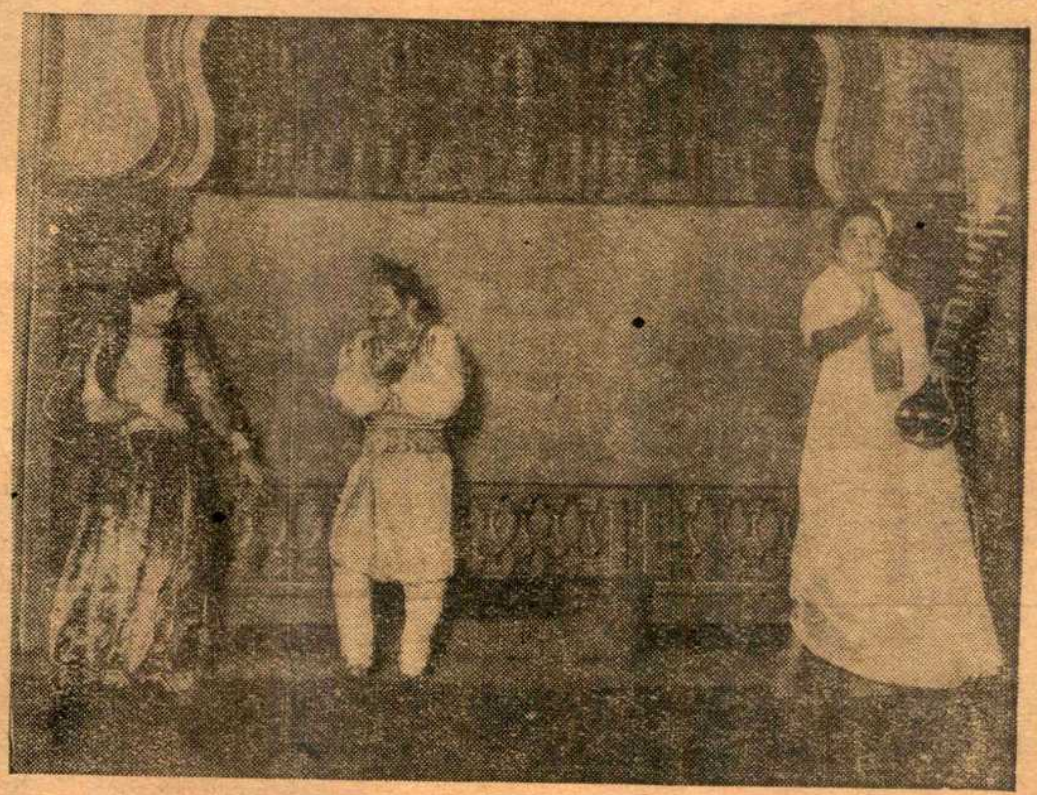

তিলতর্পণের একটি দৃশ্য

খেলা ধুলা

ক্রিকেট ও তার ধর্ম্ম

ক্রিকেট কি? 'With Cricket, one frequently conjures up the lovely idyllic picture of sylvan green, the charm of sitting under the shade of an old oak tree, sipping beer, as time slowly ticks by.'

ক্রিকেটের ধর্ম্ম কি?—'ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, মেলা; মেলা এবং মেলানোই তার ধর্ম্ম!'

কিন্তু কোলকাতার ক্রিকেট বিপরীতধর্ম্মী। এখানে ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তা থেকে শুরু কোরে খেলোয়াড় আর দর্শক সবাই ক্রিকেটের এই সাবেকজনীন ধর্ম্মকে বিস্মৃত কোরে

বি, এন, আর দলের সুজিত বসু। কলকাতার ক্রিকেট রসিকদের কাছে তিনি ক্রীড়ার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভুলেছেন। ইষ্টবেঙ্গল বনাম কালীঘাটের ক্রিকেট লীগের খেলায় অন্যতম আম্পায়ারের ওপর উচ্ছৃঙ্খল দর্শকের হামলা, আন্তঃ অফিস ক্রিকেট লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় জে, ষ্টেনসের জনৈক খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং সদ্য সমাপ্ত নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বি, এন, আর দলের খেলোয়াড় এবং আম্পায়ারদ্বয়ের ওপর মারমুখী দর্শকের হামলা, ক্রিকেটের সুললিত বাণীকেই নস্যাৎ কোরে দিয়েছে।

অথচ এর প্রতিকারের কোনও প্রচেষ্টা নেই। সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলো নিয়ম মাফিক দুঃখ প্রকাশ কোরেই গুরুদায়িত্ব পালন কোরছেন, আর রাজ্য ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল লোক-দেখানো সভা কোরেই ঘটনাগুলো ধামাচাপা দিতেই সচেষ্ট। ফলে উচ্ছৃঙ্খলতার দিন দিনই মাত্রাধিক্য ঘটছে এবং সাধারণ দর্শক থেকে এখন কর্ম্মকর্ত্তা ও খেলোয়াড়েরাও এই রোগে সংক্রামিত হোয়েছেন।

খ্যাতনামা ক্রিকেট-গ্রন্থ 'উইস-ডেনের' শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রেরিত বাণীতে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস বলেছেন —'If the art of Cricket is to survive, spectators must contribute to its survival.' স্যার মেঞ্জিস দর্শকদের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন, কিন্তু যেখানে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে ক্রিকেটের সহজ, সাবলীল গতিই বিঘ্নিত হোচ্ছে, সেখানকার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কি সম্পূর্ণই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়?

স্থানীয় ক্রিকেটে, সর্ব্বশেষ অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটেছে নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, মেহ্‌রা ট্রফির ফাইনালে, বি, এন, আর বনাম মোহনবাগানের খেলায়। বি, এন, আর চারদিনব্যাপী এই খেলায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ১১৯ রাণে পরাজিত কোরে সর্ব্বপ্রথম মেহ্‌রা ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব অর্জ্জন কোরেছে। এই সাফল্যের জন্যে বি, এন, আর দল নিশ্চয়ই গৌরববোধ কোরতে পারে, কিন্তু বিজিত দলের একদল উগ্র সমর্থক তাদের জয়লাভকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি, ফলে এই অনর্থের সৃষ্টি।

এই সব উগ্রপন্থী দর্শকদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিই,—'ক্রিকেট শুধু খেলা নয় মেলা; মেলা ও মেলানোই তার ধর্ম্ম!'

বিশ্ব টেবিল টেনিসে চৈনিক ভোজবাজী

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শুধুমাত্র দলগত বা একক প্রতিযোগিতা-গুলোতেই নয়, আন্তর্জ্জাতিক টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনেও চৈনিক ভোজবাজী কিন্তু মাৎ কোরেছে। এসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক নির্ব্বাচনে সহ-সভাপতি এবং পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী ভারতের আর, রামানুজম চীনের চেন-সিয়েনের কাছে পরাজিত হোয়েছেন। রামানুজম শুধুমাত্র আন্তর্জ্জাতিক এসোসিয়েশনেরই সহ-সভাপতি ছিলেন না,—এশীয় ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেলও

কলকাতার ক্রিকেটে কালীঘাটের বাদলচন্দ্র একজন নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান

বটে। চীনের প্রতিনিধির কাছে তাঁর এই পরাজয় আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে সুনিশ্চিতভাবেই মর্য্যাদাহানিকর।

আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের মর্য্যাদাহানির অপচেষ্টা চীনের এই প্রথম নয়। গত বছর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্ত্তায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসেও চীনের কূটনীতি ভারত-ইন্দোনেশিয়ার মধুর সৌহার্দ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা কোরেছিল। ফলে আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটীর প্রতিনিধি ভারতের শ্রী জি. ডি, সোন্ধীর জীবননাশের আশঙ্কাও দেখা দেয়। ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে মাঠের অংশীদার হবার পর মোহনবাগান ক্লাব ক্যালকাটা মাঠে তাঁদের পতাকা উত্তোলন ও বোর্ড স্থাপন করেন।

নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তায় এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটীর কঠোর মনোভাবের দরুণ চৈনিক দুরভিসন্ধি কখন বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

কিন্তু চৈনিক অপপ্রচার এবং রাজনীতি যে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় ছিল, সেটা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হোয়েছে শ্রীমানুজমের পরাজয়বরণে। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনের ভারত আক্রমণের ফলে বর্ত্তমান এশীয় টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের ভেতরে যাতে ভাঙ্গন না ধরে, সে প্রচেষ্টায় ভারতই ছিল অগ্রগামী। বিশ্বাসঘাতকতা আর কা'কে বলে।

অতীত-বর্ত্তমানের যোগসূত্র

কালাধন মুখার্জ্জী

"জন্মিলে মরিতে হ'বে
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির করে নীর
হায় রে জীবন-নদে!"

মৃত্যু স্বাভাবিক, কিন্তু কারও মৃত্যু যদি অতীত এবং বর্ত্তমানের যোগসূত্রকে ছিন্ন করে, তবে সে মৃত্যু সমগ্র দেশের পক্ষেই ক্ষতিকারক। প্রবীণ ক্রিকেটার কালাধন মুখার্জ্জী ছিলেন সেই গৌরবেই গৌরবান্বিত। শুভ নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে তাঁর মৃত্যু স্থানীয় ক্রিকেট জগতের অতীত এবং বর্ত্তমানের যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্ন কোরে দিয়েছে।

কালাধন মুখার্জ্জীর পরিচিতি এ-যুগের নবীন ক্রীড়ামোদীদের কাছে স্বল্প। যে যুগে তিনি নিজেকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যময় সেই যুগে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই সীমিত। এমন কি ইডেন উদ্যানের ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের অধিকারও ছিল নিতান্তই গৌরবের কথা। কালাধন মুখার্জ্জী সেই স্বল্প কতিপয় তরুণেরই অন্যতম, যাঁরা ছিলেন সে-যুগে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল।

দুঃখীরাম বাবুর মন্ত্রশিষ্য, এরিয়ান ক্লাবের নিজস্ব খেলোয়াড় কালাধন মুখার্জ্জী প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরবর্ত্তী ক'বছরে প্রতিটি প্রতিনিধিমূলক খেলায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯২৫-২৬ সালে আর্থার গিলিগ্যানের নেতৃত্বে ভারত সফরকারী এম, সি, সি, দলের বিরুদ্ধে ইডেন উদ্যানে সম্মিলিত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—ইণ্ডিয়ান দলের পক্ষেই তাঁর সর্ব্বশেষ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ।

কালাধন মুখার্জ্জী পরিণত বয়সেই পরলোকগমন কোরেছেন। তাঁর বিদ্রোহী আত্মা পরম শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনাই করি।

ষ্টেডিয়ামবিহীন ময়দানে ভাঙ্গা-গড়ার পালা

ময়দানে ক্লাব ভাঙ্গা-গড়ার পালা শুরু হোয়ে গেছে। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর পর পুরণো মাঠ, তাঁবুর মায়া ত্যাগ কোরে মোহনবাগান অংশীদার হোয়েছেন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। এদিকে এরিয়ান ক্লাবও এসে দখল নিয়েছে মোহনবাগান মাঠে, ইষ্টবেঙ্গলের ভাগীদার হিসেবে। ক্যালকাটা মাঠে যেমন শুধু মোহনবাগান আর ক্যালকাটা ইষ্টবেঙ্গল বা মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে অবস্থা তেমনটি নয়। ইষ্টবেঙ্গল-এরিয়ানের সঙ্গে ফেউ জুড়ে দেওয়া হোয়েছে আই, এফ, এর বেতনভুক্ সম্পাদক এম, দত্ত রায়ের স্নেহধন্য স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবকে। আবার এরিয়ানের তাঁবু দেওয়া হোয়েছে হাওড়া ইউনিয়নকে—মাঝখানে থাকবে রাজস্থান।

কে কোথায় স্থান পেল, সে প্রসঙ্গ আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু রাতারাতি ইষ্টবেঙ্গল মাঠে স্পোর্টিং ইউনিয়নের স্থানলাভ শুধু বিসদৃশই নয়, 'নেপোয় মারে দই'-এর অবস্থা। চতুর্থ ঘেরা মাঠের দাবী যাঁরা পঃ বঃ সরকারের কাছে গত

ভেক্‌সিন অয়েণ্টমেণ্ট (তরল)
(রেজিষ্টার্ড)
টিকা, হাজা, ক্ষত, বসন্ত, ফোড়া সারিয়া যায় ও ত্বকের লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ, ডজনে ডাকমাশুল ফ্রি ৭.৫০
২/১এ ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
VACCINE LABORATORY V.L.C CAL

কয়েক বছর ধরে উপস্থাপিত কোরে আসছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন এবং রাজস্থানের দাবী স্বীকৃত হোয়েছে বটে, কিন্তু জর্জ্জ টেলিগ্রাফ, উয়াড়ী প্রমুখ দলগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোরে এমন একটি ক্লাবকে ঘেরা মাঠে জায়গা দেওয়া হোল, যাঁরা প্রথম থেকেই চতুর্থ ঘেরা মাঠ এবং ঘেরা মাঠে পুনর্ব্বাসনের দাবীকে পুরোপুরি বিরোধিতা কোরে এসেছে।

এই ভাঙ্গা-গড়ার উদ্যোগী পঃ বঃ সরকার। কিন্তু সত্যিই কি এই বিরাট পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ছিল? বাংলার ক্রীড়ামোদীদের বহুদিনের দাবী একটা ষ্টেডিয়াম। সেই দাবী কেন রাজ্য সরকার উপেক্ষিত কোরে রেখেছেন? কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইতালীয় স্থপতিবিদ্ ভিটেলাজিকে

যোগীন্দর সিং

দিয়ে ষ্টেডিয়ামের যে নক্সা তৈরী করা হোল, মহাকরণের মহাফেজখানায় আর কতদিন সেটা ফাইল বন্দী হোয়ে থাকবে? অথচ একটা ষ্টেডিয়ামই কোলকাতার খেলাধূলার যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারতো,

প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলি এবার "পদ্মশ্রী" লাভ করেছেন

•

এত ওলট-পালটের প্রয়োজন হোত না। বারংবার ক্রীড়ামোদীরা ষ্টেডিয়ামের দাবী জানাচ্ছেন, আর বারংবারই সরকারী নিষ্ক্রিয়তায় সে দাবী অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। ক্রীড়ামোদীরা এখন ভাবছেন—'হায় ষ্টেডিয়াম, তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে আঁকা?'

হকি

বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় মোহনবাগান এবং সাউথ ইষ্টার্ণ রেলদল—উভয়েই পরাজয় বরণ কোরেছে। রেলদল বোম্বাইয়ে আদৌ সুবিধে কোরতে পারেনি মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইন্যালে জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ পরাক্রমশালী সার্ভিসেসকে পরাজিত কোরেও সেমিফাইন্যালে পাঞ্জাব পুলিসের বিরুদ্ধে তিন গোলে পরাজয় বরণ কোরেছে।

মোহনবাগানের এই বিলম্বিত প্রত্যাগমনের জন্যে স্থানীয় সিনিয়র ডিভিশন হকি লীগের শেষ পর্য্যন্ত পরিসমাপ্তি হবে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হোয়ে গেছে এবং হকি মরশুমের মেয়াদও মে মাসের ৮।১০ তারিখ পর্য্যন্ত। মোহনবাগান সহ বাইটন কাপে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বহিরাগত দলগুলোরও কয়েকটি আমন্ত্রণমূলক হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কোরবে। ফলে, বাইটন কাপের গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্য্যায়ের খেলাগুলোই সম্পন্ন হবে অনেক দেরীতে। এর ভেতরে আবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসিত হবে কবে?

প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
গ্রন্থাবলী
৬খানি সেরা বই—২৷৷০
দি বসুমতী প্রাইভেট লঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
কটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্ম্মরোগে
সালফা-ডারমিন
ও, আর, সি, এল, লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

Viewing the world through glass

With GLASS it's more view and more room too ! Wherever it goes Glass opens up exciting new possibilities. Gone is that cramped, confined, closed-in feeling. The bright, cheerful, open look is in.

And glass goes everywhere. To homes, hotels, hospitals—to offices, schools and stores. In windows and doors, in buses and cars.

Manufactured in India by Hindusthan-Pilkington Glass Works Limited, quality tested sheet glass is available in a wide variety of sizes and thicknesses to suit every purpose.

For the finest, most durable glass you can depend on

HINDUSTHAN-PILKINGTON GLASS WORKS LIMITED

Managing Agents: **Talukdar Law & Company Private Limited**

Hindusthan Buildings, 4 Chittaranjan Avenue, Calcutta 13

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 25th April, 1963
PHONE : { 34-3487 / 34-3488 GRAM : "BASUMATI" Price : 25 nP.

25 APR 1963

BAWA
Glass E-Crockeries Private Ltd.

TEA	SET	Rs.	8/-
LEMON	SET	Rs.	4/-
FRUIT	SET	Rs.	2/-

63-H, Radha Bazar Street, Calcutta.

Phone : 22-1494

* CROCKERY
* CUTLERY
* GLASS WARE
* WINDOW GLASS
* PLY WOOD
* HARD BOARD
* SOFT BOARD

AGENTS

BAWA POTTERIES' CROCKERY

BAWA AGENCIES PRIVATE LTD.

BRANCHES ALL OVER INDIA

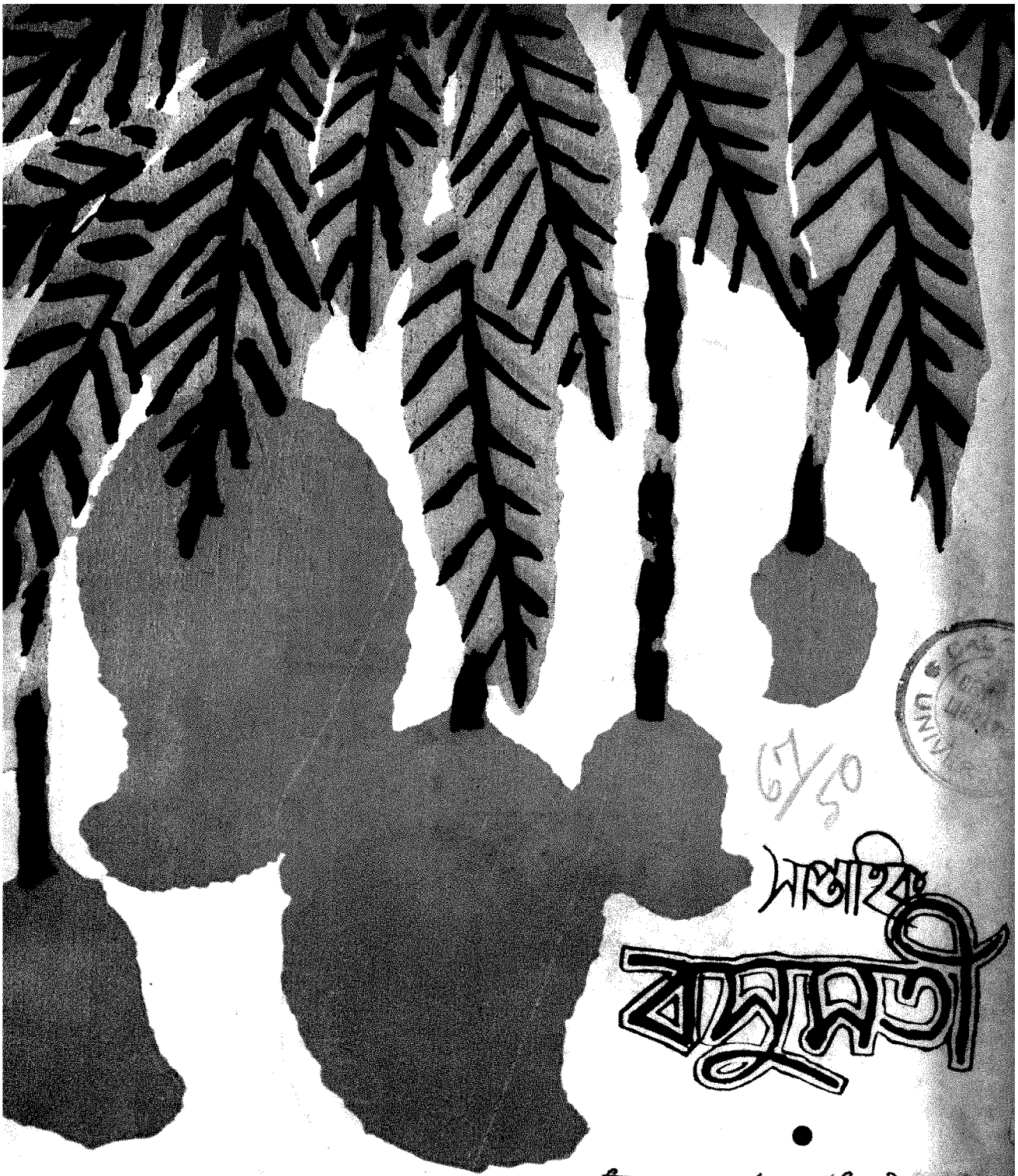

৫/১০

সাপ্তাহিক

বসুমতী

বিশেষ আকর্ষণ ঃ—"দিল্লী থেকে"

৬৭ বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৮ই বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

হিমানী

খিসারিণ সাবান

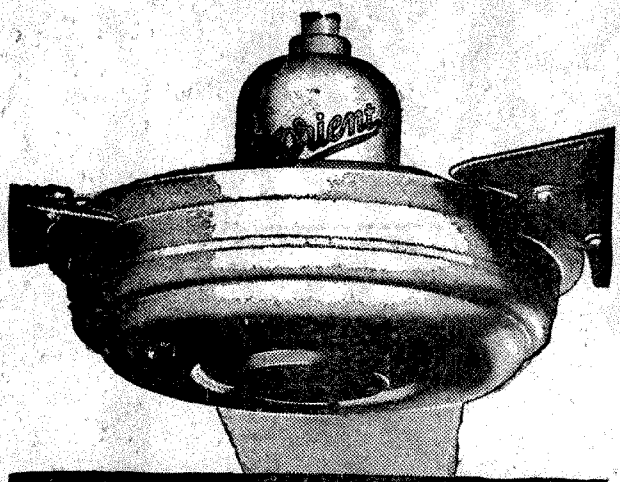

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH
BETTER ENGINEERING

Orient
FANS

Years ahead in looks and performance

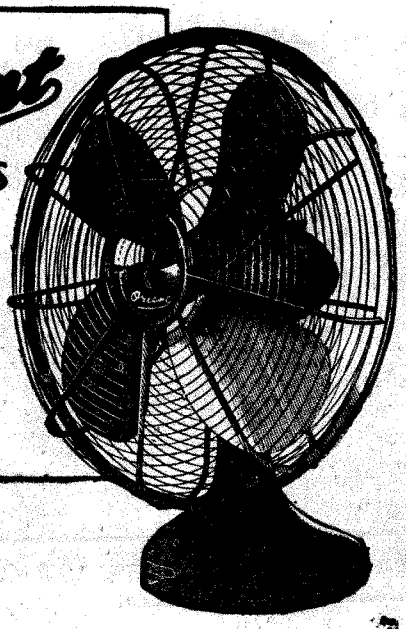

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-18

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দিল্লী থেকে	শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৭
ভ্রান্তি বিলাস	শ্রীশান্ত রক্ষিত	২৩
মহানগর (গল্প)	শ্রীসুভাষ সমাজদার	২৫
বঙ্গদর্শন	...	৩১
আন্তর্জাতিক	...	৩৩
ভারতীয় লেখক	বৈশম্পায়ন	৪১
শিব সদাগরের খাতা	দিগ্‌দর্শক	৪৩
রঙ্গজগৎ	...	৪৫
খেলাধূলা	...	৪৭

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
গ্রন্থাবলী
মূল্য সাড়ে তিন টাকা
কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।
বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে
ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব
—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—
কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।
বিখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী
১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মণিলাল গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲
রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷০
প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্ব্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক
রচিত কয়েকখানি
ভাল বই
স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী
৬ষ্ঠ ভাগ—প্রতি খণ্ড ৷৷০
শিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী ৸০
মায়াদেবী বসুর—
আঁখর ভলে ৸০
সরসীবালা বসুর—
শিবানী ৷৷০
বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ৷৷০
চারুবালা বসুর—
পতিব্রতা ৷৷০
কাঞ্চনমালা দেবীর—
স্তবক ও রসির ডায়ারী একত্রে ২৲

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আজকের মানুষ

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-লিট

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে যে-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ রত্নগর্ভা বঙ্গজননীর কোল আলো করেছেন, যাঁদের সেবা, সাধনা ও মহান কীর্তির মহিমায় দেশ হয়েছে মহিমামণ্ডিত, দেশগৌরব বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হলেন তাঁদেরই একজন।

লণ্ডনের ডি লিট, সাহিত্য-বাচস্পতি, বহু ভাষাবিদ্, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভাষাচার্য, বাণীর এই বরেণ্য সন্তানের প্রতিভা ও অপরিমেয় মনস্বিতার পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নয়। ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি কেবল ভারত নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম পথিকৃৎ।

দেশে ও বিদেশে এমন কোন পণ্ডিত সমাবেশ এখন আর হয় না, যেখানে সুনীতিকুমার আমন্ত্রণের অধিকারী নহেন। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি নিজের গৌরবে সারা বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির দূতের আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছেন।

১৮৯৪ সালে ২৬শে নভেম্বর রাসপূর্ণিমার দিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রের সময় শিবপুরে (হাওড়া) মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। এমনি লগ্নে জন্মেছিলেন ভারতের আর একজন মহাপুরুষ—গুরুনানক।

শৈশব থেকেই সুনীতিকুমার ছিলেন মেধাবী ছাত্র। এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন জলপানি পেয়ে। ইংরেজী অনার্সে বি-এ পরীক্ষায় অধিকার করেছিলেন প্রথম শ্রেণীতে শীর্ষস্থান। অন্যান্য পরীক্ষার মতোই এম-এ পরীক্ষায় কৃতকার্যদের নামের তালিকায় তাঁর নামটি ছিল প্রথম।

১৯১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ এবং জুবিলি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন।

সুনীতিবাবু শুধু পণ্ডিত নন, তিনি শ্রদ্ধাবান আদর্শ শিক্ষক, প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, সুরুচি-সম্পন্ন চিত্রকর, সহৃদয় বন্ধু এবং মজলিসের আসরে "প্রিয়দর্শন দাদাঠাকুর"। এক কথায় বলতে গেলে তিনি আদর্শ পুরুষ। মেজাজটি তাঁর ঠিক বৈঠকী ধরণের। পাণ্ডিত্যের গর্বে তাঁর চিত্ত উৎপীড়িত নয় বলেই তাঁর চরিত্রে এত গুণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্থাপন করেছেন নূতন আদর্শ। এমন ঘনিষ্ঠ গুরুশিষ্য সম্পর্ক বর্তমানকালে খুবই বিরল।

এমন কোন রসভাণ্ডার নেই যেখানে তাঁর মন একবার ডুব মারে নি। বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন সুনীতিকুমার সুরসিকও বটেন। তাঁর আঁকা ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছেন। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন, শিল্প সাধনায় অ আনিয়োগ করলে তিনি শিল্পীরূপেও সহজেই খ্যাতিলাভ করতে পারতেন।

শিবভক্ত সুনীতিকুমার শিবের মত উদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মময় জীবনে, দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ রাজ্য বিধান পরিষদের অধিবেশনে তাঁর সংযম ও সহিষ্ণুতা সহজে অপরকে আকর্ষণ করতে পেরেছে।

তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতের সামগ্রিক রূপের সাধক। তাই জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রয়াসে তিনি হিন্দী ভাষার সমর্থক ছিলেন। সেই ঐক্যের প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা দেখে ভাষা কমিশনের রিপোর্টে তাঁকে দিতে হয়েছে ভিন্ন মত।

রাষ্ট্র তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়েছে। তাঁর মত গুণীর সমাদরে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মর্যাদাই বেড়েছে।

প্রথম যুগের কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার অবস্থাগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র না থাকলেও প্রকৃতিগত মিল রয়েছে বেশ। দু'শো বছরের ব্যবধানেও কলকাতার কতকগুলো সমস্যা আজও এক। আজ কলকাতায় গাছ-পালা জঙ্গলের পরিবর্তে ইট-কাঠের অরণ্য। জলাভূমির পরিবর্তে পথ আর গলি। বাড়ি আর বাড়ি।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক পুরাতন শহরের মতন কলকাতাও গড়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদে। তার বাসভূমি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান ও তার যাতায়াতের পথ সমস্তই নিতান্ত প্রয়োজনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যেখানে যেমন খুশী এইভাবেই বেড়েছে কলকাতা। এসেছে মানুষের পর মানুষ। কিন্তু কলকাতা পরিচ্ছন্ন হয়নি কখনও। সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ইংরেজরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে তুলেছিল মূলত ব্যবসা বাণিজ্যের এবং রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে। তখন নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন কলকাতা ম্যালেরিয়া, টাইফায়েড ও কালাজ্বরে বিভীষিকাময়—অপরদিকে বাণিজ্যের টানে সেখানে মানুষের আগমন ধারা ছিল অব্যাহত।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কলিকাতার চলাফেরা' গ্রন্থে তখনকার নোংরা ও জঞ্জালপূর্ণ কলকাতার বিবরণ আছে। "সেকালে আবর্জনাবাহী রেলগাড়ীর অবস্থা বড়োই শোচনীয় ছিল ... রেলগাড়ী চলিয়া গেলেও অবশিষ্ট অনেক আবর্জনা রাস্তায় জমিয়া থাকিত। তখন ঐ অবশিষ্ট আবর্জনা ছিটেফোঁটা জল পাইয়া কর্দমে পরিণত হইত, তখন তাহা পথিকদিগের জুতার তলায় বা পদতলে গুপ্তশত্রু মৌখিক বন্ধুর মত অথবা টিকটিকি কর্মচারীর মত সংলগ্ন থাকিয়া গৃহ পর্যন্ত আসিয়া নিরবচ্ছিন্নে পূর্ণ করিতে উদ্যত হইত।" কলকাতার এই বিষপূর্ণ পরিস্থিতির কথা রামতনু লাহিড়ীর অভিজ্ঞতাতেও ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেই যুগের কলকাতা যার আয়তন আজকের তুলনায় নগণ্য যার লোকসংখ্যা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনহীন, যার পথঘাট, পরিস্রুত জলধারা, পয়ঃপ্রণালী সবই আকিঞ্চিৎকর। আজকের বিংশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরপারেও এই বৈজ্ঞানিক যুগেও তার আবর্জনার স্তূপ, মশা ও মাছির আধিক্য, ব্যাধি ও মহামারী নিয়ত উদ্বিগ্নব্যাকুল করে তোলে কলকাতাবাসীদের।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিংশ শতকের আরম্ভে বা চতুর্থ দশক পর্যন্ত কলকাতার সমস্ত এত তীব্র ছিল না। প্রথমত বিশ্ব সেই সময়কার হঠাৎ

সেকালের আবর্জনাবাহী রেলগাড়ী

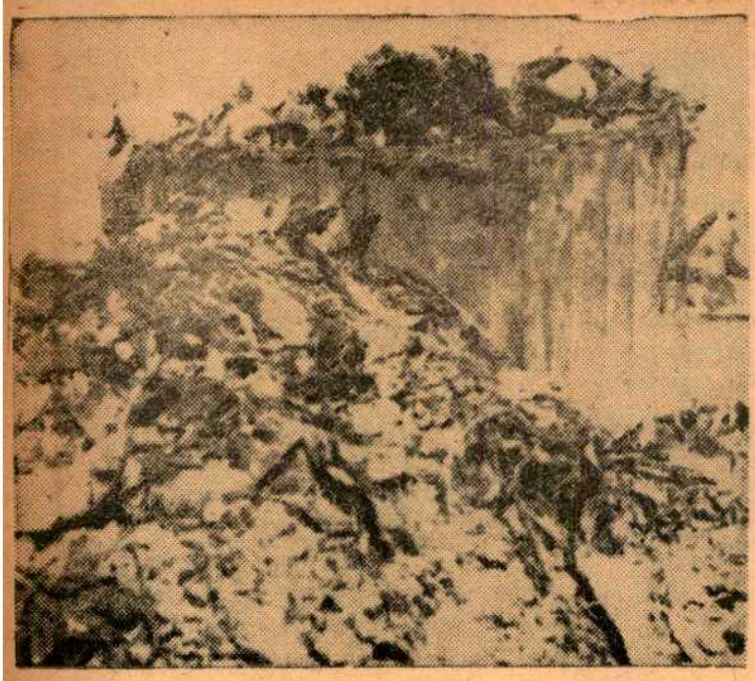

ডাষ্টবিন ছাপাইয়া ময়লা ও আবর্জনা রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। পরিষ্কার করিবে কে?

গড়ে ওঠা শিল্পের প্রাচুর্যে, দ্বিতীয়ত পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং তৃতীয়ত দেশবিভাগের ফলে কলকাতায় মানুষ বেড়েছে সংখ্যাতীত, নাভিশ্বাস উঠেছে কলকাতার বুকে। পানীয় জলের হাহাকার, পয়ঃপ্রণালীর পথ রুদ্ধ হওয়া, স্থানাভাব—এসব সমস্যা অতি প্রকট। বার্মিংহাম ও শিকাগোর জনসংখ্যা যেখানে প্রতি একরে ২৫ ও ১৩ জন, কলকাতায় সেখানে ১২৫ জন। এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় সমস্যা দেখা দেবেই। কিন্তু আবর্জনা মুক্ত করার ব্যবস্থা আজও ত্রুটিযুক্ত। যদি কলকাতার প্রথম যুগের কোন মানুষ আজ কবর থেকে উঠে আসে, সে একদিকে যেমন বিস্ময় বোধ করবে—কলকাতার বর্তমান চেহারা দেখে চিনতে পারবে না এই শহরকে কলকাতা বলে; অপরদিকে পথে বেরুলেই হঠাৎ তার মনে হবে, সব ছাপিয়ে এই ট্রাম বাসের ঘণ্টাধ্বনি, ঐ লাখ লাখ জনতার পথচলা, ঐ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা—সব কিছুর ভেতর সে দেখতে পাবে তার পরিচিত কলকাতাকে, যে কলকাতা নোংরায়, অপরিচ্ছন্নতায়, আবর্জনায় সেদিনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। যে কলকাতা ব্যাধিতে ও মহামারীতে সে যুগকে ছার মানিয়ে দিয়েছে। আর যদি বাঙালী কবি আবার ফিরে আসেন এই শহর কলকাতায়, তিনি আর নতুন করে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করবেন না। তিনি তাঁর সেই পুরাতন কবিতাকেই আবৃত্তি করবেন, "রেতে মশা দিনে মাছি, দুই নিয়ে কলকেতায় আছি।"

সুতানুটির হাটে চার্ণকের দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের পর কেটে গেছে আড়াইশোর বেশী বছর। ইতিহাস রচনাকারী কলকাতা বোধ হয় অপরিচ্ছন্নতাতেও ইতিহাস রচনায় উন্মুখ। আজও কলকাতার আবর্জনাবাহী গাড়িগুলো চলে যাবার পর সে সকল অঞ্চলে পড়ে থাকে ময়লা। আজও দেখি, আবর্জনার গাড়িতে বসে মানুষ নোংরা থেকে দু'হাতে বেছে বেছে সরিয়ে রাখছে নানারকমের ভাঙা-চুরো টুকরো জিনিসপত্র। আর বাজার অঞ্চলে! যেখানে খাদ্যসামগ্রীর সকল দ্রব্যের পণ্যশালা! সেখানে কাদা আর আবর্জনা এখানে-ওখানে সেখানে মাখামাখি। পাশাপাশি।

হায় কলকাতা! কবে তোমার দেহ অকলঙ্কিত হবে, কবে তুমি শাপমুক্ত হবে আবর্জনার—বোধ হয় তা তোমার ইতিহাস-বিধাতাই জানেন।

কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যেই মশা উৎপাদনের অপরূপ ক্ষেত্র

ভারত দর্শন

মহারাষ্ট্রের কারলার 'চৈত্য' গুহামন্দিরের অভ্যন্তরভাগ

রাজধানী :

Ministry of Economic & Defence Co-ordination-এর Secretary—শ্রীভূতলিঙ্গম সদলবলে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করবার পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও জঙ্গী বিমান পাবার চেষ্টায়। চীনের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশান্তর থেকে অস্ত্র সাহায্য ভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা সম্ভব নয় এবং সাহায্য করতে পারে এরকম রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রধান।

যুক্তরাষ্ট্রে, ভারতকে সাহায্য না দেওয়ার জন্যও অনেক সুপারিশ হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাকিস্তান। তার ভারতকে কোন বহিঃশক্তির সাহায্য করার বিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভারতবর্ষকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার। আর বলেছে যে, যদিও বা যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করে তবে একমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হলে, তবেই তা করতে পারবে—(অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যা পাকিস্তানের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সমাধান হলে তবেই যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করতে পারবে নচেৎ নয়)।

পাকিস্তান ছাড়া আর একদল লোক আছেন—তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক—যাঁরা মনে করেন যে, ভারত যতদিন গোষ্ঠী বহির্ভূত থাকবে, ততদিন তাকে সাহায্য করা সমীচীন হবে না। অন্য কথায় ভারত Sento অথবা Seatoতে যোগ দিলে তবেই যুক্তরাষ্ট্রের ভারতকে সাহায্য করা উচিৎ।

ভারত কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র চায় বিনা সর্তে। Public sectorএর Bokaro Steel Co-র জন্যও প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য, যা হয়ত Private sector-এ হ'লে সহজেই পাওয়া যেত।

নানান সমালোচনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাজদূত, মিঃ গলব্রেথ, যুক্তরাষ্ট্রকে Bokaro Steel Co. সম্বন্ধে ভারতকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা এ বিষয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারতে একটি দল পাঠিয়েছিল। সে দলের কাজ শেষ হয়েছে এবং তাঁরা বলেছেন যে, Bokaro Steel উৎপাদন করা সম্ভবপর। কিন্তু এ রিপোর্ট সত্ত্বেও Clay Committeeর report আবার একটি নূতন বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি এ কমিটী নিয়োগ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাপর দেশ সাহায্য করবার নীতি বিশ্লেষণ করার জন্য। শুক্রবার ২১শে এপ্রিল ভারী শিল্প দপ্তরের সহঃ মন্ত্রী শ্রীশেঠি বলেছেন যে, বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

ভূতলিঙ্গম কমিটী পৌঁছবার কিছু পরেই শ্রীকৃষ্ণমাচারী যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন এবং জুন মাসে আসবেন রাষ্ট্রপতি। শ্রীকৃষ্ণমাচারী এখন একই কাজে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে সফর করছেন। ভারতের অস্ত্র ও সাহায্যের প্রয়োজন থাকলেও, তা পাবার জন্য ভারত তার নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নীতি কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না। কারণ আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ভাষায় "তা করার মানেই হচ্ছে, আংশিক ভাবে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া" শ্রীকৃষ্ণমাচারী এ কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আফ্রিকার সুদান, ইথিওপিয়া ও সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরেছেন। তিনি এ সব দেশেই চীনের বিরুদ্ধে ও ভারতের জন্য সহানুভূতি দেখেছেন। ইথিওপিয়ার ভারতীয়রা দেশরক্ষার জন্য যে টাকা তুলেছিল তাতে নাকি সম্রাট হাইলে সেলাসী প্রকাশ না করে অনেক টাকা সাহায্য করেন। উপরাষ্ট্রপতির ভ্রমণে এ সব দেশের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্য আরও বেড়েছে এবং এ সব দেশে ভারতের কূটনৈতিক

ডঃ জাকির হোসেন

দুর্বলতাগুলিও ধরা পড়েছে। যে সব দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, সে সব দেশে তিনি দেখেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাদের কর্মচারীরা দেশের সাধারণ লোকদের থেকে নিজেদেরকে বড় মনে করে ও সে দেশীয় লোকদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে রাখে।

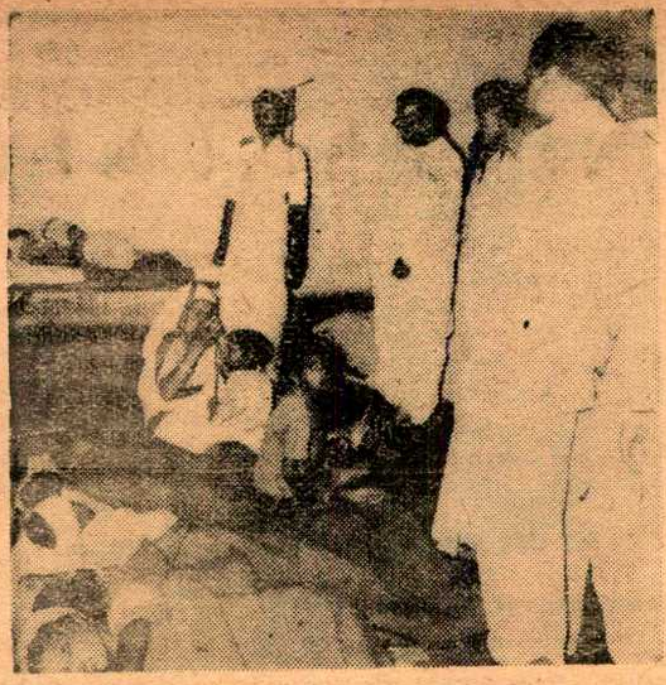

তুফানগঞ্জের হাসপাতালে আহত স্ত্রীলোক তাঁহার করুণ কাহিনী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন

ছাড়া তারা ঐ সব দেশের জন জাগরণ অথবা জনগণের চিন্তাধারা সম্বন্ধে ভারত সরকারকে ঠিকমত অবহিত রাখে না। যেমন তারা যদি আলজিরিয়া অথবা সিরিয়ার অধিবাসী-দের আশা আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে দিল্লীকে জানাত তাহলে দিল্লী সরকার আরও তৎপরতার সঙ্গে এ দু'দেশের সরকারকে স্বীকার করতেন। স্বীকৃতি বিলম্বিত হওয়ায় চীন ও পাকিস্তান আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। তা ছাড়া মুসলমান প্রধান দেশগুলিতে ভারতে যে বহুসংখ্যক মুসলমান সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে, সে কথাটা মোটেই প্রচার করা হয়নি—ফলে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে আফ্রিকায় মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে পাকিস্তানের অপপ্রচার কিছুটা কার্যকরী হয়েছে তিনি যখন কায়রোতে এক শুক্রবার নমাজ পড়তে যান তখন ভারতবর্ষে একজন মুসলমান এত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন জানতে পেরে তারা উল্লসিত হয়েছিল। আফ্রিকার অনেক দেশেই আজকাল কারিগরী শিক্ষার জন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চেয়ে পাঠায়—ভারতীয় সৈন্যদেরও চাহিদা আছে—ওসব দেশের সৈন্যদের শিক্ষিত করবার জন্য। সে সব দেশ থেকে সাহায্যের অনুরোধ এলে তা তৎপরতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিৎ।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতদের তৎদেশীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি আরও সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।

কিছুদিন পূর্বে এক জনসভায় প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা চালাবার জন্য চীনারা যে পুনঃপুনঃ দাবী জানাচ্ছে, তার আসলে কোন অর্থই নেই, কেন না আগে আলাপ আলোচনার ভিত্তিটা স্থির না করে আলোচনায় বসার কোন সার্থকতা নেই। তিনি বলেন, বিশ্ব-বিচারালয়ে এ ব্যাপারটা বিচারের জন্য পাঠান অথবা সালিশীর মধ্য-স্থতায় এর মীমাংসা করা, ভারতের এই দুই অনুরোধের কোনটাই চীন গ্রহণ করে নাই। কলম্বো প্রস্তাবটাও তারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হচ্ছে, চীনের আন্তরিক ইচ্ছাটা জোর করে আমাদের উপর তাদের মনগড়া তথাকথিত শান্তি প্রস্তাব চাপান। এরকম অবস্থায় সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার কোন যৌক্তিকতাই নাই। এ অবস্থায় "জরুরী অবস্থার" কোনমতেই অবসান করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, বন্ধুরাষ্ট্র থেকে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য নেব কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী আত্মনির্ভরতা।

লোকসভা ঃ

লোকসভায় এক বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, বিশ্বশান্তি আমাদের সবচেয়ে কাম্য। চীন পুনরাক্রমণ করলে আমরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তৈরী থাকব কিন্তু তা' বলে আমরা আমাদের প্রধান কাম্য বিশ্বশান্তির আদর্শ ভুলব না।

১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরেও সরকারী কাজে ইংরেজীকে সহযোগী ভাষা হিসাবে চালু রাখবার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী লোকসভায় যে বিল উত্থাপন করেছেন, দেশের অ-হিন্দী-ভাষাভাষী রাজ্য-গুলিতে তা নিয়ে গভীর নৈরাশ্য ও ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করে অহিন্দী ভাষাভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করবার চক্রান্তের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। বিলের প্রতিবাদে পশ্চিম-বঙ্গ ভাষা প্রচার সমিতির পক্ষ থেকে ৩৬জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদের স্বাক্ষরিত তিন দফা সুপারিশ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সম্প্রতি সংসদে পেশ করা হয়েছে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মারক-

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লিপিতে বিলটির অন্যান্য প্রধান সমালোচনা হচ্ছে :—

(১) বিলটিতে কৌশলে হিন্দীকে

আরও দ্রুততর চালু করবার প্রচেষ্টা হয়েছে ;

(২) হিন্দীকে অসঙ্গত অধিকার দেবার চেষ্টা হয়েছে—শুধু কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয় রাজ্য-বিধান অন্তর্লীতে আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে ও হাইকোর্টেও ;

(৩) প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হচ্ছে ;

(৪) বিলটি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ;

(৫) দেশের রাজনৈতিক সংহতি বিপন্ন হচ্ছে ;

(৬) সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি ;

(৭) অহিন্দীভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করা।

লোকসভার এ অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা বিলটি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। অনেক সদস্য বিলের বিরুদ্ধে সংবিধানিক ও অন্যান্য আপত্তি তোলেন। প্রায় একঘণ্টা আইন সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পর অধ্যক্ষ হুকুমসিং রুলিং দেন যে, আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন সভাকে তাঁর আইন সম্পর্কিত পরামর্শ দিতে

আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন

পারবেন। আইনমন্ত্রী বিতর্কে যোগ দিয়ে বলেন যে বিলটি সংবিধানের দিক থেকে বৈধ। জরুরী অবস্থা এবং সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকলেও সংসদে উত্থাপিত বিলটি সংবিধানের উদ্দেশ্য পূরণ করছে কি না তার দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়েছে। আলোচ্য বিলটি জরুরী অবস্থার বিল নয়, সংবিধানের ৩১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই আনা হয়েছে অর্থমন্ত্রী বিলটি সমর্থনে বলেছেন, 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কোন কর নয় এটা আয়ের সম্পত্তি। তাছাড়া এটা সঞ্চয়ের অভ্যাসকেও সাহায্য করবে।'

নীতি হিসাবে সঞ্চয়কে জাতিগত গুণ হিসাবে পরিণত করবার প্রচেষ্টা সাধু এবং তা নীতি হিসাবে সমর্থনীয় হলেও দেশের জনগণের কষ্টসাধ্য হলে তা যতখানি নিরসন করা যায় তার প্রতি আইন স্রষ্টাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

পাঞ্জাব ঃ

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি বৈঠকে বলেছেন যে, পাঞ্জাবে মাদকদ্রব্য বর্জন নীতি চালু করবার আগে যে সব রাজ্যে এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তাদের কার্যকারিতা ও ফলাফল ভালভাবে বিবেচনা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাব সরকারের তরফ থেকে দু'জন প্রতিনিধি অন্যান্য রাজ্যে পাঠাবার মনস্থ করেছেন। প্রতিনিধিরা ফিরে এসে তাদের অভিমত জানালে সরকার সেটা বিবেচনা করবেন। মাদকদ্রব্য বর্জন নীতি সব দিক থেকে বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয় এবং তা না করে হঠাৎ কিছু করবার তাঁর কোন অভিপ্রায় নাই। এ বিষয়ে পাঞ্জাব সরকারের অভিমতটা সুচিন্তিত এবং অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে অনুধাবন যোগ্য।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

শ্রী ডি, পি, মিশ্র মধ্যপ্রদেশের কাশডোল কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হওয়ায় মধ্যপ্রদেশে অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে তাঁর নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভার রদবদলের সম্ভাবনা আছে।

কংগ্রেস পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী কে কে সাহা ভুপালে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, মধ্যপ্রদেশের বর্তমান মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোনরকম হস্তক্ষেপ করবার উদ্দেশ্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নাই। হাইকমাণ্ডের বিশ্বাস শ্রীমিশ্রের নির্বাচনে কংগ্রেস এ্যাসেমব্লি দল আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী গণতান্ত্রিক উপায়ে সাধারণ সভ্যদের অধিকাংশের ইচ্ছানুসারে নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ড গণতান্ত্রিক নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

হাইকমাণ্ড কোন সময়েই এ নীতি বহির্ভূত কিছু করেন নাই এ কথা জোর গলায় বলা চলে না তবে ভবিষ্যতে এ নীতি সমর্থিত হলে তা সর্বজন আদৃত হবে সন্দেহ নাই।

উত্তরপ্রদেশ ঃ

আমরোহা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের উত্তেজনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, আমরোহা কেন্দ্রে শতকরা ৩৩ জন নির্বাচক মুসলমান এ জন্য শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে এ কেন্দ্রে নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এ অভিযোগের সমর্থনে তিনি বলেছেন যে, যদি শ্রীইব্রাহিমকে লোকসভার সদস্য করাই কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অভিপ্রেত হয় তবে তাঁকে জৌনপুর অথবা ফরাক্কাবাদ কেন্দ্র থেকে নির্বাচন প্রার্থী করা বাধাছিল না।

সমালোচনার উত্তরে এ কথা বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নির্বাচন প্রার্থী বা নির্বাচক মণ্ডলীর ধর্মাধর্ম নিয়ে আলোচনা করে আচার্যদেব নিজেই নির্বাচনটাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসছেন। তিনি প্রতিপক্ষের প্রার্থী মনোনয়নের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ করেছেন—সেটা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী।

মহারাষ্ট্র ঃ

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল সা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। গত আগষ্ট মাসে তিনি শিক্ষকদের তাদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা এক আর্জির উত্তরে বলেছিলেন যে, এটা

স্কুল ও শিক্ষকদের ঘরোয়া ব্যাপার এবং এর সঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন সংস্রব নেই। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন স্কুলের ছাত্রদের 'ফি' কমিয়ে বা মকুব করে দেওয়া সম্বন্ধে আগে বিধি ব্যবস্থা বাতিল করে দেবার। তাতে প্রদেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীসাহা তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছেন যে তাতে প্রদেশের মোট ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হবে। এ নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেও মতবিরোধ হয়েছে।

জনকল্যাণ যে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য (Welfare State) সেখানে সব সময় শাসকদের শুধু সঞ্চয়ের পন্থা অন্বেষণ করাটা সকলের মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষার প্রসারটা যেখানে সরকারী নীতি সেখানে শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে এরকম কোন পন্থা শুভ নয় বলাই বাহুল্য।

হিমাচল প্রদেশ ঃ

এ প্রদেশ পার্ট 'C' ষ্টেট অন্তর্ভুক্ত। প্রদেশের Lieutenant Governor শ্রীবজরং বাহাদুর সিং যদ্রীর কার্যকুশলতায় প্রদেশ ক্রমশই এগিয়ে চলেছে। প্রথম অর্থ যোজনায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রায় ৪½ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় অর্থ যোজনায় ব্যয়িত অর্থসংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ১৭, লক্ষ টাকায়। তৃতীয় যোজনায় ব্যয়িত হবে মোট ২৮ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপান্তরিত হলে প্রদেশ প্রাচুর্যে ভরে যাবে। সীমান্তবর্তী প্রদেশ হওয়ায় বর্তমান জরুরী অবস্থায় এ প্রদেশের স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদেশের লোকেরা জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে প্রায় ২½ কোটি টাকা দান করেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে সমগ্র প্রদেশে মাত্র ৩০০ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। বর্তমানে আছে ২২৫০ মাইল। নূতন নূতন রাস্তা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশের লোকদের এসেছে নূতন নূতন চিন্তা ও অগ্রগতির ব্যবস্থা। কৃষি ও চাষবাসের ক্ষেত্রে এদের হয়েছে প্রভূত উন্নতি। এরা তখন প্রচুর ফলমূল উৎপাদন করছে। এদেশের কৃষকদের উৎপাদন শক্তির এত প্রশংসনীয় ভাবে উন্নতি হয়েছে যে এরা সবচেয়ে বেশী শস্য উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রকলা ও রাজ্যকলা মুনাফা (Profit) লাভ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পশ্চিমবঙ্গের উপর নিদারুণ আঘাত হেনেছে। অনেকে একে খণ্ড প্রলয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বলেছেন, ধ্বংসের এইরূপ সর্বগ্রাসী মারাত্মকরূপ এর আগে দেখি নাই। দেখার পরও জিনিসটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

এই বিধ্বংসী ঝড়ে কুচবিহারে দশখানি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ৩৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, ১৫৭ জন গুরুতর আঘাত পেয়েছে ও প্রায় সাত হাজার লোক নিরাশ্রয় হয়েছে। গবাদিপশু ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ যে কত তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জানান যে, প্রচণ্ড ঝড় ও নিদারুণ ভূমিকম্পের একসঙ্গে মিলন হলে ধ্বংসের চেহারা যা দাঁড়ায় তুফানগঞ্জের ভয়াবহতা সেরকম।

সরকারের তরফ থেকে এবং বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নানাভাবে আক্রান্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।

তুফানগঞ্জে এই ঘূর্ণিবাত্যা দৈব দুর্বিপাক যা মানুষ রোধ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় যা সম্ভব তার যেন কোন ত্রুটী না হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল রকম খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে। সব চেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে চালের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়, চাল বাদ দিলে নিত্য আহার্য বস্তুর মধ্যে ডাল, চিনি ও মাছ সবই অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও মহার্ঘ এবং ভেজাল মিশ্রিত।

জনগণের এ অশেষ দুঃখে সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা না করলে দেশের সঙ্কট ও জনগণের দুর্গতি বেড়েই চলবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ১৫০০০ টন চাল সাহায্য দেওয়া হবে। আরও সংবাদ মাছের দাম নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রত্যেক মৎস্য বিক্রেতাকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হবে।

আসাম ঃ

২৭শে এপ্রিল আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় নির্বাচনকেন্দ্র হতে আসাম বিধান সভার চারটি উপ-নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

গত ৯ই এপ্রিল ধুবড়ীর মহকুমায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় একশত লোক নিহত, কয়েক হাজার লোক আহত এবং শত শত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসাম সরকার ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা খয়রাতি সাহায্য এবং পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সরকারী ত্রাণকার্য ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন এবং মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি বস্ত্র, কম্বল এবং খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করছে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য শিবির স্থাপন করা হয়েছে।

তুফানগঞ্জের ধ্বংসলীলা

মফস্বলের পত্র-পত্রিকা ঃ

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের পীঠস্থান কোলকাতা—বললে, খুব ভুল বলা হবে না। নগর জীবনে যেমন অভিশাপ আছে, তেমনি আশীর্বাদও কম নেই, বরং বেশিই বলা চলে ; বর্তমান যুগের সাহিত্যে নগরের ছায়াপাত ঘটছে অহরহ, সুতরাং সেই সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র যদি কোলকাতাই হয় তবে ক্ষতি কি, এমন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। আবার কোলকাতাকে ঘিরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই যে বিকাশ—এর অন্যতম কারণ যন্ত্র, প্রচার ও যোগাযোগের অভূতপূর্ব আনুকূল্য। আমরা অহরহ দেখছি, যে সব গ্রন্থ বাজারে স্বীকৃতি লাভ করছে—তার মূলে রয়েছে কোলকাতারই খ্যাতি-সম্পন্ন পত্র-পত্রিকা। পল্লী-কবি সেই আশায় আজ শহুরে হতে চলেন। কিংবা, কবি পল্লীর হলেও শহরের পত্র-পত্রিকার মুখ চেয়ে কথা বলেন।

তা'হলে কি মফস্বল থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা বের হয় তাদের কোনো মূল্যই নেই? সে সব পত্র-পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের (যাঁদের রচনা কোলকাতার খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকাতে দেখা যায়) লেখা কখনো-সখনো থাকে। হয়তো, পত্রিকাগুলির অর্থের আধিক্য থাকলে তাঁদের রচনা আরো বেশি প্রকাশিত হোত। কিন্তু ঐ সব পত্র-পত্রিকার সাজ-সজ্জা প্রভৃতি এমন উচ্চাঙ্গের হয় না—যা প্রতিযোগিতার বাজারে শহুরে পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার উপযুক্ত। তাই নিরাবরণ নিরাভরণ অবস্থায় তারা বের হয়। তাদের মধ্যে থাকে জীর্ণ-শীর্ণ নামমাত্র শহরের, গঞ্জের ও গ্রামাঞ্চলের সংবাদ এবং তারই পাশাপাশি পরিবেশিত হয় পল্লী অধ্যুষিত লেখকদের অটপৌরে রচনা। ঐ রচনাগুলি নাগরিকতায় ধর্মান্তরিত নয়। (অবশ্য কারো কারো রচনায় বিপদমান চেষ্টা থাকে —যা ভয়াবহ।) ঐ সব রচনার অবয়বে যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে তা সদ্য খনি থেকে তুলে আনা আকরিক ধাতুর সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। একটা সহজ সরল স্বাভাবিকতার স্বাদ পাওয়া যায় ঐ সব রচনা থেকে। তাই অবহেলিত অপাংক্তেয় এই সাহিত্যের অবধারিত মূল্য শহরের রক্তচক্ষু পাঠকের নাসিকা কুঞ্চনে নস্যাৎ হলেও,—পল্লীর বুভুক্ষু পাঠকের ও বিচারশীল খ্যাত সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের কাছে স্বীকৃত।

তাছাড়া মফস্বলের পত্র-পত্রিকার যে মূল বৈশিষ্ট্য, তা শহুরের কাগজগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। যদি বা পাওয়া যায়, সেই আমদানী কৃত বস্তু যে অনেকখানি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে—তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বাংলা দেশের হৃদয় স্বাভাবিক সাহিত্যের সুর ও ধ্বনিতে ভরপুর ছিল। আজ কোথায় সেই সুর উচ্ছ্বাস, কোথায় সেই ধ্বনি-স্পন্দন। প্রায়লুপ্ত সুর-ধ্বনিকে শহরের যান্ত্রিক 'ফ্লুট'-এ নয়, পল্লীর আড় বাঁশিতেই মানায় ভালো। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে জীবনের প্রতিচ্ছবি, সমাজের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস যা ধীরে ধীরে অখণ্ড ইতিহাসের রূপ ধারণ করে সমগ্র বাঙালীর ইতিহাসকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। হয় তো এ কথা কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নিতে পারা যায় যে, ঐ সব পত্র-পত্রিকার রচয়িতারা ভাষার ব্যাকরণ অপেক্ষা মনের প্রকরণটিকে প্রকাশ

ধলপাইগুড়ি হতে প্রকাশিত ও শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত
'জনমত' পত্রিকার প্রচ্ছদপট

করতে ব্যস্ত। মনে হয়, ঐখানে তাদের রচনার শুদ্ধতা নিহিত থাকে। তাই প্রয়োজন, প্রায় অন্তর্হিত ঐ সব লেখকদের রচনা প্রকাশ করা এবং ঐ সব লেখক ও পত্র-পত্রিকা যাতে পুরস্কৃত হয় সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। শহরের লেখকদের জন্যই শুধু পুরস্কার নয়—এ কথা আমরা আবার কবে ভাবতে শিখবো? বড়বাজারের প্রতিযোগিতায় তাদের নামবার দরকার নেই, কিন্তু বাজারের বড় বস্তুর চেয়েও তাদের সামাজিক মূল্য কম নয়—এ কথা সর্বাগ্রে আমাদের বোঝা দরকার। মফস্বল থেকে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, খুব কম জনেই তাদের প্রতি কৌতূহল দেখান; দু-একজন তাদের নিয়ে কৌতুকও করেন; তাই স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করে তাদের সামাজিক, সংস্কৃতিক ও সংস্কৃতির মূল্য এখানে স্বীকার করা হোল।

শারদায় সমাচার' ৬৮ : ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত।

অন্যান্য সুলভ রচনার সঙ্গে রয়েছে মূল্যবান দুর্লভ প্রবন্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত লিখিত "রাজমালার আদি রত্নমাণিক্যের ত্রিরত্ন"; অমিতকুমার নাগ লিখিত 'পূর্বোত্তর সীমান্ত এজেন্সীর জনজীবন" যা সর্বাপেক্ষ মূল্যবান প্রবন্ধ, তা হচ্ছে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "অহমরাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ।" তিনি তাঁর রচনা সুরু করেছেন এইভাবে—"আমাদের প্রাদেশিক ইতিহাস, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের অংশ-স্বরূপ বাঙ্গালার ইতিহাস, আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে" এরপর আমাদের পক্ষে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুরা : (শারদীয়া সংখ্যা-১৩৬৬) ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত।

উল্লেখ্য রচনা : 'ত্রিপুরার বিগত লেখক পরিচিতি।' লেখক শ্রীসুদর্শন মুখোপাধ্যায়।

শারদীয় জনমত : (১৩৬৯) জলপ ইগুড়ি থেকে প্রকাশিত।

মইয়ালদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল। শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিকের 'জলপাইগুড়ির স্থানবাচক প্রত্যয়', শ্রীনিখিল ঘটকের 'উত্তর বংলার জিতাষ্টমী পূজা'ও উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত শ্রীচারুচন্দ্র সান্যালের অজস্র প্রবন্ধ দুর্লভ ও প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ।

শারদীয় বর্ধমান : (১৩৬৮) বর্ধমান থেকে প্রকাশিত।

আকর্ষণীয় মৌলিক প্রবন্ধ—ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের 'পাণ্ডুরাজার ঢিপের কথা ও কাহিনী'; শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'নেতা ধোপানীর ঘাট'; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'হাওড়ার ভেটবাগানের পরগণাগিরি ও ডাকাত'।

বার্তিকা (নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৭০) বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে প্রকাশিত।

প্রখ্যাত কবি মনীশ ঘটকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বার্তিকা' সম্পর্কে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। শ্রীবিজনকুমার ভট্টাচার্য বহরমপুরের পাশে ছোট্ট গ্রাম কয়ার চারণ কবি সতীশ বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করে নতুন দিক উদ্ঘাটিত করেছেন।

এ থেকেই মফস্বলের পত্র-পত্রিকার অবদান উপলব্ধি করা যাবে। মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলিও যে স্বীয় দায়িত্বে সচেতন, তা প্রয়োজনস্থলে অবশ্যই উল্লিখিত ও আলোচিত হবে।

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত ও শ্রীমনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) সম্পাদিত 'বার্তিকা' প্রচ্ছদপট

লাল ধূমকেতু

হুসন্ত শর্মা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাজনৈতিক শক্তি-সাম্য ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেতে খেতে এমন একটা পর্যায়ে এসে আজ থমকে দাঁড়িয়েছে যে, তার পরবর্তী রূপান্তর অত্যন্ত চমকপ্রদ হ'তে বাধ্য। যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে অনেকের পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব হয়নি যে, বিশ্ব শক্তির নূতন তালিকায় ইংলণ্ডের স্থান নীচে নেমে যাবে, আর প্রথম শ্রেণীর শক্তির স্বাদে আমেরিকা এবং রাশিয়া কিঞ্চিৎ মস্তাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগোতে থাকবে এই গ্রহের নেতৃত্বাভিলাষী হয়ে। যুদ্ধাবসানের পর প্রথম কয়েকটা বছর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকা ছিল অগ্রপ্রসারী। কারণ সে-ই তখন পৃথিবীর একমাত্র শক্তি যার হাতে ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের দানবীয় ধ্বংস ক্ষমতা।

কিন্তু শক্তি আয়ত্তের একাগ্র প্রচেষ্টায় রাশিয়াও অবশেষে পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান যখন পেয়ে গেল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তখন আবার শুরু হ'ল আর এক নূতন বাঁকের সন্ধান। যুদ্ধাস্ত্র তৈরী রেখে এবং ক্রমাগত তার তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে যাওয়ার নীতি বজায় রেখেও বাস্তবিক যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে না পড়ার ঝোঁক দেখা দিল পারমাণবিক শক্তিধর দুই বিশাল রাষ্ট্রের কর্ণধারদের, আমেরিকার আর রাশিয়ার। রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি এবং রণনীতি, সব মিলিয়ে এক জটিল গোলোকধাঁধার পথেই অবশ্য এই ঝোঁকের আত্মপ্রকাশ। সহজ কিংবা সরল পথে নয়। আজকের আণবিক যুদ্ধে স্বেচ্ছায় নিজে থেকে কেউ জড়িয়ে পড়তে যে ইচ্ছুক নয় সেটা স্পষ্ট। কারণ যুযুধান দুই পারমাণবিক পক্ষই তা' হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ যুদ্ধে আর হারাজিত কোন সম্ভাবনা নেই, শুধু ধ্বংস, নিঃশেষ বিলুপ্তি।

তাই আমেরিকা আর রাশিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে একটা নূতন চিন্তার বাঁকে, একটা অভিনব দর্শনের নব দিগন্ত রেখায়। শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক দাবাখেলার পদ্ধতিতে পরিবর্তন যদি না আনা যায় তবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঊনবিংশ শতকের চিন্তাধারায় কিংবা প্রাক-পারমাণবিক যুগের রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণে পারমাণবিক অস্ত্রকে কেউ হিসেবে আনেন নি, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের চিন্তায় পরিপূর্ণ অবলুপ্তির আশঙ্কা ছিল না কখনও। কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই। যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে বহুদেশে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসে গেছে। বিপ্লব ও বিবর্তনের পক্ষে অনেক দেশ আজও নানারকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় ব্যস্ত। তাদের উপর আর বাইরের কর্তৃত্ব চাপানো সম্ভব নয়। আণবিক যুদ্ধ দ্বারা তো নয়ই।

দুই প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীরাষ্ট্র আজ এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন একটা সমাধানের চেষ্টায় অগ্রণী, ঠিক তখনই এশিয়ার অকাশে রক্ত পুঞ্জের আলোড়ন তুলে দেখা দিয়েছে এক অশুভ ধূমকেতু, যার কালো ছায়া আজ ভারতের পক্ষে তো বটেই, সারা দুনিয়ার পক্ষেই উদ্বেগের কারণ। লাল চীন আজ তার স্রষ্টা সোভিয়েট রাশিয়াকেও উপেক্ষার ভঙ্গীতে শাসিয়ে চলেছে। উন্মত্তকণ্ঠ মাও এবং চৌ-এর শাসন পরিষদ নবতম শক্তি হিসেবে এশিয়াতে শুধু নয় সারা পৃথিবীতেই অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকার করার দুঃস্বপ্নে বেসামাল। বহুদিন আগে যে মার্কিন লেখক চীনের দিকে চেয়ে পীতাতঙ্কের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আর যাকে এড়িয়ে চলার উপদেশে স্বয়ং নেপোলীয়ান পর্যন্ত নির্বাক থাকতে পারেন নি, সেই চীন যে আজ পৃথিবীর পক্ষে একটা অশুভ ধূমকেতুর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন রাষ্ট্রের কাছেই তা আজ উহ্য নেই

পীতাতঙ্কের আয়ত্বলক রাশিয়ার কাছেও আজ অসহ্য। এবং এ সংবাদ গোপন রাখার প্রয়াসও শিথিল।

অথচ আজকের মাও কে প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় করে বসিয়ে গেছে সেদিনের ষ্টালিন। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সূচীমুখ আক্রমণের পথে লাল চীনই ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বপ্রথম সফল পদক্ষেপ। মার্কসীয় নীতির ধারক ও বিপ্লব-পতাকার বাহক হিসেবে এক যুগ আগে যখন লাল চীনের স্বাধীন সত্তা সারা পৃথিবী-

মাও-সে-তুং

ব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছিল, তখন রাশিয়ার স্বাভাবিক কারণেই গর্ববোধ করার কথা এবং গর্বিত সে হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু হিসেবে ওস্তাদ রাশিয়ার অঙ্কেও আজকের চীন সম্বন্ধে যোগফলে ভুল দেখা দিচ্ছে। যে মাও-এর হাতে রাশিয়া চীনের শাসন-ভার তুলে দিতে সাহায্য করেছিল, আজকে দেখা যাচ্ছে সে মাও লেনিনের উত্তর সাধক নয়। বিপ্লবের মহত্তর দিকের সে দিশারীও নয়। সে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার অনুসারী এক আধুনিক চেঙ্গিস্।

কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার কোন ভ্রান্তি ছিল না, সুতরাং এ সম্বন্ধে তার কোন বিলাসও নেই। লাল চীনকে তার জন্মলগ্ন থেকেই আমেরিকা অস্বীকার করে এসেছে। এই অস্বীকৃতির মূলে যতটা ছিল আদর্শবাদের সংঘাত-অসহিষ্ণুতা, তার চেয়ে বেশী ছিল নয়াচীনের নব নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। কোরিয়া অধ্যায়ের পর হতেই আমেরিকা চীন সমুদ্রের সীমান্তরেখায় তার শক্তিশালী নৌবহর মোতায়েন রেখেছে। লাল চীনকে বিশ্বাস নেই বলে সুযোগ-সন্ধানী আধুনিক বর্বরতায় অপরিসীম কৌশলী মাও-সে-তুং-এর দলকে পাহারার আড়াল করা অন্যায়। আমেরিকা তাই চীনের দরিয়ায় যুদ্ধ জাহাজে কামান সাজিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে। কারণ আমেরিকা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, লালচীনকে সভ্য-সমাজের রীতি সম্মত কূটনৈতিক ভাষা বোঝানো যাবে না কখনও। অস্ত্রের ভাষায় কথা বললে সে বুঝবে এবং বুঝবে বলেই বহুতর অস্ফালন করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত চিয়াং চীনের রাষ্ট্র অক্ষত রয়ে গেছে। কারণ সেখানে অবিরাম টহল দিয়ে ফিরছে আমেরিকার মহাশক্তিশালী সপ্তম নৌবহর।

কিন্তু সে রকম কোন প্রতিবন্ধকের মুখোমুখী হয়ে যে সব স্থানে দাঁড়াতে হয়নি লালচীনকে সে স্থানগুলির অন্যতম হচ্ছে মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল। হিমালয়, হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম পর্বতমালার উত্তরে বিস্তৃত রুশ-চীন সীমান্তে উজবেকিস্তান ও সিংকিয়াং এর বিশাল এক ভূখণ্ডকে নিয়ে এই বিস্তার। সাম্প্রতিককালের সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, লালচীন তিব্বতকে গ্রাস করার পূর্বে তার পশ্চিম সীমান্তের সিংকিয়াং-এ অভিযান পাঠিয়ে তাকে করায়ত্ত করে' নেবার ব্যবস্থ করেছিল। চীন কতৃক সিংকিয়াং সংলগ্ন বহির্মোঙ্গল ও উজবেকিস্তান দখল করে' নেওয়ার একটি গুরুতর প্রচেষ্টার খবর যখন সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণগোচর হয়, ক্রেমলীন তখন চুপ করে' বসে' থাকে নি। তিব্বত-সিংকিয়াং অঞ্চলের নিষিদ্ধ এলাকায় যে সমস্ত সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপীয় সামরিক উপদেষ্টা চীনের হয়ে কাজ করছিল, তাদের কাছে এই বার্তা আর গোপন থাকে নি যে লালচীনের কার্যাবলী শুধু হিমালয় সীমান্তে ভারতের পক্ষেই নয়, এমন কি সোভিয়েটেরও স্বার্থ বিরোধী।

সেই থেকে সচকিত সতর্কতায় সোভিয়েট তার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের পাহারায় সজাগ হয়ে রয়েছে। যে এলাকায় আজ রুশ-চীন সংঘাতের একটা আশ্চর্য ভূমিকা তৈরী হচ্ছে, সেটা অবজ্ঞাত হলে'ও অখ্যাত নয়। মধ্য এশিয়ার এই বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড এমনই এক দুস্তর মরুপ্রান্তরে আবদ্ধ যে, চেঙ্গীসখানের অসংখ্য দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীর দলও এখানে পথ ভুলে বালুর কবরে হারিয়ে গেছে। বহির্মোঙ্গলের সীমান্ত ছুঁয়ে সোভিয়েট উজবেকিস্তান আর কিরঘিজ এলাকার পাশে পাশে দক্ষিণে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে এসে এই এলাকার শেষ। দুর্লঙ্ঘ্য এই মরুলোক মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান, চীনাদের নিকট এর পরিচয় সিংকিয়াং। খাস চীন থেকে সিংকিয়াং-এর দূরত্ব কয়েক সহস্র মাইল এবং পথের নিশানাও ক্ষীণ বলে' এই এলাকায় চীন সম্রাটের নাম-মাত্র অধীনতায় গভর্ণররা যে পদ্ধতিতে শাসনকার্য নিষ্পন্ন করতো' তা শুধু কঠোর নয়, অমানুষিক রকমের নিষ্ঠুর। কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতাও ম্লান হয়ে গিয়েছিল মাও-সে তুং-এর আমলে যখন লালচীন তার ফৌজ পাঠিয়ে সিংকিয়াং-এর উপর তার শাসন কায়েম করে' নিল! মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে পাশে ঠেলে রেখে

চৌ এন্-লাই

আধুনিক এক মার্কসীয় রাষ্ট্র এক নূতন নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষরে স্বপ্রতিষ্ঠিত হল সেখানে। আর তার পাশেই সোভিয়েটের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ হিসাবে তখন উজবেকিস্তান, সাই-

যৌয়রা আর বহির্মোঙ্গল সমুদ্রের পথে অগ্রসরমান।

১৯৫৯ সালে লালচীনের কার্যকলাপে তাই সোভিয়েট রাশিয়া বাধ্য হয়েছে তার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে সজাগ করে দিয়ে প্রস্তুত থাকতে।

ভারতের বিরুদ্ধে লালচীনের আক্রমণ বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়।

কেনেডি

এই আক্রমণের নক্সা রচনায় সিংকিয়াং-এর চীনা ঘাঁটি কাশগড়কে এক বিশিষ্ট রণনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মরুপ্রান্তরের বাধা অতিক্রম করার জন্য চীনা নায়কগণ প্রথম পর্যায়ে রাস্তা তৈরী করে নিয়েছিল অনেকগুলি। তারপর তিব্বত তাদের হাতে আসায় আরও রাস্তা তিব্বতের ভিতর দিয়ে উত্তর পশ্চিমাভিমুখী ইয়ারকন্দ-তাশখন্দ রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে নিয়েছে এবং এরই কয়েকশ' মাইল তারা ভারতীয় এলাকা লদাকের আকশাই চীনের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় চীন তখন মূল ভূখণ্ড থেকে এক বিরাট বাহিনী জমায়েত করতে সক্ষম হয়েছে তিব্বতে, যেখান থেকে প্রয়োজন মত রুশ সীমান্তে অনায়াসে সৈন্য চালনা করতে পারবে।

নিঃশব্দে চোরের মত লদাকের এই অঞ্চল গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চীনের প্রতি সোভিয়েটের নীতি-পরিবর্তন সূচিত হ'ল। সোভিয়েটের উপর সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল লালচীনের পক্ষে তা' উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। কিন্তু তবু মাও-সে তুং অনমনীয় ঔদ্ধত্যে সাম্রাজ্যলিপ্সু অভিযান থেকে বিরত থাকতে রাজী হয় নি। সোভিয়েট বাহিনী লালচীনের সীমান্তলগ্ন রুশ এলাকায় ইতিমধ্যেই সজাগ প্রহরায় দণ্ডায়মান। কারণ তারা চীনকে সন্দেহ করতে সুরু করেছে এবং এমন লক্ষণও আজ প্রকট যে, সোভিয়েটের ধারণা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সোভিয়েট থেকে পাওয়া অস্ত্র ব্যবহার করতেও চীনারা কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না যদি তাদের মনে হয় যে এতে তাদের অঞ্চল গ্রাসের পরিকল্পনাকে অগ্রসর করা যাবে।

সিংকিয়াং সীমান্তে তাই সোভিয়েট বাহিনীকে হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে মাও-সে-তুং-এর রুশ-শিক্ষিত চীনের লাল-বাহিনী।

রুশ-চীন মতান্তর যে অবশেষে মনান্তরের কোঠায় গিয়ে পৌঁচেছে তা আর আজ গোপন নেই। চীনকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করায় আজ আর সোভিয়েট রাশিয়া আগ্রহান্বিত নয়। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে চীনকে যে পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রকাশ্য ভৎর্সনায় মাও-সে-তুংকে সংযত করার পথে সোভিয়েটের অনেক বাধা। আমেরিকার সঙ্গে যতদিন না নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে তার একটা বোঝাপড়া হয় ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে তার উদ্ধত 'ভ্রাতা' ও প্রতিবেশী লালচীনকে

মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারা

স্বীকার করে নিতেই হবে। পূর্ব সীমান্তের এই লাল ধূমকেতুকে লাল রাশিয়ার পক্ষেও শেষ পর্যন্ত সহ্য করা সম্ভব হবে না হয়ত। কিন্তু তার পূর্বে পৃথিবীর রাজনৈতিক জগতে আর একটি বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। পীতাতঙ্কের রাহু বন্ধন থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার প্রেরণায় যদি দুই শক্তিধর রাষ্ট্র—আমেরিকা ও রাশিয়া—সহ-মরণের পন্থা পরিহার করে সহাবস্থানের ঐকান্তিক আগ্রহে একতাবদ্ধ হ'তে পারে, তবেই সার্থক হয়ে জ্বলে' উঠবে আর এক বিস্ময়কর বিপ্লবের আলোকবর্তিকা।

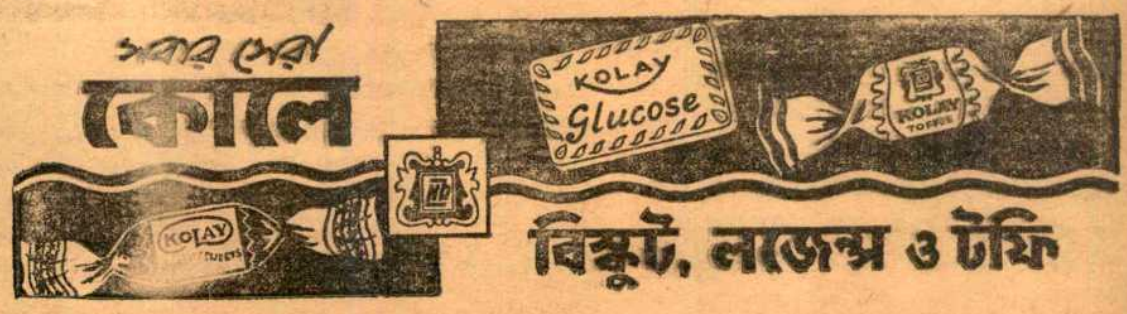

কবিতা

অসামান্য

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমি তাকে নির্মল-নীল জল এনে দিতাম।
আকাশ খাওয়াত' টলটলে আলোর কুসুম-গরম দুধ।
বাতাস—শালের শাখায়, তালের পাখায়
দিনরাত উল্টি-পাল্টি আদরের আসকারা দিত।
পাখিরাও কিছু গান শোনাত', গল্প বলত'।
আর সেই একফোঁটা প্রাণের ইসারাটা
ফন্‌ফন্‌ হরিণশিশুর মত
লাফিয়ে লাফিয়ে ফিনকি দিয়ে শুধু বেড়ে উঠছিল।
সেই স্নিগ্ধ, সতেজ, নধর, সবুজ, অসামান্য উজ্জীবন
খুব সামান্য এক রজনীগন্ধার।
সে বাড়ছিল, বাড়ছিল, বাড়ছিল এবং বেড়ে যাচ্ছিল।
বাড়ার জন্যে ছোট্ট হাত বাড়িয়ে কী-যে
আকুলি-বিকুলি করত!
বোধ হয় হাত ধরার কেউ ছিল না বলেই
তাকে বরাবর অমন প্রাণপণে বেড়ে যেতে হচ্ছিল।
আমি তাকে ঢোকে-ঢোক জল খাওয়াচ্ছিলাম।
আকাশ—আকাশ-উপুড় অঢেল আলো দিচ্ছিল।
বাতাসের, পাখিদেরও কিছু না কিছু প্ররোচনা ছিল।
ঋজু, নম্র, আনম্র, বিনম্র ভংগীতে
এক টবের মাটিতে ট'লে-ট'লেই
সে উঠছিল, উঠছিল, ছুটছিল, ছটফট করছিল।
তারপর হঠাৎ-ই একদিন চমকে দেখলাম
আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য, কা প্রসন্ন ধন্য সেই চরম প্রকাশ!
সারা রাত, সমস্ত রাত, রাতের নিঃশব্দ প্রতিটি মুহূর্তেই কি
দিগন্তভরা নক্ষত্রের সে এক অসামান্য
তার তুবড়ি জ্বালিয়েছে!!
মাটিতে যার পা ডুবোনো একটু মাটির বেড়ে
না, কোনমতেই সে ত' নীলিমায় যায় না।
তবু কা দাপ্ত-প্রদীপ্ত প্রাণাগ্নিশিখায়
আশ্চর্য সূর্যের দিকে তার মেলে-ধরা আত্মা।
আর আমাকে, পৃথিবীকেই বা কী সুন্দর সেই
ঋণাঞ্জলি-প্রত্যর্পণ
হৃদয় নেওড়ানো গন্ধে, সুগন্ধে, ছন্দে, আনন্দে।

একটি সুন্দর ভোরবেলা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কী আশ্চর্য! ঠোঁটে গালে রঙ মেখে
দাঁড়ায় না দরজার সমুখে
এখন মেয়েটি আর। শুধায় পারুল,
'তোর হলো কি মালতী,
তুলসীতলায় তুই বাতি দিয়ে রাতারাতি হলি বুঝি সতী?
আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নাকো!'
কিন্তু ও-যে কী গূঢ় অসুখে
ভুগছে তা জানে না কেউ।
চিত্রশিল্পী ইন্দ্রনাল ওর ভীরু বুকে
মুখ রেখে বলেছিল, 'ভালোবাসি।
সাক্ষী রইল রাত্রি রূপবতী,
তোমার ঐ দেহের দেউলে আমি চিরদিন প্রাণের আরতি
করে যাবো।' মালতীর তনুলতা
কেঁপেছিল রোমাঞ্চিত সুখে।
ইন্দ্রনীল বলে গেছে, এ-নরককুণ্ডে
তাকে রাখবে নাকো আর;
বাঁধবে সে নতুন ঘর। সমাজ-সংসার যদি ছেড়ে যায় যাক;
মানুষ অনেক বড়।.....
ধূসর শীতের বনে রঙের জোয়ার
বসন্ত আবার আনবে। মরুনদী শুনছে দূর সমুদ্রের ডাক!
এখন মালতী ভাবছে: এ-তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকার নিরঙ্কুশ প্রেমে
নরম বৃষ্টির মতো আকাঙ্ক্ষিত নীলাকাশ
আসবে কবে নেমে।

দিল্লী থেকে

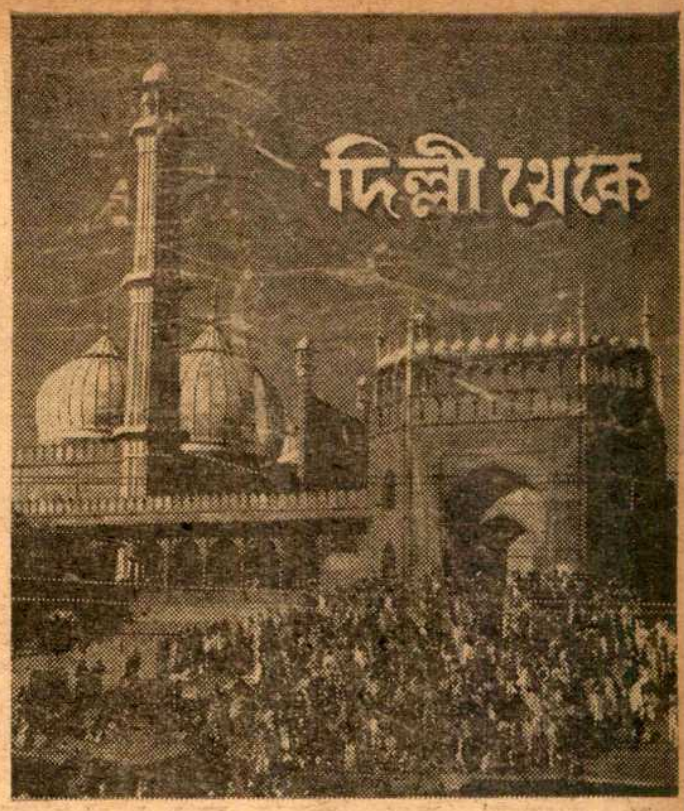

মুসলিম জগতের পবিত্র তীর্থভূমি দিল্লীর জুম্মা মসজিদ। জাহান আর অনুরোধে এই জগদ্বিখ্যাত প্রার্থনা প্রাসাদ নির্মিত হয়।

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীর ক্ষুধিত পাষাণ দেখেছেন কেউ? ক্ষুধিত পাষাণ? জংশন ষ্টেশনের পিছনে ওভারব্রীজ দিয়ে নামলেই পড়বে যে জায়গাটা, তার নাম কাশ্মীরী গেট। কাশ্মীরী গেটের সাথে কাশ্মীরের কোনো তালুক্ত নেই। কাশ্মীরী গেটে দু'পাঁচ মিনিট এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালেও যে প্রাচীন প্রাসাদখানা চোখে পড়বে, সেইখানার কথাই বলছি।

অস্তগামী সূর্যকে প্রণতি জানিয়ে পাখীর দল নীড়ে ফিরে গেছে। গোধূলি-লগ্ন কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মসীজীবীর দল যে যার ঘরে গেছে ফিরে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারী যাত্রীদল টিফিনদান হাতে নিয়ে হন্ত-দন্ত ভাবে প্রাণের জন্য দু'কৌটা মায়া না করে চলন্ত ট্রেনে সব উঠে গেছে। পথ ভুলে আমি কখন এই প্রাচীন প্রাসাদে প্রবেশ করেছি, নিজেই খেয়াল করি নি। কাজ একটা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু সেটা ভুলে গেছি। গন্তব্য জায়গাও একটা ছিল সেটাও মনে নেই। কিসের মাদকতায় আমি এই পাথরের আসনটার ওপর এসে বসেছি, আমি নিজেই জানি না। একটা ম্যাগনেটিক আ বর্ষ অনুভব করছি। চেষ্টা করছি তবুও উঠতে পারছি না।

ধীরে ধীরে বহু দূর থেকে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনির রেশ যেন ভেসে আসছিল। তাই তো এ যে অতি পরিচিত ধ্বনি! কোথায় শুনেছি? কোন্ ঋষিকণ্ঠে প্রথম ভেসে এসেছিল এই মেঘমন্দ্রধ্বনি! পরিষ্কার শুনতে পেলাম সে আবৃত্তির আমেজ, 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্ব ভূতান্তরাত্মা।' পরিষ্কার শুনলাম বাংলার সেই গান, 'এক ভগবান সর্ব-দেহে অধিষ্ঠান সর্বময় এক অদ্বিতীয়' পরিষ্কার শুনতে পেলাম আচার্য কণ্ঠের মধুর ধ্বনি 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'। পরিষ্কার শুনতে পেলাম মৌলবী সাহেবের মিষ্টি গলায় আকুল প্রার্থনা 'আল্লা হো আকবর!' এ আমি কোথায় বসে? আওয়াজগুলো যেন সবই ঐ এ্যাসেম্‌ব্লি হল থেকেই আসছে।

তাই তো এটা যে দার্শনিক দারা শিকোর পাঠাগার। এই প্রাসাদের এ্যাসেম্‌ব্লি হলে ছিল কম্প্যারিটিভ্ রিলিজনের গবেষণা মন্দির। আমরা জানি, আধুনিককালে রাজা রামমোহন রায়ই বিভিন্ন ধর্মের ভিতর থেকে একটা মিলন সুর খুঁজেছিলেন। সে চিন্তাধারাকে রূপায়িত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আপন জীবনে। আমরা জানি মোগল যুগে বিভিন্নতার মাঝেও একতার সুরের সন্ধান পেয়েছিলেন উদার শাহানসা আকবর বাদসা। কিন্তু জীবন-প্রাণ দিয়ে যে কোমল হৃদয়টি সর্ব ভারতে এই মিলন সুর শোনাতে চেয়েছিলেন, তাঁর নামটি আমরা ক'জনে জানি? গান শোনাবার পূর্বেই যে কণ্ঠটি স্তব্ধ হয়ে গেল, আমরা ক'জনে আজ তাঁকে স্মরণ করি?

দারা শিকো এই এ্যাসেম্‌ব্লি হলে সমবেত করেছিলেন দেশ বিদেশের দর্শনের বিদগ্ধ মনীষিবৃন্দ। পরমেশ্বরের বন্দনায় তাঁরা খু ছিলেন একটা 'কমন্ টিউন্।' কে শরীফের সাথে সাথে এখানে আ হত উপনিষদের উদাত্ত সুধীমাত্রই জানেন দার্শনিক সা দারা শিকো উপনিষদের অ করিয়েছিলেন পারসিয়ান্ ভা সেদিন দারা শিকোর অনূদিত "স আসরার" মুসলিম জগতে দ একটা নতুন দুয়ার খুলে দিয়ে মনীষী জগত থেকে দারা শি উপাধি দেওয়া হয়েছিল—শাহ্ একবল্। মানে হল 'ভা রাজপুত্র!' সত্যিই তো ভাগ্যবান। নাই বা পেল ন ই বা রইলো বৈভব গরিমা। স সন্ধানে যে মন সব কিছু ছেড়ে পারে, সত্যের প্রতিষ্ঠায় যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সে ভাগ্যবান্ নয়? ইতিহাসে দুই মহাপ্রাণের নজীর আমি জা

ক্ষুধিত পাষাণের স্পর্শে ও মন চলে গেল দূর দূরান্তে। কে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এসে জি

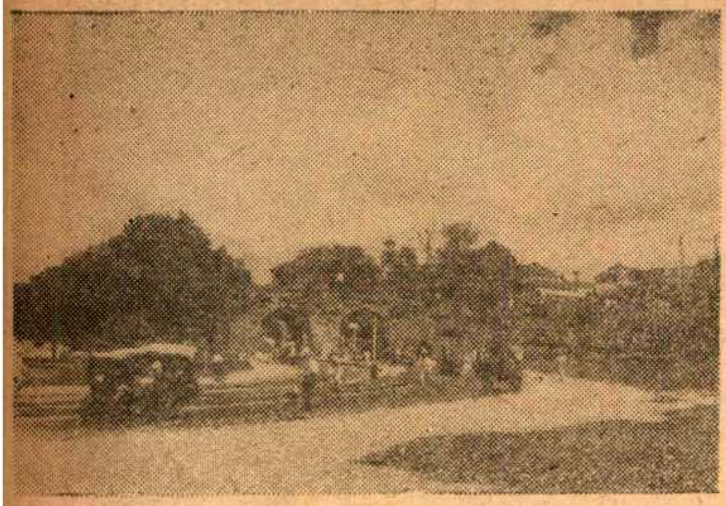

কাশ্মীর গেট—নিকটেই দারা শিকোর পুরানো পাঠগৃহ

রলে, 'সেকুলার' মানে জানো? কুলার? আমি বিস্ময়ে নির্বাক লাম। ছায়াটি কোথায় অন্তর্হিত য়ে গেল। শুধু ভেসে এলো কটা কণ্ঠ, 'সেকুলার' মানে র্মনিরপেক্ষতা। সেকুলার মানে ধর্ম-ীনতা নয়। থিয়োক্র্যাটিক ষ্টেটে াজনীতির যুপকাষ্ঠে ধর্মকেও আজ নেক প্রতিবেশী দেশে শিখণ্ডি খাড়া রে মাইনরিটি রিলিজনকে নির্বাসিত রেছে। টোটালিটেরিয়ান রেজিমে র্মের ফাঁসি হয়েছে। জনহীন এই াক্ষার ক্ষুধিত-পাষাণ প্রাসাদে বসে ামার মন ছুটে গেল শত সহস্র ছরের সত্যসন্ধানী ঋষিদের তপো-নে। এ বাণী যে শাশ্বত সত্য মনে নে বললাম, হে ভাগ্যবান দারা তুমি ামার প্রণতি গ্রহণ করো। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ যায় নি। এ যুগের শ্রেষ্ঠ াপসের মুখেও যে আমরা ঐ একই ণী শুনেছি। মনে প্রাণে আমরা শ্বাস করি—'তপস্যা বলে একের নলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ লিল জাগায়ে তুলিল একটি রাট হিয়া।' সেই 'হিয়াই' ারতের বাস্তব হিয়া। সেইটেই ারতের প্রকৃত রূপ। উপনিষদের ণী প্রচার করে হিন্দু-মুসলিম দর্শনের লন-গ্রন্থি রচনায় যে তাপস রাজ-াতির কূটচালের আঘাতে প্রাণ রালো তাঁকে লাখ সেলাম।

এই মহান্ তীর্থক্ষেত্র ভারতভূমিতে াজ পৃথিবীর কোন্ ধর্মটি অনুপস্থিত? রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে আজ কোন্ ধর্মের মন্দিরটি অনুপস্থিত? হিন্দুদের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, মুসলিমদের জুম্মা মসজিদ, খ্রীষ্টানদের কর্ণেল স্কীনার নির্মিত জাগ্রত সেণ্ট জেনস্ চার্চ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৌদ্ধ মন্দির, জৈনদের লাল মন্দির, শিখদের গুরুদ্বার শিসগঞ্জ, পারসীদের রয়েছে ফিরোজশাহ কোটলার সম্মুখভাগে। এইসব মন্দির থেকে সত্য সন্ধানের একই সুর যেন শুনি।

দারা শিকোর সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ভগিনী জাহান্ আরা। জাহান্ আরার অনুরোধে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ তৈরী হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীতে এই মুসলিম প্রার্থনামন্দিরের তুলনা নেই।

দারা শিকো, আকবর বাদশারও পূর্বে যে মহান্ মুসলিম নরপতি হিন্দু মুসলিম একতার বাণী প্রচার করেছিলেন তাঁর নাম ফিরোজশাহ তোগলক। ফিরোজ নিজেই ছিলেন হিন্দু-মুসলিম একতার প্রতীক। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন ফিরোজশাহ্ তোগলকের মা ছিলেন হিন্দু ললনা।

ফিরোজশাহ্ তোগলকও ছিলেন অপরিসীম বিদ্যানুরাগী। দর্শন ছিল তাঁর প্রাণ। আজ মুসলিম দর্শন অধ্যয়ন করতে আমরা যাই মিশরের অল্-অজর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু একদিন হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মুসলিম

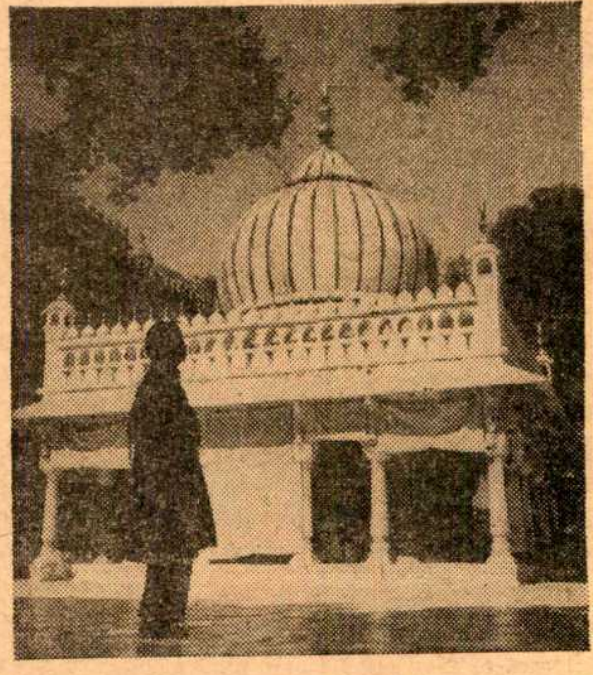

মহাতাপস নিজামুদ্দীন আউলিয়া সাহেবের দরগা। দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রী এসে মহাপুরুষকে জানিয়ে যান তাঁদের আন্তরিক প্রণতি

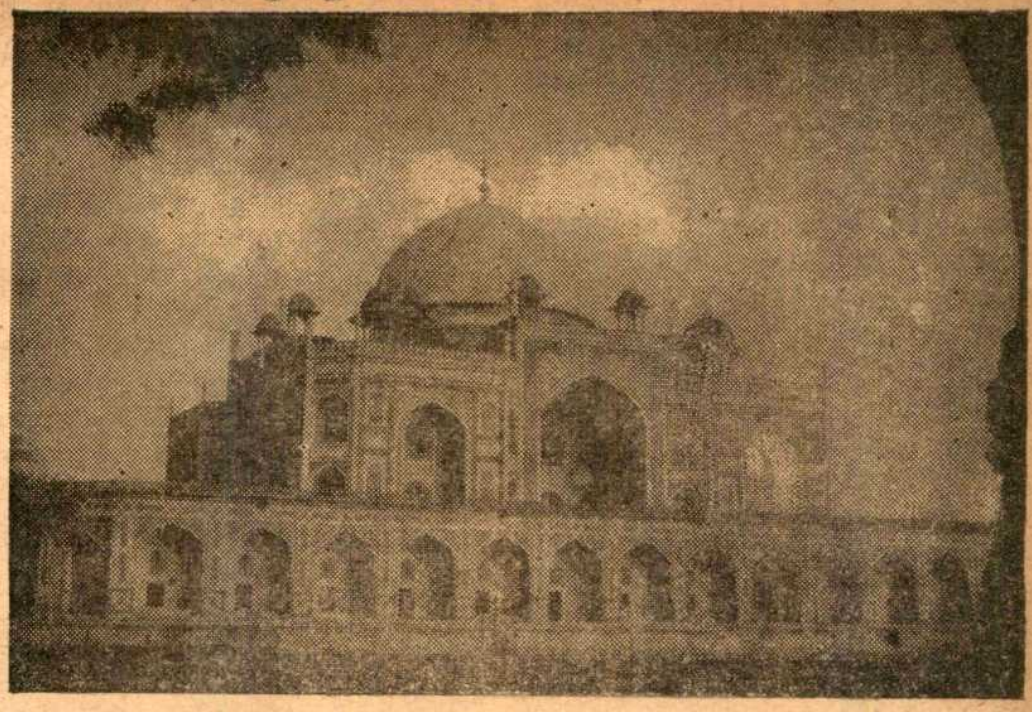

বাদশা হুমায়ুনের কবর। সাম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগম এই সৌধ নির্মাণ করান। স্মরণ রাখতে হবে পরবর্তী যুগে এই কবরের অনুসরণে বিখ্যাত তাজমহল নির্মিত হয়। হামিদা আপন প্রিয়তমের কবর নির্মাণ করিয়েছিলেন দিল্লীর পবিত্র তীর্থভূমি নিজামুদ্দীনের অদূরে।

দর্শনের পবিত্র পীঠস্থান। সে দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভাসছে। হাউসখাশের তৃণশ্যামল ভূমিতে আজও তার স্পর্শ রয়েছে লেগে। কোথায় গেল তুর্কীস্তান, জাবুলীস্তান, চীন, কাবুল, জাঞ্জিবর, খোরাসান, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, বাগদাদ, মিশর থেকে আগত হুঁশিয়ার স্নাতকবৃন্দ। তাঁদের আজানের সুর তো আজও ভেসে বেড়াচ্ছে দিল্লীর আকাশে বাতাসে।

সেদিনকার হাউসখাশটা ছিল আজকালকার ক'লকাতার গোলদীঘির মতন। আকৃতিতে নয়—পরিপার্শ্ব ভঙ্গিমায়। আজ যেমন গোলদীঘির চারিদিক পঠন-পাঠনের সরঞ্জাম সামগ্রীতে রয়েছে জীবনপূর্ণ, এই হাউসখাশও একদিন ঠিক এমন এক নবঘন যৌবনপূর্ণ জীবনে ছিল চঞ্চল। গোলদীঘি আজ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদধৌতির গৌরবে গরিমাময়। হাউসখাশও একদিন করেছে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দর্শনের পীঠভূমির পদতলে জল-সিঞ্চন।

হাউসখাশের চতুর্দিকে রয়েছে মাদ্রাসাগুলোর জীর্ণাবশেষ। ঢুলু ঢুলু পঠনরত স্নাতকের আবেগপূর্ণ কণ্ঠধ্বনিতে এরা একদিন ছিল মুখরিত। স্নাতকের ধ্যান ভঙ্গ ভয়ে সেদিন বনানী ছিল স্তব্ধ। আজ সেই শিক্ষায় তপোবন রূপান্তরিত হয়েছে বন-ভোজনের প্রমোদ কাননে!

আলা-উদ্-দিন সেদিন সুন্দরী প্রেয়সীদের অবগাহন বিলাসের জন্যই এই দীর্ঘিকা খনন করিয়ে-ছিলেন। বিদ্যানুরাগী ফিরোজ-শাহ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্ধারিত করলেন দেহলি প্রান্তে এই নিরালা পরিপার্শ্বে। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের মতন সম্রাট ফিরোজ হাউশখাশের ধূলিকণাকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। তাই জীবন অবসানের পূর্বাহ্নেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিভৃত কোণে নির্মাণ করে গেছেন আপন সমাধি।

চতুষ্কোণ সমাধি মন্দিরের সজ্জী করণের আজ প্রায় সবই কালের অতল গর্ভে গেছে তলিয়ে; গঠন ভঙ্গিমার দৃঢ়তা ছাড়া তার আর কিছুই নেই বাকী। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট খাম্বা নিয়ে খোলামেলা ঘর। এটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিস-খানা—এ্যাসেম্‌ব্লি হল।

তৈমুর তার তাণ্ডব দলনে এই মহাবিদ্যালয়কে ধূলোর সাথে দিয়ে গেছে মিশিয়ে। তার রণ উন্মাদনা এই শিক্ষা নিকেতনকে গ্রাস করেছে। পারে নি শুধু খতম করতে এর ঐতিহ্যকে। তাই আরবিকের পণ্ডিত-মাত্রই আজও সশ্রদ্ধচিত্তে এই মহা-বিদ্যালয়কে জানায় সেলাম। এই মজলিস্ খানার আদর্শেই দারা শিকো গড়েছিলেন আপন এ্যাসেমব্লি হল। দু'টোর আদর্শে কতই না সাদৃশ্য।

* * *

জাহান্ আরার কবর দেখতে গিয়ে সেদিন দেখা হয়ে গেল শেখ নিজামুদ্দীনের দরগা। পাণ্ডাদের কাণ্ড সবাই জানেন। কি কুরুক্ষেত্র, কি কাশী, গয়া, হরিদ্বারে এঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দায়। দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম এখানেও ঠিক সেই কাণ্ড। মুসলিম পাণ্ডার দল চারিদিক থেকে ছুটে এসে ছেঁকে

ধরলো। কোত্থেকে আসা হল হুজুর? ঢাকা, ময়মনসিং, ঘরিশাল? হুজুরের আব্বাজানের নাম—বিশ্বাস করুন পরিষ্কার বাংলায় তাঁরা আমাকে প্রশ্নের বাণে বিদ্ধ করলেন। ফুল, মালা, ধূপকাঠী সংগ্রহ করলাম। ঠিক সেই একই পদ্ধতি। দশ আনার, না পাঁচ সিকের ডালা দেব? অবাক কাণ্ড। গাইডের প্রয়োজন ছিল না। এখানে শতাধিকবার তো এসেইছি তবুও একজন সাথী নিলে দোষ কি? সাথীটি আমাকে শুধু কনভিন্স করাবার চেষ্টা করছিলেন—সব বইতে ভুল লিখেছে। যেই শুধু রেগুলার তালিম নিয়ে এ পবিত্র পীঠভূমির ইতিহাসটুকু জানে।

আমি জাহান্ আরার কবর পাশে রাখছিলাম। সাথীটি নিবেদন করল, "হুজুর গুস্তাকি মাপ্। আগে হজরত সাহেবকে সেলাম পেশ করুন না কেন।"

আমি বললাম, "ঠিক বলেছো ভাই, উনি যে গুরু। চলো সেখানেই আগে যাই।"

সমস্ত মুসলিম্ জগতে শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর এক পবিত্র পীঠভূমি। শেখ নিজামুদ্দীনের প্রিয় শিষ্য আমীর খসরুর কথা পূর্বেই একবার নিবেদন করেছি। তিনি হিন্দী কবিতার প্রবর্তক। তিনি

উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিব

উর্দু সাহিত্যের আদি কবি। আমীর খসরু দিল্লীর কবিদের ভিতর আজও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত, সমাদৃত ও সম্মানিত।

গুরুর প্রতি খসরুর এত অচলা ভক্তি ছিল যে, তাঁর আদেশ ছাড়া খসরু শাহানসা বাদসারও হুকুম তালিম করতেন না। গুরুর দেহত্যাগের সংবাদ শুনে খসরু দিল্লীতে ছুটে

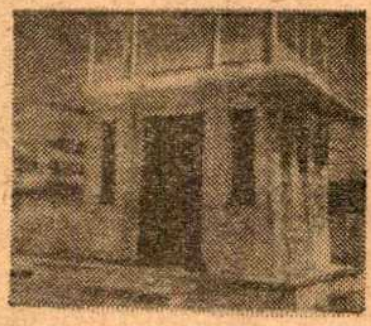

মির্জা গালিবের স্মরণে নব-নির্মিত সৌধ মন্দির

আসেন। শোকে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। শেখ নিজামুদ্দীনের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরেই ভারতের শের-এ-হিন্দ কবি খসরু দেহত্যাগ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ গুরু-ভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল।

মুসলিম সমাজে পীরশ্রেষ্ঠ শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এক শীর্ষস্থান। যুগ যুগ ধরে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ অভ্যর্থনা জানিয়ে এসেছে দূরাগত দীন দরিদ্র পথচারীকে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সবাই মাথা নত করে জানিয়েছে তাদের সেলাম।

গিয়াসুদ্দীন তোগলক যখন দিল্লীর নিকটবর্তী তোগলকাবাদ তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি হুকুম করেন, দিল্লীর কোনো মজুর যেন অন্য কোনো কাজ গ্রহণ না করে। সকলকেই এ নতুন শহর তৈরী করতে হবে।

পথচারীর পিপাসা দূর করার জন্য পীরশ্রেষ্ঠ নিজামুদ্দীন সাহেব তখন একটা দীর্ঘিকা খননে ব্যস্ত। দরিদ্র মজুরের দল বাদশার হুকুম অমান্য করে সন্ন্যাসীর আদেশ শিরোধার্য করল। তারা চায় শুধু তাঁর আশীর্বাদ। তারা চায় না অর্থ। চায় না চিত্ত। চায় প্রেম, ভালবাসা। চায় সত্যপথযাত্রীর আশীস্ কণা।

গিয়াসুদ্দীন সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করার ভয় দেখালেন। সবাই সন্ন্যাসীর পায় এসে লুটিয়ে পড়লো, হুজুর ছাড়ুন এ দরগা।

সত্য সন্ধানী সাধক বললেন, "দেহ্লি হনোজ দূর অস্ত"—দিল্লী এখনও দূরে। সত্যি দিল্লী দূরেই। মদমত্ত গর্বান্ধ শাহানসার মাথায় প্রবেশদ্বার ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি সব ধরার ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

আজও মুক্তিকামী হিন্দু-মুসলিম তীর্থযাত্রী দূর দূরান্তর থেকে এই জ্ঞানের প্রদীপটি লক্ষ্য করে ছুটে আসে। এই প্রদীপ আজ ছাঁশ বছর ধরে কত পথযাত্রীর পথনির্দেশ দিয়েছে তার হিসেব কেউ রেখেছেন কি?

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগার অদূরেই রয়েছে ভারতবিখ্যাত কবি গালীব সাহেবের কবর। মির্জা গালীব চিরজীবন দুঃখের সাথে সংগ্রাম করে গেছেন। শৈশবে পিতৃ-হারা অসহায় বালক মির্জা সাহেব বেদনাঘন জীবনের সাথে এত সুপরিচিত ছিলেন বলেই উর্দু সাহিত্য এত সমৃদ্ধশালী হতে পেরেছে। বড় কষ্টে, বড় ব্যথায়, বড় হতাশায় মির্জা সাহেব বলেছিলেন,—

"নজর লাগে না কঁহি উন্‌কে
দস্ত্ ও বাজুকো।
ইয়ে লোগ্ কি উ মেরে
জখমে জিগর্ কো
দেখতে হ্যায়"

আমার হৃদয়ের জখমী ক্ষত কেউ

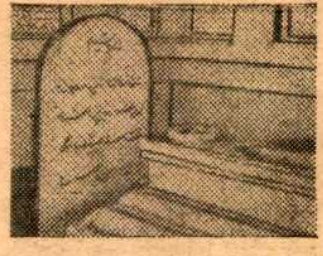

মির্জা গালিবের কবর

দেখো না। দেখলেই যে আমার সেই প্রিয়তমের বলিষ্ঠ বাজুর প্রতি নজর লেগে যাবে। যে বিধাতার বলিষ্ঠ হাতে এই হৃদয় আহত হল তার শক্ত হাতের ওপর কারুর নজর যেন না লাগে।

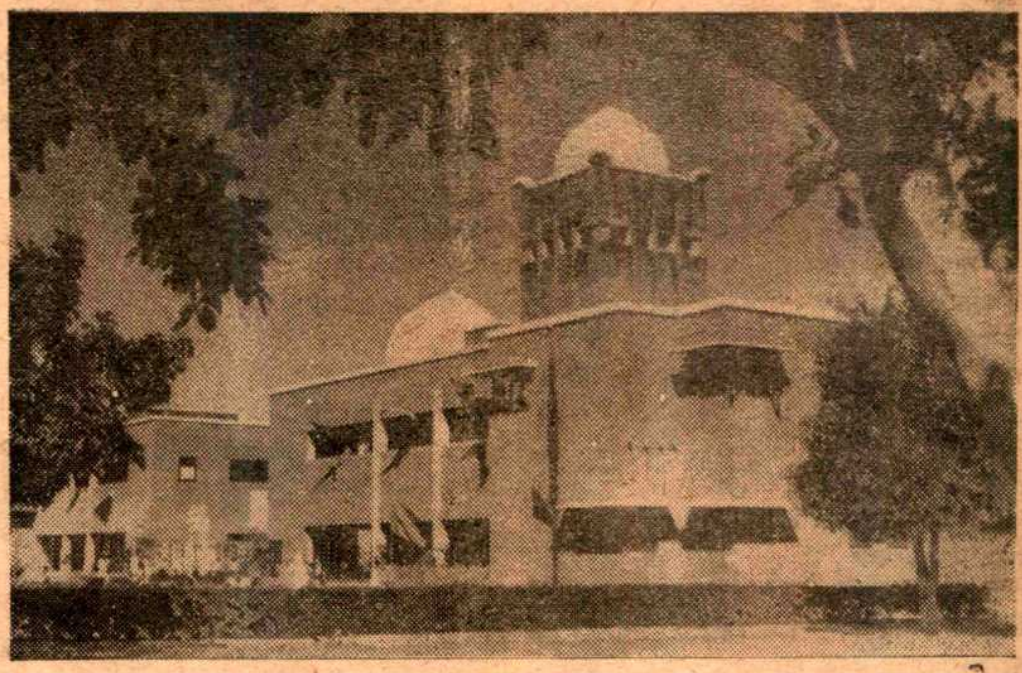

দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ সালের জানুয়ারীতে এই মহাকবি ক'লকাতায় আগমন করেন। ক'লকাতায় তিনি মহানন্দে দিন কাটান। পরে এই কলকাতা বাসের ওপর তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। অধিকাংশ কবিতাতেই বিলাপ করে কবি বলেছেন, আরও আগে এই মহানগরীতে কেন এলাম না? ক'লকাতার তদানীন্তন পত্রিকা 'আয়না-ই-সিকান্দার' পত্রিকাতে কবির ক'লকাতা আগমনের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। গালীব সাহেব তুমিই না বলেছিলে,—

"হায় গায়েব্ এ গায়েব্ জিসকো
সমঝ্তে হায়েন্ হাম্ শাহুদ্
হায়েন্ খোয়াব্ মে হনোজ জো
জাগে হায়েন্ খোয়াব্ মে।"

দিবা-যামিনী আমরা যেন একটা স্বপ্নতেই ডুবে আছি। কবিতাটির প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম মাইকেলের কণ্ঠে "আশার ছলনে আজি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে।" মাইকেলের জীবন সংগ্রামের সাথে যেন মির্জা সাহেবের অনেক মিল। দু'জনেই বড় ব্যয় করতে ভালবাসতেন। দু'জনেরই দরাজ দিল্। দু'জনেই সমস্ত জীবন শুধু কষ্ট পেয়েই গেলেন।

সর্বশেষে গেলাম জাহান্ আরার কবর পার্শ্বে। নিরাভরণ সমাধি। মৃত্যুর পূর্বে সম্রাট দুহিতা নিজেই এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমাধি-গাত্রে সম্রাট-নন্দিনী লিখিত কবিতা খোদিত।

"ছ-আল্ হাই-আল্ কিউম্
বঘাএর্ সব্জা ন পোশদ্
কসে মজার-ই-মরা
কে কব্র পোষ-ই-ঘরিবান
হামী গিয়া বস্ অস্ত্।
আল্-ফকীরা আল্-ফানীয়া
জহান-আরা
মুরীদ্-ই-থ াজ্ গান্-ই-চিশস্তী
বিনত্-ই-শাহ্ জহান্
বাদ্শাহ ঘাজী আনারুল্লা
বুর্হানুহু সনে ১০৯২।"

তিনিই জীবন্ত আত্মসত্ত্ব। আমার সমাধি তৃণভিন্ন কোন আবরণে আবৃত করিও না। দীন আত্মাদের পক্ষে এই তৃণই যথেষ্ট সমাধি-আবরণ।

শাহ্জহান্ দুহিতা, চিশতী সাধুদের শিষ্যা, বিনশ্বর ফকীরা জহান্-আরা, ১০৯২ হিজরা।

ঈশ্বর তাঁহার বোধোদয় করুন।"

কবরের ওপর ধূপকাঠিটা জ্বালালাম। মালাটা কবরপার্শ্বে রেখে নতজানু হয়ে সন্ন্যাসিনী সম্রাটকন্যাকে আদাব্ পেশ করলাম।

জাহান আরা একদিন সমস্ত নারী হৃদয়ের গোপনতম রহস্যটি বিশ্বের সামনে খুলে ধরেছিলেন। কোন্ অসাবধান মুহূর্তে চিরকুমারী জাহান্ আরা বলে ফেলেছিলেন "সূর্য-বিহীনা আকাশ আর স্বামী-বিহীনা নারী সমানই অর্থহীন।"

অদূরেই দেখা যায় হুমায়ুন বাদশার কবর। বহুদিন ধরে এখানে একটা শিক্ষামন্দির ছিল। হুমায়ুন বাদশার জ্ঞানপিপাসা ভুবন বিখ্যাত। সবাই জানেন আপন লাইব্রেরী থেকে নীচে নামার সময়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে। হুমায়ুন বাদশার প্রিয়তমা হামিদাবানু বেগম স্বামীকে পয়গম্বর জ্ঞানে ভক্তি করতেন। প্রিয়তমের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় মক্কা মদিনায় হজ করতে যান।

হজ থেকে ফিরে আসার সময়ে বেগমসাহেবা তিন শতাধিক আর্কিটেক্ট্ নিয়ে আসেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন এ কবর নির্মাণ শেষ হল তখন সম্রাজ্ঞী ঠিক করলেন দু'টো জিনিষ আরও চাই। একটা হ'ল পথচারীর জল পিপাসা নিবারণ। তাই তৈরী হল "আরব সরাই।' অপরটি হলো স্নাতকের

চারিদিকে ছোট ছোট কামরা নিয়ে খোলা হল মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় মুসলিম দর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করতেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্নাতকবৃন্দ। আরবিকের তখন অপরিসীম সম্মান। সেদিনের শিক্ষা মন্দির আজও দু' চারটি স্নাতককে আশ্রয় দেয়। গৃহহারা সংগ্রামশীল উদ্বাস্তু বহু ছাত্রকে আমি এই হুমায়ুন বাদশার কবরে তৃণশ্যামল ভূমিখণ্ডে মুক্ত আকাশ তলে পঠনরত দেখেছি। জ্ঞানপিপাসু বাদশার আত্মা নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে এ দৃশ্যে আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র আত্মাকে হাজার সেলাম।

* * *

মোগল যুগের শেষ বিদ্যামন্দির গাজী খাঁর মাদ্রাসা আজও শিক্ষার দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। আজমীর-ই দরওয়াজা কমলা মার্কেটের সংলগ্ন দেশবন্ধুর প্রস্তরমূর্তির ঠিক সম্মুখভাগে যে সপুষ্প বাটিকা প্রাচীন প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনো একদিন শত হাজার লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে তার প্রতিটি কামরা করে উঠতো ঝলমল। পঠনরত স্নাতক যে কোর-আন্ শরীফের দর্শন উচ্চারণ করতো তার প্রতিধ্বনির রেশ বোধ হয় আজও এই শিক্ষা মন্দিরের আকাশে বাতাসে বিরাজমান—"বিশ্ব-পালক দয়ালু ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।"

এই শিক্ষা মন্দিরটুকুও একটা ক্ষুধিত পাষাণ। দারা শিকোর প্রাসাদের মতন এরও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। মোগল রাজত্ব অবসানের সাথে এখানে নানা দপ্তর খোলার প্রয়াস হয়। আজ থেকে আড়াইশো বছর পূর্বে যে মন্দিরে জ্ঞানের বর্তিকা প্রজ্বলিত হয়েছিল অব্যাহত গতিতে, সে আলো ছড়িয়ে আসছে তার উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা।

এই কলেজে মির্জা গালিব সাহেব অধ্যাপনা করিয়েছেন। এক ফার্লং দূরে বিল্লি মরণ বলে যে ছোট গলিটি রয়েছে সেখানেই ছিল কবির ছোট্ট আস্তানা। আজ সেখানে কেউ সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালায় না কেন? দূরাগত পথিক আজও সেখানে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে জানায় তার সেলাম।

অতীতকে আঁকড়ে বসে থাকলেই তো চলে না। প্রগতির পথে অতীত ছায়ামাত্র। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেখানে বর্তমানকেই দিতে হবে প্রাধান্য। বর্তমান যুগের জামিয়া মিলিয়া, ইসলামিয়া দিল্লীর শিক্ষাকেন্দ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় পবিত্র পীঠভূমি। যে আদর্শে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে আদর্শে সবরমতি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক সেই অনুপ্রেরণাতেই হাকিম আজমল খাঁ সাহেব দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেণ্ট্ ফ্যান্সিস্ অব এ্যাসিসির মহান্ আদর্শে যেমন কেম্ নদীর তীরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেমব্রোক্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বিংশ শতাব্দীতে ঠিক সেই সত্যানুসন্ধানী স্নাতকের পূর্ণ আদর্শে হাকিম আজমল খাঁ এই শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ওকলার ঠিক কাছে শহর থেকে দূরে নিরালা নিভৃত কোণে

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠাতা
হাকিম আজমল খাঁ।

এই শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু মুসলিম সকল ছাত্র অনাড়ম্বর স্নাতক জীবন যাপন করেন পরম স্নেহসিক্ত পরিবেশে। কেম্ব্রিজের পেমব্রোক কলেজ থেকে বিরাট মনীষী বেরিয়েছিলেন—এড্মাণ্ড্ স্পেন্সার, টমাস্ গ্রে—বিশ্ববরেণ্য কবিদের শিক্ষামন্দির এই পেমব্রোক কলেজটি যেমন একদিন স্থাপিত হয়েছিল এক পর্ণকুটীরে, এই জামিয়া মিলিয়াও ঠিক তাই। তারা সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের জীবনে সেদিন ছিলেন অনুপ্রাণিত, আজ শান্তিনিকেতন যেমনটি গুরু-দেবের জীবন থেকে পাচ্ছে কর্মপ্রেরণা,

দিল্লীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ডক্টর আনসারির দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য

সবরমতি আশ্রম যেমনটি পেয়েছে গান্ধীজীর জীবনে, এই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার প্রাণ ঠিক সেই রকম—হাকিম আজমল খাঁ; ডঃ আন্সারি আর অধ্যাপক মুজীব তার উত্তর সাধক। শিক্ষার ক্ষুধিত পাষাণ দারা শিকোর এ প্রাসাদে কতক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই। দূরের গির্জার ঘণ্টায় দু'শ হল রাত এখন গভীর। কত কথাই না মনে এসেছিল। ধীরে ধীরে পাষাণ প্রাসাদ ছেড়ে উঠলাম। কি রহস্যময় পুরী। শিক্ষা-কেন্দ্র ছাড়া একটি দিনের জন্য অন্য কারুর এখানে স্থান হয় নি। বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি? সিপাহী আন্দোলনের আগে বৃটিশ রেসিডেন্সী এখানে বাসা বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। লর্ড মেটকাফে এখানে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। স্যার ডেভিড অক্টারলনি এখানে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। নিছক বিলাসিতার স্থান এখানে হ'ল না। এখানে খোলা হ'ল দিল্লী কলেজ। তারপর এলো সেণ্ট্রিফেল কলেজ। এলো গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল। এলো দিল্লী পলিটেক্নিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে চলে আসছে শুধু জ্ঞানের আরাধনা। শিক্ষার ক্ষুধিত পাষাণ নয় কি?

দেখেছেন দিল্লীর ক্ষুধিত পাষাণ?

শান্তি বিলাস

শান্ত রক্ষিত

সুহ্রেন্ হাসেল নামে একজন ড্যানিশ্ লেখক গত মহাযুদ্ধকে অবলম্বন করে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। সম্প্রতি কিছু ফরাসী, কিছু ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠীর পক্ষে তাঁর উপন্যাস পড়া সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখছি, যাঁদের স্নায়ু দুর্বল, তাঁদের পক্ষে হাসেল্-এর বাস্তবধর্মী উপন্যাস পড়া নিরাপদ হবে না। হাসেল এক জায়গায় স্বনামধন্য সঙ্গীতকার লিশ্ট্-এর কথা প্রসঙ্গে বলছেন, হিট্লার এবং তাঁর প্রচার সচিব গোয়্বেলসের কল্যাণে লিশ্টের অপরূপ মাধুর্যময় সুরসৃষ্টির সমস্ত রসই নিষ্কাশিত হয়ে গেছে। লিশ্ট-এর Preludesকে আবহ-সঙ্গীত ক'রে নাকি উফা (UFA(একটি ছায়া-চিত্র রচনা করেছিল—হ্বারসাউ নগরীর ইহুদী-পল্লীকে জার্মান বিমান বাহিনী কী করে পথের ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিল—তারই বীভৎস চিত্র। তিন দিন তিন রাত ধরে বিরামহীন বোমা বর্ষণের পর যখন সেই ইহুদী-পল্লীর উপর থেকে ধূমের যবনিকা অপসারিত হোল, দেখা গেল—ভস্মাচ্ছাদিত এক বিরাট প্রান্তর, সে পল্লীর লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে দু'চার জন ছাড়া কেউ বেঁচে নেই; ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে একটি দু'টি মৃতপ্রায় নরনারী আর অগণিত ইঁদুর বেরিয়ে আসছে—আর হাস্তরত জার্মান সৈন্যেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে। এই বীভৎস দৃশ্যের ছায়া-চিত্রের সঙ্গে বাজছে Preludes-এর ঐকতান সঙ্গীত। ফলে, যাঁর সামান্য মনুষ্যত্ব-বোধ আছে, সৌন্দর্যানুভূতি আছে—তাঁর কাছেই এই ছায়াচিত্র দেখার পর লিশ্টের সঙ্গীতের সমস্ত আবেদন, সমস্ত মাধুর্য চিরকালের মত নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

হিট্লার

হাসেলের আলেখ্যে সঙ্গীত-শিল্পের এই মর্মন্তুদ পরিণামের কথা পড়ে আমার মনে একটা শঙ্কা ও ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। ইদানীং চীনের আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে আমাদের দেশে, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার ক্ষেত্রে জাতীয়তা-প্রচারের নামে এক নতুন শিল্পাভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে যাকে অকুণ্ঠিতভাবে অভিনন্দন করতে পারছি না। মনে সংশয় হচ্ছে, এটা শিল্পীর রস-সৃষ্টির প্রয়াস, না বিপর্যয়-গ্রস্ত মানুষের অসুস্থ মনোবিকার? বক্তব্যটা একটু বিশদ করে বলা দরকার।

চীনের আক্রমণ আমাদের জাতির এবং দেশের পরম সঙ্কটের কারণ—এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথাও মান্‌তেই হবে যে এই বিপদের সূচনাতেই আসমুদ্র-হিমাচল এই ভারতভূমির অগণিত জনসাধারণ এককণ্ঠে, একচিত্তে দেশ-সেবার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এই ব্যাপক জন-জাগরণের প্রেরণা উৎসারিত হয়েছে গণমানবের স্বাভাবিক দেশাত্মবোধ থেকে। এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ উদ্দীপনা বা নিঃস্বার্থ দেশসেবার আকুতি কোনো আন্দোলন বা রাজনৈতিক প্রচারের অ রাখে নি। অবাক বিস্ময়ে ভেবেছে— 'এ যৌবন-জল- রোধিবে কে?' আমাদের জ মানসের এই বিপুল উৎসাহকে ভাবাবেগ ও অনুভূতির রাজ্য উদ্ধার করে সার্থক কর্মের নিয়োজিত করার ভার তাঁদের

গোয়্বেলস

যাঁরা আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সম জীবনের কর্ণধার। কিন্তু এই অথচ অবশ্য করণীয় কাজটা সুষ্ঠু সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা' মাঝে ম যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা ক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

* * *

যাঁরা সঙ্গীতানুরাগী এবং আক বাণীর প্রচারিত সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয় ভাবে শুনে থাকেন—তাঁদের সব একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আজকাল, যার অর্থ অথবা উ প্রণিধান সহজ নয়। চীনা আক্রম অব্যবহিত পর থেকেই আকাশব সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রধান উপজীব্য বীর-রস। কিন্তু আমাদেরই দে আপ্তজনবাক্য 'সর্বমত্যন্ত গর্হিত এই বীর-রসের আত্যন্তিক প্রচার হাস্তরসের সৃষ্টিতে পরিণত হয়,

বিজয়োন্মত্ত জার্মান সৈনিকগণ

কী আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষরা উপলব্ধি করতে পারেন না? কিছুদিন ধরে বার বার শোনা গেল, "শপথ নিলাম, শপথ নিলাম, প্রাণ করিনু পণ।" বীররসের আশ্রয়ে দেশপ্রেমের মহিমা প্রচার—সাধুসঙ্কল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু করুণ রসাত্মক ভৈরবীর মিশ্ররূপেও যে বীর রসের সঞ্চার হয় না—এ বোধ কী করে লোপ পেল! রাগের অন্তর্নিহিত রসমূর্তির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেশমাতৃকার পদতলে প্রাণদানের যে গৌরব অথবা আত্মাহুতির শপথ গ্রহণের মধ্যে যে মহিমা ও গাম্ভীর্যের ব্যঞ্জনা আছে, তার প্রকাশ চটুল দোলায়িত ছন্দে গাওয়া এই গানে সম্ভব নয়—এমন সহজ সরল কথাটা ভুলে যাওয়া কী করে সম্ভব? অথচ জনশ্রুতি, যে এই অতি-সাধারণ অখ্যাত একটি পুরাতন গানকে বিস্মৃতির অতলতল থেকে উদ্ধার করে জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য না কি দু'একজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক আকাশবাণীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুধু কী সঙ্গীত-জগতেই এই বিচার-বিভ্রমের প্রকাশ! সাহিত্যিকরাই কী তাঁদের সৃজনী-প্রতিভা ও ভাবনা চিন্তাকে অপ্রমত্ত-সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত রাখতে পেরেছেন? কিন্তু এ প্রসঙ্গ বারান্তরে আলোচনা করব। স্থানাভাবের অনুশাসনের কথা ভেবে এবং সম্পাদিকার ভ্রূভঙ্গ-লীলার কথা কল্পনা করে শঙ্কিত হচ্ছি!

শুধু ভাবি, যাঁরা সৌন্দর্যের উপাসক, রসস্রষ্টা তাঁরা কী করে গললগ্নীকৃতবাস হয়ে প্রচার অধিকর্তাদের হুকুম-তামিল করে সরস্বতীর আরাধনা করছেন! ফরাসী কলাবিদ্ না বলেছিলেন যে, কলালক্ষ্মীরা কাঁদার সময় ও মুখশ্রীর বৃদ্ধি হচ্ছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখেন (un secret dessein de sembellir)? আর আমাদের দেশেরই একজন বিদগ্ধকুলচূড়ামণিই তো কলালক্ষ্মীকে হ্লাদৈকময়ী অনন্য পরতন্ত্রা' বলে বর্ণনা করেছিলেন! কিন্তু, হায় শাতোব্রিয়াঁ! হায় মম্মটভট্ট!

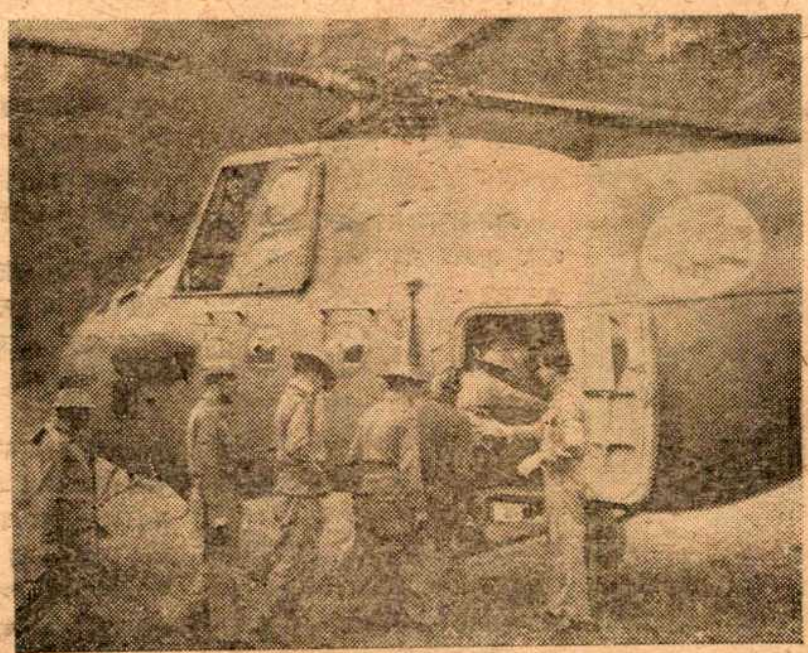

চীন হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় বন্দিগণ গৃহে ফিরিবার জন্য বিমানে উঠিতেছেন

মহানগর

সুভাষ সমাজদার

সমুদ্র।

আবার সমুদ্রে এলাম। হাওড়া স্টেশনের লোক গম্ গম্ প্ল্যাটফরম, রাস্তায় ট্রামের সরোষ গর্জন, হাজার হাজার পথচলতী মানুষের টুকরো টুকরো আলাপ, মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ আওয়াজ—সব মিলিয়ে শব্দের সে এক মহাসমুদ্র!

হাওড়ার পুলের ওপরে দাঁড়ালে দেখা যায়, দূরে বহুদূরে গঙ্গার দু'পারের আবছায়া কুয়াশাময় বড় বড় দালানগুলো প্রাগৈতিহাসিক কালের এক একটি অতিকায় প্রাণীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে প্রচণ্ড কোলাহলমুখর এই বিশাল মহানগরীর দিকে। হয়তো—হয়তো ধোঁয়া ধোঁয়া সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ওরাও অরুণা লাহিড়ীর মতই ভাবছে, কোথায় আছে—কতদূরে একটু ফাঁকা নিরিবিলি জায়গা আছে, যেখানে গেলে পাখীর ডাক শোনা যাবে। শোনা যাবে গাছের পাতার মর্মর.....

—দেখুন প্রবীরবাবু, এই-রকম ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ আমার খুব ভাল লাগে। আর যদি এই মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা বাড়ীতে থাকতে পারা যেত, কথা বলতে বলতে অরুণা লাহিড়ীর কাজলটানা চোখে স্বপ্ন নেমেছিল। আর কেমন মেদুর একটা বেদনার ছায়াভাসও—

ব্যথা! কিসের ব্যথা থাকতে পারে অরুণা দেবীর। অর্থ, খ্যাতি কিছুরই তো অভাব নেই। একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। আধুনিক গান আর রবীন্দ্র সঙ্গীতে তাঁর সুনাম আছে। সুনামের হতে কিছু কিছু অর্থও আসে ঘরে। স্বামী রমেন লাহিড়ী। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের পসার-ওয়ালা উকিল। মৌলালী আর ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে 'বিশ্বকর্মা' মোটর মেরামতের কারখানার পাশে বহুকালের পুরাণো লাল রঙের দোতলা দালানটাই মিঃ লাহিড়ীর পৈত্রিক বাড়ী। একতলা, দোতলার সব ঘরে ঘরে থাকে ভাড়াটেরা। ছাদের ওপরে তিনখানা ঘরে আইনজীবী আর গায়িকার সংসার। তিনটি ঘর বললে ভুল হবে, সাড়ে তিনটি বলাই উচিত। ছাদের উপরে একটুখানি জায়গা চট দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন রমেন লাহিড়ী। সেখানে তাঁর মুহুরী বসে। বসে মক্কেল আর তাঁদের সাক্ষীসাবুদরা। সেই কাছারীঘরের পাশের ঘরটি অরুণা দেবীর ড্রইংরুম। আবার লোকজন কেউ না এলে ছেলেরা এই ঘরেই বসে পড়তো।

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। অরুণা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে সেই বাড়ীতে যেয়ে খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। বিশাল বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এত কষ্ট করে থাকে কেন এঁরা? দুই জনেই তো শুনেছি যথেষ্ট উপার্জন করেন!

—তোমাকে কতবার— কতবার বলেছি জমির দখলীস্বত্বের মামলা এত কম ফি তে হয় না। একটা হেঁড়ে গলার চীৎকারে কেঁপে উঠল ছাদটা।

—এই মক্কেল ভদ্রলোকটি কানে কম শোনেন। তাই মিঃ লাহিড়ীকে খুব জোরে কথা বলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছায়া নেমে এল অরুণার মুখে।

—তা ছাড়াও দুবার দুবার জোরে কথা বলেন না, ঘরের কোণ থেকে যেন সতের বছরের একটী ছেলে বলে উঠল। বেশ সুশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়সের তুলনায় গম্ভীর মনে হল।

—তোমার এ কথা বলা উচিত হয়নি খোকা—তুমি পাশের ঘরে যাও পড়ো—

মাথাটা ঝাঁকালেন অরুণা লাহিড়ী।

—ঢং-ঢং-ঢং শ্-শ-শ-শ্—

—সা-রে-গা-মা-পা ধা-নি-সা—

—তোমার বাণী অনেকক্ষণ আছে, সরাও শীগগির—

নীচে মোটর গ্যারেজে হাপিটিয়ে মাডগার্ড ঠিক করছে। নীলাভ আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত চলেছে ওয়েল্ডিং-এর কাজ। যে ঘরে ছেলেকে পড়তে পাঠ সেই ঘরেই গলা সাধছে কেউ। জল নিয়ে ভাড়াটেরা ঝগড়া করে

—এ বাড়ীতে ভীষণ হট্ট প্রবীরবাবু। মোটর মেরা কারখানাটা আমি তুলে দেওয়ার করেছিলাম। কিন্তু—হঠাৎ গেলেন অরুণা লাহিড়ী। মুখখানাকে নীচু করে মাটির তাকিয়ে রইলেন।

—এত আওয়াজ, এত হট্টগোলের ভেতরে বাস করেন কি করে, এই কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বললাম না। শোভন নয়। প্রথম এসেছি।

কিন্তু তার কথা শুনতেই আমার রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। সেই তীব্র বিচিত্র শব্দে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কানের পর্দার ওপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে শব্দের এক একটা ঢেউ। আমার যে প্রয়োজনীয় কথা ছিল, তা কোনরকমে শেষ করে তাড়াতাড়ি সেই বিপুল শব্দমুখর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লাম।

পরে আরও বারকয়েক গিয়েছি তাঁর বাড়ীতে। যখুনি গিয়েছি তখুনি শুনেছি সেই ঢং-ঢং শব্দ। আমার মনে হয়েছে সেই বিকট শব্দ যেন সাঁড়াশীর মত এ-বাড়ীর মানুষগুলোর গলা টিপে টিপে ধরছে। গান করতে দেবে না। পড়তে দেবে না। কোন মানবিক ভাবনা ভাবতে পর্যন্ত দেবে না! তবুও অরুণা দেবী গান করেন। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। আশ্চর্য!

সভা-সমিতিতেই প্রথম পরিচয়। সভা উপলক্ষে মিসেস লাহিড়ীর ডাকে ক'লকাতার বাইরেও দু'তিনবার গিয়েছি। গায়িকা অরুণা দেবী যাচ্ছেন শুনলে আমরা সাহিত্যিক বক্তারা খুব আনন্দিত হতাম। কলকাতার বাহিরে গেলেই অদ্ভুত হাসিখুসী আর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন তিনি। কথায় কথায় রসিকতা। আর বর্ষার নতুন জলের আহ্লাদের মত কলকল করা হাসি। প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত তাঁর সেই মূর্তি দেখলে আমার মনে হতো, সাড়ে তিনটি ঘরের খাঁচা আর শব্দের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে একটা পাখী যেন মনের আনন্দে আকাশে ডানা মেলেছে।

সেই অরুণা লাহিড়ীর এবার কি হলো? কাঁথি যাওয়ার পথে হাসি-গল্পের ফাঁকে ফাঁকে এক এক সময় বিষণ্ণ হয়ে উঠছেন কেন? কেন চলন্ত ট্রেনের জানালায় চিবুক রেখে বললেন, এই ফাঁকা মাঠের ভেতরে যেমন তেমন একটা বাড়ী করতে কত খরচ হতে পারে?—চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর আর গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন। কেন?

আমি চট করে তাঁর কথার উত্তর দিতে পারি নি। রেল লাইনের দু'পাশের ঘন সবুজের ছবির মত অবারিত মাঠের সৌন্দর্য শহুরে চোখকে মুগ্ধ করে, জানি! এও জানি, শহরের জনাকীর্ণ হাওড়া কি শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে গেলে সেই নিঃসীম মাঠের ছবি কুয়াশার মত মিলিয়ে যায় তাঁদের মন থেকে। একটু আগে যে ফাঁকা মাঠে বাড়ী করার সঙ্কল্প জেগেছিল—তা ভাবতেই হাসি পায়! কিন্তু অরুণা দেবী যেমন করে বললেন, তাতে তো মনে হচ্ছে, ধর্মতলার বাড়ীর সেই শব্দ সত্যি সত্যি এতদিন অসহ্য হয়ে উঠেছে! হয়তো—

—কি ভাবছেন প্রবীরবাবু?

—ফাঁকা মাঠে বাড়ী করার কথা সিরিয়াসলি—

—পাগল না কি আপনি! খিল খিল করে হেসে উঠলেন অরুণা দেবী। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ে নিলেন। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখতে দেখতে বললেন, প্রবীরবাবু আপনি একটা—

—কি?

—নেহাত ছেলেমানুষ। আবার হাসির দমক উঠল।

—তোমার তো শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশে থাকাই উচিত অরুণা, আমাদের ভেতরে বয়োজ্যেষ্ঠ

সাহিত্যিক বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, শিল্পীর বাড়ীতে অত চীৎকার আর হট্টগোল যে কি অসহ্য—

—কিন্তু আমার তো ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে দাদা—

বীরেনদা'র মুখে চিন্তার ছায়া নামল। যে কোন বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। আমরা তাঁর কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম। খুব আস্তে আস্তে বললেন, জানো অরুণা 'নিউইয়র্ক সিটি নয়েজ কমিশন' নামে একটা কমিশন 'নয়েজ' নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কারখানার একঘেয়ে শব্দ মানুষের নার্ভ পর্যন্ত খারাপ করে দিতে পারে আর শ্রবণ শক্তি তো নষ্ট হয়ই। আজ তুমি বুঝতে পারছো না। কিন্তু একদিন—

—তাই বলে গোলমালের ভয়ে এই ফাঁকা মাঠে পালিয়ে আসতে হবে? লাইট নেই—ফ্যান নেই। সিটি-লাইফের কোন সুবিধাই তো নেই দাদা, কিশোরী প্রেমিকার মত অনুযোগ ঘনিয়ে এল অরুণা দেবীর চোখে। আর একটিও কথা না বলে খুব মনোযোগ দিয়ে কার্ডের মত কাগজটা পড়তে লাগল।

—কি ওটা?

—বাঙলা দেশের সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে দু'একটা কথা বলবো মিটিং-এ। তার পয়েন্টস।

নাগপুর প্যাসেঞ্জার জোরে ছুটে চলেছে। ট্রেনের চাকায় চাকায় প্রচণ্ড শব্দের ঐকতান বাজছে। অরুণা দেবী কাগজটাকে ব্যাগের সম্মুখের খোপে গুঁজে রাখলেন। আবার বীরেনদা'ও অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে হেসে গল্প করতে সুরু করলেন। কবে কোন কলেজের সোশ্যালে গান করতে যেয়ে কী বিপুল প্রশংসা পেয়েছিলেন অথচ গানে একবার তাল কেটে গিয়েছিল; সাধারণ লোকের সঙ্গীত সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতা—সেই সব কথা বলছেন আর বলার ফাঁকে ফাঁকে হাসিতে একেবারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছেন। ডানদিকে কাৎ হয়ে হাত ঝাঁকি দিয়ে কি একটা বলতে যেতেই ব্যাগে গুঁজে রাখা কাগজখানা হঠাৎ পড়ে গেল মেঝের ওপরে। কিন্তু চোখের পলকে ছো দিয়ে সেটাকে তুলে নিলেন। অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। আমাকে বললেন, আমার বক্তৃতার পয়েন্টস দেখে ফেললেন তো? তাঁর লিপষ্টিক মাখা রক্তলাল ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। কেমন শুকনো আর মরা হাসি!

—ইন্টেনসিটি এই ইংরাজী কথাটা লেখা আছে দেখলাম। ওটা কিসের—

—না; না, আপনি ভুল দেখেছেন প্রবীরবাবু—

আমার কথাকে এড়িয়ে আবার আড্ডায় মেতে উঠলেন বিখ্যাত গায়িকা অরুণা লাহিড়ী। কেমন খটকা লাগল। আমি স্পষ্ট দেখলাম ইন্টেনসিটি এবং আরও কি সব হিজিবিজি করে লেখা আছে ইংরাজীতে সেই কাগজটায়। কি যেন একটা চেপে যাচ্ছেন। এবার তাঁকে খুব বেশি হাসিখুসি দেখছি। পরনে আবছায়া নীলের আভাস দেওয়া ঢাকাই বুটিদার শাড়ি। নীলাভ ছায়ার অন্ধকারে তাঁর গৌরবর্ণ তনু যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে। পেন্টকরা মুখের ডানদিকে সযত্ন রচিত একটি তিল; পেন্সিল দিয়ে আঁকা নিবিড় কালো দীর্ঘ ভ্রূযুগল। এই সাজসজ্জা উগ্র প্রসাধন আর তাঁর হাস্যপ্রদীপ্ত মূর্তির আড়ালে কোন ব্যথা কোন গভীর অতৃপ্তি—

—টক-মিষ্টি ঝাল-লজেন্স আছে—ভাল লজেন্স—

—চিরুণী চাই, চিরুণী—

—এবার মাঠের অবস্থা দেখেছ তো হে! শুকিয়ে খটখট করছে। দুর্ভিক্ষ ঠেকায় কে?

ফেরিওয়ালাদের চীৎকার যাত্রীদের টুকরো টুকরো আলাপে কামরার ভেতরে বিচিত্র একটা শব্দের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। সেই গোলমালকেও ছাপিয়ে একটা কচিগলার স্বর কানে পড়ল—

—বাবা, ট্রেনের শব্দটা কি বলছে জানো?

—কি?

—খড়্গপুর আর কতদূর—খড়্গপুর আর কতদূর—

—তুই যা বলবি, ট্রেনের আওয়াজ তাই বলবে। এই শব্দের একটা তাল আছে, ছন্দ আছে। তা-না থাকলে আমরা এত জোর আওয়াজ সহ্য করতে পারতাম না—

বারো তের বছরের ছেলেটি আবার কান পেতে শব্দটার ভেতরে ভাষার অনুরণন শুনতে চেষ্টা করল আর তার বাবা গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে।

হঠাৎ আমার মনে হল, ট্রেনের আওয়াজের যেমন তাল আছে ছন্দ আছে, তেমনি অরুণা লাহিড়ীর বাড়ীর শব্দেরও একটা তাল আছে। শুধু তাই নয়। সেই প্রচণ্ড শব্দ ব্যঞ্জনায়। স্পষ্ট সে যেন বলছে—

ঢং ঢং ঢং
টাকা-টাকা-টাকা—
ঢং-ঢং-ঢং

স্বার্থপর হও—আত্মকেন্দ্রিক নিজের প্রয়োজনের বাইরে আর

ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদে

সাপ্তাহিক বসুমতী

অভিনব বৈশিষ্ট্যে আগামী ২ বৈশাখ রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে প্রকা হবে। কবি সম্পর্কিত দেশান্তরের তথ্যসমৃদ্ধ প্রব লেখকদের রচনা এ-সংখ্যার অ পূর্ব আকর্ষণ। সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র হরপ্রসাদ মিত্র, সুরেশ চক্র মৈত্রেয়ী দেবী, চিন্তামণি কর, মজুমদার, ধীরেন দেবনাথ, রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ সাহিত্যর বিভিন্ন রচনায় এক একটি নতুনভাবে আলোকপাত হয়েছে।

সম্পাদিকা: জয়ন্তী সে
দি বসুমতী প্রাইভেট লি
কলিকাতা-১২

ভেব না—ভেব না—ভেব না। ঠকবে-ঠকবে-ঠকবে-ঠকবে—টং-টং-টং—

সব ঘর ভাড়া দিয়ে নিজেরা এত কষ্ট করে থাকে। যে দু'একদিন গিয়েছি, তাতেই বুঝতেও পারা যায় রমেন লাহিড়ী অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল লোক। তাঁর স্বার্থের বাইরে একটা পা ফেলেন বলে তো মনে হয় না। আর বহুদিন ধরে সঙ্গীতচর্চার প্রতিকূল সেই নিষ্ঠুর শব্দমুখর ও নির্মমতম বাস্তব পরিবেশে থেকে থেকে অরুণা লাহিড়ীরও শিল্পীসত্তার মৃত্যু হয়েছে। এখন যেটুকু আছে তা মেকী। তাই এই বয়সেও অত সাজগোছের সমারোহ। এই পোষাক আর উগ্র প্রসাধন যেন তাঁর দৈন্যকে ঢেকে রাখার প্রয়াস।

—দেখুন বীরেনদা', জানালার বাইরে তাকিয়ে সেই তখন থেকে দার্শনিকতা করছেন প্রবীরবাবু—

—ও যা খুসি করুক। তোমার বক্তৃতার পয়েন্টসটা দেখাও তো। বক্তৃতা তো আমাকেও করতে হবে—

—না বীরেনদা', এই কাগজটা দেখাতে পারবো না। মাফ করবেন। আপনি কি বলবেন, তাই বলুন না? সারা দেহে বিচিত্র একটা ছন্দের ঘূর্ণি খেলিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলেন অরুণা লাহিড়ী। সামনের বেঞ্চের সেই বাপ ও ছেলে—দুইজনেই বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। হয়তো তারা ভাবল, এমন রঙ-করা ঠোঁট যার, পেন্সিল আঁকা ভ্রূ—সে এত জোরে হাসে! হাসতে পারে!

—বক্তৃতার বিষয়বস্তু অত গোপন করতে চাচ্ছেন কেন! কাগজটায় তো দেখেছি, লেখা আছে 'ইন্টেনসিটি' কথাটা। ইন্টেনসিটি মানে তো তীব্রতা। সঙ্গীত বিষয়ের ওপরে আমণে এই শব্দটা কোথা থেকে আসে? মনে হল, আবছায়া নীল শাড়ি জড়ানো দীর্ঘাঙ্গী মূর্তিটাকে ঘিরে কেমন একটা রহস্যের ছায়া যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে। আর সুতীব্র অস্বস্তিকর একটা কৌতূহলে জ্বলে যেতে লাগল আমার মন।

কাঁথি পৌঁছলাম। সন্ধ্যায় সভা সুরু হল। বীরেনদার বক্তৃতার পর জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অরুণা লাহিড়ীর ডাক পড়ল। গানের আগে তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। অন্তত আমরা তাই জানতাম। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। গান ধরলেন—

জীবনপাত্র উছলিয়া.....

ভেঙ্গে পড়ল হাততালির ঝড়। সভার ভেতর থেকে অনুরোধ এল—আর একটা—আর একটা ধরুন—

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল অরুণা লাহিড়ীর চোখ-মুখ। কিন্তু আমার কেমন মনে হল। বক্তৃতা করলেন না। তাহলে কাগজটা কি—কি লিখে রেখেছিলেন মিসেস লাহিড়ী!

সভা শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল। কাঁথির একমাত্র আবাসিক হোটেল 'মিলনী'তে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলে এসেই বীরেনদা, অরুণা লাহিড়ী এবং অন্যান্য শিল্পীরা তাস নিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ মশগুল হয়ে গেলেন।

মিসেস লাহিড়ী যেন খুসিতে গলে গলে পড়ছেন। তাঁর গান শহরের লোকের খুব ভাল লেগেছে। স্থানীয় অনেক লোক পর্যন্ত এসে তাঁর গানের প্রশংসা করে গেল। বড় শিল্পীর মত নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাদের দু'একটা কথা বলে বিদায় করলেন। কিম্বা হয়তো খেলার রসটা মাঠে মারা যাবে বলেই আলাপ সংক্ষিপ্ত করলেন—তা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। মনে হল, তাসের আড্ডায় বসেও যেন কেমন অন্যমনস্ক!

আমি সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। তাসের আড্ডার পাশে বসে থাকতে আমার ভাল লাগল না।

বাইরে এসেই নিস্তব্ধতার সমুদ্রে তলিয়ে গেলাম। অরুণা লাহিড়ী কি দেখেছে, মফঃস্বল শহরের রাত্রির এই থমথমে আর আর কেমন গা ছম-ছম করা ভুতুড়ে চেহারা! বোধ হয় পূর্ণিমার রাত্রি। দূর আকাশে গা টেনে টেনে ইয়া ঢাউস এক চাঁদ উঠল। আর ধীরে ধীরে চারিদিক কেমন মায়াময় হয়ে উঠল।

হোটেল থেকে অল্পদূরে একটা পুকুরের বুকে যেন চন্দনধারা জ্যোৎস্না চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। মৃদু হাওয়ায় ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে তার জল। চারিদিকের উঁচু পাড়ের সারি সারি তালগাছগুলো তরল অন্ধকার গায়ে মেখে এক একটা অতিকায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেই পুকুরের পাড়টা যেন একটা জমাট স্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করছে।

আমি মহানগরীর নাগরিক। কোলাহল ক্লান্ত। সেই অখণ্ড নির্জনতা আমার চেতনাকে কেমন আবিষ্ট করে দিল। অরুণা লাহিড়ী যদি এই নিচ্ছেদ স্তব্ধ পরিবেশটা দেখতেন।

খস-খস। শুকনো পাতার ওপর দ্রুত ধাবমান মানুষের পায়ের শব্দ। এ কী—! কে আসছে! আমি চমকে উঠবার আগেই কানের কাছে খুব চাপা ফিসফিস সুরে কে যেন বলে উঠল,—ইস এত নির্জন কোন জায়গা হয়, এত নিরিবিলি কোন জায়গা থাকতে পারে! এত চুপচাপ, এত নিস্তব্ধ! অদ্ভুত-অদ্ভুত—আরো আরো আগে এখানে কেন আসি নি, সুখস্বপ্নের ঘোরে যেন প্রলাপ বকছেন অরুণা লাহিড়ী। কলকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সম্রাজ্ঞীর মত সম্মান যাঁর, তাঁকে যেন পাড়াগাঁর এঁদো-পুকুরের ধারে সেই রাত্রে বড় করুণ আর বড় রিক্ত মনে হয়েছিল।

—আপনি খুব গোলমালের ভেতরে থাকেন তো, তাই এই নিস্তব্ধতা এত অদ্ভুত লাগছে আপনার—

আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না। নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকার তালবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। ঘন ছায়া বিষণ্ণ বাতাসে হু-হু করে কাঁদছে। ডাইনীর মত মাথা নাড়ছে তালগাছগুলো। চারিদিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতা, আকাশভরা রাশি রাশি তারা আর চাঁদের আলো-ছায়ায় মায়াময় সেই আরণ্যক রাত্রি যেন ধর্মতলার বাড়ীর কোলাহলে অভ্যস্ত মানুষটার দেহ, তার মন, তার চেতনাকে একেবারে শবের মত ভারী অনড় আর অবসন্ন করে দিয়েছে। শব্দমুখর পৃথিবী থেকে অনেক—অনেক দূরে গভীর স্তব্ধতার অনন্ত এক সমুদ্রে তিনি যেন

একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছেন... ডুবে যাচ্ছেন...নিস্তব্ধতার বিপুলতায় সমুদ্রে পড়ে সাঁতার না জানা মানুষের মত হাঁসফাঁস করছেন—এখুনি শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃতপ্রায়...

—ও কি আপনি অমন করে কাঁপছেন কেন? ভয় পেয়েছেন।

—জানেন—জানেন প্রবীরবাবু? ধর্মতলার বাড়ীর সেই শব্দ আমার—আমার কত বড় শত্রু!

—কেন আপনি তো বেশ অভ্যস্ত—

—না না আপনারা কেউ জানেন না, কেউ জানেন না। জানতে দিতে চান না মিঃ লাহিড়ী। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখখানা একেবেঁকে কেমন দুমড়ে গেল। কাজলটানা চোখদুটো চিকচিক করছে। সোসাইটি লেডী হয়ে একটু উঁচু গলায় কথা বলেছেন। শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই হয়তো দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু—

পারলেন না। তাঁর জলভরা চোখদুটোর ব্যথাতুর দৃষ্টিটা দূরে মেঘে ঢাকা চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে মৃদু অস্ফুটস্বরে বললেন, আমার বড় ছেলেটি অসুস্থ প্রবীরবাবু। নার্ভের অসুখ। ডাক্তার বলেছেন, খুব নির্জন জায়গায় রাখতে হবে। কিন্তু ধর্মতলার বাড়ী ছাড়া—গলায় জমে ওঠা ব্যথার উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

দূরে বহুদূরে অন্ধকারের গহ্বর থেকে শেয়ালের কান্না উঠল পাকিয়ে পাকিয়ে। সাঁ সাঁ করা বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়তে লাগল তালগাছের পাতায় পাতায়। আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার কানের কাছে যেন বেজে উঠল সেই একটানা একঘেয়ে আওয়াজ—ঢং—ঢং—ঢং—। শব্দটা যেন রমেন লাহিড়ীর নির্মম আত্মকেন্দ্রিকতা তথা মহানগরীর স্থূল স্বার্থসর্বস্ব মানুষের সংকীর্ণ মনের কথা ঘোষণা করছে দূর দূরান্তরে।

সেই রাত্রির তরল অন্ধকার, অবারিত আরণ্য প্রকৃতি আর চারিদিকে অন্তহীন স্তব্ধতার সমুদ্র যেন অরুণা লাহিড়ীর শহুরে মুখোসটাকে টান মেরে খুলে দিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল ভেতরের মানুষটা। আমাকে দেখিয়েছিল সেই কার্ডের মত কাগজটা। 'পি, জি, হাসপাতালে'র আউটডোর কার্ড। ইংরাজীতে রোগের কারণ লেখা আছে...রোগীর দুর্বল স্নায়ু...তীব্র (ইন্টেনসিটি) আওয়াজ একটানা শুনে শুনে নার্ভ খারাপ হয়েছে...আরও তিন-চারটি কারণ হিজিবিজি করে লেখা ছিল।

কান্নায় ভিজে ভিজে অস্পষ্ট গলায় বলেছিল জানেন, অত বড় অসুখ ছেলেটার। তার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সবসময় নিজের কাজে ডুবে আছেন। আমি একলা একটা মেয়েমানুষ কি—কি করতে পারি বলুন তো—কেমন করে খোকাকে ভাল করে তুলবো—চারিদিকের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর কথাগুলো চাপা আর্তনাদের মত শোনা গিয়েছিল।

পরদিন সকালে আমরা কলকাতায় রওনা হলাম। ট্রেনে যথারীতি তরল হাস্য-পরিহাসে সবাইকে মাতিয়ে তুললেন। যেন কিছুই না। দলের একজনও জানতে পারল না তাঁর গোপন ব্যথার করুণ ইতিবৃত্তটুকু। মনের ভাব চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলাই হয়তো সোসাইটীতে বেঁচে থাকার 'আর্ট'...হয়তো এর নামই আধুনিক সভ্যতা...থাক সে সব কথা।

আবার এলাম সমুদ্রে। শব্দের সমুদ্র। হাওড়া স্টেশন। থৈ থৈ করছে মানুষ। এক একটা লোক। এক একটা পৃথিবী। কতজনের বুকের ভেতরে অরুণা লাহিড়ীর মত কত দুঃখ নিঃশব্দে জমে আছে। কিন্তু সবাই মনের ব্যথা লুকিয়ে রেখে হাসছে কথা বলছে। নিজের কাজে ছুটছে।

বাইরে এলাম। হাওড়ার পুলের ওপরে নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোত। শুধু শব্দের সমুদ্র নয়, মানুষের সমুদ্রও। দূরে ওপারে বিপুল জনসমুদ্রের ছায়াময় কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল,—ওটা ধোঁয়া নয়, কুয়াশা নয়, অসংখ্য—অসংখ্য মানুষের হাজারো ব্যর্থতা আর বেদনার দীর্ঘশ্বাসই ভারী ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩'০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১'০০

(প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে)

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বঙ্গ দর্শন

বেলুড় মঠ

অনেক আন্দোলন আর আত্ম-ত্যাগের পর ঐতিহ্যমণ্ডিত মানভূম পুরুলিয়ার শাঁসটুকু বাদ দিয়ে বাকীটুকু এলো পশ্চিমবঙ্গে, বাংলা দেশ হারানো জমি ফিরে পেয়ে আনন্দিত হলো বটে, কিন্তু আসল সম্পদ রয়ে গেল বিহারে।

নূতন আসা অংশটুকু নিয়ে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা গঠিত। আয়তন ২৪১৫ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার। মানভূম পুরুলিয়ার ইতিহাসখ্যাত রাঢ় আর গৌড়ের অস্তিত্ব ছিল। কর্ণসুবর্ণের সদর দপ্তর আর শশাঙ্কের রাজধানীও ছিল এখানে। বীরভোগ্যা মানভূমের কাছে পাঠান ও মোগলকে বার বার হার মানতে হয়েছিল আর এই মানভূমকে পরাভূত করতে ইংরেজ-দেরও শতাব্দীকাল ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চালাতে হয়েছিল।

পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় সব চাইতে বেশি কৃষি-জীবী মাহাতো সম্প্রদায়। কুইরি নামে আর এক শ্রেণীর কৃষকও আছেন আর আছে কিছু আদিবাসী ভূমিজ মুণ্ডা, খেরিয়া ইত্যাদি। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান।

পুরুলিয়া জেলার শতকরা ৪০ জন লোকই এক সময় বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকতো। গালা, ছুরি, কাঁচি, তসর, রেশম, সূতিবস্ত্র, ঝুড়ি তৈরী, মাটির কাজ, খেলনা, বিড়ি তৈরী প্রভৃতিতে প্রায় ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হ'ত। এই শিল্পগুলির মধ্যে তসরশিল্প আর বিড়ি তৈরী ছাড়া অন্যান্য শিল্পের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে।

লাক্ষা চাষের জন্য পুরুলিয়া ছিল বিখ্যাত। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর দশ লক্ষ মণ লাক্ষা বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করে। এই দশ লক্ষের মধ্যে পুরুলিয়া জেলাই বছরে দু'লক্ষ পাঁচ হাজার মণ লাক্ষা যোগান দিত। বাজারে বিদেশী কৃত্রিম জিনিস এবং অন্য দু'একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে এই শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সারা জেলার চাষীর অবস্থা শোচনীয়—পুরুলিয়া জেলায় খাদ্যাভাব প্রতি বৎসরই ঘটে। উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পের অভাবে জনসাধারণের বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত কম। তাই ভগবানের দয়া কামনা করে বসে থাকে পুরুলিয়ার চাষী। তাই একমাত্র সেচ ব্যবস্থাই পুরুলিয়ার চাষীকে বাঁচাতে পারে কিন্তু গত কয় বৎসরে সরকারী প্রচেষ্টায় সেচের উন্নতি হয়েছে নামমাত্র।

পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সমষ্টি উন্নয়ন এবং কয়েকটি বড় রাস্তা হয়েছে, কিন্তু জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে খুবই সামান্য।

এই জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নূতন করে তথ্যসংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জলাভাবের এই জেলাটিতে শিল্পনগরী গড়ে তোলা, খনিজসম্পদের যে সম্ভাবনা তাকে কাজে লাগানো, আজ অপরিহার্য। তাই একদিকে যেমন সরকারী বিশেষজ্ঞ অপর দিকে তেমনি জেলার অভিজ্ঞ বে-সরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে নূতন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুর্শিদাবাদ ঃ

পিতা বনাম পুত্র। পিতা জিয়া-গঞ্জ-আজিমগঞ্জের পৌরপ্রধান। পৌর সভা পরিচালনায় করদাতাদের স্বার্থ-বিরোধী এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন, এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের অভিযোগ উঠল। পিতাকে নির্বাচনের সময় টিকিট দিয়েছিল ইউ, সি, সি দল। তাঁরাও পৌর

লাক্ষা সংগ্রহ করছে পুরুলিয়ার চাষী

প্রধানকে কোণঠাসা করার পরামর্শ দিলেন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিচার বিশ্লেষণ করে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে স্বাক্ষর দিলেন স্বয়ং পুত্র। তবে পিতাঠাকুর পদত্যাগ করেছেন কি না সেটা জানা যায় নি।

হুগলী :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ভূমি কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যাপীঠ ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন কবি-সাহিত্যিক ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত। সম্মেলনে মূল আলোচনা ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবন ও আদর্শ।' আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, স্বামী গদাধরানন্দ প্রমুখ বক্তাগণ।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দু'শো প্রতিনিধি যোগদান করেন। স্বাগত জানান বিদ্যাপীঠের পক্ষে অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

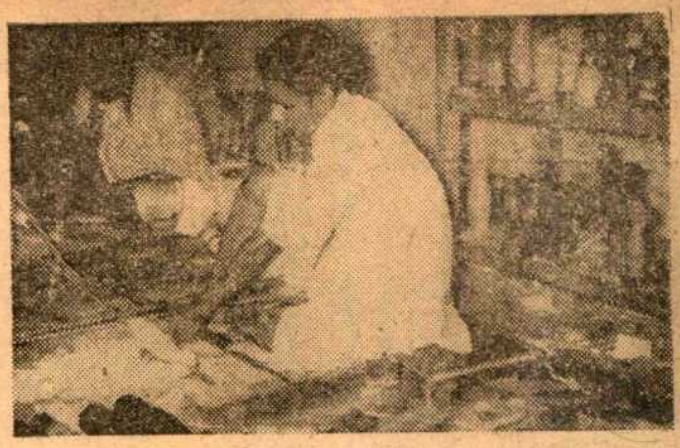

রঙ্গীন লাক্ষা দিয়ে কাঠের জিনিষ তৈরী করা হচ্ছে

বীরভূম :

শিক্ষা প্রসারের আগ্রহ আজ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে। লাভপুরের একজন পনেরো টাকা বেতনের কর্মী শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। তিনি ভালকুটী গ্রামে জুনিয়ার স্কুলের বাড়ি তৈরীর জন্যে এক একর তিরাশি শতক জমি দান করলেন। এতে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে।

নদীয়া :

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য পরিস্থিতি চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। চালের দাম প্রতি কে, জি ৯৬ নয়া পয়সা। তার সঙ্গে মাছ, তেল, ডাল, তরিতরকারীও আগুন। কৃষিপ্রধান অঞ্চলের লোকের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রেশনের দোকানে আতপ চাল —তাও দুর্গন্ধ, পোকায় ভর্তি।

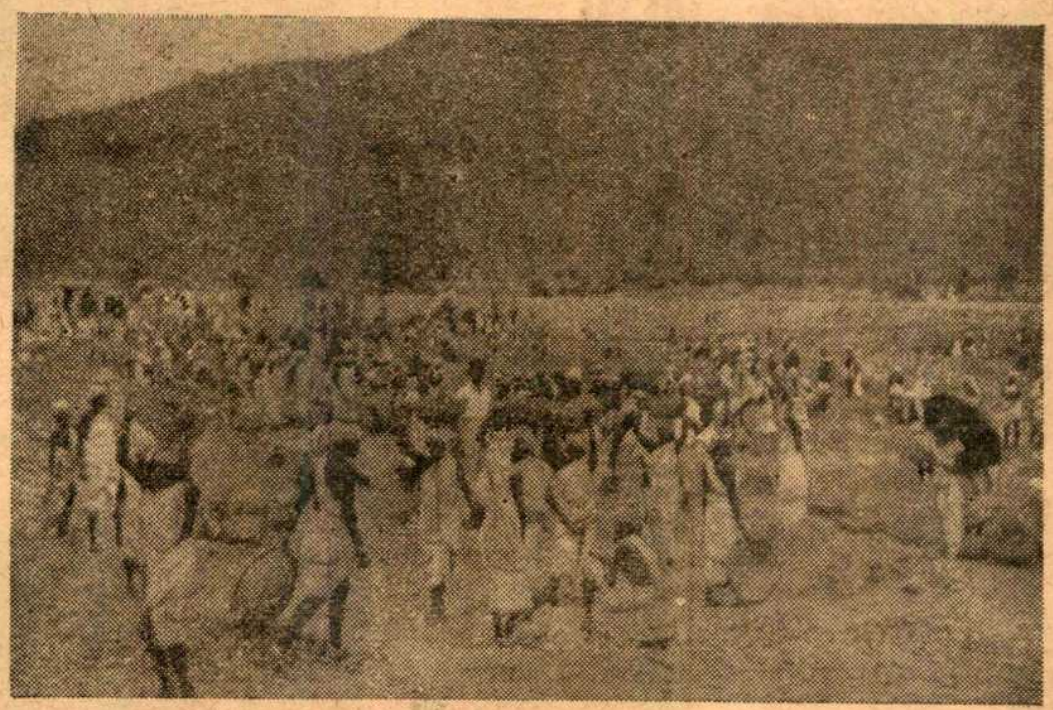

পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে টেষ্ট রিলিফ

প্রতি কে, জি-র দাম ষাট নয়া পয়সা। মেড়ে পরিষ্কার করার পর দাঁড়ায় সাত শো গ্রাম। বয়স্কের যা পরিমাণ, তাতে সপ্তাহের চারদিনও চলে না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র

অধিকাংশ লোক বেঁচে থাকার আশায় ছোলার ছাতু, শাকপাতা, পেঁপে, কচুসেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

স্থানীয় এম-এল-এ, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র একটা বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করে টেষ্ট রিলিফের দাবী জানিয়েছেন।

বাঁকুড়া :

কবি চণ্ডীদাসের আরাধ্য দেবতা সামন্তভূমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীবাশুলী দেবীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে চব্বিশ প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয় এবং তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। অন্যান্য বছরের মত এবারও চণ্ডীদাস স্মৃতিসঙ্ঘ কবির সম্পর্কে একটা মনোজ্ঞ আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

২৪ পরগণা :

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল গড়ে তুলছেন, ছাত্র যোগাড় করছেন, কিন্তু স্কুল বোর্ডের নিষ্ক্রিয়তায় শিক্ষা ব্যবস্থা এগোতে পারছে না। গ্রামবাসীরা চ্যাটার্জীপাড়া, কুমড়াপাড়া, ডাক্তারের ঘেরী, পাঁচ পুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের খরচে স্কুল বাড়ী তৈরী করেছেন, আসবাবপত্র তৈরী করেছেন, কিন্তু স্কুল বোর্ড শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নির্বিকার। এক একটা স্কুলে গড়ে ছাত্রসংখ্যাও দাঁড়িয়েছে প্রায় আশির ওপর।

জলপাইগুড়ি :

উত্তরবঙ্গে বরাবরই কয়েকটা মৌলিক সমস্যা আছে। এই অঞ্চলের জনসাধারণকে সব সময়েই কলকাতার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়। এবার হয়ত তার ব্যতিক্রম ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলপাইগুড়িকে ডিভিসন ঘোষণা করেছেন। এবার থেকে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীরা নানাদিক থেকে সুবিধা ভোগ করবেন। ইতিমধ্যেই জনসাধারণ সরকারী অফিস-কাছারী করার ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত করছেন।

দার্জিলিং :

জেলা পর্যটকদের জন্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পং এ দুটো আতিথিশালা স্থাপন করা হবে। জেলাধিপতি শ্রী বি, সি, মুখার্জি বলেছেন, জরুরী অবস্থার দরুণ যদিও বিদেশী পর্যটকদের সম্পর্কে কতকগুলো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়, তবুও তাঁদের নামে যথাবিহিত পারমিট বার করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত এবং সহজ করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হাওড়া :

পশ্চিম বাংলার পাইকারী বাজার হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর চড়াঘাটে চালের পাইকারী দর উঠেছে ৩৫৲ টাকা মণ। খুচরো দর তো আরও বেশী। মোটা চালের কিলো ৮৮ নয়া পয়সার ওপর।

চালের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আটার দরও বাড়ছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে। আটা কিলো প্রতি শহরে ৪৪ আর পল্লীতে ৪৭ নয়া পয়সা। পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রা চরম দুর্বিষহ।

মেদিনীপুর :

সমস্ত জেলা জুড়ে খাদ্যাভাব চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই জেলাতেও মণ প্রতি ৩৬৲ টাকার নীচে কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

রেশনের দোকানে যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে তা খাদ্যের তালিকা বহির্ভূত। পচা-দুর্গন্ধে ভরা। বাইরে দিব্বি বেশী দামে চাল বিক্রী হচ্ছে। সরকার কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন না।

চাল ও অন্যান্য জিনিষের দাম বাড়ার ফলে ভিখারীর সংখ্যাই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বহু লোক খাদ্যের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলেও শোনা গেছে।

বনের (পশ্চিম জার্মানী) বাজার

ইউরোপ ঃ

পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র আবার একটা বামপন্থী আবহাওয়ার স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে এবং বামপন্থী দলগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষণও আজ আর অস্পষ্ট নেই। ইতালীয়দের মতে এটা বামপন্থীর দ্বারমুক্তির ইঙ্গিত।

সমাজতন্ত্রীরা ইংলণ্ডে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় ইউরোপের চিন্তা ও কামনা তখন খৃষ্টাভিমুখী। বস্তুত পশ্চিম ইউরোপের বিধ্বস্ত রাজ্য সমষ্টিতে, বিশেষভাবে ফরাসী, জার্মানী ও ইটালীতে, যুদ্ধ সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রীশ্চিয়ান ডিমক্র্যাটিক পার্টিগুলির জন্মলগ্ন আত্মপ্রকাশ করে বসে।

ইংলণ্ডে অবশ্য সমাজতান্ত্রিক পার্টিই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কারণ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মত ইংলণ্ডের ক্ষয়-ক্ষতি অত ভয়াবহ রকমের হয়নি। যদিও তার অনেকগুলি শহর প্রচণ্ড আক্রমণে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। ইংলণ্ডের এই ক্ষত শুষ্ক হ'তে দেরী হয়নি বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি সেখানে চিরতরে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শ্রমজীবী শক্তি সংহত হ'য়ে আজ সেখানে রক্ষণশীলদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত। ১৯৫১ সনে সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আজ পর্যন্ত যদিও বিরোধী দলের ভূমিকায় দণ্ডায়মান রয়েছে তবু সেখানে একটা আপাতদৃষ্ট পরিবর্তনের লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, আগামী বৎসর সাধারণ নির্বাচনের পর রক্ষণশীল দলের অপসারণ অবধারিত।

ডঃ এডেনয়ারের ক্রিশ্চিয়ান ডিমক্র্যাটিক পার্টি পশ্চিম জার্মান পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে সোসালিষ্ট পার্টির সমর্থনে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই দুই পার্টির পক্ষে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ১৯৬৫ সনে আগামী সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে জার্মান জনসাধারণ মনে করছে যে বামপন্থী দলগুলির জয় প্রায় অনিবার্য।

আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইটালীর পার্লামেণ্টের নির্বাচন আরম্ভ হবে এবং ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সমাদৃত সংবাদে ওখানকার বামপন্থী দলগুলির শুভ সূত্রপাতের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হচ্ছে বটে, তবে নির্বাচনের পূর্বে এই সূত্রপাতের পরিধি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। গত বছরে প্রধানমন্ত্রী ফ্যান ফ্যানির ক্রিশ্চিয়ান ডিমক্র্যাটিক পার্টি এবং পিয়েট্রো ন্যানির সোসালিষ্ট পার্টি কোয়ালিশনের অগ্রগতি এখনও ব্যাহত হয় নি এবং এদের মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষমতা দখল করার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল

শুধু মাত্র ফ্রান্স। স্পেন এবং লিসবনের রক্ষণশীল ঘাটিগুলি এখনও দৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান রয়েছে। অবশ্য মাদ্রিদ ও লিসবনে পরিপূর্ণ একনায়কত্ব বিদ্যমান এবং সেখানে স্বাধীন নির্বাচন কিংবা অন্য কোন প্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। বামপন্থীদের সহযোগে কোন আন্দোলন আরম্ভ

ডঃ কে, এডেনয়ার

হলেই ফ্রাঙ্কোর সেনে আর সালাজারের পর্তুগালে অ ন্দোলন-কারীদের কম্যুনিষ্ট অ ্যায় ভূষিত করে বন্দুকের মুখে ফেলে দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে অবশ্য অতটা নির্মমতা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। স্ গলের ফ্রান্সের স্মৃতিতে আবার জেগে উঠেছে তার অতীতের ঐতিহাসিক শক্তি ও মহিমার ছবি, গর্বদীপ্ত ভবিষ্যতের একটা শক্তি-সাধ্য আকাঙ্ক্ষা। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্ গলের প্রকাশ্য অভিযানের অন্তরে নিহিত রয়েছে এরই এক ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। কম্যুনিষ্টও সোসালিষ্ট দলের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও ফ্রান্সে অদূর ভবিষ্যতে স্ গলকে শক্তিহীন করা যে সম্ভব হবে না সে কথা আজ সন্দেহের অতীত।

সম্প্রতি ইউরোপে দক্ষিণ বামপন্থীদের এক কৌতূহলোদ্দীপক মিলনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ইটালীর নূনী, পশ্চিম জার্মানীর মেয়র উইলি ব্রাণ্ট্ এবং ইংলণ্ডের হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের বামপন্থী দল ও সংস্থাগুলির সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ফ্রান্সের চাইতে আজ অধিকতর প্রীতিসমৃদ্ধ। ১৯৬৩ সনের ১৪ই জানুয়ারী তাঁর বিখ্যাত সংবাদ সম্মেলনের পর থেকে স্ গল প্রকাশ্যেই প্রচার করে চলেছেন যে, আমেরিকাকে বাদ দিয়ে তৃতীয় আণবিক শক্তি হিসাবে ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী। তৃতীয় শক্তির অর্থ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পার্শ্বে আণবিক শক্তি হিসাবে ফ্রান্সের স্বীকৃতি। এটাও লক্ষ্যণীয় যে পশ্চিম ইউরোপের দক্ষিণ-পন্থী দলগুলির মাঝে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এই প্রচারণাই ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, পশ্চিম ইউরোপের মিত্রদের অজ্ঞাতে কেনেডি ও ক্রুশ্চভের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।

সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে রাশিয়ার কবলের হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ফ্রান্সের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হওয়া। কিন্তু ১৯১০ সনের পূর্বে ফ্রান্সের পক্ষে আণবিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব এবং হলেও আমেরিকার তুলনায় তা হবে অত্যন্ত নগণ্য, শতকরা দু'ভাগের বেশী নয়।

সুতরাং ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আর একটি নতুন রাজনৈতিক গুণনীয়কের আবির্ভাব আমেরিকা ও স্ গলকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন তুলেছে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষনীয় নয়। এতে ন্যাটো গোষ্ঠীতে অনিবার্যরূপেই একটা ফাটল ধরেছে এবং যদিও কেনেডি-ক্রুশ্চভ গোপন চুক্তির কথা প্রকাশ্যে কেউ বিশ্বাস করতে রাজী নয়, তথাপি প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আগামী জুন মাসে বার্লিন পরিদর্শনের জন্য তৈরী হচ্ছেন। মেয়র উইলি ব্রাণ্ট্ অবশ্য বলেছেন যে, এই পরি-দর্শনের অন্য কারণ রয়েছে, গোপন চুক্তির কথা প্রচারের প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে নয়।

পশ্চিম জার্মানীতে ডাঃ এরহার্ড ইতিমধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এবং আমেরিকার তিনি পক্ষপাতী। স্ গলের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে তিনি বিপজ্জনক মনে করেন এবং তাঁর মতে স্ গলের প্রচেষ্টা পশ্চিম ইউরোপকে দুর্বল করতে বাধ্য। বামপন্থী শক্তিগুলির

ডঃ এরহার্ড

আবির্ভাব পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার হাতে শক্তিশালী করে তুলবে এ সত্য আজ যেমন ঐতিহাসিক তেমনি কৌতুকাবহ।

বৃটেন ঃ

বৃটেনে আণবিক 'বোমা-বহন' এর জন্য কিছু কাল ধরে একটা আন্দোলন চলেছে। অল্প কিছু দিন আগে আন্দোলনকারীদের এক

জমায়েতে একটি বিজ্ঞপ্তি বিলি করে দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তিতে বৃটেনে আণবিক আক্রমণ হলে যে গুপ্ত স্থান থেকে দেশের শাসনভার পরিচালনা করা হবে সে স্থানটি প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থার এ গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় বৃটেনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। এ গোপন সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় ম্যাকমিলান সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা এ তথ্য প্রকাশের জন্য দায়ী তাঁদেরও সমালোচনা কম হয় নাই। ইকনমিষ্ট পত্রিকার প্রকাশকারীদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে তারা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে ও তারা আসলে রাশিয়ার 'গুপ্তচরবৃত্তি' করেছে। আন্দোলনকারীদের এক-জন নেতা শ্রীক্যামেরনও এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন ও এর জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে দায়ী করেছেন বৃটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন এটা রাষ্ট্রদ্রোহীর কাজ।

অধ্যাপক এরহার্ড

বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল গত ২২শে এপ্রিল তাঁর জীবনের ৮০ বৎসর ৪ মাস ও

হ্যারল্ড উইলসন

২২ দিন পূর্ণ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও কর্মময় জীবনে তিনি অনেক বিষয়েই 'সর্বপ্রথম' হবার দাবী করতে পারেন, যেমন তাঁর মতন অল্প বয়সে আর কেউ কেবিনেট মিনিষ্টার হন নি। গত ২২শে এপ্রিল তিনি আর এক বিষয়ে প্রথম হয়েছেন—ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের থেকেও তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্যার উইনষ্টনের এককালে ধারণা ছিল তিনি অল্প বয়সে মারা যাবেন। তাঁর বাবা মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান।

নাইজেরিয়ার নাগরিক এনাহেরো তাঁর দেশ থেকে পালিয়ে বৃটেনে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ছিল। নাইজেরিয়া সরকারের অনুরোধে বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইজেরিয়া সরকারের হস্তে অর্পণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বৃটেনের জনমত এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে তাঁদের মতে বৃটেনে বিদেশীদের আশ্রয় গ্রহণের যে সুযোগ দেওয়া হয় কমনওয়েলথ নাগরিককে তা থেকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অন্যায়। বৃটিশ সরকারের পক্ষের বক্তব্য তাকে প্রত্যর্পণ না-করাটা নাইজেরিয়ার বিচার পদ্ধতির উপর সন্দেহ প্রকাশ করা হবে—সেটা অন্যায়।

ফ্রান্স :

কিন্তু ফ্রান্স এ কথা মানতে মোটেই রাজী নয়। কিছুদিন পূর্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পম্পেদো এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদানের প্রশ্নে পশ্চিম ইউরোপীয় ঐক্য ব্যাহত হতে পারে না। সাধারণ বাজার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বৃটেন ছিল না এবং তখনও ঐ সংহতিতে যখন ভাঙনের কোন প্রশ্ন ওঠে নি এখনও উঠবে না।

পম্পেদো-র মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-শেষে যে একটা নতুন মূল্যবোধের ভূমিকা তৈরী হয়েছে, তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মনে সঞ্জাত একটা অভিনব চেতনা,—'ইউরোপীয় সচেতনতা'। যুদ্ধশেষে আণবিক শক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গতির ঘূর্ণীতে মানবচেতনায় যে বিপ্লব সংসাধিত

হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন মিত্রতার সংগা আর স্থিতিশীল নেই। ন্যাটোর জেনারেল আইসেনহাওয়ারের মনোনয়নে সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়া আজ আর মৈত্রীবন্ধনের সহায়ক নয়।

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

যেমন নয় প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি হিসাবে মার্শাল ফকের নিয়োগপত্র।

গত ১৪ই জানুয়ারীর বহু বিতর্কিত-সাংবাদিক সম্মেলনের পর গত সপ্তাহে এই প্রথম জেনারেল দ্য গল পুনরায় টেলিভিশনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বৃটেনের সাধারণ বাজারে যোগদানের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্বমতের পুনরুক্তি করলেন। আমেরিকা আর কমন-ওয়েলথ্‌কে ত্যাগ না করলে ইংলণ্ডকে তিনি সাধারণ বাজারে প্রবেশ করতে দেবেন না। অর্থাৎ ইংলণ্ডকে আরো ছোট করে এনে তিনি পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

রাশিয়া ঃ

সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধার ক্রুশ্চেভের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোর জল্পনা কল্পনা চলেছে। তাঁর বিরুদ্ধে নাকি রাশিয়ায় ক্রমশঃই সমালোচনা বেড়ে চলেছে। সমালোচকদের মধ্যে আছেন রাশিয়ার সাহিত্যিকেরাও। ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে সমালোচনার যে সব বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রাশিয়া ও চীনের মতানৈক্য ও কিউবা। চীনের মতে ক্রুশ্চেভের বর্তমান মতবাদ হচ্ছে "revisionism" এবং সে পথ রাশিয়ার পরিহার করা উচিৎ। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার কোন সংশ্রব রাখা উচিৎ না এবং আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব পরিত্যাগ করা উচিৎ।

কিউবায় অনুসৃত ক্রুশ্চেভের নীতিরও প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে। তাতে নাকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কম্যুনিজম-এর পরাজয় সূচিত হয়েছে।

বৃটেনের সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে শেষ খবরে বলা হয়েছে যে, ক্রুশ্চেভ নাকি দু'বৎসরের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করবেন ও তাঁর জায়গায় কসলভ প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। ক্রুশ্চেভ কিন্তু অবসর গ্রহণের আগে তিনটি কাজ সুসম্পন্ন করে যেতে চান যথা ঃ

১। চীনের সঙ্গে একটা মীমাংসা
২। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে বার্লিন সম্বন্ধে একটি চুক্তি এবং
৩। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা।

রাশিয়ার লেনিনের জীবনীর এক নূতন সংস্করণে প্রাধান্য দিয়ে লেখা

পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে

হয়েছে যে, লেনিন বিভিন্ন মতবাদপূর্ণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বর্তমান রাশিয়াতে সে মতই প্রতিপালিত হচ্ছে।

পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ব্রুনো পন্টীকর্ভোকে আণবিক গবেষণার জন্য এ

চার্চিল

বৎসরে লেনিন পুরস্কার দেওয়া হবে ঃ ডঃ পন্টীকর্ভো গত ১৯৫০ সালে ইটালীতে অবকাশ যাপনের সময় নিখোঁজ হন ও ১৯৫২ সালে সোভিয়েট নাগরিক অধিকার লাভ করেন। এর পূর্বে তিনি বৃটিশ নাগরিক ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র ঃ

প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, কিউবা আক্রমণ করা বা কিউবাকে অবরোধ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। তিনি আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন সময়েই নির্বাচিতদের এরকম কোন অঙ্গীকার দেওয়া হয় নাই যে কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোন অভিযান চালাবে। কিউবার নির্বাসিতদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যতই সহানুভূতি থাক না কেন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য ভুলতে পারে না। তার এ উক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মতবাদ সম্পন্ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহাবস্থানে (Co-existence) যে বিশ্বাসী এটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীচার্লস ষ্টেলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে

সোভিয়েট রাশিয়াকে তাঁদের এক সামরিক প্রতিনিধিদলকে যুক্তরাষ্ট্রে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেরকম একটা প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে এলে তাদের সঙ্গে সামরিক তথ্য ও সংবাদের অনেক আদান প্রদান হতে পারে। এরকম আদান প্রদানে অতিরিক্ত সংবাদ প্রচার ও যন্ত্রের বিভীষিকা অনেকাংশে তিরোহিত হবে এবং তাতে এ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কে উন্নতি সাধিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের এটর্না জেনারেল মিঃ রবার্ট কেনেডী বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বৈষম্য আর ১০ বৎসরের মধ্যে তিরোহিত হবে। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে দেশে ও বিদেশে আমেরিকাকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। সুতরাং বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁরা এ বৈষম্যের অবসান ঘটাবেন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ৮টি রাষ্ট্রের মিলিত পরিষদের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকার

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জই পম্পেদো

সাম্যবাদের (Communism) অনুপ্রবেশ ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং কিউবার ভিতর দিয়ে এ অনুপ্রবেশ বর্ধিত হচ্ছে। এ অনুপ্রবেশ আমেরিকায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক। এর প্রতিবেধক হিসাবে পরিষদ প্রস্তাব করেছেন যে, আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা উচিৎ ও

রবার্ট কেনেডি

পরস্পরের মধ্যে সাম্যবাদীদের অনুপ্রবেশ, কার্যকলাপ ও তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ আদান প্রদান করা উচিৎ।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এভারেল হ্যারিমান ওয়াশিংটনে বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করলে ভারতবর্ষকে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, ভারতীয় নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে বলেছেন যে বাইরের কোন শক্তিকে তাঁরা দেশ দখল করতে দেবেন না এবং নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবনযাত্রা প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা বদ্ধ পরিকর।

জন জেমস্ অডুবনের প্রতিকৃতিসহ আমেরিকা সম্প্রতি একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বন্য জীবনের গবেষক হিসেবে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের বুকে ছোট্ট দ্বীপ হাইতি। সেখানে আও কেইস্ শহরে ১৭৮৫ সনে অডুবনের জন্ম। ফরাসী বংশধর বলে ফরাসী বিপ্লবের বৎসর ১৭৮৯ সনে তাঁকে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হ'ল তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য। নৌবহরে জীবনারম্ভ করার মানসে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল নৌ-বিদ্যালয়ে। কিন্তু তাঁর মন সব সময় বন-জঙ্গলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত, নৌ-বিদ্যার দিকে মনোযোগ একেবারেই ছিল না। প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডাঃ চার্লস্ ষ্ণ অরবিগনী ছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রতিবেশী। তাঁর আঁকা ছবি দেখে দেখে অডুবনের মনে জেগে উঠেছিল এক পক্ষীসাম্রাজ্যের রেখা-চিত্র।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরে এলেন যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভিনিয়ায়, তাঁর পিতার খামারে। সেখানে খামারের কাজ না দেখে পাখীর সন্ধানে তিনি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এই সময়ে লুসী বেকওয়েল নাম্নী এক আনন্দোজ্জ্বলা মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন। পরবর্তী সময়ে সন্তান-সন্ততি ও গৃহ-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তিনি স্বামীকে সারা আমেরিকায় পরিভ্রমণ করে' পক্ষীজীবনের খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করার সুযোগ দান করেছিলেন।

আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এভারেল হ্যারিম্যান

বহু পরিশ্রমের পর তিনি আমেরিকার পক্ষীজীবনের ইতিহাস ও চিত্রের নক্সা রচনা করে ১৮২৬ সালে অডুবন ইংলণ্ডে এসে 'আমেরিকার

পক্ষা' নামক তাঁর বিস্ময়কর গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ধারাবাহিক ভাবে এই পুস্তক ১৮২৭ সন থেকে ১৮৩৮ সনের মধ্যে ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে আমেরিকায় যে ন্যাশনাল আডুবন সোসাইটী রয়েছে তার সভ্য সংখ্যা ৯০ লক্ষ।

ঘানা ঃ

গত মার্চ মাসে ঘানার স্বাধীনতার ছয় বৎসর পূর্ণ হোল এ প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় ঘানার প্রেসিডেন্ট এনক্রুমা

ঘানার প্রেসিডেন্ট এন-ক্রুমা

(N-Krumah) আণবিক বোমা বর্জনের জন্য পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং পূর্ব বা পাশ্চাত্য কোন দেশেরই পক্ষপাতী নন। তিনি বিশ্বাস করেন আফ্রিকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে। তিনি বিশ্বাস করেন আফ্রিকার নির্যাতিত দেশগুলির মুক্তিতে এবং সে জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

গত ২।৩ বৎসরে ঘানায় এত ঘন ঘন মন্ত্রী রদবদল হয়েছে ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়েছে যে, ঘানার সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি তা বুঝা মুস্কিল হয়ে পড়েছে। অনেকের ধারণা যে নিজেকে গদীতে বহাল রাখবার জন্য প্রেসিডেন্ট এন-ক্রুমা কেবল মন্ত্রী পরিষদে ভাঙ্গাগড়া করছেন।

দেশের সমৃদ্ধির জন্য মূলধন প্রয়োজন এবং বিদেশ থেকে মূলধন পাবার জন্য প্রেসিডেন্ট এন-ক্রুমা সাময়িক ভাবে পুঁজিবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন—প্রমাণ বামপন্থী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করান, ব্যাঙ্ক অব ঘানার কর্তৃত্ব দক্ষিণপন্থী অর্থ দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা।

প্রেসিডেন্ট এন-ক্রুমার উপর গত এক বছরের মধ্যে তিনবার বোমা দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে। প্রথম-বারে তিনি স্বল্প আহত হয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি আর প্রকাশ্যে বেরোন না বা সভা-সমিতিতে আসেন না। এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়েছে অন্যান্যদের ভেতরে এন্‌ক্রুমার পুরোন সতীর্থ পুরোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাকো আদগেই ও পুরোন প্রচারমন্ত্রী কোমিঃজ্যাবে। উভয়কেই আজ আটক করে রাখা হয়েছে। একজন নাইজেরিয়ান আমাটুলা ও আরও চারজনের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত থাকার জন্য বিচার চলছিল কিছুদিন ধরে। গত সপ্তাহে বিচার শেষ হয়েছে এবং পাঁচজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

জর্দান ঃ

আম্মান বেতারের এক ঘোষণায় জানা যায় যে, রাজা হোসেন এক রাজকীয় ঘোষণায় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়েছেন। মন্ত্রিসভাও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে-ছেন রাজার শ্বশুরতাত শেরিফ নাসের। কায়রোর বেতারের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে জনগণের আরব ফেডারে-শনের সঙ্গে সংযুক্তি ও রাজকীয় শাসনের অবসানের দাবীটাই এ অশান্তির কারণ।

জর্দানের রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আরব জাগরণের ঢেউ জর্দানেও এসে পৌঁচেছে। রাজা হোসেন ও তার সাঁজোয়া বাহিনী এখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ইসরাইল, রাজা হোসেন, দেশের আভ্যন্তরীণ জাগরণ ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের উপর। রাজা হোসেনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য ইসরাইল তার শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকলে এ আন্দোলন (সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ) রাজা হোসেন ও তাঁর প্রজা-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত রাজা হোসেনকে জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে।

ইস্রায়েল ঃ

ইস্রায়েলের প্রেসিডেন্ট মিঃ বেন ভি জেরুসালেমস্থিত সরকারী ভবনে ২৩শে এপ্রিল ক্যান্সার রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার

ইস্রায়েলের প্রেসিডেন্ট
পরলোকগত মিঃ বেন-ভি

বয়স ছিল ৭৮ মিঃ বেন-ভি ইস্রায়েলের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

পাকিস্তান ঃ

গত ২২শে এপ্রিল থেকে করাচীতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্দো-পাক পঞ্চম চক্রর বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠক শুরু হবার ঠিক পূর্বে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, যদি এ বৈঠকে উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি ঘটে তাহলে এর পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা শুরু হতে পারে। কিন্তু এ চক্করে দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পরও সমস্যা যে তিমিরে সে তিমিরেই। কাশ্মীর সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে যে ব্যবধান তা হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণই নাই।

প্রকাশ পাকিস্তান গণভোটের দাবী ছেড়ে দিয়ে একটা মীমাংসার মূল্যস্বরূপ দেড়খানা জেলা বাদ দিয়ে গোটা কাশ্মীর রাজ্য দাবী করেছেন। প্রকাশ ভারত কাশ্মীরের বর্তমান যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার কিছু রদ-বদল করতে প্রস্তুত থাকলেও কাশ্মীর উপত্যকার কোন অংশ ছাড়তে রাজী নয়।

পাকিস্তানের মতিগতি থেকে মনে হচ্ছে পাকিস্তান ৩০শে এপ্রিল সেন্টোর আগামী বৈঠকের প্রতীক্ষায় বসে আছে—শ্রীডীন রাস্ক ও ডানকান সাণ্ড্‌স-এর করাচী আসার প্রতীক্ষায়—এ দুই পাশ্চাত্য নেতাকে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করাতে।

পাকিস্তান ন্যাশন্যাল এ্যাসেমব্লির ঢাকা অধিবেশন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর হুকুমে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত নির্দেশ সভাকে জানাবার সময় ডেপুটী-স্পীকার বলেন যে, একটু আগেও এ বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। পাকিস্তানে ব্যাপক অসন্তোষ ও গণ আন্দোলনের বিস্তৃতিই নাকি পাকিস্তান লোকসভা মুলতুবীর অন্যতম কারণ।

আফগানিস্থান :

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় সারা পৃথিবীর "Winds of charge" মধ্য-প্রাচ্যের আফগানিস্থানেও পৌঁচেছে। রাজা জাহির সার আদেশে ডাঃ মহম্মদ ইউসুফ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, রাজা জাহির তাঁকে গণতান্ত্রিক এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবার নির্দেশ দিয়েছেন—ক্রমশ প্রজাদের হাতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনভার দেবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এর পূর্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করা সম্ভব হয় নাই, দেশের অনুন্নত অবস্থা ও শিক্ষার মান নীচু থাকার জন্য। তাঁর সরকারের প্রধান চেষ্টা হবে শিক্ষার প্রসার।

তিনি তার প্রথম বেতার ভাষণে পাখতুনদের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার-এর দাবী করেন। তিনি ভারত সম্পর্কে বলেন যে, 'ভারত ও আফগানিস্থানের বরাবরই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অবস্থিত আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতির আগামী আফগানিস্থান সফরে এ বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে বলে তিনি আশা করেন।'

ইন্দোনেশিয়া :

চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ শাও চি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ শেষ করে তিনি ব্রহ্ম দেশে গেছেন।

অনেকের মতে তাঁর উদ্দেশ্য দুইটি—

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব বিস্তার করা

ও

২। ভারতের সঙ্গে বিরোধে চীনকে নির্দোষ প্রমাণ করা।

ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের পর প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণোও তাঁর যুক্ত বিবৃতিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সফল হতে শুরু করেছে। যুক্তইস্তাহারে ইন্দোনেশিয়া ও চীন বলেছে যে, কলম্বো প্রস্তাবের ফলে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সুযোগ নিয়ে চীন ও ভারতের মধ্যে সরাসরি

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট
ডঃ সোয়েকর্ণো

আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধে মীমাংসা করা উচিৎ। তাঁরা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে বান্দুং সম্মেলনের নীতি ও সহাবস্থান সংক্রান্ত পঞ্চশীলের ভিত্তিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিৎ।

এ ইস্তাহার সম্বন্ধে ভারতের বক্তব্য

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ডঃ সোয়েবান্দ্রিও

হচ্ছে যে, মুখে 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'যুক্তি-সঙ্গত' অথবা বান্দুং ও পঞ্চশীলের উল্লেখ করে কাজে তার বিপরীতটা অনুসরণ করলে বিশ্বশান্তি বা এশিয়ার সংহতি হতে পারে না। সহাবস্থান সংক্রান্ত পঞ্চশীলের নীতি যদি না কথায় ও কাজে অনুসৃত হয় তাহলে বান্দুং সম্মেলনের উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে দাঁড়াবে।

এ ইস্তাহার থেকে আর একটা বিষয় প্রকাশ হচ্ছে—যথা কলম্বো প্রস্তাবের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ইন্দোনেশিয়া এখন চীনের কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানটা শান্তির অন্তরায় বলে মনে করে না।

লাওস :

জার প্রান্তরে আপাতত লড়াই বন্ধ করতে লাওসের নিরপেক্ষতাবাদী এবং বামপন্থীরা রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু লাওসের সঙ্কটের অবসান হয়েছে বলে মনে হয় না। সংবাদে প্রকাশ, জার প্রান্তরে কং লীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পর্যবেক্ষকদের রাখার ব্যাপারে প্রিন্স সৌভান্না ফোমা, প্রিন্স সুফান্থ তং এবং

লাওসের প্রধানমন্ত্রী সোভান্না ফৌমা সাংবাদিকদের নিকট জার সমতলভূমির পরিস্থিতি বর্ণনা করছেন।

জেনারেল নোসাভান একমত হয়েছেন এবং সাময়িকভাবে প্যাথেট লাও বাহিনী ও কং লীর সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা হয়েছে। লাওসের প্রধানমন্ত্রী সোভান্না ফৌমা জার সমতলভূমি থেকে ফিরে বলেছেন যে, বামপন্থী ও নিরপেক্ষবাদীরা আরো আলোচনা সাপেক্ষে যুদ্ধ-বিরতি ব্যবস্থা বজায় রাখতে রাজী হয়েছেন।

পৃথিবীর চোখে ভারত :

গত সপ্তাহে বৃটেনের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় চায়নার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারার কারণ নির্ণয় করবার জন্য দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন যে কমিটী গঠন করেছেন তাকে "Drama without a hero" বলে অভিহিত করেছে। তার কারণ হচ্ছে যদিও কমিটী প্রতিরোধ ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার কারণ নির্ণয়ের জন্য গঠিত হয়েছে তবুও তাঁরা নাকি এ পরাজয়ের দায়িত্ব অথবা জংগী তথ্য সরবরাহের অসামর্থ্য, এ দু'টো বিষয়ের কোনটার সম্বন্ধেই কোন অনুসন্ধান করবেন না।

অন্টারিওর "The Windsor 'star' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন যে, শীত শেষ হয়ে বসন্ত আসবার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই ভারত পুনরাক্রমণের জন্য চীনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে, তবে পাশ্চাত্য দেশ ও সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্যে পরিপুষ্ট ভারত গত বছরের থেকে এ বছর অনেকাংশে অধিক তৈরী রয়েছে। এশিয়ার এ দুই মহান্ দেশ আর্থিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে; ভারত বেছেচে গণতন্ত্রের পথ, চায়না বেছেচে Dictatorship.

ভারত এখনও আকাঙ্খিত স্থানের অনেক পশ্চাদ্‌বর্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সাফল্য লক্ষ্যণীয় এবং ভারতকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবার জন্যই চায়নার এই সশস্ত্র আক্রমণ। চায়নার উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়ের জোরে সাম্যবাদ প্রচার করা, রাশিয়া যা চেষ্টা করছে শান্তিপূর্ণ ভাবে আর্থিক আধিপত্য বিস্তার করে

...চীনের আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দেশের সাম্যবাদের অসাফল্য ঢাকা এবং দেশের লোকের মন অন্য দিকে পরিচালিত করা।...

...ভারত এ সংগ্রামে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ থেকে সাহায্য পাচ্ছে কারণ তাদের এ সংগ্রাম গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার সংগ্রাম।

লণ্ডন টাইমস পত্রিকা ১৭ই এপ্রিল এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ভারতে রাশিয়ার Mig fighters তৈরী দুই বছরের মধ্যে সুরু হবে। দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ জংগী বিমান প্রস্তুত করার আশ্বাসটা অতিরিক্ত আশাবাদী বলে টাইমস অভিহিত করেছে।

...যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সমর-বিশেষজ্ঞরা ভারতের সামরিক প্রয়োজন এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োজন এ দুটোর মধ্যে বিশেষ করে তারতম্য করছেন। যতদূর বুঝা যাচ্ছে যে চীনের আবার নতুন করে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রকট না হলে এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হ'লে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য ঢালাও সাহায্য করবেন না। যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই ভারতকে চীনের সমান শক্তিশালী করবার মত সমরাস্ত্র সাহায্য দিতে প্রস্তুত নয়। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ততখানিই সাহায্য করতে প্রস্তুত যাতে চীন আরেকবার আক্রমণ করলে চীনকে উপযুক্ত মত শাস্তি দিতে পারে।

বাল্টীমোর সান এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে ভারত ১৯৬৫ সালের মধ্যে 'air borne missiles', আকাশবাহী নিক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হবে।

চীনে, এ চুক্তির বিশেষ সমালোচনা হয়েছে।

ভারতীয় লেখক

বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যই ভারতীয় সাহিত্য। কেন না দৈহিক ধর্মে পৃথক হলেও তারা প্রাণ-ধর্মে এক। ঐ সব সাহিত্যের ভাষাজনিত দৌর্বল্য বা শক্তির জন্যে অমিলতা তুচ্ছ, তাদের মানসিক মিলনটাই সকলের ঊর্ধ্বে। সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, সর্বভারতীয় মনে প্রতিষ্ঠিত; হয় তো তার সূক্ষ্ম কারণও আছে! কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সংস্কৃত রচনা না করেও বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বজনীনতার কথা না হয় এক্ষেত্রে উল্লেখ নাই করলাম। ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুশীলন ও ভারত আত্মার উপলব্ধি যাঁরা করেছেন তাঁদের সর্বজন গ্রাহ্য যদি ভারতীয় সাহিত্য বলা হয়, তাতে

রবীন্দ্রনাথ

অন্যায় হয় না। বিশেষত বর্তমানকালে সংহতি সাধনের জন্য ভারতীয় লেখকদের মুখ চেয়ে অনেকেই হয় তো অপেক্ষা করছেন। অবশ্য এই সব ভারতীয় লেখক আপন আঞ্চলিক ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। তবু তাঁদের কাছে অন্য ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার সীমা নেই। তাই যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার লেখকের দায়িত্বও কম নয়। তাঁর সাহিত্য যেন শুধু অঞ্চলগ্রাসী না হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাক, থাক সেই ভাষা,—কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ যে মানসিকতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সাহিত্যে তার প্রতিষ্ঠা চাই। তাহলে যে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের ভারতীয় সাহিত্য হিসেবে কাম্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

সুতরাং ভারতীয় লেখক হিসেবে গৌরব লাভ করা যতোখানি সহজ মনে হয়, আসলে তা ততোখানি নয়। নয় বলেই ভারতীয় লেখক হবার লোভেই হয় তো কারো কারো সরকারী নজরানার দিকে নজর পড়েছে। কিন্তু তাতে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সাময়িক-ভাবে জোরদার পেলেও সাহিত্যিকেরও যে নজরবন্দী ঘটতে পারে, সে কথা একবার অন্তত ভাবা দরকার। তখন ভারতীয় লেখকের রচনায় ভারতের আপামর প্রতিটি মানুষের না-বলা কথার প্রতিধ্বনি কতটুকু থাকবে, সে কথা ভাবলে শঙ্কিত হতে হয়।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার লেখকদের সম্মেলন কখনো আংশিক-ভাবে, কখনো বা পূর্ণাকারেই হচ্ছে। উদ্দেশ্য মহৎ-ই। তাঁরা একস্থলে মিলিত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান করেন। এই রকম প্রচেষ্টা সরকারীভাবেও হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য যাতে পরস্পর নিকটতর হয় সে প্রচেষ্টা এখনো চলছে। অবশ্য বাইরের মহলে এখনও অভিযোগ ওঠে যে কোনো কোনো ভাষা বিশেষ রকম প্রীতিও লাভ করে থাকে।

অবশ্য এই প্রীতিটাও যখন উদ্দেশ্যধর্মী তখন একজন পেয়েছে বলে আরেকজন মুখাপেক্ষী হয়ে

বৈশম্পায়ন

থাকবে, সেটাও মঙ্গলজনক নয়। আর এও মনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে প্রীতির নামে শোষণ চলে সেখানে বিশেষ প্রয়োজন কোনো এক সময় হয় তো বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাধু সেখানেও সাবধান হবেন।

যাই হোক, সংহতি বা পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের সম্মিলন সরকারী-ভাবে হয়েছিল বিগত বছরের প্রথম দিকে মহীশূরের কৃষ্ণরাজসাগরে। সেখানে সরকারী মুখপাত্রের বক্তব্য ছিল:

As creative writers they no doubt mould the minds of th people with their work, bu here also they are most effec tive when they are free fro external restraints. দায়িত্বশী মন্ত্রী তথা একজন বুদ্ধিজীবী পক্ষে যে কথা উচ্চারণ ক

হুমায়ুন কবীর

সহজ, দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে কথা বলা ততোখানি সহজ ও বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। তখন আসবে চাপ। প্রয়োজনের সময় চাপ যে আসে না, সে কথা কে অস্বীকার করবে? হয়তো জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তা মুখে অস্বীকার করাও যায় না। কিন্তু লেখকের দায়িত্ব ভিন্নজাতীয়। তিনি ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের মূলভাগকে দৃঢ় করে তুলবেন। বাস্তব প্রয়োজনের আগেই তিনি যদি জাতির মানস প্রস্তুত না ঘটান, তাহলে তিনি কিসের সাহিত্যিক? নচেৎ তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নন, বর্তমানের দফাদার। জেগে ওঠা মানুষকে তিনি জাগিয়ে রাখবেন। দরকার হলে চাক পিটাবেন। কিন্তু

এভাবে জাতীয় সংহতি যদি সাহিত্যিকরা বর্তমানকালে এনেছেন বলে দাবী করেন, তা'হলে তা গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। এখন সারা দেশ জেগেছে। কিন্তু কে জাগিয়েছে? মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের শরীরের জীবকোষগুলির বিভিন্নতা এমন কি অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও তারা আপন দেহের জীবনধারা প্রবাহিত রাখবার প্রয়াসে নিজের ভূমিকায় একনিষ্ঠ। দেহকে সেই ভাবে তারা রক্ষা করে। "আমাদের শরীরের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সত্তার একটি তুলনীয় সাদৃশ্য আছে।"—বলেছেন জনৈক খ্যাতিনামা সাহিত্যিক। ঐ কারণে সারাদেশে সংহতিও স্বাভাবিক সম্ভব হয়েছে।

দেহের সঙ্গে প্রাণের যেমন মিলন দেশের সঙ্গে দশের, ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সার্বিক মানুষের সেই রকম বিমল মিলন ও সংহতি সাধন করবেন ভারতের স্বাধীনোত্তর সাহিত্যিকরা। তা আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের দ্বারাই সম্ভব হবে। সেই ভাষার সাহিত্যিকই হবেন ভারতীয় লেখক। একদা খ্যাতনামা এক সিন্ধী সাহিত্যিক বলেছিলেন, there were three main tasks before Indian writers, namely : to bring back a sense of freedom into the mind of the common people and help him regain his lost dignity, to mould the mind of the people in such a way that a strong desire for a better life is created, to stop extolling the past, and try to make people conscious of the great tragedy that the human world is facing currently so that a great urge for a new order of things is created. কিন্তু বর্তমান সময়ে জিজ্ঞাস্য, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যাঁরা নিজেদের ভারতীয় লেখক বলে মনে করেন, তাঁরা এতদিন কি করেছেন? এবং স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সাহিত্য কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর লুক্কায়িত আছে মনে হয়।

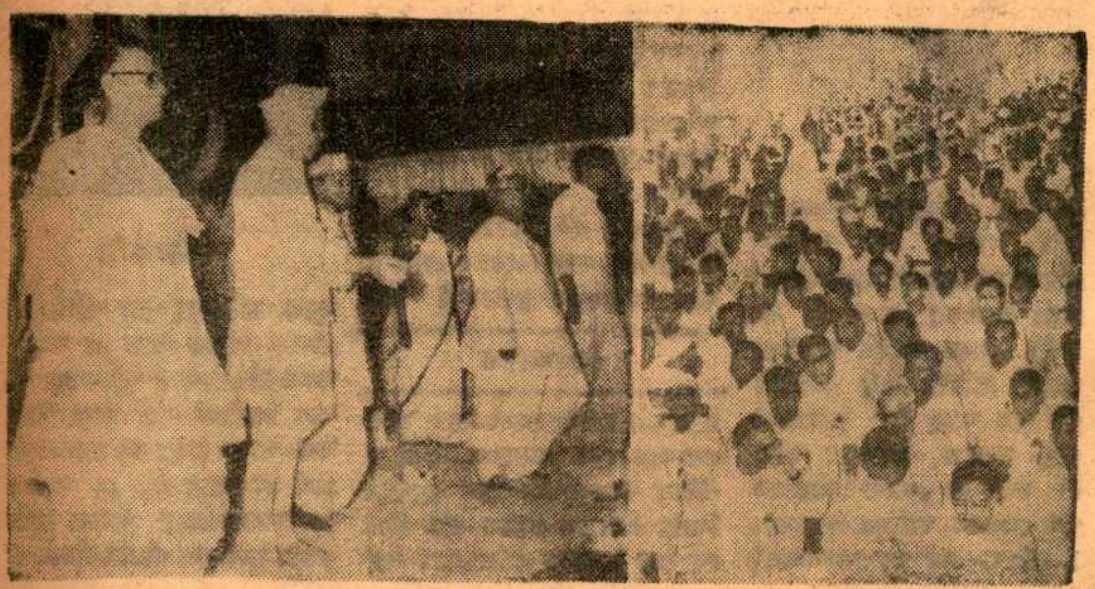

দীঘায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং বামপার্শ্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ অন্যান্য নেতাদের দেখা যাইতেছে।

শিব সদাগরের খাতা

কেন যে পাই না, জানি না। তারা তো ঘুরেই বেড়াচ্ছে। এখানে, ওখানে সর্বত্র। কিন্তু আমি পাই না। দেখতে পাই, কিন্তু হাতে পাই না। কবে পাব জানি না। প্রথমে যেদিন একটিকে ধরতে চেষ্টা করি সেদিনের কথা আজও মনে আছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কালো শ্লেটের চাইতেও ঘন কালো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূর থেকে একটিকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লাম, ডাকলাম কোনো ফল হল না। সে প্রায় বারো বছর আগের কথা।

* * *

তারপর গঙ্গা দিয়ে বহুৎ জল বেরিয়ে গেছে। অবশ্য আরো যেতে পারত যদি কোলকাতার নর্দমাগুলি ঠিক থাকত। কিন্তু আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। পেলাম না। পাওয়া হল না। কত নামে কত কাগজে যে এ নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

দিগ্‌দর্শক

দরকারের সময় আমি কখনো ট্যাক্সি পাইনি। আমি এ রহস্যের সমাধান কিছুতেই করতে পারছি না। কোলকাতায় রাস্তা আছে, লোকেদের চড়বার টাকা আছে। আমাদের দেশে মোটর গাড়ি তৈরীর কারখানাও রয়েছে একাধিক, অথচ ট্যাক্সির সংখ্যা দিনকে দিন কমছে কেন?

হয়তো সংখ্যাতাত্ত্বিক মৃদু হেসে বলবেন, কোথায় তোমার ট্যাক্সি কমছে? এই দেখো গত বছরের তুলনায় এ বছরে আরো কিছু সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মনে হয়—তবু মনে হয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন হাতঘড়িতে সময় দেখি, অফিসের দরজায় পৌঁছুতে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, যখন বুঝতে পারি, তিনটের সময় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে তার সবটাই হবে আজ বরবাদ—তখন মনে হয় ভগবানের কথা।

হে ভগবান, কোলকাতায় ভরা ট্যাক্সি অনেক আছে—কিছু খালি ট্যাক্সি এখন পাঠাও। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে খালি ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, কারখানা থেকেই তাতে লোক ভর্তি করে পাঠানো হয়—যারা কখনোই ট্যাক্সি থেকে নামে না!

* * *

কিন্তু রহস্য থাক।

সেদিন ব্রেবোর্ণ রোডে একটি খালি ট্যাক্সি পেয়েছিলাম। কত যুগ পরে তা আর মনে নেই। পেয়েই উঠে পড়েছিলাম। খালি ট্যাক্সি দেখে আরো যে দু' হাজার তিনশো কুড়ি জন লোক ওটাকে ধরতে এসেছিল তারা আমার সঙ্গে ক্ষিপ্রতায় পেরে ওঠেনি। ট্যাক্সিতে বসে আমার মনে হয়েছিল আমি রাজ্য জয় করেছি।

কিন্তু রাজ্য জয় করা এক, সেটাকে শাসন করা অন্য। হঠাৎ শুনি ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কোথায় যাবেন? জায়গার নাম বললাম। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ওদিকে যেতে রাজি নন তিনি তখন যেতে চান কালীঘাটের দিকে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমি যেতে পারি সেদিকে, নইলে সেখানেই নামতে হবে।

আমার হঠাৎ মনে হল যাত্রী হিসেবে আমার অধিকারের কথা। আমি বললাম: লালবাজার থানায় চলো।

ট্যাক্সি ছুটে চলল সোজা কালীঘাটের দিকে।

* * *

এ অবস্থায় কি কর্তব্য জানতাম না। আদালতে একটা কেস্ করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে দেখলাম, তার চাইতে ভাল হচ্ছে বাহুবল। দু'হাতে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ঘাড় চেপে

ধরলাম. এবং তখন সে ট্যাক্সি ঘোরাতে বাধ্য হল।

এবং আমার কথা মত থানাতে ও এল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, থানায় রিপোর্ট করলে কচু হবে।

কিন্তু তবু তো কিছু হবে। আজকাল কচু পাওয়াও দুষ্কর। অতএব লালবাজারে তার বিরুদ্ধে কি রিপোর্ট করা যায় দেখতে গেলাম। দেখলাম, কারুরই কিছু ধারণা নেই ও বাড়ি সম্বন্ধে। আমার তো ছিলই না।

একজন বললেন, লালবাজার ঠিক পুলিস থানা নয়। আমাকে নাকি যেতে হবে হেয়ার স্ট্রীট থানায়।

* * *

শেষ পর্যন্ত হেয়ার স্ট্রীট থানায় আমি আমার রিপোর্ট পেশ করেছি।

এ পর্যন্ত কোনো ফল হয়েছে বলে আমাকে জানানো হয়নি। আমার এক বন্ধু বললেন, তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, ফল হক বা না হক। সেটাই নাকি গণতান্ত্রিক মনের চিহ্ন।

* * *

আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আরো অনেক, অনেক দিন। ইতিমধ্যে ট্যাক্সির সংখ্যা আরো কমবে। আমরা আরো গণতান্ত্রিক হবো। কাগজে চিঠি লিখব। সম্পাদক ছাপবেন। লোকে হাসবে।

ফেটে গেল !

হিন্দীর জন্য উগ্র আগ্রহ হিন্দীরই ক্ষতি করবে—নেহরু

রঙ্গজগৎ

উত্তরায়ণ

তারাশংকরের কাহিনী ও সংলাপ-সমৃদ্ধ এই বাঙলা ছবিটির প্রদর্শনী গত শুক্রবার থেকে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আরম্ভ হয়েছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রয়েছে অগ্রদূত গোষ্ঠী। প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং পাহাড়ী সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাহিনী আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের মুখে এবং গল্পের ঘটনাস্রোতে ধীরে ধীরে অনেকগুলি চরিত্রের যে ভাবে সমাবেশ করেছেন কাহিনীকার তা তারাশংকরের মত নিপুণ গল্প-লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

সুবিখ্যাত শিল্পপতি অমৃত সেনের একমাত্র কন্যা আরতি। অসামান্যা সুন্দরী যে [illegible] যৌবনের দৃঢ়তায় সে অনবদ্য। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে পরিচয় হ'ল প্রবীর চ্যাটার্জীর এবং বলিষ্ঠ যৌবনের অনাবৃত সততায় সে-ও এক অপূর্ব চরিত্রনিষ্ঠায় ভাস্বর।

অমৃত সেনের বিরাট ব্যবসা ছিল জাপানের সঙ্গে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সেই ব্যবসায় যখন ভরাডুবি হ'ল, অমৃত সেনও সেই সঙ্গে সর্বস্বান্ত হলেন। এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাল রেখে খবর এলো বিলেতে পাঠরত তাঁর একমাত্র পুত্র জার্মানীর বিমান আক্রমণে নিহত হয়েছে। প্রৌঢ় অমৃত সেন এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এই দুঃখের দিনে প্রবীর তার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় সেন পরিবারের একান্ত আপনজন হয়ে উঠল এবং আরতিরও। কিন্তু ইতি[illegible] অরুণের কাছে সে প্রায় বাগ্‌দত্তা হয়েছিল। অরুণের আবির্ভাব আরতিকে এখন সমস্যা বিচলিত করে তুলল। অথচ প্রবীরও আর শহরে বেশী দিন থাকতে পারল না। তাকে সামরিক কাজে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চলে যেতে হ'ল ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। কোহিমা-ইম্ফলের যুদ্ধক্ষেত্রে।

আসল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে শিক্ষাশিবির থেকে প্রবীর চিঠি লিখে জানাল আরতিকে সে যেন এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু এক বিচিত্র পরিস্থিতির জন্য সে সাক্ষাৎ আর তাদের হ'ল না। আরতিকে ভুল বুঝল প্রবীর। তারপর যুদ্ধের মুখোমুখী জীবনমৃত্যুর নিষ্ঠুর সংগ্রামের পাশে রণক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হ'ল মোটর মেকানিক রতন ভট্টাচার্যের। আর আশ্চর্য তাদের চেহারার মিল, হুবহু এক রকমের চেহারা দু'জনের।

রতনের মৃত্যুর সময় প্রবীর তাকে কথা দিল যে, সে রতনের অন্ধ মা ও স্ত্রীর ভার গ্রহণ করবে। যুদ্ধের পর সেই ভার গ্রহণ করতে এসে সে এমনভাবে জড়িয়ে গেল সেখানে যে তাকে বাধ্য

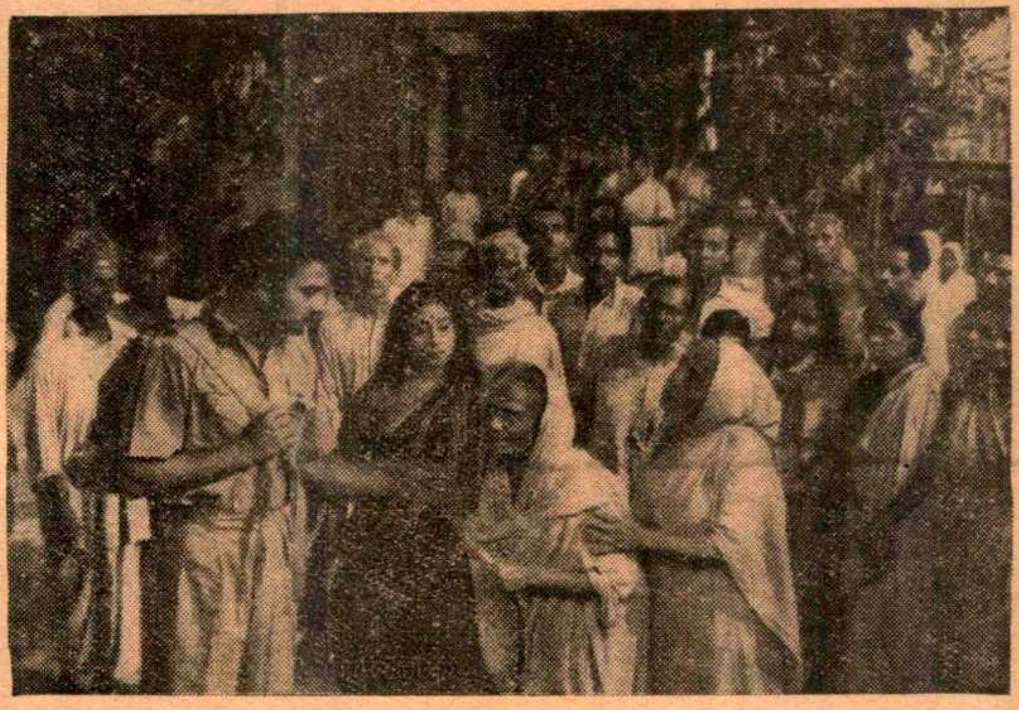

শ্রীদীপচাঁদ সাংকারিয়া নিবেদিত তারাশংকরের 'উত্তরায়ণ' চিত্রে—উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, নিভাননী প্রভৃতি। পরিচালনা : অগ্রদূত। সংগীত : রবীন চ্যাটার্জী। প্রযোজনায় : পারশমল দীপচাঁদ।

সংগঠনী (উদয়পুর, বেলঘরিয়া) অভিনীত "মহাপ্রেম" নাটকে একটি বিশেষ মুহূর্তে শ্রীঅজিত চক্রবর্তী, প্রাণেশ ও সত্যেন সাহা।

হয়ে থাকতে হ'ল সেখানে মেকানিক রতন হয়ে। আর ইত্যবসরে কলকাতায় আরম্ভ হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার কবল হ'তে অজান্তে অচেতন আরতিকে উদ্ধার করতে হ'ল তাকে। আরতি পরে তার উদ্ধারকর্তাকে খুঁজতে গিয়ে যখন দেখল—সে রতন হয়েই থাকতে চায়, প্রবীর নয়, তখন তার মনেও সঞ্চিত হ'ল সন্দেহ ও ভ্রান্তির কুয়াসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও নিরসন হল রতনের মায়ের মৃত্যুতে আর তার স্ত্রী সতীর নিঃশেষ আত্মবিলুপ্তির পর।

তারাশংকরের উপন্যাসটি দীর্ঘ এবং দীর্ঘ বলেই চিত্রনাট্যকে ক্ষুদ্রতর করে' পনর রিলের নীচে নামতে পারেন নি ছবির নির্মাতার দল। সুতরাং ছবিটিও হয়ে পড়েছে সামান্য দীর্ঘ।

উত্তরায়ণের শিল্প রূপায়ণে আরতির ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা চলে। তাঁর বিপরীত ভূমিকায় উত্তমকুমার প্রবীরের চরিত্রটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং প্রবীর ও রতনের দ্বৈত ভূমিকার অভিনয়েও উত্তমকুমার প্রায় অনবদ্য

ক্ষুদ্র হলেও সতীর ভূমিকায় দাবিত্রীর অভিনয় সুসমঞ্জস, অন্যান্যদের ভূমিকাও সুঅভিনীত বলা চলে।

অগ্রদূত-গোষ্ঠী পরিচালক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুবিখ্যাতও। এই ছবিতে তাঁরা তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখেছেন। চলচ্চিত্রায়ণে বিভূতি লাহা এবং বিজয় ঘোষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। যদিও সামান্য দু' এক জায়গায় আলো-ছায়ার অসঙ্গতি না থাকলে তাকে নিখুঁত বলা চলত।

কিন্তু শব্দগ্রহণের কাজটির সুখ্যাতি করা যায় না। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। ছবিতে দু'টি মাত্র গান এবং গান দুটি সু-গীত। লাবণ্যবতী মেয়ের মত সব মিলিয়ে ছবিখানি পরিচ্ছন্ন ও শ্রীসম্পন্ন।

বেলঘরিয়ায় নিয়মিত অভিনয়

সংগঠনী (উদয়পুর-বেলঘরিয়া) মঞ্চে গত সপ্তাহ থেকে প্রতি শনিবার ও রবিবার রাত ৭টায় শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহাপ্রেম' নাটকখানি নিয়মিত ভাবে অভিনীত হ'চ্ছে। এই সংস্থা গত কয়েক বছর থেকে ২৪ পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার পরিচালনা করে আসছেন এবং নিজেরাও গত দশ বছর হ'ল অনেকগুলি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি পরিচালনা করছেন শ্রীঅহীন্দ্র ভৌমিক, আলোক সম্পাতে আছেন বাদল ভট্টাচার্য। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন হাটী নন্দী, অজিত চক্রবর্তী, সত্যেন [illegible], মণি মুখার্জি, সুমিত্রা চক্রবর্তী, [illegible] চ্যাটার্জি, মেনকা ব্যানার্জি, [illegible] দাস, অহীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ অ[illegible]ভাগণ।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ❋ ❋
❋ ❋ চলিতেছে !

জীবনের অপরূপ কথাকার
তারাশংকরের শ্রেষ্ঠতম
সাহিত্য-কীর্তির
অবিস্মরণীয় রূপায়ণ !

উত্তরা ॥ পূরবী ॥ উজ্জলা
প্রত্যহ :: ২-৩০ ; ৫-৪৫ ; ৯-০
পদ্মশ্রী ২, ৫, ৮—সুচিত্রা ॥
নেত্র ॥ মায়াপুরী ॥ পারিজাত
শ্রীকৃষ্ণ ॥ নিউ তরুণ ॥ পার্বতী
উদয়ন ॥ মানা (পানিহাটি)

সরকারী নিয়ন্ত্রণে ময়দান

খেলা ধূলা

কথায় বলে 'ভাবিয়া করিও কাজ,—করিয়া ভাবিও না।' দীর্ঘকাল টাল বাহানার পর রাজ্য সরকার ময়দানের দর্শক গ্যালারীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ কোরেছেন। এতকাল এই গ্যালারীগুলোর মালিক ছিল এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ফুটবলের উন্নতি, দুঃস্থ বা পীড়িত খেলোয়াড়দের সাহায্যকল্পে এই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান একটি কপর্দকও ব্যয় না কোরে—লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ কোরেছে। ফুটবলের এই ঠিকাদারী প্রথার, শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্য কোথায়ও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই মহানগরীতে সবই অভিনব। সরকারী অনুকম্পায়, কয়েক যুগ ধরে এই বে-সরকারী ঠিকাদার ফুটবলের বিনিময়ে বিরাট মুনাফা শিকার কোরল,—আর প্রখ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় হীরালাল মুখার্জী অশীতিপর বার্ধক্যে, অনাহারে, অর্ধাহারে জর্জরিত হোয়ে মৃত্যু বরণ কোরলেন, পান্না প্রামাণিক বিনা চিকিৎসায়, দুরারোগ্য 'ক্যান্সারের' করাল গ্রাসে পতিত হোলেন এবং ছোগে মজুমদার প্রায়ান্ধ হোয়ে, রুজি রোজগারের আশায় এখনও দ্বার হোতে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেও একটি পয়সা সাহায্য কোরে ফুটবলে তাঁদের অবদান স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

বিলম্বে হোলেও, সরকারের চৈতন্যোদয়ে, মহানগরীর অগণিত ক্রীড়ামোদীর আশান্বিত হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোয়েছে, দর্শকদের কাছ থেকে আদায়ী টাকায়, রাজ্যের খেলাধূলার সামগ্রিক উন্নতি সাধন, দুঃস্থ এবং আহত খেলোয়াড়দের সাহায্য, আর্থিক অস্বচ্ছল ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদান এবং তরুণ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের শিক্ষা প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য কাউন্সিল অফ্ স্পোর্টস গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোয়েছে।

কিন্তু এ সবই প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন হবে না। তার প্রথম কারণ সরকারী লালফিতের বজ্র আঁটুনি। পরিকল্পনা রচনা কোরলেই তো রাতারাতি রাজ্যের খেলাধূলোর মানোন্নয়ন হবে না,—সেই পরিকল্পনাগুলো কার্যকরী কোরতেই যদি বছরের পর বছর কেটে যায়,—তবে অন্যান্য প্রকল্পের মত এই সরকারী প্রচেষ্টাও পঙ্গু হ'বে। দ্বিতীয়ত, ময়দানের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর স্থানীয় সরকারী মহলে অপরিসীম প্রভাব; এই প্রভাবই এতদিন রাজ্য সরকারকে নিষ্ক্রিয় কোরে রেখেছিল এবং বর্তমানে সরকার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবার পরে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আবার সক্রিয় হোয়ে উঠেছেন। এঁদেরই মুখপাত্র হিসেবে সম্প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ইতিমধ্যেই ময়দানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কোরেছেন এবং এতে অলিম্পিকের মহান আদর্শই লঙ্ঘিত হবে বলে মন্তব্য কোরেছেন। সরকার যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ কোরছেন না, তখন অলিম্পিক আদর্শ লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। দ্বিতীয়ত সুদীর্ঘকাল ধরে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি যে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল, শ্রীগুপ্ত প্রমুখ ক্রীড়া-কর্ণধারেরা তার বিরুদ্ধে তো একটিও কথা বলেন নি? তা হোলে কি আমরা ধরে নোব যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটির সাথে স্থানীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোর কর্ণধারদের গোপন লেন দেনের পাকাপাকি ব্যবস্থা ছিল এবং সেই বন্দোবস্তেই কুঠারাঘাত হ'বার দরুণ সেই সব কর্ণধারেরা এখন সরকারী প্রচেষ্টাকে যেন-তেন-প্রকারেন বানচাল কোরতে সচেষ্ট হোয়েছেন?

শুধুমাত্র বাইরে থেকে নয়, এমন কি রাজ্য সরকারের কোন বে থেকেও নানাবিধ বাধা আসতে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চক্রান্ত ব্যর্থ কোরে সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে দৃঢ় প স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে অদূরভবিষ্যতে ময়দানে স্বার্থান্বে প্রভাব প্রতিপত্তির অবসান সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় যুব ফুটবল দ
ব্যর্থতা

এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযো ভারতীয় দল শোচনীয় ব পরিচয় দিয়েছে। দু'টি দুর্বল দ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জয়লাভ ভারতীয় দলের ব্যর্থতা ক্রীড় মহলে প্রভূত নৈরাশ্যের কোরেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী ভ ফুটবল ফেডারেশনের কর্ণধ খেলোয়াড়েরা ন'ন প্রতিযো মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, জোড় দিয়ে খেলোয়াড়দের প্রাথমিক

ব এশিয় অ্য দলের ক্যাপ্টেন বি প্রধান দর্শকদের অকুণ্ঠ প্র অর্জন কোরেছেন।

পর্ব সমাধা কোরে বোম্বাইয়ে এক দেখানো শিক্ষা শিবিরের করা হোল। ভিন সপ্তাহ কোচি পর চূড়ান্ত দল গঠন তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হোল যোগিতায় অং গ্রহণ কো সুতরাং তাঁদের প্রদর্শিত ফলাফ

পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়ার নক আউটে বিজয়ী বয়েজ ট্রেনিং এসোসিয়েশন দল।

আশানুরূপ হবে না সে তো বলাই বাহুল্য। অথচ এই বাবদ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন একটা মোটা অঙ্কের ব্যয়ের পরিমাণই দেখাবেন এবং হয় তো বা এই ব্যয়ের একটি অংশ তাঁরা নিখিল ভারত কাউন্সিল অফ্ স্পোর্টসের কাছ থেকে খয়রাতি সাহায্য হিসেবেও আদায় কোরবেন

কিন্তু আমাদের বক্তব্য, একটু চেষ্টা কোরলেই ভারতীয় দলকে অন্তত এই ব্যর্থতার গ্লানি বহন কোরতে হোত না। এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতানুষ্ঠানের কথা ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তাদের কাছে অজানা ছিল না। তাঁরা যদি অধিকতর তৎপর হোয়ে, বেশ কিছু দিন হাতে রেখে দলগঠন পর্ব সমাপ্ত কোরতেন—শিক্ষণ-শিবিরের ব্যবস্থা কোরতেন, তবে ফলাফল সুনিশ্চিত-ভাবেই আশাপ্রদ হোত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা নিজেদের গদী বজায় রাখতেই এত ব্যস্ত যে, ভারত বা ভারতীয় দলের মান-মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করবার ফুরসৎ ওঁদের হোয়ে ওঠে না। ভারতীয় দলের ব্যর্থতার প্রধান এবং প্রথম কারণ এটাই।

আসন্ন ফুটবল মরশুম

হাঁক মরশুম পরিসমাপ্তির পূর্বেই ফুটবল মরশুম সুরু হোয়ে গেছে, পাওয়ার লীগ আর অফিস ফুটবল লীগ খেলার মাধ্যমে। কিন্তু ময়দানের প্রধান আকর্ষণ প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা আরম্ভ হোতে এখনও পক্ষকাল দেরী। কিন্তু এর ভেতরেই সব সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। দলগঠন পর্বের পরিসমাপ্তি তো অনেক আগেই ঘটেছে,—এখন শুধু খেলোয়াড়দের তালিম দেবার পালা। গত বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ইতিমধ্যেই সিংহল সফরে বেরিয়েছে। যাত্রাপথে তারা হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে একাধিক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ কোরেছে এই সফরের ফলে, স্থানীয় ফুটবল মরশুম সুরু হবার পূর্বে খেলোয়াড়েরা অনুশীলনের সুযোগ পাবেন এবং এর ফলে দলীয় সংহতিও যেমন বৃদ্ধি পাবে, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবও তেমনই গড়ে উঠবে।

ময়দানের অপর প্রধান এবং গত বছরের রোভার্স বিজয়ী (যুগ্ম) ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, অতীতের প্রখ্যাত-নামা খেলোয়াড় ল্যাংচা মিত্রকে দলের কোচ্ নিযুক্ত কোরেছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়বৃন্দ নিয়মিত অনুশীলন কোরে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব একাধিক প্রদর্শনী খেলায়ও অংশ গ্রহণ কোরেছেন।

কাগজে-কলমে, খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল। অরুণ ঘোষ, চিত্ত চন্দ, বলরাম ও সুনীল নন্দী, এই চারজন খেলোয়াড়ের দলত্যাগ ইষ্টবেঙ্গলের শক্তি সামগ্রিক-ভাবে হ্রাস কোরবে ঠিকই, তবে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ বহু তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় দলভুক্ত কোরেছেন এবং তাঁদের সাহায্যেই তাঁরা ক্ষতি-পূরণের আশা রাখেন।

মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গলের সাথে চিরকালই যাঁরা লীগ চ্যাম্পিয়ন-শিপে সমান পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে এসেছেন, তাঁরা হোলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অতীতের ছায়ামাত্র,—তবুও প্রতি বছরই সাধ্যমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে কসুর করেন না। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না,—বহিরাগত বহু খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে এবারে মহমেডান দল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হবে বলেই কর্তৃপক্ষের ধারণা।

কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে যাঁরাই এবার অগ্রবর্তী হোন না কেন প্রকৃতপক্ষে এবার তাঁদের বি, এন, আর দলের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হোতে হ'বে। অরুণ ঘোষ, বলরাম ও সুভাষীষ গুহের যোগদানে রেল-দলের শক্তি অপরিমিত বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় ফুটবল বাংলার প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত, তবুও এই গৌরবে বাংলার গৌরবান্বিত হ'বার উপায় নেই। কারণ রাজ্য দলের অর্ধেকই থাকেন বহিরাগত খেলোয়াড়, অন্তত মোহের বশবর্তী হোয়ে যাঁরা এখানে খেলতে আসেন। বিত্তশালী ক্লাবগুলো যতদিন না অবাঙ্গালী খেলোয়াড়ের মোহ পরিত্যাগ কোরতে পারবেন, ততদিন তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের প্রতিভা পরিস্ফুটনের সুযোগ আসবে না।

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

পশ্চিম বঙ্গের আধুনিকতম
ও
অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

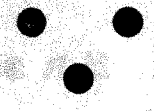

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন
কলিকাতা—১২
ফোন ৩৪-৩৩৫৬

Regd. No. C 71 SAPTAHIK BASUMATI Thursday, 2nd May, 1963
Phone : { 34-3489 / 34-3498 Gram : "BASUMATI" Price : 25 nP.

2 MAY 1963

BAWA
Glass E-Crockeries Private Ltd.

TEA	SET	Rs. 8/-
LEMON	SET	Rs. 4/-
FRUIT	SET	Rs. 2/-

63-H, Radha Bazar Street, Calcutta.

Phone : 22-1494

* CROCKERY
* CUTLERY
* GLASS WARE
* WINDOW GLASS
* PLY WOOD
* HARD BOARD
* SOFT BOARD

AGENTS

BAWA POTTERIES' CROCKERY

BAWA AGENCIES PRIVATE LTD.

BRANCHES ALL OVER INDIA

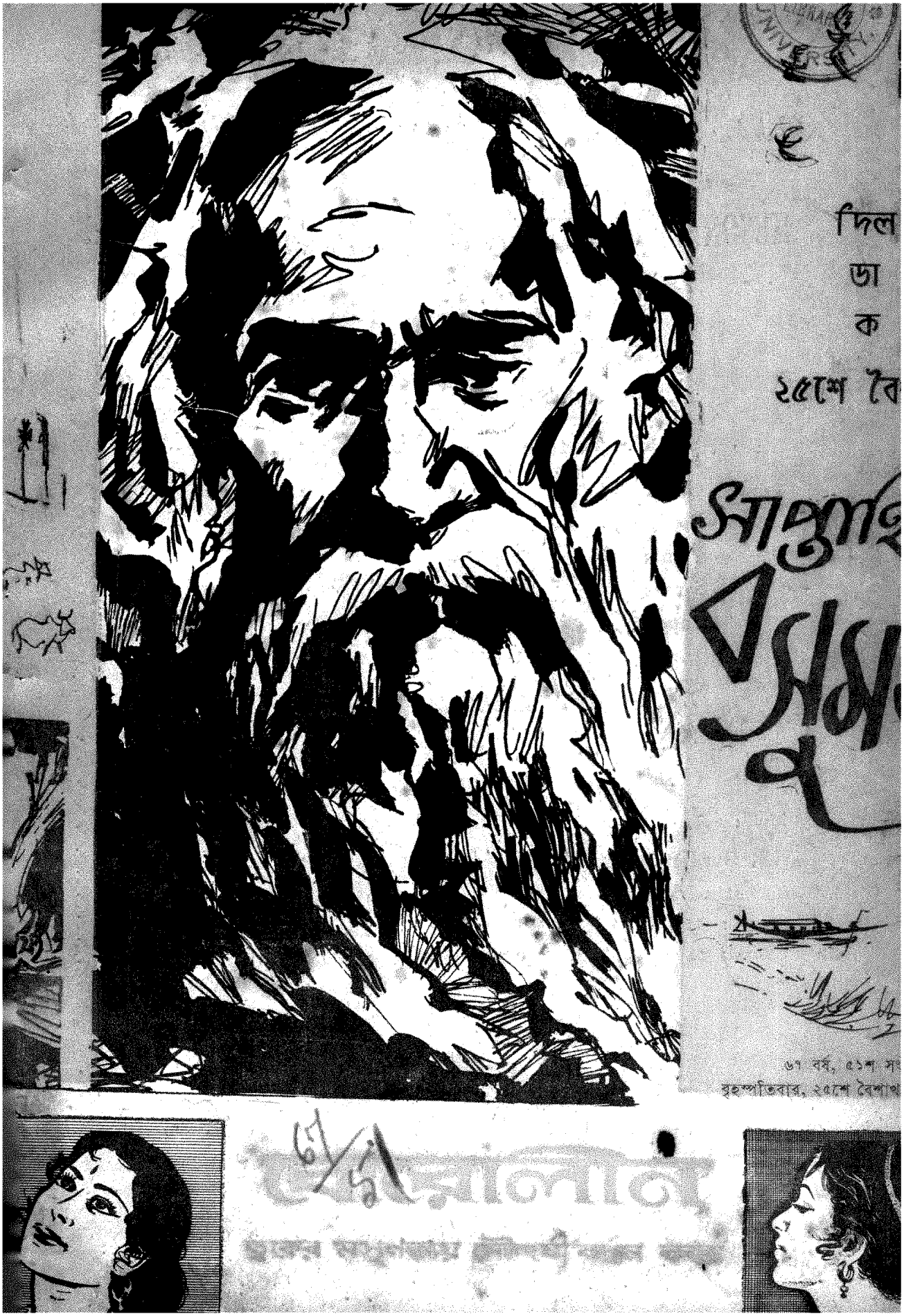
দিল
ডা
ক
২৫শে বৈ
সাপ্তাহ
৬৭ বর্ষ, ৫১শ সং
বৃহস্পতিবার, ২৫শে বৈশাখ

With best compliments of :

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly Kesoram Cotton Mills Ltd.)

Manufacturers and Exporters of

Cotton Textiles of all Varieties, such as

Greys	Long Cloths	Mulls
Poplins	Superior Leons	Shirtings
Prints	Coatings	Dhoties
Sarees	Flannels	Towels
Tapestries	Hosiery	Web Cloth

and Stockinettes.

LARGEST TEXTILE MILL IN INDIA

Mills :

42, Garden Reach Road,
Calcutta-24.
Phone : 45-3281 (4 lines)
Grams : "SPINWEAVE"

Regd. Office :

15, India Exchange Place,
Calcutta-1.
Phone : 22-3411 (16 lines)
Grams : "COLORWEAVE"

Managing Agents :

BIRLA BROTHERS PRIVATE LTD.

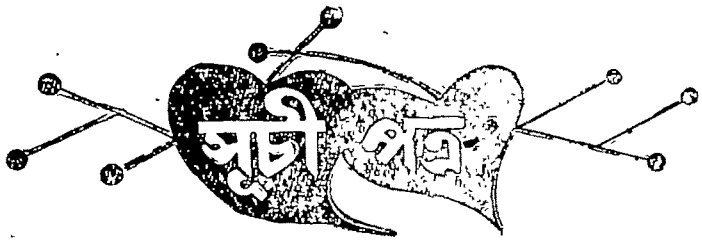

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩
আজকের মানুষ	...	৪
আবার দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ	সুধীরঞ্জন দাশ	৫
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৯
রবীন্দ্র-গীতি পদ্ধতি	সুরেশ চক্রবর্তী	১৬
রবীন্দ্রনাথ ও দেশপ্রেম	মৈত্রেয়ী দেবী	২০
মধ্যমণির আলো (কবিতা)	চিত্রিতা দেবী	২২
সভায় রবীন্দ্রনাথ	হিমানীশ গোস্বামী	২৩
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	২৫
রাজা ...	অশোক সেন	২৬
জাপানী জোনাকী	সন্দীপ ঠাকুর	২৭

—উপন্যাস—

তপতী রায়ের উপন্যাস

একটি সোনা মন ৫·৫০

চিত্রগুপ্তের সদ্য-প্রকাশিত

এরা অভিযুক্ত আসামী ৩·৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঝাড়খণ্ডের ঋষি ১ম ৩৲ ২য় ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়

মনকেতকী ৬৲ **দুরন্তমন** ৩৲

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের

কুমারী ধরম ৫·৭৫

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালোচোখের তারা ৩·৫০

প্রমথনাথ বিশীর

যা হলেও হতে পারতো ৩·৫০

নীলবর্ণ শৃগাল ৪·০০

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস

লাল পাথর ৩৲ **সমান্তরাল** ৩·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

জানালার ধারে ৪·০০

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুন্দরী কথাসাগর ৫·৫০

গজেন্দ্র মিত্র—**সোহাগপুরা** ৪৲

সুবোধ চক্রবর্তী-**একটি আশ্বাস** ৬·৫০

বিভূতি মুখোপাধ্যায়-**আনন্দ নট** ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরু—**বনমাধবী** ৩·৫০

সত্যব্রত মৈত্র—**বনদুহিতা** ২·৫০

আশাপূর্ণা দেবী—**অতিক্রান্ত** ৩·৫০

ইন্দুমতী ভট্টা—**আতপ্ত কাঞ্চন** ৩৲

বেলা দেবী—**জীবনতীর্থ** ৩৲

অখিল নিয়োগী—**বহুরূপী** ৩৲

বিমল কর—**দিবারাত্রি** ৩৲

—নাটক—

স্বামী বিবেকানন্দ (অভিযাত্রী) ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) ২·০০

শাপমুক্তি (মহেন্দ্র গুপ্ত) ২·৫০

পান্থশালা (রমেন লাহিড়ী) ২·৫০

চাঁদির কৌটা (উৎপল দত্ত) ২·০০

সন্তান (বাণীকুমার) ৩·০০

পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী) ২·০০

সূর্যমুখী (প্রশান্ত চৌধুরী) ২·০০

প্রত্যাবর্ত্তন ২·০০ **লালপাথর** ২·৫০

অনর্থ (সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২·৫০

সত্যের সন্ধানে (জলধর চট্টোঃ) ২·৫০

রাঙা রাখী ২·৫০ **মানুষ চাই** ২·০০

পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম ১৫·০০

(আদি মধ্য অন্তলীলা সম্পূর্ণ)

শ্রীহরি সাধক কণ্ঠহার ১·৫০

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের

দেশবন্ধু স্মৃতি ১০·০০

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ৮·০০

অশোক গুহ অনূদিত

নগরীতে ঝড় ৫·০০

বনেদী ঘর ৩·৫০

যোগেশচন্দ্র বাগলের

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬·০০

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪·০০

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

বাংলা সাহিত্যে একদিক ৪·৫০

সাহিত্যের স্বরূপ ২·৫০

অভিযাত্রীর উপন্যাস

অনির্বাণ শিখা ৫·০০

নষ্টচন্দ্রের আলো ৬·০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী ঃ ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ঃ কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	...	৩৩
আন্তর্জাতিক	...	৩৭
রবীন্দ্র সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
গ্রন্থমেলা	...	৪৮
বঙ্গদর্শন	লীলা মজুমদার	৪৯
কবিতা :—		
রবীন্দ্রনাথ	অজিত দত্ত	৫২
পঁচিশে বৈশাখ	হরপ্রসাদ মিত্র	৫২
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ	ধীরেন দেবনাথ	৫৩
ভারত দর্শন	...	৫৭
কবিগুরু অঙ্কিত চিত্র	...	৬০
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা	চিন্তামণি কর	৬১
চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ	চিদানন্দ দাশগুপ্ত	৬৩

প্রকাশিত হইতেছে !! প্রকাশিত হইতেছে !!

অবিলম্বে অগ্রিম সহ অর্ডার পেশ করুন

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

(চতুর্থ খণ্ড)

॥ মূল্য আট টাকা মাত্র ॥

॥ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে)

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্ত্তিমান বিকাশ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্ব্বরসের সাগর-একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্ত্তি নাট্যকার, সর্ব্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

রাজকৃষ্ণ রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলনীর, শৃঙ্গশৃঙ্গ, চতুরালী, চম্পাবলী, প্রহ্লাদ চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

৪র্থ ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিহর লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, টাটকা-টোটকা, বঙ্গভূষণ, বেলুনে বাঙালী বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর চার্লস ডিকেন্সের

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৫১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

Thursday, 9th May, 1963
25 Naya Paise

রবীন্দ্রনাথ

আজ পঁচিশে বৈশাখ। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের পবিত্র জন্ম-দিবস হিসেবে এই গৌরবময় দিনটি আমাদিগকে অভিনব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, নোতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলুক। মহাকবির কর্মময় জীবন—তাঁর সকল সাধনা ও সুগভীর ধ্যানকে এই দিনে স্মরণ করা যেমন মহৎ কর্তব্য, তেমনি গৌরবানুভবের মধ্যে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্বকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার দিনই ত' এই পঁচিশে বৈশাখ। তাহলেই মহাকবির ধ্যান-ধারণা কর্মজগতে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে আমাদের জীবনকে আনন্দময় ও সুষমামণ্ডিত করে তুলবে। কিন্তু তার পূর্বে চাই আমাদের নিরলস প্রয়াস, প্রবল প্রতিশ্রুতি, সুকঠিন কর্মোদ্যোগ। তিনি যে সত্যকে সুন্দররূপে প্রতিভাত করেছেন—সেই সুন্দরকে সত্যে পরিণত করার অধিকার ও দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা যেন অসতর্ক মুহূর্তে, অকল্যাণের আঘাতে লক্ষ্যহীন হয়ে না পড়ি, আমাদের এই জীবন যেন অসত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে। কোনো ছলনার দ্বারা আমরা যেন কদাচ মোহাবিষ্ট না হই। মহাকবির স্বয়ম্ভুবাণী কখনো মিথ্যা হয় না। কিন্তু তার জন্যে চাই আমাদের অমেয় দুঃখ-স্বীকার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আপন জীবন সত্যে বাস্তব দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন বীরের মতই। তা যেন কবির আরেক রূপ। কিন্তু ঐ বীরের রূপই কবিকে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক-যুক্ত করে তুলেছে। সেই কারণে জগতের সমস্ত মানুষের কল্যাণের কথা রবীন্দ্রনাথের মতো অমন স্পষ্ট করে আর কেউ ভেবেছেন বলে মনে হয় না। মানুষের সত্য-রূপটি তিনি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আবার অনাদৃত, অবহেলিত, অজ্ঞাত মানুষের সুখ-দুঃখময় মানবহৃদয় সম্পর্কে আমাদের তিনি সচেতন করেছেন। এই ভারত আজ তাদের শক্তিতেই বলীয়ান। জাতীয় সঙ্কটে তাদের একাগ্র সংহতি রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড ভারতের কল্যাণময় কামনাকেই সুদৃঢ় করে তুলেছে। অশুভ মুহূর্তে চরম দুঃখের পরীক্ষায় পরম সত্যকে আমরা লাভ করেছি। অকল্যাণ বা অসুন্দর কি ভাবে পরাজয় বরণ করে—তা আমরা চোখের সামনেই দেখেছি। তাই দুঃখ ও বিপদের দিনে রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা বারবার স্মরণ করেছি। দেখেছি, যিনি দেশের কর্তব্যপরায়ণ নেতা—তিনিও কি ভাবে গুরুদেবের পুণ্যতীর্থে গিয়ে নবপ্রেরণা লাভ করেন। তাই বলাই বাহুল্য, ভারতের জাগ্রত আত্মার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই আমাদের গৌরবের, সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেছেন। কিন্তু আমাদের জীবনের গ্লানি ও তুচ্ছতাও তাঁকে বারবার পীড়িত করেছে। সোচ্চারে তিনি তার রূঢ় প্রতিবাদও করেছেন। তুচ্ছ স্বার্থ, কিংবা কোনো মোহ কখনো তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েই কবি আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিকতার সফল স্বরূপটিকে খুঁজে নিয়েছিলেন। আবার সভ্যতার সঙ্কটে তিনি কী সতর্ক বাণী-ই না উচ্চারণ করেছেন। এই যে বিরাট বোধ, স্বাতন্ত্র্য ও ভূয়োদর্শন—এ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষিকবির পক্ষেই সম্ভব।।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে। শুধু যে চিরকালের বলেই তিনি আজকেরও তা নয়। সত্যিই প্রমাণসিদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে তিনি আজকের মানুষ। বাংলা দেশে ত বটেই, বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় সশরীরে না থেকেও তিনি অনস্বীকার্য ভাবে আমাদের জীবনে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন চলে গেছেন, মরজীবনে সবাইকেই যেমন আসতে যেতে হয়। কিন্তু যে পৃথিবীতে তিনি এসেছিলেন সে পৃথিবী যা ছিল ঠিক তেমনি রেখে আর তিনি যান নি। মানুষের জগৎই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আর প্রভাবে প্রেরণায় বদলে গেছে। তাঁর মত আশ্চর্য মানুষেরা পৃথিবীর এই বিস্ময়কর রূপান্তরই ঘটিয়ে যান।

পৃথিবীর যে মানচিত্র চাক্ষুষ দেখা যায়, সেখানকার পরিবর্তন সবাই সহজেই লক্ষ্য করে। প্রাকৃতিক ঘটনা বিপর্যয়ে কিংবা মানুষের সাহস বীর্য অধ্যবসায়ে যেমন তেমনি লোভ, দম্ভ, হিংসা আর রাজনীতির প্ররোচনাতেও সে পরিবর্তন ঘটে। ভূমিকম্পে, কি পৃথিবীর অন্তর্বহ্নির উদ্গারে পাহাড় ওঠে নামে, সমুদ্রে নতুন দ্বীপ জাগে কি পুরাণো দ্বীপ ডোবে, আর দুর্বার সেনাবাহিনীর প্লাবনে কি রাজনীতির খেলায় দেশ ও রাজ্যের সীমান্ত রেখার অদল বদল হয়। কিন্তু এই বাইরের মানচিত্র ছাড়া মানুষের অন্তর্লোকের আর এক মানচিত্র আছে যার মূল্য মানব সভ্যতায় অনেক বেশী। ক্ষণজন্মা লোকোত্তর পুরুষেরা আমাদের মনোজগতের সেই মানচিত্র বদলে দিয়ে মানব প্রগতির নব নব ধারাপথ সৃষ্টি করে যান জীর্ণ জড়ত্বের জায়গায় বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে। পঙ্কিল সংস্কারের বদ্ধ জলায় তাঁরা আনেন নির্মল প্রবাহ-বেগ, উদ্‌ভ্রান্ত আচ্ছন্নতার কুজ্ঝটিকায় সত্যের তমোবিদার খড়্গদ্যুতি।

আমাদের এ যুগের মনোজগতের নিসর্গ যে কতখানি রবীন্দ্রনাথের গড়া ও সাজানো তা আমরা অভ্যস্ততার ঔদাসীন্যে অনেক সময়েই ভুলে থাকি। তাঁরই চিন্তা ভাবনা, ধারণা, কল্পনা এ জগতের মানচিত্র আজ কিন্তু বিস্তীর্ণভাবে জুড়ে আছে। আমরা যা ভাবছি, কল্পনা করছি বুঝছি, তার উপাদান ত বটেই, তা প্রকাশ করবার ভাষাও তাঁর কাছেই বেশীর ভাগ পাওয়া। আমাদের চিত্তভূমির দিগন্ত পর্যন্ত যিনি তাঁর অজস্র অফুরন্ত দাক্ষিণ্যে সরস শ্যামল করে রেখেছেন, আমাদের মনের আকাশ যাঁর বাণীতে বাঙ্ময়, আজকের মানুষ হিসেবে তাঁর চেয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে সর্বাগ্রে স্মরণীয় আর কেউ হতে পারেন না।

আবার দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

আবার দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ। ধনীগৃহের প্রসূতি কক্ষের নির্জনতাকে আলোড়িত করে এমনি এক দিনে একটি সদ্যোজাত শিশুর জন্মের প্রথম শুভক্ষণে পঁচিশে বৈশাখ ডাক দিয়েছিল অতি ক্ষীণ স্বরে। তারপর প্রতি বৎসর পঁচিশে বৈশাখ ডাক দিয়ে গেছে শিশুটির জন্মদিনের কথা স্মরণ করিয়ে। সে ডাক তখন পরিবার পরিজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—বাইরের কেউ সে ডাক শোনেন নি, গ্রাহ্যও করেন নি। কিন্তু ক্রমশই সে ডাকের সুর উচ্চতর হয়ে যখন দেশবাসীদের কানে পৌঁছল তখন সকলে বিস্ময় বিনম্র-চিত্তে হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ দিয়ে দীপ্তিমান মনীষাটিকে বরণ করে নিয়েছিলেন—কেবলমাত্র কবিগুরু বলেই নয়, এক-জন ধ্যানমগ্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রতীক জেনে ও স্বীকার করে। যেদিন পঁচিশে বৈশাখের ডাক দেশবাসীদের জীবনে মূর্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল। আজকে আবার দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ। এ ডাক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে বাংলা দেশ ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের ছোট বড় নগর ও গ্রামের উপর দিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কত দূর দূর দেশ ও দেশান্তে। এই ডাক শুনে কত না দেশের কত না নরনারী আজকে একত্রিত হয়েছেন এই পুণ্যদিনটি পালন করবার জন্যে যেমন করে ভক্তি-বিনম্র চিত্তে আমরা আজকে এই দিনটি স্মরণ করছি। আমাদের এই নমস্কার যদি কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার বাহ্যিক আয়োজনেই পর্যবসিত হয়, তবে এর কোনই সার্থকতা হবে না, কেন না সেটা হবে বিক্ষিপ্ত মনে, না বুঝে মন্ত্র আওড়িয়ে আচার প্রতিপালনের প্রচেষ্টামাত্র আমাদের এই জন্মতিথি পালন সত্য হবে একমাত্র যদি বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে রবীন্দ্রনাথের মহামানবতার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিতে পারি। "শ্রদ্ধা" শব্দটির মানে হল বিশ্বাস। গুরুদেবের আদর্শের 'পরে যদি আমাদের সত্যিকারের বিশ্বাস থাকে তবেই আমরা তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবো। তাঁর মহামূল্য দানের কথা স্মরণ করে আমাদের মন যদি সরস ও অনুকূল হয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে কাণায় কাণায় ভরে ওঠে তবেই তাঁর জন্মতিথি পালনের অনুষ্ঠান সহজ হবে, সত্য হবে। সুতরাং আজকের দিনে ক্ষণকালের জন্যে অবহিত চিত্তে আমাদের ভাবতে হবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি দিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক সমালোচনা সম্বন্ধভাবে করতে হলে যে পরিমাণ অধ্যয়ন ও চর্চা প্রয়োজন হয়, তার তিলার্ধও আমার নেই। সুতরাং সে প্রচেষ্টা না করাই সমীচীন বলে মনে করি। দুটো একটা মোটা কথা যা মনে হয়েছে, এইখানে তার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। এ কথায় ভুল নেই যে, রবীন্দ্রপ্রতিভা বহুমুখী। সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই, যেখানে তিনি কিছু না কিছু দিয়ে যান নি। প্রথমেই ধরা যাক রবীন্দ্র-কাব্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার একমাত্র তুলনা মেলে নদীর সঙ্গে। তুষারাবৃত শৈলশিখরের মুখে রোদ লাগায় বরফগলে যেমন করে ঝর্ণা জেগে ওঠে, তেমনি করেই নিতান্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল। তারপর সেই কাব্যধারা ঝরণা ধারারই মত কত না পাথর ও নুড়ির উপর দিয়ে নূপুর বাজিয়ে নেচে নেচে ছুটে চলল আপনার পথ আপনি কেটে কেটে।

নদী-যেমন কত না দেশের কত না গ্রামের পাশ কাটিয়ে আশে পাশের জলধারায় পরিপুষ্ট ও স্ফীত হয়ে দুই তীরের ভূমিসকল উর্বর করে দিয়ে সাগরের অতল জলে মিশে যায় রবীন্দ্র-কাব্যও তেমনি দেশের প্রাচীন ভ ধারা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এ নানা দেশ বিদেশের কাব্যসমৃদ্ধি অলংকৃত হয়ে কত না বিচিত্র স্বজন করে দেশবাসীর চিত্ত বিনোদিত ও উদ্বুদ্ধ করে সাগর গভীরতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ভাববৈচিত্র্যে ও ছন্দের লালি রবীন্দ্রকাব্য যে কি অপূর্ব অব দিয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বলে শেষ করা যায় না। "নির্ঝ স্বপ্নভঙ্গ", "এবার ফিরাও মো "যেতে নাহি দিব", "পবন দেব "সোনার তরী" ও "মানসসুন্দর বাক্য ও ভাববিন্যাসের উৎসা কিরণচ্ছটায় কার না হৃদয় উর্ধ্বো হয়ে ওঠে? "উর্বশী" কবিতাটি কে না স্তম্ভিত হয়েছে কবিচিত্তের ব মাধুর্যে?

"সুর সভাতলে যবে নৃত্যকর
পুলকে উল্লা
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু
মাঝে তরঙ্গের দ
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে
ধরার অঙ্ক
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে
খসি পড়ে তার
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চি
আত্মহারা নাচে রক্তধারা
দিগন্তে মেখলা তব টুটে
আচম্বিতে, অয়ি অসম্বৃতে

সৌন্দর্যের যে বিরাট পরি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই ক'টি ল তেমনটি ত' দেখিনি কোনো দে কোনো কবিতায়। "শরৎ" কবিতা বাংলা দেশের স্বরূপ ছবিটি আরো বেশী করে ও ঘনিষ্ঠ চিন্‌তে পারি আমাদের জন্মভূমি বাংলা দেশকে। এই রকম অ কত অসংখ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন। প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি অকলঙ্ক মুক্তা।

অবহিত চিত্তে একটু লক্ষ্য করে পড়লেই স্পষ্ট দেখা যাবে যে, রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্টভাব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। একটি মালার ফুলগুলির মধ্যে দিয়ে যেমন সুতোটি ফুলগুলিকে ধারণ করে থাকে, তেমনি এক একটি ভাবধারা অনেকগুলি কবিতাকে আশ্রয় করে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এই সকল ভাবধারার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে আলোচনা করলে এক একটি মোটা পুঁথি হয়ে পড়বে। সুতরাং দু'একটি ভাবধারা যা আমার মনে লেগেছে তার উল্লেখ করছি অতি সংক্ষেপে। এই অপরিসর ভাষণে বিশদভাবে সকল দিক দিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথমেই যে ভাবধারাটি নজরে আসে, তার কথাই বলি। পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে অনাদিকাল হ'তে যে জীবনস্রোত নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মানুষ সেই স্রোতেই ভেসে চলেছে এবং যুগে যুগে, নব নব জীবন লাভ করে মানুষ এগিয়ে চলেছে চরমমুক্তির পথে। এই যাত্রা কবে সুরু হোলো কেউ জানে না—এই যাত্রার শেষ নেই, বিরাম নেই। তিনি লিখেছেন—

"কবে আমি বাহির হ'লেম
তোমারি গান গেয়ে,
সে ত' আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে
আসছি তোমায় চেয়ে,
সে ত' আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে ধায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলাম,
জীবনধারা বেয়ে।
সে ত' আজকে নয়,
সে আজকে নয়।

॥ লেখক মহল ॥
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-১৪
শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯
সকল প্রকার রচনা প্রকাশের
জন্য যোগাযোগ করুন
প্রতিমা পুস্তক কর্তৃক প্রচারিত

এই একই কথা তিনি অন্য ভাষায় বলেছেন—

"জানি জানি কোন
আদিকাল হ'তে—
ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে—
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
* * *
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে
কত লোকে লোকে—
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত দুঃখে সুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষণ।"

মানবজীবনের এই যে অফুরন্ত গতিবেগ, এই যে নব নব বিকাশ, তাকে স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট কবিতার ক'টি চরণে—

"আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি, কত যে নদী তীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।"

জাগতিক জীবন-প্রবাহে মনুষ্য-জীবনের এই যে ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তি, পরম পরিণতির দিকে এই যে তার বিরামবিহীন যাত্রা, এই ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি অনির্বচনীয় অবদান বলে মনে করি।

এরই পাশাপাশি আর একটি ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। ভক্তের যিনি ভগবান তিনি যুগে যুগে, পলে পলে নেমে আসছেন ভক্তের কাছে নিজেকে ধরা দেবার জন্যে। আকাশে বাতাসে তাঁর চরণধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় কান পেতে থাকলে। এই ধ্বনি শুনেই ভক্তিমতী মীরাবাঈ গেয়েছিলেন—

"শুনি ম্যঁয় হরি আওন
কি আওয়াজ।"

রবীন্দ্রনাথও সেই আগন্তুকের চরণ-ধ্বনি শুনে গেয়ে উঠেছিলেন—

"তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি কি
তাঁর পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে, পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
* * *
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।"

জীবন দেবতা আসছেন—অনাদি অনন্তকাল ধরেই তিনি আসছেন। তিনি আমার ডাকার অপেক্ষা রাখেন নি। তিনি তাঁর নিজের গরজেই আসছেন আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে—

"আমার মিলন লাগি
তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে?
কতকালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে—
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে তোমায় ডেকে।"

যিনি রাজার রাজা তিনি তাঁর উচ্চ সিংহাসন থেকে নেমে আমারই পর্ণকুটীরের দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

"তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে।
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।"

কেন তিনি নীচে নেমে আসছেন? কবি নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
* * *
তাই ত' তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি—
আসছ কত মনোহরণ বেশে প্রভু
নিত্য আছ জাগি।
তাই ত' প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিত।"

এই মহামিলনটি দেখবার জন্যেই উন্মনা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে

রয়েছে, আলোয় আকাশ ভরে গিয়েছে।

"তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে
আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।

* * *

তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।"

যখন জীবন দেবতাকে বুকের কাছে পাই, তখন আর কোনো বাধা থাকে না—

"তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ তুলিয়ে
ওঠে তখন দুলে।"

তখনই মানুষ বলে—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।
আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়
তাই না হারায়
তাই দেখি তায় যথায় তথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।"

তখনই প্রত্যয় হয়—

"ও যে আছে বলে
আকাশ জু'ড়ে ফোটে তারা রাতে
প্রাতে ফুল ফুটে বন বনে।
এত রূপের খেলা, রঙের মেলা
অসীম সাদায় কালোয়।
ও যে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক জাগায়
দখিন সমীরণে।"

প্রিয়সঙ্গ লাভ করলেই মানুষ গেয়ে ওঠে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হোলো অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।"

নিজের বুকের মাঝে দেবতার স্পর্শ পেলেই মানুষ চায় তাঁর কাছে নিভৃতে নিজেকে নিবেদন করতে। সেই জন্যে মানুষ হৃদয়-দেবতাকে গান গেয়ে জাগিয়ে তুলে বলে—

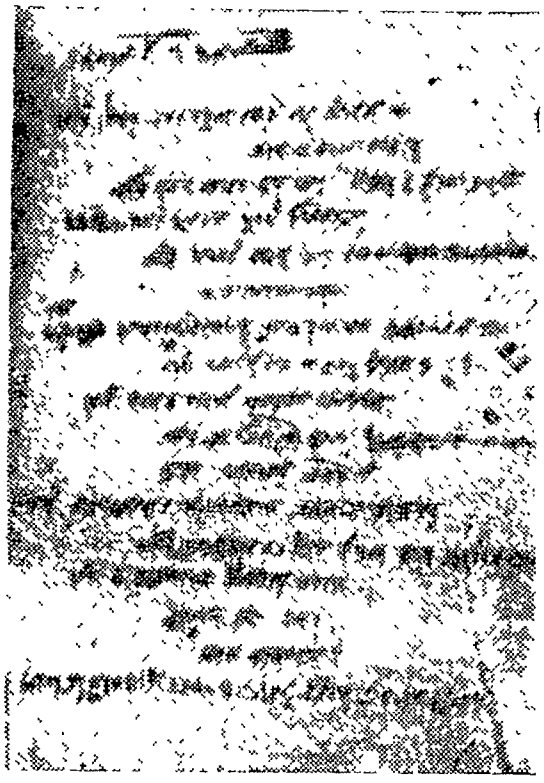

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে জাগ, জাগ জাগ।"

তারপর জিজ্ঞাসা করে—

"ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম?"

এই যে ভগবানের নিত্য অভিসার, এই যে মানুষের আত্মসমর্পণ জীবন দেবতার চরণে—এই ভাবটিও রবীন্দ্র কাব্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনায় যে সকল অপূর্ব ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয় তারই দু'একটি ভাবধারার নিদর্শন স্বরূপে কয়েকটি চরণ উদ্ধার করে আপনাদের সামনে ধরলাম। একটু মনোনিবেশ সহকারে রবীন্দ্ররচনাবলী পাঠ করলে এই ধরণের বহু উদাহরণ নানা লেখায় পাওয়া যাবে। যাঁরা কাব্য-রসিক, কৌতূহল যাঁদের সজীব, তাঁরা যে এইভাবে সকলের সম্যক বিশ্লেষণ করে অপার আনন্দ পাবেন এবং জনসাধারণকে দেবেন, সে বিষয়ে আমার কিঞ্চিদপি সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ যে লিরিক কবিতাই লিখে গেছেন, তা মোটেই নয়। ও কাহিনী"তে ভাষা, ছন্দ ও নিরুপম। "নৈবেদ্য", "গীতা "গীতিমাল্য" ও অন্যান্য বইতে দু'তিন হাজার গান তিনি রচনা গেছেন—একমাত্র তাইতেই নাম অমর হয়ে থাকতো। আন্দোলনের সময় যে সকল মাতানো গান তিনি লিখে সেগুলি আজও বাংলা দেশের মাঠে, বাটে শোনা যায়। নাথের "জনগণ মন অধিনায়ক" স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পৃথিবীর সর্বত্র সুবিদিত ও প্রশং "বাল্মীকি প্রতিভা" ও "মায়ার বোধ হয় বাংলা ভাষায় গীতিনা কিম্বা অন্তত গোড়ার দিকের উদাহরণ। পদ্য নাটকের মিত্রাক্ষর ছন্দে "মালিনী" অমিত্রাক্ষর ছন্দে "বিসর্জন" উপভোগ্য। অন্যান্য নাটকের দেখি "রাজা ও রাণী", "প্রায়শ্চি "শারদোৎসব","অচলায়তন", "র "ডাকঘর" এবং তারপরে কত কি। প্রহসনও বাদ যায় নি

"বৈকুণ্ঠের খাতা", "চিরকুমার সভা", "হাস্যকৌতুক", ব্যঙ্গকৌতুক" ও "গোড়ায় গলদ"-এর মার্জিত ও সাবিল রসালাপ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

ছোট গল্পের রাজা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছের প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে আশ্চর্য রকমে সুনিপুণ লেখনীর তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলাদেশের নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্না ভরা উজ্জ্বল ছবি। বড় উপন্যাসও তিনি লিখেছেন বিস্তর—"নৌকাডুবি", "চোখের বালি", "গোরা", "ঘরে-বাইরে", "শেষের কবিতা", "চার অধ্যায়" এবং আরো কত কি। এর প্রত্যেকটি এক একটি মুক্তা বললেই চলে। গদ্য প্রবন্ধের কথা উল্লেখ না করলে ফিরিস্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কথাসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলির লৌকিকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাংলাদেশের পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের চিন্তা যখন তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার প্রমুখ কয়েকজন মনীষী ব্যতিরেকে সে সব নিয়ে তখন কেউই বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামান নি। ছোটদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচীন তপোবনের যে ছবি জেগেছিল, সেই রকম করে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিলাইদহে, পৈতৃক জমিদারী তত্ত্বাবধানকালে প্রজাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এবং তাদের কঠিন সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্যে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নানা রচনায় ও বক্তৃতায়। "সমবায় নীতি"র বিশ্লেষণ ও তার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতগুলি আজকের দিনে বিশেষ করে অনুধাবনযোগ্য মনে হয়। গ্রামীণ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি যে সকল পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁর নানা গদ্য রচনায় ও ভাষণে সেইগুলিই কার্যকরী করবার জন্যে তিনি শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। স্বল্প কথায় বলি যে, সাহিত্যের এমন কোনো শাখাই নেই যার উপর তাঁর মনীষার ছাপ না পড়েছে এবং দেশ ও সমাজের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক এমন কোনো সমস্যাই নেই যার সম্বন্ধে তিনি না ভেবেছেন এবং যার সুমীমাংসা তিনি নির্দেশ না করেছেন। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে তিনি যে সকল বিষয়ে চিন্তা করে, গবেষণা করে দেশবাসীদের সতর্ক করেছিলেন, আজকে দেশের সরকার ও দেশবাসী সকলে সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তাকে কার্যকরী করে তুলবার চেষ্টা করছেন নানা পরিকল্পনায়।

সাহিত্য ও সমাজের উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথ যে সকল অবদান রেখে গেছেন, তা অমূল্য সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও আর একটি জিনিষ তিনি বিশ্ববাসী সকলকে দান করে গেছেন। সেটি হচ্ছে তাঁর সার্বজনীনতার আহ্বান। যে আহ্বান ছড়িয়ে গেছে আমাদের দেশের সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে। স্বাদেশিকতার প্রাচীর তুলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সমূহ দুর্ভেদ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে পরস্পরকে হতমান নতশির করে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হবার জন্যে যখন বিরাট বিরোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তুলেছিল, তখন সেই সকল বিবদমান শক্তিশালী-জাতি সমূহকে লক্ষ্য করে পরাধীন ভারতের এই মনীষী সন্তান প্রাচীন ভারতের ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত উদার শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন নির্ভিক চিত্তে ও সুস্পষ্ট ভাষায়। তিনি বিশ্ববাসী সকলকে ডেকেছিলেন ভাই বলে, কেন না আমরা সকলেই যে অমৃতস্য পুত্রাঃ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে মৈত্রী-সংস্থাপন করতে হলে পরস্পরকে চেনা প্রয়োজন প্রত্যেক দেশের চিরাচরিত প্রথা সকলের অন্তরালে যে সনাতন সভ্যতা নিহত রয়েছে তাকে ভাল করে জানা এবং নিজেদের দেশের সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্যেই গুরুদেব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বভারতী যার মূল মন্ত্র হোলো—

"যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্,"

তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যান দিয়ে গড়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্ব একনীড় হয়ে বাস করবে। এই সার্বজনীনতাই গুরুদেবের প্রকৃষ্ট দান।

এই যে মনীষী ঋষিকল্প মহামানবের বহুমুখী প্রতিভার কথা এতক্ষণ বললাম, তিনি আমাদের ও জগদ্বাসী সকল নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূয়সী উন্নতি করে গিয়েছেন। তাঁর নিরুপম সাহিত্য সৃষ্টি সকল আমাদের সৌন্দর্য ও রস-বোধকে পরিতৃপ্ত করেছে অনাবিল মাধুর্যে এবং আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভগবৎ প্রেমের অনির্বচনীয় আনন্দ হিল্লোলে। তাঁর তেজস্বিতা দ্বারা তিনি দেশ-মাতৃকার মলিন মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের পর রাজ উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বড়লাটকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার প্রত্যেকটি লাইনে ফুটে উঠেছিল ক্ষমতা প্রমত্ত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর উদ্দীপ্ত হৃদয়ের প্রতিবাদ এবং দীনদরিদ্র নিরপরাধ দেশ-বাসীদের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা। আজকে ভারতবর্ষ যে জগৎসভায় উচ্চ আসন অধিকার করবার সম্মান পেয়েছে, তার জন্যে আমরা যে ক'টি মহাপুরুষের কাছে ঋণী—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের সেই ঋণ স্বীকার করবার দিন আজকে এসেছে।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

শ্রীজগদীশ গুপ্তের

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও

৩খানি অপূর্ব রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

দিল্লী থেকে

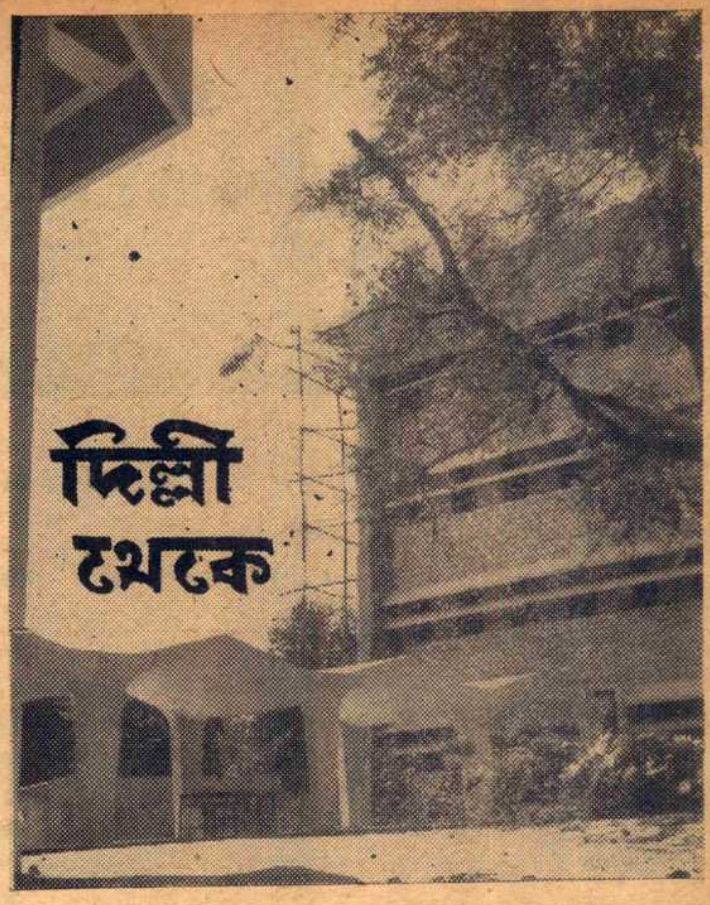

নয়াদিল্লীর রবীন্দ্র ভবন

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জন-চেতনার কথা বলতে গেলে যে নামটি সর্বপ্রথম মনে পড়ে সে নামটির সাথে দিল্লীর সাংস্কৃতিক প্রগতি ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনে স্বর্গত ডক্টর সুধীন সেনের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সুধীন সেনের বাসভবন হল 'দিল্লীর শান্তিনিকেতন'।

ডক্টর সেন দিল্লীতে প্রথম পদার্পণ করেন আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে।

তখনকার দিনে দিল্লীতে, শুধু দিল্লীতে কেন সমগ্র উত্তর ভারতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল একমাত্র বাঈজীদের নৃত্য ছন্দে। তাঁরাই নাচতেন, তাঁরাই গাইতেন, বিশেষ করে কাওয়ালী ও গজল।

সুধীন সেন অবাকভাবে চারিদিকে তাকালেন। সাথে সাথে তাকালেন সমভাবে বিস্মিতা নববধূ বীণা। এ কোন্ দেশী রাজধানী? দম যেন বন্ধ হয়ে আসে তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববরেণ্য; হলে কি হবে দিল্লীতে রবীন্দ্র গণচেতনা তখনও এসে পৌঁছোয় নি। দিল্লীতে বাঙ্গালী সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। সরকারী দপ্তর কলকাতা থেকে বদলি হয়ে এসেছে অনেক দিন আগে, সাথে নিয়ে বঙ্গসন্তান। সংস্কৃতিটা তাঁরা বোধ হয় তাড়াতাড়িতে সাথে আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুধীনবাবু দেখলেন রবীন্দ্রকৃষ্টি সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনারই বন্দোবস্ত নেই। এমন কি বাঙ্গালীদের একটা ক্লাবঘরও নেই!

বঙ্গীয় নাট্যসভা নামে একটা ছোট থিয়েটার পার্টি ছিল। পূজোর সময়ে তাঁরা মাঝে মাঝে দু'-একটা থিয়েটারও খাড়া করতেন। সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বই-ই অভিনীত হত।

ডক্টর সেন সর্বপ্রথম একটা ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করলেন। সেদিন দিল্লীতে রবীন্দ্রকৃষ্টির বাহক ও অগ্রদূত ছিলেন ডক্টর সুধীন সেন, শ্রীমতী বীণা সেন, সেন্টষ্টিফেন্স্ কলেজের দর্শনের হেড্ অব ডিপার্টমেন্ট অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কেও আলোচনা হত। ডক্টর সেনের বাসভবন ও অধ্যাপক নিশিকান্ত সেনের বাস-ভবনেই এই ঘরোয়া বৈঠক সীমাবদ্ধ ছিল। এ আলোচনার সাথে ছিল না কোনো জন-সম্পর্ক। কিন্তু সঙ্ঘ ছাড়া আলোচনা কখনও জমে ওঠে কি?

তাই ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো সিটি বেঙ্গলী ক্লাব। তাও সুধীন বাবুর বাড়ীতেই। এই সমিতির উদ্যোক্তাদের ভিতর ছিলেন সুধীন বাবুর অগ্রজ দিল্লীর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রকুমার সেন, পাঞ্জাব চেম্বার্স এ্যাণ্ড্ কমার্সের প্রমদা মুখার্জি, অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন, বীরেন গুপ্ত, রাসবিহারী সেন (আঁদুবাবু), সত্যচরণ সরকার আর ডক্টর সুধীন সেন।

দিল্লীতে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের প্রথম উদ্বোধন হয় 'ফাল্গুনী' মঞ্চস্থ করে। সেটা মার্চ উনিশশো ছাব্বিশ।

বহু বিদেশী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অবাঙ্গালী দর্শকবৃন্দ হতবাক হয়েছিলেন এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে।

ষ্টেজ ডেকরে বিশেষ সহায়তা করেন সারদা উকিল। তখনও ফাল্গুনীর স্বরলিপি প্রকাশিত হয় নি। তাই সুধীনবাবু স্থানীয় সুগায়ক মন্মথনাথ সেনকে পাঠালেন শান্তি-নিকেতন, গানগুলো তুলে আনবার জন্য। মন্মথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন স্নাতক। তিনি সাত দিনের ভিতর শান্তিনিকেতনের দিনু ঠাকুরের কাছ থেকে গানগুলো শিখে এলেন। আসার সময়ে যখন তিনি রবীন্দ্র-নাথকে প্রণাম করতে যান তখন গুরুদেব পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন, "তুই সাত দিনের ভিতর ফাল্গুনীকে দিল্লীতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিস?"

এদিকে নাটকের রিহার্সেল পুর্ণোদ্যমে চলছিল। "হবে জয়, হবে জয়" গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ মন্মথ একদিন রিহার্সেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে রবীন্দ্র ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন স্বর্গত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। শ্রোতৃবর্গের ভিতর শ্রীজওহরলাল নেহরুকেও দেখা যাচ্ছে।

মন্মথর গলার সাথে তুলনা দেওয়া চলে একমাত্র পল্ রব্‌সনের। ও জাতীয় কণ্ঠস্বর আজকাল দুর্লভ।

জুম্মা মসজিদের কাছে 'নিশাদ' হলে এই গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়। ছোট ছোট ছেলের দল হয়েছিল পারুল, বকুল, সুধীনবাবু নিজে হয়েছিলেন বসন্ত।

পর বৎসর অভিনীত হল "শেষ রক্ষা।" মেয়ের পার্ট করে রাজেন সরকার মেয়েদেরও অবাক করে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত কবি অতুল-প্রসাদকে নিমন্ত্রণ করে আনানো হয়েছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। তিনি সুধীনবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মেয়েটি কোথায় পেলেন?

দিল্লী সমাজে মিক্‌স্‌ড্ কাষ্ট তখন কল্পনার বাইরে।

সামাজিক নির্যাতনও কম হয় নি। সুধীনবাবু ছোট ছোট মেয়েদের নাচ শেখাতেন নিজের পায়ের সাথে তাদের পা বেঁধে। কটাক্ষ করে প্রবীণরা বলেছিলেন সেদিন "ছোক্‌রা ডাক্তার দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজটাকে উচ্ছন্নে দিল রে!"

উনিশশো ছাব্বিশ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসেবে প্রমথ চৌধুরী মশাই দিল্লীতে পদার্পণ করেন। সাথে ছিলেন ধর্মপত্নী ইন্দিরা দেবী।

সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে সুধীনবাবু মঞ্চস্থ করালেন ডাকঘর, ফাল্গুনী।

যমুনার তীরে কুদ্‌সিয়া গার্ডেন্স-এ ওপন্ এয়ারে অভিনীত হল 'ফাল্গুনী।' ডাকঘর দেখে সেদিন ইন্দিরা দেবী বলেছিলেন, "এ জিনিষ বাংলার বাইরে কখনও হয় নি। ডাকঘরের 'অমল' আমরা শান্তি-নিকেতনেও দেখি নি!" সেদিন দিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন উত্তর ভারতের সব খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকুমুদ, অতুল-প্রসাদ, অসিত হালদার। দিল্লীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো সমস্ত উত্তর ভারতের একটা অভিনব সংস্কৃতি-কেন্দ্র।

আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে দিল্লীতে সার্বজনীনভাবে কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তীর আয়োজন করেন সুধীন সেন। মীরাট, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটিয়ালা থেকে সব গুণী-জ্ঞানীদের জানানো হয়েছিল সাদর আহ্বান। লক্ষ্ণৌ-এর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ এসেছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর সেই আলোচনার আর তুলনা হবে না! পাতিয়ালা থেকে এসে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল সর্দার হৃষীকেশ ভট্টাচার্য। তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, "ওগো মা রাজার দুলাল গেল চলি।"

সেদিন মুষ্টিমেয় দিল্লী প্রবাসী বঙ্গসন্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা স্পন্দন ছিল, প্রাণে ছিল উৎসাহ, মনে ছিল আন্তরিকতা। আর আজ?

দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় উনিশশো উনপঞ্চাশে। সেবার ডক্টর সেন মঞ্চস্থ করান 'নবীন'। এতদিন নৃত্যশিক্ষা নিজেই দিয়ে এসেছিলেন। এবার সে ভার অর্পণ করলেন আপন কন্যা মালশ্রীর ওপর।

উত্তরকালে এই মালশ্রীই বার্লিনে "তাসের দেশ" অভিনয় করে জার্মানীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লীর পুজো বাড়ীতে লছমীনারায়ণ ধর্মশালায় অন্তত দশাধিক রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করেছেন সুধীন সেন।

দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা নতুন সাড়া আসে আজ থেকে ঠিক সাতাশ বছর পূর্বে কবিগুরুর দিল্লী

ডঃ সুধীন সেন : দিল্লীতে রবীন্দ্র জনচেতনার অগ্রদূত

আগমনে। শান্তিনিকেতনকে বাঁচাতে চ্যারিটি শো হবে, রিগ্যাল থিয়েটারে 'চিত্রাঙ্গদা'।

বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেল উৎসবের। অবাঙ্গালীদের

ভিতর সেদিন দেখা দিয়েছিল নব প্রাণস্পন্দন। ভারতের কাল্‌চারাল ইন্টিগ্রেশনের ইতিহাসে সেদিন মহা স্মরণীয় দিন।

দিল্লীতে গুরুদেবকে সম্বর্ধনার যে বন্দোবস্ত হয় তার সর্বপ্রথমটির আয়োজন হয় পিয়ার্সন সাহেবের বন্ধু সুলতান সিং-এর বাড়ীতে। ঠিক সুলতানের বাড়ীতে বললে একটু ভুল হবে। উৎসবটির আয়োজন করেন সুলতানের পুত্র রঘুবীরের বাড়ীতে। সুলতান সিং দিল্লীর ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর পুত্র রঘুবীর ছিলেন পিয়ার্সন সাহেবের ছাত্র। পিয়ার্সন সাহেব স্নেহ, ভালবাসা, পাণ্ডিত্য দিয়ে রঘুবীরকে হাতে পিঠে মানুষ করেছিলেন। পরে সুলতান সিং যখন শুনলেন পিয়ার্সন সাহেব তাঁদের ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন তখন তিনি বহু অর্থের বিনিময়ে এই বিদেশী তাপসকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি পিয়ার্সন সাহেবকে বলেছিলেন সম্পদ দিয়ে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে। কিন্তু পিয়ার্সন সাহেব কি করেছিলেন তা আমরা সবাই জানি। সুলতান সিং পরিবারের সাথে তাই শান্তিনিকেতনের একটা প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগ ছিল বহুদিনের। এঁদের মনে একটা কৌতূহলও কম ছিল না। "যে ধনে হইয়া ধনী" পিয়ার্সন সাহেব মণিরেও মণি মানলেন না, সুলতান সিং পরিবার সেই মণির খানিক 'মাগিল নত শিরে'। সেই মণির সন্ধানে বেরুলো। তাই সুলতান সিং তনয় রঘুবীর যখন দিল্লীর বিখ্যাত বিদ্যামন্দির মডার্ণ স্কুলের প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করেন তার দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি কবিগুরুকেই জানান সর্বপ্রথম নিমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। নব বিদ্যামন্দির উপাসনা-গৃহ দ্বারোন্মোচনের উৎসবে যে যজ্ঞের আয়োজন হয় কবি স্বয়ং করেছিলেন সেই যজ্ঞের অগ্নি রক্ষা। তাই দিল্লীতে এবারের পদার্পণ সম্পূর্ণ নতুন নয়।

কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা'র ডিরেকশন দিচ্ছেন।

কনট্ প্লেসের নেহরু-পার্কের সামনে রিগ্যাল্ থিয়েটার হলে চিত্রাঙ্গদা অভিনীত হল ঠিক বসন্ত সমাগমে। মার্চ মাসের শেষের দিকেই হবে। সালটা বোধ হয় উনিশশো ছত্রিশ।

কবি সেদিন দিল্লী এসেছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য ফাণ্ড তুলতে। দেশের কি দুর্দিন! গুরুদেব বলে যাঁকে সবাই ডাকেন, সারা হিন্দুস্থানের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারী আপন হৃদয়-মন্দিরে যাঁকে স্বেচ্ছায় গুরুর পদে অভিষিক্ত করেছেন তিনি প্ল্যাটফরমের উপরে স্বয়ং অংশগ্রহণ করবেন এ নৃত্যনাট্যে! কেন? লোক আকর্ষণে। দেশের সংস্কৃতির কতখানি অধঃপতন। ঠিক সেই হিন্দী ভজনটার কথা মনে পড়ছে না কি, যার সারমর্ম হল—ক্ষীর নিয়ে নিয়ে গোয়ালা ঘরে ঘরে হাঁক দিচ্ছে, শুঁড়ির দোকানে বসতে দেবার জায়গা নেই।' লোকেদের দোষ দিয়ে লাভ কি? এটা পরাধীনতার গ্লানি। স্বাধীন ভারতে আজ সরকারের কাছে একটা নতুন বিদ্যামন্দিরের পরিকল্পনা পেশ করলেই অর্থমঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সেদিন অর্থ সংগ্রহটা বেশ কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার ছিল না কি?

"কি প্রয়োজন এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার পাবলিক থিয়েটার হলে নৃত্যানুষ্ঠানের? তুমি জাতির গুরুদেব, তুমি পঁয়ত্রিশ কোটি হিন্দু-মুসলিম, শিখ, ইশাহীর গুরুদেব সে কথাটা একেবারে ভুলে গেলে? এরকম ভাবে আমাদের অপমান করার মানে কি?"

জাতির জনক গান্ধীজী এসে প্রতিবাদ জানালেন। সাথে ধর্মপত্নী কস্তুরবা।

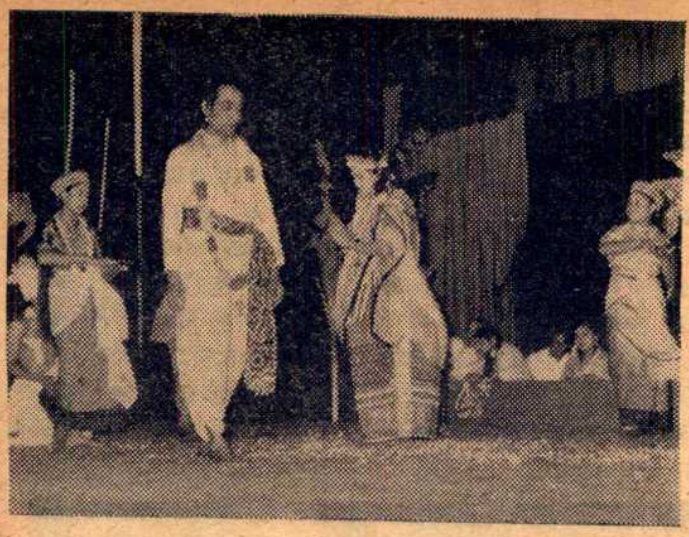

শুভজন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীতে মঞ্চস্থ "চিত্রাঙ্গদার" একটি দৃশ্য

একেবারে দু'জনেই এসে হাজির। এ হতে পারে না। দেশ এখনও স্বাধীন হয় নি সত্য, তবে দেশবাসী আজও পথের ভিখিরি নয়।

ষাট হাঁজার টাকার একখানা চেক দিয়ে গান্ধীজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে উত্তর ভারতের সফর বন্ধ করে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত, বিশ্বপথিক শান্তির আশায় আপন আশ্রমে ফিরে গেলেন।

স্বাধীন ভারতের রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে বসে মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাবি স্বাধীনতাটা যদি একটু আগে আসতো। যাই হোক, শান্তিনিকেতন রয়েছে। তাকে গড়েই, তাকে উন্নত করে, তাকে বিশ্বমহামানবের মিলনকেন্দ্র করে সভ্য জগতের প্রাণকেন্দ্র করেই মহামানবের ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়। নান্যো পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কবি মাত্র সাতটি দিন দিল্লীতে ছিলেন।

দিল্লীর বাঙ্গালীদের জীবনের স্মরণীয় সাতটি দিন।

মাঝে একদিন মিরাট যেতে হয়েছিল। মিরাটে মিলিটারী এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের দপ্তর। দপ্তর ভর্তি বাঙ্গালী। তাঁদের নিজস্ব দুর্গাবাড়ী আছে। আছে পাকা নাটমন্দির। তাঁরা ছাড়বেন কেন? এতো কাছে এসেছেন গুরুদেব, আর একবার মিরাট যাবেন না! তাকি হয়? মিরাট থেকে এসে সবাই প্রায় সত্যাগ্রহ সুরু করে বসার জোগাড়। তাই গান্ধীজীর কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেন শুধু মিরাটে গিয়েই দিল্লী ফিরে তিনি শান্তিনিকেতনে যাবেন।

মিরাটে বিরাট আয়োজন।

মিরাট কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী, মিলিটারী এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের কর্মচারিবৃন্দ, কালীবাড়ীর স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ (মিরাটের কালীবাড়ী প্রায় দু'শত বছরের প্রাচীন এটা সাবজনীন নয়, এর স্বত্বাধিকারী একজন প্রাচীন বঙ্গসন্তান, আগ্রাতেও ঠিক তাই) বেগমব্রীজের পাশে লখ্‌পত কোয়ার্টার্সের অধিবাসিবৃন্দ সবাই ঝেঁকে এসেছিলেন সেদিনের মহা উৎসবে।

এই তো গেল মিরাটের ঘটনা। দিল্লীর কি খবর? দিল্লীর উৎসব বর্ণনায় সঙ্কোচ কেন? শুধু সঙ্কোচ নয় মর্মবেদনা। বলতে আজ লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে অপমানে, লাঞ্ছনায় পদে পদে, পলে পলে, মুহূর্তে মুহূর্তে বিদেশী শাসক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে যে আমরা পরাধীন। পরাধীন অধিবাসীর আবার যথেচ্ছা সমারোহ কিসের? আজ দিল্লী কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্রায় প্রতি মাসেই একাধিক সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়ে থাকে বিদেশী মাননীয় অতিথিদের সম্মানে। সেদিন বিদেশী শাসনাধীন ভারতের রাজধানীর মিউনিসিপ্যাল অথরিটিস্-এর বিদেশী কর্ণধার কবির সংবর্ধনা সভায় আপত্তি তোলেন! তা তো তুলবেনই। শুধু তো স্কুলের অমনোযোগী ছাত্ররাই নয়। বহু মূর্খই কবির "ভারততীর্থ" কবিতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। সেদিন দিল্লীর নগর কর্তাদের ইতিহাসে যে কলঙ্কপাত হয়েছিল, ইতিহাস যতদিন থাকবে, সভ্যতা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ কলঙ্ককাহিনী সেই বিদেশী কর্মকর্তার ভীরুতা ঘোষণা করে আসবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, সেদিন দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির সেই সভাগৃহ পরিত্যাগ করে যে বঙ্গললনা তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, উত্তরকালে তিনিই দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়রের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। আমি অরুণা-আসফ আলীর কথাই বলছি। দিল্লীর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাই স্বতন্ত্রভাবে সংবর্ধনার আয়োজন হল ঘন্টাঘরের সামনের কুইন্‌স্ গার্ডেনে।

এই সেই দিল্লী, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোহিনূরের দেশ পরাধীনতার ক্লেদমুক্ত দিল্লী শহরেই এই সেইদিন দেশ-বিদেশের মনীষিবৃন্দ একত্রিত হয়ে বিজ্ঞানভবনে জানালেন সেলাম যুগের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরকে তাঁর শততম শুভ জন্ম-জয়ন্তী দিনে? মহা বাণী ব্যর্থ যায় নি। এসেছে আর্য, এসেছে অনার্য, এসেছেন বিদ্বান, এসেছেন গুণী সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তাঁদের সম্মান জানাতে, শুধু তাঁদের নয়, এসেছেন জানাতে তাঁদের দেশের লক্ষ, কোটি জনসাধারণের আন্তরিক সাদর প্রীতিপূর্ণ প্রণতি। দিল্লী কর্পোরেশনের সেই ভীরু প্রাক্তন সরকারী সাহেব চেয়ারম্যানকে পাঠানো হয়েছিল কি এই বিশ্বমহামানবের মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ? উচিত ছিল বোধ হয় পাঠানো।

দিল্লীতে সাত দিনে যে উৎসব আয়োজিত হয়েছিল তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া কঠিন। মিরাট থেকে ফিরে

আসার দিনই স্থানীয় হিন্দু কলেজের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে গুরুদেবকে জানানো হয় আন্তরিক সংবর্ধনা। হিন্দু কলেজের এই আয়োজনের পিছনে ছিল স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের অক্লান্ত পরিশ্রম; পরিশ্রম সবাই করতে পারেন, আজকাল যেটা বিরল সেটা হল আন্তরিকতা। হিন্দু কলেজের আয়োজনের পিছনে সেটা ছিল ষোলো আনায়।

সিটি বেঙ্গলী ক্লাবের পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানাবার বিরাট আয়োজন হয় দরিয়াগঞ্জের সরস্বতী ভবনে। নৃত্য-সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করান ডক্টর সুধীন সেন। কবির শরীর তখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। শত সহস্র বাঙ্গালী সে সভায় একত্রিত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কবি সে সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

* * *

গত পঁচিশটি বছর ধরে কত সুরেই না কবির জন্মজয়ন্তীর শুভ সঙ্গীত শুনলাম এই দিল্লী মহানগরীতে।

বেয়ার্ড রোডের নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ব মনীষী মহা সম্মেলনের উৎসবের কোনোটাতেই দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী অর্ঘ্য নিবেদনে কৃপণতা করে নি।

কবির এ জন্মজয়ন্তীর দিনগুলো দেখতে দেখতে যেন কেটে গেল, নূতনের ডাক একটা গলায় শুনতে না শুনতেই যেন আরেকটা নতুন গলা এসে জানিয়ে গেল আরেকটি বছরের আগমনবার্তা। এই তো সেদিন রীডিং রোডের (আজকাল এর নাম হয়েছে মন্দির মার্গ) সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাবে গুরুদেবের জন্মজয়ন্তীতে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সবাই মিলে শুনছিলাম প্রবীণ সাহিত্যরসিক সুব্রত চক্রবর্তীর আবৃত্তি! তা হবে বছর কুড়ি আগে। মনে নেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় প্রিয়রঞ্জন সেনের (ইনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাগ্নে ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্র ছিলেন) কণ্ঠ:

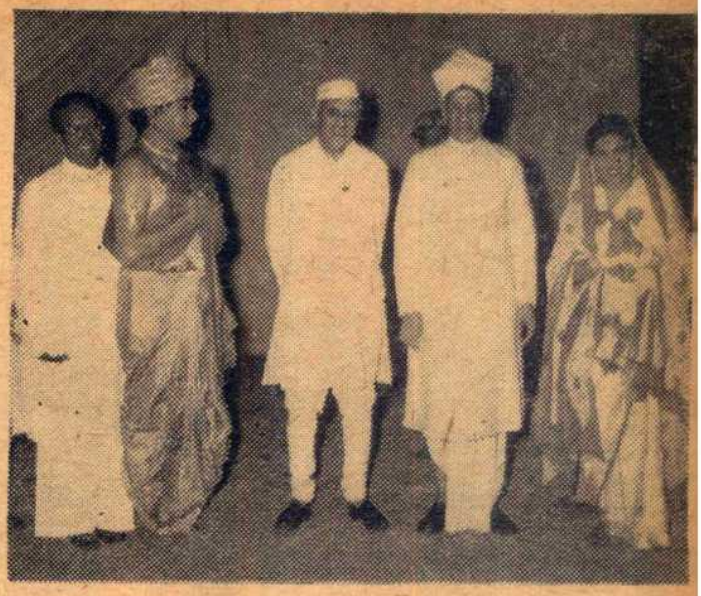

নয়াদিল্লীতে উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্কর 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যছন্দে অভিনীত করেন। অভিনয়ের পর শ্রীজওহরলাল নেহরু ও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁদের অভিনন্দিত করেন

"মহা আশংকা জপিছে মৌন অন্তরে
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

কালবৈশাখীর ঝড়েতে বাতি নিবে গিয়েছিল। মাইক্রোফোন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু সভা ভাঙ্গে নি। সেই আবৃত্তির আমেজ আজও আমার কানে লেগে রয়েছে। প্রবোধ সান্যাল মশাই-এর আবৃত্তি শুনেছি, শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শুনেছি, হারীন চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি শুনেছি, প্রিয়রঞ্জন সেনের সে আবৃত্তির যেন তুলনাই নেই। প্রিয়রঞ্জন সন্ন্যাসী হয়েছেন তাও আজ বছর আঠারো কুড়ি তো হবেই!

রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিউদিল্লী কালীবাড়ীতে বাংলার কোনো প্রান্তের এ্যাক্সেন্টের প্রতি অবিচার হয় নি! গুরুদেব সভায় উপস্থিত থাকলে রোদনাশ্রু দিয়ে এই সর্বাঙ্গ-কণ্ঠ মিলনকে গ্রহণ করতেন কিংবা আনন্দাশ্রু দিয়ে এর অভিষেক করতেন জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে "হে নূতন" গানটির ওপর অত্যাচার কম হয় নি!

দিল্লীতে গুরুদেবের যে সকল রচনা মঞ্চস্থ হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ এই অল্প সীমিত জায়গায় দেওয়া মুস্কিল। এই অভিনয়গুলো সাংস্কৃতিক জ নিশ্চয়ই নতুন সাড়া এনেছে। প্রবাসী বঙ্গসন্তান রবীন্দ্রন সবচেয়ে শক্ত বইও দিল্লীর অভিনীত হতে দেখেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মিলে করেছিলেন 'তাসের দেশ' প্র বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনীর রাইসিনা স্কুলের প্ল্যাটফ শ্যামাপ্রসাদ তখন কেন্দ্রীয় ছিলেন। মনে আছে, বিশেষ জ সভাতে না গিয়েও তিনি শেষ এই অভিনয় উপভোগ করেছি বিশ্ব - বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছা চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বৈ খাতা, একাধিক বার মঞ্চস্থ করে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে রামজাস কলেজের ছাত্রবৃন্দ নি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

দিল্লীতে 'মিক্সড্ কাষ্ট' সূত্রপাত হয় গুরুদেবের 'শে নিয়ে। উদ্যোক্তারা কিন্তু শে করতে পারেন নি। রবীন্দ্র-ভ দিল্লীতে বেশ জনপ্রিয় সাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠ মুকুলে ঝরে গেছে।

অবাঙ্গালীদের ভিতর প্রতিষ্ঠান গুরুদেবের অনেক

মুক্তধারার" অভিনয় দেখছেন শ্রীজওহরলাল নেহরু ও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

স্থ করেন। 'তাস কি নগরীয়া' ধ হয় তিনবার রিপিট করতে য়ছিল। এইতো সেইদিন বৈজয়ন্তী-ার 'চিত্রাঙ্গদা' দিল্লীর সাংস্কৃতিক বনে এনে দিল একটা অভিনবত্ব। য় শঙ্কর অমলা শঙ্কর দেখালেন মান্য ক্ষতি' আপন নৃত্য ছন্দে। র রাধাকৃষ্ণণ, প্রধান মন্ত্রী নেহরু ই সে অভিনয় উপভোগ করলেন। নের পর দিন 'কাবুলিওয়ালা' লছিল স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে। াঙ্গালী দর্শকে হলঘর ভরে গেছো শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞান নে অভিনীত হয়েছে 'মুক্তধারা'। কদেবের 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘর' তো ভিন্ন ভাষায় অভিনীত হয়েছে— দী, মারাঠী, গুজরাতি অনুবাদ র ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুজরাতি অনুবাদের কথা উঠলেই মনে পড়ে স্বর্গীয় বাচুভাই শুক্লা সাহেবের কথা। বাচুভাই গুরুদেবের অন্তত দশ বারোখানা বই গুজরাতিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি থাকতেন রাজঘাটের অদূরে দরিয়া-গঞ্জে। মাঝে মাঝে আশ্রমের প্রাক্তন স্নাতকদের বৈঠক বসত ওঁর বাড়ীতে। সেখানে সাধারণত থাকতেন সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব, মাপারা সাহেব ও আরও অনেকে।

দিল্লীর আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কবির জন্ম-জয়ন্তীর যে উৎসবের আয়োজন হয় তার অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয় পতৌদি হাউসের সামনের লেডী আরউইন স্কুলে। বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ মশাইর সভাপতিত্বে একবার বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয়। সভায় 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশিত হয়। নৃত্য হয় নি, হয়েছিল শুধু সঙ্গীত। শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য পাঁচশো কপি বই তাড়াতাড়ি ছাপানো হয়েছিল। এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রামে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল এই পুস্তক বিতরণের জন্য। উদ্যোক্তাদের ভিতর ছিলেন সৈয়দ সাহেব, শ্রীমতী বন্দিতা কৃপালনী, শ্রীযুত মাপারা।

ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনার ডঃ সমর সেনের বাসভবনে একাধিকবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিল্লীর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা দপ্তর প্রাঙ্গণে কয়েক বছর বেশ আড়ম্বরের সাথে গুরুদেবের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। এই উৎসবে বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছে। মনে পড়ে ডঃ শশধর সিংহের বক্তৃতা, প্রভাকর মাচওয়ের সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা।

দিল্লীর 'টেগোর সোসাইটি'র পক্ষ থেকে যে সভার আয়োজন হত সেটা অনুষ্ঠিত হত ওয়েষ্টার্ণ কোর্টে। টাউন হলের পিছনে ওয়াই, এম, সি-এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একাধিকবার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন হয়। স্বর্গত অধ্যাপক পরিমল রায় (আই, এ, এস সার্ভিস ট্রেণিং স্কুলের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন) মেটকাফে হাউসে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্বোধন করেন। আমেরিকাতে যাবার সময়ে তিনি শেষ কথায় আমাদের জানান, সেখানে গিয়েও তিনি রবীন্দ্র সাহিত্য আলো-

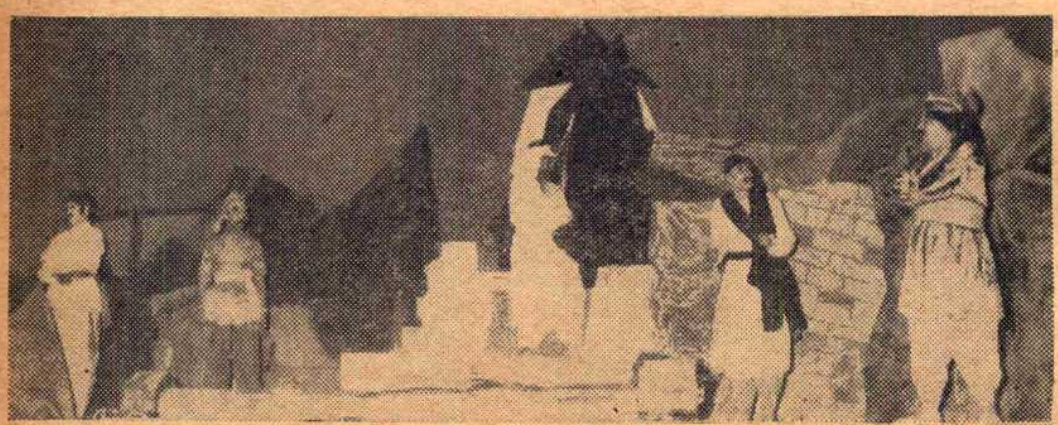

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞানভবনে মঞ্চস্থ "মুক্তধারার" একটি দৃশ্য

চনার পাঠচক্র খুলবেন। আমেরিকাতেও এবার বেশ আড়ম্বরের সাথেই রবীন্দ্রজয়ন্তী হল। অধ্যাপক রায় কিন্তু আমেরিকাতে গিয়েই দেহত্যাগ করেন।

দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী একাধিকবার বাংলাদেশ থেকে নিমন্ত্রিত করে এনেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দকে। একবার খুব মজা হয়েছিল। সভার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে অথচ কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছোচ্ছে না। কি বিপদ। সবাই প্রায় অধৈর্য হতে চলেছে। এমন সময় (মনে নেই ষ্ট্রেট ষ্টেশন থেকেই কিনা) প্রধান অতিথি এসে হাজির হলেন। প্রমথনাথ বিশী সাহেবের সেই বক্তৃতার অংশ আজও দিল্লী প্রবাসী বহু বাঙ্গালীর মনে আছে, বিশেষ করে তাঁর হিউমার।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

নিউদিল্লী টাউন হলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন হয়। অবাঙ্গালী শ্রোতাই বেশী। তিন চারজন বিদগ্ধ গুণীর বক্তৃতার পর উঠলেন সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন বসু। ঠিক তাঁর আগেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক বানারসী দাস চতুর্বেদী—হিন্দীতেই তিনি বললেন। অধীর আগ্রহে সবাই অধ্যাপক বসুর বক্তৃতার জন্য এতক্ষণ বসেছিলেন। একটা লাইন শুধু ইংরিজীতে বলে তিনি গড় গড় করে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। সভার অনেকেই সে বক্তৃতা বুঝেছিলেন। শুধুমাত্র

গুজরাতিতে কবিগুরুর 'বিসর্জন' অভিনীত হয় নয়াদিল্লীর সামার ড্রাম ফেষ্টিভ্যালে। অভিনয়ের অংশগ্রহণকারীর একটি গ্রুপ ফটো

রবীন্দ্রনাথকে অরিজিন্যাল পড়ার জন্য বহু সাহিত্যপ্রেমী দিল্লীবাসী বাংলা শেখার প্রয়াস করে থাকেন।

দিল্লীর হিন্দী সাংবাদিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যে সভার আয়োজন হয় তাতে নৃত্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের বেশী আয়োজন থাকে না। সেখানে একাধিক বক্তাকে রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি।

হিন্দী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক দেবেন্দ্র সত্যার্থী অনেকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বেশভূষায় তিনি সর্বদা রবীন্দ্রানুগামী। লম্বা চুল আরও লম্বা দাড়ি। আলখেল্লা পরে তিনি যখন বাংলা আবৃত্তি করেন তখন দূর থেকে মনে হয় যেন গুরুদেবের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বরটুকু একটু কড়া। সেটা বোধ হয় পরিপার্শ্বের ফল। রাজধানীতে কড়া গলাতেই হুকুম চালাতে হয় যে!

দিল্লীতে রবীন্দ্রভক্তের অভাব নেই। উৎসাহ নিয়ে যাঁরা গান্ধী ময়দানে গুরুদেবের স্মরণে সভা আহ্বান করেছিলেন তাঁদের ভিতর আজ দু'জনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। একজন সুলতান সিং তনয় রঘুবীর, অপরজন রঘুনন্দন সরল। দিল্লীর সাথে গুরুদেবের জীবনের আর একটা ঘটনা বিশেষভাবে জড়িত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সে স্যর মরিস গয়ারকে দিল্লীর আশু বলা চলে। এই ঘটনার সাথে তি ছিলেন জড়িত। আরও এ ছিলেন, তিনি সগৌরবে এ কা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রন দর্শন' পুস্তকের সাম্প্রতিক সংস্কর তাঁর নাম ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ

কবির দেহাবসানের ঠিক এক পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থিরীকৃত হল যে গুরুদেবকে ডক্ট ডিগ্রী দিয়ে তাঁরা কবিকে ও নিজে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানিত কর কবি তখন খুবই অসুস্থ। বিশ্ববিদ্ কর্তৃপক্ষ তখন ঠিক করলেন বিদেশযাত্রা গ্রহণ করতে না পা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনে বিশেষ সমা উৎসব অনুষ্ঠিত করে এ উপাধি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি হিসাবে সেদিন মনোনীত হ অকস্‌ফোর্ডের প্রাক্তন সদস্য স্যার ম গয়ার। স্যর মরিস দিল্লী বিশ্ব লয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

স্যর মরিস অনুষ্ঠানের মন্ত্র উচ্চ করলেন ল্যাটিনে। গুরুদেব তার জ দিলেন সংস্কৃতে।

দিল্লীর সাথে শান্তিনিকেত সেদিন প্রীতির বন্ধন হল দৃঢ়তর।

রবীন্দ্র-গীতি পদ্ধতি

* সুরেশ চক্রবর্তী *

ভারতীয় সঙ্গীতে বহু সংখ্যক বন্দেজী গান আছে। এই সব গানের সুরবরচনা বিশেষ কতকগুলি নিয়ম বা ছাঁচের মধ্যে বন্দী। খেয়াল-গায়ক নিজ নিজ ঘরাণার কৌশল অবলম্বন করে এই সব গানের গায়কীতে এবং পরিবেশনে অভিনবত্ব যোজনা করতে পারেন, কিন্তু এদের আসল বনেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা আনতে পারেন না,—যদি কেউ আনেন তবে আর যা-ই হোন, উঁচু দরের গায়ক বলে পরিচিত হতে পারেন না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর প্রতিটি উপাদানই বন্দেজী এবং বনেদী, সুতরাং অপরিবর্তনীয়। উপাদান বলতে বুঝায় এর কথা, সুর আর সুরের রূপায়ণ। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ কথার অংশটা নিরাপদ, কারণ তা ছাপার অক্ষরে লেখা আছে,—ওতে অদল বদল বা প্রক্ষেপের ভয় নেই। দ্বিতীয় উপাদান সুর। অনেকের মতে সুরের দিকটাও নিরাপদ হয়ে এসেছে, কারণ ছাপার অক্ষরে অধিকাংশ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকিগুলোও শিগ্‌গিরই ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো গানে একাধিক সুরযোজনা করেছেন, এবং দুই একাধিক সুরই স্বরলিপির মাধ্যমে সহজপ্রাপ্য। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, স্বরলিপি সুরের কাঠামোটারই খোঁজ দিতে পারে, তার আসল রূপের খোঁজ দিতে অনেক ক্ষেত্রেই সে অপারগ। তার মানে স্বরলিপির সাহায্যে আমরা গানের বন্দেজ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেতে পারি, কিন্তু তার বনেদটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও করতে পারি।

সুতরাং তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ সুরের রূপায়ণই হচ্ছে আসল বস্তু। তারই উপরে নির্ভর করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সত্যিকারের রূপ। এই রূপ যাঁর আয়ত্তে না এসেছে তিনি তথাকথিত জনপ্রিয় গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে থাকলেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যোগ্য গায়ক বলে বিবেচিত হতে পারেন না। এই শ্রেণীর কোনো কোনো গায়ক রবীন্দ্রনাথের গানে নিজের কল্পিত অলংকার প্রয়োগ করে তাকে সুন্দরতর (?) করতেও চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ধরণের প্রচেষ্টাকে নিজের কানে শুনেও তাঁর সমর্থন জানান নি। মোটকথা তিনি তাঁর সুরে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার কাউকেও দেননি। কাজেই দেখতে হবে তাঁর গান তিনি কি ভাবে গাইতেন, কোন্ কোন্ উৎস থেকে উপাদান আহরণ করে তিনি তাঁর গানের সুরগুলিকে সাজিয়েছেন এবং গানের পরিবেশন সম্বন্ধে অসংখ্য বার তিনি কি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসল রূপটি যে সর্বত্র রক্ষিত হয় না তার সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তিনি একস্থানে বলেছেন, "এমন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি না বুঝতে পারি না। মনে হয়, কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন আমার নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য।" অসহ্য শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নয়, অসহ্য তাঁদেরও পক্ষে যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধ রূপটিকে বজায় রাখতে চান।

এই বজায় রাখার কাজটা বজায় রাখবার একটা সশ্রদ্ধ ইচ্ছার ওপরেই নির্ভর করে না। প্রথমেই দেখতে হবে গানের আসল রূপের সন্ধান পাওয়া যাবে কোথায়। এ প্রশ্নের এক সহজ উত্তর হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখ থেকে বা তাঁর বিশ্বাসভাজন গায়কগণের মুখ থেকে গান শেখা। গান, কীর্তন হোক, ধ্রুপদ খেয়াল হোক আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতই হোক, গুরুর কাছে শিখতে হবে। এতে একলব্যের স্থান নেই। গান-বিদ্যা যদি গুরুমুখী বিদ্যা হিসাবে আয়ত্ত না হয়, তাহলে তার ফল যা হয় তার সাক্ষী প্রত্যেক মর্মজ্ঞ শ্রোতা। সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে এবং তার পরে তার পরবর্তী পুরুষে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গানের মূল রূপের মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন ঘটবে—সে পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং অলঙ্ঘ্য। কিন্তু বর্তমান যুগে—যখন গুরুদেবের স্মৃতি অধিকাংশ মানুষের মনে অম্লান রয়েছে—এই যুগের মধ্যেই যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তি টলতে আরম্ভ করে, তবে সেটা হবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, উভয়ের পক্ষেই অমার্জনীয় অপরাধ। গুরুদেব অন্যত্র বলেছেন, "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়।"—এই পর্যন্ত বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, "তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি," তাঁর এই আশা নিরর্থক হবে না, যদি তাঁর গানের অন্তর্নিহিত ভাব, রস এবং পরিবেশের প্রতি আমরা সজাগ থাকি।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, দু' একজন ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অপরিমিত সংখ্যক কারবারীদের এইসব বিষয়ে সজাগ থাকতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় তাঁর অনেক গান দরদের আর রসের অভাবে ষ্টিম-রোলারের তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এর প্রতিকারের উপায় আছে কি? আছে বৈ কি? কিন্তু সেটা অবলম্বন করবে কে? সবাই যে যেন তেন প্রকারেণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য উৎসুক—সে সঙ্গীতের মূল ধারা আর বিশুদ্ধ পরিবেশন রীতির দিকে মন যায় ক'জনের? গানের শিক্ষকদের কাছে আবেদন নিবেদনে ফল হবে না, কারণ তাঁরা যে যার অভিমত আর কর্মধারায় অচল অটল। তবে যদি একজন দরদী রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীরও সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাকেই লক্ষ্য করে এখানে দু'চারটি কথা বলব। পছন্দ হলে তিনি গ্রহণ করবেন, আর পছন্দ

না হলে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করবেন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে এবং সাহিত্যে হয়ত বিশ্বজয় করেছেন, নৃত্যে, নাট্যে হয়ত তাঁর সৃষ্টি অভূতপূর্ব, দর্শনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ধর্ম আলোচনায়, গল্পে, উপন্যাসে হয়ত তার রচনা অতুলনীয়, এই সব ব্যাপারেই তিনি সমগ্র বিশ্বে এমন একটি স্থান অধিকার করেছেন যার ওপর কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতি দাবী উপস্থিত করতে পারে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রটি একেবারেই পৃথক,—তাঁর কথার বা কাব্যের অংশ সার্বজনীন, সর্বকালীন হতে পারে! কিন্তু তাঁর সুরের অংশটা পুরোপুরি মাত্রায় বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। কোনো গানে হয় ত একটু দক্ষিণী বা মারাঠী খোঁচ আছে, কোনো গানে আবার হয় ত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজও ক্ষণকালের জন্য উঁকি মেরেছে। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে ওতে যা কিছু উপাদান আছে, সবই বাংলা দেশেই প্রাপ্য এবং একমাত্র বাংলা দেশেই। গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে বাঙালী, শুধু তাই নয়, বোধ হয় ষোল আনার চেয়েও একটু বেশি পরিমাণেই বাঙালী — তার মানে ষোল আনা বাঙালী বলতে আমাদের মনে সাধারণত যে ধারণাটা জাগে সেটা বাংলা দেশের ভাবমূর্তির একটা অসম্পূর্ণ চিত্র, রবীন্দ্রনাথের গানে বাংলার সুরের দিকটা একটা পরিপূর্ণ প্রতিকৃতিতে পরিণতি লাভ করেছে। আমরা যারা আজ বাংলা গানের অনেক অধুনা বিস্মৃত রূপের খবর রাখি না, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সেই সব সুরেরও অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলার সেই সব বিস্মৃত সুর তাদের পরিপূর্ণ রস আর ভাব নিয়ে নূতন করেই যেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের সচেতন করতে সাহায্য করে। আর তারই ফলে বাংলার সেই অর্ধবিস্মৃত ভাবমূর্তির রূপ ফুটে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

কথার বাঁধুনি, লালিত্য, তার ভাব এবং অর্থগৌরব, পদের অন্তর্নিহিত রস, সেই রসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সুরযোজনা, গতি বৈচিত্র্য বা ছন্দ, অনুকূল উচ্চারণভঙ্গী কণ্ঠস্বরের কমনীয়তা আর তা ছাড়া এই সবগুলি উপাদানের সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায় —এইগুলিই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গানের লক্ষণ। রবীন্দ্রেতর সঙ্গীতে আমরা অনেক সময়েই এই সব উপাদানের মধ্যে একটির বা একাধিকের অভাব লক্ষ্য করি, অথচ সেটাকে খুব বেশি দোষের বলে মনে করি না। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতে যেখানে এই সব উপাদানের একটিও বাদ পড়ে, সেইখানেই যেন একটা মস্ত বড় অভাবের সৃষ্টি হয় বলে অনুভব করি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে কয়েকটা স্থূল সত্যের দিকে আপনা হতেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। প্রথম কথা, যা আগেই বলেছি, গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণমাত্রায় বাঙালী,—তি তাঁর সঙ্গীত রচনায় যে সব উপক আহরণ করেছেন তাও বেশির ভ বাংলা গান থেকে। বাংলা গ চিরকাল কাব্যধর্মী, আর সুরের ক্ষে সাবলীল। অবলীলাক্রমে এ স্বাভাবিক ভাবে যে সুরের কাজ গল বেরোয় না—খাঁটি বাংলা গা কোনো কালেই তার স্থান ছিল ন এই উপলক্ষে দু' একটা উদাহ দিলেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বু যাবে।

যাঁরা নিধুবাবুর টপ্পা, শ্রী কথক রচিত বাংলা গান, পুরো ভঙ্গীর শ্যামাসঙ্গীত এবং অন্যান্য তথ কথিত প্রাচীন বাংলা গান শুনেছে তাঁরাই জানেন হিন্দী টপ্পার ঘনসন্নিবি জমজমা তান বাংলায় এসে কি ভা চেহারা বদলে ফেলেছে, বাং

টপ্পার কাজে জমজমা অবলম্বন করেছে সাবলীলতা, হিন্দী টপ্পার কষ্টসাধ্য কসরতিকে বাদ দিয়ে। কেন এমন হ'ল?—নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পাকেও আমরা টপ্পাই বলি, অথচ ওস্তাদি টপ্পার তানরীতিকে বর্জন করা হ'ল কেন? এর একমাত্র উত্তর, বাঙালীর ধাতে গান খুব স্বাভাবিক ভাবেই সহ্য হয় কিন্তু কসরতি গান সেখানে অচল। আমদানী করা টপ্পা সেই পরিমাণেই গৃহীত হ'ল, যে পরিমাণে তার অনুকূল পরিবেশ আগে থাকতেই বাংলার নিজস্ব গানের ক্ষেত্রে ছিল তার প্রমাণ, খাঁটি ভাটিয়ালি গানে এই শ্লথ গতি ও তানের অস্তিত্ব আছে। প্রাচীন যাত্রার জুড়িগানেও এই তান শুনতে পাওয়া যেত, প্রাচীন বৈঠকী গানে হোলি গানেও তা লক্ষ্য করা যেত। এই সব কারণেই টপ্পার আমদানী সহজ হয়েছিল এবং এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরে মাঝে মাঝে এই ধরণের তানের প্রয়োগ করেছেন।

আসলে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নূতন কিছু করেন নি,—যে বিশেষ প্রকৃতির তানের কাজটি বাংলা গানের আসর থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিল, তিনি সেই কাজের মধ্যেই পুনর্জীবন দান করলেন। যে বাংলা গান ক্রমে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছিল তাকে তিনি আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বাংলা গানের আর একটি চিরাচরিত ধর্ম হচ্ছে তার কথা আর সুরের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গীভাব রক্ষা করা। সাধারণ মেঠো গান থেকে সুরু করে বিশিষ্ট নিয়ম রীতি সম্মত কীর্তন পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর বাংলা গানের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে এই বাঙ্গালীয়ানা রক্ষা করেছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও তাঁকে নূতন কিছু করতে দেখা যাচ্ছে না। একেও আমরা গানের কাব্যধর্মিতারই অন্যতম নমুনা হিসাবে গ্রহণ করব। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই গান কাব্যধর্মী হয়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায় কাব্য এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে যার তুলনা শুধু বাংলায় নয়, সারা বিশ্বের কোনো অঞ্চলেই নেই।

যাহোক বাংলার গীতিধারাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনা আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও দুটি বিষয়ে তাঁর সৃষ্টি একেবারে অভিনব। একটি, সুরের সঙ্গে অজস্র প্রকারের ছন্দ-প্রয়োগ, আর অপরটি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কণ্ঠশৈলী।

ছন্দের সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্যের কথা বোধ হয় আমরা ভুলেই যাচ্ছিলাম। ওস্তাদি-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অধিকারীদের মুখে মাঝে মাঝে এইরকম কথা শুনেছি যে, বীররসের ব্যাপারে ঝাঁপতালটি বেশ উপযোগী; তাই উদ্দীপনাপূর্ণ কথায় সাধারণত হিন্দী সাদরা গান রচিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু কাজের বেলায় অনেক স্থলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রমও বেশ ঘটে থাকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোনো স্থানেই কিন্তু এমন কথা বলতে পারা যায় না যে, এই গানের ছন্দটি বদলে এরকম করলে আরো ভাল হ'ত। তা ছাড়া একই গানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ছন্দপ্রয়োগের সার্থকতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রবন্ধগীতের বিভিন্ন কলিতে যে নানা সুরে নানা তালের প্রয়োগ হ'ত, তারও সার্থকতা এইভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে হয়ত। কীর্তনে ত সব সময়েই এই তাল-বৈচিত্র্যের স্থান আছে।

প্রাচীন বাংলা গানের একটা ত্রুটি ছিল, ওতে একটা স্থায়ীর পর একই সুরে রচিত কতকগুলি অন্তরার সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ গানে ধ্রুপদের মত চার তুকের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু প্রাচীন বাংলা গানের মত স্থায়ী ছাড়া বাকী তিনটি তুককেই অন্তরায় রূপদান করেন নি। সেগুলি ধ্রুপদের রীতি অনুসারে অন্তরা, সঞ্চারী আর আভোগ হিসাবেই রচিত হয়েছে, যদিও ক্ষেত্র বিশেষে

রবীন্দ্রনাথ ও দেশপ্রেম

* মৈত্রেয়ী দেবী *

কিছুদিন ধরে দেশের মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে একটা হাঙ্গামা সুরু হয়েছে—প্রায় দাঙ্গা হবার উপক্রম। জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব ও একটা দারুণ বিপদের সঙ্কেতে যাঁরা জীবনেও কখনো স্বদেশের জন্য চিন্তা করেন নি তাঁরাও দেশপ্রেম দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য এতে কোন দোষ নেই—সুযোগ না পেলে কিছুই করা যায় না। দেশপ্রেম তো "করা"ই যায় না। "করা" বলছি এজন্য যে, এর মধ্যে বেশ একটা active ভাব এসেছে, সবাই যে যুদ্ধ ফ্রন্টে নাম লিখিয়েছেন তা নয়। কিন্তু বহিঃ শত্রুর চেয়ে গৃহ শত্রুই যে বেশি ভয়ঙ্কর এই কথাটাই মনের মধ্যে হাঁটারে চাপিয়ে বেশ তপ্ত করে তুলেছেন। আর বলা বাহুল্য "দেশের শত্রু" আর "নিজের শত্রু" সেই রাগের রসায়নে ক্রমাগতই এক হয়ে যাচ্ছে, তখন শত্রুবধের জন্য প্রেরণা খুবই জোর পাচ্ছে। বিশেষত এর জন্য বন্দুক ঘাড়ে করে বরফের মধ্যে মার্চ করতে তো হচ্ছে না নিজের নিজের দোতলার কিংবা তেতলার ফ্ল্যাটে বসে কলম হাতে নিলেই হল।

এই কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করছি। যাঁর দেশপ্রেম ছিল মানব প্রেমেরই একটি পরিপূর্ণ উপলব্ধি। যে কথা তিনি অতি সোজা ভাষায় রাশিয়াতে একটি কাগজের রিপোর্টারকে বলেছিলেন—যে তাদের উদ্দেশ্য যদি মানুষের ভাল করা হয়, তবে শত্রুর উপরই বা নির্মম হবে কেন, সেও তো মানুষ। অর্থাৎ ভালো করতে হলে তার ভালোই কর, নির্মূল করো না। এই অতি সোজা কথাটা কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবনে ক'জন মনে রাখতে পারে?

দেশপ্রেমের বহু রকম প্রকাশ আছে। কিন্তু আমাদের দেশ দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল বলেই আমরা প্রধানত স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রাম মুখরতাকেই দেশপ্রেমের বিশেষ মাপকাঠি বলে মনে করি। তা ছাড়া জগতে সর্বত্রই যুদ্ধকালে দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত আবেগের মুখে জ্বলে উঠতে প্রেরণা পায়। রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে কর্মের লিপ্সা বাড়িয়ে তোলে কিন্তু এর আর একটি দিক আছে যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-শূন্য সমাজ ও মানুষের হিতার্থে নিবেদিত, যা কোনো সাময়িক কারণে উত্তেজিত নয়, যা অপ্রমত্ত মনের আত্ম-ত্যাগ ও সাধনায় জন্ম নিতে পারে।

রবীন্দ্র কাব্যে ও জীবনে দেশ-প্রেমের এই দুই দিকেরই প্রবল প্রকাশ আমরা দেখেছি। রবীন্দ্র-নাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে হিন্দুমেলায় পাঠ করেছিলেন। বালক কবির ঐ কবিতার প্রতিছত্র প্রশ্ন করছে ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে:—

ভারত কংকাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন?"

সে যুগে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল এমন অনেকেই দেশের আদর্শ, ভাষা ও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ছিলেন অনেক দূরে। কিন্তু ভারতবর্ষকে চিনবার ও চেনাবার সাধনাই ছিল রবীন্দ্রজীবন ও কাব্যের মূলে।

"নব বৎসরে করিলাম পণ।
লব স্বদেশের দীক্ষা।
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন তেয়াগিব
আজ পরের আসন,
যদি হই দীন, নাহইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

এই স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ কেবল কয়েকটি কবিতায় আবদ্ধ রইল না। সারা জীবনের কর্মে হল অনূদিত। কংগ্রেসের সভায় প্রথম বাংলায় ভাষণ দিলেন, স্বদেশী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বমর্যাদায়। জীবনে কখনো বিদেশী পরিচ্ছদ ধারণ করলেন না। বিদেশী রীতি গ্রহণ করলেন না। ও প্রতিদিনের জীবনে ঘোষণা করলেন:

—"রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়
ভিক্ষা ভূষণ ফেলিয়া, পরিব
তোমারি উত্তরীয়...

১৯১৬ সালে আমেরিকায় সমুদ্রতীরে বায়ুসেবী কোনো অভব্য ব্যক্তি ঐ পোষাক দেখে বিদ্রূপ করলে তিনি সংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে, অন্যদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি বলে যাত্রার দলের অধিকারীর মত বিভিন্ন দেশের পোষাককে তো বয়ে বেড়াতে পারিনে! জাপানে গেলে জাপানী পোষাক পরব। চীনে গেলে চীনা পোষাক পরব এ তো সম্ভব নয়। তাই আমার যা দেশীয় পোষাক তাই পরব। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এই সচেতন স্বাজাত্য বোধ জাগাতে তিনি সাহায্য করেন। একজন বিশিষ্ট জাপানী আমায় বলেছিলেন, "তাঁর পোষাক দেখেই আমাদের মনে এ কথা পরিষ্কার হল যে, সভ্য হবার জন্য ইয়োরোপীয় হবার কোন প্রয়োজন নেই।"

দেশের যে অংশ অশিক্ষায় কুশিক্ষায় দারিদ্র্যে মলিন ও জীর্ণ সেই বৃহৎ অংশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,
—"সত্য করিয়া বলুন আমরা কে কি করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের যাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছে," এই সুখ দুঃসহ হল, তিনি ফেলে দিতে চাইলেন বাঁশি, কল্পনার তীর থেকে চলে আসতে চাইলেন যেখানে সম্মুখেতে কষ্টের সংসার বড়ই দরিদ্র ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।" কিন্তু বাঁশি বাজতেই লাগল দুরূহ কর্মের মধ্যে

জীবন শিল্পের রচনায়। স্বদেশ প্রেম রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্যে সাময়িক উত্তেজনা ছিল না, যখনই উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে তিনি বলেছেন :—"আজ অনুনয় সহকারে আমরা দেশবাসী-গণকে বলিতেছি আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। বিরোধ করিতে গেলেও তেমনি পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গল সাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব ..."

দেশের এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্যই তাঁর কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার তপ্ত আবহাওয়া থেকে দূরে নিয়েছিলেন। দু'টি রাজনৈতিক ঘটনা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জালিয়নওয়লাবাগ কবিকে রাজনৈতিক রঙ্গ-ভূমিতে অল্পকালের জন্য হলেও টেনে এনেছিল। এ একটি বিশেষ ঘটনার অভিঘাতে উৎসারিত হলেও তখনকার সেই গানগুলির মধ্যে চিরকালের কথাই ধ্বনিত হয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সত্য...

"শাসনে যতই ঘেরো,
আছে বল দুর্বলেরো "—

এই কথাই দেখি ন্যাশনালিজম গ্রন্থে "The weak are as great a danger for the strong as quick sand for an elephant. They do not assist progress because they do not resist they only drag down. Politician's calculate upon the number of mailed hands that are kept on the sword hilts, they do not possess the third eye to see the great invisible hand that clasps in silence the hand of the helpless and waits its time."—কবি জানেন দুর্বলের দুর্বলতা শুধু তার নিজেরই ধ্বংস ঘটায় না তা সমস্ত মানবেরই অকল্যাণ আনে, তা প্রবলকে অত্যাচারী হয়ে উঠতে প্রলুব্ধ করে, তাই যেখানেই শক্তির প্রকাশ সেখানেই

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে—রবীন্দ্রনাথ

কবির মন আবেগে শাসিত হয়। এই আবেগের প্রবল ধ্বনি শুনি আমরা বাংলার বিপ্লবীদের অন্তর বেদনার মূর্তপ্রকাশ 'প্রশ্ন' কবিতায় সাময়িক ঘটনার বেদনা ও আবেগে কবির অন্তর্মূলে স্পর্শিত তাঁর সমস্ত চিত্ত মথিত করে দু'একটি বজ্রবাহিনী কবিতা স্ফুরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শে থাকেন চিরস্থির। সেজন্য দেশ তাঁকে বারেবারেই ভুল বোঝে—তরুণ বালকের নিষ্ফল যন্ত্রণার সমব্যথী কবি কিন্তু স্বদেশী ডাকাতি, গুপ্তহত্যা ইত্যাদিকে সমর্থন করতে পারেন না। তিনি বলেন, "আজ দস্যুবৃত্তি তস্করতা অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে—জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ঙ্কর ভুলকে তিনি কখনোই মনে স্থান দিতে পারেন না, যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া জানেন, ফললাভ চরম লাভ নহে ধর্ম লাভই লাভ একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশ মানুষের যথার্থ হিত নহে।"

রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মবুদ্ধিকে রাখার আবেদন তিনি কোনও বি শিথিল করেন নি—কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অহিংসার মহাত্মাজীর নীতিকেও অতিক্রম গেছে। বল প্রয়োগ বা মতের দীপ্ত চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর অভি নয়। "জিজ্ঞাসা করি বাজারে লাগাইয়া, অথবা অনিচ্ছুক লো মাথা ভাঙ্গিয়া যদি আমরা বি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লো দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বি চিরদিনের মত বিদ্রোহী করিয়া না ?...সবলে গলা টিপিয়া মি মিলন বলে না...ভয় দেখাইয়া, কি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় সাধন বলে না।" যখন দেশ

মধ্যমণির আলো

চিত্রিতা দেবী

এই তো সেদিন তোমায় ঘিরে,
সভা জম'ত কত।
বাংলা দেশের হৃদয় পদ্মে,
পদ্মরাগের মত
তুমি ছিলে মধ্যমণির আলো।
সেই আলোরি আভাস লেগে,
ঝলমলিয়ে উঠত জেগে।

এই দেশেরি হেথায় হোথায়,
যেথায় যত ভালো।
তুমি ছিলে মধ্যমণির আলো।

বিদ্রোহে হায় যারা তোমায়
চাইত দিতে ব্যথা।
ভালোবাসাই তাদের মুখে,
বলত বিরূপ কথা।

তাদের মনেও চুপি চুপি, তোমার
আলোর বাণী ;
অন্তবিহীন ভালো লাগার,
পরশ দিত আনি।
সেই আনন্দে, নতুন ছন্দে,
নতুন নতুন আশা।
নতুন ভাবনা ;
এনেছিল তোমার দেশে, জাগ্রত
এক প্রাণের সাধনা
ঘুচিয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে থেকে,
অন্ধতম কালো।—
যখন তুমি গাইছিলে গান,
বাসতে হবে ভালো !
দেখেছিলাম তখন তোমায়
মধ্যদিনের আলো।

ননকো-অপারেশনের ধ্বনি গগনভেদী হয়েছে তখন তিনি দূরে দাঁড়িয়ে বললেন,—"আমি চাই সমগ্র জগতের কোঅপারেশন বিরোধ মূলক আদর্শ ভারতের আদর্শ নয়।" রাজা প্রজায় লিখেছেন, "আমাদের দেশেও যখন দেশের হিত সাধন বুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে প্রচুররূপে দেখা দিল ... তখন একথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে ভালো জিনিষের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তা-ঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।..." ক্রান্তদর্শী কবির উচ্চারিত এই অমোঘ সত্যগুলি আজ বিশেষ করে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রমত্তজন চিত্তকে যিনি সংহত করে যুক্তির হাল ধরে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে পথ নির্দেশ করেন তিনিই নায়ক তিনিই কাণ্ডারী। সমসাময়িক লোকে তাঁকে ভুল বোঝে, হয়ত পরবর্তী কালেও ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানুষেরা ভুল বোঝে, যেমন শুনছি বিদেশেও রবীন্দ্র সাহিত্যচর্চাকারীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ননকো-অপারেশন অস্ত্র যখন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ কেন রইলেন দূরে—? বিদেশীদের তো অবশ্যই জানা কঠিন যে, ভারতবর্ষের ঋষি, মনীষী ও জ্ঞানীরা কালোত্তীর্ণ, সমসাময়িক বিপর্যয়ের উর্দ্ধে, চিরসত্যের প্রতি বিশ্বাসে অবিচলিত। ননকোঅপারেশন ক্ষণকালীন সত্য, একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র, চিরকালীন সত্য সর্ব-মানবের কো অপারেশন মানুষকে যে মিলতেই হবে তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের তীব্রতার সময় নাইটহুড পরিত্যাগের জন্য ইংলণ্ডে বন্ধুবর্জিত পরিত্যক্ত হয়েও তিনি ইংরেজের গুণগুলি দেখতে পান। বন্ধু এণ্ড্রুজকে একবার ইংল্যাণ্ড থেকে লিখেছিলেন যে, তাঁর কাছে এডমণ্ড-বার্কের মধ্যে প্রকাশিত ইংরেজ জাতির মহত্বই বেশি সত্য inspite of Warren Hastings,

আজকের দুর্দিনে তিনি উপস্থিত থাকলে, দেশপ্রেম উদ্বোধিত করবার জন্য কনফিউসিয়াসকে বা হিউয়েন-স্যাঙকে গালাগালি করবার কোনো প্রয়োজন হল না ক্ষুদ্রতা দেশপ্রেম নয়। সমস্ত বিরোধের মধ্যে মহামানবের মিলনের সেই সত্যবাণীই 'ভারততীর্থ' কবিতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, কোনো বিপত্তির তরঙ্গাঘাত তাকে ক্ষয় করে, দিতে পারে না।

থাকত ততখানি। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকেও বাদ দিতে পারতাম না। কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অনেকখানি বাদ পড়ে গেলেন।

মনেই হল না আমরা অনেক কিছু হারাচ্ছি।

* * *

যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলাম তখন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেছে, খাদ্যাভাব তত নেই। অভাব তখন স্বাধীনতার। চারিদিকে চলছে প্রবল উত্তেজনা। পুলিসের গুলি। তারপর দাঙ্গা। তারপর স্বাধীনতা, তারপর আবার হত্যাকাণ্ড, আবার দাঙ্গা। তারপর আবার গুলি, আবার খাদ্যাভাব। প্রতিটি দিন আমাদের পরিচিত কেউ মারা পড়ছে দাঙ্গায়, কেউ মরছে পুলিসের গুলিতে, কেউ বা ভয়ে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না।

তখন আমরা সমস্ত দেখছি। সমস্তদিন বাড়িতে ফিরছি না। কালীঘাটের ট্রামের আগুন দেখে, মেছুয়া বাজারের গুলির আঘাতে পড়ে থাকা মানুষ দেখে বাড়ি যখন ফিরছি তখন আমরা ক্লান্ত।

তখনো আলোচনা শুনতে পাচ্ছি —রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাম্যবাদের কতখানি মেশাল আছে, কতখানি তিনি বুর্জোয়া। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া কেন উচিত ছিল।

পড়তে ইচ্ছে করছে তখন—সমস্ত কিছুই। মাঝে মাঝে বই পড়তে বসেওছি।

বই পড়ছি—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের, রবীন্দ্রনাথের, রজনী পাম এবং শশধর দত্তের। যেটা যখন পাই। কোনোটা প্রয়োজনে, কোনোটা সময় কাটানোর জন্যে।

কোনো বই খারাপ লাগছে। সেই সঙ্গে ভালও লাগছে এই ভেবে যে, আমি লিখলে এর চাইতে ভাল লিখতে পারতাম!

* * *

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি 'ষ্টাডি' করি নি। জানি, যাঁরা করেছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আরো জানি, সেই মুষ্টিমেয়রা যা বলেছেন তা রবীন্দ্রনাথকে জানবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এটুকু বুঝেছি, আমার পক্ষে এবং অদূর ভবিষ্যতে কারুর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব। কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, কোনো বিশেষ মানুষকেই জানা সম্ভব নয়। অতএব যখন আমি শুনতে পাই কেউ সভা করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলবেন, আমার সে সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ হয় না।

এ রকম কয়েকটি সভায় গিয়ে হাসব না মনে করে গম্ভীর ভাবে বসেওছি, কিন্তু তবু হাসি আসে। তাড়াতাড়ি চলে আসি।

আমি বলছি না, সভার কোনো প্রয়োজন নেই। সভা যখন হয়, তখন ধরে নিচ্ছি কারুর কাছে তা নিশ্চয় প্রয়োজনীয় বলেই হয়।

যিনি গান গেয়ে থাকেন, এরকম সভায় তিনি প্রায়ই মোটা টাকা পেয়ে থাকেন। আমি চাই না সভা বন্ধ হক, বা গায়ক বা গায়িকার আয় কমুক। চারিদিকে যা চলছে, তার বিরোধিতা আমি করতে চাই না।

কারণ, তার বিরোধিতা করবার মত আমার শক্তি নেই।

* * *

এবারে তিয়াত্তর বছর আগের একটি সভার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিই। তিনি নিজেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সভায়—তা পড়লেই বোঝা যাবে :

"মুখ টুক শুকিয়ে, হাত-পা কালিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেসে কুসে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলুম। বললুম, বিনয় সম্বন্ধে

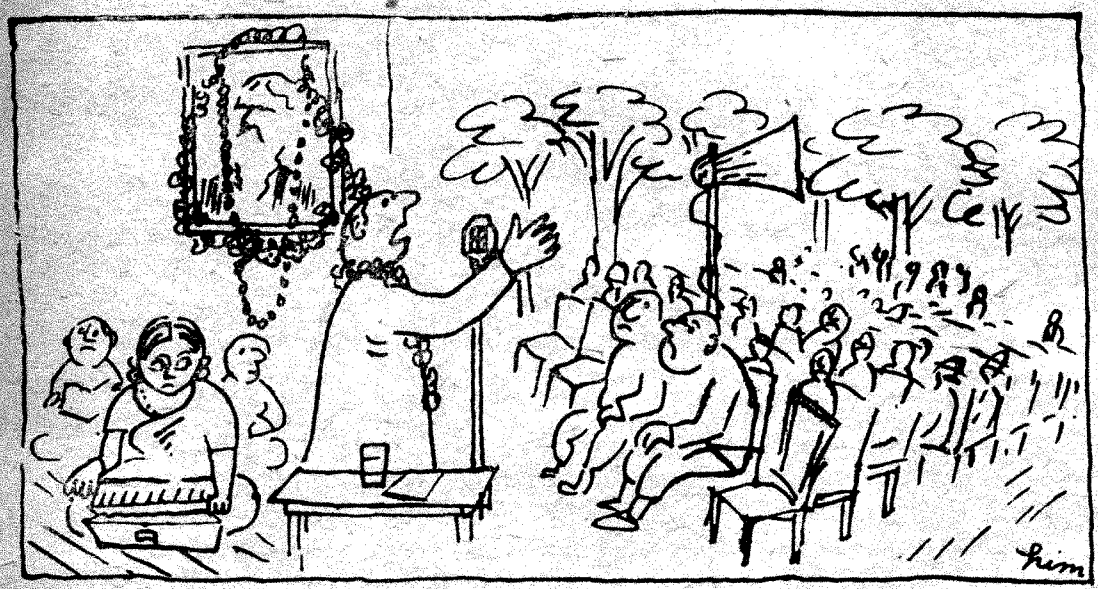

"রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি…বড় কবি…সবচেয়ে বড় কবি…পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম কবি… বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি… ।"

রাজা * অশোক সেন

'রাজা' নাট্যে এক অভিনব পন্থায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জগৎ চালনার ধারা প্রতীকের দ্বারা রূপায়িত করিয়াছেন। এই পৃথিবী যেন একটি রাজ্য—এখানকার রাজা অদৃশ্য এবং অরূপ; কারণ ঈশ্বর যিনি জগতের রাজা, নিজেই যে তিনি নিরাকার এবং রূপাতীত। অথচ যা কিছু এ পৃথিবীতে ঘটিতেছে সকলই আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। যাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে সেই বুঝিতে পারে, সারা বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নিয়মের ধারা। বাঁধা সুরের একচুল এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। এই রাজার দেশে বাহিরের অনেক রাজা আসিল। অদৃশ্য রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহারা এ রাজ্য অধিকার করিবার নানারূপ প্রচেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত সকলেই পরাভূত হইল। এমনই হয় বটে। নিরাকার ভগবানকে কত উপায়ে কতবার সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। এই অদৃশ্য রাজাকে পাইতে হইলে বাহিরে খুঁজিলে চলিবে না। অন্তরের নিভৃত কক্ষে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক—সাধারণতই মানুষ ভাবে অন্যান্য জাগতিক বস্তুর মত ঈশ্বরকেও সহজেই চোখে দেখা যাইবে। মানুষের মন আত্মাভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতিতে মোহগ্রস্ত। এ সকল মোহ দূর হইলে তবেই সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে।

সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে রাজার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণ বাস্তব আখ্যানভাগ অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত

"বঙ্গানীড়" কর্তৃক মঞ্চস্থ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে রাণী সুদর্শনার ভূমিকায় বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীবিনতা রায়

হইতেছে আধ্যাত্মিক আখ্যানভাগে। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থের দিকে মনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ব্যঙ্গার্থের ভিতর দিয়াই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রথম দৃশ্যে সুদর্শনা এবং রাজার কথোপকথনের মাঝে এক জায়গায় আছে—

"সুদর্শনা—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি,—এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা—পাই বৈকি।

সুদর্শনা—কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা কি দেখ?

রাজা—দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

অর্থাৎ সিন্ধু যেন বিন্দুর মধ্যে রূপায়িত। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

রাজা তো শুধু মানব-প্রেমিক নহেন, তিনিই যে আবার ঈশ্বর—সুদর্শনাকে যে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির ভিতর দিয়াই স্রষ্টার যত ধ্যান, জ্ঞান, আনন্দ, কৌশল প্রভৃতি রূপায়িত হয়। সৃষ্টিই স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি, উপমা, ছায়া! পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গভীর ভাবে দেখিলে বুঝা যায় এ সীমা-অসীমের প্রেম-মিলনের কাহিনী, অসীম যেন সীমার মাঝে নিজের অপূর্ব প্রকাশ দেখিতে পাইয়া উদাত্ত স্বরে সীমার স্বর্গীয় রূপের আরাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। Subjective, Objective-এর মাঝে নিজের রূপ আবিষ্কারে বিস্মিত, চকিত, মুগ্ধ।

চোখে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। আরো কত ছবি। কত কথাই কয়ে যাচ্ছে এরা নিঃশব্দে। তখন সারা এসিয়াতে রবিবাবুই তো একমাত্র Nobel prize winner। আজই নয় কিছুদিন আগে জাপানী বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিদেকী ইউকাওয়া অর্জন করেছেন ঐ পুরস্কার। তার আগে তো রবীন্দ্রনাথই এসিয়ায় একমাত্র সারা এসিয়ার গৌরব। পরে অবশ্য এলেন রমন্। এদেশী লোকেরা রবিবাবুকে ভাল ভাবে অনেকে না জানলেও তিনি যে Nobel prize winner তা ভাল ভাবেই জানে।

"কবির তখন শরীর তেমন সুস্থ নয়। তবু আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে আমার কী সৌভাগ্য। ভাল ইংরাজী জানি না, তাই বিশেষ সুযোগ হয়নি কথোপকথনের। তবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলুম কদিন একসঙ্গে, ভাল করেই চিনেছি তাঁকে, জেনেছি বাংলার কবি হৃদয়কে। সবচেয়ে ভাল লাগত যখন দেখতুম ভোরবেলায় উঠে বারান্দায় বসে আছেন ধ্যানে। সে মূর্তি ভুলবো না জীবনে। এ মূর্তি দেখেই বুঝেছি ভারতের চেহারা। আসল চেহারা। বুদ্ধের চেহারা—তাঁর চির নূতন বাণী।

"কী তাঁর আতিথেয়তা! আপনার করে নিতে জানতেন তিনি-সবাইকে। কী স্বদেশী কী বিদেশী। মনে হ'ল এই তো আমার ঘর। ইনিই আমার পিতা। এঁর সঙ্গে পরিচয় আজন্ম। হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব মনে হ'ল তুচ্ছ। তাঁর পদ্মের মত চোখের দৃষ্টি আমার মনকে দিল সব ভুলিয়ে। জন্ম নিলুম যেন দ্বিতীয়বার এ ধরণীতে। কি বলব টেগোর সান্—শুনেছি তাঁর গুনগুনিয়ে গান—আহা সে যেন স্বর্গের। হিমালয়ের পাইনগাছের চূড়ো বেয়ে, হাল্কা হাওয়ার গতিতে, পার্বতী ঝরণার জলে স্নান করে নীলাকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে সে গান। সদাই বাজছে আমার কানে। ভুলতে পারিনি আজও। কোথায় গেল সে গান!—পারো তো শুনিও আমাকে একদিন। একটা গান বড়ই ভাল লাগত আমার! কথা তো জানি না--উচ্চারণও হবে না। তবে সুরটা অনেকটা এই ধরণের " প্রবীণ গলায় গুন্ গুন্ করে সুর টানলেন বৃদ্ধ নোমুরা। অবাক্ বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলো আমার বুক। এ যে আমারো অতি প্রিয় গান : "ওগো দুখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাব"! চোখে এসে গেল জল। আর পারলুম না থাকতে। গৃহিণীর দিকে চাইতেই এগিয়ে দিলেন আমার মা'র দেওয়া এস্রাজটি। মেন্ তারেতে ছড় ঘষে গেয়ে উঠলুম দুখ জাগানিয়া গান। ভুলে গেলুম সব।—এ যে সব ভোলানো গান।

প্রঃ নাওতারো নোমুরা

রবিবাবুর গান যে গাইবে তাকে ভুলতে হবে নিজেকে। যেমন ভুলেছেন নোমুরা। গানের শেষে দেখি মাথার টুপি মেজেতে রেখে হাঁটু গেড়ে বসেছেন জোড় হাতে মাথা নামিয়ে। চোখ দিয়ে বইছে আনন্দাশ্রু। স্তব্ধ হয়ে প্রণাম করে চলেছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর স্মৃতিকে। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা গলায় গেয়ে উঠছেন আমার গানের সুরে সুর টেনে; আর তার সঙ্গে যেন তেহাই দিচ্ছে আমার গৃহিণীর ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নোমুরা। প্রায় মিনিট পনেরো। কথা বলতে সাহস হলো না। ধ্যানভঙ্গ করা উচিৎ নয়। হঠাৎ ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো "আরিগাতো!" এই সংক্ষেপ ধন্যবাদ জানিয়েই বৃদ্ধ দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। থামাবার চেষ্টাও করলুম না আমরা। গৃহিণী বললেন, "ঐ যাঃ, টুপি ফেলে গেলেন নোমুরা সান্। নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন আবার।" হ্যাঁ ফিরে এসেছিলেন বারবার আমাদের এই কাব্য মরুভূমিতে—মরীচিকা দেখার লোভেই বোধ হয়। আমরাও যাই ওঁর কাছে মাঝে মাঝে। কিসের টানে? তা' উনিই জানেন আর আমরাই জানি। "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে....."

আধুনিক জাপান, যা'র হাওয়ায় বইছে modern zazz (জারজ?) সঙ্গীতের অসহ্য চীৎকার, সেই হাওয়ায় আজও নোমুরার ভাঙ্গা গলার সুরের রেশ লেগে আছে কানে। এ কি ভোলা যায় কখনও! এ যে অমূল্য সম্পদ। নোমুরার কাছে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি ও নেগেটিভ্ আছে আমার কাছে। দুষ্প্রাপ্য।

ইয়োকোয়ামা টাইকান্

ইয়োকোয়ামা টাইকান্ আর কাউণ্ট্ তেন্‌শিন্ ওকাকুরার নাম কে না জানে? তাঁদের পরিচয় নতুন করে জানানো নিষ্প্রয়োজন। তবে টাইকানের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমার যে বিশেষ সৌভাগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বছর পাঁচেক আগে দেখা পেয়েছিলুম টাইকানের। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। রাজধানী তোকিও থেকে মাইল পনের দূরে তাঁর বাগানবাড়ী। শরীর অসুস্থ। দেখা দেন না সহজে কাউকে। তবে সুদূর ভারতের বন্ধুবাড়ীর লোকদের তো আর সহজে না বলা যায় না। তাই মিললো দর্শন।

গাঢ় নীল রংয়ের কিমোনো পরা অতি বৃদ্ধ দিব্য মূর্তি। আঙ্গুলের ফাঁকে লম্বা হোল্ডারে ঝুলছে জলন্ত সিগারেট। পাশে বেঁটে টেবিলে রাখা জাপানী সাকের পেয়ালা। জানালার ধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। লম্বা ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত টাইকান্। শরীর পড়েছে এলিয়ে তবু আর্টিষ্টের দৃষ্টি রয়েছে হুঁশিয়ার। নমস্কার বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন, "নন্দবাবু কেমন আছেন?" ভাল আছেন জেনে একটু চুপ করে হঠাৎ ইংরাজীতে বলে উঠলেন—

"Gagan Babu gone, Rabi Babu gone, Aban Babu gone ! Every body, every good friend gone ! Only Nanda Babu well. But I am going !"

এঁর আঁকা ফুজিয়ামাকে দেখতে পেলুম যেন। ইনিও ঠিক ঐ আগ্নেয়-গিরির মতই। দম্‌কে দম্‌কে বলে উঠছেন কথা। সত্যি কথা। এগিয়ে দিলেন সাকের পেয়ালা আমার দিকে। "This is my food, my life." শুনলুম আহারের পালা তুলে দিয়েছেন টাইকান্। শুধু সাকে আর সাকে। ভাতের রস দিয়ে তৈরী জাপানী সুরা। অবাক হতে বলে উঠলেন, "I can't eat food. But I drink the elixir of life and that is this 'Sake'. No need to eat rice. The juice of rice, Sake is enough !" জীবনের ঘোর সন্ধ্যায় পৌঁছে জীবন-সুরা পান করে নিচ্ছেন এই যুগান্তকারী আর্টিষ্ট। এঁর মত আর্টিষ্ট সারা জাপানে নেই।

আর দেরী করা উচিৎ নয়। অনুরোধ করলুম রবিবাবুর বিষয়ে কিছু বলুন। সংক্ষেপে বললেন, "My memory is confused. But Rabindranath was great. Nobody like him, forever never !" বলেই হাত বাড়ালেন সাকের পেয়ালার দিকে। চুমুক দিতে দিতে মাথা হেলিয়ে জানালেন শুদ্ধ সায়োনারা। বিদায় নিলুম।—মাসকয়েক পরে কিওতোর রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছি এক সন্ধ্যায়। একটি electrical goods-এর দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি টাইকানের মুখ—T. V.র পর্দায়। শুয়ে আছেন অন্তিম-শয্যায়। চারিদিকে ফুলের তোড়া। রবীন্দ্রনাথের জাপান-প্রাসাদের বিরাট একটি আলোর ঝাড় যেন খসে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল আজ। ছিন্ন হয়ে গেল জোড়বাঁধার বাঁধন। ভারত আর জাপানের। সায়োনারা ! সায়োনারা ! সায়োনারা ! "But I am going" !

কাৎসুতা শোকিন্

"আজই তো কাৎসুতা সানের বাড়ী যাবার কথা, নয় কী ?" গৃহিণীর প্রশ্ন কানে আসতেই লাফিয়ে উঠলুম শয্যা ত্যাগ করে। হ্যাঁ আজই তো। তাড়াতাড়ি রবিবারের প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লুম আমরা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে। আধঘণ্টার রাস্তা। কাৎসুতা সানের বাড়ীর কাছে পৌঁছে যেই ট্রাম থেকে নেমেছি অমনি সুরু হয়ে গেল জাপানী শরতের হঠাৎ বৃষ্টি। দৌড় দৌড়। কাক ভেজা হয়ে পৌঁছলুম কাৎসুতালয়ে। বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। আমাদের অবস্থা দেখে এনে দিলেন দু'টি কিমোনো। সাজ বদল হোলো আমাদের।

'হিবাচীর' আগুনের চার পাশে বসে সবুজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুরু হোলো আলাপ। ইতিমধ্যে কাৎসুতা গৃহিণী কয়েকটি ছবির অ্যালবাম্ নিয়ে এলেন।

কাৎসুতার বয়স প্রায় পঁচাত্তর। প্রায় বাহান্ন বছর আগে ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতীয় subject-এর ছবি আঁকতে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে কাটিয়েছেন লম্বা দু'টি বছর। সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের অতিথি হলেও বেশীর ভাগই সময় কাটতো রবিবাবু, গগনবাবু, অবনবাবু, সমর-বাবুর সঙ্গে। বললেন, "আমি যখন ভারতে যাই রথেবাবু (রথীন্দ্রনাথ) তখন very young। ঠাকুর বাড়ীর অনেক ছেলেমেয়েদের ছবি এঁকেছি আমি।" পুরাতন drawing book-এ ভর্তি সব নবীন ঠাকুরদের চেহারা। পাশে পাশে নাম লেখা আছে জাপানীতে—নবু, রথী ইত্যাদি।

আর দেখালেন অবনবাবুর আঁকা ছোট্ট একটি ওয়াশের ছবি। পদ্মার বুকে একটি পান্‌সী ভেসে চলেছে তীর বেগে। মাঝি বসে আছে হাল ধরে চুপটি করে। চমৎকার ছবি। সযত্নে রেখেছে এঁরা এঁদের সম্পদ। "মাঝে মাঝে যেতুম রবিবাবু, সুরেন-বাবুর সঙ্গে শিলাইদহে। কী চমৎকার জায়গা, আহা কী দৃশ্য। একবার গেলে অন্য কোথাও যেতে ইছা হয় না। রবিবাবু মাঝে মাঝে চুপ করে বসে রচনা করতেন কবিতা আর সুরেনবাবু হঠাৎ এসে লেখায় বাধা দিয়ে বলতেন, "চল বেড়িয়ে আসি। সকলে মিলে ঘোড়া পিঠে চড়ে আমরা পদ্মার ধারে, নদী চরে ঘুরে বেড়াতুম। মাথায় ঠাকু বাড়ীর পাগড়ী এঁটে বেড়ে দেখাতে ওঁদের। আমিও একটা ঐ পাগড় পরতুম। ওঁদের কাছেই পাওয়া আজকাল তোমরা ঐ পাগড়ী প না বুঝি !"

পরি না জানতে পেরে দীর্ঘশ্বা ফেলে বললেন, "দুনিয়া পাল্টে গে একেবারে। আমরা জাপানীরা আ সমস্ত সনাতনী জিনিষকে জলাঞ্জ দিয়ে বিদেশী ন টুকে পোষাক প

অসামান্য বই

—অগ্নিযুগের সেই মহামানব—

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী

—বসু-স্মারক সমিতি কর্তৃক গ্রন্থিত ও প্রকাশিত। মহানায়কের রচনা অগণিত তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর সম্বন্ধে ভারতের তথা বিশ্বের বিভি মনীষীদের চিন্তাধারা। ৩০ খানা উপরে দুষ্প্রাপ্য তথ্য চিত্র। অবিস্মরণী ও অপরিহার্য গ্রন্থ। মাত্র অল্পসংখ্য মুদ্রিত। আপনার বইখানা শীঘ্র সংগ্র করুন। ১২·০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলী ঃ প্রথম ভাগ

ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের বিস্তৃত ভূমিক ও আলোচনা সহযোগে যুগের একজ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা সম্ভার কাপড়ে বাঁধাই, পারিপাট্যে অনবদ্য। ১০·৫

প্রত্যেকখানা বই ঘরে রাখবার, উপহা দেবার ও লাইব্রেরীর জন্য।

কালার হাট

অশোক গুহ ।। ৮·৫

ক টরাগ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪·০

অন্যনয়ন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪·০

অ্যাক্‌সিডেণ্ট

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ২·৫

চৌধুরী বাড়ি বিশ্বনাথ রায় ।। ৪·০

সঙ্ঘমিত্রা সঙ্কর্ষণ রায় ।। ২·৫

সীমান্ত শিশির দাস ।। ৩·০

একমাত্র পরিবেশক ও প্রকাশক

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

ভাবছি কী স্মার্টই হলুম। তোমরাও কী তাই?" গৃহিণীকে বললেন, "পাগড়ীটা নিয়ে এসো তো।" হাল্কা বাদামী রংয়ের, কাপড় পেঁচিয়ে দড়ির মত শক্ত করে ঘোরানো পাগড়ী। পরিয়ে দিলেন আমার মাথায়। ছবি তুললেন আমার গৃহিণী কাৎসুতা আর আমাকে পাশা-পাশি বসিয়ে। দু'একটি বাংলা কথা এখনও মনে আছে এঁর। অন্দরবাড়ী

কাৎসুতা শোকিন্ ও লেখক

ঠাকুরবাড়ী, বাগানবাড়ী, নাম কি, ভাল আছ, জলখাবার, লুচি ইত্যাদি।"

"মাঝে মাঝে ড্রামা হ'ত দিনের পর দিন, জোড়াসাঁকো বাড়ীতে। কত লোক আসতো দেখতে। যারা অতিথি তাদের দেখতেই বড় মজা লাগতো আমার। কেউ আসতেন পাল্‌কী চেপে, কেউ বা জুড়ি ঘোড়ার গাড়ীতে। তাঁদের সাজ পোষাক কত রকমের! সেই সব পোষাকী স্কেচ্ করতুম বসে বসে।"

দেখলুম সব পুরাণো স্কেচ্। রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ করে, বৌ-রাণী-ঠানদির দল, পাগড়ী মাথায় চুড়িদার পাজামা পরা রামসিং দ্বারবান, সহদেব চাকর, পঞ্চী দাসী সবাই যেন ভিড় করে বসে আছে ঐ কাৎসুতার drawing খাতার পাতায় পাতায়। আরও কত কী? রাজকীয় ব্যাপার। বুঝলুম কাৎসুতা সত্যিই বাড়ীর একজনই হয়ে গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোয়। তা'না হলে বিদেশীর পক্ষে—সেকালে ঐ ধরণের ছবি আঁকা হ'ত দুষ্কর। রবীন্দ্র-ভারতী এইসব ছবির সন্ধান পেলে হয়ত ছুটে আসবেন জাপান পর্যন্ত! বিদায়কালে কাৎসুতা সুন্দর একটি জাপানী ফলের (persimmon) ছবি এঁকে আমাদের উপহার দিলেন। কমলা রংয়ের তাজা ফল। বললেন, "এই ফলের মতই তাজা রয়েছে রবিবাবুর বাড়ীর স্মৃতি আমার বুড়ো পাঁজরের আড়ালে।"

মাদাম্ তোমি কোরা

জাপানী পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব মেম্বার ডক্টর মাদাম্ তোমি কোরার নাম ভারতের অনেকেই জানেন। রবীন্দ্র-নাথ জাপানে এসেছিলেন তিনবার। প্রতিবারই এঁকেই দো-ভাষীর কাজ করতে হয় কবির সঙ্গে সঙ্গে থেকে। যেখানেই কবি সেখানেই মাদাম্ তোমি কোরা। টেগোর সোসাইটি অফ্ জাপানের প্রেসিডেন্ট ইনি সোরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। মনস্তত্ত্বই হ'ল এঁর বিশেষত্ব। অথচ রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেই নামডাক। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় দক্ষ! এঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় পিকিং-এ "সীন্ চাও" হোটেলে। একই হোটেলে ছিলুম আমরা ক'দিন। জাপানে এঁর মত মহিলার সংখ্যা কম। তাই বোধ হয় দো-ভাষীর কাজ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল এঁকে, যখন রবিবাবু আসেন এই সূর্যোদয়ের দেশে।

রাজধানী তোকিও থেকে ট্রেনে ঘণ্টা দু'য়েকের পথ 'আতামী' পর্যন্ত। এই আতামীতেই মাদাম্ তোমি কোরার বাগানবাড়ী। নাম 'শান্তিনিকেতন'। বীরভূমের লাল মাটির বুকে ছড়ানো শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একেবারেই মিল নেই এই শান্তিনিকেতনের। এর একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, আরেক দিকে পাইন্ গাছের মালা পরা পর্বতের দল। তবে এই শান্তিনিকেতনে এলে ভাল ভাবেই বোঝা যায় এর মালিকের মন। পর্দা থেকে আরম্ভ করে কেদারার গদীর ওয়াড় পর্যন্ত সবই শান্তিনিকেতনি। বেশ রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। ড্রইংরুমে ঝোলান রয়েছে রবিবাবুর আঁকা অরিজিনাল্ একটি সুন্দর ছবি।

এ ছবির প্রশংসা করতে বললেন, আমাদের জাপানী আর্টিষ্টরা মডার্ণ আর্ট এত পছন্দ করেন, য়ুরোপ, আমেরিকার ছবি কত আছে আমাদের নানান্ মিউজিয়ামে, অথচ কেন যে রবিবাবুর মত হাইক্লাস্ মডার্ণ আর্টিষ্টের ছবির তত্ত্ব জানেন না এতেই আমার বিস্ময়। পাশ্চাত্যের আর্টের পাব্‌লিসিটি প্রচুর। ভারতীয় কলার এ জিনিষটি নেই। তাই বোধ হয় বিদেশীরা তেমন ভালভাবে জানে না ও সম্বন্ধে। কদর করতে পারে না ভারতীয় আর্টের। দুঃখের কথা।"

'সত্যি কথা। এখানকার টেগোর মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন্ রবীন্দ্র-নাথের শতবার্ষিকের সময়ে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। বিফল হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। সারা এসিয়ার ফিল্ম Festival হচ্ছে জাপানে। শুধু ভারতীয় ছবির অস্তিত্ব নেই। অথচ ভারত হোলো পৃথিবীর তিন নম্বর সিনেমা প্রোডিউসার!

"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর আমার জীবন গেল বদলে। তাঁর দেশ, জীবন ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও মতামত আমার মনের একটা বিরাট দিক খুলে দিলে। জানলুম এ দেশের মেয়েরা যতদিন না এগিয়ে যাবে, যতদিন না পুরুষকে সমান ভাবে সহায়তা দিতে পারবে মনে, প্রাণে আর কাজে ততদিন উন্নতির সম্ভাবনা নেই। যান্ত্রিক সভ্যতাই তো আর সব নয়। সে তো মানুষের আত্মার উন্নতির জন্যই কাজে লাগবে। তা' যদি না হয় তো বিফল হবে সে সভ্যতা। মেয়েদের কাজ কত! তাকে হতে হবে বান্ধবী, inspiration এর উৎস, গৃহিণী, হতে হবে মা। তার কাজের কি আর শেষ আছে?"

১৯৫৮ সালের প্রথম ভাগে জাপানী মহিলার দল ঘোর আপত্তি জানাতে জাপানী সরকার পার্লামেন্টে বিল পাশ করে বন্ধ করে দিলেন prostitution। সমস্ত red light districts উপে গেল দিন কয়েকে। এই আন্দোলনে ছিলেন অনেক নাম-করা মহিলা social workers। মাদাম্ তোমি কোরা তাঁদের অন্যতমা।

এঁর কাছে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের

"কবির পকেটে সদাই থাকতো একটি পকেট অক্সফোর্ড ডিক্সনারী। যখন তখন মনোযোগ দিয়ে পাতা উল্টে দেখতেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে।

বাঁ দিক থেকে :—
লেখক, লেখক-পত্নী, অজানা, অজানা, মাদাম্ ওকুরা, রেভ.রেণ্ড ইনাজু, কুনিহিকো ওকুরা।

ভোরে উঠে একলা বেড়াতেন আমাদের এই বাগানে। সে সময়ে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া বৃথা। কইতেন না কথা। বোধ হয় ধ্যান করতেন।"

"আমার কাছে কবির দেওয়া একটি জিনিষ আছে।" বললেন মাদাম্ ওকুরা। পাশের ঘরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন পোষাক বদল করে। আমরা তো অবাক্! ইনি জাপানী না ভারতীয়? গরদের চাঁপা রংয়ের শাড়ী, গায়ে বহুমূল্য রেশমের শাল। জাপানী বলে মনেই হয় না। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। চমৎকার! ছবি তোলা হ'ল তাঁর সেই শাড়ী পরা বেশে। এতদিনের জিনিষ—আশ্চর্য—পোকায় কাটেনি এতটুকু। কী যত্নে রেখেছেন এই উপহার!

ইনাজুর কথাই সত্যি। কত লোকের সঙ্গে যে সংযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের—সে কি আর লিখে শেষ করা যায়? এ দেশের নানান্ স্থানে একটু খুঁজলেই দেখা যায় কবির অটোগ্রাফ্। লেখা আছে ওঁ, মাঝে মাঝে বেদের লাইন উদ্ধৃত করা—তার বাংলা অনুবাদ। ইয়োকোহামার প্রসিদ্ধ 'হারা' পার্কে ছিল ধনী 'হারা'দের বিরাট প্রাসাদ। সেখানেও বেশ কিছু দিন কাটিয়েছিলেন রবিবাবু। 'জাপান যাত্রী' ঐ 'হারা'কেই উৎসর্গ করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই হারা-প্রাসাদ জলে খাক্ হয়ে গেল। এখন তার স্থানে আছে বিরাট একটি সুন্দর পার্ক। পার্কের এক কোণে একটি tea house আর তার সামনে পাথর ফলকে লেখা আছে "জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে কাটিয়ে গেছেন ক'টি সুখী দিন।"

"Poet Tagore-এর নাম জানে না এমন লোক নেই এ দেশে। যদি নেহাৎ না জানে তবে সে মূর্খ!" বললেন একটি Bank Clerk। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ কথা ছিল সত্য। কিন্তু আজ অন্য কথা। এ যুগের নারীদের কাছে কবির কথা নূতন। বিশেষ কেউ জানে না। মানে তাঁর লেখা পড়ে না। ভারতেই বা ক'জন পড়ে? প্রবীণরা অবশ্য অনেকেই জানেন। তাঁরা ইংরাজী বা জাপানী তর্জমা পড়েছেন রবিবাবুর লেখার। একেলে ছেলেমেয়েরা ভাল লেখা পড়ার সময়ই পায় না। Mass education ও mass communication-এর যুগে সময় কোথা? always busy! Busy and busy এদের সবার মুখে ঐ বুলি। তার চেয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনবরত T.V. প্রোগ্রাম্ দেখলে কত কি জানা যায়! বই পড়ে শেষ করতে সময় লাগে যে! সময় কোথা?

জাপানীরা পৃথিবীর নানা ভাষার সাহিত্য চোখের পলকে অনুবাদ করে ফেলে প্রকাশ করে এদেশে। বেশীর ভাগই য়ুরোপ-আমেরিকার বই। তারা এসিয়ার এককোণে থাকলেও এই মহাদেশের বিষয়ে detailed কিছুই জানে না। Culturally Western আর commercially Asian হবার চেষ্টা চলেছে এদের ভিতরে আজ। এতে ফল ফলবে সুযোগের দিক থেকে নিশ্চয়ই। দেশ হিসেবে?—সে কথা ভাবার সময় কোথায়? জাপান আজ ছুটে চলেছে। পশ্চিমের ল্যাজ ধরে। গতি একটু কম হলেও প্রায় ধরে ফেলেছে ঐ অরিজিনাল্‌কে। এই অরিজিনাল্‌কে ধরা মানেই যে আর একটা সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ জিনিষের জন্মলাভ তা—ভাবার সময় কোথায়? দরকারও নেই হয় তো।

তাই আজ এদের আধুনিক সাহিত্য, সিনেমা—থিয়েটারের গল্প, T.V. প্রোগ্রাম বেশীর ভাগই বিদেশী মালের নির্লজ্জ কপি। যেখানে এই copy-culture-এ প্রতিযোগিতার জন্য দিনরাত fertilizer তৈরীর মহড়া চলেছে—সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত অরিজিনালিটির স্থান কোথায়? মনে হয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষেরা যদি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহির্জগতে একটু জোর দিয়ে পাব্‌লিসিটি করেন তা' হলে কবি তথা ভারত সম্বন্ধে বিদেশীরা অনেক কিছুই জানবার অবকাশ পাবেন। এসিয়ার দেশ ক'টিতে, বিশেষ করে জাপানে তাঁর কদর হবেই—যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়।

প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
গ্রন্থাবলী
৬খানি সেরা বই—২।০
দি বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রতিমা পুস্তক
১৩৯-ভি-১, আনন্দ পালিত (সি. আই. টি.) রোড, কলিকাতা ১৪
শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯
● স্কুল-কলেজের বই ● উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক ●
● বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থ ●
স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

শহর কলকাতা

রবীন্দ্রনাথের বাসভবন (জোড়াসাঁকো)

বছরের বারোটি মাসের মধ্যে বোধন মাস বলে বৈশাখের একটি বিশেষ মূল্য আছে, কিন্তু আমার কাছে বৈশাখের গুরুত্ব একমাত্র সে কারণেই নয়। সে যদি বোধন মাস নাও হোত—অন্য কোন মাসের পর যদি তার উল্লেখ নির্দেশিত হোত তা হলেও সে গুরুত্ব তার কোনক্রমেই অমলিন হোত না। সেটি হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। বৈশাখ মাসটির মধ্যে যেন একটি ব্যক্তিত্বের বীজ লুকিয়ে থাকে—তারপর সহসা এক উদ্দামগতিতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্রের বেড়াজালে এ আবদ্ধ নয়। বৈশাখ মাসটিকে মনে হয় যেন যত কিছু নির্জীবতার, জড়তার, অক্ষমতার বিরুদ্ধে দীপ্ত বিদ্রোহ, গ্লানি, জরা, গ্লানিমা থেকে মুক্তির ব্যাপক প্রতিশ্রুতি। অর্চির, বায়ুর, কবির, মহাকালের মূর্তিমন্ত ঋতুরূপ।

কলকাতা শহরের মধ্যে থেকে নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি যে, বিজয়ী বৈশাখ আসছে তার বিজয়-কেতন উড়িয়ে, তার দুন্দুভি-দামামার সিংহনাদে বিশ্বভুবন প্রকাম্পত, নব-জীবনের পাঞ্চজন্যে তার ধ্বনিতরঙ্গ আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে। তার রুদ্রলীলার অগ্নিবর্ষী প্রখর তাপের দাবদাহে যত কিছু জড়িমা, গ্লানি, ব্যর্থতা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে—সারাটা শহর এক নতুন প্রাণের ধারা-স্নানে নবজীবনের স্পর্শে, এক অনা-স্বাদিত জীবন চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে জীবনের সার্থকতার মানে খুঁজে চলছে। সারাটা শহরে প্রতি পদক্ষেপে নতুন ছন্দ, নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতি এনে দেওয়াই বোধ হয় বৈশাখের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি।

বৈশাখের কাছে আমাদের ঋণ এখানেই শেষ নয়। বৈশাখ আমাদের আরও অনেক দিয়েছে—দিয়েছে বুদ্ধ, দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের শুভজন্ম মাসে কলকাতা শহরের আলোচনায় মনো-নিবেশ করলেই জোড়াসাঁকো অঞ্চলটি চোখের সামনে ভেসে আসে। এক একটি মানুষে এক-একটি পরিবার, এক-একটি পরিবারে এক-একটি পল্লী, তেমনই এক-একটি পল্লীতে এক-একটি শহর—কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে, প্রসারিত হয়েছে, ব্যাপ্ত হয়েছে এক-একটি পল্লীর অবদানে, আজকের দিনে কলকাতার যে জগদ্ব্যাপী প্রসিদ্ধি সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গশীর্ষে সে আজ সমাসীন, জগতের বুধমণ্ডলে তার যে প্রথম শ্রেণীর নির্দিষ্ট আসন—এর মূলে এক-একটি পল্লীর অবদান। এক একটি পল্লী থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী যুগপুরুষেরা। তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জোড়া-সাঁকোর দান সর্বাগ্রগণ্য।

উত্তর কলকাতার ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরেই জোড়াসাঁকোর অবস্থিতি মনে হয় তাই বোধ করি কলকাতার হৃদয়ের গোপনতম বারতা জোড়া-সাঁকোই সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছিল। বিরাট বিশাল এলাকা জুড়ে তার স্ফীতি। উত্তরে পাথুরেঘাটা, দক্ষিণে মেছুয়াবাজার, পূর্বে চোরবাগান, পশ্চিমে পোস্তা-এরই মধ্যবর্তী অঞ্চলে জোড়াসাঁকো। সিংহবাগান, কয়লা-হাটা প্রমুখ অঞ্চলগুলি জোড়াসাঁকো এলাকার মধ্যেই পড়ে যায়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। এর নামকরণ। কলকাতার অন্য কোন অঞ্চলের নামকরণ এর মত এত সার্থক নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সাঁকো জোড়াসাঁকো জুড়ে দিয়েছিল তা আজ সেতুতে পরিণত। ধ্যানের সঙ্গে ধারণার, চিন্তার সঙ্গে কল্পনার, ভাবের সঙ্গে ভাবনার, আবেগের সঙ্গে প্রেরণার উপলব্ধির সঙ্গে অনুভূতির এবং সর্বোপরি সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের

এমন অপূর্ব সাঁকো রচনা আর কে করেছে?

আজকে যে মূর্তি নিয়ে জোড়াসাঁকো আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে এ মূর্তি তার চিরকালের নয়। পৃথিবীর রঙ বদলায়, রূপ বদলে যায়, কালের স্বাভাবিক নিয়মই তাই। পরিবর্তনই পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে, রূপসী করে তোলে, বৈচিত্র্যময়ী করে তোলে। জোড়াসাঁকোকে জোড়াসাঁকো করে গেলেন যাঁরা তাঁদের আবির্ভাবের পূর্বে জোড়াসাঁকোর চেহারা অন্যরকম ছিল আবার তার এখনকার চেহারা আরেক রকম। জোড়াসাঁকোর ছবি ভাবলেই তার তিনটি মূর্তি আমাদের সামনে ভেসে আসে।

কলকাতার তখন শৈশবকাল। ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। ভয়ঙ্করের বিষাণ তখন দিকে দিকে বেজে উঠছে। আকাশে-বাতাসে চতুর্দিকে সর্বনাশের স্পষ্ট স্বাক্ষর। আরঙ্গজেবের রেখে যাওয়া ময়ূর সিংহাসন নিয়ে অপদার্থ বংশধরদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলেছে—সেই সুযোগে এক-একটি পৃথক শক্তির অভ্যুদয় হচ্ছে অখণ্ড ভারতশক্তি থেকে খণ্ডিত হয়ে, পূর্ব ভারতের একপ্রান্তে বাঙলার এককোণে সুতানুটির জোড়াসাঁকো অঞ্চলটিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তখন ভারতবাসীর নেই। আজকে পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র, ভারতের সর্বৈব চেতনার জন্মদাতা, সংস্কৃতির লীলাভূমি, জনবহুল, আলোকিত-দোকান, বাজার, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, যানবাহন, ক্লাব পরিপূর্ণ কোলাহলমুখর কলকাতার সঙ্গে সেদিনকার মোগল ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জনবিরল, দু'একটি চলার পথ, ঝোপঝাড়, অল্প শকট, তদুপরি চতুর্দিকে লেঠেল-ডাকাত-ঠ্যাঙ্গাড়েদের উপদ্রবপূর্ণ গোবিন্দপুর, কলকাতা ও সুতানুটির ব্যবধানটাও আকাশ-পাতাল। কিন্তু কলকাতার ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই একটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তার সূচনা থেকে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাকে সকল দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালিনী করে তোলার সাধনার সূত্রপাত সেদিন থেকেই। এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা সেদিন শেঠ-বসাকরা, দত্তচৌধুরীরা—বাণিজ্যে যাঁরা দেশের জয়পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান করে আসছেন দেশের বাইরে—বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্র ধরে কলকাতার দরজাগুলো খুলে দিয়ে বাইরের আলো হাওয়া বাতাসে তাকে মাধুর্য-মণ্ডিতা করে তুললেন।

নবাবী শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনে প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন নীলমণি ঠাকুর। ১৭৮৪ সালের জুন মাসের কোন একটি বিশেষ দিনে জোড়াসাঁকোর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অমৃতলোকে গৃহপ্রবেশ করলেন পিঠেভোগ থেকে আগত পঞ্চানন কুশারীর পৌত্র ও ভারত-ব্যক্তিত্বের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ নীলমণি ঠাকুর। সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাবনত শির উত্তরকালে যে বাড়ীর উদ্দেশে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে, সেই অমৃততীর্থের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হল। তখন জোড়াসাঁকোর চেহারা এক প্রস্থ বদলেছে। বসতি গড়ে উঠছে, পালকী, তাঞ্জাম জুড়ি, ল্যাণ্ডোর মিছিল

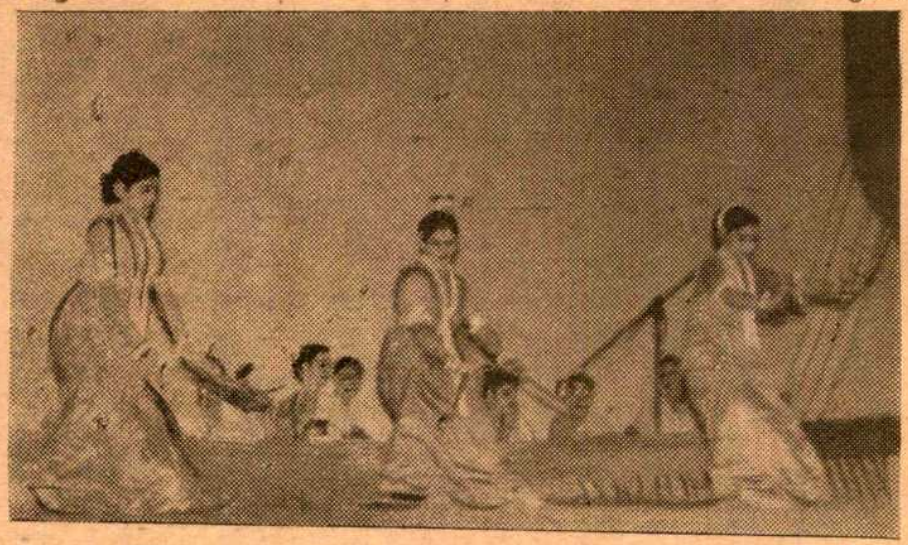

"রবীন্দ্রভারতী"তে "শ্যামা"র একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে

চলছে, জামিয়ার, নওরোঙী, কাবা, শিরপ্যাঁচ, বেনিয়ান, আচকান, চাপকান পরিহিত মানুষদের দেখা যেতে লাগল। নাচঘরগুলিতে তখন নাচের আসর, গানের জলসা, ধর্মীয় রাজনীতিক সামাজিক সম্মেলন শুরু হ'তে থাকে বাড়ীতে বাড়ীতে তখন নতুন নতুন ভাবের নব নব চিন্তাধারার আদান-প্রদান চলছে। গঙ্গা আরও পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। কলের জল এল, ঘোড়ায় টানা ট্রামের সূত্রপাত হচ্ছে। টানাপাখা শেজলণ্ঠনের যুগ শেষ হয়ে বিজলী আলো, বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন শুরু হ'ল।

জোড়াসাঁকোর স্বর্ণযুগ এসে গেল। উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির শিখরে উঠল। পাথুরেঘাটার ও কয়লাহাটার

ঠাকুরবাড়ী, কাশিমবাজার রাজবাড়ী বাঙলার মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তান কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবন, তৎকালীন বাঙলার দিকপাল ভ্রাতৃদ্বয় মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী, মল্লিক, শীল, গুপ্ত পরিবারের ভবনসমূহ, কবিকুলবন্দনীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাময়িক অবস্থান প্রভৃতি জোড়াসাঁকো ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের সম্পদস্বরূপ।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যথানিয়মে জোড়াসাঁকোরও আবার রূপান্তর ঘটেছে। তার মানচিত্রের চেহারা আজ আবার বদলেছে। আজকের জোড়াসাঁকো পেয়েছে বিবেকানন্দ রোড, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ প্রমুখ দীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথসমূহ, আজকের জোড়াসাঁকোর বিপুল জনসংখ্যা, যানবাহনের যান্ত্রিক কোলাহল হাট বাজার দোকান নিওনলাইট, সিনেমা, আকাশচুম্বী বাড়ীগুলির এবং চতুর্দিকে অবাঙ্গালী বসতির মধ্যে কয়েক ঘর বাঙ্গালী পরিবারের কোনক্রমে বসবাসের মধ্যে তার বিগত রূপটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সে রূপ মালিন্যমুক্ত হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়, থাকবে মানুষের মনের মণিকোঠায়।

চীৎপুরের অঙ্গ থেকে যে গলির সৃষ্টি, বাঁদিকে একটি শিবমন্দির অতিক্রম করে খুব নিকটেই সামনের যে বিরাট বাড়ীটার কাছে গলিটি আত্মসমর্পণ করছে সেই বাড়ীর ইতিহাসেরও আজ অধ্যায় বদল হয়েছে; এই পরিবেশের ভিতর নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে বাড়ীটি কোনক্রমে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। তার গৌরব আজ মিলিয়ে গেছে। তার বৈশিষ্ট্য আজ নিঃশেষিত, তার ঐশ্বর্য আজ শুধু গল্পের খোরাক জুগিয়ে চলছে মাত্র। নাচঘরের বত্রিশ ডেলে ঝাড়ের কলম মোছা হচ্ছে। প্রধান ফটকে এসে দাঁড়াচ্ছে ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ঢাকাই মসলিনের আবরণে বড় বড় গড়গড়া, গোলাপের রস মেশানো গয়া বিষ্ণুপুর লক্ষ্ণৌ-এর তামাক, বেলফুলের

"রবীন্দ্রভারতী"তে অভিনীত "চিত্রাঙ্গদা"র একটি দৃশ্য

মালা জড়ানো নল, একদল লোক হিসেব রেখে চলেছে কার ক পাক নলে অধিকার—আড়াই না দুই না দেড়, একদল চাকর যাঁদের বাঁধানো দাঁত আছে তাঁদের প্রত্যেকের চার সেট হিসেবে সেই কৃত্রিম দন্ত মেজে ঘসে, ঝকঝকে করে তুলেছে। খড়দার গোস্বামী মাতারা আসছেন মেয়ে মহলে পাঠ দিতে, নাপতিনী আসছে আলতা পরাতে, পাখীওয়ালা আসছে পাখীগুলিকে মুনিয়া দানা খাওয়াতে, ক্ষেত্রীরা আসছেন কাশী থেকে নতুন নতুন শাড়ী দেখাতে, কাশী, দিল্লী—কাশ্মীর থেকে আসছে শাল-জামিয়ারের বিক্রেতারা, সাহেব জহুরী আসছে অর্ডার নিতে, হলদে রঙের মানুষগুলো আসছে ছুতোরের কাজ করতে। সভাগৃহ মুখরিত, আকর্ষণীয় আসরে নতুন নতুন স্বপ্ন, নতুন নতুন কল্পনা, নতুন নতুন চেতনা এখানে জন্ম নিয়ে দিক দিগন্তরে ব্যাপ্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে—এ সব দৃশ্য আর দেখতে পাওয়া যাবে না, আলোগুলো নিভে গেছে, ঘরগুলো শোভাহীন, শূন্য, সুরের মূর্ছনা—কাব্যের ঝংকার সৃষ্টির অভিসারে আজ যবনিকা পড়েছে। সেই সব কল্পলোকের রাজকুমারেরা আজ আর নেই। তাঁদের কাজ শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা চলে গেছেন সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে। সূর্যোপাসনার প্রণামমন্ত্র উচ্চারিত হয়ে গেছে!

অতীতের সকল ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী হোয়ে বাড়ীটি আজো বেঁচে আছে। মনের কোণে তার বুকফাটা কান্না, সবহারানোর নিদারুণ বেদনার ধ্বনি আমি শুনতে পেয়েছি, হয় তো আপনিও পেয়েছেন! আজো দূর-দূরান্ত থেকে পৃথিবীর মানুষ আসে তাকে বন্দনা জানাতে, অনুভূতির মাধ্যমে তাকে জিগ্যেস করতে—কেমন আছ? তার পবিত্র

ধূলিকণা শ্রদ্ধাবনত মানুষের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, দিক থেকে দিগন্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

কিন্তু তারা কি দেখে এসে? তারা দেখে যে, জীবনযৌবনের লীলাভূমি আজ মরুভূমিতে পর্যবসিত সংস্কৃতির জন্মভূমি এই অমৃতলোক আজ চরম অবহেলা, অনাদরে জরাজীর্ণ, ম্রিয়মাণ, ভগ্নপ্রায়। তারা দেখে যে অগ্রগামী, সুসভ্য বাঙালী তাদের জাতীয় জীবনচেতনার সকল উৎসের স্রোতোমুখ নির্মমভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তারা সাবধানে ঢোকে, সাবধানে বেরোয়, কখন বুঝি দেয়াল থেকে খানিকটা চাঙ খসে পড়ে এই আশঙ্কায়—কিন্তু এর জন্যে কে দায়ী? এর জন্যে একটি বিশেষ পরিবারকে আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দায়ী করা চলে না—এর জন্যে দায়ী সারা জাতি। বছরে দু'বার কেবলমাত্র একটি ফুলের মালা নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে পরিয়ে দিয়ে একটি কাষ্ঠপ্রণাম জানিয়েই কি জাতীয় কর্তব্য পালন শেষ করা যায়?

তবে হ্যাঁ। অন্ধকারের অত্যাচারই আলোকের রথকে বেগবান করে তোলে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় দুর্যোগ সঙ্কুল ত্রিযামরাত্রির কালো মেঘ সরে গিয়ে মেঘমুক্ত আকাশ আবার ভরে ওঠে লোহিতবরণ প্রভাতসূর্যের প্রসন্ন রশ্মিতে, অনেক বেদনার দুর্গম অপরিসর কণ্টকিত পথ পেরিয়ে সার্থকতার তোরণ দুয়ারের চাবিকাঠি মেলে। আমরা এখানেও আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি। সরকার আজ নিজে এগিয়ে এসেছেন এই পুণ্যমন্দিরের মহিমাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখতে। একে রক্ষা করতে, নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে এর দীপ্তি, বিরাটত্ব, মর্মবাণীকে অম্লান রাখতে।

রবীন্দ্র অবনীন্দ্রের জন্মভূমি—ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক ভাষায় যথাক্রমে বড়বাড়ী ও বৈঠকখানা বাড়ী—আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের অক্লান্ত কর্মোদ্যমে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তার গৌরব আজ আরও বিবর্ধিত হতে চলেছে। এই বাড়ীর রুদ্ধবাতায়ন আবার উন্মুক্ত হয়েছে, এর কক্ষগুলিতে আবার পড়ছে বলিষ্ঠ চরণচিহ্ন এর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আবার লাগছে নবজীবনের স্পর্শ। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই তীর্থ প্রাঙ্গণে সমাগত আশা, আনন্দ, আলোর জীবন্ত বিগ্রহের দলের সম্মিলিত সাধনায় জাতীয় জীবনের নতুন দিগন্তের দ্বার আবার উন্মোচিত হবে তাঁদের সাধনায় আজকের স্তিমিত বাঙালী জাতির জীবনে আসবে নতুন স্পন্দন। পত্তন হবে নতুন প্রাণের। জাতীয় জীবনের আবার নতুন ভাষ্য রচিত হবে। জাতির মানসচেতনায় আবার লক্ষ প্রদীপ জ্বলে উঠবে। এই বাড়ীর আদর্শ, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে এঁরা আবার সৃষ্টি করবেন নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি, জন্ম দেবেন নতুন ইতিহাসের। আমি সেই পরম পুণ্য লগ্নের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছি, আমি সেই পরম পুণ্য লগ্নের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুণব।

সুন্দর প্রকাশনের সুন্দরতম নিবেদন

নেতাজির একান্ত সহকর্মী—

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত :

"নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ"

বহু তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত

এবং

দেশবন্ধু সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর

আশীর্বাণী সম্বলিত

প্রথম খণ্ড—দাম বারো টাকা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ :

ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ প্রস্তুতির পথে

আমাদের কয়েকখানি অসামান্য বই :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব) মূল্য—৫৲

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

ললিত বিভাস মূল্য—১০৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের—

নারী ও নগরী মূল্য—৫৲

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

হার মানালে গো মূল্য—৩৲

বিশ্বনাথ রায়ের—

নতুন দিনের আলো মূল্য—২·৫০

সুন্দর প্রকাশন

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতারত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বের সঙ্গে ভারতের আত্মিক যোগ সাধন ঘটিয়েছেন তিনজন মহাপুরুষ। মহাত্মা রামমোহন। স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানই সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশের মাটিকে নব ভাবাদর্শে তিনি যেমন রসায়িত করেছেন, তেমনি দেশের মানুষকে প্রাণচ্ছন্দে, আশায়-আনন্দে, সুখে দুঃখে উদ্দীপিত করে তুলেছেন। এই স্বদেশ ও তার মানুষকেই তিনি বিশ্বের সম্মুখে পরিচিত ও সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই পরিচিতি—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সুমধুর ঐক্যেই সম্ভব। হোক নানা বিচিত্র দেশ, তবু প্রাণের ঐক্যেই বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি ঐক্যকে সম্ভব করেছেন। নিজের দেশ এবং সমস্ত জাতিকে এইভাবে আন্তর্জাতিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তোলা একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ভাবের জগতের মানুষ হয়ে শুধু কল্পনাই করেন নি, বাস্তবক্ষেত্রে 'বিশ্বভারতী'র মতো প্রতিষ্ঠানকে স্বীয় অনুভাবনার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জগতের সার্বিক মানুষের কল্যাণের জন্যই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্র জন্ম-শত পূর্তি উপলক্ষে দেশে দেশে কবির ধ্যান-ধারণাকে উপলক্ষ্য করে যে মহা-মিলনের ও বিশ্ব-মানবতার সুর-ই ফুটে উঠেছে, তদ্বারা মহাকবির প্রতি সারা পৃথিবীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে'—কবির এই বাণী সার্থক, সুন্দর ও সত্যরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মহা অবদানের

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ হ'তে নিমন্ত্রিত সংগীতগোষ্ঠী লণ্ডনে 'মহাত্মা গান্ধী' হলে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন দেশে কবির প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে, তা পাঠ করে আজ আমরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

'রবীন্দ্রনাথ টেগোরা' এই এক নামে পশ্চিম জার্মানী আজও সহজ স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল। ১৯১৩ সনে আন্তর্জাতিক সম্মানপত্র পাবার পর থেকেই জার্মানী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করে। য়ুরোপে সর্বপ্রথম যে রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়, তা বার্লিন থেকে ক্রিমার জার্মান ভাষাতেই প্রথম প্রকাশ করেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সমগ্র জার্মানভাষীদের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কবির জার্মান ভ্রমণের রাজকীয় সম্মান লাভের ভেতর। ১৯২১, ১৯২৬ ও ১৯৩০ এই তিনবার কবি এসেছিলেন জার্মানীতে, প্রতিবারই তিনি যেখানে গেছেন, যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানেই জনসাধারণ অভূতপূর্ব সম্মান জানিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ৬০ বৎসর বয়সে ১৯২১ সনে মে মাসে জার্মানীতে অবতরণের মুহূর্ত থেকে তিনি জার্মানবাসীর চিত্ত জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ডারম্‌ষ্টাডের নিউ প্যালেসে অবস্থানকালে যে জনসংযোগ ও জন সম্বর্ধনায় তিনি সাতটি দিন অতিবাহিত করেছিলেন, তার সঙ্গে জার্মান জাতির নাড়ীর যোগ ছিল। ডারম্‌ষ্টাডের কাছে হেরগটসবার্গের এক আশ্চর্য অরণ্য প্রান্তে কবিকে সেখানকার অধিবাসীরা শুনিয়েছিল জার্মান লোকসঙ্গীত। তার পর সম্মুখে-পশ্চাতে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা সহকারে তারা রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিয়েছিল গৃহে। একজন সামান্য বৃদ্ধ মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তরে আরেকজন বলেছিল, "হ্যাঁ, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু তিনি শুধু ভগবদ্বিশ্বাসী নন, তিনি মানুষের প্রতিও বিশ্বাসী।" জার্মানীর প্রধান প্রধান নগরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সব দিনে কবি সৌভ্রাত্রের, প্রীতির ও বিশ্বাসের বাণী শুনিয়ে এসেছিলেন।

তারপর তাঁর শততম জন্মজয়ন্তী দিনে আর একবার দেখা গেল "রবীন্দ্রনাথ টেগোরা" নামে সমগ্র পশ্চিম জার্মানীকে মুখর হতে। বার্লিনে অবস্থানকারী ভারতীয়েরা এক সপ্তাহব্যাপী যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন করেছিল, বার্লিন সিনেট তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। বিশ্ববিখ্যাত কংগ্রেস হলে (Hall) এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন আমাদের রাষ্ট্রপতির মহান বন্ধু ডাঃ প্রফেসর থিয়োডোর হয়েস। অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠানের জন্য কোথাও কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রবীন্দ্র প্রতিকৃতি, কোথাও "ভারতীয় ও জার্মান" উভয়ের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাট্যের আয়োজন হয়েছিল, কোথাও বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রাপার্টি বাজনা বাজিয়েছিল। সেদিনের বার্লিন, মারবার্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শহরে কবির কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল, আর এই সেদিন মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের পর সদ্য গড়ে ওঠা পশ্চিম বার্লিনের বুকে কবির সৃষ্ট চরিত্রের ও সঙ্গীতের কথা ও সুর আবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু তবু এ কথা নির্দ্বিধায় ও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিকে এখনও সমগ্রভাবে তুলে ধরা হয় নি পশ্চিম জার্মানীর কাছে। বিশেষ করে প্রয়োজন অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর কবিতার আনন্দ আস্বাদনের ও রসানুভূতির পর্যাপ্ত আয়োজন করা।

ইংলণ্ড ও রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী ঃ

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাত্রা করেন, তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য ছিল অপরিসীম। সাধারণভাবে ভারতীয়দের তখন মনে করা হত অসভ্য, নীচ ও উদ্দেশ্যহীন। হয়ত এইটেই তখন অনিবার্য ছিল কারণ ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের স্বপক্ষের একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, ভারতীয়রা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত। মেকলে থেকে কিপলিং পর্যন্ত ছোটো-বড়ো নানা লেখকের রচনাই বৃটেনে এই ধারণার ব্যাপক প্রসারের জন্য দায়ী।

ভারতবর্ষ ঐ সময়ে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুলাংশেই। রবীন্দ্রনাথ তখন বারবার বিদেশ যাত্রা করেন শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে

পরিচয় নিবিড়তর করার জন্যই নয়, বিশ্বের দরবারে যে ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটছিল দিনের পর দিন, তারই সঙ্গে পশ্চিমকে পরিচিত করার মহান দূত হিসাবেই প্রধানত তাঁর বিদেশযাত্রা।

কবির বিভিন্ন দেশে পর্যটনমাত্রই অবশ্য সার্থক হয়েছিল পূর্ণমাত্রায়। তবু ১৯১২ সালের জুন মাসে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যার উইলিয়াম রদেনষ্টাইন এবং আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের আমন্ত্রণে কয়েকটি কবিতার ইংরেজী তর্জমা নিয়ে তাঁর ইংলণ্ড ভ্রমণই শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে।

১৯৬২ সনে তাই বৃটেনে যে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুষ্ঠানের পরেই বৃটেনের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন সব থেকে সার্থক হয়েছিল। ব্যাপক সমর্থন ও যোগদান, বৈচিত্র্য ও বৃটিশশোভন পারিপাট্যের দিক থেকে।

শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি জগতের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে যোগস্থাপন করেন বৃটেনের 'রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কমিটীর' সঙ্গে। সভাপতি হলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান। তিনি আবার সেই সুবিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, ম্যাক-মিলান পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার যেটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় দুনিয়ার পরিচয় ঘটিয়েছে কবির বহু গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমা প্রকাশন মারফৎ।

সঙ্গীত জগতের পল রোবসন (বর্তমানে তিনি বৃটেনের বাসিন্দা) ইয়েহুডি মেনুহিন, স্যার ম্যালকম সার্জেন্ট, স্যার আড্রিয়ান বুল্ট, ডাঃ আর্নল্ড বাকে, মিস হেপজিবা মেনুহিন সক্রিয়ভাবে যোগ দেন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে।

অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল ও অধ্যাপক পি, এম, এস ব্ল্যাকেটের মত জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী; ডেম সিবিল থর্ণডাইক, ডেম পেগি এশ্‌ক্রফট,

কবিগুরুর নাটকে বিদেশীদের অভিনয়ে ভারতীয় পরিবেশ, বেশভূষা দ্রষ্টব্য

স্যার লিউয়িস ক্যামন, মিঃ জন নেভিল, মিস বার্বারা জেফর্ডের মত খ্যাতনামা মঞ্চশিল্পী; রাজকবি জন মেসফিল্ড; দার্শনিক জন লিউইস; বেতার প্রচারক মিঃ হ্যালাম টেনিসন (তিনি বিখ্যাত কবির পৌত্র); গ্রন্থকার ও ঔপন্যাসিক স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জি ও মিঃ জ্যাক লিণ্ডসে; সাংবাদিক মিঃ কিংসলি মার্টিন, মিস ডরোথি উডম্যান, ডিক্টর এ্যানাল্ট; ঐতিহাসিক অধ্যাপক এ, এল, ব্যাশাম ('ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক) ও মিঃ এরিক হবসব্যম; শিল্প সমালোচক মিঃ জন বার্গার ও মিঃ ডবলিউ, জি, আর্চার; ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিঃ ফ্র্যাঙ্ক কাজিনস এবং লর্ড হেলশ্যাম, লর্ড হারউড, লর্ড এ্যাটলি, মিস্ জেনি লী, মিঃ হ্যারল্ড উইলসন, মিঃ আর, সোরেনসেন, লেডি হারউড, মিঃ এ, গ্রিনউড, মিঃ জে, গ্রিমণ্ড ও মিঃ আইভর মন্টেগুর মত রাজনীতি-জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কমি সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

লণ্ডনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহ ধরে। আর, এডিনব গ্লাসগো, ব্রিস্টল, লিডস, বার্মিংহ্য ম্যাঞ্চেষ্টার, লঙ্গররো, কার্ডিফ প্রভৃ অন্যান্য বড় বড় শহরগুলিতে চ আরো কিছুটা কম সময় নিয়ে লণ্ডনের অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গগুলি ি এই রকম:

১। ওল্ড ভিকস কর্তৃক ইংরে ভাষায় 'চিত্রা' অভিনয়;

২। কমনওয়েলথ গ্যালারি কবির চিত্রপ্রদর্শনী;

৩। মহাত্মা গান্ধী হল-এ 'শি মানবতাবাদী ও মানুষ রবীন্দ্রন সম্পর্কে সারাদিনব্যাপী আলো সভা;

৪। ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েট শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের 'তিনকন্যা'

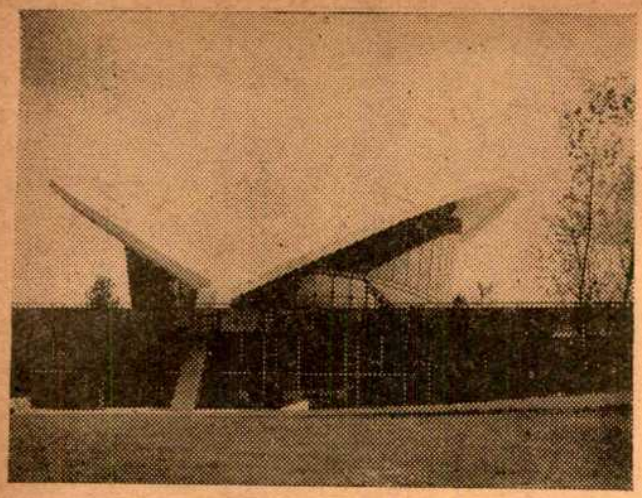

মার্কিন স্থপতি হার্গ ষ্টারন্স নির্মিত আধুনিক অট্টালিকা বার্লিনের কংগ্রেস হল। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হয়।

কবির জীবনবিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন ও সর্বশেষে

৫। রয়াল এলবার্ট হল-এ এক বিশাল জনসভা।

কবিগুরুর 'চিত্রা' ইংরেজীতে প্রথম অভিনীত হয় ১৯১৪ সনে, লণ্ডনের সেণ্ট জেমস'স থিয়েটরে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শিল্প সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে। নাটকটির অন্তর্নিহিত বাণী এবং কবির অভিপ্রেত আড়ম্বরহীন পরিবেশনশৈলী উভয়ই সমালোচক মহলের এই উৎসাহের জন্য দায়ী।

ডেম সিবিল থর্ণডাইকের উপরে যখন শতবার্ষিক উৎসবে অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচনের ভার পড়ে, তিনি যে তখন আবার ঐ 'চিত্রা'কেই বেছে নেন—এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনিও সেক্সপীয়র নাটক অভিনেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মিঃ জন নেভিল ওল্ড ভিক্‌সে ঐ নাটকের প্রযোজনা করেন আশ্চর্য নিপুণভাবে। বিশেষ করে মিস বার্বারা জেফোর্ডের অভিনয় প্রশংসা অর্জন করে দর্শকমাত্রেরই।

ভারতীয় শিল্পের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, মিঃ ডব্লিউ, ডি, আর্চার কর্তৃক আয়োজিত কবির চিত্রপ্রদর্শনীর সাফল্য অনুষ্ঠান কমিটীর সদস্যদেরও বিস্ময় উদ্রেক করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইয়োরোপই প্রথম একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করে। লণ্ডনের শিল্পসমজদার মহল ভোলেনি যে, কবি বেশ পাকাপোক্তভাবে তুলি ধরেন ৬৮ বছর বয়সে এবং তাঁর জীবনের শেষদশকে ছবি আঁকেন প্রায় ৩০০০ এর মতো, এর মধ্যে অনেকগুলিই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচায়ক।

সারাদিনব্যাপী আলোচনাসভায় যোগ দেন বহু বিশিষ্ট রবীন্দ্র অনুরাগী। মিঃ জ্যাক লিণ্ডসের একটি খুবই অভিনব রচনার বিষয় ছিল 'মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ।' জনাকীর্ণ মহাত্মা গান্ধী হলে অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল বক্তৃতা করেন 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বশান্তির সমস্যা' বিষয়ে। ডেম পেগি এশক্রফট কবির যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি করেন তার মধ্যে ছিল 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটি। আলোচনা সভা শেষ হয় ডাঃ আর্ণল্ড বাকের বক্তৃতায়। ইয়োরোপে যে কয়েকজন ভারতীয় সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে এতাবৎ আয়ত্ত করতে পেরেছেন ডাঃ বাকে তাঁদের অন্যতম। কবির জীবদ্দশায় তিনি শান্তিনিকেতনে কাটান চার বৎসর এবং নিখুঁতভাবে চর্চা করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের। ডাঃ বাকে তাঁর বক্তৃতার মাঝে মাঝে পরিষ্কার ও দরাজ গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের নমুনা প্রদর্শন করেন। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন ভারতীয় তাঁরা বিশেষ চমকিত হন ডাঃ বাকের গানে।

অনুষ্ঠানের মূল ঘটনা হল লণ্ডনের বৃহত্তম 'হল', কেনসিংটনের রয়াল এলবার্ট হলের বিরাট জনসভাটি। এর সভাপতিত্ব করেন বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি, এন, কাউল। প্রধান অতিথি ছিলেন লর্ড হেলশ্যাম।

বিশাল জনসভার সামনে লর্ড হেলশ্যাম ইয়োরোপ ও সারা বিশ্বে ভারতের বাণী প্রচারের চেষ্টার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ঐ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কবি য়ুরোপীয় সভ্যতার ভালো দিকগুলি যাতে তাঁর দেশে গৃহীত হয় তার জন্যও যে সচেষ্ট ছিলেন তারও উল্লেখ করেন। কবিকে উদ্ধৃত করে লর্ড হেলশ্যাম বলেন, 'তোমাদের হাত থেকে কোন দান আমরা গ্রহণ করতে পারি না, যদি না প্রতিদানে আমরাও তোমাদের কিছু দিতে পারি।' শান্তি মানুষের অগ্রগতি ও বিদেশী শাসনের থেকে ভারতের মুক্তি সম্পর্কে কবির গভীর আবেগের কথাও লর্ড হেলশ্যাম বলেন।

ইংলণ্ড (এবং য়ুরোপের অন্য দেশগুলিতেও) কবির আবির্ভাব ঐ মহাদেশের মানুষদের চোখ খুলে দেয়। বহু দশক ধরে ভারতের বিরুদ্ধে যে বিরূপতার প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছিল য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব আবির্ভাবের আঘাত তা সহ্য করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। লর্ড হেলশ্যাম বলেন যে, কবির রচনা, জনসভায় তাঁর ভাষণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ইংলণ্ডে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করে যে, ইংলণ্ডের একটি সমসাময়িক পত্রিকা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে:

'এতাবৎ আমরা ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে যত যুক্তির সম্মুখীন হয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন তার মধ্যে সব থেকে জোরদার।'

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ ঃ

পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যিখানে কৃত্রিম বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে দুই পরস্পর বিরোধী দর্শনের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করার ব্রত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নতুন পৃথিবী' আমেরিকা ভ্রমণে আসেন। তিনি জানতেন পশ্চিমের আশ্চর্য আবিষ্কার উদ্ভাবনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তাকে যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে শুধু দরিদ্র ভারতবর্ষ কেন গোটা দুনিয়ার বুক থেকেই দারিদ্র্যকে মুছে ফেলে দেওয়া যাবে। তার বিনিময়ে জড়বাদী, অসহিষ্ণু পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে খুলে দেবেন ভারতীয় জ্ঞানের, সহনশীলতা আর আধ্যাত্মিক শান্তির ললিত বাণী। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে যে সঙ্গীতকাব্য, সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, যার মধ্যে প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শবাদ বিমূর্ত, স্বাধীনতার লীলাভূমি সেই আমেরিকার জনজীবনে তা সঞ্চারিত করার জন্যেই কবিগুরুর পাঁচ-পাঁচবার আমেরিকা আগমন।

১৯১২ সাল অক্টোবর মাস। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমেরিকার মাটী স্পর্শ করলেন। কোনো অভ্যর্থনা নয়, প্রচার নেই কোনো। বাংলাদেশের একজন কবি এসে ইলিনয়ের বিশ্ব-বিদ্যালয় সহর উর্বানায় এসে উঠলেন। তারপর সেখান থেকে চিকাগোতে কলারসিক শ্রীমতী উইলিয়াম ভন মুডীর বাসভবনে অতিথি। শান্ত নির্জন পরিবেশে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো রবীন্দ্রনাথের, তাঁর 'সাধনা' রচনায় ব্যস্ত তিনি। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি তখনো ভৌগোলিক সীমারেখা না হলেও মুষ্টিমেয় কবি-সাহিত্যিক মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নোবেল প্রাইজ তিনি তখনো পাননি, তাঁকে চিনবে কে? সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী মুডীর বাড়ীতে রবীন্দ্রানুরাগী কয়েকজন আমেরিকান কবি সাহিত্যিক মিলে বাংলাদেশের এই 'মিষ্টিক' কবিটিকে ঘিরে চুল্লীর ধারটাতে গিয়ে বসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে তাঁর বাংলা কবিতা, ইংরাজী অনুবাদের আবৃত্তি। রসজ্ঞরা বিস্ময়-আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন, এমন উচ্চাঙ্গ ভাব যাঁর কাব্যে, এমন মধুর যাঁর ভাষা তিনি বিশ্বকবি বলে বন্দিত হতে দেরী নেই আর। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো কবিখ্যাতি। চিকাগোর বিশিষ্ট কাব্য সংকলন 'পোয়েট্রি' গীতাঞ্জলির ছটা কবিতা (ইংরাজীতে) প্রকাশ করে কবিকে সম্মানিত করলো।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভ্রমণ সমস্ত আমেরিকাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে তখন কে না চেনে। তাঁর আগমন-বার্তা পেয়ে আমেরিকান পত্র-পত্রিকাতে সাড়া পড়ে যায়। কবি সম্বন্ধে তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছবি কবির জীবনী ছাপাটা পত্রিকাগুলোর পক্ষে আভিজাত্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়ালো। বিখ্যাত 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পুরো এক পাতা রবীন্দ্রনাথের জীবনী, তাঁর এক পেন্সিলে স্কেচ আর ১১টা কবিতার পুনর্মুদ্রণ করে। 'সানডে বুক রিভিউ' কবির 'মালঞ্চ'র সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বিখ্যাত মার্কিনী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনা করে। এখানে ওখানে

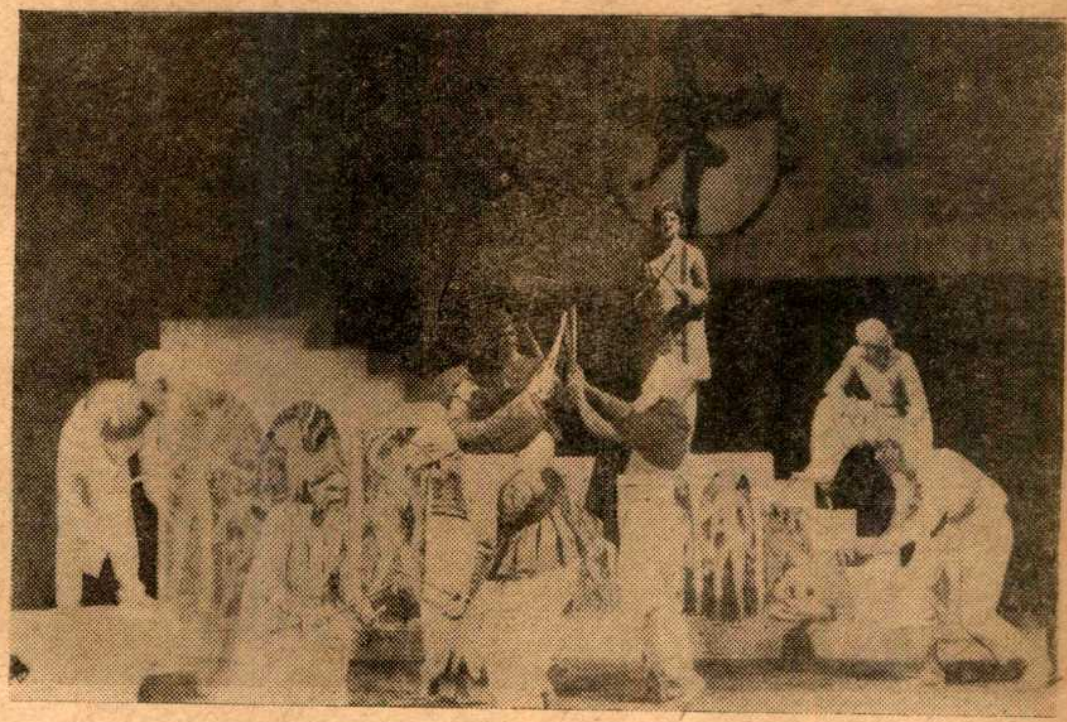

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত 'রক্তকরবী' নাটকের একটি মনোরম দৃশ্য

কবিকে নিয়ে সভা-সমিতি হলো, ছেলেদের ক্লাব, মেয়েদের সমিতি, এমন কি চার্চের পাদ্রীরা পর্যন্ত কাব্যসাহিত্য, তাঁর নতুন জীবনদর্শন আলোচনা করলেন, উল্লেখ করলেন তাঁর ঈশ্বরভক্তির কথা। সল্টলেক সিটি, ডেনভার, ও রেগঁ, নিউইয়র্ক, চিকাগো, ক্লেভল্যাণ্ড, বোস্টন ইত্যাদি ১৫টা জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন, ধন্য ধন্য পড়ে গেল সর্বত্র, প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের নতুন দ্বার গেল খুলে। সেই সঙ্গে স্টেইট বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

১৯২৯ সালে কবি চতুর্থবারের মত এলেন মার্কিন মুলুকে। ইতিমধ্যে তাঁর নৌকাডুবি, পলাতকা, গোরা, রক্তকরবী, মানবধর্ম, কাব্যসংকলন ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ এদেশে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে সুধীসমাজে আদৃত হয়েছে। এবারেও প্রাচ্যের এই কবি-দার্শনিক বহু বন্ধু লাভ করেন সুদূর পৃথিবীর এই প্রত্যন্তদেশে।

রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত আমেরিকায় আসেন ১৯৩০ সালে। ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ চলছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাজার হাজার আমেরিকান সুহৃদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বললেন, কলম্বাস যে সমুদ্রযাত্রা সুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করতে হবে, ভারতের সমস্যা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে হবে পশ্চিমী দুনিয়াকে। সভা হলো এখানে-ওখানে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজ। ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতি ও আমেরিকার ইণ্ডিয়া সোসাইটির যুক্ত উদ্যোগে বিখ্যাত বিল্টমোর হোটেলে যে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সদ্য নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত প্রখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক সিনক্লেয়ার লুইসও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্যাসিষ্ট শক্তির দাপটে যখন সভ্যতা ধ্বংসের সম্মুখীন, রবীন্দ্রনাথ জানালেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে, যাতে আমেরিকা তার অমিতশক্তি নিয়ে ধ্বংসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন।

তার কয়েক মাস বাদেই আগষ্ট (১৯৪১) মাসে বিশ্বকবির লোকান্তর ঘটে।

১৯৬১ সালে সারা বিশ্বে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হলো মহাধূমধাম করে। আমেরিকাও কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ বিশ্বযজ্ঞ থেকে পোছয়ে রইলো না। শহরে শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে গঠিত হলো বহু ঠাকুর শতবার্ষিকী

নিউইয়র্ক শহরের টাউন হলে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনারত স্বর্গত রবার্ট ফ্রস্ট।

বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থও ভালো সংগ্রহ হলো।

১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে কবি তৃতীয় বার আসেন এবং '২১ সালের মার্চ পর্যন্ত থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তাঁর এই ভ্রমণ অর্থসংগ্রহের দিক দিয়ে এবং মানসিক দিক থেকেও খুব সন্তোষজনক হয় নি। কিন্তু তবুও তাঁর নাট্যানুষ্ঠান ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট টাকা তুললেন শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য। নিউইয়র্কের শ্রীমতী উইলার্ড

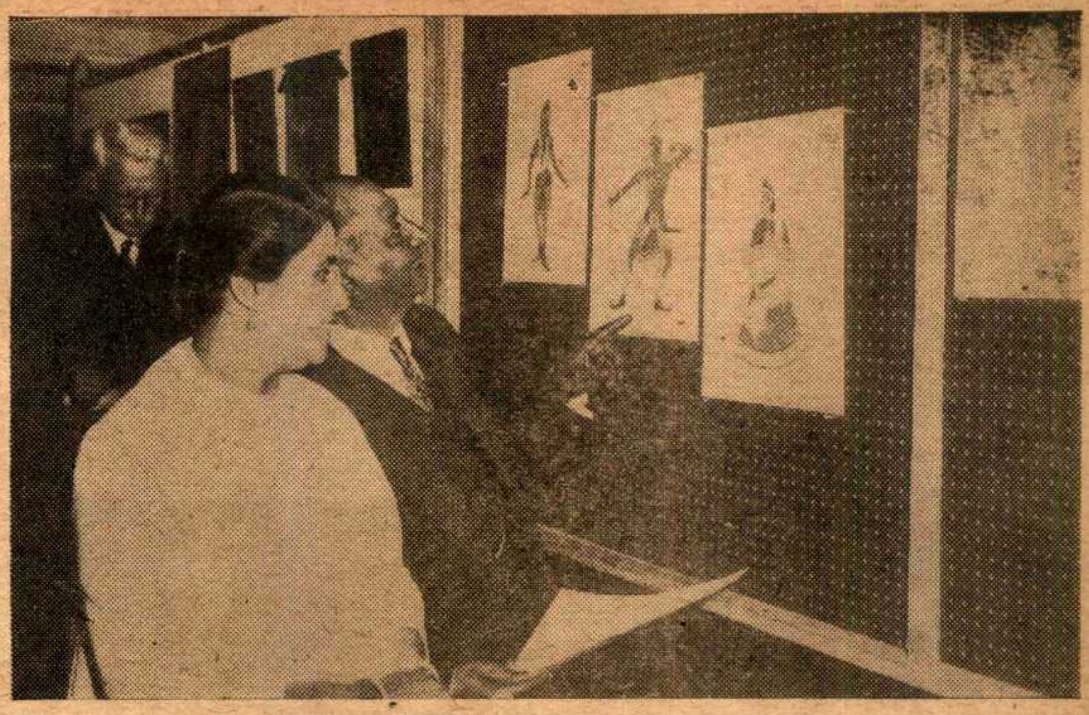

আমেরিকায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আর্ট সোসাইটির চিত্র প্রদর্শনী

উৎসব কমিটী। পরম সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হলো শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানগুলো। তাঁর কবিতার আবৃত্তি হলো, গান গাওয়া হলো, রচনা পাঠ ও তাঁর নাটক অভিনীত হলো। মাসের পর মাস মার্কিন ভারতীয় ভূমিকা-লিপি সম্বলিত 'অচলায়তন' অভিনীত হলো—প্রশংসা কুড়োলো শিশু-বৃদ্ধ-নরনারী নির্বিশেষে প্রতিটি আমেরিকান দর্শকের। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করলেন বিখ্যাত আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট, ঔপন্যাসিক শ্রীমতী পার্ল বাক। সাংবাদিক নরম্যান কাজিনস প্রমুখ দিকপালেরা। ভারতবর্ষ থেকেও গেলেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক নরেশ গুহ, অধ্যাপক পুণ্যশোক রায়, প্রভাকর মেকুয়ি, ডঃ অমিয় চক্রবর্তীও (বোস্টন বিশ্ব-বিদ্যালয়) যোগ দিলেন। সমস্ত আমেরিকা মহাদেশে রবীন্দ্রনাথের নামে স্বতস্ফূর্তভাবে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। অনুষ্ঠানগুলোর সাফল্য কামনা করলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, প্রেসিডেন্ট কেনেডি। রবীন্দ্রনাথের রচনা না পড়ে থাকাকে আমেরিকার সুধীসমাজ অপরাধ বলে মনে করে আজ। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের তিনি পরমসম্মানীয় কবি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রচর্চা ঃ

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভা যে শুধু আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে নবরূপ দান করেছে তা' নয়, নিখিল মানবিকতার প্রশস্ত পথে মানুষের জয়যাত্রার বৃহৎ শোভাযাত্রায়ও তাকে নিয়ে দাঁড় করালেন। সম্প্রতিকালে স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে বন্ধুতা এবং মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—ভারতের জোট নিরপেক্ষ শান্তিবাদী পররাষ্ট্রনীতির ভিতর দিয়ে যার প্রতিফলন ঘটেছে, তারও ঐতিহাসিক কারণ রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিরাটাকৃতি সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, তাঁর সমগ্র রচনা এবং বাণী কতগুলো 'সত্যের' প্রতি তন্নিষ্ঠ। আর এ সত্যগুলো বাংলা বা ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং কর্মে প্রকাশিত হলেও স্বদেশের মানুষের সম্পদ। তার কারণ তাঁর কাব্যের পরিধি বিশ্বব্যাপী মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে ধরে আছে। এই কারণেই পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আজ রবীন্দ্র চর্চার এত প্রসার।

আলোচ্য রচনায় সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্র-রচনার প্রচার এবং প্রসার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের এবং সাম্প্রতিককালে এই বন্ধুতার গুরুত্ব শুধু উভয় দেশের ক্ষেত্রেই নয় আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রেও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একথা বহুল প্রচারিত যে, অধুনা সোভিয়েট দেশে ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ চর্চা চলছে এবং বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সোভিয়েট পাঠকদের মধ্যে অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সোভিয়েট দেশে ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বাধিক পঠিত। নোবেল প্রাইজ পাবার পরেই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি পাশ্চাত্য দেশগুলির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একথা অনেকাংশে

সত্য। নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুদিন পরেই এবং ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পূর্বেই সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলীর (গল্প, কবিতা ও পত্রাকারে রচিত নিবন্ধ) রুশ অনুবাদ ১৯১৪ সালে পর পর দু'টি সংস্করণে মুদ্রিত হয় এবং পরে ১৯২৬ সালে পুনরায় এর বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন এই রচনাগুলি প্রধানত ইংরেজী অনুবাদ থেকেই অনূদিত হয়েছিল। তাই এগুলো প্রায়ই ছিল অনুবাদের অনুবাদ। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর প্রাচ্য দেশগুলির প্রতি রুশ চিন্তা-নায়কদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়। এবং বিপ্লব পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য অনেক সোভিয়েট "ভারত-তত্ত্ববিদ" বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে এঁদের অনেকে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদের কাজে ব্যাপকভাবে হাত দেন।

১৯৫৫-৫৭ সালে মস্কোর রাষ্ট্রীয় কথাসাহিত্য প্রকাশালয় থেকে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলী আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই রচনাবলী মোট ৯০ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে কিছুদিন পরে নতুন করে ১২ খণ্ডে বৃহত্তর রবীন্দ্র রচনা-বলী প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই নতুন সংস্করণের শেষ দুই খণ্ডে থাকবে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পত্রাবলী ও বক্তৃতা। এই ১২ খণ্ডের রবীন্দ্র-রচনাবলীর অনু-বাদকগণের মধ্যে আছেন সের্গেই লিপকিন, ভেরা তুশানোভা, নিকোলাই তিখনফ, তাতিয়ানা স্পেন্দিয়ারোভা, ভিক্তর রোজদেস্ত্-ভেন্স্কি, এস. সেভেৎসেফ প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতনামা সোভিয়েট কবি ও অনুবাদকগণ। এই নতুন ১২ খণ্ড সংস্করণের প্রথম দু'টি খণ্ড ১ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয় এবং ইতিমধ্যেই তার সমস্ত কপি বিক্রয় হয়ে গেছে।

এছাড়া সোভিয়েটে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে-বাইরে বউঠাকুরাণীর হাট ও নির্বাচিত গল্প-সংগ্রহ প্রভৃতি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত রাশিয়ায় রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসগুলির মোট মুদ্রণ-সংখ্যা হচ্ছে ১১ লক্ষ ৪০ হাজার এবং রবীন্দ্রনাথের ১১২টি গ্রন্থ ২০টি জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার মুদ্রণ সংখ্যা হচ্ছে ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার। উপরের এই তথ্যই সোভিয়েট ইউ-নিয়নে রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি রুশ জনগণের অনু-রাগের সাক্ষ্য বহন করছে।

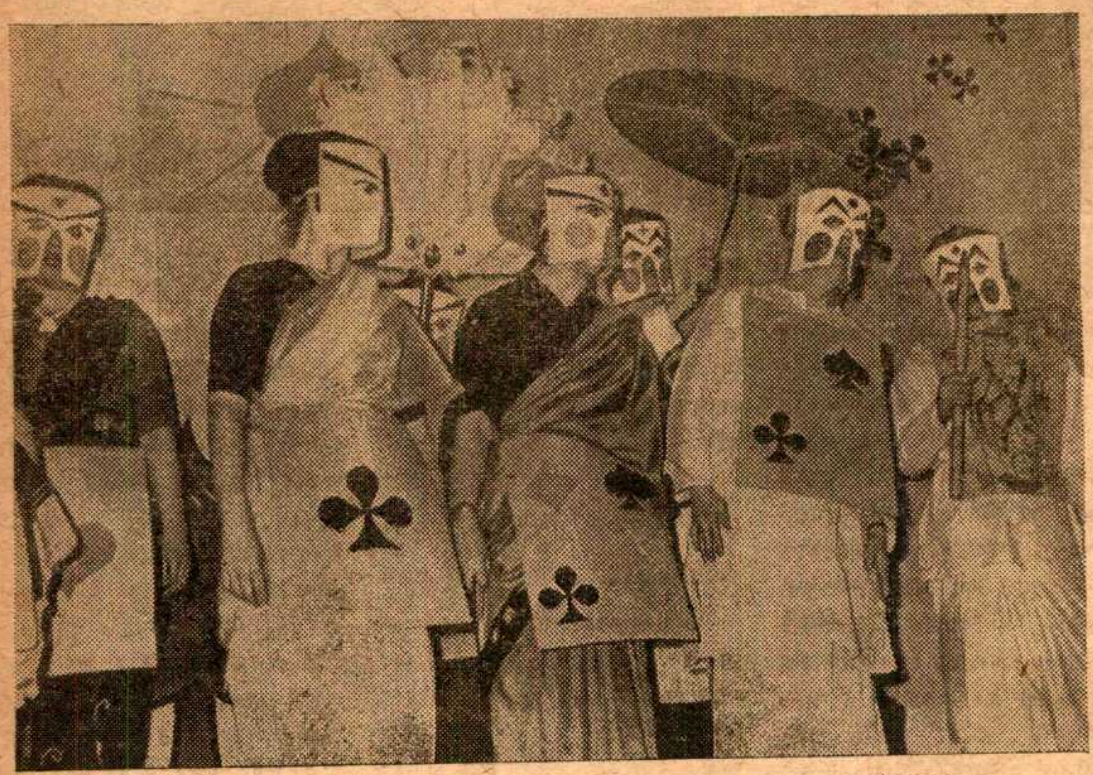

লেনিনগ্রাদে বাংলায় তাসের দেশ অভিনয়ের ছবি

রবীন্দ্র সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা

* হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় *

বর্তমান কালে রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের কাছে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বিরাজমান। তার ভাষার মাধুর্য এবং ভাবের মর্মস্পর্শিতা আমাদের মনকে অতি সহজেই জয় করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আবিষ্ট করে। কিন্তু এ কথাটা বোধ হয় অনেকের জানা নেই যে, তাঁর মত প্রতিভাবান লেখকেরও প্রথম জীবনে অত্যন্ত কঠোর এবং হৃদয়হীন প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার দু'চারিটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রবন্ধ সুরু করা যেতে পারে।

তাঁর সম্বন্ধে চব্বিশ পরগণা বার্তাবহে অকিঞ্চন দাস লিখেছিলেন,—

"রবীন্দ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উদ্ভট। এ মনগড়া ভাষা কতদিন টিকবে, তাহাতেও আমাদিগের সন্দেহ আছে।"

অকিঞ্চন দাস না হয় ছিলেন গ্রামের লোক, কিন্তু তাই বলে তিনি কলিকাতা মহানগরীবাসী সে কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কাছেও নিস্তার পান নি। তাঁদের আক্রমণ ছিল আরও কঠোর, আরও নিষ্ঠুর।

১২৯৩ সালে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন ছিলেন হিতবাদীর সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কবি। এই কাব্য গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব প্রকাশন ভঙ্গি এতই তাঁর বিরক্তিকর ঠেকেছিল যে, তিনি প্রতিবাদ ক'রে একটি পুস্তিকা লিখে ফেলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'মিঠে কড়া'। ব্যঙ্গ করে তিনি তা আরম্ভ করেছিলেন এই বলে,—

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি
শিখেছি তাঁহারি দেখে
তোরা কেউ কবি হবি?
'কড়ি ও কোমল' পড়।

এইভাবে পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক ক'রে তিনি 'কড়ি ও কোমল' হতে কিছু কিছু কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে নিজস্ব মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি মন্তব্য এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম দিকের একটি কবিতায় একটি বাক্য আছে, "পুলক নাচিছে গাছে গাছে।" কাব্যবিশারদ মহাশয়ের রুচি মতে কল্পনাকে কবির এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন,—

মানুষের মনে মনে
এতদিন ছিলে ভাল।
কেন রে পুলক আজ
তোমার এ দশা হল।
নাচিতেছ কোন্ গাছে
কোথায় সে গাছ আছে?
না জানি কেমন গাছ—
হায় রে কপাল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। রবীন্দ্রনাথের রচনার রীতি তাঁর কাছেও একান্ত অসহ্য হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি মন্তব্য এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' তখন একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। তার ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের সমালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল এই মন্তব্যটি করেছিলেন,—

"রবীন্দ্রনাথ অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন দেখুন। একজন যে কোনো ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে পারিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন?"

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন। তার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। 'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির অন্যতম। তার সম্বন্ধে সমাজপতি মহাশয় এই মন্তব্য করেছেন,

"আমরা বলিতেছি যে, আমাদের অত্যল্প আলোকানুসারে অবশ্যই বরাবর

সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি

বলিব যে, রবিবাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই।"

এই ধরণের আলোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এঁদের রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি বিদ্বেষের দুটি মূল কারণ ছিল একটি, তাঁর রচিত কাহিনী তাঁদের নীতিবোধকে আঘাত করত। অপরটি, তাঁর রচনার রীতিকেই তাঁরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। দ্বিতীয়টির উদাহরণ স্বরূপ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পুলকের বর্ণনা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। মানুষের মনের ভাব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করা কাব্যে একটা সাধারণ রীতি। কালিদাসের সাহিত্যেও তার বহুল প্রয়োগ আছে। কিন্তু কাব্যবিশারদ মহাশয় তা বরদাস্ত করতে পারেন নি। কারণ বোধহয় তিনি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বর্ণনার পক্ষপাতী ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যে মন্তব্য দু'টির উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা প্রথমটির উদাহরণ। তাঁদের নীতিবোধের সঙ্গে এখানে রচনার বিষয় বস্তু সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি বলেই তাঁরা রুষ্ট হয়েছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যে কুমারী রাজকন্যার সহিত প্রণয়ের উল্লেখ আছে বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। এটি যেহেতু সমাজ-বিরুদ্ধ, সে হেতু কাব্যে তার স্থান থাকা উচিত নয়—এই ধরণের যুক্তি তাঁর মনকে প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি সম্ভবত শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, এধরণের কাব্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনন্য-সাধারণত্ব সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। তুলনা হিসাবে এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "বস্তুত এত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়।"

আরও বলেছেন,—

"এক দিকে যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কেবল কৌতূহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্যদিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব।"

এখানে রবীন্দ্রনাথের রচনার গুণ গ্রহণে তাঁর অসুবিধা হয় নি। কারণ, গল্পে এমন কিছু ছিল না—যা তাঁর নীতিবোধকে আঘাত করে।

এঁদের নিষ্ঠুর সমালোচনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কড়া জবাব দিয়ে উঠতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ তাঁর রুচিতে ও মার্জিত সংস্কারে বাধত। তিনি সামান্য মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন এইভাবে,—

"হয় এ ফুল সুন্দর নয়
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয় ক'দিনের ভুল—
দুদিনে ভাঙিবে তবে,
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে।"

এর বেশী আর কিছু প্রতিবাদে তিনি বলতে পারেন নি। বরং সমালোচকদের অন্তর ভরে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই বলে,—

"হউক ধন্য তোমার যশ
লেখনী ধন্য হোক—
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।"

অবশ্য যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী এবং যাঁদের সাহিত্য-রচনার মূল্য নির্ধারণের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাঁরা ভুল করেন না। উদাহরণ স্বরূপ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর বাড়ীতে ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাট্য অভিনীত হয়; তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে অভিনয় দেখে একটি শ্লোক লিখে তাঁর প্রশস্তি রচনা করেছিলেন এইভাবে,—

"উঠেছে নবীন রবি,
নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা'
দেখাইতে পুনর্বার।"

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৮ সালে। সে রচনাও তাঁর অতি অল্প বয়সের। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, এই সময়কার লেখাগুলি তাঁর কাব্য জীবনের 'কাঁপ বুকের' যুগের লেখা, অর্থাৎ সরল ভাষায় কাঁচা লেখা। কিন্তু তাই পড়েই সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছিলেন। সেইজন্য প্রথম সুযোগেই তাঁকে ভাবীকালে

বাংলা সাহিত্যের কর্ণধাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যে কাহিনীটি এই প্রতিপাদ্যটিকে সমর্থন করে, সেটি ভারি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতিতে' সংক্ষেপে এইভাবে তা উল্লেখ করেছেন,—

"রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিম বাবুর গলায় বরমাল্য পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম বঙ্কিম-বাবু তাড়াতাড়ি সে মাল্য আমার গলায় দিয়া বলিলেন—এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' পড়িয়াছ?"

কিন্তু এই রকম গুণ গ্রহণের ক্ষমতা অসাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মত কবিরও এমন কঠিন, কঠোর ও হৃদয়হীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটি ক্ষোভের কারণ বটে, তবে এই ভেবে আমরা খানিকটা

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্ত্বনা লাভ করতে পারি যে, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবির ভাগ্যে এমনটি ঘটে থাকে। অন্য সাহিত্যের ইতিহাসেও এমনটি ঘটেছিল।

উদাহরণস্বরূপ ইংরাজি সাহিত্যে কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি সাহিত্যে অনেক

রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয়, কিন্তু তাঁর মত ইংরাজি সাহিত্যের রীতির ওপর এমন প্রভাব আর কেউ বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর ভাষার সরলতা ও ভাবের অভিনবত্ব পোপ ও ড্রাইডেন এর যুগের কৃত্রিম বাকচাতুরিতে অভ্যস্ত সাহিত্য-রসিক ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেউ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, কেউ তাঁর কাব্যরীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ একটি সারগর্ভ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—"যে কোনো লেখকের, যে পরিমাণে তিনি গুণী হন, সেই পরিমাণে কর্তব্য এসে পড়ে সেই রুচিবোধ গড়ে তোলবার—যা দিয়ে তাঁর রচনা উপভোগ করা যায়; পূর্বেও এমন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও এমন ঘটবে।"

তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রতি সমালোচক বিশেষের বিরূপ মনোভাবের কারণ হল তাঁরা তাঁর নূতন রীতির সহিত অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর ভাষার অভিনবত্ব এবং কল্পনার বৈচিত্র্য—তাঁরা যে শ্রেণীর রচনার সহিত পরিচিত তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তার রস গ্রহণে তাঁরা অসমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের সংস্কার-যুক্ত মন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর রচনার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে দেয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের প্রতিকূল সমালোচনার কথাই উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক না। কাব্যে সমাজ-নীতি অঙ্কিত হয়েছে দেখেই তাঁর মন এমন তিক্ত হয়ে উঠল যে, সামগ্রিক ভাবে এই সুন্দর নাট্যখানিকে অবলম্বন ক'রে যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রতিপাদ্য বিষয় কি? তা সংক্ষেপে বলতে চেয়েছে—যে দেহের রূপাভিত্তিক যে প্রেম তা কৃত্রিম, তা অস্থায়ী, আর চরিত্র গুণকে ভিত্তি করে যে প্রেম জন্মলাভ করে, তা স্থায়ী। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে কি তার উপর এরূপ দোষারোপ করা যায় যে, তা দুর্নীতি প্রচার করে?

কবিগুরুর চিত্রকলা

আমাদের গুরুদেব

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

'আমাদের গুরুদেব' গ্রন্থটি শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় দ্বিতীয় প্রকাশন। তাঁর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটি বিশ্বভারতীতে উপাচার্য হিসাবে যোগদান করবার পূর্বেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। 'আমাদের গুরুদেব' গ্রন্থটিতে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ করে কিছু বক্তৃতারও সংকলন আছে বলে মনে হচ্ছে। বক্তৃতাটাই অবশ্য বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা—সেই উপস্থাপিত বিষয়টি সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হয়েছে কি না। যদি সেই ভাষণ কোনো কোনো পাঠকের মনেও রসক্রিয়ার অনুরূপ কিছু সম্ভোগসম্পূর্ণতা এনে থাকে তা হলেই সেটা সাহিত্য। বিকাশকেই যদি আমরা জীবন বলে থাকি এবং অভিজ্ঞতার সাবলীল প্রকাশকে কাব্য বলি, তবে 'আমাদের গুরুদেব' অবশ্য সাহিত্যকীর্তি এবং নিশ্চিতভাবে তাই।

এই বইটিও 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর মতো লেখক বিশেষ আন্তরিকতা এবং উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভাস্বর করে তুলেছেন।

রবীন্দ্র-ছায়াতপে মানুষ যাঁরা তাঁদের মনে বিশ্বভারতীর এক রূপ এক আদর্শ। বর্তমানে তাঁদের ভিতর যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে আসছেন, ছাত্রসমাজকে দেখছেন, পরিবেশকে লক্ষ্য করছেন তখন তাঁদের বারবার রবীন্দ্রসান্নিধ্যের কথা, রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের কথা মনের সামনে-দুয়ারে অপেক্ষা করে থাকে। তাই দেখি তাঁরা বার বার শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন চক্রমণে বেরিয়েও পুনঃ পুনঃ রবীন্দ্র-প্রকোষ্ঠে থেমে থেমে যাচ্ছেন।

এই গ্রন্থটি 'সৌরমণ্ডলের' পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়েছে সর্বসাকুল্যে একাদশটি অধ্যায়ের যে পরিমিত বাণীর পুষ্পস্তবকে আমাদের গুরুদেবকে বন্দনা করা হয়েছে তাতে লেখকের

'আমাদের গুরুদেব' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট

বোধ এবং ভাবনাকল্পকে প্রশংসা করতে হয়। রচনাকারের 'আশ্রমে গুরুদেবের আহ্বান' থেকে শুরু করে পুণ্যাহ '৭ই পৌষ' পর্যন্ত রচনা পরিক্রমা করে দেখতে পেলাম শ্রীসুধীরঞ্জন দাস সর্বত্রই একটা স্বাতন্ত্র্যমাধুর্যে লেখাগুলো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অনেক সাধারণ ঘটনাকেও তিনি যেমন মহৎ এবং শ্রদ্ধেয় ভক্তিতে ব্যক্ত করেছেন এ থেকেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রগাঢ়তা অনুভব করা যায়। 'আমাদের গুরুদেব' গ্রন্থটিতে এমন কতকগুলি অধ্যায় আছে যা পড়বার পর এখন মনে হচ্ছে সে গুলোই বুঝি এই বইটির অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ করে লেখক সবিনয়ে আপন অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েও যখন লিখছেনঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্ররূপ ও বিকাশ ॥ রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবধারা ॥ বিশ্ব-মানবিকতা ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ॥ —বলতে দ্বিধা নেই এ ধরণের 'ক্রিটিক্যাল' আলোচনাতেও লেখককে ত্রুটিযুক্ত মনে হল না।

'গুরুতর্পণে' এবং '৭ই পৌষে' শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বিশেষ একটা দর্শনের কথা তুলে বলছেন,—"মানবাত্মার উপরে মৃত্যুর কোনো অধিকার নেই। পরন্তু দেহটাকে বিনাশ করে মৃত্যুই মানবাত্মাকে অমৃতের দিকে এগিয়ে দেয়; বস্তুতঃ মৃত্যুই অমৃতকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করে দেয়।" কিংবা যখন দেখি, "শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই করতে পারি, যখন তাঁর আদর্শ ও তপস্যাকে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি।" তখন গুরুদেবের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর সদা প্রফুল্ল শ্রদ্ধার্ঘ্য দেখে আমরা তৃপ্ত হই।

'আমাদের গুরুদেব'এর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী লেখকের রচনাশৈলীর কুশলতার পরিচয় দিয়েছে।

গ্রন্থটি সচিত্রশোভনতায় বিশ্ব-ভারতীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়—৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ মূল্য ৩·৫০।

কবি দর্শন

উদয়ন

শান্তিনিকেতন

প্রত্যেক মানুষের দু'টি পরিচয় থাকে, একটি তার কাজের ক্ষেত্রে আর একটি তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে। একটিকে চোখে দেখা যায়, ধরা ছোঁয়া যায়, ভাঙ্গা গড়া যায়, আর একটি থাকে নিভৃতে গোপনে, হঠাৎ তাকে খুঁজে পাওয়া যে সে লোকের কাজ নয়, এ দিকটি চিরন্তন অবিনশ্বর, এর পরিবর্তন হয় না।

লোকে যখন দুঃখ করে বলে সে শান্তিনিকেতন আর নেই, এখন আর একে চিনতে পারার জো নেই, তখন কি তারা ঐ প্রথম পরিচয়টির কথাই ভাবে? যখন এখানে কিছু ছিল না, ধূ ধূ করত ঢেউ খেলানো শুকনো খরা জমি, বেঁটে বুনো খেজুর আর ফণি-মনসার ঝোপ ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না, তখন পথের ধারে দু'টি ছাতিম গাছের সবুজ অভ্যর্থনা দেখে একজন মনীষীর মন মুগ্ধ হয়েছিল। তারপরে কোপাই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

ছাতিম গাছের কাছে শান্তি-নিকেতনের সাধনাশ্রমের দোতলা বাড়ি হল, কুয়ো হল, বাগান হল, ক্লান্ত ভক্তজনরা দু'দিনের জন্যে সেখানে আসতে লাগলেন, প্রাণ জুড়োবার আশায়? নতুন একটা অশান্তিময় শতাব্দীর শুরুতে সেখানে একজন কবি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন হবে না, এ কথা পরমভক্তরাও নিশ্চয়ই আশা করেন না।

শান্তিনিকেতন গৃহটিকে ঘিরে দু'-তিনটি পাকা বাড়ি আর অনেকগুলি মাটির ঘর হল, বড় কুয়ো হল, ছেলেদের জন্যে পাকশাল হ'ল, বিদ্যালয়ের

লীলা মজুমদার

আপিস ঘর হল, গ্রন্থাগার হল, শিক্ষকদের ঘরবাড়ী হল, গাছে গাছে শুকনো মাঠের মধ্যে যেন একটি কুঞ্জবন তৈরী হল।

এরকম আবার ছিল কবে? ছাপাখানা হল, বিজলীর কারখানা হল, দেখতে দেখতে দোতলা ছোট বাড়ী 'দেহলী' থেকে কবির বাস উঠে গেল, একতলার কুটীর 'কোণার্কের' পাশে রাজবাড়ীর মতো 'উত্তরায়ণ' হল। উত্তরায়ণের সামনে টেনিস্ খেলার প্রাঙ্গণ হল, গোলাপ-বাগান হল, জাপানী বাগান হল, পিছনেও সোখীন গাছ-গাছড়ার আমদানী হল। সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন বাড়ীতে চারদিক ছেয়ে গেল, উত্তরায়ণের পর কোণার্কের ভোল বদল, তারপর শ্যামলী, তারপর পুনশ্চ, তারপর উদীচী। কেবলই পরিবর্তন, কেবলই এগিয়ে চলা।

নিশ্চলতা কবির সইত না। কোনো কিছু এক ভাবে থাকবে এ তিনি চাইতেন না। ঘরের আসবাব এ কোণ থেকে ও কোণে, এধার থেকে ওধারে নিতেন। এ ঘরের বাস তুলে ও ঘরে যেতেন, সেখান থেকে সে-ঘরে। সব ঘর ফুরিয়ে গেলে অন্য বাড়ীতে যেতেন। বাড়ী ফুরুলে নতুন বাড়ী তৈরী করে নিতেন। কখনো নিরামিষ খেতেন, কখনো আমিষ, কখনো হোমিওপ্যাথি করতেন কখনো বায়োকেমিষ্ট্রী।

আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়ে পরে আবার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে বলতেন সব হোক বাংলায়, ইংরাজীতে কেউ যেন একটি দু'টি চিঠিও না লেখে, পরে

আরো দূরে দৃষ্টি ফেরালেন, পৃথিবীকে ডাক দিলেন, তখন আর বলা গেল না শুধু বাংলা চলবে। হিন্দী ভবন, চীন ভবন হল। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্বভারতী, কলাভবন, সঙ্গীতভবন হল, গ্রামোন্নয়ন, শিল্পবিদ্যালয়, সব হল। আশ্রমের সে রিক্ত নগ্ন রূপ গেল ঘুচে।

যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা একদা 'স্বদেশী সমাজে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার দীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই বিদ্যালয় এখন সরকারী নিয়মে, সরকারী অর্থে চলেছে। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ নেই, এ তো আমাদেরই স্বদেশী সরকার, এ টাকাও আমাদেরই দেশের টাকা।

নিয়ম-কানুন, পরীক্ষা, দপ্তর, এসবও অনিবার্য। দেশের সেই নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয়তার দিন শেষ হয়েছে। যখন লোকে টাকা পয়সা রোজগার করার কথা ভেবে লেখাপড়া শিখত। সংস্কৃতি এখন আর সৌখীনদের এক-চেটিয়া বিলাসের বস্তু নয়, এ আমাদের দেশেরই সামগ্রী, যাদের করে যেতে হবে, এ তাদেরও। তাই ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, পাঠক্রম, দপ্তর। কবি একদিন অনিচ্ছা থাকলেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠানো প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদন করেছিলেন, আজকের ব্যবস্থাতে যে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন, তাই বা কি করে বলা যায়?

তবে ক্ষুণ্ণ হয় তো খানিকট হতেন, কারণ যেখানে তিনি চেয়েছিলেন প্রাণের জোয়ারে সব বাধা ভাসিয়ে দিতে, সেখানেই সব কিছুকে নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা হচ্ছে। প্রাণের অবাধ গতি না থাকলে মানুষের চারা বেশি নিচে শিকড় নামাতে পারে না। ঐ যে প্রত্যেক মানুষের দু'টি পরিচয়ের কথা বলা হল, নিয়ম-কানুন তার প্রথমটিতে খাটে, দ্বিতীয়টি সব নিয়মের বাইরে।

কবি বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন, সেইজন্যই একদিন তরুণী স্ত্রী ছোট শিশুদের শুদ্ধ জোড়াসাঁকোর আরাম থেকে টেনে এখানকার কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। তবে কৃচ্ছ্রসাধনার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্থাভাবের জন্য, সেটি হয়েছিল অনিবার্য। গান্ধীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে কবির মতভেদ ছিল। কবি চাইতেন ছেলেরা অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন করবে, শরীরকে কর্মঠ ও অনলস করে তুলবে, কিন্তু অতিরিক্ত শারীরিক কষ্ট সইতে হলে স্বাস্থ্য হবে মন্দ আর মনের বিকাশ হবে ব্যাহত। সদাই যদি ছেলেরা ভাবে কিসে এই কষ্টটুকুর খানিকটা লাঘব হয়, তাহলে উন্নত চিন্তা করবে কখন?

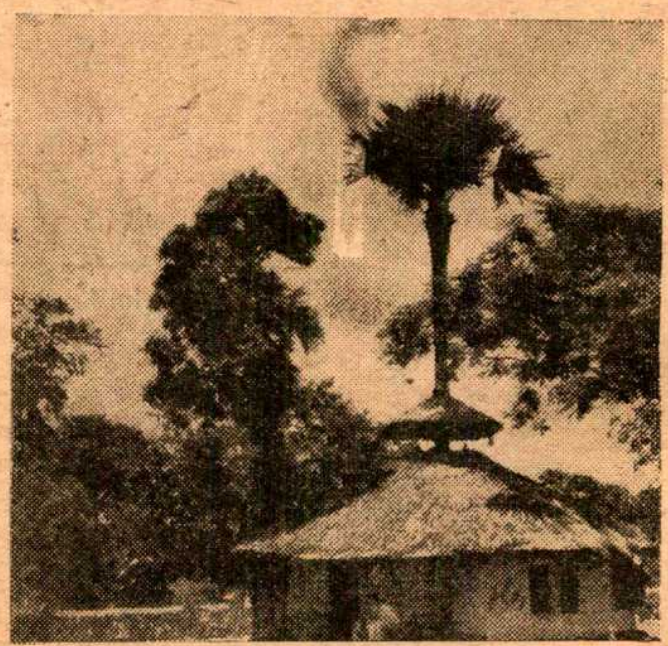

শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের বাসগৃহ

এখন দেখা যায়, ঘরে ঘরে আলো, পাখা, নতুন নতুন অট্টালিকা, হলঘর, প্রদর্শশালা, এ সবেই যে কবির আপত্তি হ'ত, তাও বলা যায় না।

তবে বেশি আড়ম্বর যে তাঁর অভিপ্রেত ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার এও সত্যি যে, যেখানকার যা যোগ্য সে বিষয়েও কবি সচেতন ছিলেন। বিদেশ থেকে আগত অতিথি ও কর্মীদের যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টি ছিল।

ফুলের চারা লাগিয়ে সুন্দর করা হচ্ছে। পুরোনো বাড়ি-ঘর সংস্কার করে বিদ্যা-দানের কাজে লাগানো হচ্ছে, কবির স্মৃতিরক্ষার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

একবার উত্তরায়ণের বেষ্টনীর মধ্যে গেলে এই কথাই বারবার মনে হবে। 'দেহলী' হয়েছে শিশুদের পাঠশালা। তালগাছ ঘিরে মাটির বাড়ী 'তালধ্বজ' হয়েছে মেয়েদের কারু-শিল্পালয়।

যে বাড়ীতে কেউ বাস করে না সে বাড়ী ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, এ কথা কি সত্যি; শান্তিনিকেতনের এই সব পুরোনো বাড়ীতে আর প্রায় কেউই বাস করে না, সব তক তক করছে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ে না। কুটো পড়লেই লোকে তুলে ফেলে দেয়, কোন বাড়িতে কোন ঘরে কি হবে দপ্তর থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। যেখানকার চারিদিক ছেলে-মানুষদের কলকণ্ঠে ভরা, সে কি

গান শেখে, খেলার মাঠে ছেলের ভিড়, ঘণ্টাতলায় অষ্টপ্রহর ঘণ্টা বাজে, ব্রতীবালকরা সারি বেঁধে হেঁটে চলে, চাঁদনি রাতে এখনো

চড়িভাতি হয়। প্রাণহীন বলা যায় কেমন করে।

তবে প্রাণের কথা বলতে গিয়ে সব মানুষের ঐ দ্বিতীয় পরিচয়টির কথায় এসে পড়তে হয়। কবি চেয়েছিলেন দু'টি ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দিতে, যা ছিল মনের জিনিষ, তার জন্যে কাজের ঘরে ঠাঁই করে দিতে,

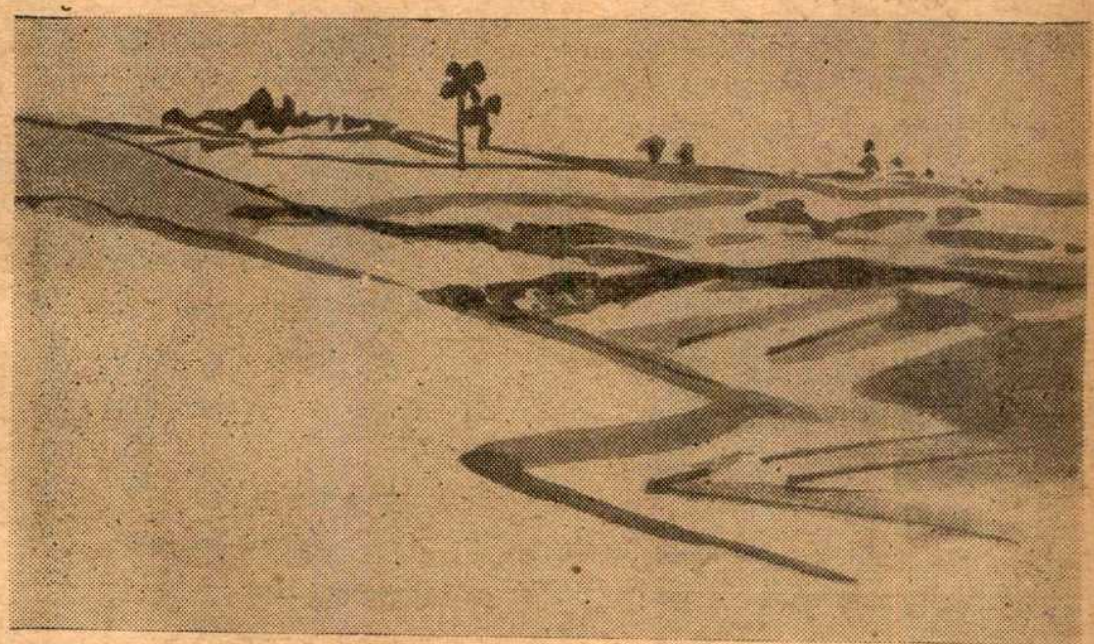

এখন শান্তিনিকেতনে গেলে আবার একটা নবীনের আভাস পাওয়া যায়। বেড়া তুলে, গাছের অন্তরাল ঘুচিয়ে, একটা মুক্তির নিশানা দেওয়া হচ্ছে। রুক্ষ অসুন্দর জমিকে ঘাসে ঢেকে

কখনো প্রাণহীন হতে পারে। বিদ্যাদানের কাজ যেখানে চলে, তার নিজস্ব একটা প্রাণ থাকে। এখনো এখানকার গাছতলায় ক্লাশ বসে, সঙ্গীতভবনে দলে দলে ছেলেমেয়েরা

যাতে দৈনন্দিনের গ্লানি লাগে তার মধ্যে আদর্শের রং ধরিয়ে দিতে। সে আদর্শ চিরন্তন, মুনি-ঋষিরা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তার নাম সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

কবিতা

পঁচিশে বৈশাখে

হরপ্রসাদ মিত্র

বৃহৎ বিস্তার, স্তব্ধ গভীরতা, নিঃসীম নীলিমা,
মাত্র ক'টি শব্দ,—নাকি—
ত্রস্ত প্রাণে ওরা জয়টীকা ?
লোকভয়, মৃত্যুভয়,
ভয়
শুধু পেষণযন্ত্রণা।
তাই তো তোমাকে ব'লি—
খোলো খোলো স্তব্ধ যবনিকা!

কালের মন্দিরা বাজে জীবনের চঞ্চল নাটকে।
কতো ব্যাখ্যা করে
কতো শতকোটি রবীন্দ্র-পাঠকে !
নিত্য নান্দীপাঠে করে তোমারই বন্দনা ;
ভূমাতে সংযমে নতি,—নাকি
শুধু সজ্ঞান ছলনা ?

অসংখ্য মানুষ-কীট ইঁটে ইঁটে
পঁচিশে বৈশাখে
এক প্রশ্ন করে প্রাণ—
কে যায়, কে থাকে ?
সে মূল্য-জিজ্ঞাসা বৃথা,—নাকি
সে-ই সত্য জয়টীকা ?
বলি, হে বিজয়ী বীর, খোলো খোলো
স্তব্ধ যবনিকা।

রবীন্দ্রনাথ

অজিত দত্ত

অশ্রু-আঁখি দুঃখময়ী জননী মলিনা শ্যাম মাটি
আমি ভালবাসি—এই কথা বলে, স্বর্ণ ডানা মেলে
ঊর্ধ্বলোকে গিয়েছে সে। মর্মমাঝে সৌরবহ্নি জ্বেলে
দুঃখের দহনে পুড়ে নিজে, তবু আলোর শিখাটি
আমাদের অন্ধকার পথে রেখে, চলে গেছে দূরে
সীমা আর অসীমের সাগর-সঙ্গমে। পৃথিবীর
রূপাঞ্জন আমাদের চোখে মেখে দিয়ে সুগভীর
স্নেহভরে, বেঁধেছে সে মনোবীণা শাশ্বতের সুরে।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম। জীবনের সৌন্দর্যে বিভোর,
তবু মৃত্যু-অতিক্রান্ত অনন্ত আনন্দ তার বুকে।
হৃদয়ের সারথি সে, বিধাতার শঙ্খ তুলে মুখে
চূর্ণ করে দিয়েছে সে যৌবনের সুষুপ্তির ঘোর।
তারপর, 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' এই কথা বলে
অন্য কোথা চলে গেছে,—
কিংবা আজো যায় নি সে চলে॥

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ

* ধীরেন দেবনাথ *

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোচনায় প্রথমেই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন নি, তাঁকে রাজনৈতিক নেতা আখ্যা দেওয়া চলে কি না এবং তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শ ও বিশ্বাসকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত করা চলে কি না। দেশের পরাধীনতার দিনে যিনি কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠন করেন নি, যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করেন নি, প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী তিনি রাজনৈতিক নেতা নন। কবি ও দার্শনিক হিসাবে তাই রবীন্দ্রনাথকে যতটা বুঝবার চেষ্টা চলেছে, কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রবক্তারূপে তিনি সেই পরিমাণে ব্যাখ্যাত হন নি। অবশ্য এ প্রসংগে স্বীকার করে নিতে হবে তাঁর রাজনীতির মধ্যেও দর্শন রয়েছে এবং দার্শনিক মতবাদের আলোচনায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার কিছু কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনা কখনো সম্পূর্ণ নয়।

রবীন্দ্রনাথও অবশ্য নিজেকে রাজ-নৈতিক নেতা হিসাবে দাবী করেন নি। তিনি মানুষের কবি, পৃথিবীর কবি—এই পরিচয়ই নিজের জীবনে কামনা করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। বরং তাঁর সাহিত্যকৃতির বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আলোচনা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। বিপরীত পক্ষে এ প্রশ্নও তোলা যায়—রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, তা' পৃথিবীর ক'জন মহৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন পারিবারিক পরিবেশ ও সমকালীন যুগপরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেও এ প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ-সমর্থনে যাবে।

বহু কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, রবীন্দ্র-নাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। পরাধীন দেশের মর্মবেদনা তাঁর তীব্র অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে আঘাত হেনেছে। জাতির দুর্দশা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার দিকে তিনি দেশবাসীর চেতনাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবী, সুতরাং সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি এ চেতনাবোধ উদ্দীপ্ত করতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতা অধিকারের চেয়ে তার মূল্য কি কিছু কম? অথবা, একারণেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার উপযোগিতা তথাকথিত রাজ-নৈতিক নেতাদের মতাদর্শের সাথে তুলনায় গৌণ হয়ে দাঁড়াবে? রবীন্দ্রনাথ সকল সমস্যাকেই মানব-জীবনের সামগ্রিক পটভূমিকায় বিচার করেছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন। সে লক্ষ্য হোল জীবনের অখণ্ডতাবোধ। সে দৃষ্টিতে মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, অবস্থান্তর মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সমাজজীবনেও তেমনি রবীন্দ্র-নাথ সকল সমস্যাকে বিচার করেছেন সামগ্রিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রেখে। অর্থাৎ সমস্যার বাহ্যিক রূপ ও তার আশু সমাধানকেই তিনি বড় করে দেখেন নি। সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ, তার অন্তর্নিহিত কারণ ও তার চির সমাধানের দিকেই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। জীবনের অখণ্ডতা-বোধের ঘোষণায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর তাই এক মহাপ্রেমসংগমে মিলিত হতে পেরেছে। আর সে কারণেই মানবিক প্রেমের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে অর্থ-নৈতিক আলোচনা, রাজনৈতিক অনুধ্যান ও সমাজভাবনায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি আন্দোলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন প্রতিফলিত। তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার সম্যক্ প্রকাশের জন্যে সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁকে পদচারণা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে লক্ষণীয় হোল এই যে, বিভিন্ন ধরণের রচনা-গুলিও একটি অদৃশ্য ঐক্যের সূত্রে বিধৃত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে বুঝতে হ'লে তাঁর রাজ-নৈতিক আলোচনাকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে। ভারত তীর্থ, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, দীক্ষা, ত্রাণ, ন্যায়দণ্ড, প্রার্থনা, ভূমিকম্প, আহ্বান, প্রশ্ন, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি কবিতায় কবির মর্মজ্বালা ও আদর্শের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় প্রভৃতি উপন্যাসে, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, রক্ত-করবী প্রভৃতি নাটকে কবির সমাজ-ভাবনা এবং রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক চিন্তাধারার বৃহৎ পটভূমি বিস্তৃত। তবু কবিতা, নাটক ও উপন্যাসে বক্তব্যকে ছাড়িয়েও একটি নিবিড় মাধুর্যের রস পরিব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণতর। 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধাবলীতে ও অন্যান্য বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-ধর্মী রচনায় কবির রাজনৈতিক মতাদর্শ সোচ্চারে ঘোষিত। সুভাষ চন্দ্রের প্রতি সম্ভাষণে, জালিয়ানওয়ালা-বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লিখিত পত্রে সেই একই আদর্শের ঘোষণা। এর উৎস-ভূমিতে রয়েছে তাঁর বাল্যকালীন পারিবারিক পরিবেশ ও তৎকালীন রাজনৈতিক

সচেতনতা। 'হিন্দুমেলা'র ইতিহাসকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

পরাধীনতার জ্বালা তাঁর আবেগকে উত্তেজিত করে তুলেছে। কিন্তু শুধু আবেগেই শেষ নয়। বুদ্ধিদীপ্ত সংযত আবেগের মোহমুক্ত স্বরূপে তিনি সব কিছু বিচার করেছেন। তাঁর জীবনদর্শনের এটাই বড় কথা। ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে পারলে দেশ স্বাধীন হবে—এ সত্যে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মতোই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এ বিশ্বাস পোষণ করতেন না যে, ইংরেজদের তাড়াতে পারলেই দেশের সকল সমস্যার সমাধান ঘটবে। আর এ জন্যই যে-কোনো প্রকারে ইংরেজকে তাড়ানোই তাঁর রাজনীতির মূল কথা নয়। হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, জাতিভেদ-প্রথা, উচ্চ-নীচের পার্থক্য, অর্থনৈতিক অসাম্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের অমিলন—এ সব যদি টিকেই রইল, তবে ইংরেজ চলে গেলেই বা কি লাভ? তাছাড়া, ইংরেজ আজ চলে গেল, কিন্তু কাল আর একদল এসে তার জায়গা দখল করবে। বাইরের শত্রুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টাতে পারে। সুতরাং ইংরেজকে তাড়ানোর মধ্য দিয়ে সমস্যার চির-সমাধান হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।"

সুতরাং বাইরে থেকে আঘাত নয়, মূল কারণগুলোকে খুঁজে দেখতে হবে প্রথমে। তারপর সেই ত্রুটি ও দুর্বলতাকে জয় করতে হবে। ব্যাধির স্থায়ী নিরাময় ঘটাতে হলে দেহের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করতে হবে। দেহকে শক্তিশালী করে তুলেই স্থায়ী প্রতিরোধ সম্ভব। নইলে বাইরে থেকে ওষুধ প্রয়োগ করে সাময়িক ফললাভ হয়ত করা যায়, কিন্তু আবার নতুন রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে।

সে যুগে প্রধানতঃ দু'টি খাতে আমাদের দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছিল। একটি হিংসাত্মক, অপরটি অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন। হিংসাত্মক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। এ আন্দোলন রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের বিরোধী। শক্তিচর্চায়, বীর্য সাধনে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, কিন্তু হিংসাত্মক আন্দোলন একটি সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশে সকল শক্তি ব্যয় করে ফেলায় মানবচিত্তের সামগ্রিক জাগরণকে প্রধান করে তুলতে পারে নি। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকে উদ্রিক্ত করে তুলতে হবে। সর্বশক্তির যোগ ঘটাতে হবে। খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে মহত্তম সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।

মহাত্মা গান্ধী-নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নীতিগত সমর্থন থাকলেও যে পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, চরকার আহ্বান—সেদিন পরাধীন ভারতবাসীর মনে উত্তেজনার খোরাক যুগিয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু তার পিছনে স্বদেশপ্রেমের চেয়ে ইংরেজের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষই ছিল প্রধান। সত্যিকারের স্বদেশপ্রেমের বন্যা আসলে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত বিভেদ, উচ্চ-নীচের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত ছিল সেদিন। কিন্তু তা তো ঘটেনি। তাছাড়া কাপড় পোড়ানোর মধ্য দিয়ে যে দেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটাবার আয়োজন চলেছিল, দরিদ্র অন্নবস্ত্রহীন অগণিত দেশবাসীকে কি তা' আরো শোচনীয় দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেবে না—রবীন্দ্রনাথ এ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> "কাপড় পোড়াতে আমি রাজী আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তির দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড় পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে, অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে বিনা প্রমাণে, বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় প'রে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি, কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরো বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরো কঠিন হয়ে উঠবে না?"

সে যুগের প্রায় সকল আন্দোলনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি মারাত্মক ত্রুটি ও অপূর্ণতা লক্ষ্য করেছিলেন। আত্মার উদ্‌বোধনই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। অন্তঃকরণকে জাগাতে না পারলে বারে বারেই তাকে বাইরের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। তৎকালীন হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক দুটি আন্দোলনের মধ্যেই দেখা গেছে, আদেশ দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হয়েছে। এতে সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। কেবল মাত্র মন্ত্রের কাছে, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে, নেতার পরুষ আদেশের কাছে যদি আমাদের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে বন্ধক রাখি, তবে স্বরাজলাভের মতো মহত্তম ফললাভ সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষকে যদি আত্মবিকাশের সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে তার শক্তির পরমতম প্রকাশ হবে কি ভাবে? আর এই স্বাধীন সত্তা অর্জিত না হলে স্বাধীনতালব্ধ ফল আশ্রয় পাবে কোথায়? তাকে রক্ষা করাই বা যাবে কি ভাবে?

রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যাক:—

> "কিন্তু, স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য। তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই।

তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিদ্ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিদ্ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিদ্, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে।.....

এই স্বরাজ সৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয়নি; সকল দেশেই কোনো না কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধন-দশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়?"

উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কখনো কখনো অসম্ভবকেও মানুষ সম্ভব করে তুলতে পারে। কিন্তু উত্তেজনা যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন কোন্ দাবিতে কিসের জোরে তাকে ধরে রাখা যাবে? আর ধরে রাখাই যদি না যায়, তবে অকারণ এ শক্তিব্যয়ে লাভ কি? বিপরীত মতাবলম্বীরা প্রশ্ন তুলবেন— তাহলে এ উত্তেজনা কি মিথ্যে? স্থায়ী কিছু করতে পারছি না বলেই কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব? রবীন্দ্রনাথ এ উত্তেজনাকে মিথ্যা বলেন নি। বিশেষ এক মুহূর্তে এ উত্তেজনা যে মানুষকে অস্থির করে তোলে, এ সত্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু উত্তেজনার তাপটিকে যে স্থায়ী করে তুলতে হবে, নইলে আর এক দিন সেই তাপের অভাবে পাওয়া জিনিষটিরও মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া সুচিন্তিত কর্মপন্থার মাধ্যমে দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে যদি এগিয়ে না যাওয়া হয়, তবে যা পেলাম, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় কি তেমন প্রবল হবে? এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসাবে মানবাত্মার উদ্বোধনকেই প্রধান করে দেখেছেন। মন জাগলে সে তার অভাবটা বুঝবে, ক্রমে ক্রমে অভাবটা দূর করতে চাইবে এবং একদিন আকাঙ্ক্ষিত সত্যের ধ্রুব লক্ষ্যে পৌঁছাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো সহজ সরল উপায় নেই। এই চিন্তা-

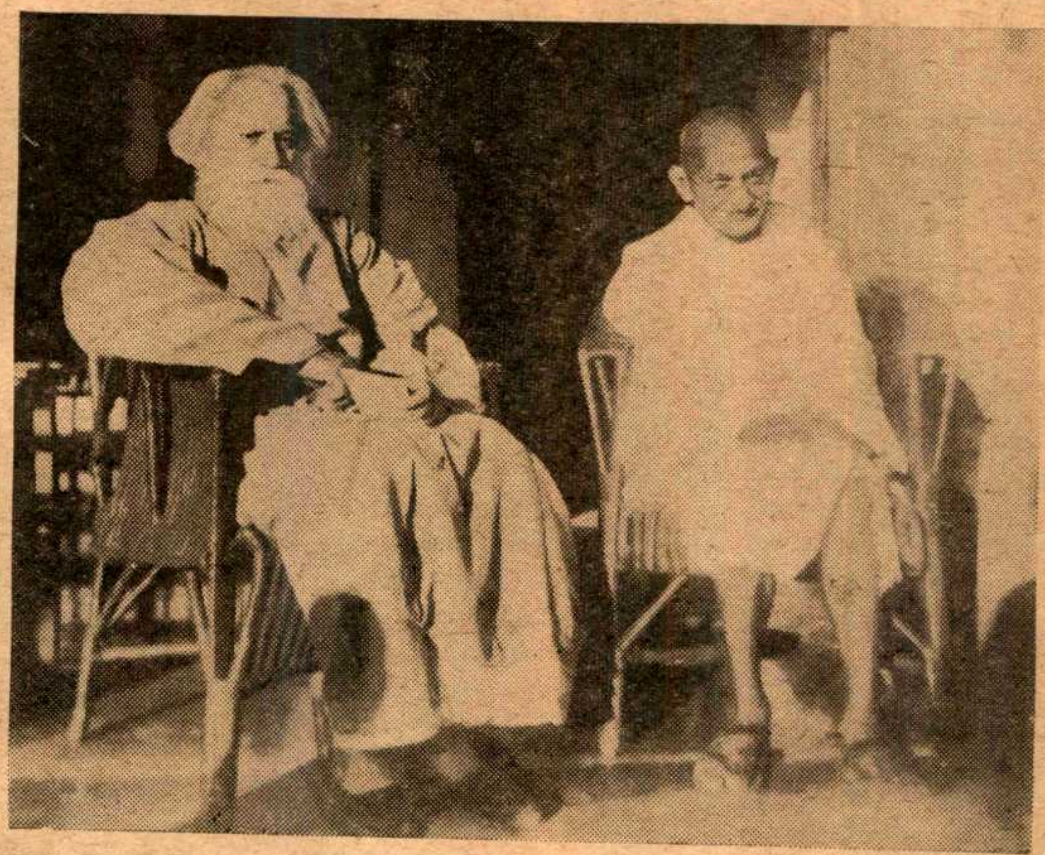

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

ধারার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনকে বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানেও রবীন্দ্রনাথ অন্তঃকরণের জাগরণ ও সর্বমানবের সর্বশক্তির যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্ধ-বাধ্যতা ও আবেগ সর্বস্ব উন্মাদনায় ব্যক্তিচেতনা ঢাকা পড়ে যায়। অন্ধ বিচারবুদ্ধিহীন জাতীয়তাবোধকে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করতে চেয়েছেন। যা' কিছু সংকীর্ণতার পরিচায়ক,

তা-ই তাঁকে পীড়া দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেও একটি অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেও যেমন চলবে না, তেমনি রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে যদি কোথাও আপাতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়, তাকে ইতিহাসের গ্রন্থন-সূত্রে বাঁধতে পারলে তাঁর বক্তব্যের স্বরূপ বোঝা যাবে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

"রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণ ভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"

সে-যুগে আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা নিজেদের শক্তির 'পরে যতটা না আস্থা রাখতে পেরেছিলেন, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ভরসা করেছিলেন ইংরেজদের দাক্ষিণ্যের 'পরে। এই আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুধু যে আমাদের হীনমন্যতাই প্রকাশ পেয়েছে, তা' নয়। নিজেদের যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনকেও অবহেলা করা হয়েছে। এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট ও পূর্বসূত্রানুসারী। ভিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতার মতো মহৎ ও বৃহৎ অর্জন সম্ভব নয়। আর ভিক্ষা-লব্ধ স্বাধীনতা কখনো স্থায়ী হতে পারে না, কখনো দেশের আপামর জনসাধারণের ভোগ্য পরম-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুরূপে দেখা দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই দেশের মানুষকে তাদের দাবির যোগ্য হয়ে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের সাধারণ মানুষের দিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। প্রতিটি মানুষ যদি এইভাবে মনুষ্যত্বের পরম মহিমায় উন্নীত হয়ে ওঠে, তবে তাদের সম্মিলিত শক্তিতে সকল বাধাই অপসৃত হয়ে যাবে। সামাজিক বিভেদ, ধর্মীয় সংস্কার—যা আমাদের মানুষে মানুষে মিলনের পথে অন্তরায়, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে অবহেলা করতে বলেছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের মর্যাদাবোধ ও মানব-প্রেমের জয় ঘোষণা সোল্লাসে অভিব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন তুলেছেন—দেশকে যদি সত্যিই আমরা ভালবাসি, তবে কি দেশ কখনো পরাধীন থাকতে পারে? আমরা প্রকৃতপক্ষে দেশ-সম্পর্কে উদাসীন বলেই দেশের এই অবস্থা। অতএব দেশের প্রাণ যারা, তাদের 'পরেই নির্ভর করতে হবে সরকারের দানের উপর নয়, বিদেশী কৃপা কটাক্ষের 'পরেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারাকে কেউ কেউ আদর্শবাদ বলে অবজ্ঞা করতে চেয়েছেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে যেহেতু তিনি বক্তৃতা করেন নি, যেহেতু তিনি খুব উদ্দীপক ও উত্তেজক কোনো পথের নির্দেশ দেন নি, যেহেতু তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের দ্বারা মানবজীবনের সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান আনতে চেষ্টা করেছেন, সুতরাং তিনি স্বপ্ন-বিলাসী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন: "I love India, but my India is an idea and not a geographical expression, Therefore I am on ta patriot—I shall ever seek my compatriots all over the world."

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে কি রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শবাদের জন্যই আমাদের মন লালায়িত হয়ে ওঠেনি? রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজো যে সামঞ্জস্যের প্রতীক্ষা করছে আজকের মানুষ, রবীন্দ্রনাথ কি বহু আগেই তার উপায় নির্দেশ করে যান নি? রাজনৈতিক আদর্শের যে মূল্যমান তিনি দাবী করেছিলেন, তা' সেদিন পূর্ণ হয়নি। তিনি বলেছেন:

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না-একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষদিন পর্যন্ত মনুষ্যত্বের জয়ে বিশ্বাস করেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন। আশা করেছেন—পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে একদিন ইতিহাসের নূতন সূচনা আভাসিত হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই আজন্ম বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার ফল এ যুগ থেকে আগামী যুগে সৃষ্টির প্রাণশক্তিকে লালন করবে, তারই ইঙ্গিত এদিনের আকাশে-বাতাসে।

কবিগুরু অঙ্কিত 'পোট্রেট'

ভারতদর্শন

মহাজীবনের তীর্থপথে তীর্থঙ্কর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মনীষী-গগনে এক পরম বিস্ময়। মানবসভ্যতার বিবর্তন ইতিহাসের এক আশ্চর্য সূর্য। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার কবি, ভারতের কবি, পৃথিবীর কবি। নিগূঢ় অনন্ত জীবনের রসবেত্তা কবি বলেই তাঁর কাছে পৃথিবীর ধূলি শুধু মৃত্তিকার প্রাণহীন, স্পন্দনহীন ধূলিমাত্র নয়। সেই ক্ষুদ্রতম বিচ্ছিন্ন ধূলিকণার মাঝেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নিখিল বিশ্বের প্রেম ও আনন্দের অখণ্ড লীলার প্রবাহ। তাই অনায়াসে লিখেছিলেন,—

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে,
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে,
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

এই অখণ্ড সত্তাধৃত মহাজীবনের অঙ্কুরোদ্গম সময়ে বাঙলা দেশের আকাশভরা আলো, দক্ষিণের স্মিত-সুগন্ধ বাতাস আর গঙ্গার অবারিত অজস্র প্রবাহধারা তাকে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করে' তুলেছিল। পরিণত জীবনে, তাই কবি কখনও প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়াহীন কর্মকঠোর প্রহরগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাল বলে' গ্রহণ করতে পারেন নি।

ললিতে কঠোরে সংমিশ্রিত এই বিপুল পৃথিবীর কর্মের শিকল বাঁধা পদধ্বনি চকিত বেদনায় কান পেতে যেমন শুনতে পেয়েছিলেন তিনি, তেমনি তাঁর মুগ্ধ হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ তুলেছিল বিরহিণীর স্বপ্নাবিষ্ট চোখের মতো বিস্তৃত উদাস আকাশ-নীলিমা, তরুণীর নবীন কপোলের মতো সবুজ পাতার স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, আর আগ্রহচঞ্চল মিলনের মতো বসন্তের সুরভি-নিঃশ্বাস।

শোভায় সম্ভ্রমে শুভ্রতায় উজ্জীবিত কবি ভারতের বেদনাসুন্দর আলেখ্য উদ্‌ঘাটন করে' তার মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন বিশ্বলীন সত্যের প্রদীপ্ত সুষমা। অতীতকে তিনি অন্ধকার যবনিকায় আবারিত দেহ মৃত অতীত বলে মনে করেন নি কখনও, তাঁর কাছে অতীত ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যতের জীবনপ্রবাহে নিহিত অনন্ত সত্তার ভিত্তিভূমি। তাই প্রাচীন ভারতখণ্ডের নদী গিরি নগর প্রান্তরের নামগুলি পর্যন্ত তাঁর মনের অঙ্গনে ছন্দ-সৌন্দর্যে মুখর হয়ে উঠেছিল। 'অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা শিপ্রা বেত্রবতী।' এবং এই সূত্র ধরেই ঐ রেবা শিপ্রা নির্বিন্ধ্যার তীরে তীরে কবির মগ্নচেতনা একদা এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এসে পৌঁছেছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতিতে মানুষকে প্রকৃতির ক্রোড়ালিঙ্গনচ্যুত বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যে কখনও গৌরবান্বিত করা হয় নি। বিশ্বের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই মানুষের গৌরব নয়। 'মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য

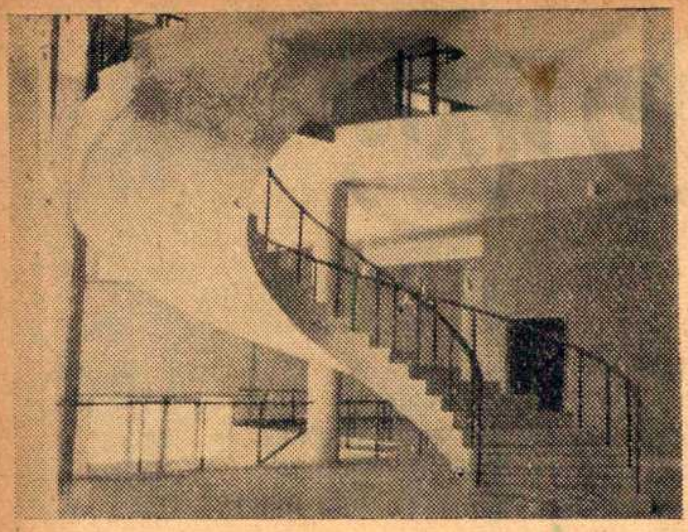

নয়া দিল্লীর রবীন্দ্রভবনের একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী ' মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ এখানে বেদান্তাভিমুখী রসস্রষ্টা কবি, ভাবদর্শনের লাবণ্য এবং ঐশ্বর্য বিস্তারে অতলান্তিক গভীরতায় মহৎ ও গভীর।

কিন্তু জাতিক সত্তার অস্তিত্ব ও প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধকরূপে। 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—'বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ-মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে, ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।'

'এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা! ধারাবাহিক বহুকোটি লোক পুরুষ-পরম্পরায় এক একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে।'

জাতিক সত্তার ঊর্ধ্বে যে আত্মিক ঐক্যবোধের নিবিড় সম্মিলিত শক্তি কবিগুরুকে মহামানুষের বিচিত্র লীলা-জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল, তারই আবেগোজ্জ্বল প্রেরণায় তিনি ভারতের মাটিতে এক অখণ্ড নব মহাভারত সৃষ্টি করার পথ-নির্দেশ করে গেছেন। এই প্রচেষ্টায় কোন তর্কের তরঙ্গ নেই, প্রমাণের জটিল প্রয়াস নেই, আছে শুধু একান্ত উপলব্ধির অব্যবহিত স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসায় যে ঐক্য ও অখণ্ডতার স্বরূপ তাঁর মানস মুকুরে প্রতিফলিত হয়েছিল সেই মৌলিক আলোকে তিনি সারা ভারতবর্ষকে উজ্জীবিত দেখতে পেয়েছিলেন। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, পদানত ভারত তাঁর কাছে সত্য ছিল না, ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যের আলোকে ভারতকে তিনি এক অবিনশ্বর আত্মার চেতনায় অখণ্ডরূপে দেখেছিলেন। আজকের ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মাদর্শের অনুসরণ বাঞ্ছনীয় বলেই তাঁর লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে হ'ল।

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকে সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

"এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্য বিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন রাখিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্ট', ইহাই ধর্ম-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।

"য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনী দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল—যাহাতে কোন পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়। অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না; সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বাণিজ্যের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে; এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিরোধী বিসদৃশ অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই

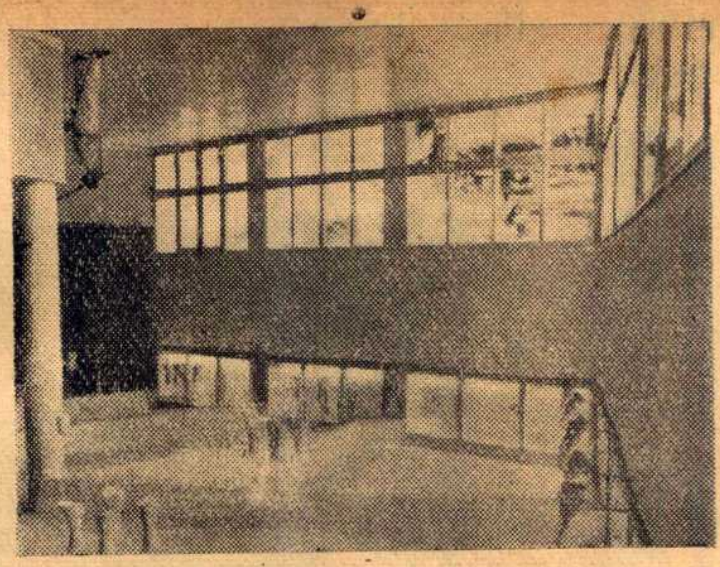

নয়া দিল্লীর রবীন্দ্রভবনের আভ্যন্তরীণ প্রদর্শনী 'ব্লক'

রাজ্যে এনে দিয়েছে এক সমৃদ্ধ একতার সুমধুর ঐকতান।

রবীন্দ্রস্মৃতির অনুধ্যানে আজ ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য সাধ্যানুপাতিক চেষ্টার ত্রুটি করছে না, এবং প্রতি রাজ্যেই ইতিমধ্যে রবীন্দ্র নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে বাঙলাই পেছনে পড়ে রয়েছে আজও, অদ্যাবধি রবীন্দ্র নাট্যশালার নির্মাণপর্ব সমাপ্ত হয় নি।

কলকাতায় এখনও রবীন্দ্র-সরণীর সাক্ষাৎ মিলছে না। আর নিমতলার শ্মশানঘাটে কবির স্মৃতি ভবনেরও কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। বাঙলা এই আত্মভোলা অবহেলার বেদন দুঃখদহনে মর্মান্তিক হলেও গ্লানি আর্তিতে বিষণ্ণ, করুণ।

তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধ শস্যেরই প্রাণবান বলবান বৃক্ষ।"

ভারতীয় ঐক্যের উদ্‌গাথা রবীন্দ্রনাথের ভাবমানসকে যে কর্মযোগের প্রেরণা উদ্বেলিত করে তুলেছিল আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কাছে তার আবেদন অসীম। রবীন্দ্রনাথ তাই একমাত্র বাঙলার কবি হয়ে থাকতে পারেন নি, তিনি লোকোত্তর প্রাণের আহ্বানে আজ ভারতের কবি, সারা বিশ্বের কবি।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী ভারতের সমগ্র অংশে যে ভাবে শ্রদ্ধা ও প্রেম-প্রীতির নিষ্ঠায় সুসম্পন্ন হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্যের বার্ষিক সম্মেলনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনা যখন আরম্ভ হয় তখন তার মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ আর তাতে তিরিশটি দেশ থেকে প্রায় অর্ধশত লেখক-লেখিকা যোগদান করেছিলেন। সেদিনের অভিভাষণে সভাপতি গুরুদেব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি নিখিল আত্মার প্রতীক, তিনি বিশ্বমানব।

প্রকৃতপক্ষে শুধু বাঙলা আর মহারাষ্ট্রের মধ্যেই নয়, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর ব্যক্তিসত্তার প্রভাব চিন্তা ও ভাবের

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত একমাত্র পরিবেশক

মূল্য—তিন টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ কবিগুরু অঙ্কিত চিত্র ॥

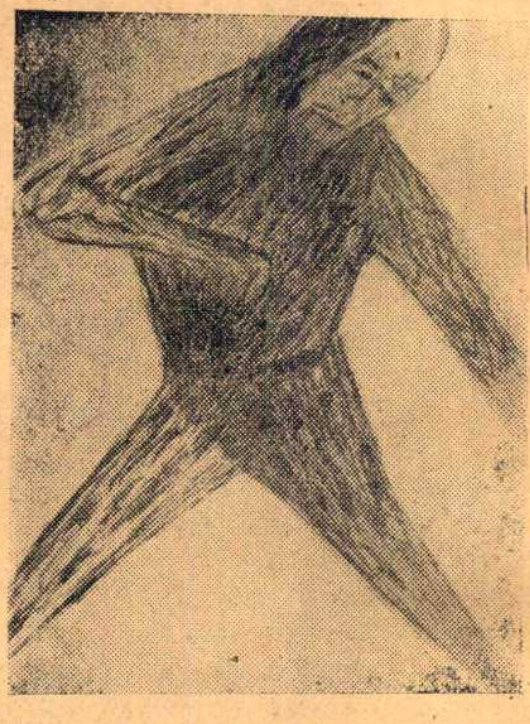

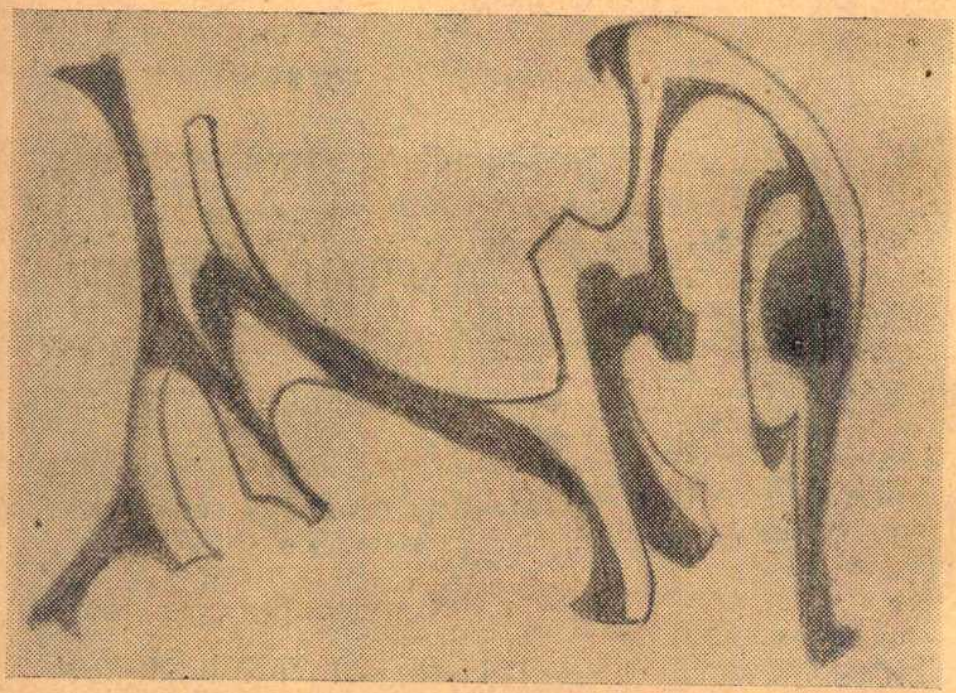

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

* চিন্তামণি কর *

ইতালীতে রেণেসাঁস যুগে বহুমুখী প্রতিভাশালী মনীষী ব্যক্তিদের উদ্ভব হয়েছিল এক সঙ্গে বহুজনের। এঁদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলোকে মহান ভাস্কর ও চিত্র-শিল্পী হিসাবে আমরা জানলেও তিনি কবি হিসাবেও পরিচিত হ'তে চেয়েছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো যদি তাঁর অমর ভাস্কর্য ও চিত্র-রচনা গুলি না রেখে যেতেন তা হলেও আজ আমরা তাঁকে জানতে পারতাম রেণেসাঁস-এর এক অপূর্ব কবি হিসাবে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি বিশ্বকবিরূপে এবং ভবিষ্যৎ যে তাঁকে এই পরিচয়েই স্মরণ করবে তা স্পষ্ট বোঝা যায়:

"আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি,
আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে।"

কবিতায় তাঁর প্রতিভার বহুধা বিকাশের মধ্যে তাঁকে চিত্রকরের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য-সাহিত্য-সম্ভার জগতকে না দিয়ে তবু তাঁর ছবি রেখে গেলে ভবিষ্যৎ তাঁকে এ যুগের এক বিরাট শিল্পী বলে মেনে নিত কি না বলা শক্ত।

কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকের সৃষ্টিতে তিনি যে পরিমাণ মনঃসংযোগ, অনুশীলন ও সাধনা করেছিলেন, তাঁর চিত্ররচনা সে ভাবে আবির্ভূত হয়নি। অবসরে মনে ভেসে যাওয়া স্বপ্নবিকসিত ধারণা খণ্ডের পিছু ধাওয়া কল্পনা বিলাসের মত তাঁর কলম ও তুলি থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মবিকাশ করেছে তাঁর ছবিগুলি।

"আমি যা আঁকি তা মনের অগোচরে। ইচ্ছে করে আঁকা বা আঁকতে চাওয়া তার একটু রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা। একে কি আর্টিষ্ট বলে। তোমরা আমায় স্তুতি বাক্যে ভোলাও—দেখো না কত গুলো মাথা-মুণ্ডই আঁকলুম। কোনটার গোঁফ আছে, কোনটার নেই, কেউ বেঁকে আছে, কোনটা অদ্ভুত—এর কি কোনো মানে আছে?"

(আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)

তাঁর করা ছবিগুলি কোনটা ব চোখে দেখা জগতের রূপাভিব্যক্তি কোনটা আধো এবষ্ট্র্যাকট কিংব পূর্ণভাবে এবষ্ট্র্যাকট। রবীন্দ্রনাথ শিল্পরচনা দক্ষতা অর্জনে আবশ্যক শিক্ষানবিশী না করলেও তাঁর রচনায় রেখা ও রঙের বিন্যাস ও সম্পাতে অদ্ভুত সঙ্গীত ও ছন্দের সৃষ্টি করেছেন।

গভীর জ্ঞানময়, বিরাট বুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিক মনের আজ্ঞাবাহী তাঁর হাতে লেখনী বা তুলিকা তাঁর ইচ্ছামত সাংখ্য ও বলিষ্ঠ রেখা ও প্রাণবন্ত রঙের প্রলেপকে কাগজের উপর সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছে

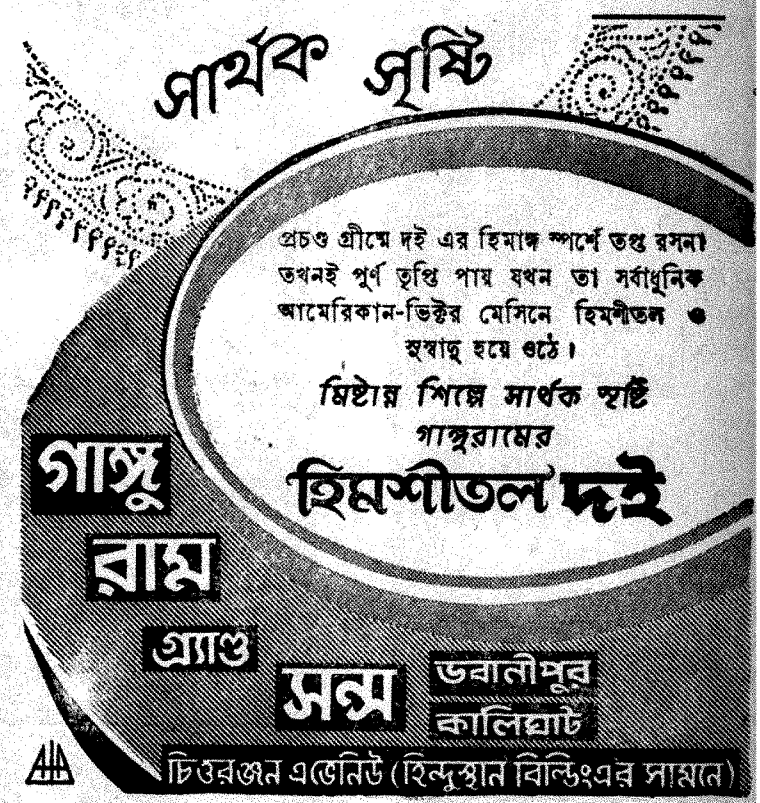

নক্‌সা

রূপে যে আধুনিকতার ভাবাভিব্যক্তি ও ঢং আজ প্রবল দেখা যায়, মনে হয় যেন তার ভবিষ্যৎ আবির্ভাবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। বাস্তব ও কল্পনা জগতের সীমাকে দ্রবীভূত করে তাঁর ছবিগুলির আত্মা দর্শকের মনে কত বিচিত্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে—বিস্ময়, বিরহ, কৌতূহল—অশরীরির সংস্পর্শ—বিপর্যয় ও ঝড়ের ঘনায়মান প্রতীক্ষা কিংবা শিশির সিঞ্চিত সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলবনে সুগন্ধে মাদর মনের বিলাস।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর প্রথম প্রচেষ্টা লেখনী ও লেখকের রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরে এর বন্ধনমুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে কাগজে লিখবার প্রভাবকে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ("দেখ তো অবুর মতো বসে বসে এই ছবিখানি করলুম। শুধু লাইনেই রেখে দিলুম।") কালি, কলম, জলরঙ কাগজ ছাড়া তেলরঙ, ক্যানভাস ইত্যাদি চিত্রকর অন্যান্য উপকরণ তিনি ব্যবহার করেন নি। এলবাম পেন্টিং-এর মত তাঁর ছবিগুলি লিখবার কাগজের সাধারণ পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ রয়ে গেছে। সূচনায় তাঁর চিত্রণকে রেখা প্রধান দেখা যায়। ক্রমে সেই রেখাময় নক্‌সা বর্ণের প্রলেপে রঙ্গীন হতে এবং পরে লেখনীর রেখা ও তুলির টানে, রেখা ও ছোপের সমন্বয় হ'তে হ'তে, লেখনীর প্রভাব বিমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে তুলিতে আঁকা ছবিতে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে পেশাদারী পটু কোন শিল্পীর রচনার সঙ্গে তুলনা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায় যে, যদি তিনি পেশাদারী শিল্পীদের মত চিত্ররচনার শিক্ষানবিশী করতেন তা বলে তাঁর করা যে শিল্পসম্ভারের সৃষ্টি হ'ত, বর্তমান ভারতীয় শিল্পের যুগ-ইতিহাস তাকে পুরোভাগে রেখেই লিখিত হ'ত। ভারতে শিল্পের

নিসর্গ চিত্র

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

* চিদানন্দ দাশগুপ্ত *

রবীন্দ্রনাথ সব শিল্পেই হাত দিয়েছিলেন, চলচ্চিত্র ছাড়া। শোনা যায় যে 'শিশুতীর্থ' এবং 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে চলচ্চিত্রের চিন্তা করেছিলেন। নানা কারণে সে চিন্তা ফলবতী হয়ে ওঠেনি। তরুণ চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা চলচ্চিত্রশিল্পের মূল সূত্রকে সহজেই খুঁজে নিত নিশ্চয়। এবং তারপর সেই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বাংলা চলচ্চিত্রের ঘুমন্ত কলালক্ষ্মী কী ভাবে জেগে উঠতেন, তা ভাবতে গেলে কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই। সেই কলালক্ষ্মী যখন কালঘুমে অচেতন তখন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর অপরিণত বাংলা চলচ্চিত্রের শিশুসুলভ দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছিল। সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্যই হোক, বিশেষ করে গোড়ার দিকের এ সমস্ত ছবি দেখা হয়ে ওঠে নি যা দেখেছি তার মধ্যে 'নৌকাডুবি'ই প্রথম। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভরাডুবিও বলা যেতে পারে কেন না দৃশ্য রচনার বোধ যেখানে বর্জিত, বহির্দৃশ্যে যেখানে টেক্‌নিক্যালিটির লেশ নেই সেখানে 'নৌকাডুবি'র মতো উপন্যাসের অবস্থা অতি অসহায়। চলচ্চিত্রের প্রাথমিক গুণ যেখানে অবর্তমান, সেখানে কেবল নাটকাংশকেই ছেঁকে নিয়ে ক্যামেরার সামনে মঞ্চস্থ করা ছাড়া উপায় কি?

'শেষের কবিতা'কে চলচ্চিত্রকরণের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট হাস্যকর। কেননা চম্পূকাব্যের মহিমা ব্যক্ত করার জন্য চলচ্চিত্রের জন্ম হয় নি। গদ্যে, কবিতায়, শিলং-এর রূপ-বর্ণনায়, অমিট্ বা লাবণ্যের চরিত্রচিত্রণে যে মনোহারিত্ব জেগে ওঠে চলচ্চিত্র সংস্করণে তার দেখা কোথাও মেলেনি এবং তার বিশুদ্ধ রসকে খুঁজে পাওয়া চলচ্চিত্রে আদৌ সম্ভব বলে বোধ হয় না। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে চলচ্চিত্রে যে প্রহসন প্রায়ই ঘটেছে তার প্রতি 'শেষের কবিতা'র অবদান সামান্য নয়। 'যোগাযোগ' ঠিক ততটা হাস্যকরতার স্তরে যায় নি, কেন না উপন্যাসে সার্থক চলচ্চিত্রের উপাদান উপস্থিত। তবু ভাবের ঘরে একেবারেই ফাঁকি, কেবল ঘটনার জোড়াতালি দেওয়াই সার। যে উন্নত চলচ্চিত্রবোধ এই জাতীয় অসামান্য উপন্যাসকে সার্থক চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে পারে তার হদিস যোগাযোগ ছবিতে মেলে না। কুমুদিনী-চরিত্রের গভীরতা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

বোধ হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চলনসই চলচ্চিত্ররূপ 'ক্ষুধিত

'ক্ষুধিত পাষাণে'র চলচ্চিত্রাভিনয়ে শ্রীঅরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়

পাষাণ'-এ। যদিও তপন সিংহের ছবিতে ছোট গল্পের রস ক্ষুণ্ণ, কাহিনীকে টেনে বড় করার ফলে সূক্ষ্মতা স্থূলতায় পরিণত হয়েছে, তবু মানতেই হয় যে পূর্বতন সমস্ত রবীন্দ্ররচনাশ্রয়ী ছবির চেয়ে তা চলচ্চিত্রধর্মী।

স্বভাবতঃই শতবর্ষপূর্তি উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ওপর সবদিক থেকে যে যুগপৎ আক্রমণ হয় তাতে চলচ্চিত্র পিছিয়ে থাকেনি। বরঞ্চ সুখের বিষয় যে, সত্যজিৎ রায়-এর 'রবীন্দ্রনাথ' ছবি-ই (ইংরিজী) শতবার্ষিকীর শ্রেষ্ঠ প্রশস্তি হয়ে দাঁড়াল, কেন না আর কোনো মাধ্যমের রবীন্দ্রপ্রতিভার এত সমগ্র এবং যথাযথ পরিচয় ঐ উৎসবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

কোনো কোনো পর্যায়ে—যেমন চিত্রকলায় বা যুদ্ধোত্তর রবীন্দ্রনাথের অথবা পদ্মার ওপর কালো মেঘের ছবিও 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' গানের সংযোগে অবশ্য ব্যক্তিগত অনুভব প্রকাশ পায়। নৈর্ব্যক্তিক সংবাদ কিছু কম থেকে স্বকীয় ভাবপ্রকাশ বেশি হলে হয়ত এ ছবির শতবার্ষিকী গুণ খর্ব হতো, কিন্তু রস পরিবেশন আরো সমৃদ্ধ হত।

'অর্ঘ্য'-এর গ্লানি থেকে শতবার্ষিকীর অনেক লুঠতরাজের মধ্যে চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত কালিমার নিদর্শন হয়ে থাকবে স্বনামধন্য কোনো পরিচালকের চলচ্চিত্রে। সেখানে পরিচালক বোধ হয় ভেবেছিলেন কবিতায় বর্ণিত ঘটনাকে ক্যামেরার সাথে অভিনয় করানোই তাঁর একমাত্র উপায়। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে illustrate করতে চেয়েছেন। এই পথ ভুল বলেই ক্ষান্ত হওয়া গেলে কথা ছিল না। কিন্তু illustration-এরও স্তর বিভেদ আছে, এর চেয়ে নিম্নস্তরে তাকে নামানো কঠিন। ফুটপাথে সাজানো রামসীতার ক্যালেণ্ডারে বাল্মীকি রামায়ণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাও এর তুলনায় মহৎ সৃষ্টি বলতে হবে।

শতবার্ষিকীর এই কালিমা চলচ্চিত্র

কিছুটা মোচন করে সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা'তে। মোটামুটি হাল্কারসের রচনা হলেও উপভোগ্য এবং চলচ্চিত্র-ধর্মের বিচারে রবীন্দ্ররচনাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ 'তিন কন্যা'। ছোটো গল্পের সূক্ষ্মতা ও স্বধর্মকে বজায় রেখে তিনটি পৃথক গল্পকে একত্র পরিবেশন করে বাংলা ছবিতে অভিনব পন্থা নির্দেশিত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগ কেবল তাঁর গল্প-উপন্যাস বা কবিতার ব্যবহারেই শেষ হয় নি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র গান বাংলা ছবির অলিগলিতে অনেকদিন থেকেই অতি পরিচিত। সুষ্ঠু ব্যবহারের তারতম্য থাকলেও 'আধুনিক বাংলা গান'-এর বিভীষিকাকে অন্তত কিছুটা ঠেকিয়ে রেখেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাংলা ছবির অপেরা-প্রবণতা রবীন্দ্রসঙ্গীতের

তিন কন্যার "পোষ্ট মাষ্টার" (শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়)

ভিত্তিতে সঙ্গীতপ্রধান ছবির মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে কিন্তু তার পথসন্ধান এখনো হয় নি'। আবহসঙ্গীতেও রবীন্দ্রনাথের গানের সুররীতি কাজে লাগতে পারে মনে হয়। কেন না কথার বর্ণনাকে সুরের সাহায্যে মায়াময় করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই আমাদের দেশের Programme music-এর ভিত্তি খুঁজতে হয়। বিভিন্ন মেজাজকে রবীন্দ্রনাথের গান যে ভাবে ব্যক্ত করে তাতে কথা বাদ দিলে শুধু সুরের অনেকখানি বর্ণনাত্মক শক্তি থাকে। কথার পরিবর্তে যদি চলচ্চিত্র ব্যবহার হয় তবে এক ধরণের সম্পূর্ণতা আসার সম্ভাবনা থাকে যা illustration-এর অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়, দৃশ্যবস্তু ও সঙ্গীতের সম্পূর্ণ সমন্বয়। বলা বাহুল্য যে, 'মালতীলতা দোলে' সুরের সঙ্গে কোনো রকমের লতা বা গাছ দোলানো অপরিহার্য নয়। তেমনি আবহসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সুর ব্যবহারেও সুরের সরলীকরণ পরিবর্ধন, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন অনুভূতিকে এমন কি ঘটনাবোধকে ব্যক্ত করার যে সূক্ষ্ম ক্ষমতা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের মধ্যে রয়েছে তারই অনুশীলন অভিপ্রেত।

রবীন্দ্ররচনা থেকে চলচ্চিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনাও অশেষ। কেবল বিশ্বভারতী এবং শিক্ষিত সাধারণ যদি সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পংক্তি মিলিয়ে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ান এবং মূল থেকে আক্ষরিক বিচ্যুতির চেয়ে রুচিভ্রষ্টতাকে কঠিনতর দৃষ্টিতে বিচার করেন তবেই এই সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হবে।

স্নানের আনন্দ...
বেঙ্গল কেমিক্যালের গোল্ডেন
স্যান্ডালউড
সোপ
স্নানের পর এই
সাবানের মধুর চন্দন-গন্ধ
আপনাকে সারাদিন
সজীব ও প্রফুল্ল রাখবে।

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

মিহির সরকার এণ্ড মনোহর সরকার

শো রুম—২০০/২ সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

কারখানা—৫২/এফ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫

ভারত সরকারের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুযায়ী
যন্ত্রে তৈয়ারী ১৪ ক্যারেট অলঙ্কারের
আমরা প্রস্তুতকারক।

ইহার

(১) স্থায়িত্ব বেশী

(২) নিখুঁত গড়ন ও

(৩) ব্যবহারে খুব কম ক্ষয় হয়

জাতীয় সঞ্চয়ের জন্য

১৪ ক্যারেট অলঙ্কার ব্যবহার করুন

Phone : { 34-9489 / 34-9488 Gram : "BASUMATI" Price : 25 nP.

10 MAY 1963

স্বচ্ছ **কাঁচের** আবরণ

সেরা কাঁচের
দরকারে সর্বদা
এইচ, পি, জি,
কাঁচই নেবেন

বর্ষায়, ঝড়ে অথবা দারুণ ঠাণ্ডায়—যে কোন অবস্থায়ই আপনি আরামে ঘরে বসে আপনার বাগানের শোভা উপভোগ করতে পারেন। ঘরে স্বচ্ছ কাঁচ লাগিয়ে নিলেই হলো। কাঁচে ঝামেলা কম, খরচা অল্প আর তা দেখতেও চমৎকার। কাঁচ লাগালে আপনার ঘর প্রশস্ত মনে হবে, বাইরের আলো ঘরে আসবে কিন্তু আওয়াজ ও ধুলোময়লা ঢুকবার পথ পাবে না। আর কাঁচ পরিষ্কার করতেও কোন ঝামেলা নেই। কাঁচ অজস্র কাজে লাগে—অফিসে, স্কুলকলেজে, হাসপাতালে, দোকানে, হাজারো জায়গায়। নানা মাপের নানা রকম পুরু কাঁচ পাওয়া যায়। আপনার যে কোন প্রয়োজনে এইচ্, পি, জি, কাঁচের শীট ব্যবহার করতে পারেন।

হিন্দুস্থান-পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেন্টস : **তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ**

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

IWTHP 5664

সাপ্তাহিক

বসুমতী

আকর্ষণ—'আমেরিকা থেকে'

● ● ৬৭ বর্ষ, ৫২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ● ●

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী

হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

আপনার চিকিৎসক যখন বুঝতে পারেন যে আপনার বুকে সর্দ্দি জমেছে...

তখনই তিনি আপনাকে এ্যাজমলীন সেবন করতে বলেন— কারণ তিনি জানেন যে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্, সর্দি ও কাশির উপযোগী ঔষধ এ্যাজমলীন। এ্যাজমলীন সেবনে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপানীর টান কমে যায় এবং অধিককাল স্থায়ী শ্বাস কষ্টের অবসান ঘটিয়ে রোগীকে দ্রুত আরগ্য লাভে সাহায্য করে।

এ্যাজমলীন

শ্বাসযন্ত্রের

একমাত্র নির্ভরযোগ্য টনিক

প্রস্তুতকারক —

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

১১১১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩
আজকের মানুষ	...	৪
শহর কলকাতা	...	৫
নূতন বাজেটের কয়েক দফা	...	৭
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৯
উৎসমুখে (কবিতা)	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১৬

মুকুন্দ পাবলিশার্সের বই মানে ভালো ভালো বই!

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ত ম সা ২·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
প্রতিহারিণী ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
দ্বীপপুঞ্জ ৪·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
ময়না তদন্ত ৩·০০

চিরঞ্জীব সেনের
রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

কানাই পাকড়াশীর
নীলকুঠীর জংলায় ৩·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
উলটো পুরাণ ৪·০০

গোলাম কুদ্দুসের
সুরের আগুন ৪.৭৫

প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর
প্রাণতরঙ্গ ৬·৫০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের
দেওয়ালের দাগ ৭·০০

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সেই দিনটি (গল্প)	মানবেন্দ্র পাল	১৭
কাগজ বদল	সর্বদর্শী	২৩
হে প্রবৃদ্ধ পিতামহ পথ বলো (কবিতা)	শান্তনু দাস	২৪
আমেরিকা থেকে	ত্রিদিব মুখোপাধ্যায়	২৫
ভারত দর্শন	...	৩০
আন্তর্জাতিক	...	৩৫
বঙ্গদর্শন	...	৪২
রঙ্গজগৎ	...	৪৪
খেলাধূলা	...	৪৭

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
গ্রন্থাবলী
মূল্য সাড়ে তিন টাকা
কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।
বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে
ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব
—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—
কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।
বিখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী
১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মণিলাল গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲
রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০।
প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্ব্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক রচিত কয়েকখানি
ভাল বই
স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী
৬ষ্ঠ ভাগ—প্রতি খণ্ড ৷৷০
গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী ৸০
মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে ৸০
সরসীবালা বসুর—
শিবানী ৷৷০
বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ৷৷০
চারুবালা বসুর—
পতিব্রতা ৷৷০
কাঞ্চনমালা দেবীর—
স্তবক ও রসির ডায়ারী একত্রে ২৲

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

৬৭ বর্ষ, ৫২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

Thursday, 16th May, 1963
25 Naya Paise

756
.005
Y.67

বাংলা ভাষার মর্যাদা

বাংলা ভাষা এই বৎসর রবীন্দ্র-জন্ম দিবসে এই রাজ্যের সরকারী কাজ-কর্মে পাকাপাকিভাবে প্রথম ব্যবহৃত হোল। বাংলা ভাষা সরকারীভাবে প্রচলিত হবে---এ কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষিগণ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। মাতৃ-ভাষাকে কোনো এক করদ রাজ্যে রাজভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখে একদা বিদ্যাসাগর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্র-নাথ সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রচলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে-ছিলেন বলেই---ইংরেজী তিনি জানেন না এমন আখ্যাও নিন্দুকদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত হন নি। এবং তাঁর বিশ্বাসকে সত্যে রূপায়িত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক অবিশ্বাস্য রকমের যুগান্তর সৃষ্টি করলেন। বাংলা ভাষাকে এই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের একদা বাস্তব চেষ্টা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্য-সচিব শ্রীসুকুমার সেন। তখন থেকেই নাকি বাংলা ভাষাকে প্রচলন করার ব্যাপারে অনেকের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল। প্রয়োগ-গত অভিজ্ঞতা ও বাংলা পরিভাষার অভাব, স্বল্প সংখ্যক বাংলা টাইপ-রাইটারের অসুবিধা ও বাংলা সাঙ্কেতিক শ্রুতিলিখন পদ্ধতির জটিলতা মহৎ উদ্দেশ্যের পথে বিঘ্নস্বরূপ ছিল।

যাই হোক, পরিভাষা বা বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কারমুক্ত যে নির্দেশ দিয়েছেন---তা যথাযথ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে কোনোকালেই গোঁড়ামি প্রশ্রয় পায় নি। তাই এই ভাষায় একদা অনেক ফার্সী শব্দ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবাধে প্রবেশা-ধিকার লাভ করেছিল। পরবর্তী-কালে অন্যান্য বিদেশী শব্দ অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় এসেছে। এমন কি, যে সংস্কৃত ভাষাকে 'রক্ষণশীল' মনে হয়, তাতেও বহুযুগ আগে অন্যভাষার শব্দসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যে 'দাম' শব্দটি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বাধিক প্রচলিত তাও যে কিভাবে গ্রীকভাষা থেকে এসেছে তা অনেকেই জানেন। সেইভাবে অন্য ভাষার পরিচিত শব্দ অপরিবর্তিত কিংবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে সহজবোধ্য অবস্থায় বাংলা ভাষায় থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। 'দাঁত ভাঙা' পরিভাষা সৃষ্টি না করে আমরা অন্য ভাষার প্রচলিত শব্দগুলি অনা-য়াসে গ্রহণ করতে পারি। ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি-মূলেও আছে ঐ গ্রহণ-শক্তি। বিদ্যাসাগর পরিভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে হোমরা-চোমরাদের না নিয়ে সাধারণ মানুষের মুখের কথার কাছাকাছি হতে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। আমরা যদি ঐ আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে বাংলা ভাষা যেমন যুগোপযোগী, তেমনি সর্ব-স্তরে সহজেই বিকশিত হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মহৎ কাজ করলেন, তদ্বারা গণতন্ত্রের আদর্শই সুদৃঢ় হোল। আমরা চাই, বাংলা দেশে অধিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও বাংলা ভাষা চালু হোক। এখনো এমন অনেক বিদ্যালয় বা কলেজ আছে, যেখানে বাংলা ভাষা অব-হেলিত, অনাদৃত, এমন কি পঁচিশে বৈশাখ যেন সেখানে তাৎপর্যহীন। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও শিক্ষা-নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ডিন রাস্ক

বিশ্বের মানচিত্রে লালচীনের আবির্ভাবের পরই তার সম্প্রসারণ-শীল, বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয় যে কয়জন মননশীল রাজনীতিকের দূর-দৃষ্টিতে প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল, মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ডিন রাস্ক তাঁদেরই একজন।

কোরিয়ার যুদ্ধে রবাহুতের মত হঠাৎ চীন যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন পররাষ্ট্র দপ্তরের নবনিযুক্ত এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী ডিন রাস্ক বুঝেছিলেন চীনকে সায়েস্তা না করতে পারলে সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুষ্টগ্রহের মত হয়ে দাঁড়াবে. ডিন রাস্কের প্রচেষ্টাতে আজও প্রশান্ত মহাসাগর অশান্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এখানে সপ্তম নৌবহর মোতায়েনের কাজে তাঁর অবদান সর্বাধিক।

এই লালচীনের খপ্পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে মুক্ত রাখতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উপমহাদেশ ভারতকে নবোদ্যমে গড়ে তোলা। সেই কাজে ডিন রাস্ক এসেছিলেন ভারত সফরে। পাক-ভারত মৈত্রীকে দৃঢ় করে তুলতে তিনি এখন অগ্রণী।

ভারতকে শক্তিশালী করার কাজে মার্কিন সাহায্যের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, এ কথাও তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। চীনের সম্প্রসারণ নিরোধ কাজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য।

লাওস ও ভিয়েতনামে যখন চলেছে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আফ্রিকায় দেখা দিয়েছে বিবদমান দুইটি দলের মধ্যে সংঘাত, কিউবার ক্যাষ্ট্রো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে যুক্ত-রাষ্ট্রকে তুলেছে বিব্রত করে, ঠিক এমনি সময়ে কেনেডি নির্বাচিত হন মার্কিনদেশের প্রেসিডেন্ট। আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট কার হাতে তুলে দিবেন পররাষ্ট্র দপ্তরের গুরুদায়িত্ব তা' নিয়ে বেশ কিছুটা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট যেদিন ডিন রাস্কের নাম ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি জানালেন, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই বেছে নিয়েছেন।

১৯০৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জর্জিয়ার চেরোকী কাউন্টিতে ধর্ম-যাজকের পরিবারে ডিন রাস্কের জন্ম হয়। নিজের দেশে শিক্ষা শেষ করে তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শনের ছাত্র হয়ে আসেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনেই তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রবন্ধ লিখে লাভ করেছিলেন "সিসিল শান্তি পুরস্কার।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি জেনারেল জোসেফ ষ্টিলওয়েলের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন ব্রহ্ম অভিযানে। দূর প্রাচ্যের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিভাগে যোগ-দান করেন। প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের সময় ডিমোক্র্যাট ডিন রাস্ক পদত্যাগ করে 'রকফেলার ফাউণ্ডেশনে'র সভাপতির পদ গ্রহণ করেন এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলার কাজে তিনি আট বছরে ২৫ কোটি ডলার সাহায্য বিতরণ করেছেন।

বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির এখন সব চাইতে প্রয়োজন আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য। মার্কিন সরকারের অর্থভাণ্ডার সীমিত হলেও ডিন রাস্ক এ কাজে সফল হবেন বলে তাঁর দেশবাসী আশা রাখে।

"ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত
কলিকাতাতে ফিটন রথ।"

কলকাতার ঐরাবত যে আর ফিটন রথ নেই, তা বলা বাহুল্য। সামন্ততন্ত্র বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিটনও বিদায় নিয়েছে। এযুগ যন্ত্রযানের যুগ। কলকাতায় আজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত মটর-রথ। রাশি রাশি—অসংখ্য।

কোলকাতার জন্মলগ্নের পরবর্তী কাল থেকে মানুষ ক্রমাগত এখানে ভিড় জমিয়েছে। সে যুগে সকলে—

"রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে,
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে"।

কলকাতার আকাশবাণী ভবন

কিন্তু এ যুগে শিল্পসমৃদ্ধিশালী কলকাতা বন্দর পশ্চাদ্‌বর্তী পাঁচটি রাজ্যের পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্রস্থলরূপে বিরাজমান হওয়ায় এবং ভারতের পণ্যসামগ্রীর ৪৩ ভাগ দ্রব্য এই বন্দর দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় এর গুরুত্ব অসীম। বাণিজ্যিক কারণে এবং চা ও পাট শিল্পের সমস্ত দায়িত্ব এই বন্দর মাধ্যমে রপ্তানী হওয়ায় কোলকাতা যেমন গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল রূপে—সেই প্রসঙ্গে মানুষও এসেছে জীবিকার সন্ধানে। এই মানুষের ভিড় আজ কোলকাতায় যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যানবাহন চলাচল ও দুর্ঘটনা তার অন্যতম।

কলকাতার কর্পোরেশনের এক্তিয়ারভুক্ত ও ডক এলাকা সংযুক্ত পথের বিস্তার ৫০০·৬৮ মাইল। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ কালীঘাট ট্রামডিপো থেকে টালীগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত যার বিস্তার ১৫০ ফুট। রাসবিহারী এভিনিউ, সাদার্ণ এভিনিউ ও কিছুকাল হল নির্মিত মাণিকতলা-নারকেলডাঙ্গা বেলেঘাটা মেন রোডের বিস্তার ১২০ ফুট। একমুখী পথ চলার ব্যবস্থা-সম্পন্ন এই রকম পথ কলকাতার মত মহানগরীর পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু কলকাতার সর্বাপেক্ষা জনবহুল পথগুলি যেমন—চিৎপুর, ষ্ট্র্যাণ্ডরোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত সীমিত বিস্তারে আছে। শহর কলকাতার এই স্বল্পবিস্তারিত রাজপথগুলো কলকাতার মানুষকে আজ নির্বিঘ্নে পথচলার অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছে এই সীমাবদ্ধ ব্যাপ্তিই সমস্যার সৃষ্টি করেছে যানবাহনের।

কিঞ্চিদধিক ৫০০ মাইল পথে কিরূপ পরিমাণ যানবাহন চলাফেরা করে তার একটি অনুমান করা যাক্। দ্রুতগামী যানবাহনের সংখ্যা কলকাতায় ৭৮,১০৬টি। এবং ধীর গতি সম্পন্ন যানবাহনের সংখ্যা ২১ হাজারের কিছু বেশি। এ কথা সহজেই অনুমেয় অন্তত ৮০।৮৫ হাজার যানবাহন কলকাতার রাজপথে প্রত্যহ চলাফেরা করে। এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই বড়বাজার, শিয়ালদহ, ডালহৌসী ও এসপ্ল্যানেড এলাকায়। প্রাইভেট মোটর গাড়ীর সংখ্যা আজ পৌছেচে পঞ্চাশ হাজারে, ট্যাক্সি

বৌবাজার ষ্ট্রীটে একটি পৌর-সংস্থার গাড়ী জনৈক আট বৎসরের বালককে চাপা দেয়। পার্শ্বে আহত ড্রাইভার।

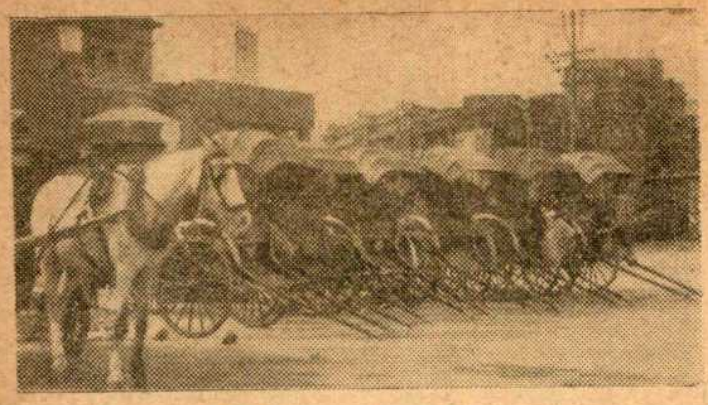

শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী

২১০০, ট্রাক ১০,৯৯৪, ষ্টেটবাস ৮১১ (কিছু বেড়েছে) প্রাইভেট বাস ৯০৫, মটর সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন প্রায় ১৪০০০। কলকাতার রাজপথের যে বিস্তার ও যে আয়তন তাতে এই বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচলের পক্ষে তা অনুপযুক্ত। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। প্রায় ২০।২২ হাজার দুর্ঘটনা প্রতি বছর কলকাতায় ঘটে। দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি জড়িত প্রাইভেট মটর গাড়ি, তারপর ট্যাক্সি, তারপর বাস (ষ্টেট ও প্রাইভেট দুইই)। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ধীরগতি যানের জন্যও দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানুষের অন্যমনস্কতার জন্য এবং পথ চলার নিয়মগুলো নির্দয় ভাবে অবহেলিত করার জন্য মানুষ দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ওভারটেক করা, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণ তো আছেই।

একদিন রূপচাঁদ পক্ষী গান বেঁধেছিল,

"কত রোড কত গলি
সাধ্য কি যে তাহা বলি
ইচ্ছা করে ছবি তুলি
সে হয়ে ওঠা দুষ্কর।
ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর।।"

আজ রোড ও গলির ছবি তুলতে গেলে দুর্ঘটনার ছবি তুলতে হয়। আর তাতে যে কলকাতা ধন্য হতে পারে না তা সুনিশ্চিত। তাই কলকাতার দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য তো বটেই কলকাতার অগুনতি মানুষকে পথ চলার নিয়মগুলো মেনে চলবার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য শহরেও পথ চলার নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি আছে। কলকাতাতেও তা হওয়া প্রয়োজন। শৃঙ্খলা মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। পথ চলতেও। কর্মযোগে ঘর্ম পড়তে থাকে যে লাখ লাখ মানুষের, তাদের সময় কম মেনে নিয়েও এ কথা বলা যায়, পথ চলার চেতনা বোধ জাগ্রত হলে কলকাতা ধন্য হবে বৈকি?

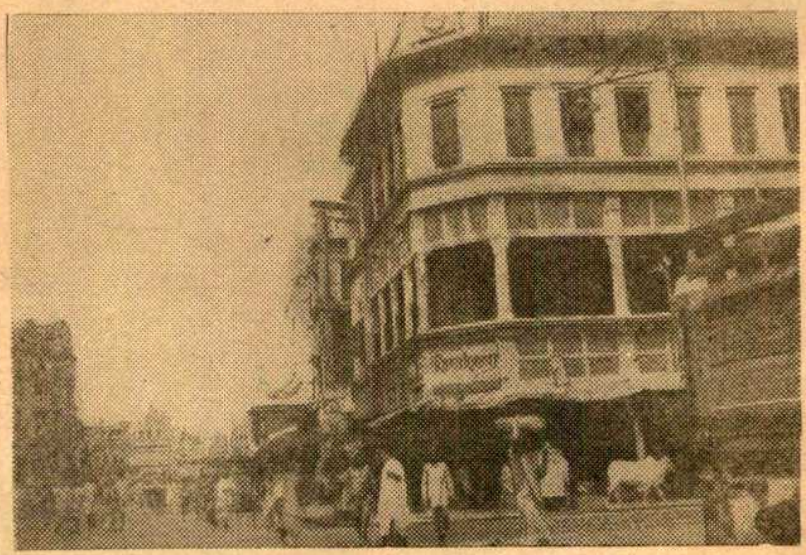

কর্পোরেশনের ফুটপাথের উপর শূন্যে ঝোলা অবস্থায় বৃহৎ অট্টালিকা

নূতন বাজেটের কয়েক দফা

নক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট

নূতন বাজেট লইয়া নানাদিকে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু যে লোকের অধিক টাকা আয়কর দিতে হইবে তাহাই নহে—প্রতি বছর নূতন ধরণের আইন করিয়া জনসাধারণকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করা হয়। কয়েক বছর আগে ব্যয়ের উপর কর বসাইয়া অনেক বক্তৃতা করা হইয়াছিল; গত বছর তাহা উঠাইয়া দিবার সময় ঐরূপ করের অপকারিতা সম্বন্ধে আর এক দফা বক্তৃতা চলিল। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ভরসা দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতার ফলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন দু'টী তুলিয়াও দিতে পারেন। এরূপ ঠেকিয়া শেখা বুদ্ধিমানের কর্ম নয় এবং ঘন ঘন আইন পরিবর্তনে দেশের ক্ষতি এবং

কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী মোরারজী দেশাই

লোকের নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। লোকে অন্নসংস্থান করিয়া জীবন ধারণেই বিব্রত তারপর তাহাদের আর নব নব আইনে জর্জরিত না করাই ভাল।

আজকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই যে অসংখ্য আইন-কানুন জানা থাকা দরকার—আয়কর আইন তাহার মধ্যে অন্যতম। এই প্রবন্ধে নূতন বাজেটে পুরাতন আইনের যে সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে—তাহারই মধ্যে প্রধান কয়েকটি সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবে। অর্থমন্ত্রী এ প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত বাজেটের যে সব সংশোধন ঘোষণা করিয়াছেন তাহারও বিশেষগুলি এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে।

ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য অতিরিক্ত আয়কর সারচার্জ

আয়কর সোজাসুজি বর্ধিত করা হয় নাই কিন্তু আয় হইতে আয়কর বাদ দিয়ে যে অঙ্ক দাঁড়াইবে তাহার উপর নিম্নলিখিত হারে এই সারচার্জ দিতে হইবে।

১।	প্রথম ৬০০০৲ উল্লিখিতরূপ অঙ্ক	৪%
২।	তারপর ৯০০০৲ উল্লিখিতরূপ অঙ্ক	৬%
৩।	তারপর ১২,০০০৲ উল্লিখিতরূপ অঙ্ক	৮%
৪।	তারপর ১৫,০০০৲ উল্লিখিতরূপ অঙ্ক	৯%
৫।	তারপর অবশিষ্ট উল্লিখিতরূপ অঙ্ক	১০%

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গত বছর যে বিবাহিত একাধিক সন্তানের পিতা বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকা বেতনের মধ্যে ৪৭৯৲ টাকা ট্যাক্স দিয়াছেন, এ বছর তাঁহাকে এই আয়ের উপর ৯৩০৲ টাকা অর্থাৎ ৪৫১৲ টাকা অধিক ট্যাক্স দিতে হইবে। ২৫০৲ টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে জমা দিলে অনুরূপ টাকা এই সারচার্জ হইতে বাদ যাইবে অর্থাৎ উল্লিখি ৯৩০৲ টাকা কর কমিয়া ৬৮০৲ টা হইবে। জমার ২৫০৲ টাকা পাঁচ বা বাদে শতকরা ৪৲ টাকা করশূন্য অ সহ পাওয়া যাইবে। বাধ্যতামূলক সঞ্চ আইন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই বি বিবরণ পাওয়া যাইবে। যাঁহা দু' বেলার অন্নসংস্থান করিতে পারে না তাঁহাদের পক্ষে সঞ্চয় এক বিলাস মাত্র। এইরূপে নানাভা ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে বর্তমানে অ সংগ্রহ কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচ্য।

কোম্পানীর কর্মচারীদের আয় নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানীর কর্মচারীদের মাসি ৫০০০৲ টাকার অধিক বেতন বা সুবিধ দিলে তাহা কোম্পানীর আয়করে জন্য খরচ হিসাবে বাদ দিতে দেওয় হইবে না প্রথমে আয়কর বিলে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এখন অর্থমন্ত্রী বলিতেছেন, এই আইন শুধু ভারতবাসীদের জন্যই প্রযোজ্য হইবে। ইহাতে যে জাতিগত সম্মানহানি ঘটিবে অর্থমন্ত্রী মহাশয় তাহা চিন্তা করেন নাই। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের বেতনাদি সরকারের কাছে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখন হইতে সরকার ভারতীয় ডিরেক্টরদের পক্ষে মাসিক ৫০০০৲ টাকার অধিক বেতন ও সুবিধা মঞ্জুরই করিবেন না। ইহার ফলে ভারতীয় পুরাতন ডিরেক্টরগণও বিদেশী নবতম ডিরেক্টর হইতে কম বেতন পাইবেন। অল্প বেতনের লোক দিয়া যে ব্যবসা চালান যায় না সরকার পরিচালিত অনেক

প্রতিষ্ঠান দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। আয়করের নামে এরূপ বেতন নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত কি না অথবা দেশী ও বিদেশী লোকদের জন্য এরূপ বিবিধ ব্যবস্থা জাতীয় সংবিধানের বিরোধী কি না তাহা অবশ্যই বিবেচ্য।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা

এই আইন দ্বারা ব্যক্তিদের পক্ষে সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করা হইবে। সঞ্চয়ের অর্থ অবশ্যই বিধি অনুসারে সরকারে জমা দিতে হইবে। সঞ্চয় জমার পরিমাণ এইরূপ—

১। জমির আবাদীদের পক্ষে ১৯৫৯।৬০ সনের রাজস্বের শতকরা ৫০৲ টাকা।

২। শহরের স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক ভাড়ার মূল্যের শতকরা ৩৲ টাকা। যাঁহারা আয়কর দিয়ে থাকেন তাঁহাদের আয়ের সহিত এই ভাড়া যুক্ত হইবে, কাজেই এ বাবদ আলাদা কোনও জমা দিতে হইবে না।

৩। নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানগুলির বেতনভোগী ব্যক্তিগণ যাঁহারা বাৎসরিক ১৫০০৲ টাকার উপর আয় করেন অথচ আয়কর দেন না তাঁহাদের বেতনের শতকরা ৩৲ টাকা। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা আয়ের শতকরা ১১৲ টাকা নির্দিষ্টরূপে সঞ্চয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের উল্লিখিতরূপ জমা দিতে হইবে না।

৪। অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের বিবিধ হারে।

৫। যাঁহাদের আয়কর দিতে হয় তাঁহারা যদি সারচার্জ কমাইতে চাহেন তবে নিম্নলিখিত হারে:

আয় হইতে কর বাদ দিয়া প্রথম ৬০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩৲ টাকা তদূর্ধ্ব টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা।

এই আইনটিও সংবিধানের বিরোধী কি না তাহার স্থিরতা নাই।

কোম্পানী

আয়কর ইত্যাদিতে আগের বছরের তুলনায় সামান্যই রদবদল হইয়াছে কিন্তু কোম্পানীগুলিকে অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হইবে। মোট আয়ের দশমাংশ ও কোম্পানীর আয়করাদি ও কার্যকরী মূলধন (আদায়ীকৃত মূলধন+রিজার্ভ) এর শতকরা ৬৲ টাকা বাদ দিয়া যে অঙ্ক দাঁড়াইবে তাহার মধ্যে কার্যকরী মূলধনের শতকরা ৪৲ টাকা পর্যন্ত ৫০% এবং তদূর্ধ্বের উপর ৬০% অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হইবে। যদি কোনও বছরের মুনাফা উল্লিখিত শতকরা ৬৲ টাকা হইতে কম হয় তবে সেই ঘাটতি তিন বছরের মধ্যে মুনাফা হইতে বাদ দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য করা হইবে। উল্লিখিত শতকরা ৬৲ টাকা যদি ৫০,০০০৲ টাকা হইতে কম দাঁড়ায় তবে এই শেষোক্ত টাকার উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হইবে না।

নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত

উষসী

ট্যালকম পাউডার

বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড সহযোগে প্রস্তুত

ঘামাচি স্থায়ীভাবে দূর করে

উষসীর দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল ও সজীব রাখবে। বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড থাকায় ইহা অতি সত্বর ঘামাচি দূর করিয়া আপনাকে অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষে সমান উপযোগী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

মোগল উদ্যান

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

আজ দিল্লীর নবীনা উর্বশীদের কথা বলব, সেই সব উর্বশীর কথা, যাঁরা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। যাঁরা শুধু সুন্দরী রূপসী। তাঁরা হলেন দিল্লীবাসিনী উর্বশী। এক কথায় যাঁদের বলা হয় মডার্ণ, মানে আধুনিকা।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি তাঁদের পদতলে তপস্যার ফল ঢেলে দেন কি না জানি না, তবে তাঁদের কটাক্ষঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু নবীন যুবকের নিদ্রাহানি ঘটেছে। সে খবর দিল্লী থেকে কেম্‌ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। সত্যি বলতে কি তাঁদের রূপচ্ছটার তেজটা এতই উগ্র যে, দিল্লীর খ্যাতনামা কলেজ থেকে কো-এডুকেশন তুলে দিতে হয়েছে। তার নির্দেশ এসেছে সুদূর কেম্‌ব্রিজ ব্রাদারহুডের কর্তৃপক্ষ থেকে। উত্তর-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ দিল্লীর সেণ্ট্‌ ষ্টিফেন্সে তাই আজকাল কো-এডুকেশন নেই!

বসন্তের আম্রকুঞ্জের মুকুলিত শাখায় কোকিলের কুহুধ্বনিতে মনে যখন উদাসভাব দেখা দেয়, রক্ত-রঞ্জিত অশোক শাখায় যখন দক্ষিণ সমীরণের দোলা লাগে, মাধবীলতা যখন নব পল্লবিত আম্রশাখা জড়িয়ে মৃদু-মন্দ বাতাসে দুলতে চায়, দিল্লীর আধুনিকার মন তখন কিংশুক রক্তিম রাগে গোপনব্যথার সাথে ছুটে যায় শুধু একটি কেন্দ্রে। সেটা হল নয়া-দিল্লীর কনট প্লেসে। সন্ধ্যার কনট প্লেস যেন একটা মধুচক্র। মধুচক্রই কি শুধু? বসন্তকুঞ্জও বটে। আধুনিকা কিছুতেই তার মনটি ঘরে রাখতে পারেন না রুদ্ধ। নাম না জানা বন্ধুর জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। সকল বাধা তুচ্ছ করে, শপিঙের দোহাই দিয়ে, ষ্ট্রোলিঙের ছুতোয় তখন সে ছুটে যায় দিল্লীর এই নব বসন্তকুঞ্জে।

জানালার ওধারে সম্ভাগতা নব-বধূটি এতক্ষণ কন্তু এই প্রতি-বেশিনীটিরই প্রতীক্ষায় ভ্রান্তভাবে প্রহর গুণছিল। গ্রাম্য বধূ। সুদূর বাংলার পল্লী থেকে এসেছে। আধুনিকার ছোঁয়া এখনও লাগে নি তাঁর গায়ে। পুরোণো সেই সুরে দূর থেকে কেউ এসে তাঁকে ডেকে বলে না, 'বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল্‌।'

আধুনিকাকে সে ঈর্ষা করে না! সে এখনও ঈর্ষা করতে শেখে নি। একাকিনীই সে নিজের মনে মনে আবৃত্তি করে,

"হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ,
উদার পথ ঘাট
পাখীর গান কই বনের ছায়া?"

এখানে খোলা মাঠ হয় তো আছে। রয়েছে উদার পথ ঘাট। অভাব নেই পাখীর গানের, বনের ছায়ার। এখানে যার অভাব সেটা হ'ল শু সেই সুকুমার মতি সরল খোলা মনটি

নব গ্রাম্যবধূ এখানে পাবে না যার নাগাল।

দিল্লী থেকে মথুরা খুবই নিকটবর্তী। আজকাল বোধ হয় সেইজন্যই দিল্লীর আধুনিকার দল শকুন্তলা, প্রিয়ংবদার ষ্টাইল ছেড়ে এক কাঠি ওপরে উঠেছেন। দিল্লীর আধুনিকাদের 'চোলি' ড্রাইভ্ মাঝে স্থানীয় পত্র-পত্রিকার হেড্ লাইন হয়েছিল। মথুরার কথা বলছিলাম সেখানকার গোপিনীদের উল্লেখে। দিল্লীর আধুনিকারা বেশ পরিচ্ছদ ষ্টাইলে ওয়ান্ ষ্টেপ্ ফর্ওয়ার্ড টেন্ ষ্টেপ্স্ ব্যাক্ওয়ার্ড পলিসি নিয়েছেন। কর্তাদের এতে বড় সুবিধে। এক গজ কাপড়ে গোটা দুয়েক ব্লাউজ তো হয়েই যায়। বিপুলাদের সংখ্যা বিরল। 'তন্বী' সাধনায় যে রেটে এঁরা ফাষ্টিং ও ডায়েটিং চালাচ্ছেন তাতে ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধানে নিশ্চয়ই সহায়তা হচ্ছে।

সালওয়ার কামিজ দোপাট্টা পরিহিতা বঙ্গবালা নয়াদিল্লীর আধুনিকা মহলে মোটেই পিছনে হটেন না। পাঞ্জাবী বান্ধবীকে তিনি শিখিয়ে দেন শাড়ী পরার কায়দা কানুন।

* *

মেখলা টাইপের কটিভূষণের সাথে রেশমী দোপাট্টা উড়িয়ে সপুষ্প কবরী সজ্জায় আধুনিকার কটাক্ষে গোপিনীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

চোলি, ঘাগ্রা, ওড়না পরিহিতা আধুনিকার বেশে নিশ্চয়ই আভিজাত্য আছে। পোষাকটি ইরানিয়ান হলেও অধুনা মোগল কল্যাণে ভারতীয় বেশের অঙ্গীভূত হয়েছে। এর কাউন্টারপার্ট হলো যোধপুরী কোট আর চুড়িদার পাজামা—এটাই আজকাল স্বাধীন ভারতের পুরুষদের ফর্মাল জাতীয় পোষাক হিসাবে স্বীকৃত। মোগলযুগেও এ পোষাকের সমাদর ছিল। স্মরণ রাখতে হবে হিন্দু-মুসলিম পোষাকের সমন্বয়ের পিছনে রয়েছে রাজপুত-মোগল পরিণয়বন্ধনের যোগসূত্র।

মোগল যুগের সুন্দরীদের সেই টাইট্ পাজামা, কামিজ ও দোপাট্টা দিল্লীর আধুনিকারা আজও পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে একটু অভিনবত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে তাঁরা খাড়া করেছেন এর একটা মডার্ণ সংস্করণ।

সালওয়ার, কুর্তা, দোপাট্টা শুধু দিল্লী-বাসিনীকেই নয়, বহু আধুনিকা বঙ্গবালারও মন হরণ করেছে। পোষাকটা দেখেই একটা মন্তব্য করার বিপদ আছে। এ রণরঙ্গিণী বেশ নয়নাভিরাম বটে তবে শাড়ীর জায়গাটি এরা দখল করে নিলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ জানাব। অর্থ-নৈতিক দিকে তো বটেই, শালীনতা ও অভিরুচিতেও এ বেশ শাড়ীর সাথে মোকাবিলায় পেরে উঠবে না।

একাধিকা বিদেশিনীকে বিভিন্ন ডিজাইনের শাড়ী পরিহিতা দেখে মনে বেশ আনন্দ হল। শুধু ডলারের জন্য নয় (যদিও সেটা একটা উল্লেখযোগ্য লাভের চিহ্ন, ইংরিজী 'লভ্' নয়, বাংলা 'লাভ'।), বিদেশিনী আধুনিকার এ ভারতীয় ঐতিহ্য প্রীতির নিদর্শনে। খানদানী মহলে মোগল জেনানার এ

অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। বাঙ্গালী ষ্টাইলে শাড়ী পরিহিতা একটি মারাঠী সুন্দরী

টিপিক্যাল্ পাঞ্জাবী পোষাকে আধুনিকা

পুরোণো মোগল যুগের ষ্টাইল হলেও দিল্লীর খানদানি মহলে আজও এ মহিলা-বেশ সমাদৃত

পরিচ্ছদ আজও বিশেষ সমাদৃত। নৃত্যানুরাগী সমঝদার মাত্রই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন নূপুরনিক্কণের তালে তালে নৃত্যশীলা সুন্দরীকে কত সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ করেছে এই পাজামা, কামিজ ও দোপাট্টা।

কোনো অভিযোগ নয়, কোনো প্রতিবাদ নয়, আধুনিকা বঙ্গললনার দোপাট্টার নিশান লক্ষ্য করে শুধু নিবেদন করতে চাই প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি। এই দোপাট্টা পাজামা চোলিতে যে মোগল সম্রাজ্ঞীরা প্রতিদিন নিজেদের সাজাতেন আপন রুচি অনুসরণে, বাংলার শাড়ীর প্রতিও তাঁদের দুর্বলতা নেহাৎ কম ছিল না। ঢাকাই মসলিনের কথাই বলছি। ঢাকাই মসলিনের প্রতি সাহান্ শা বাদশা সাজাহান দুহিতার দুর্বলতা সর্বজন-বিদিত। আজ থেকে তিনশো বছর পূর্বে এই শাড়ী ঢাকার শহর থেকে মেসোপটিমিয়া সহর হয়ে ইংলণ্ডের আধুনিকাদের হাতে গিয়ে পৌঁছে ছিল। ইতিহাসে তার নজীর আছে।

পোষাকেতে এসেছে ইমোশন্যাল্ ইন্টিগ্রেশন্। কাঞ্চিপুরের শাড়ী পরিহিতা আধুনিকা নিশ্চয়ই কাঞ্চিপুরাগতা নন। মুর্শিদাবাদী সিল্ক পরে যাঁরা আনন্দ পান মুর্শিদাবাদের মাটি তাঁরা জীবনেও চোখে দেখেন নি। ব্যাঙ্গালোর পরিহিতা আধুনিকা কখনই হয় তো দিল্লী জংশনের বাইরে পা বাড়ান নি। শান্তিনিকেতনী শাড়ী পরে সপুষ্প কবরীতে যে আধুনিকাটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচহীনভাবে কুল্‌পি মালাই খাচ্ছেন তাঁর নিবাস পঞ্চনদীর তীরে! এ ইমোশন্যাল্ ইন্টিগ্রেশন স্বতস্ফূর্ত। এর পিছনে নেই কোনো সরকারী দপ্তরে পাশ করা রিজলিউশন!

অধুনা আধুনিকাদের একটা কম্পিটিশন চলেছে কবরী বিন্যাসে। পনিটেল্, খোঁপা, বিনুনী, বব্ এগুলো হলো কেশ বিন্যাসের শ্রেণী বিভাগ। সদ্যাগতা কলেজের আধুনিকা পনিটেল্ প্রেফার করবেন। কেশ বিন্যাসের সহজ উপায়। চুলগুলো ধরে একটা হেয়ার ক্লাষ্টারে আটকে দাও। বাস্ হয়ে গেল। খোঁপা, বিনুনী সেকেলে হলেও বিন্যাস ব্যবধানে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রাখে। নবতম ষ্টাইল হলো ভৈরবী প্যাটার্ণের কেশ বিন্যাস। চুলগুলো নিয়ে মাথার

রুদ্রাক্ষের মালা নয়। বেলফুলের মালা। দক্ষিণ ভারতের সুন্দরীবৃন্দের ফুলের প্রতি একটা বিশেষ প্রীতি আছে

নব প্রসাধনে আধুনিকা

ঠিক মাঝখানটিতে পনিটেলের মতন বেঁধে ছেড়ে দেওয়া। আজানু-লম্বিত কুঞ্চিত কেশদামের সৌন্দর্য রাজধানী থেকে ধীরে ধীরে কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। তাই বব্ হলো আধুনিকতম ষ্টাইল। প্রসাধন ক্ষেত্রের আপষ্টাট!

সপুষ্পকবরী চালু করে দক্ষিণ-ভারতের আধুনিকার দল সত্যিই দিল্লীবাসীর এস্‌থেটিক সেন্সের প্রসার করেছেন। দিল্লীতে কেন বাংলাদেশেও কবরীসজ্জায় পুষ্পের এ প্রয়োগ সর্বপ্রথম প্রচলিত করান দক্ষিণভারতীয়া আধুনিকা। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয়া রাণী চন্দের 'গুরুদেব' বইখানি দ্রষ্টব্য। শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের কবরীসজ্জায় তদানীন্তন অধ্যাপকবৃন্দ কি রকম বীতরাগ ছিলেন রাণীদি আমাদের সে কথা বলেছেন। শান্তি-নিকেতনের ছাত্রীরাও সেদিন কবরী সজ্জায় ফুলের প্রয়োগের প্রেরণা পেয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতবাসিনী সতীর্থাদের সংক্রমণে!

অনেকে কবরী পুষ্প দেখে আধুনিকাদের আবাস-পরিচয় নিরূপণ করেন। কবরীগুচ্ছে চাঁপা, রজনী-গন্ধা থাকলে তিনি নিশ্চিতভাবে বঙ্গদুহিতা। কুন্দ, চামেলী, বেল থাকলে তিনি খাস দিল্লীবাসিনী।

দিল্লীর আধুনিকতর কেশ বিন্যাসে ফুলের একটা বিশেষ স্থান

যূথিকা, গোলাপ থাকলে তিনি মাদ্রাজনন্দিনী। যদি মালাটা হয় সাদা প্ল্যাষ্টিকের তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি পাঞ্জাবনন্দিনী। সজ্জাভরণে পরিপাটিতে তাঁকে কেউ পরাজিত করতে অপারগ। সিল্কের ঝলমলানি আর রঙ্ বেরঙের পরিপাটিতে কনট্ প্লেসের সন্ধ্যাটিতে তিনিই হলেন বিউটি কুইন!

আমার জনৈক বন্ধু একবার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সান্ধ্যভোজে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিলেন। বেচারা

ভৈরবী নয়! দিল্লীর আধুনিকার নবতম হেয়ার ষ্টাইল!

পানাসক্ত নন। নির্ভেজাল বৈষ্ণব ঘরের ছেলে। ভদ্রতা রক্ষা করতে নেহাৎ পার্টিতে যোগদান করেছিল। সে কি করে জানবে পার্টিতে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে? পার্টিতে নানা রঙের পানীয় পদার্থ সার্ভ্ করা হোলো। সেই সব সুধাপানের পর সমবেতা আধুনিকার দল যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো নৃত্য সহচরের অনুসন্ধানে। আমার বন্ধুটি কন্দর্পকান্তি না হলেও নেহাৎ অসুন্দর নন। বঙ্গ-সন্তান। নৃত্যজ্ঞান ঐ ব্রতচারী নৃত্যের ভিতরই সীমাবদ্ধ।

হঠাৎ জনৈকা আধুনিকা এসে তার হাতখানা টেনে বললেন, "আপনি কার সাথে নাচছেন! নিশ্চয়ই আমার সাথে? আপনার ফেবারিট্ নাচ কোনটা, টুইষ্ট্? ফক্স্ ট্রাট্? ওয়াল্চ্, ওঃ ডেড্ সাইলেণ্ট্। মাষ্ট্ হ্যাভ্ হ্যাড্ এ হেভি ডোজ। আসুন, উই শ্যাল্ হ্যাভ্ রক্ এন্ রোল।" বলে বেচারাকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিল।

এ সব ব্যাপারে বিরাট ফুলদানির পিছনে লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। সেখান থেকে আমি লক্ষ্য করছিলুম শুধু বন্ধু গৃহিণীর জলন্ত চোখ দু'টো। মণি দুটো থেকে ঠিকরে পড়ছিল যেন আগুনের ঝলক!

বিবেচনা করে দেখুন আমার অসহায় বন্ধু বেচারাটির অবস্থাখানা!

তিন তিনটি মাস আমি বন্ধুর বাড়ীর নিকটবর্তী পথ মাড়াই নি। আগ্নেয়গিরিকে কে না ভয় পায়? তার ওপর যদি জানা থাকে এর অগ্ন্যুদ্গীরণ নিশ্চিত ও আসন্ন! কোন বিভাগ নেই যার সম্বন্ধে দিল্লীর আধুনিকার কৌতূহল নেই। কৌতূহল শুধু নয় জ্ঞান সঞ্চয়ও হয়েছে সে সব বিষয়ে। যেমন ধরুন খেলাধূলা।

ট্রান্সিষ্টার হাতে পুরুষের সাথে সামনে পাল্লা দিয়ে দিল্লীর আধুনিকা দিনের পর দিন ফিরোজশাহ কোটালা গ্রাউণ্ডে ক্রিকেট টেষ্ট্ দেখতে মোটেই ক্লান্ত হন না। দিন দিন তাদের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলাটা যেন একটা মহা সমস্যা হয়ে পড়েছে। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে একদিন 'গোল্' বলে চেঁচিয়ে বেকুব বনে গিয়েছিলুম। রঙীন চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যক কটাক্ষ করে জনৈকা আধুনিকা মন্তব্য করলেন, ষ্টাটস্ নো গোল্। ষ্টাটস্ অফ্ সাইড্। সমস্ত খেলার মাঠে তারপর কি হয়েছিল আমার একটুও মনে নেই আমি খেলা দেখায় একটুও মনোযোগ দিতে পারি নি। সবাইকে দেখে দেখে অনেক হাই জাম্প্ লঙ্ জাম্পের পর

সপুষ্প কবরী নিয়ে মাদ্রাজিনী আধুনিকা দিল্লীর এসথেটিক্ সেন্স প্রসারে নিশ্চয়ই সহায়তা করেছেন

আমিও একদিন গিয়ে হাজির হলাম ক্রিকেট টেষ্ট দেখতে। সত্যি বলছি সিকৃদার, বাউণ্ডারী, সেঞ্চুরী আর ক্যাচ্ এই চারটি শব্দের ভিতর আমার পুরো ক্রিকেটের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। ব্যাটের পরশে বলটা উপরে উঠলো। একজন খেলোয়াড় সেটা ধরে ফেলল। স্বতস্ফূর্তভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্লো ক্যাচ।

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে প্রতিবাদ উঠলো, হোয়াট্ ডিড্ ইউ সে, স্যাটস্ নো ক্যাচ্। স্যাট্স্ এ বাম্পার!

সবচেয়ে মজা হলো আম্পায়ারও যেন তাদের কথাটাই মেনে চলেন!

দিল্লীর খানদানি ঘরের সৌন্দর্য চর্চায় সাবানের বিশেষ কোন স্থান ছিল না, আজও নেই। বাংলা দেশে একটা প্রবাদ আছে 'মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া'। যিনি এ প্রবাদ প্রচার করেছেন তিনি মাথায় কোনোকালে ঘোলের প্রয়োগ করেছেন কি না জানি না, তবে দই মেখে স্নান করে স্থানীয় সুন্দরীরা ভাল ফলই পেয়েছেন। নির্ভেজাল মাখন আজকাল প্রায় দুষ্প্রাপ্য। একাধিক বাড়ীতে দেখেছি শেষ রাতে ভৃত্য উঠে দুধ থেকে মাখন তুলছে। বাড়ীর মেয়েরা সেই মাখন মেখে স্নান করবেন।

প্রসাধনরতা দিল্লীর একজন আধুনিকা। বিশেষ অনুরোধে বসুমতীর জন্য এ স্কেচটি এঁকেছেন দিল্লীর খ্যাতনামা শিল্পী ব্রজমোহন জিজ্ঞা

সাবানের প্রতি এ বীতরাগ দেখেছি একাধিক মহাপুরুষের। রাজর্ষি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কোনোদিন সাবান প্রয়োগ করেন নি। এটা সর্বজনবিদিত যে, জর্জ বার্ণাড্ শ কোনোদিন সাবান ব্যবহার করেন নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতেও সৌন্দর্য-চর্চায় দুধের সরের ছিল বিশেষ স্থান। কবি স্বয়ং লিখছেন, "এখনকার কালের শৌখীন গিন্নীরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম বাটা, সর, কমলা-লেবুর খোসা, আরও কত কি—যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না।" সত্যিই কম আয় হোত না! এখানকার সৌন্দর্যচর্চায় বাদাম বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা ছাড়াও আরও একটা জিনিষ ব্যবহৃত হয় সেটা হল বেসন। শরীরের ঔজ্জ্বল এতে অপরূপ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এসবই হোল সময়সাপেক্ষ ও ধৈর্যের ব্যাপার।

পুরুষদের গোঁপ যদি বাটারফ্লাই হতে পারে, মেয়েদের খোঁপা বাটারফ্লাই হবে না কেন? শ্যাম্পুর পরে হাল্কা চুলে সমস্ত কবরী একটা প্রজাপতির আকার ধারণ করে

সৌন্দর্য চর্চায় দিল্লীবাসিনী আধুনিকার বিন্দুমাত্র অলসতা নেই

বাংলা দেশের বিনুনী ষ্টাইল গ্রহণ করেছেন স্থানীয়া দক্ষিণ ভারতবাসিনী আধুনিকা

থাকা উচিতও নয়। দিল্লীর আধুনিকা সুন্দরীর পদযুগল কখনও অলক্তরাগ-রঞ্জিত নয়। আলতা দিল্লীতে আউটডেটেড। তার স্থান অধিকার করেছে মেহ্‌ন্দি। এটা এক-জাতীয় গাছের পাতা। দিল্লীর অদূরে ফরিদাবাদ বলে যে জায়গাটা আছে কোনো কালে সে অঞ্চলের সকলের একমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় এই মেহ্‌ন্দির চাষের উপরই ছিল নির্ভরশীল। কলকাতার পথে বর্ধমানে ট্রেনটা থামলেই সকলে যেমন শুনতে পান বর্ধমানের "মিহিদানা, সীতাভোগ", দিল্লীর পথে ফরিদাবাদ ষ্টেশনে ঠিক তেমনটি আজও শুনতে পাবেন, "মেহ্‌ন্দি, মেহ্‌ন্দি ফরিদা-বাদকা মেহ্‌ন্দি।

নখাগ্রে, পদযুগলে মেহ্‌ন্দিপাতার রস লাগিয়ে তাদের করা হয় রঞ্জিত। মেহ্‌ন্দিপাতার প্রলেপ স্বাস্থ্য প্রগতি সম্মত।

মেহ্‌ন্দি প্রয়োগ প্যালেষ্টাইন, ইরাণ, ঈজিপ্টে আজও বিশেষ জন-প্রিয়। এই মেহ্‌ন্দি জন্মায় আফগানি-স্থান, ইরাণ ও ভারতবর্ষে। মেহ্‌ন্দি ফুলের সৌরভ চারিদিকে ছড়ায় একটা অনুপম রোমান্স। মেহ্‌ন্দিরই অপর নাম হেনা। অজন্তার ফ্রেস্কোতে বা রাজপুত পেন্টিঙে সুন্দরীদের আমরা দেখি মেহ্‌ন্দিপাতা প্রলেপরতা। আমাদের বাংলা দেশে কাঁচা হলুদের যে স্থান, দিল্লীর মেহ্‌ন্দি স্থানীয় সর্ব শুভানুষ্ঠানে সগৌরবে সেই স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রাক্‌-বিবাহ উৎসবে গাত্রহরিদ্রার শুভোৎসব সম্পন্ন হয় মেহ্‌ন্দিপাতার প্রলেপে। তাই বোধ হয় এই সৌন্দর্য প্রসাধন সামগ্রীটির প্রতি দিল্লীর সুন্দরী আধু-নিকার রয়েছে একটা বিশেষ অনুরাগ।

* * *

কনট প্লেসের সান্ধ্য সৌরভ শুধু পুষ্প সুবাসেই সীমাবদ্ধ নেই। এ যেন একটা সুগন্ধের রায়ট্‌। মেনকা যদি ব্যবহার করেন 'মিস্‌চিফ' তাহলে তাঁর প্রতিবেশিনী তিলোত্তমার চাই 'এক্‌সষ্ট্যাসি', কুমারী শকুন্তলার হট্‌ ফেভারিট্‌ হল 'সেভেন ফ্লাওয়ার্স।' 'ক্যালিফোর্ণিয়ান পপি' না হলে মিস প্রিয়ংবদা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোন না সেদিন। তা'ছাড়া আরও কত রকমের সৌরভ আছে হাঁদার, ষ্টুডিও, সেভেন্থ হেভেন্‌ মনেও থাকে না সব নামগুলো।

সেন্টের বিষয় নয়াদিল্লীর আধুনিকা যতই মডার্ণ হোন না কেন এ বিষয়ে টেক্কার উপরেও ট্রাম্প কার্ড মারেন তার চাঁদনীচক্‌বাসিনী বান্ধবী। তিনি মাখেন আতর। আতরের আজও সমাদর আছে অভিজাত সমাজে।

আতরের রাজা 'ইত্‌রা গুলাব্‌।' মানে গোলাপের আতর। ইরাণ থেকে আতর সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করে মোগল শাসকদের সাথে সাথে। তবে ইত্‌রা গুলাবটা পুরো-পুরি ভারতীয়। এর আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর-সঙ্গিনী প্রিয়দর্শিনী নুরজাহাঁ প্রতিদিন অবগাহন করতেন একটা বিরাট হউজে। হউজ মানে পণ্ড, আজকালকার মডার্ণ সুইমিং পুল। একদিন তাঁর খেয়াল হলো হউজের তীরবর্তী সমস্ত গোলাপ ফুলগুলো জলে ভাসিয়ে তিনি সেই জলে করবেন অবগাহন। তাই করা হল। শত সহস্র সুগন্ধি গোলাপ ফেলা হলো সেই হউজে। সম্রাজ্ঞী সেই জলে অবগাহন করে তৃপ্ত হলেন। পরদিন স্নান করতে এসে তিনি দেখলেন সমস্ত হউজে একটা তৈলাক্ত পদার্থ ভাসমান। সম্রাটকে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন আতরের কনেসার। তিনি দেখেই বুঝতে পারলেন এ তৈলাক্ত পদার্থ গোলাপের আতর। হল ইত্‌রা

গুলাবের আবিষ্কার। এক আউন্স ইত্‌রা গুলাবের দাম শ' তিনেক টাকা তো হবেই!

সংক্ষেপে এই হল দিল্লীবাসিনী উর্বশীর কাহিনী।

যৌবনপ্রমত্ত চঞ্চল চপলতার আনন্দ কতই না ক্ষণস্থায়ী। দিল্লী-বাসিনী সুন্দরী আধুনিকাদের বেশ-বিন্যাসের প্রসাধনের পিছনে শুধু কি আনন্দই আছে? সেটা থাকলে খুশীই হতেম। কিন্তু জানি আমি সেটা নেই পূর্ণমাত্রায়। দিল্লীর ক'জন জানেন এঁদের ভিতর কত সুন্দরীর কত আশার স্বপ্ন প্রতিদিন ভেঙ্গে হচ্ছে চুরমার?

বাইরের প্রসাধনে যে রূপই থাকুক না কেন, এঁদের একটা ভিতরের রূপও আছে। তবুও এঁরা আবলম্বিনী। কাল সকালেই হয়তো দপ্তরে গিয়ে টেলিফোনের নম্বরটা দিতে ভুল হলে জীবনটা হয়ে দাঁড়াবে বিড়ম্বনা মাত্র। সাহেবের ডিক্‌টেশন্ নিতে কেন যে আজকাল রোজ এত ভুল হচ্ছে দিতে হবে তার কৈফিয়ৎ। কটেজ্ ইণ্ডাষ্ট্রিস্ এম্পোরিয়মের ইন্টার-ভিউটার জন্য কাউকে বা গিয়ে করতে হবে সুপারিস। অর্থোপার্জ্জন করে শুধু সংসার চালালেই চলবে না। প্রতিদিনের পরিশ্রমোপার্জিত অর্থাংশ

পাঞ্জাব নন্দিনীর অভিনব কেশ বিন্যাস

রাখতে হবে সঞ্চিত—যৌতুকের জন্য। ভাবতেও রোমাঞ্চ দেয় শরীরে। জীবনটা গড়ে তুলতে হবে, তাই সৃষ্টি হবে নীড়।

কনট প্লেস্ থেকে ফিরে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে দিল্লী-বাসিনী উর্বশী মনে মনে ভাবেন, কোথায় গেল সেই পুরোরবা, আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে যে জীবনটা করে তুলবে মধুময়। গৃহকোণে রাখা পিয়ানোটা বহুদিন বাজানো হয় নি উর্বশীর ভারী সখ হয় ছাত্রী-জীবনে গৃহশিক্ষকের কাছে শেখা সেই গানটা গাইতে; বহুবার বহুভাবে সেটে শুধু যৌতুকের অভাবেই যে মধুর গা তার কাছে দিন দিন শুধু তিক্তই হয়ে উঠেছে। তবু সে হাল ছাড়ে নি গুন্ গুন্ করে সে গান ধরে:

"আমার হৃদয় তোমার আপন
হাতে দোলও—"

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব। বহু পরিশ্রমে দুটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি: বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

পুরাতনে চিরনূতন মণিমঞ্জুষা

সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত—হুতোম প্যাঁচার নক্সা। বাংলা উপন্যাসের প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—ভ্রান্তিবিলাস। একত্রে ২৲ টাকা মাত্র।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্ত্তিমান বিকাশ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্ব্বরসের সাগর একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্ত্তি নাট্যকার, সর্ব্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলনীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, প্রহ্লাদ চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

৪র্থ ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিহর লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, টাটকা-টোটকা, বঙ্গভূষণ, বেলুনে বাঙালী বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কবিতা

উৎসমুখে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গভীর জলের জাদু মোহনার অনির্দেশ্য অগাধ বিস্তার
ভেবে থামি তুমি আমি আমরা সবাই
উৎসমুখে ফিরে যেতে চাই।
তুষার কঠিন শিলা, নীরব গহন অন্ধকার,
ঘুমন্ত পুরীতে পরী ঘুমে অচেতন, আমরা তার
গাঢ় ঘুম কেমনে ভাঙাই।
তারার আঁধারে জেগে নদীর উজানে ভাঙি পথ,
নদীও যে নারী, তার গূঢ় কামনার
মুগ্ধতায় অতীত হারাই
অবলুপ্ত বর্তমান, অচিন্তিত থাকে ভবিষ্যৎ।

তুমি আমি বাঁধি ঘর
নদী নারী ছায়া ক্লান্তি তৃষ্ণা প্রেম দ্বেষ ঘৃণা—
ঘূর্ণিচক্রে বিপন্ন ঈশ্বর
বধির দিগন্তে কোন উচ্চৈঃশ্রবা—ঝড়
হানা দেয়, মানা মানে নাকো,
যতদিন অবসন্ন সময়ের পক্ষপুটে রুগ্ন অসহায়
পরম নির্ভরে তুমি থাকো,
কাল যাপো চিন্তার ধূসর কুয়াশায়।

আমি তুমি সময়ের মহা বিলে নিমগ্ন জর্জর,
গভীর করুণ ক্লান্তি ছায়া নদী নারী তৃষ্ণা ঈশ্বর, ঈশ্বর।
মারী মড়কের চেয়ে ভয়াবহ প্রতীকারহীন এক জ্বর।
ঘর বাঁধি তুমি আমি
অতল শূন্যের খাদে নেমে গিয়ে হস্ত-পদ বদ্ধ হয়ে থামি,
তারপর তুমি আমি আমরা সবাই
উৎসমুখে দ্রুতবিলম্বিত লয়ে ফিরে যেতে চাই।
মনে পড়ে নেবুলার নয়নাভিরাম
রূপে মুগ্ধ একদা হয়েছিলাম।

রাত্রি অন্ধকারে কোথা যাই—
হরিণী এখনো ডাকে, আর বাইসন নীল গাই
জ্যোৎস্নায় প্রবল হয়, আমাদের রুচিমেধা প্রবৃত্তি হঠাৎ
আকাঙ্ক্ষায় লালসায় বাড়ায় অক্ষম হাত,
পোষমানা পৌরুষের নির্লজ্জ কপট
আস্ফালনে রচে প্রেক্ষাপট ;
অন্ধকারে আলেয়ার আলো জ্বলে প্রান্তরে জলায়
অরণ্যে, স্থবির কোনো বটের তলায়
গান গায় নিরন্ন বাউল, কোনো শাঁই ;
উৎসমুখে আমরা সবাই তবু ফিরে যেতে চাই।

সেই দিনটি

মশলার কৌটে টা অন্যদিনের মতো আজও এগিয়ে দিল সুনন্দা। তাড়াতাড়ি খানিকটা মশলা হাতে ঢেলে নিয়ে ভবেন্দু আপিসে বেরে ছিল, সুনন্দা একটু হেসে বললে —মনে থাকবে তো?

অন্যমনস্কভাবেই ভবেন্দু উত্তর দিল—হুঁ।

—হুঁ! কী জিজ্ঞেস করলাম বলো তো?

ভবেন্দু হঠাৎ কি উত্তর দেবে স্থির করতে না পেরে আরও একটু ব্যস্ত হয়ে বললে—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিচ্ছু ভাবার নেই। বলে হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

সুনন্দা আর বৃথা সময় নষ্ট করল না। তবু আর একবার চেঁচিয়ে বললে—আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরবে। নইলে—

বাকি কথাটা আর বলার দরকার হল না। যার উদ্দেশ্যে বলা সে তখন ট্রাম স্টপেজের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। প্যান্টটাও ভালো করে পরা হয় নি। ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন বিশ্রী লাগছে। আর ফুলপ্যান্টটির সঙ্গে মোজা নেই—তার ওপর কাবলী জুতো যে কী অপূর্ব মানিয়েছে তা দেখে অতি দুঃখেও সুনন্দার হাসি পেল।

ভবেন্দু চলে গেলে সুনন্দা ধীরে ধীরে ঘরে এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল। মনটা ছিল আনন্দে ভরা। তখনো ভবেন্দু ঘুমোচ্ছিল। একবার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। গলায় গুন্ গুন্ করে গান, সমস্ত মনে খুশির নেশা। ঠিক করেছে, আজকের এই দিনটির সূচনাতেই স্বামীকে একটি উপহার দেবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে বসে গেল চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। খুব সাবধানে কাপ ডিস চামচ নাড়তে লাগল। যেন কিছুতেই ভবেন্দুর ঘুম ভেঙে না যায়। বেড-টি খেতে খুব ভালোবাসে আর সিগারেট। দু'টির উপরেই সুনন্দা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কিছুতেই চা

পাবে না—ওটা নেংবা অভ্যাস। আর সিগারেট? কিছুতেই না। ও থেকে কি না হতে পারে! এই বলে ভবেন্দুর যে কয়েক প্যাকেট সিগারেট কেনা ছিল সবই সুনন্দা বাজেয়াপ্ত করে নিজের দেরাজে চাবি বন্ধ করে রেখেছে। খুব প্রয়োজন হলে অবস্থা বুঝে একটা কি দুটো সিগারেট—কখনো বা একটা সিগারেট ব্লেড দিয়ে সুনিপুণভাবে কেটে আধখানা করে দেয়। অনুগ্রহের দান। সে মুহূর্তে স্বামীর কাঙালপনা সুনন্দা মনে মনে উপভোগ করে।

আজ কী খেয়াল হল, সুনন্দা ভোরবেলাতেই চা তৈরি করে এনে হাজির। ছোট্ট টিপয়ের উপর রাখল ধূমায়িত কাপ, প্লেটের ওপর দুটি মাখনমাখানো বিস্কুট—আর ছাইদানের খাঁজে একটি গোটা সিগারেট।

টিপয়টা এগিয়ে দিল বিছানার কাছে, যেন হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়। তারপর মশারিটা তুলে মিষ্টিগলায় ডাকলে—এই শুনছ।

অত অল্পে ঘুম ভাঙে না, সুনন্দা তা জানে। তবু ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করেনি—অন্তত আজকের দিনটিতে। ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তোলা আর মিষ্টিস্বরে ঘুম ভাঙানোর ভিতর যে কত প্রভেদ তা সুনন্দাই বোঝে আর কেউ নয়। ভবেন্দু? হায়, সে যদি বুঝত তাহলে আর আজ সুনন্দার আক্ষেপ কী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেলেই ঘুম ভাঙাতে হল। ধড়মড় করে উঠে বসল ভবেন্দু।

—কটা বাজল? ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো।

সুনন্দা হেসে বললে—বেশি বাজেনি। এই যে, চা।

ভবেন্দু হঠাৎ বুঝে উঠতে পারল না, এতখানি প্রসন্নভাগ্যের কারণ কি। তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের পেয়ালাটি গ্রহণ করল।

সুনন্দা হেসে বললে—এমন কিন্তু রোজ হবে না। এ কেবল আজকের জন্যে।

ভবেন্দু চোখ বুজিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। কোনো উত্তর দিল না। একবার জানতে কৌতূহলও হল না, আজকের দিনটির প্রতি সুনন্দার এতখানি পক্ষপাতিত্ব কেন। সুনন্দা নিঃশব্দেই সে আঘাতটুকু সহ্য করে গেল। এবং তখনো তার মনে আকৈশোরের কৌতুকপরায়ণতা চটুল মনোবিলাস অন্য অনেকদিনের মতোই স্বামীকে লক্ষ্য করে শরসন্ধান করতে লাগল। স্নানের জন্যে তোয়ালে সাবান এগিয়ে দেবার সময়, খাবার টেবিলে এমন কি চলে যাবার সময় মশলার কৌটাটা এগিয়ে দিতে গিয়েও বারে বারে বললে—আজ কিন্তু ফিরতে দেরি করবে না। ঠিক সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা চাই-ই।

কৌতূহলহীন আপিস সর্বস্ব কর্মব্যস্ত স্বামী বারে বারেই উত্তরের পরিবর্তে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে, 'হুঁ'।

স্বামী চলে গেলে ঘরখানা আজ যেন নিতান্তই শূন্য মনে হল। এ শূন্যতা অনুভব অন্যদিনও করেছে। আর, বছর দশেক আগে এই শূন্যতা সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে বেরিয়েছে। সে দিন সে কি অধীর প্রতীক্ষা। কখন এই নির্বাসনের শাপ-লাগা দুপুর শেষ হবে? কখন আসবে সোনা-বাঁধানো বিকেল—দিনান্তের আবিরমাখানো বিকেল। কিন্তু আজকের শূন্যতা অন্য রকম। কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করল সুনন্দা। মনে হল, সব যেন ফুরিয়ে গেছে; ভাঙা দেউলে বৃথাই আজ এ রোশনাই। দেবতা নেই জীর্ণ বেদীটাই শুধু পড়ে আছে।

অসময়েই সুনন্দা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ বড় সাধ করে প্রত্যূষেই স্নান সেরে পরেছিল ধোপ ভাঙা একটা তাঁতের শাড়ি। সে শাড়ি যেন বড় ভার মনে হচ্ছে। বিশেষ দিন বলেই মেখেছিল দামী তেল, সে গন্ধে তার যেন হাঁপ ধরছে। সব উৎসাহ যেন নিভে গেল। মনে মনে ভাবল, এ সমারোহ না করলেই হ'ত।

সমারোহ?

হ্যাঁ, সমারোহ বৈকি। সকাল থেকেই সাজসজ্জা—সকাল থেকেই মনের প্রস্তুতি। তার ওপর স্বামীকে ঘটা করে বার বার তাড়াতাড়ি আসতে বলা। কী হবে? কী হবে এসব করে? স্বামী যদি আজ একটু সকাল সকালই ফেরে, তাহলেও কি ফিরে পাওয়া যাবে সেই প্রথম দিনের আনন্দ? বিশেষ করে যে স্বামী একবারও ভাবতে পারল না—একবার জিজ্ঞেসও করল না, কেন আজ এত উৎসাহ।

সুনন্দা যুক্তি খুঁজতে লাগল, কেমন করে মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে একটা মানুষের এতখানি পরিবর্তন

ঘটতে পারে। আর সে পরিবর্তন দেহে এবং মনে।

অথচ তার নিজের কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? হয়তো যে মেয়েদের পাতলার ওপর গড়ন তাদের শরীরের ভাঙা-গড়া বড় একটা বোঝা যায় না। একটু ভালো খাওয়া দাওয়া, একটু কম দুশ্চিন্তা থাকলে অনেক মেয়েরই ঠাটটি ঠিক থাকে। কিন্তু ঠিক থাকা আর ঠিক রাখা এ দুইয়ে প্রভেদ আছে। দেহ আর মনকে চিরতরুণ রাখা একটা সাধনা। সে ভাগ্য সকলের হয় না। সুনন্দা সেদিক দিয়ে ভাগ্যবতী কিন্তু ভবেন্দু? আজকের এই অফিসার ভবেন্দু রায়ের মধ্যে দিয়ে কি দশ বছর আগের সেই প্রথম যৌবনচঞ্চল আপিস পালানো বুদ্ধিদীপ্ত দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ তরুণটিকে খুঁজে পাওয়া যায়? কোথায় গেল সেই পাতলা পাতলা হাল্কা গড়ন? কোথায় গেল দুরন্ত দুঃসাহসে ভরা উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক? বিলাত ফেরত দুধর্ষ ব্যারিষ্টার উজ্জ্বল সেনের একটিমাত্র বিদুষী কন্যাকে ঘর থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে যে সামান্য মাইনের কেরাণী যুবক—সে তেজ সে প্রেমের প্রবল শক্তি এই দশ বছরের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল।

এই দশ বছরের মধ্যে পরিবর্তন বড় কম হয় নি। দেহ স্থূল হয়ে গেছে, মাথার চুল পাতলা হতে হতে দিব্যি টাক পড়েছে। একমাত্র আপিস ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক যেন ফুরিয়ে গেছে। বাড়িতে আসে, তাও আপিসের ফাইল নিয়ে। ছুটির দিনে বাড়িতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। আপিসের এমনি নেশা।

কত শীতের রবিবারে সুনন্দা বলেছে, চলো বেড়িয়ে আসি। এ তো কোনো নতুন প্রস্তাব নয়। বিয়ের আগে এই বেড়ানোর মধ্যে দিয়েই তাদের ঘনিষ্ঠতা। সেদিন অবশ্য প্রস্তাব আসত অন্য পক্ষ থেকে।

কিন্তু সেদিনের সেই পথ—সেই পথের ধারে ঘনছায়া—কিম্বা শহরের উপকণ্ঠের কোনো কোনো পোড়ো বাগানবাড়ির বোবা ইঙ্গিত আজও যে সুনন্দার রক্তে মাতন লাগায়। তার দোলা কি ভবেন্দুকে একটুও স্পর্শ করে না। পেয়ে যাওয়া যে এমন সর্বস্ব খোওয়ানো সে অভিজ্ঞতা ছিল না কখনো।

কিন্তু বেড়ানোর নেশা আজ আর ভবেন্দুর নেই। সুনন্দার প্রস্তাবে বোকার মতো স্বচ্ছন্দে বলে বসে,—তুমি যাও।

হায় রে, যেন স্বামীর অনুমতি ভিক্ষা করতেই এসেছিল!

আর সবচেয়ে দুঃখ—ওর ওপর আজ আর অভিমান করেও লাভ নেই। অভিমান যে বোঝে না, তার সঙ্গে অভিমানের লীলা—এর চেয়ে লজ্জাকর পরিহাস আর নেই।

অথচ ওরই সমবয়সী—ওরই অনেক দিনের বন্ধু পীযুষ। এখনো আশ্চর্য ইয়ং। তার চলায় বলায়—তার চোখের চাউনিতে প্রাণ যেন উপচে পড়ছে। এমন কতদিন গেছে। বর্ষার সন্ধ্যা। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। একটি ঘরে দু'জনে রয়েছে। কথা ফুরিয়ে গেছে। মুখ ভার করে সুনন্দা চেয়ে আছে জানলা দিয়ে।

আর এদিকে ভবেন্দু টেবিল-লাইট জেলে আপিসের ফাইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগ দিচ্ছে। বর্ষার এমনি সন্ধ্যা যখন একের ক্ষুব্ধ অভিমানে এবং আর এক-জনের অকারণ ঔদাসীন্যে নষ্ট হতে চলেছে, এমনি সময় হঠাৎই ঝোড়ো হাওয়ার মতো প্রবেশ করেছিল পীযুষ গুপ্ত।

ওয়াটারপ্রুফ টুপিটা একটানে খুলে ফেলে হাসতে হাসতে বলে ওঠল...গুড ইভনিং মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস।

দু'জনেই যেন আনন্দে চমকে

উঠল ভবেন্দু হেসে বললে—আরে। আসুন আসুন।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে,—ওয়াটারপ্রুফটা আগে খুলে ফেলুন তো। দাঁড়ান তোয়ালে দিই।

পীযুষ ওয়াটারপ্রুফ খুলে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে জুতো খুলে ইজিচেয়ারে সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বললে,—মিসেস রায়, হঠাৎ এমনি বাদলা সন্ধ্যায় অনাহূত এসে পড়ে' আপনাদের শান্তি নষ্ট করলাম না তো?

মিস্টার এবং মিসেস দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন—না না, মোটেও না। বরং—

বরং—এই কথাটা সুনন্দাই উচ্চারণ করেছিল। উচ্চারণ করেই থেমে গিয়েছিল।

পীযুষ গুপ্ত তা বুঝতে পারে নি। সে আরও খুশি হয়ে বললে—তা হলে এমন সন্ধ্যাটা আপনি গান দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলুন।

গান! মনে মনে সুনন্দা এত খুশি হল যে এসব ক্ষেত্রে যে প্রাথমিক একটু আপত্তি দেখাতে হয় সেটুকুও ভুলে গেল। এমনি সন্ধ্যাতে তাকে গাইতে অনুরোধ করা যার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে একান্ত হতাশ হয়েছিল, হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এক অতিথি-বন্ধু ঠিক সময়েই তার সম্মান রাখল। পীযুষ গুপ্তর প্রতি সেদিন কৃতজ্ঞতায় সুনন্দার মন ভরে গিয়েছিল।

সেই পীযুষ গুপ্তের কথাই আজ মনে পড়ল সুনন্দার। ওরই তো বয়সী। অথচ—

বেলা তিনটে বাজল। সুনন্দা উঠল। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল। একটু বেরোতে হবে। টুকিটাকি কিছু কেনার দরকার।

মনটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। আবার তাকে ঠিক করে নিল। বহু সাধনায় পাওয়া এই দিনটি। না না, এ দিনকে অত সহজে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না।

তারপর এক সময়ে বিকেল এসে পড়ল। পাঁচটা বেজে গেল—সাড়ে পাঁচটাও বাজে। যদিও সুনন্দা ভালো করেই জানে, এত তাড়াতাড়ি সে আসবে না, তবু প্রতীক্ষা করতে কেমন যেন ভালো লাগছিল।

আবার ভাবছিল, তাড়াতাড়ি আসবেই না বা কেন? রোজ নয়—একদিন। এই একটা দিন কী তার কথা রাখবে না?

কৈ আর রাখল! সুনন্দা বার বার তার রিষ্টওয়াচটা দেখতে লাগল। ছ'টা বেজে গেল। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। এল কই! তার একটি দিনের একটি মিনতি তাও রাখল না। এ কি ভুল, না উপেক্ষা?

দারুণ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে সুনন্দা একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, একবার ঘরে এসে বসছে। কাছেই বড় রাস্তায় বাস থামছে, ট্রাম থামছে কিম্বা ট্যাক্সির হর্ণ শুনছে অমনি উৎকর্ণ হয়ে উঠছে—এই বুঝি এল। কিন্তু—না, কেউ না।

এমনি করে আরও কতক্ষণ কাটল। হঠাৎ এক সময়ে সিঁড়িতে ভারী দেহের শব্দ হতে লাগল। ধুপ্ ধাপ্ করে কে যেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে আসছে।

—আজ কিন্তু তোমার কথা রেখেছি, খুব বেশী দেরী করি নি। বলতে বলতে ভবেন্দু ঘরে এসে ঢুকল।

সুনন্দা একনজর ঘড়ির ওপর তাকিয়ে নিল। পৌনে সাতটা।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

সভাপতি: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবৈতনিক সম্পাদক: সাগরময় ঘোষ

১ম পুরস্কার: ৫০০ শত টাকা
২য় পুরস্কার: ২৫০ শত টাকা
৩য় পুরস্কার: ১০০ শত টাকা

এতদ্ব্যতীত যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেককে ২৫৲ টাকা করিয়া ২২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী:

১। গল্প বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে।

২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

৩। রচনা পূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় দেওয়া বা প্রকাশিত না হওয়া চাই এবং রচনা মৌলিক হওয়া চাই।

৪। নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইতে হইবে, কারণ লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্পের প্রথম প্রকাশনের অধিকার সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের থাকিবে।

৭। কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ৯ই জুলাই, ১৯৬৩।

৯। সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

হ্যাঁ, তবু অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল বৈকি।

—ঘরটা আজ বেশ সাজানো গোছানো মনে হচ্ছে যেন?

সুনন্দা ঈষৎ হেসে গ্রীবাভঙ্গি করে বললে,—মনে হচ্ছে বুঝি? কী ভাগ্যি আমার!

—বাঃ বেশ ফুলের গন্ধ আসছে তো?

বলতে বলতেই ভবেন্দু সার্টটা খুলে আলনা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলে। সার্টটা আলনাকে স্পর্শমাত্র না করে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

তারপর ভবেন্দু সেই নিখুঁত করে সাজানো আলনা থেকে হাতড়ে হাতড়ে লুঙ্গি খুঁজতে লাগল।

সুনন্দা তখন ঘরে ছিল না, বোধ হয় চায়ের জল চড়াতে গিয়েছিল, এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেই অবাক!

—আরে করো কী! কাপড়গুলো যে সব পড়ে গেল।

ভবেন্দু সে কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে গম্ভীরগলায় বললে—আমার লুঙ্গি?

সুনন্দা ছুটে এসে হাত জোড় করে বললে,—অনেক কষ্টে আলনাটা গুছিয়েছি, দোহাই, অমন লণ্ডভণ্ড কোরো না। একটু স্থির হয়ে বোসো। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি—এই নাও। বলে দড়ি থেকে একটা পায়জামা নিয়ে এগিয়ে দিলে।

—পায়জামা! কেন, আমার লুঙ্গি?

সুনন্দা মিনতি করে বললে—আজ একটা দিনের জন্যে পায়জামা—লুঙ্গি নয় Please!

একটু অবাক হয়েই ভবেন্দু বললে—কেন, কেন শুনি? আজ কী? কেউ আসবে নাকি?

সুনন্দা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—হ্যাঁ।

ভবেন্দু ঈষৎ হেসে বললে—বোধ হয় গুপ্ত সাহেব?

হঠাৎ আজই যেন কেমন লাগল ভবেন্দুর হাসিটা। সুনন্দা কোনো উত্তর দিল না, গম্ভীরভাবে চলে গেল।

গম্ভীর হয়ে চলে গেলেও সুনন্দার মনে ভবেন্দুর এই অহেতুক জ্বালাটুকু ভালোই লাগল। একটু আশ্চর্যও হল এই ভেবে যে, তা হলে পীযুষ গুপ্তের যে প্রশংসা এতদিন সে স্বামীর কাছে করে এসেছে তা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। ভেতরে ভেতরে জ্বালা ধরিয়েছে। অর্থাৎ মানুষটা একেবারেই এখনো প্রাণহীন প্রেমহীন স্তূপমাত্র হয়ে পড়েনি।

এই আনন্দটুকু মনে আসামাত্র সুনন্দা নতুন রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে ভবেন্দুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হল।

—এই যে পায়জামাটা পরেছ! দেখো দিকি কি সুন্দর লাগছে। তা না, কি এক লুঙ্গি।

সুনন্দা লক্ষ্য করল—ভবেন্দু হাসল না। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছে।

মনে মনে খুশি হয়ে সুনন্দা বললে—হঠাৎ পীযুষবাবুর কথা তুললে যে? তিনি কি তোমায় আজ টেলিফোন করেছিলেন?

—আমায়! ভবেন্দু ভ্রূভঙ্গি করে তাকালো। তারপর কেটে কেটে বললে—তিনি আমায় কেন টেলিফোন করতে যাবেন?

ভবেন্দুর এই চাপা ক্রোধে সুনন্দা ভেতরে ভেতরে হাসিতে ফেটে পড়ছিল। কষ্টে সে হাসি চেপে বললে—না, এমনিই বলছিলাম।

কথাটা এখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আজ ভবেন্দুর যেন কি হয়েছে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—তাঁর যদি খবর নেবার দরকার হয় তা হলে তো এখানেই টেলিফোন করবেন। আশা করি, তিনি বাড়ির নম্বর ভুলে যান নি।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে আলনা গোছাতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর ভবেন্দুই বললে—হঠাৎ আজ রজনীগন্ধার এত ঘটা!

সুনন্দার কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেল না।

ভবেন্দু হঠাৎ একটু যেন ব্যস্ত হয়ে বললে,—হ্যাঁ তিনি কখন আসবেন? আমি তা হলে মুখহাত ধুয়ে আর একটু ভালো সাজসজ্জা করে তাঁর মতো হবার চেষ্টা করে বসি!

সুনন্দা এতক্ষণ কী ভাবছিল কে জানে, ভবেন্দুর এই শেষ কথাগুলোয় হঠাৎ যেন তীব্র বেঁধা বাঘিনীর মত চমকে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে মুখে একটুকরো আগুনের মতো জ্বালা ধরানো হাসি ফুটিয়ে বললে—চেষ্টা করলেই কি আর কারও মতো হওয়া যায়? তার জন্যে অনেক জন্মের সাধনা দরকার।

ভবেন্দু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে—সেই সাধনাই করতে হবে। স্ত্রীর মন পেতে হবে তো। নইলে—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল। ঐ যে 'নইলে' বলে শুরু হয়েছে—কে জানে এরপর কোন্ ইতরতায় ইঙ্গিত দিয়ে বসবে। পুরুষ মানুষকে তার জানা আছে। ঈর্ষা এবং ক্রোধ অনেক সময় সামান্যতম বোধশক্তিও নষ্ট করে দেয়। তা না হলে আজই নিতান্ত রসিকতায় যা আরম্ভ হয়েছিল, এরই মধ্যে দেখো না কোথায় তা নেমে গেছে। ঐ মানুষটার মনে যে এত গরল ছিল তা কে জানত। তা হলে কি কখনো সুনন্দা পীযুষের কথা তুলতো ওর সামনে? না কি আর কোনোদিন তুলতে পারবে?

কিন্তু এখন? আজকের দিনের আনন্দ তো সব মাটি। ভেবেছিল হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চা খেতে খেতে ভবেন্দুকে আজকের বিশেষ দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ও ভাবে কথা বলা আর সম্ভব হবে না। একসঙ্গে চা খাওয়া দূরের কথা—কী ভাবে যে চায়ের সঙ্গে এই বিপুল আয়োজন তার সামনে প্লেট সাজিয়ে দেবে সুনন্দা তাই ভাবতে লাগল।

এমনি সময় ভবেন্দু তাকে ডাকল। সুনন্দা কোনো সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—আমায় একটু বেরোতে হবে। পীযূষবাবু কখন আসবেন? আমার কি থাকা দরকার হবে?

—অর্থাৎ? দপ্ করে জ্বলে উঠল সুনন্দা।

ভবেন্দু একটু বিব্রত হয়ে বললে—আচ্ছা বেশ, বুঝলাম। আমাকে থাকতেই হবে।

সুনন্দা তীক্ষ্ণস্বরে বললে—তুমি কি বলতে চাচ্ছ বুঝতে পারছি না। কারও জন্যে তুমি অপেক্ষা করতে চাইছ?

—হ্যাঁ, মানে ইয়ে—পীযূষবাবু…

সুনন্দা গম্ভীরভাবে বললে—পীযূষবাবুকে আমি নেমতন্ন করিনি, তুমি যদি করে থাক তা হলে আলাদা কথা।

ভবেন্দু একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—পীযূষবাবুকে তুমি আসতে বলো নি আজ?

—না। খামকা কেন বলতে যাব? আর যদি বলতেই হয় তা হলে আমি তোমাকে দিয়েই বলাতাম।

ভবেন্দুর বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে,—আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। মানে আজ আপিসে নতুন পেস্কেলটা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হয়েছে যে, মাথায় কিছুই আর ঢুকছে না। কিন্তু হঠাৎ ঘর এত সাজানো? রজনীগন্ধা? লুঙ্গির বদলে পায়জামা? এ সবের অর্থ?

সুনন্দা এর উত্তর না দিয়ে তৎক্ষণাৎ ভেতরে গিয়ে দু' প্লেট খাবার এবং ছোট্ট টিপটটা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল।

ভবেন্দু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললে—এসব আবার কী?

সুনন্দার মুখে পুরনো দিনের এক টুকরো হাসি সোনার মতো ঝলসে উঠল। কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললে—আমার দুর্ভাগ্য, সে কথাও আজ মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে কার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

—গুড ইভনিং। গুড ইভনিং।

এরা দুজনেই চমকে উঠে দেখল, পীযূষ গুপ্ত আপিসের পোষাকেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অন্যদিন সুনন্দাই অভ্যর্থনা করে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার কণ্ঠ থেকে স্বর বেরোল না। ভবেন্দুই কোনোরকমে কাষ্ঠহাসি হেসে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন।

পীযূষগুপ্ত টেবিলের ওপর শূন্য কাপ লক্ষ্য করে খেদের সুরে বলে উঠল—হায়, আমি বোধ হয় খুবই দেরি করে ফেলেছি।

সঙ্গে সঙ্গেই দু'জোড়া চোখ সুনন্দাকে স্পর্শ করল। কিন্তু সুনন্দা মুখ তুলতে পারল না।

কিন্তু তখনো সুনন্দা জানত না, আরও তীব্র গ্লানি তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। হঠাৎ সেই সময়েই ইজিচেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসে পীযূষ গুপ্ত বলে উঠল—কী ব্যাপার বলুন দেখি। ঘরখানি ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। বিছানার কাছে টিপয়ের ওপর পিতলের ঘটিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। আজ কি কোনো বিশেষ দিন? হ্যাঁ, মশাই।

ভবেন্দু নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল।

—মিসেস রায়।

সুনন্দা কোনো রকমে মুখ তুলে তাকালো।

পীযূষ গুপ্ত সোজা উঠে গিয়ে সুনন্দার হাতখানা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন—আমি নিশ্চয় বলছি, আজ আপনাদের বিয়ের দিন Am I wrong?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই পীযূষ গুপ্ত এগিয়ে গিয়ে ভবেন্দুর হাতখানি ধরল। কী মশাই। অমন অবাক হয়ে দেখছেন কী।

ভবেন্দু প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলে উঠল—নন্দা, সত্যিই আজ আমাদের বিয়ের দিন নাকি।

ঠিক এই লজ্জার আশংকাটাই করছিল সুনন্দা। এই মুহূর্তে মনে হল, আজকের এই দিনটি নিয়ে তার যত কল্পনা ছিল এতক্ষণে সব কিছু মিলে তাকে যথার্থ উপহাস করে গেল। তার ইচ্ছে করছিল এই মুহূর্তে একজন নির্বোধ স্বামী এবং একজন নিষ্ঠুর পর-পুরুষের চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে লজ্জা নিবারণ করে।

কিন্তু পারল না। কারণ, তখনো তার আরও একটু কর্তব্য বাকি ছিল।

সুনন্দা ধীরে ধীরে দুটি প্লেট নিয়ে তাদের সামনে রেখে দু'টি পেয়ালায় নিঃশেষে চা ঢেলে দিলে।

চায়ের শেষ ফোঁটাটি যখন তার স্বামীর পেয়ালায় পড়েছে, তখন সুনন্দা করুণ চোখে মনে মনে শুধু এই প্রার্থনা করলে—সবই তো আজ আমার প্রতিকূলেই যাচ্ছে, সব উপহাসই সহ্য করে গেলাম। কিন্তু ওগো অন্ধ, অন্তত এইটুকু লক্ষ্য কোরো, দুটি মাত্র প্লেটেরই ব্যবস্থা করেছিলাম আর মাত্র দু' পেয়ালার মতো লিকার—তোমার আর আমার।

কাগজ বদল

* শ্রীসর্বদর্শী *

মানুষ বাসা বদল করে। পোষাক বদল করে, মাঝে মাঝে ভোলও বদলায়। এই বদলা-বদলির ব্যাপারটা যেমন রকমারি কারণও তেমনি হরেক রকমের। এ-সবের পুরো খতিয়ান তৈরী করা সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কিন্তু সম্প্রতি আমার কৌতূহল জেগেছে খবরের কাগজ নিয়ে। মানুষ খবরের কাগজ বদলায় কি না এবং কেন বদলায়।

অন্য দেশের খবর জানি না কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এ বিষয়ে রীতিমত গোঁড়া বলেই আমার ধারণা। আমাদের পাড়ার নিবারণবাবুর বয়স প্রায় পঁচাশী। ভদ্রলোক খবরের কাগজকে বলেন, "বঙ্গবাসী"। তাঁর ভুল শুধরে দেবার বহু চেষ্টা করেছি। বলেছি, "ঠাকুর্দা, বঙ্গবাসী উঠে গেছে বহুকাল। এ কাগজটার নাম অন্য।"

তিনি নির্বিকারভাবে জবাব দিয়েছেন, "ঐ হোল। খবর নিয়ে কথা। নাম দিয়ে কি ধুয়ে খাবি?" প্রীতম সিং কাগজের হকারি করে চুল পাকিয়েছে। তাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল "এমন বাড়ীও আছে যেখানে তিন পুরুষ ধ'রে একই কাগজ দিয়ে আসছে। ছেলে ছোকরা বাবুরা অবশ্য নতুন নতুন কাগজ নেন; তবে সেটা প্রায়ই বরাদ্দের উপরি।"

যে কোন খবরের কাগজের সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টের নথিপত্র ঘাঁটলেও এ নজীর ভূরি ভূরি মিলবে যে, স্থায়ী গ্রাহকের সংখ্যাই অধিকাংশ-ক্ষেত্রে বেশী।

কেন এই গোঁড়ামী। খবর তো মোটামুটি সব কাগজেই প্রায় একই রকম থাকে। দামের ইতর বিশেষের জন্য যদি হ'ত তাহলে সস্তা দামের কাগজ সবচেয়ে বেশী বিক্রি হত। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার তুলনামূলক বিচার করলেই দেখা যাবে যে, মূল্যের সঙ্গে কাগজ বাছাইয়ের সম্পর্ক খুবই কম।

আজকের দিনে রাজনীতিক মতামতটা কাগজ নির্বাচনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু স্বদেশী-ওয়ালাকে দেখেছি। যাঁরা সারা জীবন বিজাতীয় সংবাদপত্র পড়ে আসছেন এবং সকালে চায়ের আসরে ঠিক সেই কাগজখানা না পেলে তাঁদের মুখে চা সেদিন বিস্বাদ লাগে।

তা'ছাড়া ধরুন দল নিরপেক্ষ কাগজও তো আছে। নতুন নতুন কাগজও বেরিয়েছে এবং বেরুচ্ছে। অবশ্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পড়ুয়া-সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিনিয়ত পড়ুয়ারা কাগজ বদল করছেন। বদল করছেন বলে কাগজ-গুলোর প্রচার সংখ্যা কমছে বাড়ছে এ কথা ঠিক নয়।

কেন বিশেষ একজন লোকের বিশেষ একখানা কাগজের উপর ঝোঁক থাকে তা' বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু অভ্যাস একটা বড় কথা। একখানা কাগজে রোজ যতগুলো হরপ ছাপা হয় বইয়ের আকারে তা ছাপা হ'লে মানুষের তা পড়তে কয়েক ঘণ্টা যে লাগবে তা নিশ্চিত। অথচ আধঘণ্টা, একঘণ্টার মধ্যেই অধিকাংশ লোক তাঁদের কাগজ পড়া শেষ করেন।

বিশেষ কাগজের সংবাদ সন্নিবেশ ও সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ ঢংটি আমাদের জানা থাকে বলেই এটা সম্ভব হয়। আমরা জানি কোথায় আমরা রুচিকর সংবাদটি পাব, বুঝতে পারি কোন্ খবরটি খুঁটিয়ে পড়া দরকার, কোন্ মন্তব্যটি দরকারী।

তবু কি সংবাদপত্র বদল একেবারেই হয় না? হয়, আর তার সংখ্যা কম নয়। এই বদলের একটা বড় অংশও বিশেষ কাগজের বিশেষ ঘটনার উপর পক্ষপাতিত্ব। ধরুন আসামের ঘটনা বা বেরুবাড়ী হস্তান্তর ব্যাপারে আপনার নিজস্ব একটা মতামত আছে। কাজেই আপনার প্রিয় কাগজ যদি সে সম্পর্কে বিস্তৃত খবর দিয়ে খুশী করতে না পারে, যদি সম্পাদকীয় মন্তব্য আপনার মনোমত না হয়, আপনি সাময়িকভাবে হ'লেও কাগজ বদলাবেন। আর

আজকের দিনে নিত্য নতুন দেশী-বিদেশী সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

—আমাদের মতামতও রোজ ভাঙছে গড়ছে। তাই অনেকেই একাধিক কাগজ পড়ছেন বা কেউ কেউ ঘন ঘন কাগজ বদলাচ্ছেন।

এ বাদেও আর একটা কারণে মানুষ কাগজ বদলায় তা' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কারণটা আমিও জানতাম না। ঘটনাটা বহ্নিদি বললেন আমাকে চায়ের আসরে। কাগজ বদলানোর প্রসঙ্গটা কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে। তাই সবার সামনে প্রশ্নটা উত্থাপন করলাম—তাঁদের অভিজ্ঞতা জানবার জন্য।

বহ্নিদি বললেন তাঁর ননদের কথা। ভদ্রমহিলা অধ্যাপিকা, কুমারী। ভালবাসতেন যাঁকে তিনি কাজ নিয়ে-ছিলেন বোম্বে এক নামজাদা

কোম্পানীতে—ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধির। সেবার তিনি গেছেন উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে। ঠিক ছিল সেখান থেকে ফিরে এসেই বিয়ে করবেন। কোম্পানী ছুটিও মঞ্জুর করেছে। প্রতিদিনকার ডাকে চিঠি দিতেন, রীতিমত কাব্য করে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

সেদিন সকালে চায়ের আসরে সংবাদপত্র খুলে প্রথম খবরটি পড়েই বজ্রাঘাত হ'ল বহ্নিদির ননদের মাথায়। সু···বাবু মারা গেছেন মোটর একসিডেন্টে আলিপুর দুয়ারের রাস্তায়। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে খবরটা।

বহ্নিদির ননদ আজ দশ বছরের মধ্যে ঐ বিশেষ কাগজখানা পড়েননি। ঐ কাগজখানা দেখলেই তাঁর শরীর ও মন অস্থির হয়ে পড়ে। তাঁর সামনে বাড়ীর কেউ সে কাগজের নামও করেন না। অন্য কাগজ রাখেন তাঁরা পরদিন থেকে।

এমন ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণার ফলেও মানুষ কাগজ বদল করে।

হে সবুজ পিতামহ পথ বলো

শান্তনু দাস

নৌকা আমি বাইবো না আর,
একলা আজ, কোথায় পিতামহ?
কোন মহাজন পথ দেখাবে,
নৌকা আমার পৌঁছোবে না আর
প্রাচুর্যেরই তীরে;
হয়তো আমি মিলিয়ে যাবো,
তলিয়ে যাবো কালেরই গভীরে:
অনেক রঙ
অনেক মাটি
অনেক সমারোহ; বঞ্চিত আজ
ওপারেতে আকুল হাতছানি,
পারে যাওয়া হোলো না আর,
দুলছে ঝড়ে-ছোট্ট ডিঙিখানি
অপেক্ষিত হিংস্র শ্বাপদ
স্বাদ নিতে চায় ভরন্ত যৌবনের
পিতামহ একলা আমি
হয়তো আমি মিলিয়ে যাবো তলিয়ে যাবো,
কালেরই গভীরে:

আমেরিকা থেকে

ত্রিদিব মুখোপাধ্যায়

খোপরোগ [illegible]। বছর কয়েক আগে এক নিকট আত্মীয় ডাক্তার এসেছিলেন আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের Minnesota প্রদেশে। ছিলেন বছর দু'য়েক। সেই সূত্রে লতায়-পাতায় পরিচয়ের বিস্তার হোল স্থানীয় ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে। দেশে ফিরলেন। সেখানে আমার যাবার ইচ্ছে শুনে লিখলেন তাঁর Minnesota-র এক ডাক্তার বন্ধুকে।

বন্ধুটি জবাবে লিখলেন, দাও পাঠিয়ে তোমাদের ছেলেকে, আমার বাড়ীতে। আমার Doctorate করার জন্য যতদিন এবং যত টাকা লাগবে তার জন্য তাবৎ ব্যয় তিনি বহন করবেন—এই মর্মে সই করলেন বণ্ড। নিলাম admission Minnesota বিশ্ববিদ্যালয়ে, পেলাম পাসপোর্ট, হোলো ভিসা।

পরিবহনের জন্য স্বল্পতম ব্যয়ে গ্রেহাউণ্ড বাসে চেপে Newyork শহর থেকে Minnesota-র কেন্দ্র Minneapolis শহরে যখন পৌঁছলুম—নানা জটিল দুশ্চিন্তা তখন মনে। ভাবলাম বাস ষ্টেশনে নেমেই—আমার এ দেশের Sponsor, Dr. Walsh-কে তাঁর লিখিত নির্দেশমত ফোন করে আমার উপস্থিতি সংবাদ জানাবো। গাড়ী করে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন তিনি। মনে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। লজ্জা আর সঙ্কোচ নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীই গেছি কখনো-সখনো—আর এতো বারো হাজার মাইল দূরের আমার অদৃষ্টপূর্ব একজন অনাত্মীয় ব্যক্তি ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভাষাভাষী। ভিন্ন সংস্কৃতি জাত। বাস থেকে নেমে ফোন করতে যাবো। দেখি এক মাতৃমূর্তি দু'টি ছেলে সঙ্গে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি মিঃ মুখার্জী।

পরম স্বস্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্বাস ফেলে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই কি Mrs. Walsh ?

জবাবে প্রশান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, এটি আমার মেজ ছেলে Bob, আর এটি ছোটো Warren, ছেলেদের বললেন. ত্রিদিবের লাগেজ নে। গাড়ীতে তোল।

Newyork শহর থেকে মোটর গাড়ীর সংখ্যা এবং তার বৈচিত্র্য দেখে প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখন 'দেখে দেখে চক্ষু ঘোর হয়ে বিকলে'র পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ষ্টেশনের বাইরে তাঁদের গাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম। মার্চের শেষের দিক। মনে পড়েছে জাহাজে চাপবার আগে মাদ্রাজে গরমে ঘুম হয় নি। আর এখানে টপকোট চাপিয়েও শীত বাগ মানে না। আর একী! এ যে দেখি চারিদিকে বরফের সহজ সমুদ্র। আর তার ওপর অবলীলাক্রমে সমস্ত শহরটা কর্মচঞ্চল, প্রাণাবেগে ভরপুর।

আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখে Mrs. Walsh জিজ্ঞেস করলেন, ত্রিদিব তোমাদের ওখানে এত বরফ পড়ে ?

কী জবাব দেবো ? বাংলা দেশের ছেলে। দার্জিলিং গিয়েছিলুম মাত্র একদিনের জন্য। তাছাড়া বরফের সঙ্গে আমার পরিচয় বাকচাতুর্যের বাঞ্জনায়। কারুর অলীক কল্পনা বা অবাস্তব গল্পের কথা শুনলে তাঁর মাথায় বরফ চালার প্রস্তাবে। আর ডাক্তারবাবুর নির্দেশে, রোগশয্যায় মৃত্যুপথযাত্রীর মাথাতেও দুর্লভ উচ্চ মূল্যের বরফের বরফি ঢেলেছি। তাছ'ড়া আর অন্য কোনো উপলক্ষে বরফের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হোয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। ও হ্যাঁ, ছেলেবেলায় পাড়ায় আইসক্রীম মাঝে মাঝে কিনে খেয়েছি [illegible] কিন্তু আমার ঐ অর্বাচীন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে Mrs. Walsh-এর প্রশ্নের সাধারণভাবে একটা কী [illegible] দেবো ? মৃদু হাসলাম, বললাম, [illegible] আমি যেখানে থাকি, সেখানে [illegible] তাপমাত্রা বরফ পড়ার ছেলেখেলা অনুমোদন করে না। এত [illegible] জীবনে একসঙ্গে ইতিপূর্বে [illegible] দেখি নি। আর প্রখর গ্রীষ্মে আমার দেশের প্রলয় অগ্নিকাণ্ডের [illegible] তোমার এই বরফকাণ্ড আমার [illegible] সমান ভীতিবহ।

ভরসা দিয়ে তিনি বললেন, [illegible] তো বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছো ত্রিদিব। শীত কাটিয়ে [illegible] আগমনে এসেছো। আর এখানকার প্রকৃতি এবং আবহাওয়া এখন থেকে সুন্দরী এবং প্রসন্ন হবে।

গাড়ীর দরজার কাছে [illegible] Walsh সবিনয়ে বললেন, ত্রিদিব যদি কিছু মনে না করো, তুমি আমার ছোট ছেলে Warren-এর সঙ্গে পেছনের সীটে বসো। কারণ Bob তোমাকে তার গাড়ী চালানো দেখাতে চায়, তবে এতদিন তার পনেরো বছর পুরো হয় নি বলে ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পায় নি। গত সপ্তাহে ও পনেরো পড়লো বলে অপারেটরস লাইসেন্স নিয়ে চালাচ্ছে। কাজেই ওর পাশে আইনত এমন একজন ব্যক্তিকে বসতেই হবে, যার ড্রাইভারী লাইসেন্স আছে। তাই আমিই বসছি।

হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে

আমেরিকায় বরফ পড়ার দৃশ্য

বললেন, ভালো কথা। ত্রিদিব, তোমার কলকাতার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখিয়ে এখানকার লাইসেন্স করিয়ে নেবে। বোধ হয় তোমাকে শুধু একটা ড্রাইভিং পরীক্ষা দিতে হবে। আচ্ছা, তুমি কি ধরণের গাড়ী চালাতে? Automatic Transmission, Semi-automatic না Standard Shift?

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এতগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দেবার আতঙ্কে নয়। মনে মনে ভাবলাম, নির্বোধ বালিকা। তোমাকে কী জবাব দেবো? ছাত্রজীবনে কলকাতায় ছিলাম। সাধারণ আরো হাজার ছেলের মত নিজস্ব একটা গাড়ীর অনুপস্থিতির কথা মনে কোনো অভাববোধ বা অভিযোগের সৃষ্টি করে নি। গাড়ী বলতে চড়েছি—ট্রাম, বাস, আর ঠেকায় পড়ে ট্যাক্সি। খেয়াল করার প্রয়োজন হয় নি তাদের Transmissionএর জাতি, বর্ণ, গোত্র। তাই থ' হ'য়ে গেলাম আমার নির্বিকার জবাব শুনে তাঁর সম্ভাব্য বিস্ময় এবং হতাশার মাত্রার কথা ভেবে। মৃদুকণ্ঠে বললাম, কলকাতায় আমার কোন ড্রাইভারী লাইসেন্স ছিল না।

আকাশভরা অবাককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি, দেশে তুমি গাড়ী চালাতে না?

সংক্ষিপ্ত একটা হ্যাঁ বা না বললেই জবাব মিটে যায়। কিন্তু ভাবছিলাম সামান্য একটা প্রশ্নের তাৎপর্যের কথা। হ্যাঁ বা না বললে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় বটে, হয় না প্রশ্নকর্তার সন্দেহের নিরসন। কারণ, আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁদের গাড়ী থাকে তাঁরা গাড়ী চালান না। যাঁরা চালান তাঁদের নিজেদের গাড়ী নেই—গাড়ী চালানোই তাঁদের জীবিকা। আর নিজের গাড়ীও আছে এবং নিজেই চালান—এমন লোক যে নেই তা নয়, তবে তাঁদের সংখ্যা স্বল্প। আর আমি এই তিনটির কোনো দলেরই নয়।

বললাম,—না। আমাদের দেশে গাড়ী পুষতে তুলনামূলকভাবে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন।

Mrs. Walsh কী বুঝলেন জানি না। মৃদু হেসে বললেন, যাক্‌গে, একটা সামান্য বিষয় নিয়ে এখন থেকে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তিন বছর আছো। আগামী বছরই দেখবে তুমি নিজের গাড়ী নিজেই চালাচ্ছো।

Warren-এর বয়স দশ। গাড়ীতে Warren-এর পাশে বসে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। ছোটো ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাব জমিয়ে নেওয়ার সাফল্যের ব্যাপারে দেশে আমার সুনাম ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, Warren, What class do you read in? জবাব এল, Pardon me! প্রশ্নটা আবার করলাম। এবারে দেখি Warren তো দূরের কথা, তার মাতৃদেবীরও বোধগম্য নয় আমার প্রশ্ন। আমার নিতান্ত সরল সহজ প্রশ্ন। আশ্চর্য হোয়ে গেলাম। দেশে নব-পরিচিত কোনো সুবোধ বালকের নবলব্ধ ইংরেজী জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা মাপতে গিয়ে তো এই প্রশ্নটাই আমরা সচরাচর ব্যবহার করি। তবে এখানে এ কী হোলো। আমার চব্বিশটা বছরের সযত্ন পালিত অভিজ্ঞতার অভিমান কি মিথ্যা হোয়ে গেল? কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, আমার হতভাগ্য প্রশ্নটির মধ্যে দু'টি বেপরোয়া ভুল ছিল। প্রথমটি Term বা শব্দের বিশিষ্ট অর্থের। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকে এখানে class বলে না, বলে Grade. দ্বিতীয়, বাক্যটির রীতি, প্রকৃতি এবং গঠনপ্রণালীর। বোধ হয় একেবারে প্রাচ্যসুলভ। আমাকে বলতে হোতো, What grade are you in বা What's your grade বা ঐ ধরণের একটা কিছু।

বুঝতে পারলাম, এই ক্ষুদ্র বালকের প্রতি নিক্ষিপ্ত আমার প্রথম নির্বোধ প্রশ্নের দুর্বোধ্যতার এই অবাধ্য দ্বিবিধ ভুল—আমার আমেরিকা অবস্থানের তাবৎ সময়কালকেই বিড়ম্বিত করবে। পরে বুঝেছি, সেদিন কী ভুলই না বুঝেছি! আমার তথা এশিয়া এবং আফ্রিকার সমগ্র বিদেশীকুলেরই আমেরিকায় এসে পরিষ্কার শুদ্ধ ইংরেজীতেও নিজের মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করতে এবং সাধারণ আমেরিকানের মুখনিঃসৃত সাধারণ আটপৌরে ভাষা বুঝতে যে বিশুদ্ধ কারণে হিমসিম খেতে হয় তা হোলো accent বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। আর তার সঙ্গে Term এবং বাক্যগঠন রীতির উপযুক্ত পার্থক্যদ্বয় উপস্থিত থাকলে তো ষোলকলা পূর্ণ। এদের এবং আমাদের accent-এর আকাশ-জমীন ফারাক দেখলে মনে হয়, বুঝি দু'ধরণের ইংরেজী আছে, American English এবং আমেরিকা ছাড়া বাকী দুনিয়ার

ইংরেজী—যা ইংরেজদের কাছ থেকে বা ইংরেজদের মত করে শেখা। ঠাট্টা নয় মশাই, এদেশের Webste - এর একখানা অভিধান খুলে দেখি—সেটা ইংরিজী ভাষার অভিধান নয়, লেখা আছে—Webster's New World Dictionary of the American Language : ভাষা dynamic, এ মতের আমি পোষক—কাজেই এ প্রভেদ আমি স্বীকার করে নিলাম।

গাড়ী বাড়ী পৌঁছুল। সামনে বিশাল লন (Lawn)। বরফের ভেতর ঘাস না বালি কী ঢাকা আছে বলা দুঃসাধ্য। বেশ বড় অভিজাত ধরণের বাড়ী। অবিশ্যি এরকম বাড়ী বুঝতে আমাদের দেশের অট্টালিকার কথা ভেবে নিলে ভুল হবে। এ হোলো আগাগোড়া কাঠের বাড়ী। একতলাটা আয়তক্ষেত্রের মত—তার ওপর দোতলাটা ত্রিভুজের মত, অনেকটা অর্ধেক হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে গৌরবে দাঁড়িয়ে। বিরাট বিরাট জানলা। আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে ঢাকা। জানলায় লোহার গরাদের বালাই নেই, প্রয়োজন অনুপস্থিত বলে। ঘরের ভেতর থেকে কাঁচের দরজার ওপর পর্দা টেনে দেওয়া যায়। পর্দা সরিয়ে নিলেই মনে হবে বাজারের মধ্যে আব্রুহীন বসে আছি। মনে নিরাপত্তার অভাব ঘটে। অবশ্য তা ঘটে কেবল প্রাচ্য দেশোদ্ভব এই অধমেরই। বাড়ীর বাসিন্দাদের নয়।

Mrs. Walsh সামনের দরজাটা খুলে ডান হাতটা কাস্তের মত সামনের দিক থেকে তাঁর নিজের কাছে টানলেন। বোঝালেন, অতিথি সুস্বাগতম্। পরে বুঝেছিলাম, এদেশের অধিকাংশ দরজাতেই স্প্রীং লাগানো বলে, প্রথমে যে ব্যক্তি ঘরের ভেতর ঢোকেন বা ঘরের বাইরে বেরোন, তিনি দরজাটা খুলে ধরে রাখেন—যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি দরজাটিকে অতিক্রম করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হলো অলিখিত আইন। আর তাঁর কষ্ট বা সৌজন্যের বিনিময়ে দরজা অতিক্রম করার পর আপনি শুধু চোখের কোণে একঝলক হাসি টেনে নাতিউচ্চ কণ্ঠে বলবেন,

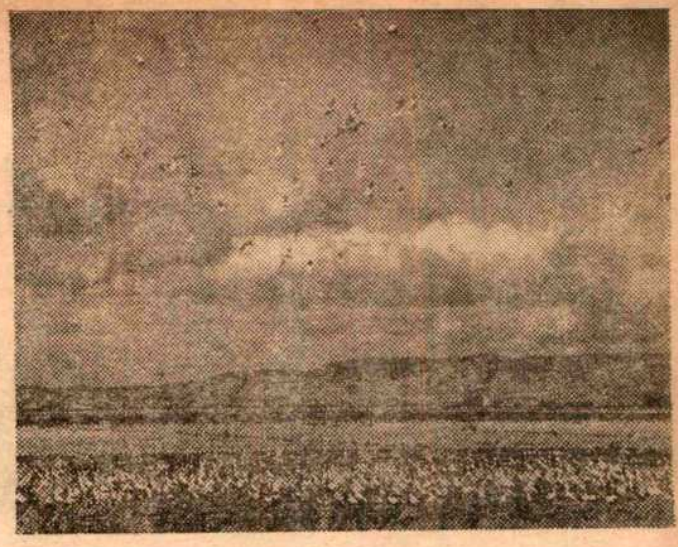

যুক্তরাষ্ট্রে বসন্ত সমাগমের একটি মনোরম দৃশ্য

Thank you. নইলে আপনার চেনা বা অচেনা পুরোগামী যদি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই শীষ দিতে দিতে দরজাটা ছেড়ে দেন, তাহ'লে সেই অবাধ্য দরজাটা সবেগে দড়াম করে আপনার নাকে গিয়ে জুডাস—চুমু দেবে।

ঘরে ঢুকলাম। এখন এক নতুন জগৎ। দেখি, আলোয় ঝলমল করছে ঘরখানি। মেঝেয় বিশাল কাশ্মীরী কার্পেট সারা ঘরখানি জুড়ে। মাথার ওপর 'ঝাড় আলো' ঝুলছে। একটা বিরাট টেবিলপাতা। খাবার টেবিল। চারপাশে তার চেয়ার পাতা। এখানে ওখানে জ্যামিতির অভ্রান্ত মাপে সুসজ্জিত সোফাকোচ। পাশের বৈঠকখানা ঘরে, যাকে এরা বলে 'ডেন'—দামী সোফাকোচ, একটা টেলিভিসন সেট, একটা Record player, বিরাট এক দেওয়াল আলমারী ভর্তি দামী দুর্লভ গ্রন্থের সম্ভার —বাইরের অন্য লম্বা হলঘরটিতে একটা বিশাল পিয়ানো, রকমারী আলোর স্ট্যাণ্ড, পৃথিবীর দূর-নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দুর্লভ antique এবং চিত্তাকর্ষক রকমারিত্বের সযত্ন সংগ্রহ। পিয়ানোর ওপর একটা বাইবেল। দেওয়ালে ঝোলানো দামী অয়েলপেন্টিং।

প্রথম দর্শনেই ভেবে নিলাম, এঁরা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ধনী। পরে বুঝেছিলাম, কাশ্মীরী কার্পেট এবং দু' একটি উপকরণের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী সমস্তই উনিশ কোটী আমেরিকানের প্রায় প্রতি ঘরেই একটা অতি পরিচিত দৃশ্য।

সওয়া ছয় ফুট লম্বা একজন সুদর্শন সপ্রতিভ সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। Mrs. Walsh পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার বড় ছেলে, Mike. আর Mike, এ হোলো ত্রিদিব। আমাদের বাড়ীতে বছর তিনেক থেকে পড়াশুনো করবে। জানো ত্রিদিব, গতমাসে Mike উনিশে পড়লো।

উনিশে পড়লো! মনে মনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দৈহিক আকৃতি এবং উচ্চতা দেখে এরপর এদেশে আর কখনো কারুর বয়স নিরূপণ করার ধৃষ্টতা দেখাই নি।

Mike আমাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বললো, ত্রিদিব, বাথরুমে আগে হাতমুখ ভালো কোরে ধুয়ে নাও। তারপর কথা হবে।

দু'মিনিট পর Mike আবার দৌড়ে হুড়মুড় করে ওপরে এল। আমাকে কী যেন বলল। বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,—কী বলছ? এবারে ও শুধু দু'টি কথা বলল, Dr. Walsh আমার বাবা। বুঝলাম, Dr. Walsh ফিরে এসেছেন। পার্শ্ববর্তী Wisconsin প্রদেশে

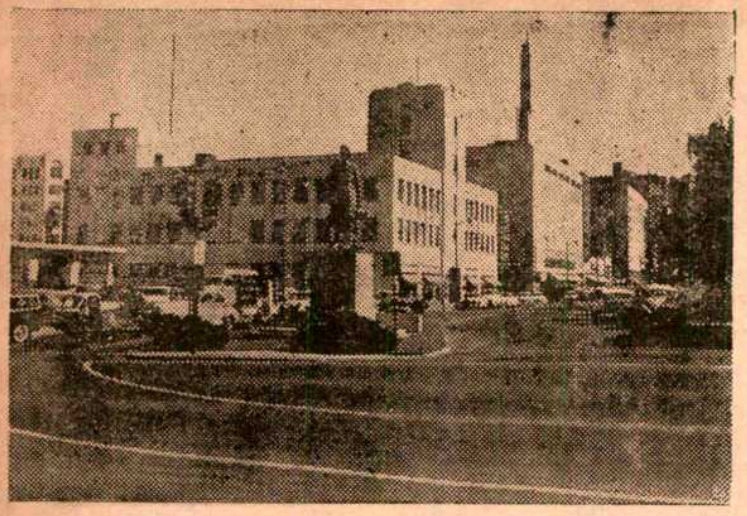

ছবিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় মোটর গাড়ীর সমাবেশ দেখা যাচ্ছে

গিয়েছিলেন রোগীদের চোখ অপারেশন করতে। ফিরে এসেছেন।

দেশের কথা মনে পড়লো। বাইরের কোনো ভদ্রলোক এসে বাবার খোঁজ করলে বলতাম, বাবা বাড়ী নেই বা আছেন, বা উনি বাড়ীতেই আছেন। কখনো বাবার প্রথম নাম ধরে, অমুকবাবু বাড়ীতেই আছেন বা অমুকবাবু বাড়ীতে নেই বলি নি। বা শেষ নাম বা পদবী ধরেও বাবার পরিচয়দানের পর তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ঘোষণা জানাবার প্রয়োজন হয় নি। তাই Mike-এর কথায় একটু আশ্চর্য লাগল। Dr. Walsh এসেছেন, আমার বাবা!

দেখি Dr. Walsh নিজেই ওপরে উঠে আসছেন। আসার সময় আমার সেই আত্মীয় বলে দিয়েছিলেন, ত্রিদিব ওদেশে ছোটোরাও বড়দের নাম ধরে ডাকে বা শেষ-নামের আগে Mr. Miss. বা Mrs. বসায়। কাজেই তুমিও Dr. এবং Mrs. Walsh কে ঐ বলেই ডাকবে। কিন্তু সেই প্রশান্ত, সৌম্য, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রৌঢ় যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন একবার শুধু মনে হোলো, হা ঈশ্বর, এঁকে যদি Uncle Walsh বা ঐ ধরণের একটা কিছু বলে ডাকতে পারতাম। যাক্, পরবর্তী-কালে আমার প্রপিতামহের বয়সী ব্যক্তিদেরও আর তাঁদের প্রথম বা শেষ নাম ধরে ডাকতে কোনো সঙ্কোচ হয় নি। অভ্যাস!

পরের দিন সকালে উঠে হাত মুখ ধোওয়ার পর বাথরুম থেকে বেরুলাম। Mrs. Walsh বললেন, ত্রিদিব এসো রান্নাঘরে। রান্নাঘরে? অতিথি পুরোনো হোলেও তাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করার প্রস্তাব করতে মা-কাকীমাকে কখনো শুনি নি। রান্নাঘরে যিনি রাঁধবেন, একমাত্র তাঁরই অবাধ প্রবেশাধিকার। নেহাৎ চুরি করে তরকারী চাখতে যাওয়া ছাড়া রান্নাঘরে প্রবেশ বিশেষ করে পুরুষদের—অপ্রয়োজনীয়, অনন্ত-মোদনীয়, অবাঞ্ছনীয়। এদেশে কিন্তু পরিবারের রন্ধনকার্য ছাড়াও রান্নাঘরের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের সমস্ত সভ্য এসে সময় পেলেই রান্নাঘরে জমা হয়—চেনাশোনা বাইরের লোক থাকলে তিনিও যোগদান করেন। সেজন্য এদের রান্নাঘরও আকৃতি ও প্রকৃতিতে তদুপযোগী করে তৈরী।

ওদিকে Pressure Cooker-এ বা Coffeemix-এ খাদ্য, চুট্‌কী বা কফি তৈরী হচ্ছে। এদিকে আসর জমছে। তবে আমাদের আসরের সঙ্গে এর গুণগত এবং সময়গত পার্থক্য রয়েছে। এদের আসরে বাবা ছেলের সঙ্গে artificial breedingএর সুফল এবং ঝঞ্ঝাট থেকে আরম্ভ কোরে Space Capsule-এর যান্ত্রিক খুঁটিনাটি পর্যন্ত আলোচনা করেন। ছেলের গতরাত্রের date-এর বালিকা-বন্ধুর attitude নিয়ে পিতার প্রশ্ন এবং পিতার অফিসের নবনিযুক্ত ব্লণ্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করিয়ে দেবার জন্য মাতৃদেবীর কাছে মিষ্টিলঘু আবদারের মধুর সম্পর্কের মধ্যেও কখনো কখনো তার সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয়ত, এ আসরের স্থায়িত্ব এত স্বল্প যে আসরের মৌজ আর কখনো জমে পেকে ওঠার অবসর পায় না। কারণ এরা সময়কে দু'ভাগে ভাগ করেছে। কাজের সময় এবং ফুর্তির সময়, যাকে এরা বলে 'ফান'। আর এ দুয়ের মধ্যে অকাজের সময় এদের অল্প। কাজের সময় এরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে তাই সোম থেকে শুক্র এই পাঁচদিন—প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করার পর যখন শুক্রবারে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে তখন আবার উন্মাদ হয়। শনি এবং রবি এই দু'টো দিন কী করে মত্তবেগে উপভোগ করা যায় সেই চিন্তায়। ঘরে চুপচাপ বসে গল্পগুজব করে, তাস খেলে দুটোদিন কাটিয়ে দেওয়া? নৈব নৈব চ। বাইরে বেরুতে হবে। ড্রাইভ কোরে দূরে কোথাও যেতে হবে। অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। শীতে স্কী, স্কেটিং, বোলিং, আর গরমে সাঁতার, ক্যাম্পিং, টেনিস, কার্ণিভেল, বোটে চড়া, ঘোড়ায় চড়া থেকে আরম্ভ করে রোদ্দুরে শুয়ে চামড়া 'ট্যান' করা, হাই কিং বা হেঁটে অনেক দূর যাওয়া, সাইকেল চড়া, মাছ ধরতে যাওয়া এবং মুক্ত আকাশের নীচে নিজের গাড়ীর ভেতরে শব্দযন্ত্রটি রেখে বিশাল কংক্রীটের সাদা রঙ করা পর্দার ওপর Drive-in movie দেখা পর্যন্ত রয়েছে। তারপর দেহে মনের রসে টলমল করে সোমবার অফিস বা কর্মস্থানে ফেরে; আর নিংড়োনো আখের ছিবড়ে হ'য়ে শুক্রবার রাত্রে সেখান থেকে বেরোয়। কর্মযন্ত্রের নিষ্কাষণশক্তি এত নিষ্ঠুর বলেই সপ্তাহান্তে উপভোগের এত উন্মত্ততা। আর মত্ততার এই ঝড়ে কুকুরের মত সহচর সামান্য একটি

চতুর্চক্রযান। আদর করে ছোট্ট দু'টি শব্দে, তাকে ডাকে 'কার' ব'লে। কখনো বলে 'অটো'। মানে আমাদের ভাষায় মোটর গাড়ী।

রান্নাঘরে চা খেতে খেতে Mrs. Walsh-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আর সব কোথায়?

বললেন, Dr. Walsh তাঁর ডাক্তারখানায় গেছেন সকাল আটটায়। ফেরেন সন্ধ্যা ৬টায়। Bob আর Warren গেছে স্কুলে।

—Mike? Mike ও কী কলেজে গেছে?

—না, দেখ, Mike কালকে যাবে Marine এ জয়েন করতে ছ' মাসের মত। তাই আজ ওর Girl Friend কে নিয়ে date এ গেছে এখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে Duluth (ডুলুথ) এ Lake Superior এর তীরে। ফিরতে অনেক রাত্রি হবে। আবার কাল ভোরের প্লেনেই Minneapolis ছাড়বে তার Marine Training এ যোগদান করতে।

—সঙ্গে মেয়েটার কোনো গার্জেন গেছে? অমার্জনীয় অজ্ঞতার বশে সরলবিশ্বাসে জীবনে অনেক বোকার মত প্রশ্ন করে পরে অনুতপ্ত হয়েছি। কিন্তু একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসূচক বাক্যের দ্বারা এতখানি স্তম্ভিত বোধ করি জীবনে কাউকে করতে পারি নি।

খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর Mrs. Walsh আর্তনাদ করে উঠলেন, For heaven's sake, No!

বুঝলাম আমার হতভাগ্য প্রশ্নটা করা শুধু অপরিমেয় বোকামিই হয় নি, সামাজিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে Mrs. Walsh তথা সমগ্র আমেরিকা-

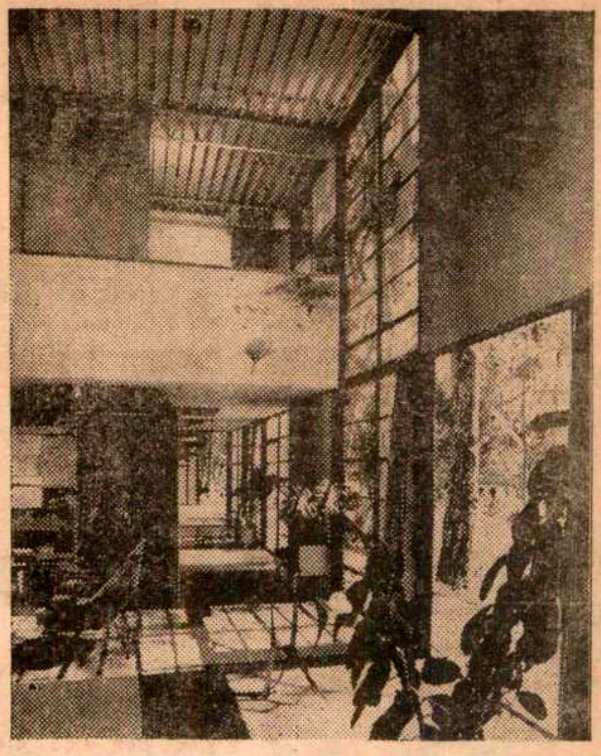

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ধরণের এই দোতলা বাড়ীটির একতলায় যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম চলে ও ওপর তলাটিকে শয়ন ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাসীর মূল্যবোধকেই তা আঘাত দিয়েছে, অপমানিত করেছে।

উনিশ বছরের একটি অবিবাহিত ছেলে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে এক প্রায়-নিরালা জায়গায় নিজের গাড়ীতে সমবয়সী একটি যুবতীকে নিয়ে গিয়ে সারাদিন হৈ হৈ কোরে কাটানোর পর অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরবে; এবং তাতে তার মাতাপিতার সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সহানুভূতি আছে এ সংবাদটি আমার মত একটি নবাগত যুবকের কাছে যত অসম্ভব অথচ লোভনীয়ই ঠেকুক না কেন, এদের গতিশীল সমাজব্যবস্থায় সেটা একটা—ডাল ভাত।

প্রশ্ন উঠতে পারে Teen-agers বা আঠারো-উনিশ বা তারও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে মেলামেশার একটা মাত্রা থাকা উচিৎ। কারণ দায়িত্ববোধ এবং দেহ বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণে তারা যে পরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় দেবে তার Guarantee কী?

প্রশ্ন করবেন, মশাই আপনি তে অনেকদিন আছেন ওদেশে। বলুন ন এ সম্পর্কে আপনার মতটাই এক শুনি। আপনি কী ভাবেন?

কী ভাবি? ভাবছি। এখনে দেখছি আর ভাবছি। বেশ তে আমার অভিজ্ঞতার কাঁচ-কাঁটাই বলু আর মণিমুক্তোই বলুন, আপনাদে সামনে তুলে ধরছি। স্থান-কাল-পা বিবেচনা কোরে আপনারাই রা দেবেন। কেমন?

Mrs. Walsh-কে জিজ্ঞা করলাম, তুমি বললে, Mike, Mari এ যাবে। সেটা কী? Army, A Force বা Navy কোন্‌টার মধ্যে পড়ে? শুনে তো মনে হ'চ্ছে Navy কাছাকাছি কিছু।

—দেখো ঠিক তা নয়। এদে Marine হচ্ছে.....

যাক্‌গে সে কথা পরের ব হবে।

মুক্ত অঙ্গন
বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥
যা-নয়-তাই
শৌভনিক প্রযোজিত প্রহসন
৪৩-৬৪৭৩

পাণ্ডব রথ—মহাবলীপুরম্

রাজধানী ঃ

নয়াদিল্লীর আবহাওয়ায় গত সপ্তাহে যে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল তা বর্তমানে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ শীতল হয় নি।

বৈদেশিক কূটনৈতিক দল একে একে স্বদেশে ফিরে গেছেন,—আমেরিকার ডিন রাস্ক, ইংলণ্ডের ডানকান স্যাণ্ডস এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। চীনের আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ভারতকে কি ভাবে, কখন এবং কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

দান সম্ভব পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে তার বিধিব্যবস্থা করার জন্যই এঁরা এসেছিলেন।

ডানকান স্যাণ্ডস্ আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা বাধ্যতামূলক আপোষে নতি স্বীকার করার জন্য যে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেছিল তা' আজ আর দেশবাসীর অবিদিত নেই। দু'তিনদিনের দ্রুত, গভীর ও নিরেট আলোচনায় কুয়াশাচ্ছন্ন দু'টো দিগন্ত-রেখা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। ভারতকে সামরিক সাহায্যদানের প্রশ্নে কাশ্মীর সমস্যাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখে অগ্রসর হওয়ার যে নীতির পাঠশালা খুলতে চেয়েছিলেন ডানকান স্যাণ্ডস্ আর তাঁর সাগরপারের রক্ষণ-শীল গভর্ণমেণ্ট তা' সফল হয় নি। মার্কিন সরকার শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডকে পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

পণ্ডিত নেহরুর দৃঢ়তায় সুফল পাওয়া গেছে এবার। তিনি লোক-সভায় পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেছেন যে, ভারতকে পশ্চিমী সামরিক সাহায্য দানের প্রস্তাব আর পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান প্রয়াস এ দু'টো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক।

লোকসভার বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু বিতর্কমূলক বিষয়ের এবং বাক্‌বিতণ্ডার অবসান ঘটেছে। কলকাতার সিরাজুদ্দিন কোম্পানীর ব্যাপারটি তদন্ত হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে শ্রীনেহরু লোকসভায় জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য এই তদন্তের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জঙ্গীবাদী চীনের মুখোস খুলে পড়ছে ধীরে ধীরে। চীন বিনা সর্তে কলম্বো প্রস্তাব মানতে রাজী নয়। তার মতলব হাসিল করার জন্য সে চালিয়েছে সমানে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি।

চীনের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে যে-চিঠি বিনিময় হয়েছিল ভারত সরকারের, শ্রীনেহরু লোকসভায় তা পেশ করে বলেছেন, কোন পূর্ব সর্ত মেনে নিয়ে ভারত সরকার চীনের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত নয়।

* * *

তথাকথিত সাম্যবাদী চীনের কাছে আন্তর্জাতিক আইনেরও কোন

ডিন রাস্ক

মর্যাদা নাই। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের তারা চীনের রাজপথে 'প্যারেড' করিয়ে ছেড়েছে। ভারত সরকার এই আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

* * *

ভারতীয় অর্থনীতির বহুমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টার একাধিক অধ্যায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এ যাবৎ আমেরিকা থেকে ভারত যে সাহায্য পেয়েছে তার পরিমাণ ২৩২৩·৯

কোটি টাকা। প্রতিরক্ষার জন্য আমেরিকা যে সাহায্য দিচ্ছে ওটা তার বাইরে। নিম্নোক্ত বিবরণী থেকে অবস্থাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

	ডলার (মিলিয়ন)	টাকার মূল্য (কোটি)	শতাংশ
১। দান (প্রত্যর্পণযোগ্য নয়)	১,৩২৮·২	৬৩২·৫	২৭·২
২। ডলারে পরিশোধনীয়	১,২৩৯·৬	৫৯০·৩	২৫·৪
৩। স্থানীয় অর্থে পরিশোধযোগ্য (এর মধ্যে ঐ সমস্ত ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যা ডলারে বা টাকায় পরিশোধ করা যাবে; কুলে তহবিল যা থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ঋণ দেওয়া হয় আর, পি, এল ৪৮০ টাইটেল ১, খাতে চুক্তি আছে যে ঐ ভাণ্ডারের টাকাটা মার্কিন সরকার নিজে ব্যবহার করতে পারবে)	২,৩১২·৩	১,১০১·১	৪৭·৪
একুনে	৪,৮৮০·১	২,৩২৩·৯	১০০·

উপরোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাবে যে আমেরিকা প্রদত্ত সমগ্র ঋণের ২৫ শতাংশের মত মাত্র ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

১৯৬২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে আমেরিকা ভারতকে দেয় যে সাহায্যের পরিমাণ ঘোষণা করেছে, নীচের উদ্ধৃতি থেকে তার স্বরূপ বোঝা যাবে :—

শিল্প সম্প্রসারণ খাতে

ভারত সরকারের আমদানী তহবিলে

১। অপ্রকল্প ঋণ	২৪০·০	মিলিয়ন ডলার
২। ন্যাপকো বিভেল গিয়ার অব ইণ্ডিয়া লিঃ (প্রিসিসন গিয়ার প্ল্যান্ট)	২·৩	,,
৩। ইউনিয়ন কারবাইড অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৭·৭	,,
৪। হিন্দুস্থান এ্যালুমিনিয়াম লিঃ (২য় দফা)	৫·০	,,
৫। ইণ্ডিয়ান রেয়ন কর্পোরেশন লিঃ ...	৪·৭	,,

রেলওয়ে

৬। পঞ্চম রেলওয়ে ঋণ	১৫·৯	,,
৭। বারাণসী ডিজেল লোকোমটিভ ফ্যাক্টরী	১৯·০	,,

শক্তি উৎপাদন

৮। চন্দ্রপুরা থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন (২য় দফা)	১৬·০	,,

পি, এল—৪৮০

৯। উচ্চমানের তামাক ক্রয় খাতে ...	২·৬	,,

বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু রবার্ট কিফুত বর্তমানে নয়াদিল্লীতে রয়েছেন। বিশ্বসাঁতার প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিযোগীরা তাঁর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে। মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ বিনিময় প্রোগ্রাম অনুযায়ী কিফুতের ভারতে আগমন সম্ভবপর হয়েছে। কিফুত কিছুদিন বম্বেতে অতিবাহিত করে পুণা যাবেন এবং সেখানে চার সপ্তাহ থেকে আমাদের সাঁতারুদের বিশ্বপ্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করবেন।

১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণের প্রাক্কাল অবধি কিফুত দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতার-শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে চারটি অলিম্পিক দলকে শিক্ষা দেওয়ার ভার তিনি নিয়েছিলেন। এরা ক্রমান্বয়ে ১৯২৮ সনে আমষ্টারডম, ১৯৩২ সনে লস্ এঞ্জেলস্, ১৯৩৬ সনে বার্লিন এবং ১৯৪৮ সনে লণ্ডন অলিম্পিকসে যোগদান করেছিল। সুন্দর ডাইভিং-এ তাঁর খ্যাতি অসাধারণ। ১৯৫৭ সনে তিনি তাঁর নাতনীকে নিয়ে একবার এসেছিলেন। তখন তাঁর নাতনী ঠাকুর্দার ডাইভিং কৌশলের চমৎকার নিদর্শন দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

কিফুতের মতে ভারতীয় সাঁতারুরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাঁতারুর

বিখ্যাত সাঁতারু কিফুত

দলে পরিণত হতে পারে যদি অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় আর তাদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সন্তরণ সায়রের ব্যবস্থা থাকে।

* * *

সুপ্রীমকোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে বলেছে যে, জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার ফলে শাসন তান্ত্রিক বিধানের ১৯নং ধারায় যে মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে তা স্থগিত হয়ে রয়েছে এবং ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে আটক কোন ব্যক্তির সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করার অধিকার নাই। যতদিন জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকবে ততদিন সরকারের আইন প্রণয়ন করবার অবাধ ক্ষমতা থাকবে। জরুরী অবস্থা চলাকালীন আইন আদালতে

মৌলিক অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ চলবে না।

ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে আটক শ্রীমোহন চৌধুরী তাকে আটক রাখার আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে হেবিয়াস কর্পাস যে আবেদন

মিঃ ডিন রাস্ক ও মিসেস রাস্ক

করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে উল্লিখিত রায় দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ সংবিধান সংশোধন বিল দু'টি লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যে পাশ করা হয়েছে। প্রথম বিলের দ্বারা হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণ করিবার বয়স ৬০ থেকে ৬২তে বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব হয়েছে। বিলটি এখন রাজ্য বিধানসভা ও সংসদগুলিতে যাবে। যদি অর্ধেক রাজ্য বিধানসভা ও সংসদগুলিতে এই বিলের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরে এই সংশোধন কার্যকরী আইনে পরিণত হবে। এই বিলে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সকল সরকারী কর্মচারীর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাদের প্রথমে অভিযোগগুলি জানাতে হবে, তাদের নিজেদের পক্ষে সাক্ষী সাবুদ ও সওয়াল করবার সুযোগ দিতে হবে এবং যে শাস্তি দেওয়া প্রস্তাবিত হবে সে শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ (যা সাক্ষী সাবুদে দেওয়া হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে) দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় বিল দ্বারা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আইন দ্বারা করবার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। বিলটির অন্য ধারা অনুসারে বিধানসভার ও লোকসভার সমস্ত প্রার্থীকে নির্বাচনের আগে এবং সমস্ত সভ্যকে নির্বাচনের পরে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করবার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে।

কাশ্মীর ঃ

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ কাশ্মীর বিভাগের প্রশ্নটাতে ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান যুদ্ধবিরতি সীমারেখার কিছুটা রদবদল এবং সংশোধনের দ্বারা এই সীমারেখার স্থায়িত্ব খানিকটা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান। কিন্তু তা বলে কাশ্মীর বিভক্ত করা চলবে না এবং তাতে সমস্যার সমাধানও হবে না। কাশ্মীরের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে—কাশ্মীরের অধিবাসীরা এক জাতি। তাদের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা বিভাগ করা চলে, কিন্তু মানুষকে ভাগ করা চলে না। তার মতে পাকিস্তান আসলে কোন সমাধান চায় না, তারা কাশ্মীর সমস্যাটাকে অন্যভাবে ব্যবহারে লাগাতে চায়—ভারতের এই জরুরী অবস্থার সময় চাপ দিয়ে সুবিধা আদায় করবার জন্য। তিনি পাকিস্তানকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, যদি এখন এ সমস্যার সমাধান না হয় তবে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

পাঞ্জাব ঃ

পাঞ্জাব সরকারের সেচ বিভাগ পশ্চিম যমুনার খাল দিয়ে যমুনা নদীতে পর্যাপ্ত জল যাবার ব্যবস্থা করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ফলে ২৫০০ কসেক পর্যন্ত জল প্রত্যেক দিন যমুনা থেকে পানীয় জলের জন্য আহরণ করা যাবে। দিল্লীর নাগরিকগণের পানীয় জলের চাহিদা মিটাতে দরকার মোট দৈনন্দিন ৩২৫ কসেক জল। যদি দিল্লীর পৌরসভা এই অতিরিক্ত জলধারার উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগান তবে এ বৎসর মে-জুন মাসে দিল্লী শহরে জলাভাব হবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পাঞ্জাব সরকার রাজ্যের বিভিন্ন শৈলাবাসগুলিতে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য মাগ্‌গিভাতা দেবার পুনঃ সিদ্ধান্ত করেছেন। কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থারও পরিবর্তন করা হয়েছে। গত তিন বৎসর

ইউ, এন, ধেবর

ধরে কর্মচারীদের প্রতি ৮ মাসে সপ্তাহে ২ দিন করে ছুটী দিবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে নূতন নিয়ম করা হয়েছে যে তার বদলে প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় শনিবার সম্পূর্ণ ছুটী থাকবে।

মোট সপ্তাহে কাজের সময় ১৭০৯ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১৭১২ ঘণ্টা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ ঃ

আচার্য কৃপালনী ও হাফিজ

রাজাগোপালাচারী

মহম্মদ ইব্রাহিমের মধ্যে আমরোহা উপনির্বাচন সম্পর্কে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। আচর্যদেব বিজয়ী অথবা পরাজিত যাই হউন না কেন এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে অবতীর্ণ হলেই একটা উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন এবং জনগণের দৃষ্টি তাঁর উপর আকর্ষণ করাতে সমর্থন হন—যেমন সাধারণ নির্বাচনের সময় বোম্বেতে করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত ইউ, এন, ঢেবরের সভাপতিত্বে Central Advisory Board of Educationএর আগামী বৈঠক ২১শে মে নৈনীতালে বসবে। এ বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আলোচিত হবে—

১। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব,

২। তাদের পারিশ্রমিক,

৩। স্কুলের জন্য উপযুক্ত গৃহ-নির্মাণ।

শিক্ষার প্রসার কোন দেশে কত সেইটে দেশের অগ্রগতির মাপকাঠি। শিক্ষার প্রসার প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। এ সমস্যা সম্বন্ধে নেতৃস্থানীয়রা অবহিত হলে দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

মাদ্রাজ ঃ

ইংরাজী ভাষা আরও ১০ বৎসর চালু রাখবার জন্য যে বিল লোকসভায় পাশ করা হয়েছে, তা নিয়ে অন্যান্য অহিন্দীভাষী দেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেও অসন্তোষ প্রকাশিত হচ্ছে। মাদ্রাজের ডি, এম, কে দল এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবার ভয়ও দেখিয়েছেন। লোকসভায় বিল আলোচনার সময় তাদের সভ্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। উচ্চপরিষদে বিলের আলোচনার সময় তাদের প্রতিনিধি পরিষ্কার বলেছেন যে, তারা সর্বভাবে হিন্দীর প্রসারে বাধা দেবেন।

স্বতন্ত্র নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারীও বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি হিন্দী ভাষার প্রচারটাকে "Hindi Imperialism বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি D. M. K. থেকেও তীব্র ভাষায় বিলের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'একথা বললে ভুল হবে না আমরা হিন্দী বিরোধী। আমরা হিন্দী বিরোধী ও ইংরাজী ভাষার পক্ষপাতী। তিনি হিন্দীর প্রসার বন্ধ করার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পক্ষপাতী। তাঁর প্রচেষ্টাকে তিনি "Crusade against Hindi বলে অভিহিত করেছেন ও বলেছেন, এ প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর ভারতের ভবিষ্যত নির্ভর করবে। ভারত এক থাকবে, কি বিভক্ত হবে।

হিন্দীর প্রসারের বিরুদ্ধে এই যে প্রতিবাদ এটাকে উপহাস বা পরিহাস করাটা নিতান্ত ভুল হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বিরোধীদের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শুনা ও তার প্রতিকার চেষ্টা করা। জোর করে কিছু আরোপ করতে গেলে অধিক-ক্ষেত্রেই ফল বিপরীত হয়।

কোচিন ঃ

গত ২৭শে এপ্রিল ভারত সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের Philips Petrolium Co.র মধ্যে কোচিনে একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপনের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই শোধনাগারের নির্মাণ কার্য আড়াই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে আর এতে ২৫ লক্ষ টন তৈল শোধন করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন এ বৎসর সমুদ্র সৈকত দীঘায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধন বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থার এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভারত-চীন যুদ্ধ-বিরতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দু'দেশের মধ্যে সরাসরি আলাচনা চালাবার জন্য কোন পথ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

শ্রীনেহরুকে দীঘা হইতে বিদায় সম্বধ না জানাইতেছেন
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

আলি সাবরির চীন পরিভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শ্রীআলি সাবরি চীনে গিয়েছিলেন ভারত-চীন বিরোধ মীমাংসার একটা পথ খুঁজতে, তিনি কোন রাস্তাই খুঁজে পান নাই। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবেকে শ্রদ্ধা করেন কিন্তু তাঁর সকল মতের সঙ্গে একমত নন। চীন বিষয়ক তাঁর বক্তৃতাগুলির তিনি বিরোধী। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি, সি, সেনও অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। অধিবেশনে নিরপেক্ষতা নীতি ও সমাজতন্ত্র নীতির সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের Sanfrancisco Chronicle কাগজে কলকাতা ও বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তাতে বিদেশীরা কলকাতাকে কতটা মনোযোগ দিয়ে দেখেন তা বুঝা যায়। প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছে যে, কলকাতা কমনওয়েলথের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, আর এর অধিবাসী-সংখ্যা চার কোটী। এ শহরে একদিকে আছে বিরাট অট্টালিকা গত শতাব্দীর বিলাতী বাড়ীগুলির অনুকরণে, অন্যদিকে আছে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েছেন এমন সব লোক, যাঁরা ভারতের চিন্তাধারায় নেতৃস্থানীয় ও যাঁদের লেখনী সর্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কলকাতার ছাত্র কফি হাউসে যে ধরণের ও বিষয়ের আলোচনা করে তা দিল্লীর উচ্চশিক্ষিত পরিবারে বৈঠকখানায়ও হয় কি না সন্দেহ।

কলকাতায় রয়েছে অবিশ্বাস্য রকম তারতম্য রয়েছে দুঃখ-দুর্দশার চূড়ান্ত ও অপর্যাপ্ত ভোগ বিলাস। ঐশ্বর্যের অধিপতিরা গত শতাব্দীর ইংরেজসৃষ্ট। তারা যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তার একমাত্র তুলনা চলতে পারে Texas-এর (যুক্তরাষ্ট্র) তৈল সম্রাটদের সঙ্গে। আবার তাদেরই পাশে বাস করে অতি দীনদরিদ্র।.....

এ সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই চেষ্টা করছে তার মধ্যে আছে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর এই শহর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপে যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। শহরটাকে বাঁচাবার জন্য

আলি সাবরি

অনেকেই চেষ্টা করছে—তার মধ্যে আছেন ভারতীয়দের সঙ্গে অনেক বিদেশীও।

আন্তর্জাতিক

ট্রিনিটী কলেজ, কেম্ব্রিজ

বৃটেন ঃ

লেবার পার্টির প্রভাব এখন ক্রমশ বৃদ্ধির পথে। প্রায় দশ লক্ষ বেকার আজ ইংলণ্ডের বাতাস ভারী করে তুলেছে। এই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব লেবার পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

পার্টির নতুন নেতা হ্যারল্ড উইলসন বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ হলেও সুযোগের সদ্ব্যবহারে তিনি নিপুণ। তাঁর প্রাক্তন নেতা গেইটস্কেল যতটা রাজনৈতিক ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন দার্শনিক। সেদিক থেকে উইলসনের যাত্রারম্ভ তাঁর দিক থেকে শুভসূচকই বলা চলে।

ম্যাকমিলানের জনপ্রিয়তা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তাঁর পরামর্শদাতাদের মতে তাঁর পক্ষে এখন কোন তরুণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ানই সঙ্গত। ৪৬ বছরের তরুণ হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য রক্ষণশীলদেরও আজ তরুণের সন্ধানে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, ভাবলে অবশ্য অদ্ভুতই মনে হবে। কিন্তু বৃটেনের বর্তমান রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এ দৃশ্যের ইঙ্গিত অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

প্রাক-নির্বাচনী অভিযান হিসাবে রক্ষণশীল দল একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে—শিরোনামা 'জ্ঞাত হওয়ার অধিকার'। তাতে জাতিকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি লেবার পার্টি সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তবে অন্তত চল্লিশটি কোম্পানীকে তারা জাতীয়করণের জাঁতিকলে আট্‌কে ফেলবে। আরও ৬৪টি সাধারণ কোম্পানী এসে পড়বে ঐ আওতায়।

জাতীয়করণের নীতি লেবার পার্টি অনেক আগেই কার্যকরী করেছিল। ১৯৪৫ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারা ইস্পাত-শিল্প ও রাস্তা পরিবহন জাতীয়করণ করতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু রক্ষণশীল দল তা' আবার উল্টে দেয়। লেবার পার্টি ঘোষণা করেছে যে, ক্ষমতায় আসীন হলে তারা ও দুটোকে পুনর্জাতীয়করণ করে নেবে।

ভারতবাসী আজ দেখতে পাচ্ছে ভারতের মতই ইংলণ্ডের অনুন্নত অংশে সরকারী শিল্পায়ন নীতি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

হ্যারল্ড উইলসন ঘোষণা করেছেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারিক ভিত্তিমূলক সমস্ত শিল্পায়নের দায়িত্বই তাঁর সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করবে। কারণ ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিল্পব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বড় বড় কোম্পানীগুলিতে এমন অনেক ডিরেক্টর রয়েছেন অপদার্থ হলেও যাঁদের অর্থবল ও সামাজিক সম্পর্কের জোর অপরিসীম। একাধারে তাঁদের পদচ্যুত করা যেমন অত্যাবশ্যক অপর পক্ষে তেমনি তাঁদের জায়গায় তরুণ, কর্মঠ ও উদ্যমশীল ডিরেক্টর নিয়োগ করা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের শিল্পরাজ্যে এরকম লোকের হাতেই থাকবে উৎপাদন, পরিকল্পনা ও বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতিরোধহীন দায়িত্ব।

হ্যারল্ড উইলসন পশ্চিম জার্মানীতেও এক ঝড়ের সূত্রপাত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, লেবার পার্টি পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে পূর্ব জার্মানীর সীমান্তরেখা স্বীকার করে নেবে। তাঁর মতে বার্লিন সমস্যার এই সর্তে সমাধান হ'তে পারে যদি পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীদের জীবনধারা অব্যাহত

হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

রাখা হয় ও বার্লিন প্রবেশের অবাধ অধিকার স্বীকার করে' নেওয়া হয়। পূর্ব-জার্মানীকে কার্যত স্বীকৃতি দিচ্ছেন হ্যারল্ড উইলসন, এ ব্যাখ্যাই পশ্চিম জার্মানীতে প্রচারিত হচ্ছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় দপ্তরে উইলসনের এই ঘোষণায় এ পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অনেকে মনে করছেন যে, উইলসন যদি পূর্ব-জার্মানীকে বাস্তব সত্তায় স্বীকার করে নেওয়ার পথে আরও অগ্রসর হতে চায় তবে আমেরিকা তা সমর্থন করবে এবং রাষ্ট্রীয় দপ্তরের বর্তমান মনোভাব তারই পূর্ব ভূমিকা।

ফ্রান্স ঃ

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে জেনারেল দ্য গলের নির্বাধ জয়োল্লাসের রথচক্র এই সর্বপ্রথম পরাজয়ের বাধায় থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল, ফ্রান্সের অগণিত কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতিরোধ ব্যূহের সম্মুখে। এক-মাসেরও ওপর তারা ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছিল। দ্য গল মনে করেছিলেন অল্পায়াসেই ধর্মঘটীদের কোমর ভেঙে দেবেন তিনি, আর তাঁর জনৈক মন্ত্রী মিসোফি, ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন যে ফ্রান্সে আজ রাজনৈতিক দলগুলির যে দুর্দশা হয়েছে কয়লা-খনির ইউনিয়নগুলিও শীঘ্রই সে অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিপরীত। খনি মজুরদের মজুরী হার ৬½ শতাংশ তো বেড়েছেই, তা আরও বেড়ে আগামী এপ্রিল মাসে ১২½ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। ফ্রান্সের জনমত নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটুশনের মতে এ বছরের এপ্রিল মাসে দ্য গলের কার্যাবলীর সমর্থনে ৪২ শতাংশের বেশী লোক নেই; আনুপাতিক হারে মার্চ মাসে এই সংখ্যা ছিল ৫৫ শতাংশ আর জানুয়ারীতে ৬৪ শতাংশ।

ফ্রান্সের অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরাও কয়লাখনির কর্মীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। দ্য গল আজ সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কয়লা শ্রমিকদের এই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায় হ'ল বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাস্তব সমর্থন। তারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য ২০ হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিল আর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত নয় বৃটেনের এমন আরও অনেকগুলি সংস্থার তরফ থেকেও সাহায্য এসেছিল প্রচুর।

দ্য গলের সমর্থকরা অবশ্য মনে করেন যে, এই সাহায্যের পেছনে একটা

হ্যারল্ড উইলসন

প্রতিশোধাত্মক মনোভাব রয়েছে। ফ্রান্স ইংলণ্ডকে ইয়োরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশ করতে দেয় নি বলেই নানাসূত্রে ইংলণ্ড থেকে ধর্মঘটীদের

দ্য গল

সমর্থনে এই সাহায্য এসে পৌঁছেছিল।

প্যারিস থেকে এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। দি লংগেষ্ট ডে পুস্তকের প্রখ্যাত লেখক মিঃ কর্ণেলিয়াস রায়ান সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হিটলারের তৃতীয় একখানি উইলের সন্ধান পেয়েছেন। এই উইলে হিটলার নাকি লিখে রেখে গেছেন, "আমি আমার প্রিয় বান্ধবী ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিয়াছি।" উইলের পূর্ণ বয়ান কিন্তু রায়ান পান নি, কারণ উইলখানি আছে রুশ সেনাপতি মার্শাল ভ্যাসিলি চুইকভ-এর কাছে। ১৯৪৫-এ জার্মান বাহিনী তাঁরই হাতে বার্লিন সমর্পণ করেন। চুইকভ নিজেই একখানা বই লিখছেন —তাই তাৎপর্যপূর্ণ এই দলিলখানির শুধু শুরুটাই তিনি মিঃ রায়ানকে দেখিয়েছেন। হিটলারের প্রথম উইল-খানি রাজনীতিক, দ্বিতীয়খানি ব্যক্তি-গত। তৃতীয়খানির পূর্ণ রহস্য অবশ্য উদ্‌ঘাটিত হবে চুইকভের বইখানি প্রকাশিত হলে। কিন্তু যেটুকু প্রকাশিত হ'ল তাই কি কম চমকপ্রদ?

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ঃ

ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক স্থির করেছিলেন যে, অটোয়াতে ন্যাটোর যে বৈঠক এ মাসে হবে তাতে তাঁরা এক যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করে জানিয়ে দেবেন যে অতঃপর মিত্রশক্তির পক্ষে আণবিক-শক্তি যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন

আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। কিন্তু স্থ গল এবারেও তাঁর বন্ধুদের হতাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: আণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে মার্কিন সরকারই একাধিপত্য করছেন। কাজেই ফ্রান্স বা ইংলণ্ড যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের আণবিক অস্ত্রসজ্জা গড়ে তুলতে পারছে ততদিন এই যৌথ-নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব শুধু কাগজে কলমেই থাকবে কর্তৃত্ব আমেরিকার হাতেই থেকে যাবে। প্যারিসের কোন কোন মহল মনে করেন যে, এ এক ভাঁওতা। মস্কো-ওয়াশিংটন—এ বিষয়ে এক গোপন বোঝা-পড়া করেছে বলে বিশ্বাস। তাই আমেরিকা দেখাতে চায় যে, আণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে আমেরিকার সব প্রস্তুতির পেছনে রয়েছে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের সহযোগিতা। এ ব্যাপারে তারা অংশীদার। প্রকৃত-পক্ষে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ টাকা যোগাবে, অংশীদার হিসাবে গণ্যও হবে, কিন্তু আসল কর্তৃত্বে আমেরিকারই একচেটিয়া অধিকার থাকবে।

স্থ গলের এই মনোভাবে মিঃ ম্যাকমিলান ও মিঃ কেনেডি সম্ভবত খুবই বিব্রত বোধ করবেন। পশ্চিমী আণবিক জোটে স্থ গলের সমর্থন পাবার আশায় তাঁরা পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত ফরাসী ফৌজের হাতে আণবিক অস্ত্র তুলে দিয়েছেন—আরও অনেক সুযোগ সুবিধাও ফরাসী সরকারকে তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু স্থ গলের এই মনোভাব কিছুতেই পরিবর্তন তাঁরা করতে পারবেন না। ফ্রান্স তার নিজস্ব আণবিক সমর সম্ভার তৈরী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র:

নিউ জার্সির হাওয়েল নামক ক্ষুদ্র শহরে একটি তিব্বতী বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়েছে। মঠের নামকরণ করেছেন দলাই লামা স্বয়ং—ল্যাগসাম শেডরাব লিঙ্। ল্যাগসামের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান, দুঃখ এবং তপস্যা। শেডরাবের অর্থ আধ্যাত্মিক শিক্ষা আর লিঙ্ হচ্ছে মঠ। ১৯৫৮ সালে শ্রদ্ধেয় গিসে ওয়াঙ্গিয়াল কর্তৃক মঠটি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে যে চারজন তিব্বতী সন্ন্যাসী

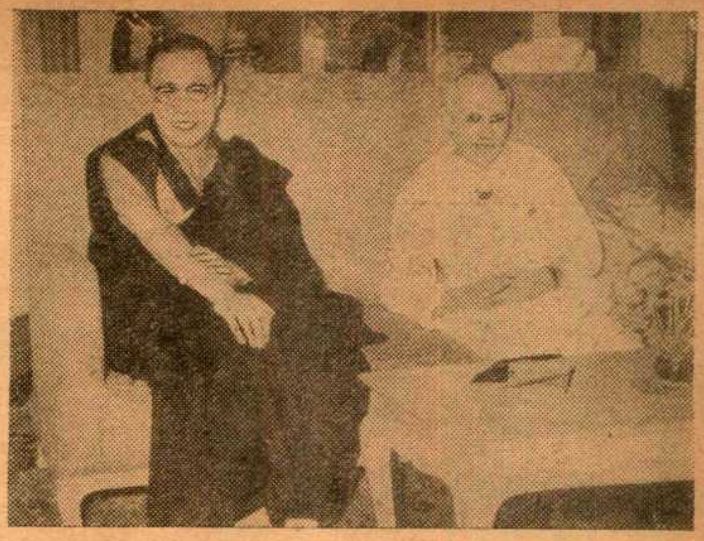

নেহরু ও দলাই লামা

দলাই লামার সঙ্গে ভারতে চলে এসেছিলেন তাঁরাই বর্তমানে ঐ মঠে অধ্যয়ন করছেন তাঁদের ভেতর যিনি সর্বকনিষ্ঠ—সেরমে তেনজিন তিনলে, তিনি ভাল ইংরেজী জানেন বলে হয়েছেন এঁদের মুখপাত্র।

আমেরিকানদের কাছে তিনি বলেছেন যে, যখন তাঁরা তিব্বত থেকে পালিয়ে আসেন তখন লাসা থেকে তাওয়াঙ্ পর্যন্ত সাড়ে তিনশো মাইল তাঁদের পায়ে হেঁটে আর ঘোড়ায় চড়ে আসতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ শিশু মিলে প্রায় এক হাজার উদ্বাস্তু ঐ ভাবে চলে এসেছে। তিব্বতে চীনাদের অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণের কথা বলতে বলতে তাঁদের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে।

আমেরিকার এই অংশে এই মঠটি আজ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

* * *

আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ইয়েল। এখানকার ভারতীয় শিক্ষার্থীরা একটি তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। এলিহু ইয়েল,—ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৭ সালে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই তৈল-চিত্রটি উপহার হিসাবে তদানীন্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের নিকট পাঠিয়েছিলেন

অনেকে শুনে হয়ত—আশ্চর্য বোধ করবেন যে, এই বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ভারতীয় অর্থ ও মসলিন।

আমেরিকার কনেকটিকাটে ১৬৪৮ সালে এলিহু ইয়েলের জন্ম। প্রথম জীবনের প্রায় বিশটি বছর তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ ফোর্টে অতিবাহিত করেছিলেন। ১৬৭২ সালে তিনি কোম্পানীতে যোগ দেন। ১৬৮৭ সাল থেকে ১৬৯২ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের শাসনকর্তা ছিলেন। কোম্পানীতে চাকুরী করা কালীন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে তিনি যে ধন-সম্পদের অধিকারী হন, তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল।

অন্যতম ভারতীয় নবাব বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি দানধ্যানের ব্যাপারেও ছিলেন 'নবাব'। সে সময়ে বিলেতী কাপড়ের আমদানীর জন্য যে সমস্ত ভারতীয় তন্তুবায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন।

তাঁর জন্মভূমি কনেক্টিকাটের সেব্রুক শহরে ইংলণ্ডের পিউরিটান ঔপনিবেশিকরা ১৭০১ সালে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজ লেখকদের চাঁদায় তারা ক্ষুদ্র একটি লাইব্রেরীও স্থাপন করে। দাতাদের

তালিকায় স্যার আইজাক নিউটন ও স্যার এডমণ্ড ষ্টীল প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম রয়েছে। ১৭১৫ সালে কলেজের ট্রাষ্টীরা কলেজের জন্য একটি নিজস্ব ভবন প্রস্তুত করতে অগ্রসর হয়ে

কেনেডি

৫০০ শত ডলারের বেশী সংগ্রহ করতে পারলেন না।

এলিহু ইয়েল তখন লণ্ডনে। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে ট্রাষ্টীগণ বললেন, আপনার টাকায় আপনার নামেই কলেজটি হবে ইয়েল কলেজ। আপনার নামকে অমর করে হয়ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হবে ভবিষ্যতের কোন একদিন এবং 'তা' সত্যি একদিন মিশরের পিরামিডের চেয়েও হবে সম্পদ-সমৃদ্ধ।'

আবেদনে সাড়া দিলেন এলিহু ইয়েল। পাঠিয়ে দিলেন নয় বেল উৎকৃষ্ট ঢাকাই মসলিন। আমেরিকায় মসলিনের তখন প্রচুর খ্যাতি। বেষ্টনের সদাগররা অবিশ্বাস্য মূল্যে সেই মসলিন কিনে নিল। ৬০০ পাউণ্ড প্রায় ৯০০০ টাকা। বর্তমানের প্রায় ১ লক্ষ টাকার সমান। সেই টাকায় তৈরী হ'ল কলেজ ভবন, ১৭৮৮ সালে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর নামকরণ করা হ'ল ইয়েল কলেজ।

পরবর্তী কালে ক্রমশ বড় হতে হতে আজ ইয়েল কলেজ পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ইয়েল আজ হারভার্ডের সমকক্ষ। আমেরিকার অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি ইয়েল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সফলতা অর্জন করেছেন এবং আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কেনেডিও তাঁদের ভেতর অন্যতম। কলেজের ট্রাষ্টীগণ সেদিন সত্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়েলের নাম 'পিরামিডের চেয়ে হবে সম্পদ সমৃদ্ধ।' ভারতের পক্ষেও আনন্দিত হওয়ার কথা যে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় মসলিনের টাকায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিল।

* * *

গত ২৪শে এপ্রিলের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার ব্যাপারে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। শীর্ষ সম্মেলনের কোন সম্ভাবনার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন, কারণ রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা ও বৃটেনের নীতিগত মিল না হওয়া পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলন নিরর্থক। তিনি প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকা ও বৃটেনের রাষ্ট্রদূতগণ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে দেখা করে যাতে সর্বসম্মত পন্থায় এই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা যায় তার চেষ্টা করছেন।

কিউবা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন, নির্বাসিত কিউবা সরকারের পক্ষে কিউবার অবস্থায় বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয় আর তাদের কার্যকরী কোন সরকার গঠন করার ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ।

ফ্রান্সের সঙ্গে মতদ্বৈধতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে' তাঁর ধারণা এবং বলেছেন যে, দ্য গলের এবার আমেরিকায় পদার্পণ করা সমীচীন। এখানে তাঁর সমাদরের অভাব হবে না। যদিও গতবছর একবার তিনি ফ্রান্স ঘুরে এসেছেন তবু প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি পুনরায় ফ্রান্সে যেতে প্রস্তুত।

ভারতের জন্য মনোনীত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌স গত ২৫শে এপ্রিল টেক্সাসে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কতগুলো দেশে আমেরিকার সাহায্য কি রকম সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করা হয়েছে ভারত তারই এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রদূত হিসাবে যখন তিনি ভারত ত্যাগ করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয় ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আর খাদ্যশস্যের হার ৫৬ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে সেখানে ১ শত কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হ'ত আজ পনের বছরে তা' প্রায় অবলুপ্তির পথে। গড়পড়তা আয়ু বেড়েছে ২৭ থেকে ৪২ বছরে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যেখানে ভারতের ১০ শতাংশ লোককে 'শিক্ষিত' বলা চলত আজ সেখানে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীর হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশে। ভারতীয় শিল্প প্রতি বছর ১০ শতাংশ অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে এবং একনায়কত্ব কায়েম না করেই এই উন্নতির পথে ভারতের অগ্রগতি নিশ্চয় প্রণিধান-যোগ্য।

চেষ্টার বোল্‌স

তিনি বলেছেন যে, ভারতের এই প্রাগ্রসরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গণতন্ত্রী ভারতের শক্তিই এশিয়াতে লাল চীনের সম্প্রসারণের পথে সমতা এনে দিতে সক্ষম হবে।

উপরন্তু গণতন্ত্রী ভারতের সাফল্য এই নির্দেশই দিচ্ছে যে এটা নিছক পাশ্চাত্য ধরণের একটা বিলাসমাত্র নয়, এটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার।

আগামী ১৫ই জুলাই তিনি ভারতে এসে রাষ্ট্রদূতের কার্যভার গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্তমান রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথ সম্ভবত ১০ই জুলাই আমেরিকার পথে রওনা হয়ে যাবেন।

বারাণসীর ডিজেল লোকোমটিভ ওয়ার্কসের তিনজন বিশিষ্ট দায়িত্বশীল অফিসার,—লোকোমটিভ শপের ওয়ার্কস ম্যানেজার জি, এস, কাউগ, ডিজেল ইঞ্জিন শপের ওয়ার্কস ম্যানেজার ভি কে লারোসিয়া। বৈদ্যুতিক বিভাগের ওয়ার্কস ম্যানেজার জি পি ডোডিগা ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় পৌঁছেছেন। এখানকার আল্‌কো প্রোডাক্টস্ কারখানায় এরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই গত বছর ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, এদের শিক্ষার ব্যয়ভার সমস্তটাই বহন করবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার! কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক গলব্রেথ ঘোষণা করেছেন যে, বারাণসী কারখানার জন্য আমেরিকার আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক ৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

অনুমান করা হয়েছে যে, আগামী ১০ বৎসরে বারাণসী কারখানায় বাৎসরিক ২৫০টি ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের তুলনায় এগুলির গতি যেমন অনেক বেশী, ভারবহন ক্ষমতাও তদনুরূপ। দক্ষিণের কোচিন থেকে উত্তরে পাঠানকোট পর্যন্ত কোথাও না থেমে এই ইঞ্জিন একদমে চলে যেতে পারবে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পক্ষে যা অসম্ভব।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

ক্রেমলিনে রাশিয়ান ফেডারেশনের এক কর্মী সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে, ৬৯ বছর বয়সের পরেও তিনি চিরকাল শাসনের জোয়াল কাঁধে রেখে চলবেন এটা ভাবা নিশ্চয় সমীচীন নয়। স্মরণ রাখা সঙ্গত যে, তিনি দশ বছর রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক ও পাঁচ বছর যাবৎ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গুরু দায়িত্বের বোঝা বহন করে আসছেন। অধিকন্তু, বলেছেন তিনি, সর্বসময়ের জন্য তাঁর পক্ষে আর গভর্ণমেণ্ট ও পার্টির দ্বৈত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

ক্রুশ্চেভ

ক্রুশ্চেভের অবসর গ্রহণের গুজবের পুনরাবির্ভাবের এও একটা কারণ।

কিউবার প্রধানমন্ত্রী কাষ্ট্রো এখন সোভিয়েট রাশিয়ায়। এই সর্বপ্রথম তিনি আতলান্তিক পাড়ি দিলেন। রাশিয়ার মেরু-বন্দর মুরমান্‌স্কে সোভিয়েট ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মিকোয়ান তাঁকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মস্কোর রেড স্কোয়ারে তাঁর যে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল তা প্রায় রাজকীয়। ক্রুশ্চেভের সঙ্গে যখন তিনি লেনিন মসোলিয়ামে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপুল জনতা তখন তাঁকে উচ্ছ্বসিত স্বাগতধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করেছিল।

কাষ্ট্রোর অভ্যর্থনা উপলক্ষে ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি কিউবার জনগণকে বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট। কিন্তু কিউবার জনগণ নিঃসঙ্গ নয়; তাদের পেছনে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমষ্টি।

ফিডেল কাষ্ট্রো তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মকৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, রাশিয়া ও কিউবার মৈত্রী বন্ধনের ভিত্তি হ'ল বিপ্লব। কিন্তু যখন তিনি বললেন যে, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম্ এবং আন্তর্জাতিক মজদুর রাজই বিশ্বমানবের একমাত্র ভবিষ্যৎ, তখন বিশ্ববাসী অন্যান্য অনেকে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারে নি।

আদ্দিস আবাবা ঃ

আগামী ২২শে মে আদ্দিস আবাবা আফ্রিকান রাজ্যগুলির এক ঐতিহাসিক সম্মেলন হচ্ছে। সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছে, "শীর্ষ সম্মেলন"। ৭২ বৎসর বয়স্ক সম্রাট হাইলে সেলাসী প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম—অতিথি আপ্যায়নের ভারও নিয়েছেন তিনি। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবদমান আফ্রিকান রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপন। প্রায় ৩০টি রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। উদ্যোক্তাদের সকলেই একটি বিষয়ে একমত -তা' হচ্ছে জোট নিরপেক্ষতা। পৃথিবীর বৃহৎ দুই শক্তি শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আফ্রিকার কোন রাজ্যই অংশগ্রহণ

হাইলে সেলাসী

করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। তা' করতে হলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতৈক্য ঘটানো ও পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা দরকার। সম্মেলনের কর্তারা আশা করেন যে, তা' তাঁরা পারবেন।

কায়রো ঃ

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আরব যুক্ত প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান আলি সাবরি প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার পর দেশে ফিরে শ্রীমতী বন্দরনায়কের কাছে এক পত্র লিখেছেন। তাতে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, কলম্বো প্রস্তাব যাতে চীন পুরাপুরি গ্রহণ করে—কলম্বো প্রস্তাবের প্রণেতারা সে প্রয়াস চালিয়েই যাবেন। খবরে আরও বলা হয়েছে, দিল্লী ও পিকিঙে আলোচনার মর্মার্থ প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত অপর পাঁচ রাজ্যের কাছে মিঃ সাবরি জ্ঞাপন করেছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে, মিঃ সাবরি কোন নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি ; মূল কলম্বো প্রস্তাব চীন যাতে মেনে নেয় তার জন্য কূটনীতিক চাপ সৃষ্টির কথাই তিনি বলেছেন। এই মহল আরও বলেছেন যে, চীন কলম্বো প্রস্তাবের নিজস্ব ভাষ্যই আঁকড়ে বসে আছে। পিকিঙে আলাপ-আলোচনার সময়েও তার মত পরিবর্তনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই।

এ মাসের গোড়ার দিকে সিরিয়ায় নাসের-পন্থী ছয়জন মন্ত্রী পদত্যাগ করবার পর থেকে সিরিয়ার অবস্থা রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বাথ সোসালিষ্ট পার্টি ও নাসেরপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধের ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। গত ৮ই মে আলেপ্পো শহরে নাসেরপন্থীরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ফলে দুই তরফে গুলী বিনিময় হয়। আলেপ্পোতে ও দামাস্কাসে কার্ফু জারী করা হয়েছে। ন্যাশানাল রিভোলিউশন কাউন্সিল আজ কায়রোয় গিয়েছেন পরামর্শ নেবার জন্য। দামাস্কাস রেডিও ঘোষণা করেছেন যে, রিভোলিউশান কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল এবং সরকারী প্রতিনিধিদলও বাগদাদে যাচ্ছেন ইরাকী সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে।

নীলনদে লঞ্চডুবির ফলে প্রায় ১৮৫ জন মুসলমান তীর্থযাত্রী জলমগ্ন হয়েছেন বলে কায়রো থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে। মুশ্লিম উৎসব কোরবান বৈরাম পর্ব উপলক্ষে এঁরা কায়রো গ্রামে আত্মীয় পরিজনদের কবর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। স্থানীয় পুলিশ গ্রামে গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিয়ে নিরূপণ করবার চেষ্টা করছে যে, নিহতের সংখ্যা কত। আজ ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। মাঘাঘা বন্দরের জেটীতে বোরুন্তমান জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উদ্ধারকার্য পরিদর্শন করছিল। কিন্তু কাউকেই জীবন্ত উদ্ধার করা যায় নি।

লাওস ঃ

লাওস সঙ্কটের সুরাহা হওয়া দূরে থাক ক্রমশই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন এপ্রিল মাসের শেষ দিকে জারস উপত্যকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টপন্থীরা সেখানে তাঁদের উপস্থিতি অনুমোদন করেন নি। ফলে কমিশন-এর অন্যতম সদস্য পোল্যাণ্ড সেখানে পরিদর্শক পাঠাতে অস্বীকৃত হন। লাওসের বামপন্থী নেতা প্রিন্স সুভানোভং জারস উপত্যকা থেকে নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য দাবী জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমার কাছে লিখিত এক পত্রে এই দাবী জানানো হয়েছে। লাওসের রাজধানীতে

নীলনদে লঞ্চডুবির পর উদ্ধারকারীদলকে মৃতদেহ তুলে আনতে দেখা যাচ্ছে

নির্দলীয় ও প্যাথেট লাও নেতাদের যে বৈঠকের প্রস্তাব প্রিন্স সুভান্না ফুমা করেছেন প্রিন্স সুভানো ভং তা গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তিনি জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে লিপি-

প্রিন্স সুভান্না ফুমা

যোগে জানিয়েছেন যে, জারস উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মী মোতায়েন জেনেভা সম্মেলন প্রস্তাবের পরিপন্থী। তিনি নাকি আরও বলেছেন যে, শান্তি পুনঃ স্থাপনের আর যদি কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে আবার জেনেভা সম্মেলন ডাকা হোক।

সিংহল ঃ

সিংহলী সরকার সিংহলে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষকে নাগরিক অথচ অ-নাগরিক হিসাবে নাম রেজেষ্ট্রী করার যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিল সম্প্রতি তা' প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সিংহলী তামিল বা মুসলমান যদি অনবধানতাবশত অ-নাগরিক হিসাবে রেজেষ্ট্রীতে লিপিবদ্ধ হয়ে যেত, তবে তাতে গুরুতর গোলমাল আরম্ভ হ'তে পারত।

সিংহলী পার্লামেন্টে পূর্বে যে আইন পাশ করার পরিকল্পনা ছিল তাতে এই বিধানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, নাগরিকত্ব নিরপেক্ষ প্রত্যেকটি সিংহলবাসীকে নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত করাতে হবে। আপাতত এগুলি বন্ধ রইল।

নেপাল ঃ

নেপালের বহু বিজ্ঞাপিত পূর্ব-পশ্চিমাংশ সংযোগকারী পথ নির্মাণ-পর্ব আরম্ভ হয়ে গেছে। এই রাস্তার গতিপথ পূর্বে মেচি থেকে সুরু হয়ে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পশ্চিমে মহাকাশী পর্যন্ত বিস্তৃত। পথটি তার গতি পথে নেপালের অন্তর্গত দক্ষিণ প্রান্তের প্রায় সব ক'টি শহর ও ব্যবসার কেন্দ্রকেই স্পর্শ করে যাবে।

এ যাবৎ নেপালের পূর্ব থেকে পশ্চিমাংশে যেতে হলে ভারতভূমির মধ্য দিয়ে প্রায় সম পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে হ'ত। নেপালের এই রাস্তার দৈর্ঘ হবে ৬ শত মাইল। তার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২২৩ মাইল রাস্তা তৈরী হয়েছে। এর ওপর দিয়ে এখন শুধু জিপগাড়ী চলাচল করতে পারে। বড় গাড়ী নয়। অবশিষ্ট ৩৭৭ মাইলের মধ্যে ২৩২ মাইল রাস্তার পত্তন আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই নেপাল এই রাস্তা তৈরীর কাজে হাত দিয়েছে। অনেকের মনে অবশ্য সংশয় রয়েছে এমন পর্বতাকীর্ণ কঠিন কাজের উপযোগী দক্ষ কারিগর ও প্রয়োজনীয় প্রচুর রসদাদি সময় মত সংগ্রহ করা নেপালের পক্ষে সম্ভব হবে কি না। গত ২৬শে এপ্রিল নেপালের সর্বোচ্চ আইনসংস্থা জাতীয় পঞ্চায়েতের এক অধিবেশনে কোন কোন সদস্য এই দাবী উত্থাপন করেছিল যে, নেপালের নাগরিকদের বৈদেশিক সামরিক বাহিনীতে যোগদান বন্ধ করা হোক। বর্তমানে নেপাল সরকারের সঙ্গে চুক্তিক্রমে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীতে গুর্খা সৈন্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ এই অভিযোগ করেছিল যে, নেপালের অর্থনীতির উপর ভারতের চাপ অত্যন্ত প্রবল।

সম্প্রতি এক নতুন আইন পাশ করে নেপালে এযাবৎ প্রচলিত ব্রাহ্মণদের কোন অপরাধে প্রাণদণ্ড না দেবার রীতি রহিত করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড আইনের ক্ষমতার বাইরে ছিল বলে নেপালে যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের এঁরাই ছিলেন পুরোধা।

নতুন আইন আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু হবে নেপালে। এখন থেকে আইনের চোখে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান হয়ে যাবে। বহু বিবাহও বাতিল করে' দেওয়া হয়েছে। এতকাল অসবর্ণ-বিবাহ আইনের চোখে নিষিদ্ধ ছিল, সে নিষেধও আর বলবৎ থাকবে না।

রাজা মহেন্দ্র তাঁর প্রিয় অনুচর ডাঃ তুলসী গিরিকে মন্ত্রিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান করেছেন। ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে' ডাঃ গিরির সুনাম আছে। উৎকট ভারতবিরোধী বলে যে ব্যক্তিটি এতকাল নেপালে খুব হৈ চৈ করে এসেছে, সেই বিশ্ববন্ধু থাপা এখন আর কেবিনেটে নেই।

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে রাজা মহেন্দ্র নাকি প্রাক্তন মন্ত্রী এস, পি, উপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি, পি, কৈরালার সঙ্গে একটা আপোষ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। কৈরালা এখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই আছেন। খবর এসেছে, কাঠমুণ্ডু-লাসা সড়কের নির্মাণপর্ব এখন সমাপ্তির পথে। নেপালের সীমান্ত থেকে কাঠমুণ্ডু পর্যন্ত ৩৫ মাইল রাস্তা কে তৈরী করবে, চীন না নেপাল, তা নিয়ে কাঠমুণ্ডু আর পিকিং-এর মাঝে কিঞ্চিৎ বিতণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র সমস্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করে চীনের হাতেই এই অংশ নির্মাণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে নেপালের অভ্যন্তরে অসংখ্য চীনা আজ কারিগর কিম্বা পক্ষীপালকের ছদ্মবেশে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেপালী সৈন্যবাহিনীর যে সব অফিসার চীনবিরোধী ছিল, তাদের নাকি অপসারিত করা হয়েছে। দার্জিলিং শিলিগুড়ি সীমান্তের নেপালী তরাই অঞ্চলে পাকিস্তানকে একটি আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করার অনুমতি দেবেন রাজা মহেন্দ্র যাতে করাচী থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে পাকিস্তানী বিমান সেখানে অবতরণ করার সুবিধা পায়। ভারতের অভ্যন্তর সীমায় পাকিস্তান ও চীনকে নেপাল যেভাবে অগ্রসম্প্রসারণের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, ভারত সরকার যে তাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হবে তা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গ দর্শন

প্রকৃতির মারের উপর কারও হাত নেই। গত কয়মাস ধরে প্রায় বাংলার উপর প্রকৃতির নিষ্ঠুর লীলা চলেছে অব্যাহত গতিতে। প্রথমে অনাবৃষ্টি খাল বিল নালা সব শুকনো খটখাট। হ'ল অজন্মা। একবার নয়—পর পর তিন বৎসর। অজন্মার স্বাভাবিক পরিণতি আকাল—অন্নের জন্য হাহাকার। তাই পশ্চিম বাংলার শস্য ভাণ্ডার সুন্দরবন থেকে সুরু করে আকালের দেশ পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার সর্বত্রই এক অবস্থা। চালের দর বাড়তে লাগলো হু হু করে। এক ধরণের ব্যবসায়ী, যাঁরা চিরদিনই দেশের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে থাকেন, তাঁরা স্বাভাবিক অভাবকে নিজেদের মুনাফার অঙ্ক বাড়ানোর কাজে লাগাতে চেষ্টার কসুর করলেন না। ফলে ২০৲ টাকা মণ থেকে চালের দর লাফিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে। প্রতি বৎসর চাষীর চাল ওঠার পর অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দাম কমের দিকে থাকে। এবার হ'ল তার ব্যতিক্রম।

গ্রামের চাল আর বাইরে থেকে ঘাট্‌তি পূরণের জন্য যে চাল আসে তা দিয়ে চলে কোলকাতা ও শহরতলীর মানুষের অন্নের সংস্থান। এবারে গ্রামের অবস্থা খারাপ, পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যাও আর আগের মত সরবরাহ করতে পারছে না। তাই কোলকাতার চাহিদা মেটাতে সরকার হিমসিম। ওদিকে ভাল দরের আশায় গ্রামের চালও শহরে আসতে লাগলো। পরিণতিতে গ্রাম আর শহরের হাল হ'ল একই।

নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের দামও সমান তালে বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলার সর্বত্র একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ওদিকে উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বালুর ঘাট, অন্যদিকে মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া সব জায়গায় সমান অভাব। চালের দরের পার্থক্য মাত্র উনিশ বিশ। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না, অর্থাভাবে জমি-জিরেত বিক্রী, টেষ্ট-রিলিফ আর খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভর—সমগ্র পশ্চিম বাংলায় এই একই ছবি। অনাহারে মৃত্যুর-ও সংবাদ আসছে দু'একটি করে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সংবাদে চব্বিশ পরগণা জেলায় দু'জন অনাহারে মারা গিয়েছে বলে জানা গেছে। ওদিকে পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ তো সাংবাদিক সম্মেলনেই অভিযোগ করেছেন, একমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই গত দু'মাসে বারোজনের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলে, মুখ্যমন্ত্রী অবস্থার গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে নি। তিনি সকলকে আলু আর গম খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আরও সতর্কবাণী করেছেন, খাওয়ার অভ্যাস না বদলালে অবস্থা আমাদের কোনদিনই বদলাবে না। পশ্চিমবঙ্গের যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গের চালের অভাব ঘুচবে না।

মে মাসের গোড়াতেই এই অবস্থা —জুলাই-আগষ্টে কি হবে ভেবে লোকের চোখে ঘুম নেই।

প্রকৃতির দ্বিতীয় মার সুরু হয়েছে বৈশাখের গোড়ার দিক থেকে। কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলা পশ্চিম বাংলার অভাবী মানুষের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে ফেলছে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে ঘূর্ণি-বাত্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা যে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে বিভীষিকার মত। ওখানকার কয়েক সহস্র মানুষ আজ সর্বস্বান্ত।

এ ছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিনই ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবের খবর আসছে। একমাত্র গত সপ্তাহে বজ্রপাতে চব্বিশ পরগণা জেলার ক্যানিং-এ ৩ জন আর বীরভূমের গ্রামে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ

আগুনছোঁয়া দর তবু বাঁচতে হবে তো।

মুরারিশা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে নিঃস্ব হয়েছে কমপক্ষে দু'হাজার মানুষ। গত সপ্তাহে ক্যানিং ও বাসন্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত বিস্তারিত সংবাদ জানা না গেলেও যেটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বাসন্তী থানায়। শিলাবৃষ্টির তাড়নায় কলিকাতাগামী একখানা ট্রেন পর্যন্ত ঘুটিয়ারীশরিফে আটক পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। একপোয়া হতে সুরু করে পাঁচপোয়া ওজনের শিলা অজস্রধারায় পড়ে অনেক গবাদি পশুর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। ক্ষেতের রবিশস্য সমূলে নষ্ট হয়েছে।

হুগলী জেলার ধনিয়াখালীতেও ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবের খবর পাওয়া গিয়েছে। নদীয়া জেলার বাদকুল্লা অঞ্চল থেকেও এই সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টির সংবাদ এসেছে।

একবেলা খেয়েও লোক বেঁচে থাকে, ঝড়ে সর্বস্বান্ত হয়েও ভবিষ্যতের নূতন ঘর বাঁধার আশায় মানুষ বুক বাঁধে, কিন্তু মহামারীতে যখন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায় তখন সান্ত্বনা দেবার আর কিছু থাকে না মহামারী আকারে কলেরা শুধু কোলকাতার মানুষের মনেই আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যাপক অঞ্চলে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলার কোন কোন অংশেও কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিরোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কলেরার প্রকোপ কমছে না। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাবেই কলেরার প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে বলে সরকারী মহল মনে করেন। ঝড় আর অনাবৃষ্টির উপর সাধারণ মানুষের হাত নাই কিন্তু কলেরাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুললেই মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে সরকারী মহল মনে করেন।

জলপাইগুড়ি ঃ

জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা রেল ষ্টেশনের কাছে ৩০০ ডিনামাইট, ৫০০ ডিটনেটার এবং একশত ফিউজ তার পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ ষ্টেশন থেকে কয়েক গজ দূরে মাঠের মধ্য থেকে এই মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি উদ্ধার করে। কোন কোন মহল সন্দেহ করেন নাশকতামূলক কার্যের সঙ্গে এগুলির সংযোগ থাকতে পারে। এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ঃ

নদীতে বিষ মেশানোর অভিযোগে আগরতলার ফরেষ্টার একশত লোকের একটি দলকে গ্রেপ্তার করে। প্রতি বৎসরই নাকি এভাবে জলে বিষ মিশিয়ে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

আগরতলা থেকে আর একটি খবরে জানা গেল একটি তরুণী স্নান করার সময়ে গভীর জলে চলে গেলে তার পালিত একটি হরিণী জলে নেমে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তরুণীর চীৎকার শুনে অনেকেই পুকুরের পাড়ে এসে ঘটনাটি দেখে অবাক হয়ে যায়।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ

বালুরঘাটে জনবহুল রাজপথ চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটি জুয়েলারী দোকান, মশলাপাতির দোকানে এবং হিলি রোডের একটি জুয়েলারী দোকান, চা মিষ্টির দোকানে পরিণত হয়েছে।

বালুরঘাটে চাল, তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতির দাম অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। শহরে চালের দাম ৩০৲ টাকা, মাছের দাম কিলো প্রতি সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা।

চব্বিশ পরগণা ঃ

বিভিন্ন এলাকায় কলেরার প্রকোপ বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ টিকা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না। সম্প্রতি খড়দহ পৌর এলাকায় জনকল্যাণ সমিতি কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিরোধে নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা টি-এ-বি-সি ইনজেকসান দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছে। জনকল্যাণ সমিতি কলেরা টাইফয়েড প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করে কয়েক হাজার লোককে ইঞ্জেকসন দেন।

মুর্শিদাবাদ ঃ

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলার সোলা শিল্পের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। মালাকার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যবসা ছিল সীমাবদ্ধ। ধীরে ধীরে মালাকার সম্প্রদায়ের লোকেরা কল কলকারখানায় ঝুঁকে পড়লো। ফলে সোলা শিল্প হারিয়ে যেতে বসেছিল। এমনি সময়ে রায়পুর গ্রামের তারাপদ কর্মকার নিজে এই শিল্প আয়ত্ত করে শিল্পটিকে পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে যে সব কাজ করেছেন তাতে শুধু জেলার লোক নয় সারা দেশের লোকই মুগ্ধ হয়েছে। এই শিল্পীর ছেলে হিরণ্ময়ের সোলা দিয়ে তৈরী "বজরা", 'নৌকা' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি, দেশবিদেশের সৌন্দর্য পিপাসু রসিকদের খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

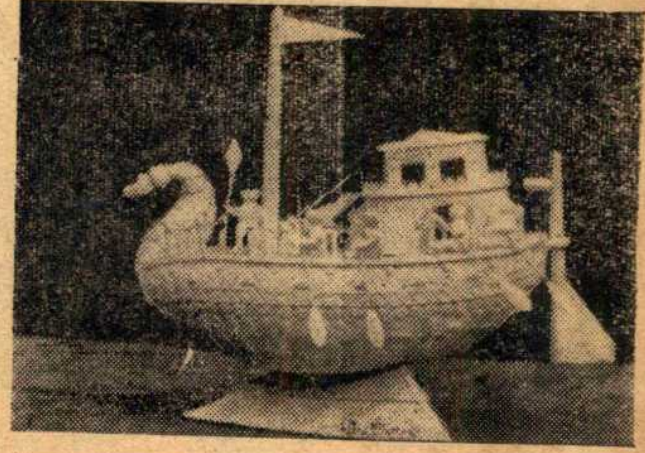

মুর্শিদাবাদের শিল্পীর সোলা দিয়ে তৈরী ময়ূরপঙ্খী

রঙ্গজগৎ

হাই হিল

[রাজীব পিকচাস]

পরিচালনা : দিলীপ মিত্র। কাহিনী : ফণি গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য। সংগীত : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, রেণুকা রায়, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আজকের দিনে সিনেমার মধ্যে গল্প খুঁজতে যাওয়া (বিশেষ করে অধিকাংশ বাংলা সিনেমায়) নিছক সময় নষ্ট করা মাত্র। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এ কথা জানেন, বিশদভাবে বলবার কোন প্রয়োজনই নেই বলেই মনে হয়। 'হাই-হিল' সিনেমাতেও এর খুব একটা ব্যতিক্রম হয় নি (অবশ্য আপনি যদি কারণ ছাড়াই হাসেন)। বর্তমান চিত্র-জগতে আমরা অতি মাত্রায় গল্পকে রিয়ালিষ্টিক হ'তে দেখি এবং পরিণামে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক, হাস্যকর পরিণতি লাভ করে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন সিনেমা দেখবার সময়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আপনি হাসেন সিনেমার গল্প অনুসরণ কোরে নয়, গল্পের অসংগতি লক্ষ্য কোরেই।

'হাই-হিল' ছবিটিতে এর সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। ছবিটিতে হাল্কা রসেরই প্রাধান্য বেশী এবং বলা বাহুল্য যে এই ছবিটির গল্পে সৌভাগ্য-বশত রাঁচির পাগলা গারদের দৃশ্যাবলী উপস্থাপিত করা হয় নি, এবং তার জন্যে ছবিটির পরিচালক দিলীপ মিত্রকে ধন্যবাদ জানাই। অবশ্য ছবিটির মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ নেই এবং নেই বলেই হয় তো দর্শক অনেক পরিমাণে আনন্দ লাভ করবে। কাহিনীকে অতিমাত্রায় মনস্তত্ত্বমূলক করতে গিয়ে পরিচালক দর্শককে যে ভয়াবহ প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেন, এ ছবিটিতে অন্তত তার থেকে কিছু পরিমাণে রেহাই দিয়েছে।

হাল্কা হাস্যরসই এই ছবিটিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। আপনার অবসর মুহূর্তকে যদি একটু উপভোগ করতে চান, সারাদিনের পরিশ্রমের পর যদি বেসামাল হয়ে একটু হাসতে রাজী থাকেন, তবে হাই-হিল দেখতে পারেন।

সংগীতাংশও বাংলা সিনেমার একটি ভয়াবহ সম্পদ। সব 'সিনেমা'র ক্ষেত্রেই যদিও এ কথা প্রযোজ্য নয়, তবে অনেকে সিনেমার ক্ষেত্রে তার সংগীতাংশ অনেক দর্শকের ব্লাড্-প্রেসার বাড়িয়েছে। আশা করি

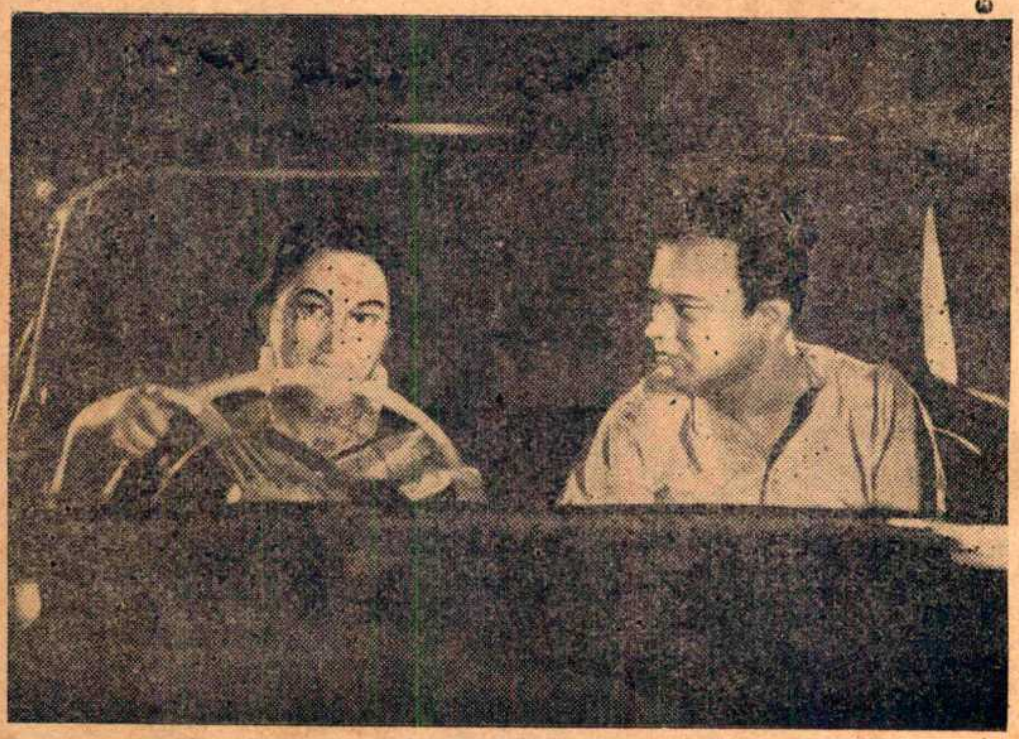

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত রাজীব পিকচাসের হাসির ছবি "হাই হিল" ছবির একটি দৃশ্যে
অনিল চ্যাটার্জী ও সন্ধ্যা রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

ভ্রান্তিবিলাস

ও

প্রযোজক

উত্তমকুমার

এই একটি কারণেই বাঙলার কীর্তিমান শিল্পী উত্তমকুমার চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজ পর্যন্ত কতো ছবিই তো বাঙলার রজতপটে রূপ নিল, কিন্তু কারুরই এ-কথা মনে হয় না। বাঙলা ভাষার অন্যতম জনক পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তো বারেকের জন্যে কারুর স্মৃতি-পথে উদিতই হয় নি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর অবিস্মরণীয় ধ্রুপদী রচনা 'ভ্রান্তিবিলাস' এতদিন লোক-লোচনের আড়ালেই আত্মগোপন করে ছিল। উত্তমকুমার বিস্মৃতির ধলো ঝেড়ে তাকে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পতাকাতলে চিত্রায়িত করতে মনস্থ করলেন। সাড়ম্বরে তার শুভ-সূচনা হল, বর্তমানে সে ছবি আশু মুক্তি প্রতীক্ষায়।

'ভ্রান্তিবিলাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণের খবরে গিয়েছিলাম একদিন নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিয়োয়। দেখা হতেই প্রযোজককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। স্মিতমুখে উত্তমকুমার আমার উচ্ছ্বাস প্রশমিত হতে অবকাশ দিলেন। বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর পূজার আমরা কতটুকুই বা আয়োজন করেছি? গোলদীঘিতে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেই কর্তব্য আমাদের সমাপ্ত হয়েছে। বৎসরান্তে দুবার মাল্য অর্পণের মাঝেই দায়িত্ব যায় শেষ হয়ে। তারপর বাকী দিনগুলিতে মর্মরমূর্তির সে কী দুরবস্থা! বাঙালী জাতির এই শৈথিল্য শিল্পী-কুলতিলককে মনোবেদনায় বিদ্ধ করেছে। আজ সুযোগ পেয়েই তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদনের আয়োজনে তৎপর।

ধ্রুপদী সাহিত্যের আদিতম এই 'ভ্রান্তিবিলাস' বাঙলা ভাষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পশ্চিমের আর এক দিক্‌পাল সাহিত্য-সব্যসাচী বিশ্ববরেণ্য নাট্যকার শেক্সপীঅরের একটি অবিস্মরণীয় রচনা 'কমেডি অফ এরারস'। তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির পাশেই এই প্রহসনটিও স্থান করে নিতে পেরেছে এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। সাগরপারের সেই মহামনীষী প্রায় চার শতাব্দী আগে তৎকালীন রীতি-নীতি পরিবেশে যে রচনাকে রসগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন, আজ এতগুলি শতাব্দীর বিভিন্ন মতবাদের ঝোড়ো হাওয়ায় বিন্দু-মাত্র তার বিচ্যুতি লক্ষিত হয় না। ধ্রুপদী সাহিত্যের এই হল বৈশিষ্ট্য এ সাহিত্য সর্বকালীন, সর্বজনীন---দেশ জাতি বর্ণের প্রাচীর ধুলিসাৎ করে---এর কনক আসনটি পাতা হয় মানুষের মর্মমূলে। তাই আজও সায়রাকিউজ নিবাসী বণিক ইজিঅনের যমজ পুত্র অ্যান্টিফোলাসযুগল এবং ভৃত্য ড্রোমিওদ্বয় আমাদের প্রভূত আনন্দ দান করে, হাসির প্রস্রবণে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুন্দরী আড্রিআনা, তস্যা ভগ্নী লুসিয়ানাকে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, তাদের বিস্ময় বিরাগ দুশ্চিন্তায় নির্মল কৌতুকের ছোঁয়া লাগে সমস্যাজর্জর আমাদের প্রতিদিনকার মনে, চাঙ্গা হয়ে উঠি সহজেই। সাহিত্য তো মানুষকে এই ঐশ্বর্য অকাতরে দান করে, মহাসমুদ্রের সহস্র বৎসরের কল্লোল পুঁথির পাতায় এমনি ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, আমরা তার স্পর্শ লাভ করি হৃদয়ে। 'কমেডি অফ এরারস'-এ কোন জটিল সমস্যা তুলে ধরা হয় নি, কোন বিরাট বক্তব্যও এতে দানা বাঁধে নি---নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না। নিছক একটি হাসির গল্পই এ নাটকে বিধৃত। তবে এটাও অবশ্য উল্লেখনীয়---এ গল্পে যে হাসি প্রতি মুহূর্তে আকুল করে তোলে পাঠক বা দর্শককে, তা স্বতঃ-উৎসারিত। কাতুকুতু দিয়ে কিংবা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে হাসির নামে কান্না উদ্রেক করে না এই ধ্রুপদী রচনা।

মাত্র শতবর্ষ আগে আমাদের এই বাংলার এক মহাত্মা, বাংলা ভাষার অন্যতম জনক আকৃষ্ট হলেন এই কালজয়ী সাহিত্যের প্রতি। তাঁর মনের মত করে 'কমেডি অফ এরারস'কে আমাদের বিশাল সাহিত্যে অন্যতম সম্পদে পরিণত করলেন। যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজীকে অনুসর করেছেন কিন্তু রচনার প্রসাদ ও 'ভ্রান্তিবিলাস' মৌলিকত্ব দাবী করতে পা অনায়াসে। এখানেও যুগল চিরঞ্জী চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী এবং কিঙ্কর আমাদের অনুরূপ ভাবে কৌতুকর আপ্লুত করে। আমরা বিভ্রান্তিকর পরিবে পাত্রপাত্রীকে নাস্তানাবুদ হতে দে কৌতূহলী হই সহজেই। বিদ্যাসাগ রচনায় তৎকালীন আবহাওয়া পরিপূর্ণভ রক্ষিত হয়েছিল, শেক্সপীঅর ও বিদ্য সাগরের কালের ব্যবধান কয়েক শ হলেও আজকের মত এমন সর্ববি পরিবর্তন সূচিত হয় নি সে সময়।

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্র সামাজিক, পারিপার্শ্বিক সব-কিছুরই অ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতীতে রীতি নীতি আজ সব দেশেই পরিত্য সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রযোজক উত্তমকু তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্রার্ঘ 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর প্রয়োজনীয় সং সাধন করেছেন, বরং বলা ভাল, কর বাধ্য হয়েছেন। এ পরিবর্তনের ভার যে জনের ওপরেই ন্যস্ত করেছেন----ি স্বনামধন্য নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচ মুখ্য পাত্রপাত্রী সবই প্রায় বিদ্যমান অ চিত্রনাট্যে, অপ্রয়োজনীয় বোধে দু'এ চরিত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, স্থানকালেও জ বিধায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এ রূপান্তর চিত্রনাট্যে প্রয়োজন ছিল, রচি জনের এই হল অভিমত।

পরিশেষে একটা কথা বলে আজকের এ প্রসঙ্গ শেষ করি---উত্তমকুমার উপ কাজই করেছেন তাঁর নতুন পর্যায়ে তৈরি করবার ব্যাপারে। আজকের আঙ্গি ও পটভূমিকায় অন্যতম ধ্রুপদী সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ সর্বসাধারণের মন জয় ক নিঃসন্দেহে। 'ভ্রান্তিবিলাস' ছায়ায় সাফল্যলাভ করতে বাধ্য।

রাধারাণী পিকচার্সের 'শ্রেয়সী' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অনেক হার্টের অসুখে ভোগা দর্শক আমার মন্তব্যটি বিনা দ্বিধায় সমর্থন করবেন। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সত্যিই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বলা যেতে পারে সংগীতই এই ছবিটির মুখ্য আকর্ষণ। অন্তত গানগুলি শোনবার পর 'এনাসিনে'র প্রয়োজন হয় না।

আলোকচিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ ও কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ মোটামুটি ভাবে প্রশংসনীয়।

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। শ্রীশ্যামল ঘোষ নির্দেশনার কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত জীবনের অনন্যোপায় ও অসহায় দুই বোনের জীবন-ট্রাজেডি নিপুণ ঘাত-প্রতিঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত আকারে ফুটে উঠেছে নাটকটিতে।

মমতা চট্টোপাধ্যায় নায়িকার অভিনয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তিনি অভিনয়াংশে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ। অরূপ মুখোপাধ্যায়, কণিষ্ক রায়, দেব দত্ত, হারু রায় ও চন্দন রায়ের অভিনয় স্থানোপযোগী এবং অভিনন্দনযোগ্য। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চ-পরিকল্পনায় ও রঞ্জিৎ মিত্র আলোকসম্পাতে উল্লেখযোগ্য।

চতুর্মুখ-নাট্যসংস্থা

সুবিখ্যাত নাট্যসংস্থা 'চতুর্মুখ' আগামী রবিবার ১৯শে মে সকাল ৯-৩০ মিঃ এ রঙমহল থিয়েটারে শরৎ-চন্দ্রের 'পথের দাবী' মঞ্চস্থ করিতেছেন। নাটকটি পরিচালনা করিতেছেন শ্রীশ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য এবং আলোক নিয়ন্ত্রণে আছেন শ্রীআশুতোষ বড়ুয়া। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিবেন 'চতুর্মুখের' সভ্যবৃন্দ।

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৫১তম সংখ্যায় 'শহর কলকাতা' লিখেছেন শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সংখ্যায় প্রচ্ছদচিত্র ও 'বঙ্গদর্শনে' শান্তিনিকেতন প্রবন্ধের স্কেচগুলি এঁকেছেন যথাক্রমে শ্রীহর্ষ রায় ও শ্রীসত্যেন বিশী।

বিদেশী ছবি

দি লাস্ট ওয়ার

শ্রীজওহরলাল নেহরু এই ছবি সম্পর্কে প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ জাপানের এই 'দি লাস্ট ওয়ার।' পারমাণবিক যুদ্ধের ভীষণতা কী—তা এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ দৃশ্যে অবর্ণনীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ছবিটি 'এলিটে' প্রদর্শিত হচ্ছে।

নাট্যমঞ্চ

নায়িকার নাম নিয়তি

গত ৬ই মে একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়ের "নায়িকার নাম নিয়তি" নাটকটি 'গন্ধর্ব' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায়

২য় সপ্তাহের জয়যাত্রা | ৩ ঘণ্টা শুধু প্রাণ খুলে হাসুন আর মন-মাতানো গান শুনুন!

ছবি বিশ্বাস * তুলসী চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ হালদারের সর্বশেষ ছবি

শ্রেঃ অনিল - সন্ধ্যা - অনুপ - ভানু - জহর - কমল - শীতল - অজিত
রেণুকা - কুন্তলা এবং গুণ্ডা (কুকুর)

।। গানে ঃ হেমন্ত ০ সন্ধ্যা মুখার্জী ০ ইলা ০ অমল মুখার্জী ।।

রাধা (২।।,৫৮,৯) - পূর্ণ (৩,৬,৯) - লোটাস (৩,৬,৯) - আলোছায়া (২,৫,৮)
লীলা - জয়শ্রী - যোগমায়া - গৌরী - রূপালী - নৈহাটী সিনেমা ও অন্যত্র

খেলা ধূলা

নবজাগ্রত রাষ্ট্রসমূহের নূতন ক্রীড়ানুষ্ঠান

গত বৎসর চতুর্থ এশিয়ান গেমস উপলক্ষে যে রাজনৈতিক খেলা সুরু হোয়েছিল তার জের এখনও মেটে নি। ইন্দোনেশিয়া তখন প্রকাশ্যেই প'ল্টা অলিম্পিক সংগঠনের হুমকি ছেড়েছিল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটীও কঠোর মনোভাব অবলম্বন কোরে ইন্দোনেশিয়ার সদস্যপদ বাতিল কোরে দিতে বাধ্য হয়। সদ্য-প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বারোটি রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় এক বৈঠকে মিলিত হোয়ে 'নবজাগ্রত রাষ্ট্রসমূহের ক্রীড়ানুষ্ঠানে'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরেছেন।

এ বৈঠকে সরকারীভাবে উপস্থিত ছিলেন, কাম্বোডিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক্, মালি, পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েৎনাম, ইউ, এ, আর ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। সিংহল ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি-বর্গ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জাকার্তার এই সম্মেলনে, নিম্ন-বর্ণিত তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হোয়েছে।

(ক) আফ্রো-এশীয় সংহতি ও অলিম্পিক আদর্শ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের ভিত্তি এবং নবজাগ্রত শক্তির প্রতীক সকল রাষ্ট্রে খেলাধূলা, শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়ানুরাগ প্রবর্তন এর উদ্দেশ্য।

(খ) নবজাগ্রত শক্তিসমূহের যুবকগণের ভেতরে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ও সাধারণভাবে বিশ্ব শান্তির সহায়তা করা এই ক্রীড়ার অন্যতম লক্ষ্য।

(গ) এ বছর নভেম্বর মাসে প্রথম ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং তারপর থেকে প্রতি চার বছর অন্তর এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পর্কে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন,—ভারতকে এ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান হয় নি এবং আমন্ত্রিত হোলেও ভারত যোগদান কোরত না। ভবিষ্যতে ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণও ভারত প্রত্যাখ্যান কোরতে দ্বিধা কোরবে না। রাজা বালিন্দার সিংয়ের এই মন্তব্য সকল ভারত-বাসীর অকপট মনোভাবেরই দ্ব্যর্থহীন প্রতিধ্বনি।

কারণ বারোটি রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত অলিম্পিক আদর্শের পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হ'বে এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটী সহ অন্যান্য আন্ত-র্জাতিক ক্রীড়াসংস্থাও এই ক্রীড়ানুষ্ঠানকে অনুমোদন দেবেন না। ফলে, এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা কেবল-মাত্র বারোটি রাষ্ট্রের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত—ইন্দোনেশিয়ার অলি-ম্পিকের সদস্যপদ বাতিল হোয়ে গেছে এবং কম্যুনিষ্ট চীনের সদস্য-পদই নেই। ফলে এদের উদ্যোগে এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে অনুষ্ঠিত কোনও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য রাষ্ট্রেরও অলিম্পিকের সদস্যপদ বাতিল হোয়ে যাবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়ত—ইন্দোনেশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনের এই প্রচেষ্টা এশিয়ান গেমসকে বানচাল করবার সুপরি-কল্পিত চক্রান্তমাত্র।

ডেভিস কাপে ভারতের সাফল্য

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলীয় ফাইন্যালে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের সাফল্য বস্তুতই অভিনন্দনযোগ্য। ভারতের অধিনায়ক রমানাথ কৃষ্ণাণের মতে, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেই ভারতকে খেলতে হোয়েছে।

কিছুদিন আগে অষ্ট্রেলিয়ান কোচ্ ষ্ট্যানলি এডোয়ার্ডস এক মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ভারতের তরুণ

রমানাথ কৃষ্ণাণ

প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ঠিকমত কোচিং দিতে পারলে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে 'উইম্বলডেন' জয় করাও অসম্ভব নয়। এই মন্তব্যের প্রতি নজর দিয়ে ভারতীয়

পোলাও এর জন্য

ফোন : ৪৪-৩৩৯৯ গ্রাম : [illegible]

সুগন্ধি বাসমতী চাউল

কম বেশী যে কোনও পরিমাণ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ব্ববিধ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭-এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

লন টেনিস এসোসিয়েশন এবং নিখিল ভারত কাউন্সিল অফ স্পোর্টস যদি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেন, তবে হয় তো ভারতের ক্রীড়ামান অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত হোতে পারে।

পরিচালক ও পরিচালনা

যে কোনও খেলায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'টো দল, আর খেলাটির পরিচালনা ভার থাকে পরিচালকের ওপর। সেই পরিচালকের পরিচালনায় গুরুতর ত্রুটী-বিচ্যুতির ফলে শুধুমাত্র খেলাটির সহজ, সাবলীল গতিই ব্যাহত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ও মীমাংসিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য এ সমস্যা কেবলমাত্র আমাদের নয়, সকল দেশের খেলাধুলাতেই এ সমস্যা বিদ্যমান।

তবে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করবার উদ্দেশ্য হোল, সম্প্রতি বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার একাধিক খেলায় আম্পায়ারিং সম্পর্কে ময়দানে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হোয়েছে। ক্রীড়ামোদীদের ধারণা, এর ফলে স্থানীয় দলের জয়লাভের পথ সুগম হোয়েছে, পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে বহিরাগত দলগুলো। তাঁদের ধারণা এমনভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হোলে, ভবিষ্যতে হয় তো বহিরাগত দলগুলো অংশগ্রহণে বিরত থাকবে।

কোলকাতায় এ সমস্যা নূতন নয়। কেবলমাত্র হকিতেই আম্পায়ারিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় নি, ফুটবল এবং ক্রিকেটেও একই অবস্থা। ফুটবলের মত হকিতেও যদি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাগুলোতে, বহিরাগত আম্পায়ারদের দিয়ে খেলাগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা করা যায়, তবে এই অপবাদের নিরসন ঘটতে পারে।

তবে এই প্রসঙ্গে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সজাগ থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন খেলাতেই, দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রাধিক্য ঘটছে। এই দর্শকদের উপর কারও হাত নেই,—ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও কিছু করণীয় নেই। একমাত্র পুলিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাব অবলম্বন কোরে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন, তবে সুফল ফলতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন ক্রিকেট

ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল এই সর্বপ্রথম একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা সুরু কোরেছেন, গ্রীষ্মকালীন আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বাংলা দেশের খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা গদীয়ান হোয়ে আছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে খেলাধুলোর কোনও সংযোগ ছিল না। কিসে খেলাধুলোর সামগ্রিক উন্নতি বা অবনতি হোতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি 'ওয়াকিবহাল' নন। ফলে, ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের মত বিত্তশালী প্রতিষ্ঠানও সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে কিশোর প্রতিভা অনুসন্ধানের জন্য কোনও বাস্তব চেষ্টা করেন নি। অথচ নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এককভাবে বাংলা বা সামগ্রিকভাবে পূর্বাঞ্চলীয় দলে বাংলার ভূমিকা নিঃসন্দেহেই উল্লেখযোগ্য। যে সব স্কুলের ছাত্র এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় স্ব-রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পান, তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্যের মূলে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কোনও অবদান নেই। এসোসিয়েশনের এই দুর্বলতার সুযোগে সময় সময় স্কুলের ছাত্র না হোয়েও বে-আইনীভাবে স্কুল দলে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ কোনও কোনও খেলোয়াড়ের ভাগ্যে এসে যায়।

দেরীতে হোলেও, কোলকাতার বিভিন্ন আঞ্চলিক শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলোর ভেতরে একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা কোরে সি, এ, বি, আংশিকভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা কোরেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কামনা করি।

উভয় বঙ্গে ফুটবলের একই হাল

কথায় বলে 'যাহা বাহান্ন,—তাহা তিপান্ন।' বাংলার পূর্ব ও পশ্চিমে অন্তত ফুটবলের একই হাল দাঁড়িয়েছে। কোলকাতায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিশন ফুটবল লীগের খেলা সুরু হতে দেরী হয়ে গেছে। কারণ হোয়াইট বর্ডার ক্লাব আই, এফ্-এর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের কোরেছে, তার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ফুটবলের অচলাবস্থার অবসান হবে না। এ বিষয়ে আইনজ্ঞেরাও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করবার ফলে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে পেশ করা হোয়েছে।

ওদিকে ঢাকায় আবার খোদ সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের বিরুদ্ধেই ছয়টি শীর্ষস্থানীয় ফুটবল দল জেহাদ ঘোষণা কোরেছেন। তাঁরা ৪০টি ক্রীড়াসংস্থা ও ক্লাবের সহযোগিতায় ইউনাইটেড স্পোর্টস কাউন্সিল গঠন কোরে পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের কার্যকলাপের প্রতিবাদ স্বরূপ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভের হুমকি দিয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন প্রদেশপালের বিবেচনাধীন, কারণ তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দাখিল কোরে রাজ্যের খেলাধুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার আবেদন জানান হোয়েছে।

ঢাকাই নাটকের আবার আরও আছে। যে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের এত দোস্তী, সেই চীনা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ না করবার দরুণ পাকিস্তানের চারজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়কে এক বছরের জন্যে সাসপেণ্ড করা হোয়েছে। বলাবাহুল্য পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনই এই শাস্তি প্রদান কোরেছেন

দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

মিহির সরকার এণ্ড মনোহর সরকার

শো রুম—২০০/২ সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

কারখানা—৫২/এফ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫

ভারত সরকারের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুযায়ী
যন্ত্রে তৈয়ারী ১৪ ক্যারেট অলঙ্কারের
আমরা প্রস্তুতকারক।

ইহার

(১) স্থায়িত্ব বেশী

(২) নিখুঁত গড়ন ও

(৩) ব্যবহারে খুব কম ক্ষয় হয়

জাতীয় সঞ্চয়ের জন্য

১৪ ক্যারেট অলঙ্কার ব্যবহার করুন

BAWA

Glass E-Crockeries Private Ltd.

16 MAY 1963

TEA	SET	Rs.	8/-
LEMON	SET	Rs.	4/-
FRUIT	SET	Rs.	2/-

63-H, Radha Bazar Street, Calcutta.

Phone : 22-1494

* CROCKERY
* CUTLERY
* GLASS WARE
* WINDOW GLASS
* PLY WOOD
* HARD BOARD
* SOFT BOARD

BAWA
POTTERIES' CROCKERY

AGENTS
BAWA
AGENCIES PRIVATE LTD.

BRANCHES ALL OVER INDIA